# মোস্তফা-চরিত

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

# মোস্তফা-চরিত

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

প্রণীত

কাকলী প্রকাশনী

# MOSTAFA CHARIT

by

Mohammad Akram khan

**পঞ্চম প্রকাশ**

৪র্থ ঢাকা বইমেলা '৯৭ ও

ফেব্রুয়ারি বইমেলা '৯৮

(প্রথম কাকলী প্রকাশ)

**ষষ্ঠ মুদ্রণ**

জুন ২০০০

(দ্বিতীয় কাকলী প্রকাশ)

**সপ্তম মুদ্রণ**

জুন ২০০৩

(তৃতীয় কাকলী প্রকাশ)

**অষ্টম মুদ্রণ**

ডিসেম্বর ২০০৫

(চতুর্থ কাকলী প্রকাশ)

**প্রকাশক**

এ কে নাছির আহমেদ সেলিম

কাকলী প্রকাশনী

৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

**প্রচ্ছদ**

সিকদার আবুল বাশার

**কমপিউটার কমপোজ**

কম্পিউটার গ্যালাক্সী

৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ১১০০

**মুদ্রণ**

সালমানী প্রিন্টার্স

৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০

দাম সাদা ৩০০ টাকা

ISBN 984 437 154 6

# প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-কে নিয়ে মোহম্মদ আকরম খাঁ রচিত সুবিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ 'মোস্তফা-চরিত' অনেক দিন আগে থেকেই ছাপা ছিলো না। এই গ্রন্থটি আমার 'কাকলী প্রকাশনী' থেকে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের পর তা প্রকাশ করতে বিভিন্ন কারণে বিলম্ব হয়েছে। বিলম্ব হলেও 'মোস্তফা-চরিত' প্রকাশ করতে পেরে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

'মোস্তফা-চরিত' একটি বিশালাকৃতির গ্রন্থ। গ্রন্থটি নির্ভুল এবং প্রকাশনার মান রুচিসম্মত করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। তবু হয়তো আমাদের অজ্ঞাতসারে কোনোরকম ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। যদি সচেতন পাঠকদের কাছে সেরকম কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়ে, আমরা জানতে পারলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে। আশা করি আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি সম্মানিত পাঠকগণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিচার করবেন।

**প্রকাশক**

# নিবেদন

আল্লাহর অনুগ্রহে, এ অধমের বহু দিনের সাধনা ও দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষার ফল— 'মোস্তফা-চরিত' আজ জন-সমাজে প্রকাশিত হইল। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর জীবনী রচনা-ব্যাপারে অন্যান্য লেখকগণ এ-যাবৎ সাধারণতঃ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছি। ইঁহাদের অধিকাংশই হযরতের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রধানতঃ তাবরী, তাবকাত, এবন-হেশাম ও ওয়াকেদীর উপর নির্ভর করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কোরআন-হাদীছের মাপকাঠিতে ঐসব বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সার্বভৌম মানব-ধর্মের যিনি প্রবর্তক, সেই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনায় কেবল ইতিহাসকারদের উপর নির্ভর করা আমি নিরাপদ মনে করি নাই; তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথাকে আমি কোরআন-হাদীছের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেকটি বর্ণনার সত্যাসত্যের জন্য আমি কোরআন-হাদীছের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ফলে অনেক স্থলেই বহু অভিনব তথ্য অবগত হইয়াছি, একাধিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নূতন সত্যের সন্ধান পাইয়াছি।

একদিন অতিভক্ত ও অসতর্ক মুছলমান লেখকগণ রাশি-রাশি ভিত্তিহীন ও আজগুবী গল্প-গুজবের আবর্জনা দ্বারা মোস্তফা-চরিতের প্রকৃত ও পবিত্র আদর্শের বিমল জ্যোতিঃ অজ্ঞাতসারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন, অন্যদিকে ইউরোপের এছলাম-বিদ্বেষী লেখকগণ প্রধানতঃ ঐ সমস্ত গল্প-গুজব অবলম্বন করিয়া হযরতের পূত-পবিত্র জীবনকে কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় শ্রেণীর লেখকগণের বর্ণনার ভিত্তিহীনতা প্রদর্শন করিয়া অকাট্য যুক্তিতর্ক-সমন্বিত মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্যই আমাকে অত বড় বিরাট ভূমিকা লিখিতে হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ ভূমিকাটি মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে শিক্ষিত পাঠকগণের পক্ষে এছলাম-ধর্ম-শাস্ত্রের আলোচনা খুবই সহজ হইয়া উঠিবে।

এই অসাধ্য সাধন করিতে আমাকে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অবিরাম নিভৃত সাধনায় সমাহিত থাকিতে হইয়াছে। আমার এ সাধনা কতটুকু সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, বিজ্ঞ পাঠক তাহার বিচার করিবেন। এই ব্যাপারে আমাকে ইতিহাস, জীবনী, তফছীর, হাদীছ ও তাহার ভাষ্য প্রভৃতি হযরতের জীবনী-সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে হইয়াছে। পুস্তকের যথাস্থানে আমি ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে আবশ্যকমত সঙ্কলন ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করিয়াছি। স্বতন্ত্র প্রমাণ-পঞ্জীতে ঐ সমস্ত গ্রন্থের তালিকা দিয়া পুস্তকের আকার বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

হযরতের নামের সঙ্গে সঙ্গে দরূদ পাঠ করা প্রত্যেক মুছলমানের কর্তব্য। আশা করি, 'মোস্তফা-চরিত' এর পাঠকগণও এই কর্তব্য পালনে অবহেলা করিবেন না।

উপসংহারে বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণের খেদমতে আমার বিনীত আরজ—তাঁহারা এই গ্রন্থের কোথাও ভুলত্রুটি দেখিলে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে তাহা জ্ঞাত করাইবেন। ইনশাআল্লাহ্, আগামী সংস্করণে আমি ঐ সমস্ত ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করিব।

বিনীত

গ্রন্থকার

# দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

যাঁহার সাহায্যমাত্রকে সম্বল করিয়া 'মোস্তফা-চরিত' সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম—এবং যাঁহার প্রদত্ত তাওফিকে দুই বৎসর পূর্বে 'মোস্তফা চরিত' প্রকাশে সমর্থ হইয়াছিলাম—তাঁহারই অনুগ্রহের ফলে আজ আবার তাহার ২য় সংস্করণ হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি—তাই সর্বপ্রথমে সেই সর্বসিদ্ধি দাতা রহমানুর রহিমের হুজুরে অন্তরের অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

'মোস্তফা চরিত' সম্বন্ধে সমাজ যে ভাবে এই দীন খাদেমের উৎসাহ বর্ধন করিয়াছেন, তাহাতে যাহার-পর-নাই অনুগৃহীত ও আপ্যায়িত হইয়াছি। মোছলেম বঙ্গের স্নেহের ঋণ পরিশোধ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাঁহাদের অনুগ্রহে উৎসাহিত হইয়া কোর্‌আনের তফছীর ও 'মোস্তফা-চরিত'-এর ২য় খণ্ড যথাসাধ্য সত্বর প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। তাঁহারা আশীর্বাদ করুন—দীন সেবকের এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে পরিণত হউক।

'মোস্তফা-চরিত'-এর দোষ-ত্রুটীর সংশোধনের জন্য পুনঃপুনঃ বিজ্ঞ পাঠকগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। মফঃস্বলের যে বন্ধুটি এ-সম্বন্ধে আমার সহায়তা করিয়াছেন এবং যাঁহার আলোচনার ফলে দুইটি স্থানের তারিখের ভুল এবার সংশোধিত হইয়াছে, তিনি নিজের নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত। তাঁহাকে ও অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুবর্গকে 'মোস্তফা-চরিত'-এর ২য় সংস্করণের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এবার পুস্তকখানি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া দিলাম। দুই-একটি আবশ্যকীয় স্থানে সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া দিয়াছি।

বিনীত
গ্রন্থকার

# তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

সমাজের অনুগ্রহে ২য় সংস্করণের 'মোস্তফা-চরিত' দুই বৎসর পূর্বে শেষ হইয়া যায়। প্রেসের কর্তৃপক্ষ ৩য় সংস্করণের জন্য পূর্ব হইতেই তাকীদ দিয়া আসিতেছিলেন, গ্রাহকগণের নিকট হইতেও কম তাকাদা আসে নাই। এ সব সত্ত্বেও এই দীর্ঘকালের মধ্যে 'মোস্তফা-চরিত'-এর ৩য় সংস্করণ প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই, অন্যদিকের নানা প্রকার কর্তব্যের নির্দেশে। বিশেষতঃ "দৈনিক আজাদ" প্রকাশের উদ্যোগ-আয়োজনের এবং পরে তাহার সম্পাদন ও পরিচালনের জন্য গত দুই বৎসর আমাকে এত ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইয়াছে যে, এই শ্রেণীর কাজের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা আমার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ মনে একান্ত বাসনা ছিল, ৩য় সংস্করণের মুসাবিদাটা নিজে দেখিয়া দিব, নিজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশ করিয়া যাইব।

দীর্ঘকালের অনর্থক অপেক্ষার পর অবশেষে নিজের কর্মক্লিষ্ট ও চিন্তা-পীড়িত দেহ, মন ও মস্তিষ্ককে প্রস্তুত করিয়া রাত্রের নিশীথ যামগুলিতে কোনগতিকে এই কর্তব্য সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই শক্তি ও সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তাআলার দরগাহে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

এই সংস্করণে কয়েকটা নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে, কয়েকটা বিষয় নূতন করিয়া লিখিয়া দিয়াছি এবং মুসাবিদাখানাও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একবার দেখিয়া দিয়াছি। কিন্তু প্রুফ সংশোধনের ভার নিজে গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমার নিজের অজ্ঞতার ফলে বা প্রুফ সংশোধনের দোষে পুস্তকে যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সম্ভব, বিজ্ঞ পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক সেগুলিকে সংশোধন করিয়া লইলে বিশেষ বাধিত হইব।

'মোস্তফা-চরিত'-এর এই সংস্করণ, সম্ভবতঃ আমার জীবনের শেষ সংস্করণ। 'মোস্তফা-চরিত' রচনার জন্য আমি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, আর্থিক হিসাবে সমাজ তাহার পুরস্কার প্রদান করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আজ পার্থিব পুরস্কার-তিরস্কারের জমা-খরচের দিন অতিবাহিত প্রায়। কৈশোরের উদ্‌ভ্রান্ত নিঃস্ব এতীম যে স্বর্গীয় রূপের স্বেতশুভ্র আভায় চক্ষুষ্মান হইয়া নিজের কর্মজীবনের এই গতিপথকে চিনিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল, পার্থিব জীবনের যবনিকাপাতের পর সে যেন সেই মহানূরের চরণের শরণলাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার একামাত্র কামনা আজ ইহাই। সেই অনাগত সময় সমাগত হইবে যখন, বাংলার মুছলমান অন্তরের একটা "আমিন" দিয়া দীন লেখকের এই প্রার্থনাকে তখন আশীর্বাদ করিবেন, এই তাহার শেষ ভিক্ষা।

কলিকাতা
১৮ই জুলাই, ১৯৩৮

বিনীত
মোহাম্মদ আকরম খাঁ

# সূচিপত্র

## উপক্রমণিকা


প্রথম পরিচ্ছেদ

**প্রাথমিক কথা** ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**মোস্তফা-চরিতের উপকরণ** ৫

ইতিহাসের ধারা ৫, ছিরত ও তারিখ ৬, রেওয়ায়ৎ পরীক্ষায় অবহেলা ও তাহার কারণ ৬, পরবর্তী লেখকগণের অবহেলা ৭, অবহেলার পরিণাম ৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

**মোস্তফা-চরিতের তিনটি সূত্র** ১০

কোর্‌আন ১০, প্রথম নিয়ম—১২, কোর্‌আনের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে একটি সংশয় ১২, দ্বিতীয় নিয়ম—হাদীছ ১৩, তৃতীয় নিয়ম—বিচার ১৩, তৃতীয় নিয়ম—রায় ও রেওয়ায়ৎ ১৫, চতুর্থ নিয়ম—অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ১৬, পঞ্চম নিয়ম—বৈজ্ঞানিক ফ্যাশান ১৮, ষষ্ঠ নিয়ম—অসম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী ১৯, সপ্তম নিয়ম—প্রমাণের তারতম্য ২০।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

**হাদীছ সম্বন্ধে আলোচনা** ২১

হাদীছ, রাবী ও ছনদ ২২, রেজালশাস্ত্র বা চরিত-অভিধান ২৩, হাদীছ লেখার নিয়ম ২৪, মাউজুআৎ বা প্রক্ষিপ্ত সঙ্কলন ২৬, ওছুলে হাদীছ ২৭।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

**পরীক্ষার নূতন ধারা** ২৮

মূলে ভুল ২৮, সূক্ষ্ম সমালোচনা—আবশ্যকীয় ধারা ২৯, দাবী ও প্রমাণ ২৯, প্রথম প্রমাণ ২৯, দ্বিতীয় প্রমাণ ৩০, তৃতীয় প্রমাণ ৩০, চতুর্থ প্রমাণ ৩০, পঞ্চম প্রমাণ ৩১, ষষ্ঠ প্রমাণ ৩২, সপ্তম প্রমাণ ৩২, অষ্টম প্রমাণ ৩২, নবম প্রমাণ ৩৩, দশম প্রমাণ ৩৩।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

**রেওয়ায়ৎ ও দেরায়ৎ** ৩৪

দেরায়ৎ আধুনিক আবিষ্কার নহে ৩৪, প্রথম প্রমাণ ৩৫, দ্বিতীয় প্রমাণ ৩৫, তৃতীয় প্রমাণ ৩৭, চতুর্থ প্রমাণ ৩৭, পঞ্চম প্রমাণ ৩৮, ষষ্ঠ প্রমাণ ৩৮, সপ্তম প্রমাণ ৩৯, অষ্টম প্রমাণ ৩৯, নবম প্রমাণ ৪০, দশম প্রমাণ ৪১, একাদশ প্রমাণ ৪২, দ্বাদশ প্রমাণ ৪২, ত্রয়োদশ প্রমাণ ৪৩, চতুর্দশ প্রমাণ ৪৩, পঞ্চদশ প্রমাণ ৪৩, ষোড়শ প্রমাণ ৪৩, সপ্তদশ প্রমাণ ৪৩, অষ্টাদশ প্রমাণ ৪৪, ঊনবিংশ প্রমাণ ৪৪, বিংশতি প্রমাণ ৪৫।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

**হাদীছের শ্রেণীবিভাগ** ৪৬

হাদীছের প্রাথমিক বিভাগ ৪৬, হাদীছের সংজ্ঞা ৪৭, ছনদ হিসাবে বিভাগ ৪৭, ছাহাবা ও তাবেয়ীর সংজ্ঞা ৪৭, রাবী হিসাবে বিভাগ ৪৮, ছহী হাদীসের সংজ্ঞা ও শর্ত ৪৮, হাছান হাদীছ ৪৯, জঈফ হাদীছ ৪৯, রাবীর ১০ প্রকার দোষ বা 'তা'আন' ৪৯, বেদ্‌আতের সংজ্ঞা ৫১।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

**''মারফু' হুকমী''** ৫১

'মারফু' হুকমী' হাদীছের ব্যাখ্যা ৫২, 'মারফু' হুকমী'র শর্ত চতুষ্টয় ৫২, উপরোক্ত আলোচনার সার ৫৩, অন্যায় সিদ্ধান্ত ৫৪, এই সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা ৫৪, আমাদিগের সিদ্ধান্ত ৫৬, ছাহাবিগণ ও মিথ্যা কথা ৫৭, ছাহাবা ও আদালৎ ৫৭, ছাহাবিগণ মা'ছুম নহেন ৫৯, ছাহাবার হযরতের নাম উল্লেখ না করার কারণ কি? ৫৯, অসম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী ৬০, মারফু হুকমীর দুইটি শর্ত ৬০।

নবম পরিচ্ছেদ

**জাল ও অপ্রামাণিক ও মাউজু' হাদীছ** ৬১

হাদীছের জাল হওয়ার মূল কোথায় ৬১, ছাখাভীর অভিমত ৬১, জালিয়াতগণের শ্রেণীবিভাগ ৬১, ঐতিহাসিক প্রমাদ ৬৩, প্রমাদের নমুনা ৬৩, এছরাইলী রেওয়ায়তের প্রভাব ৬৪, তফছীর ও ইতিহাসে ঐ রেওয়ায়তগুলির প্রাদুর্ভাব ৬৫।

দশম পরিচ্ছেদ

**হাদীছ মাউজু' হওয়ার কারণ কি?** ৬৬

মূলের ভুল ৬৬, মারাত্মক অবহেলা ৬৭, তফছির ও ইতিহাস সম্বন্ধে চিরাচরিত উপেক্ষা ৬৭, ইমাম আহমদের মত ৬৮, জাল হাদীছের লক্ষণ ৬৮, হাদীছ জালের কারণ ও উদ্দেশ্য ৬৯, কেরামিয়া ও ভণ্ডছুফিগণের অভিমত ৭০, ইমাম আহমদ ও জনৈক জালিয়াত ৭০, এবনে-জরিরের বিপদ ৭১, ওয়াজ ব্যবসায়ীদিগের দুরবস্থা ৭৩, নবদীক্ষিত কপট মুছলমানদিগের কীর্তি ৭৪, পৌরাণিক গল্প-গুজবগুলি ধ্বংসের কারণ হয় কেন? ৭৪, জাল হাদীছের লক্ষণ ৭৬।

একাদশ পরিচ্ছেদ

**অষ্টম, নবম ও দশম পরিচ্ছেদের সার সঙ্কলন** ৭৭

পূর্ববর্তী জীবনী লেখকগণ ৭৮, আরবী ইতিহাস ও জীবন-চরিত ৭৮, ইমাম জোহরী ৭৯, মুছা-এবন-ওকবা ৭৯, এবন এছহাক ৭৯, ওয়াকেদী ৮২, এবন ছাআদ ৮২, বোখারীর 'তারিখ' ৮৩, এবন জরীর তাবরী ৮৪, এবন কাইয়েম ৮৪।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

**মুছলমান গ্রন্থকার কর্তৃক অন্যান্য ভাষায় লিখিত জীবনী** ৮৫

'খোতবাতে আহমদিয়া' ৮৫, 'রাহ্মাতুল্-লিল্-আলামীন' ৮৫, 'ছিরতে নবভী' ৮৫।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

**হযরতের জীবনী ও পাশ্চাত্য লেখকগণ** ৮৬

''মিথ্যা-ঈশ্বর মোহাম্মদ'' ৮৭, মদ্য ও শূকর মাংস ৮৮, দ্বিতীয় যুগের সূচনা ৯০।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

**খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সমূহের সহিত তুলনা** ৯১

বৈদিক সাহিত্য ৯৬, জেন্দ-আভেস্তা ৯৯।

# ইতিহাস ভাগ

## প্রথম পরিচ্ছেদ


**প্রাক্-এছলামিক যুগের আরব** ১০২

ইতিহাসের উপকরণ ১০২, আরবের প্রথম বিশেষত্ব ১০২, দ্বিতীয় বিশেষত্ব ১০৩, তৃতীয় বিশেষত্ব ১০৩, চতুর্থ বিশেষত্ব ১০৩, পঞ্চম বিশেষত্ব—স্বাধীনতা ১০৪, জাতিভেদ ১০৪, পুরোহিত বংশ ১০৫, আরবের ইহুদী ১০৫।


## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ


**পাদরীদিগের প্রমাদ** ১০৬

চাঞ্চল্যের কারণ ১০৬, এছলামের শিক্ষা ১০৭, বর্তমান তাওরাতের ঐতিহাসিক মূল্য ১০৭, ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক মূল্য ১১০, যীশুর প্রার্থনা ১১২, বাইবেলে সদাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভের বিবরণ, সদাপ্রভুর আশীর্বাদ ১১২, যোসেফ ও যীশু ১১২, যীশুর আশীর্বাদ প্রাপ্তি ১১৩, যাকোবের নৃশংসতা ১১৩, প্রবঞ্চনামূলক আশীর্বাদ লাভ ১১৩।


## তৃতীয় পরিচ্ছেদ


**এছমাইল ও এছহাক** ১১৫

কোরবানীর স্থান নির্ণয় ১১৫, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার ১১৭।


## চতুর্থ পরিচ্ছেদ


**এছমাইলের কোরবানী সম্বন্ধে কোরআনের উক্তি** ১১৯

একটা সাধারণ ভ্রম ১২০, দ্বিতীয় সংশয় ১২১, খ্রীষ্টানের প্রধান দাবী ১২২, আরব ও এছরাইল বংশের সামঞ্জস্য ১২৩, মওলানা শিবলীর সিদ্ধান্ত ১২৫, ভৌগোলিক ভ্রম ১২৬।


## পঞ্চম পরিচ্ছেদ


**আরবের ভৌগোলিক বিবরণ** ১২৮

আরবের ভৌগোলিক বর্ণনা ১২৮, প্রাচীন আরব ১২৮, জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ধারা ১২৯, আরব আরেবা ১২৯, দুইটি সমস্যা ঃ প্রথম সমস্যা ঃ ১৩৩, দ্বিতীয় সমস্যা ঃ ১৩৪, সমস্যার সমাধান ১৩৫।


## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ


**এছলামের পূর্বে জগতের অবস্থা** ১৩৬

ভারতবর্ষ ১৩৬, চীনদেশের অবস্থা ১৪১, বৌদ্ধ প্রভাব ১৪২, পারস্যের অবস্থা ১৪৩, ইহুদী জাতি ১৪৪, খ্রীষ্টান ধর্ম ১৪৫, আরবের শোচনীয় অবস্থা ১৪৬।


## সপ্তম পরিচ্ছেদ


**শেষ নবী আরবে আসিলেন কেন?** ১৪৮

মক্কা পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ১৪৯, আরবের অন্যান্য বিশেষত্ব ১৪৯, আরবের স্বাধীনতা ১৫০।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

**.হযরতের আবির্ভাব** ১৫১

জন্মের তারিখ ১৫১ মাতৃগর্ভে পিতৃহীন ১৫২, আকিকা ও নামকরণ ১৫২, আমেনার স্বপ্ন ১৫৩, যীশুর নামকরণ ১৫৪, মোহাম্মদ-আহ্‌মদ ১৫৪।

নবম পরিচ্ছেদ

**হযরতের জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ব্যাপার** ১৫৫

অলৌকিক ব্যাপার ১৫৬, আমেনার স্বপ্ন ১৫৬, কল্পিত গল্প ১৫৭, অনৈছলামিক কল্পনা ১৫৮।

দশম পরিচ্ছেদ

**ধাত্রীগৃহে** ১৫৯

প্রথম ধাত্রী ১৬০, বিবি হালিমা ১৬০, ডাঃ স্প্রেঙ্গারের অদ্ভুত মত ১৬২।

একাদশ পরিচ্ছেদ

**বক্ষ-বিদারণ ব্যাপার** ১৬৩

শাস্ত্রীয় প্রমাণের আলোচনা ১৬৪, ঐতিহাসিক সমালোচনা ১৬৬, সিলাইয়ের চিহ্ন ১৬৭, কোর্‌আনের প্রমাণ ১৬৮, আয়তের ভ্রান্ত অর্থ ১৬৮।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

**মৃগী বা মূর্চ্ছারোগ—ভিত্তিহীন কল্পনা** ১৬৯

মূরের পুস্তক ১৬৯, মূরের চরম অজ্ঞতা ১৬৯, খ্রীষ্টান লেখকগণের অসাধুতা ১৭১, মিথ্যার মূল উৎস ১৭১।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

**বিপদের উপর বিপদ** ১৭৩

মাতৃবিয়োগ ১৭৩, পিতামহের মৃত্যু ১৭৩, বিপদ স্বর্গের দান ১৭৩, আবু-তালেব ১৭৪, খ্রীষ্টান লেখকগণের নীচতা ১৭৪, মূরের অসাধুতা ১৭৫।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

**অন্যান্য ঘটনা** ১৭৬

ঋণনা ১৭৬, হযরত (সঃ) মানুষ ১৭৬, হযরতের শিক্ষা ১৭৭।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

**সিরিয়া যাত্রা** ১৭৯

বাহিরা রাহেব ১৭৯, গল্পের ঐতিহাসিক ভিত্তি ১৮০, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ১৮১, হাদীছের পরীক্ষা ১৮১, হাদীছটি যুক্তির হিসাবেও অগ্রাহ্য ১৮৩, অন্যপক্ষের প্রথম প্রমাণ ও তাহার খণ্ডন ১৮৩, বিপক্ষের দ্বিতীয় প্রমাণ ও তাহার খণ্ডন ১৮৪।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

**যৌবনের প্রথম সাধনা** ২০৫

ওকাজ-মেলাক্ষেত্রে আরব ১৮৫, ফেজার সময় ১৮৫, হযরতের জীবন্ত মো'জেজা ১৮৬, হলফল ফজুল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা ১৮৭, এই অধ্যায়ের শিক্ষা ১৮৮, প্রথম যৌবনের বৃত্তি ও ব্রত ১৮৯।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

**তাহেরা ও আল্-আমীন** ১৯০

বিবি খদিজা ১৯০, হযরতের নূতন নাম ১৯০, খদিজার আহ্বান ১৯১, বিবি খদিজার উপর মোস্তফা চরিত্রের প্রভাব ১৯২, বিবাহের প্রস্তাব ১৯২, বিবাহ ১৯২, নাস্তুরা রাহেবের কেচ্ছা ১৯৩, ছৈয়দ বংশের উৎপত্তি ১৯৫, হযরতের অসাধারণ সংযম ১৯৫, মার্গোলিয়থের হঠোক্তি ১৯৫, কথকগণের ঘৃণিত গল্প ১৯৬, আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ১৯৭।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

**কা'বার পুনর্নির্মাণ** ১৯৮

পুনর্নির্মাণের আবশ্যকতা ১৯৮, কোরেশের সম্মিলিত চেষ্টা ১৯৮, ঘোর বিরোধ ১৯৯, আল-আমীনের আবির্ভাব ১৯৯, বাইবেলের সাক্ষ্য ২০০, কৃষ্ণ প্রস্তর একটা স্মৃতিফলক মাত্র ২০০।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

**সাংসারিক জীবনের কয়েকটা ঘটনা** ২২১

জায়েদের সৌভাগ্য ২০১, ক্রীতদাস পুত্র হইল ২০২, কর্ম-জীবনে সাফল্য ২০৩, কোরেশ কৌলিন্যের কঠোর প্রতিবাদ ২০৩, স্বাধীন চিন্তা ও ভাবুকতা ২০৪, দরগাহ্ পূজার প্রতি হযরতের আজীবন ঘৃণা ২০৪, খ্রীষ্টান লেখকের সাধুতা ২০৫, সত্যান্বেষী দল ২০৫, মূরের প্রগলভতা ২০৬।

বিংশ পরিচ্ছেদ

**সময় নিকটবর্তী হইতেছে** ২০৬

ভাব ও চিন্তা ২০৬, নিভৃত চিন্তা ও আত্মার বিকাশ ২০৭, হেরা পর্বত ২০৮, সাধনার সিদ্ধি ২০৮, প্রথম অহির সময় নির্ণয় ২০৮।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

**সত্যের আত্মপ্রকাশ** ২১১

অহির প্রারম্ভ ২১১, আত্মহত্যার চেষ্টা ২১২, ত্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক ২১৩, বিবি খদিজার হেতুবাদ ২১৩, প্রথম অবতীর্ণ আয়তগুলির বিশেষত্ব ২১৪।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

**সত্য প্রচারের আদেশ** ২১৫

আল্লাহো আকবর—এছলামের বীজমন্ত্র ২১৬, নেতার কর্তব্য ২১৬, প্রাথমিক মোছলেমমণ্ডলী ২১৭, আলী ও আবুবাকর ২১৭, তিন বৎসর গোপনে প্রচার ২১৮, কয়েকটা বিবরণের বিচার ২১৮, রাবীগণের ভ্রম ২১৯

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

**প্রকাশ্য প্রচারের আদেশ** ২২০

কোরআনের দুইটি আয়ত ২২০, প্রচার উদ্দেশ্যে প্রথম সম্মেলন ২২১, দ্বিতীয় সম্মেলন ২২১, অদম্য উৎসাহ ২২১, পর্বতের ওয়াজ ২২২, তাওহীদের প্রথম ঘোষণা ২২২, এছলামের প্রথম শহীদ ২২৩।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

**সত্যের বিরুদ্ধাচরণ** ২২৩

বিরুদ্ধাচরণের ধারা ২২৩, কোরেশের বিরুদ্ধাচরণের কারণ ২২৪, একটি প্রশ্ন ২২৫, ধৈর্যের সময় ২২৬।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

**মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন** ২২৬

আবু-তালেবের দৃঢ়তা ২২৭, হযরতকে হত্যা করার চেষ্টা ২২৮, হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের দৃঢ়তা ২২৯।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

**কঠোর পরীক্ষা** ২৩০

বেলালের পরীক্ষা ২৩০, ভক্ত পরিবারের পরীক্ষা ২৩২, খব্বাবের অনল পরীক্ষা ২৩২, ওছমানের দৃঢ়তা ২৩৩, পরীক্ষার ফল ২৩৪।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

**দেশত্যাগের সঙ্কল্প** ২৩৫

আবিসিনিয়ায় প্রস্থান ২৩৫, প্রত্যাবর্তন ২৩৬, অন্যায় দোষারোপ ২৩৭।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

**কোরেশের নূতন ষড়যন্ত্র** ২৩৮

আবিসিনিয়ায় কোরেশ দূত ২৩৮, দূতগণের ষড়যন্ত্র ২৩৮, নাজ্জাশীর ন্যায়নিষ্ঠা ২৩৯, জা'ফরের অভিভাষণ ২৩৯, নাজ্জাশীর মীমাংসা ২৪১, দূতগণের নূতন অভিসন্ধি ২৪১, নূতন পরীক্ষা ও মুছলমানগণের দৃঢ়তা ২৪১, যীশু সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ২৪২, নাজ্জাশীর এছলাম গ্রহণ ২৪২, মার্গোলিয়থের চাঞ্চল্য ২৪২।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

**ঐতিহাসিক প্রমাদ** ২৪৩

মিথ্যা জনরব ও তৎপ্রচারের কারণ ২৪৩, মোস্তফা-চরিত্রে জঘন্য দোষারোপ ২৪৩, আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য ২৪৪, এই বিবরণে কথিত হইয়াছে যে—প্রথম দফা ঃ ২৪৪, দ্বিতীয় দফাঃ ২৪৫, তর্কীভূত আয়ৎ ২৪৫, স্পষ্ট মিথ্যা ২৪৬, দ্বিতীয় প্রমাণ ২৪৬, তৃতীয় প্রমাণ ২৪৭।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

**ভীষণা উক্তি** ২৪৮

বিবরণের ঐতিহাসিক ভিত্তি ২৪৮, অবিশ্বাস্য সাক্ষ্য ২৪৮, এবনে-আব্বাছের বর্ণনা ২৪৯, বোখারী ও মোছলেমের হাদীছ ২৫০, প্রত্যক্ষদর্শীর বিরুদ্ধ-সাক্ষ্য ২৫০, মূল রাবী একরামা ২৫১, আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য ২৫১, স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা ২৫২।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

**মুছলমান লেখকগণের অবহেলা** ২৫৪

মিঃ আমীর আলীর মন্তব্য ২৫৪, শিবলীর আলোচনা ২৫৫, ধর্মের দিক দিয়া আলোচনা ২৫৫, রাজীর মত ২৫৫, খাজেনের মত ২৫৬, এবনে খোজায়মার মত ২৫৬, বায়হকীর অভিমত ২৫৬, কাজী আয়াজের অভিমত ২৫৬, ইমাম এবনে হাজমের অভিমত ২৫৬, ইমাম গাজ্জালীর অভিমত ২৫৬, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ২৫৭, গল্পটির মূল ভিত্তি কোথায়? ২৫৮, মূলের ভুল ২৫৯, আয়তের অর্থ বিকৃতি ২৬০, অর্থ বিকৃতির কারণ ২৬১, কংক্রিট ভ্রম ২৬২, বিবরণগুলির অসামঞ্জস্য ২৬২।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

**কোরেশদিগের ক্ষোভ ও ক্রোধ** ২৬৩

আবুজেহেলের অত্যাচার ২৬৩, হামজার প্রতিশোধ গ্রহণ ২৬৪, চিন্তা ও জ্ঞানের বিকাশ ২৬৪, হামজার এছলাম গ্রহণ ২৬৫, নূতন ষড়যন্ত্র—প্রলোভন ২৬৫, সত্যের মহিমা ২৬৬, ওৎবা স্তম্ভিত ২৬৬, ওৎবার অভিমত ২৬৭, কোরেশের সমবেত চেষ্টা ২৬৭, কোরেশ মজলিসে মোস্তফা ২৬৭, আবার প্রলোভন ২৬৭, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ২৬৮, কোরেশের প্রলাপোক্তি ২৬৯, তকদির ও তদবির ২৬৯।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

**ওমরের নবজীবন লাভ** ২৭০

এছলামের প্রথম তকবির নিনাদ ২৭৩, ওমরের পরীক্ষা ২৭৪, মক্কা নগরে মোছলেম মিছিল ২৭৪।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

**কঠোরতর পরীক্ষা** ২৭৫

কোরেশের নূতন সঙ্কল্প ২৭৫, সামাজিক শাসন ২৭৫, অন্তরীণে তিন বৎসর ২৭৬, পরীক্ষা ও ঈমান ২৭৬, চরম ক্লেশ ভোগ ২৭৭, অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া ২৭৭, বিপদ আল্লাহর দান ২৭৮।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন বিপদ ও **কঠোরতর পরীক্ষা** ২৭৯

বিবি খদিজার মৃত্যু ২৮০, আবু-তালেবের মৃত্যু ২৮১, আবার অত্যাচার ২৮২, তায়েফে ২৮৩, তায়েফে প্রচার ২৮৪, তায়েফবাসীর অত্যাচার ২৮৪, হযরতের জীবন-সংশয় অবস্থা ২৮৪, সত্যের তেজ ও ভবের আবেগ ২৮৫, হযরতের করুণ প্রার্থনা ২৮৬, মক্কায় প্রত্যাবর্তন ২৮৬, মোৎএমের অভয়দান ২৮৬

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ

**খ্রীষ্টান লেখকগণের চাঞ্চল্য** ২৮৭

পুণ্য আদর্শ ২৮৮, মে'রাজের বিবরণ ২৮৯, ছওদার সহিত বিবাহ ২৯১।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

**তীর্থ মেলায় এছলাম প্রচার** ২৯১

কোরেশের নূতন ষড়যন্ত্র ২৯১, হযরতের প্রচার ও কোরেশদিগের বাধাদান ২৯২, বিভিন্ন গোত্রের নিকট প্রচার ২৯৩, বিফলতা ও ধৈর্য ২৯৫।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

**সফলতার প্রথম সূচনা** ২৯৫

তোফেলের এছলাম গ্রহণ ২৯৫, দাওছ গোত্রে এছলাম প্রচার ২৯৬, আবু-জর গেফারীর নবজীবন লাভ ২৯৭, আবু-জরের তাওহীদ ঘোষণা ২৯৮, প্রবাসীদিগের চরিত্রের প্রভাব ২৯৮, গুণীন জেমাদ গুণমুগ্ধ হইলেন ২৯৯, খাজরাজীয় দূতগণের নিকট সত্য প্রচার ২৯৯, উজ্জ্বল আদর্শ ৩০০, কর্মহীন দোওয়া ৩০০।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

**মদীনার মহামুক্তি** ৩০১

আটজন দীক্ষিত ৩০১, প্রত্যেক মুছলমানই প্রচারক ৩০১, প্রথম আকাবার বায়আৎ ৩০২, মোছআবের আদর্শ ৩০২, মদীনায় প্রচার ৩০২, আদর্শের প্রভাব ৩০৩, প্রধানগণের বিপক্ষতাচরণ ৩০৩, প্রচারকের আদর্শ ধৈর্য ৩০৪, ওছায়দের সত্য গ্রহণ ৩০৪, ছা'আদের শত্রুতা ও সত্য গ্রহণ ৩০৫, আশহাল গোত্রের এছলাম গ্রহণ ৩০৫, প্রচারের ফল ৩০৫।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

**মদীনা প্রয়াণের শুভ সূচনা** ৩০৬

কা'ব বেন-মালেক ৩০৬, গুপ্ত সম্মেলন ৩০৬, বায়আৎ ৩০৭, জ্ঞানের মুক্তি ৩০৮, জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব ৩০৮, স্বাধীন চিন্তা এছলামের দীক্ষামন্ত্র ৩০৯, দ্বিতীয় আকাবায় বিশেষ শর্ত ৩০৯, দ্বাদশ প্রচারক ৩১০, শয়তানের চীৎকার ৩১১, কোরেশের চৈতন্য ৩১১, ছা'আদের প্রতি অত্যাচার ৩১২।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

**মদীনায় কৃতকার্যতা,—কারণ কি?** ৩১২

মদীনার অধিবাসী ৩১২, সফলতার কারণ কি? ৩১৩, খ্রীষ্টান লেখকগণের অভিমত ৩১৩, প্রথম দফার প্রতিবাদ ৩১৩, দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের অসমীচীনতা ৩১৪, তৃতীয় যুক্তির খণ্ডন ৩১৪, চতুর্থ দফার আলোচনা ৩১৫, খ্রীষ্টানের ক্ষোভ ৩১৫, এ প্রদীপ নিবিবে না ৩১৫, সংশয় ভঞ্জন ৩১৫, প্রথম কারণ, মক্কা ও মদীনার প্রাকৃতিক তারতম্য ৩১৬, দ্বিতীয় কারণ, স্বদেশবাসীর অভিমান ৩১৬, তৃতীয় কারণ, সত্যের প্রধান বৈরী পুরোহিত সমাজ ৩১৭।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

**বায়আৎ—প্রকৃত তথ্য** ৩১৮

অর্থ ও ব্যাখ্যা ৩১৮, বর্তমান যুগের অনর্থক বায়আৎ ৩১৯, এছলাম ও তরবারি ৩১৯, প্রচারকের স্বরূপ ও তাহাদের কর্তব্য ৩২০, প্রচারের ধারা ৩২১, প্রচারের বর্তমান অবস্থা ৩২১।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

**দেশত্যাগের সঙ্কল্প** ৩২২

ভক্তগণের দেশ ত্যাগ ৩২৩, ছোহেবের প্রতি কোরেশের চরম অত্যাচার ৩২৩, হেশাম ও আইয়াশের প্রতি অত্যাচার ৩২৪, অলিদ প্রমুখের ধর্মত্যাগ—মিথ্যা কথা ৩২৫, আইয়াশ প্রমুখের ধর্মত্যাগ—মিথ্যা কথা ৩২৫, কোরেশদিগের মর্মবিদারক অত্যাচার ৩২৭, মারগোলিয়থের অসাধু মন্তব্য ৩২৮।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

**আনছারগণের সৌজন্য** ৩২৯

কোরেশের ষড়যন্ত্র ৩২৯, সম্মিলিত সভায় পরামর্শ ৩৩০, শেষ সিদ্ধান্ত—মোহাম্মদকে হত্যা করিতে হইবে ৩৩০, হিজরতের আয়োজন ৩৩১, আবু-বাকরের গৃহে পরামর্শ ৩৩১, হিজরতের অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা, বোখারীর হাদীছ ৩৩২, প্রচলিত গল্প ৩৩২, গল্পের মূল রাবী তাবরী ৩৩৩, গল্পটি ভিত্তিহীন ৩৩৩, আসল কথা ৩৩৪, আর একটি প্রশ্ন ৩৩৫।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

**পূর্ণচন্দ্র গুহায় লুকাইলেন** ৩৩৫

আবদুল্লাহ্—গুপ্তচর ৩৩৬, কোরেশের ক্রোধ ৩৩৬, বিশ্বাসের চরম আদর্শ ৩৩৭, মূরের কুমতলব ৩৩৭, মূরের উক্তি পরস্পর বিরোধী ৩৩৮, গুহা সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প ৩৩৮, গল্পটি অপ্রামাণিক ৩৩৯, মাকড়সার জাল ৩৩৯, যীশু ও মোহাম্মদ ৩৪০, খ্রীষ্টানের আক্রমণ ৩৪০, মদীনা যাত্রা ৩৪১।

ষটচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

**মদীনার পথে** ৩৪৩

ছোরাকার আক্রমণ ৩৪৫, ইতিহাসের ভ্রম ৩৪৭, উম্মে-মা'বদের আশ্রম ৩৪৮, হযরতের রূপগুণ বর্ণনা ৩৪৮, দস্যুদলের আক্রমণ ৩৪৯, দস্যুদলের এছলাম গ্রহণ ৩৫০।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

**কোবা পল্লীতে শুভাগমন** ৩৫১

আলীর আগমন ও মছজিদ নির্মাণ ৩৫২, নবীর ছুন্নত ৩৫২, নেতৃত্বের আদর্শ ৩৫৩, এছলামের প্রথম জুমআ ৩৫৪, প্রথম খোৎবা ৩৫৪, নগর প্রবেশ ৩৫৬।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

**খ্রীষ্টান লেখকগণের সাধুতা** ৩৫৭

কোবা নগরে গমন ৩৫৯, জুমআর নামায সম্বন্ধে মারগোলিয়থের দাবী ৩৫৯, ঐ দাবীর অসারতা ৩৬০, প্রকৃত কথা ৩৬১, অনুকরণের কুফল ৩৬১, ঐতিহাসিক ভ্রম ৩৬২।

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

**মদীনার প্রাথমিক অনুষ্ঠান সমূহ** ৩৬৩

আবু-আইউবের আতিথ্য ৩৬৩, পিয়াজ-রসুন অভক্ষ্য ৩৬৩, মছজিদ নির্মাণের আয়োজন ৩৬৩, মছজিদ নির্মাণ ৩৬৫, মছজিদের বিশেষত্ব ৩৬৫, সেকাল ও একাল ৩৬৫, ঐতিহাসিক প্রমাদ ৩৬৬, আছহাবে ছুফফা ৩৬৬, সন্ন্যাস ও এছলাম ৩৬৭।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

**প্রথম হিজরীর অন্যান্য ঘটনা** ৩৭১

আবদুল্লাহ্‌র এছলাম গ্রহণ ৩৭১, আনছারগণের মহত্ত্ব ৩৭২, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ৩৭২, নির্বাচনের বিশেষত্ব ৩৭৩, মোহাজেরগণের আত্মনির্ভরশীলতা ৩৭৪, আজান ৩৭৫, আজানের অর্থ ৩৭৫, আজান সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ৩৭৫, আবদুল্লাহ্‌র হাদীছ অপ্রামাণ্য ৩৭৬, অন্যান্য ঘটনা ৩৭৮, মদীনায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ৩৭৯, আন্তর্জাতিক সনদ ৩৭৯, স্থায়ী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ৩৮০।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

**মক্কার ১৩ বৎসর** ৩৮০

অপরাধের আলোচনা ৩৮১, অন্তর্জাতিক আইন ৩৮২, কোরেশের ক্রোধ ৩৮৩, মদীনার অবস্থা ৩৮৩, মদীনার কপট ও পৌত্তলিকদল ৩৮৪, মুছলমানদিগের উৎকণ্ঠ ও সতর্কতা ৩৮৫।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

**কোরেশদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্র** ৩৮৫

আবওয়া 'অভিযান' ৩৮৭, বোওয়াৎ ও ওশায়রা ৩৮৭, প্রকৃত কথা ৩৮৮, শিবলীর সিদ্ধান্ত ৩৮৮, মদীনা আক্রমণ ৩৮৯, গুপ্তচর সজ্ঞ প্রেরণ ৩৮৯।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

**এছলামের প্রথম ধর্মসমর** ৩৯২

আবু-সুফিয়ান ও তাহার কাফেলা ৩৯৩, জেহাদের প্রথম আয়ৎ ৩৯৪, কোরআনের প্রমাণ—দ্বিতীয় আয়ৎ ৩৯৫, কোরআনের প্রমাণ—তৃতীয় আয়ৎ ৩৯৬, ঐতিহাসিক প্রমাদ, প্রথম প্রমাণ ৩৯৭, দ্বিতীয় প্রমাণ ৩৯৮, তৃতীয় প্রমাণ ৩৯৮, চতুর্থ প্রমাণ ৩৯৮, আর একটি ঐতিহাসিক ভ্রম ৩৯৯, প্রতিপক্ষের প্রথম দলিল ও তাহার খণ্ডন ৪০০, প্রতিপক্ষের দ্বিতীয় দলিল ও তাহার খণ্ডন ৪০১, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ৪০২।

চতুষ্পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

**বদর সমর—ভক্তগণের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা** ৪০৩

কোরেশের ব্যূহ রচনা ৪০৩, হযরতের জন্য আরিশ নির্মাণ ৪০৪, হযরতের প্রার্থনা ৪০৪, ভক্তগণ প্রস্তুত ৪০৫, যুদ্ধ নিবৃত্তির প্রস্তাব ৪০৫, যুদ্ধের সূত্রপাত—ওৎবা নিহত ৪০৬, সাধারণ আক্রমণ ৪০৭, হযরতের আকুল প্রার্থনা ৪০৭, যুবকের সঙ্কল্প ৪০৮, আবু-জেহেল নিহত হইল ৪০৯, সত্যের জয় ৪০৯, কোরেশ বন্দীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার ৪০৯।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

**বদর সমর সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনা** 410

মদীনায় সংবাদ প্রেরণ 411, ইহুদীদিগের মনস্তাপ 411, হযরতের প্রত্যাগমনে মদীনায় উৎসব 411, বন্দীদিগের সম্বন্ধে পরামর্শ 412, মুক্তিপণ—প্রকার ও পরিমাণ 413, বন্দী হত্যার মিথ্যা অভিযোগ 413, নাজ্‌রের হত্যা 414, ওকবার হত্যাকাণ্ড 415।

ষট্‌পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

**দ্বিতীয় হিজরীর অন্যান্য ঘটনা** 417

হযরতকে হত্যা করার নূতন ষড়যন্ত্র 417, কোরেশের প্রতিহিংসা 418, বিবি ফাতেমার বিবাহ 419, আবু-সুফিয়ানের নূতন ষড়যন্ত্র 419, রোযা ও ঈদের জামাআত 420।

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

**ইহুদীদিগের বিশ্বাসঘাতকতা** 420

ইহুদের আশঙ্কা 421, বানি-কইনোকা বংশের প্রকাশ্য বিদ্রোহাচরণ 424, কা'বের প্রাণদণ্ড 427।

অষ্টপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

**ওহোদের অগ্নি-পরীক্ষা** 449

কোরেশের রণসজ্জা 429, কোরেশের ধনবল ও জনবল 430, কোরেশবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা 431, পরামর্শ সভা 431, প্রতিবাদ ও ভোট গ্রহণ 431, মোছলেম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা 433, সেনাপতিরূপে আল্লাহ্‌র রছুল 434, বালকগণের ভক্তি ও অভিমান 434, যুদ্ধের সূচনা 435, দ্বন্দ্বযুদ্ধ 435, আমীর হামজার বীরত্ব ও শাহাদত 437, আবু-দোজানার সৌভাগ্য 437।

ঊনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

**যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য পরিবর্তন** 438

আদেশ অমান্য করার শোচনীয় প্রতিফল 438, মোছআবের আত্মত্যাগ 439, হযরতের উপর ভীষণ আক্রমণ 440, জিয়াদের অপূর্ব সৌভাগ্য 440, ওম্মে-আমারার অপূর্ব বীরত্ব 441, হযরত আহত হইলেন 441, মদীনার মহিলাগণ ময়দানে 442, নররাক্ষসীদিগের পৈশাচিক কাণ্ড 443, তাওহীদের প্রকৃত স্বরূপ 443, আবু-সুফিয়ান হতভম্ব 444, যুদ্ধের জয়-পরাজয় 445, হামরাউল-আছাদ অভিযান 446, দুইজন বন্দীর প্রাণদণ্ড 447।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

**চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী** 449

রাজী প্রান্তরের শোণিত-তর্পণ 449, জায়েদের আত্মত্যাগ 450, খোবায়েবের লোমহর্ষণ পরীক্ষা 451, শত্রুপক্ষের ভীষণ ষড়যন্ত্র 452, ইহুদীদিগের ষড়যন্ত্র 453, হযরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র 454, ঐতিহাসিকগণের বিপরীত বর্ণনা 454, হযরতের উদারতা এবং ইহুদিগণের ধৃষ্টতা 455, এছলামের উদার ব্যবস্থা 456, মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা 457।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

**সমস্ত আরব গোত্রের সমবেত শত্রুতা** ৪৫৭

দুমা অভিযান ৪৫৭, বানি-মোস্তালেক বংশের উত্থান ৪৫৮, হযরতের অনুপম করুণা ৪৫৮, কপটদিগের শয়তানী ৪৫৯, মাওলানা শিবলীর ভ্রান্ত অভিমত ৪৫৯, মদীনা আক্রমণের বিরাট আয়োজন ৪৬০, ইহুদীদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্র ৪৬০, মদীনায় সংবাদ পৌঁছিল ৪৬১, পরিখা খনন ৪৬১, অপরূপ দৃশ্য ৪৬১, কোরআনের বর্ণনা ৪৬২, শত্রুপক্ষের মদীনা অবরোধ ৪৬৩, বানি-কোরেজার বিদ্রোহ ৪৬৪, অবরোধ ও আক্রমণ ৪৬৪, শত্রুপক্ষের অবসাদ ৪৬৬, অবসাদ আত্মকলহে পরিণত হইল ৪৬৬, ঐতিহাসিক বর্ণনা ৪৬৭, দৈব সাহায্য ৪৬৭, ছা'আদের আত্মবলি ৪৬৮।

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

**কোরেজা গোত্রের প্রতি সামরিক দণ্ড** ৪৬৮

কোরেজার বর্তমান সঙ্কল্প ৪৬৯, দুর্গ অবরোধ ৪৬০, খ্রীষ্টান লেখকগণের গাত্রদাহ ৪৭০, ঐতিহাসিকগণের প্রলাপোক্তি ৪৭১, বিশ্বস্ত হাদীছের প্রমাণ ৪৭১, তৃতীয় প্রমাণ—কোরআন ৪৭২, চতুর্থ প্রমাণ—হাদীছ ৪৭২, পঞ্চম প্রমাণ—সাধারণ যুক্তি ৪৭২, রায়হানার মিথ্যা গল্প ৪৭৩, পঞ্চম সনের অন্যান্য ঘটনা ৪৭৩।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

**মুছলমানদিগের তীর্থযাত্রা—হোদায়বিয়া সন্ধি** ৪৭৪

বাধা প্রদান ও সন্ধির প্রস্তাব ৪৭৫, সত্যের প্রভাব ৪৭৬, কোরেশের ধৃষ্টতা ৪৭৭, ছাহাবাগণের মরণ-পণ ৪৭৭, কোরেশের চৈতন্য ৪৭৭, সন্ধির শর্ত ৪৭৮, নূতন পরীক্ষা ৪৭৮, ওৎবার ঘটনা ৪৭৯, মহা-বিজয় ৪৮০।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

**খায়বার বিজয়** ৪৮১

পূর্বকথা ৪৮১, খায়বার ও তাহার বর্তমান অবস্থা ৪৮১, কার্যকারণ পরম্পরা ৪৮২, ইহুদীপক্ষের ষড়যন্ত্র ও সমরায়োজন ৪৮২, আক্রমণের সূত্রপাত ৪৮৩, খায়বার অভিযান ৪৮৪, দুর্গাবরোধ ৪৮৫, দুর্গ আক্রমণ ৪৮৫, আলীর বীরত্ব ৪৮৬, বাজে কথা ৪৮৬, পূর্ণ বিজয় ৪৮৭, বিজিতদিগের অধিকার ৪৮৭।

পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

**ঐতিহাসিক প্রমাদ** ৪৮৮

শুশ্রূষাকারিণী মহিলা সঙ্ঘ ৪৮৯, পার্শ্ববর্তী ইহুদীদিগের আত্মসমর্পণ ৪৮৯, হযরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ৪৯০, ভিত্তিহীন গল্প-গুজব ৪৯১, হযরতের দৃঢ়তা ও করুণা ৪৯১, জয়নাবের কর্মফল ৪৯২, প্রবাসিগণের প্রত্যাবর্তন ৪৯২, মক্কাবাসীদিগের মনোভাব ৪৯২, কয়েকটা সংস্কার ৪৯৪, পুনরায় তীর্থযাত্রা ৪৯৪।

ষটষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

**ধর্মের আহ্বান** ৪৯৫

রোমরাজের দরবারে মদীনার দূত ৪৯৬, সম্রাটের সিদ্ধান্ত ৪৯৮, হযরতের পত্র ৪৯৮, নাজাশীর নিকট পত্র প্রেরণ ৫০০, মিশর দরবারে এছলাম ৫০১, পারস্য দরবারে মোছলেম দূত ৫০১, বাজান প্রভৃতির এছলাম গ্রহণ ৫০২।

সপ্তষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

**খালেদ, ওছমান ও আমরের এছলাম গ্রহণ** ৫০৩

বাহরাইন প্রদেশ বিজিত হইল ৫০৪, ওম্মান প্রদেশ বিজিত হইল ৫০৫।

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

**খ্রীষ্টানশক্তির বিরুদ্ধাচরণ** ৫২৭

"মুতা" অভিযান ও তাহার কারণ ৫০৭, ফারওয়ার পরীক্ষা ৫০৭, মুতা অভিযানের কারণ ৫০৮, মুছলমানগণের পরমর্শ ৫১০, ভীষণ সংগ্রাম ৫১১, খালেদের রণকৌশল ৫১২, ঐতিহাসিক প্রমাদ ৫১২, জয়-পরাজয় ৫১৩, দ্বিতীয় প্রমাদ ৫১৩।

ঊনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

**মক্কা বিজয়** ৫১৪

সেই এক দিন আর এই এক দিন! অতীত স্মৃতি ৫১৪, অভিযানের কারণ—কোরেশের সন্ধিভঙ্গ ৫১৫, খোজায়ীদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার ৫১৬, অত্যাচারের স্বরূপ ৫১৭, কোরেশের অপরাধ ৫১৮, খোজাআর ডেপুটেশন ৫১৯, এ যাত্রার বিশেষত্ব ৫১৯, হাতেবের অপরাধ ৫২০, আবু-সুফিয়ানের নূতন ফন্দী ৫২০, হযরতের মক্কাযাত্রা ৫২১।

সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

**হযরতের নগর প্রবেশ** ৫২৪

যাত্রার বিশেষত্ব ৫২৪, অপরূপ দৃশ্য ৫২৫, হযরতের অভিভাষণ ৫২৬, অপরূপ দৃশ্য ও মহিমাময় আদর্শ ৫২৮, হত্যার ষড়যন্ত্র ও হযরতের করুণা ৫২৮, প্রাণের বৈরীর জীবনলাভ ৫২৮।

একসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

**অপরাধিগণের প্রাণদণ্ড** ৫২৯

ঐতিহাসিকগণের অলীক বিবরণ ৫২৯, এবন-খাতলের অপরাধ ৫৩০, মেকয়াছের প্রাণদণ্ড ৫৩২, মেকয়াছের অপরাধ ৫৩২, গায়িকার প্রাণদণ্ড ৫৩৩, মূরের উক্তি ৫৩৩।

দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

**বিভিন্ন ঘটনা** ৫৩৪

বিজয়ের প্রভাব ৫৩৪, মক্কাবাসীর এছলাম গ্রহণ ৫৩৫, কয়েকটা ক্ষুদ্র ঘটনা ও মহৎ আদর্শ ৫৩৬, আমি রাজা নহি ৫৩৬, খালেদের অন্যায় আচরণ ৫৩৬, বিচারে ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ৫৩৭, হযরতের অভিভাষণ ৫৩৮, শরীফ ও রজীল ৫৩৮।

ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

**হোনেন, আওতাছ ও তায়েফ সমর** ৫৩৯

ছকিফ ও হাওয়াজেন জাতির রণসজ্জা ৫৩৯, পৌত্তলিকদিগের সাহায্য ৫৩৯, প্রথম সংঘর্ষ ঃ মুছলমানদিগের ভীষণ পরাজয় ৫৪০, মোস্তফার অসাধারণ দৃঢ়তা ৫৪১, অবস্থার পরিবর্তন ৫৪২,

আওতাছ অভিযান ৫৪২, তায়েফ অবরোধ ৫৪২, বন্দী ও ধন-সম্পদ ৫৪৩, আনছারগণের পরীক্ষা ৫৪৪, ঐতিহাসিক গল্প-গুজব ৫৪৫, হযরতের পুত্রবিয়োগ ও তাওহীদ শিক্ষা ৫৪৬।

চতুঃসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

**নবম হিজরী—সত্যের জয়জয়কার** ৫৪৬

তাবুক অভিযান—অভিযানের কারণ ৫৪৭, আবদুল্লাহর সৌভাগ্য ৫৪৯।

পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

**বিভিন্ন ঘটনা** ৫৫০

মুছলমানদিগের হজ্জযাত্রা ৫৫০, ছামুদ জাতির আবাসভূমি ৫৫১, এছলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার ৫৫১।

ষটসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

**প্রতিনিধি সঙ্ঘসমূহের সমাগম** ৫৫২

মাজিনা ডেপুটেশন ৫৫২, তায়েফের প্রতিনিধিদল ৫৫২, ওরওয়ার শোণিত-তর্পণ ৫৫৩, তামিম ডেপুটেশন ৫৫৫, আবদুল কায়েছ বংশের প্রতিনিধিগণ ৫৫৬, হানিফা গোত্রের ডেপুটেশন ৫৫৬, "তাই" বংশে এছলামের প্রচার ৫৫৭, তারেকের কথা ৫৫৭, নাজরান ডেপুটেশন ৫৫৮।

সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

**বিদায় হজ্জ** ৫৬০

হজযাত্রার ঘোষণা ৫৮০, লক্ষ সেবক বেষ্টিত মোস্তফার হজযাত্রা ৫৬১, মক্কার নূতন দৃশ্য ৫৬১, তসাম্যের প্রতিবাদ ৫৬১, হযরতের অভিভাষণ ৫৬২, স্বর্গের নেয়ামত পূর্ণ পরিণত হইল ৫৬৫, তিনটি ক্ষুদ্র ঘটনা ৫৬৫, এলেম উঠিয়া যাওয়ার অর্থ কি ৫৬৫, জেহাদে আকবর ৫৬৫, অপাত্রে দান ৫৬৫।

অষ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

**একাদশ হিজরী বা শেষ বৎসর** ৫৬৬

মহাযাত্রার আয়োজন ৫৬৬, কবর পূজার কঠোর নিষেধাজ্ঞা ৫৬৭, পীড়ার বিবরণ ৫৬৮, সোমবার শেষ দিন ঃ ৫৬৮, এন্তেকাল ৫৬৯।

ঊনাশীতিতম পরিচ্ছেদ

**বিভিন্ন কথা** ৫৬৯

আব্বাছের প্রতিশোধ গ্রহণের ভিত্তিহীন গল্প ৫৬৯, হযরতের এন্তেকালের তারিখ ৫৭০, বিয়োগ-বিধুরা বিবি আয়েশার শোকগাথা ৫৭০, ভক্তকুলের শোকাবেগ ৫৭১, আবু-বাকরের দৃঢ়তা ৫৭১, হযরতের জানাজা ৫৭২, দরূদ ৫৭২

# উপক্রমণিকা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### প্রাথমিক কথা

কোন ধর্মের বিশেষত্ব ও সত্যতার সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে হইলে, সেই ধর্মের প্রবর্তক যিনি, সর্বপ্রথমে তাঁহাকে সম্যকরূপে চিনিয়া ও বুঝিয়া লইতে হয়। কতকগুলি বিশ্বাস, কতকগুলি অনুষ্ঠান এবং কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান—এই ত্রিধারার একত্র সমাবেশ-স্থলের নামই—"ধর্ম"। আমরা মোছলেম এবং আমাদের ধর্মের নাম—এছলাম। এছলামের বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইতে হইলে—এছলামের সত্যতা ও বিশেষত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার চরিত্রের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্যকরূপে জ্ঞাত হইতে—অন্ততঃ জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ঐতিহাসিক হিসাবে (ভক্তের হিসাবে নহে) জগতের সাধুসজ্জন ও মহাপুরুষগণের জীবন ও চরিত্র আলোচনার চেষ্টা করিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কিংবদন্তি-সঙ্কুল ঐতিহাসিক এবং অন্ধ ভক্তগণের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত জীবন ও জীবনের আদর্শস্থানীয় আসল বিষয়গুলি হয়ত একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, অথবা এমন পর্বত-পরিমাণ কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের আবর্জনারাশির তলে তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে—যাহার উদ্ধার একেবারে অসাধ্য না হইলেও সহজসাধ্যও নহে।

মানুষের দেহের ন্যায় তাহার আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিগুলিও খুব বাবু। এই বাবুগিরির খাতিরে আমাদের জ্ঞান ও বিবেক, স্বাধীন আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা, অসত্যের পুঞ্জীকৃত ন্যক্কারজনক আবর্জনারাশির নিম্ন হইতে সত্যের উদ্ধার সাধন করার জন্য, পরিশ্রম স্বীকার করিতে বড় একটা চাহে না। এই সুখপ্রিয় মানসিকতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের গাড়ি পাল্কীগুলিতে চড়িয়া পরম আনন্দে পা এলাইয়া শুইয়া পড়ে। ইহা মানবীয় দুর্বলতার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দিক। মহাপুরুষগণের জ্ঞানের গভীরতা, তাঁহাদের চরিত্রের মহিমা, তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও সাধনা—এ সব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে অনেক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে হইলে, তাহার জীবনীকে একেবারে বাদ দিয়া গেলেও চলে না। তাই ভক্তগণ খুব সহজে উভয় কূল রক্ষা করার জন্য কতকগুলি আজগুবী, অনৈতিহাসিক গল্প-গুজব এবং কতকগুলি অলৌকিক ও অস্বাভাবিক উপকথার আবিষ্কার করেন এবং সেগুলির মধ্য দিয়া মহাপুরুষের নামের জয়জয়কার করিয়া মনে করিয়া লন যে, তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করা হইল।

ক্রমে ঐ সব কুসংস্কারমূলক উপকথা ও অলৌকিক কেচ্ছা-কাহিনী, মহাপুরুষগণের জীবনের প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে দূরে সরাইয়া দিয়া, ইতিহাস ও পুরাণ-পুস্তকসমূহের পৃষ্ঠায় স্থায়ীভাবে অধিকার জমাইয়া বসে। কালক্রমে তাহাই 'শাস্ত্র' হইয়া দাঁড়ায় এবং সেগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সংস্কারের বিপরীত কেহ কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে শাস্ত্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও কাফের বলিয়া নির্ধারণ করা হয়। যুক্তির দিক দিয়া কোন কথা বলিয়া উদ্ধার পাইবার আশাও এ ক্ষেত্রে খুবই কম। তুমি ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করিয়া, এমন কি মূল শাস্ত্রগ্রন্থের শত শত অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাও, কিন্তু 'ভক্তের' নিকট সবই বিফল। তিনি এক কথায় সকল যুক্তির উত্তর দিয়া বলিবেন—প্রাচীন মুনি-ঋষি ও শাস্ত্রকারগণ—'ছলফে ছালেহীন ও বোজর্গানে-দীন'—কি এ সকল কথা বুঝিতেন না ? তোমরা বাপু কি তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক বিদ্বান হইয়াছ ? বাপ-পিতামহ চৌদ্দপুরুষ যাহা বুঝিয়া ও বলিয়া গিয়াছেন—তাহাকেই আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে হইবে, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্মো ভয়াবহঃ।' ইহাই হইতেছে মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের শোচনীয়তম অধঃপতন।

জগতের সমস্ত উন্নত ও প্রাচীন জাতির পতন ও মৃত্যু, মূলতঃ একমাত্র এই রোগেই সংঘটিত হইয়াছে। রোমান ও গ্রীকের মৃত্যু এবং ইহুদী ও হিন্দুর সর্বনাশ এই অন্ধবিশ্বাস, তাকলিদ গতানুগতি ও পৌত্তলিকতার জন্যই সংঘটিত হইয়াছে। খ্রীষ্টান যতদিন গির্জার বাহিরেও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব স্বীকার করিয়াছিল, ততদিন তাহার দুর্দশার ইয়ত্তা ছিল না। এখন সেই খ্রীষ্টান ধর্মের সমস্ত উপকথা ও আজগুবী অলৌকিকতাগুলিকে গির্জার গুদামঘরে পুরিয়া তালাচাবি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার কর্মজীবনের সহিত ধর্মের আর কোনই সম্বন্ধ নাই।

জীবনে একবারও কোরআন শরীফের কোন একটি অধ্যায় পাঠ করার সৌভাগ্য যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই শ্রেণীর গতানুগতি ও অন্ধবিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করাকেই কোরআন নিজের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছে। কিন্তু হইলে কি হইবে—আজ মুছলমান নিজের জন্মগত ও পারিপার্শ্বিক কুসংস্কারের চাপে কোরআনের সেই স্পষ্ট শিক্ষাকে একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছে—ভুলিয়া বসাকেই এমন কি সেই শিক্ষার 'বরুদ্ধাচরণ করা'কেই আজ তাহারা 'এছলাম' বলিয়া মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে যে সকল কারণে রোমান, গ্রীক, হিন্দু, ইহুদী প্রভৃতি প্রাচীনতম জাতিসমূহের সর্বনাশ হইয়াছিল, মুছলমানও আজ ঠিক সেই সমস্ত কারণের স্বাভাবিক অভিশাপে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।

নবী ও রছুল অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হইতে প্রেরণা ও অবতরণপ্রাপ্ত মহামানুষগণ, মানব জাতির ইহ-পরকালের—ধর্মজীবনের ও কর্মসংসারের—স্বর্গীয় আদর্শ। মুছলমানেরা জগতের প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশে আবির্ভূত এই নবী ও রছুলগণকে 'সৎ ও মহৎ' বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন—ধর্মতঃ তাহারা এইরূপ মান্য করিতে বাধ্য। তবে বিশেষত্ব এই যে, এছলাম তাঁহাদিগকে মহামানুষ বলিয়া স্বীকার করিলেও, অতিমানুষের অস্তিত্ব এমন কি তাহার সম্ভবপরতাই স্বীকার করে না—বরং কঠোর ভাষায় তাহার প্রতিবাদই করিয়া থাকে। তাই আমরা দেখিতেছি, কোরআনে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে সম্বোধন করিয়া পুনঃ পুনঃ বলা হইতেছে—

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي —বল, "আমি তোমাদেরই মত একজন মানব মাত্র—ইহার অতিরিক্ত আমি আর কিছুই নহি, তবে আমার নিকট আল্লাহর বাণী সমাগত হইয়া থাকে।"[*]

মুছলমানদিগের ইহাও বিশ্বাস যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা জগতের শেষ এবং শ্রেষ্ঠতম

---

[*] একজন বন্ধু জনৈক মোছলমান লিখিত হজরতের একখানা জীবন চরিত দেখাইলেন, উহার প্রথম ছত্রেই লেখা আছে—"যে অসাধারণ অতিমানবিক মহাপুরুষ"—ইত্যাদি।

নবী। তিনি কোন দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের জন্য অথবা কোন নির্দিষ্ট যুগ বা সময়ের নিমিত্ত প্রেরিত হন নাই। বরং তিনি সকল জাতির সকল দেশের ও সকল যুগের সার্বভৌমিক, সার্বজনিক ও সার্বযৌগিকভাবে সমস্ত আ'লমের জন্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ দুনিয়ায় প্রেরিত হইয়াছেন।* আর্য, ইহুদী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকলেই তাঁহার উম্মত এবং তিনি সকলেরই নবী অর্থাৎ সকলের জন্যই স্বর্গের সংবাদবাহক।**

পূর্বকথিত ভক্তরূপী শত্রুগণের কল্পনার বাহাদুরী ও তাঁহাদের সহজলভ্য অতিভক্তির শোচনীয় ফলে, কত সাধুসজ্জনের, কত আদর্শ-মহাপুরুষের, কত অলি-দরবেশের, এমন কি কত নবী-রসুলের পবিত্র জীবনী যে আজও সত্যের আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে এবং তাহাতে জগতে জ্ঞান, ধর্ম, কর্ম ও মনুষ্যত্বের যে কত ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্টের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাংলা-পাক-ভারত প্রাচীন সভ্য দেশ, এমন কি মুছলমানের নিজস্ব রেওয়ায়ত অনুসারে, এই দেশই হইতেছে আদমের আদিম আবির্ভাবস্থল। সে যাহা হউক, ভারতবর্ষ যে অতিশয় প্রাচীন ও সভ্য দেশ, ইহা সর্ববাদী সম্মত। জ্যোতিষে, দর্শনে, গণিতে ও সাহিত্যে, ভারতবর্ষ—ইউরোপের সভ্যতার ত সামান্য কথা—যীশুখ্রীষ্টের জন্মেরও বহু শতাব্দী পূর্বেও যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছিল, আজিকার এই উন্নত দুনিয়াও জ্ঞানের হিসাবে তাহার নিকট মাথা হেঁট করিতে বাধ্য। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু জাতির প্রাচীন শাস্ত্র, সাহিত্য ও পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতির সূক্ষ্ম গবেষণার দ্বারা, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত রাশিকৃত আবর্জনার মধ্য হইতে কৃষ্ণচরিত্রের (Character) কতকটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতে পারে মাত্র। কিন্তু প্রথমতঃ ইহা বহু আয়াসসাধ্য, এমন কি অনেকের পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিলেও, এ-সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার আনুমানিক ফলের উপর নির্ভর করা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। অর্থাৎ যতটুকু জানিতে পারা যাইবে, ইতিহাস-দর্শনের (Philosophy of History) হিসাবে, তাহার মধ্যে এইটুকু সত্য আর এইটুকু মিথ্যা, দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রামাণিক দলিল প্রমাণের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে, ভক্তদিগের কল্পনা, অজ্ঞতা ও অতিরঞ্জনের ফলে তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা ও জীবন-চরিত আজ কার্যতঃ অজ্ঞেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রই আজ স্বীকার করিবেন যে, বুদ্ধদেবের পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধরা তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন 'তথাগত' ও ত্রিকায়া-বিশিষ্ট একজন আদি বুদ্ধকে, তিনি আবার অতিমানব এবং স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্রীভগবান। তথাগত-অর্থে, পূর্বকার অন্যান্য বুদ্ধের ন্যায় ইনিও একজন বুদ্ধ, একমাত্র বুদ্ধ নহেন। কালক্রমে মনুষ্য-বুদ্ধ বৌদ্ধদের স্মৃতি হইতে এমন দ্রুতভাবে বিলুপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন যে, তাঁহার পরলোক গমনের পর একটা শতাব্দী অতিবাহিত হইতে না হইতে, বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত, বিশেষতঃ প্রবল 'মহা সাংঘিকা' সম্প্রদায় বুদ্ধের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া বসে। তখন তাহারা এই

---

* وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين — 'আমি তোমাকে সকল জগতের জন্য আমার করুণাস্বরূপে প্রেরণ করিয়াছি।'—কোরআন।

** তাঁহার প্রধান সংবাদ দুইটি :— (১ম) 'আল্লাহ্ এক, তিনি নির্দোষ-নির্লিপ্ত, তিনি জনক বা জাত নাহেন অর্থাৎ তিনি কাহারও ঔরস হইতে জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার ঔরস হইতেও কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। এবং তাহার দ্বিতীয় বা সমতুল্য কেহই নাই।' এই এক, অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ, সর্বশক্তিমান 'মোকাদ্দেম মোহাইমেন' নামক সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্তা, ইহাতে তাঁহার কাহারও সহায়তা, সুপারিশ, সাহায্য বা পরামর্শের আবশ্যক করে না, তিনি সর্বপ্রকারে অংশীশূন্য। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—কলেমা, এই বিশ্বাসের বীজমন্ত্র। (২য়) মানুষ মাত্রই ইহকালে ও পরকালে নিজেদের সদসৎ কর্মনিচয়ের সু বা কুফল ভোগ করিতে বাধ্য।

মতবাদটাকে দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকে যে, বুদ্ধ রূপক, অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক, বাস্তব সত্তা তাঁহার কখনও ছিল না। বাস্তব বুদ্ধসংক্রান্ত প্রচলিত বিবরণগুলি মানুষের ভ্রান্ত মনের কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শাস্তুই হইতেছেন প্রকৃত 'তথাগত'। বৌদ্ধ সাহিত্যে যে বুদ্ধের সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি দার্শনিক পণ্ডিত, ধর্মগুরু নহেন। ধর্মের মূল সাধ্যের সহিত তাঁহার শিক্ষার কোনই সম্বন্ধ নাই, বরং বিপরীত সম্বন্ধ। এই বুদ্ধকে আমরা দেখিতে পাই, অজ্ঞেয়তাবাদী অথবা নিরীশ্বরবাদী দার্শনিকরূপে। সে দর্শনকে আবার জগতের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে একটা Sophistic Nihilism মতবাদের মধ্য দিয়া। অবশেষে ত্রিত্ববাদ ও তান্ত্রিক মতবাদের শোচনীয় প্রভাবে অগ্নি, সূর্য এবং অন্যান্য বহু দেবদেবী ও রাক্ষস-রাক্ষসী প্রভৃতির প্রতীক ও প্রতিমা-পূজার অভিশাপে এবং অবশেষে হিন্দু-পুরাণের নবম-অবতারত্বের মহিমায় প্রকৃত বুদ্ধ বস্তুতঃই অজ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছেন।

যীশু সম্বন্ধে এই সমস্যাটি আরও জটিল ও অসমাধ্য। কারণ, বহু শতাব্দী পর্যন্ত কতকগুলি অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক আজগুবী ঘটনার মধ্যে, যীশু-চরিত্রের মহত্ত্বগুলিকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। যীশুকে জানিতে হইলে বর্তমান বাইবেলের মধ্য দিয়া জানিতে হয়। কিন্তু ইউরোপের নিরপেক্ষ পণ্ডিতগণ, নানা প্রকার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, ইতিহাসের হিসাবে ঐ বাইবেলগুলির কানাকড়িরও মূল্য নাই। এ সম্বন্ধে ইউরোপে শত শত পুস্তক লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এখন জ্ঞানী ও বিদ্বৎসমাজের প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, বর্তমান ও পূর্ব (নিকের কাউন্সিলগুলির অধিবেশনের পূর্বে) প্রচলিত বাইবেলগুলি, যীশুর সময়ে বা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগে লিখিত হয় নাই। সে যাহা হউক, বর্তমান বাইবেলকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, যীশু সম্বন্ধে আমাদিগকে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। জনসাধারণের অবোধগম্য কতকগুলি অস্পষ্ট ভাবপ্রকাশতার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভূতচালান, প্রেতছাড়ান, অন্ধের চক্ষুদান, মৃত্যুর পর আবার জীবন্ত হইয়া মেঘের আড়াল দিয়া স্বর্গে (কারণ স্বর্গ ও স্বর্গীয় পিতার আবাসস্থল ঊর্ধ্বে—আকাশে।) পিতার নিকট গমন করা, জলের মটকাকে মদের মটকায় পরিণত করা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বাদ দিলে, সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই আজ বাইবেল বর্ণিত কিংবদন্তি, অন্ধ-ভক্ত ও স্বার্থপর শিষ্যদের কল্পনা এবং অজ্ঞ জনসাধারণের গোঁড়া-খেয়ালের মধ্য হইতে, যীশুর প্রকৃত চরিত্রের উদ্ধার সাধন সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।*

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) সম্বন্ধেও অবস্থা কতকটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে যে সকল বই-পুস্তক পরবর্তীকালে লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সত্য-মিথ্যা, বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য, প্রকৃত ও প্রক্ষিপ্ত রেওয়ায়ৎ সমূহে পরিপূর্ণ। সুতরাং, অজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ লোকদিগের কথা দূরে থাকুক, অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির পক্ষেও সেগুলির বাছাই করিয়া লওয়া, কার্যতঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে পার্থক্য এই যে, শত চেষ্টা করিলেও অন্যান্য মহাজনগণের জীবনী ও চরিত কাহিনীগুলি হইতে মিথ্যা ও প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিকে খাঁটি ঐতিহাসিকভাবে বাছাই-বাছাই করিয়া ফেলার এখন আর কোনই সম্ভাবনা নাই,—সেখানে সকল সিদ্ধান্তের ভিত্তি অনুমান মাত্রের উপর স্থাপিত। কিন্তু যিনি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনী আলোচনা করিয়া সত্য ও মিথ্যাকে স্বতন্ত্ররূপে দেখিতে ও দেখাইতে চান, তাঁহার পক্ষে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা খুব সহজসাধ্য না হইলেও অধিক আয়াসসাধ্যও নহে। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ আনন্দের ও সৌভাগ্যের কথা এই যে, তাঁহার নবী-জীবন সম্বন্ধে সমস্ত আবশ্যকীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় কোরআন ও হাদীছ হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায়। পরবর্তী রেওয়ায়ৎ ও ইতিহাসগুলির প্রতি দৃকপাত না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে জীবনী-সংকলক বা সাধারণ ঐতিহাসিকবর্গ তাঁহার সম্বন্ধে যে সব

---

* যীশু সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

বিবরণ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনটির ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু হইতে পারে না-পারে, আমাদের ভক্তিভাজন এমাম ও মোহাদ্দেছগণ প্রথম হইতে সূক্ষ্ম দার্শনিকভাবে তাহার যথেষ্ট বিচার করিয়া গিয়াছেন। ফলে সত্য ও মিথ্যাকে স্বতন্ত্রভাবে বাছাই করিয়া লওয়া এ ক্ষেত্রে বস্তুতঃই অধিক আয়াসসাধ্য নহে। তবে নিজের মস্তিষ্কের দাসত্বশৃঙ্খল যিনি কাটিতে না পারিবেন, বাপ-দাদার কথা, পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের নজির, ইত্যাদি—মন্ত্রার মোশরেকগণের অবলম্বিত যুক্তিধারার চোখরাঙ্গানীকে যিনি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না, তাঁহার পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## মোস্তফা-চরিতের উপকরণ

### ইতিহাসের ধারা

স্বাধীনভাবে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনী রচনা করিতে হইলে, আমাদিগকে সর্বপ্রথমে কোরআন শরীফের এবং সেই সঙ্গে হাদীছ-শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। হযরতের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষভাবে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে, অথবা যে সকল প্রাচীন আরবী ইতিহাসে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে, সেগুলির প্রতি দৃকপাত করা হইবে তাহার পর। ঐতিহাসিক বিবরণ বা রেওয়ায়েৎ পরীক্ষা করার জন্য মহামতি মোহাদ্দেছগণ যে সকল যুক্তিসঙ্গত নিয়ম ও নীতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে বা তাহার Principle অবলম্বনে নূতন নিয়ম গঠন করিয়া, আমরা এই বিবরণগুলির পরীক্ষা করিয়া দেখিব। তাহার মধ্যে নিয়ম ও যুক্তির হিসাবে যাহা প্রমাণিত ও বিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হইবে, তাহা সানন্দে গ্রহণ করিব ; আর যাহা অপ্রামাণিক, ভিত্তিহীন বা প্রক্ষিপ্ত ('মউজু') বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেটিকে আমরা দূরে ফেলিয়া দিব,—পরীক্ষার জন্য আমাদিগকে এই ধারা অবলম্বন করিতে হইবে। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মোহাদ্দেছ (হাদীছ-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত)-গণ যে সকল আইন-কানুন রচনা করিয়া গিয়াছেন, চোখ বুজিয়া তাহা মানিয়া লইতেও আমরা ধর্মতঃ বাধ্য নহি। নিজেদের প্রণীত নিয়ম ও আইনগুলির সঙ্গতি প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদের মোহাদ্দেছগণও যুক্তি-প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং যুক্তির হিসাবে ঐ নিয়ম ও নীতি (অছুল বা Principle) গুলির মধ্যে যদি কোন দোষ-ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহা সংশোধন করিয়া লইবার অধিকারও আমাদের আছে। "যেহেতু, মোহাদ্দেছগণ বলিয়াছেন"—অতএব তাঁহাদের ভ্রমগুলিকেও চোখ বন্ধ করিয়া মানিয়া লইতে হইবে, তাহারও কোন কারণ নাই। তবে ইহাও ঠিক যে, নিজে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন না করিয়া এবং সকল দিক দিয়া বিশেষরূপে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া না দেখিয়া, হঠাৎ একটা খেয়ালের ঝোঁকে ঐ প্রকার কোন একটা নিয়মকে ভুল বলিয়া প্রকাশ করাও উচিত নহে। বলা বাহুল্য যে, পরবর্তী যুগের গ্রন্থকার ও মোহাদ্দেছগণ নিজেদের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক মোহাদ্দেছগণের নির্ধারিত হাদীছের অছুল বা নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে যথেষ্ট সমালোচনা ও বাদানুবাদ করিয়াছেন। তবে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে, যখন মুছলমান বলিয়া বসিল যে, জ্ঞান—চিন্তা ও যুক্তিতে নহে, বরং পূর্ববর্তী লেখকগণের উক্তিতেই সীমাবদ্ধ, সেই কাল মুহূর্ত হইতে তাহাদের অবস্থান্তর ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে।

## ছিরত ও তারিখ

সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর পুস্তক হইতে হযরতের জীবনী সঙ্কলিত হইয়া থাকে। প্রথম— সাধারণ ইতিহাস, এবং দ্বিতীয়—হযরতের জীবনী সম্বন্ধে লিখিত বিশেষ পুস্তক-পুস্তিকা সমূহ। আরবীতে প্রথম শ্রেণীর পুস্তককে 'তারিখ', এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তককে 'ছিরত' বলা হয়। যেমন, 'তারিখে তাবরী' ও 'ছিরতে এবনে হেশাম' ইত্যাদি। ইতিহাস পুস্তকগুলিতে সৃষ্টির প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া, লেখক তাঁহার সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন রাজত্বের উত্থান পতন ও অন্যান্য নানা প্রকার বিবরণ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে হযরতের ও এছলাম ধর্মের ইতিবৃত্তও তাহাতে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ মুছলমান। এই কারণে তাঁহারা যথাসম্ভব বিস্তৃতরূপে হযরত-সংক্রান্ত বিবরণগুলির আলোচনা করিয়াছেন। 'ছিরৎ' বা চরিত্র-পুস্তকে, কেবল হযরতের জীবন-বৃত্তান্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিই সবিস্তারে বিবৃত হইয়া থাকে।

## রেওয়ায়ৎ পরীক্ষায় অবহেলা ও তাহার কারণ

প্রাথমিক যুগে ইতিহাস ও হযরতের জীবন-চরিত সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তাহার লেখকগণ নিজেদের বর্ণিত বিবরণ, অভিমত ও ঘটনাগুলির সূত্র পরম্পরা সনদ যথাযথভাবে প্রদান করিয়াছেন। তাহার ধারা এইরূপ : গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'আমি বালাখ নিবাসী জয়েদের পুত্র আহমদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি বলেন— আমি কুফা নিবাসী মোহাম্মদের পুত্র আবদুল্লার মুখে শুনিয়াছি, আবদুল্লাহ্ বলিয়াছেন,— আমি মোকাতেলের মুখে শুনিয়াছি, মোকাতেল এবনে আব্বাছের মুখে শুনিয়াছেন যে, "হযরতের জন্ম সময়ে এই এই অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।" তাঁহারা যে সূত্রে যে বিবরণ অবগত হইয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

তবে কথা এই যে, এই শ্রেণীর গ্রন্থকারগণের মধ্যে কেহই দার্শনিক হিসাবে তাঁহাদের বর্ণিত ঘটনা ও বিবরণগুলির সত্যাসত্য পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। ইহার কতকগুলি কারণও ছিল- নিম্নে তাহার আভাস দেওয়া হইতেছে :—

১। পাঠকগণ একটু পরে দেখিবেন, আমাদের আলেমগণের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, যে সকল রেওয়ায়ৎ দ্বারা শরিয়তের কোন হুকুম, যথা হালাল হারাম বা ফরজ-ওয়াজেব। অথবা কোন আকিদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস প্রামাণিত না হয়, সে সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের কোনই আবশ্যকতা নাই। এই সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাসের ফলে, আমাদের ইতিবৃত্তকার ও চরিতলেখকগণ এবং অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ, হাদীছের ন্যায় ইতিহাসগুলিকেও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া লওয়ার জন্য, আদৌ কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এই উপেক্ষা ও অবহেলার ফলে ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত অসতর্ক লেখকগণের খেয়াল ও কল্পনা, হেজাজ, সিরিয়া ও এরাকের রোমান, গ্রীক, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত নানা প্রকার অলৌকিক গল্প গুজব এবং তাহাদের মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টি-প্রকরণ ও পুরাণ-কাহিনীগুলি সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়া ইতিহাসের আলখেল্লা পরিয়া আমাদের ছিরৎ ও তারিখ পুস্তকগুলিতে আসর জমাইয়া বসিয়াছে।

২। পূর্বে আমাদের আলেমগণ মনে করিতেন—আল্লাহর কালাম কোরআন এবং সর্বতোভাবে বিশ্বাস্য ছহীহ হাদীছ ব্যতীত, শরিয়তের কোন হুকুম বা আকিদা প্রমাণিত হয় না। ইতিহাস লেখকগণ যাহা ইচ্ছা বলুন না কেন, ধর্মের হিসাবে তাহার যখন কোনই মূল্য ও গুরুত্ব নাই, তখন কোরআন ও হাদীছের অত্যাবশ্যকীয় খেদমৎ পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাস পরীক্ষার জন্য নিজেদের মহামূল্য সময় ব্যয় করা মোহাদ্দেছগণের পক্ষে সঙ্গত

হইবে না। এই কারণে তাঁহারা ইতিহাস বা জীবনী রচনায় বা তাহার পরীক্ষায় আদৌ মনোযোগ প্রদান করেন নাই।

৩। ঐতিহাসিকগণের এই প্রকার অসতর্ক ব্যবহারের জন্য আমরা অনেক সময় তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক যুগের নানা প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব এবং মুছলমান সমাজের আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্য হইতে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ তৎকালে মোছলেম জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক গ্রামের এবং প্রত্যেক মানুষের মুখে, ইতিহাস ও হযরতের জীবনী সম্বন্ধে সঙ্গত-অসঙ্গত যে বিবরণটুকু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এইরূপে বর্ণিত প্রত্যেক বিবরণের সহিত পূর্বকথিতরূপ সূত্রও লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রমবিমুখ ঐতিহাসিকের ও নিতান্ত কৃতঘ্ন মুছলমানের নিকট, তাঁহাদের এই কার্য প্রীতিকর ও সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, পক্ষপাতশূন্য ইতিহাস রচনার উপকরণ একমাত্র আমাদের নিকট ব্যতীত জগতের আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। আজ জগতে ইতিহাসের নামে যে সকল পুস্তক চলিয়া যাইতেছে, তাহার অধিকাংশই কোন একটা দলের বা মতের পক্ষ হইতে, কোন একটা বিশেষ প্রতিপাদ্য বা চরম লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, সেই মতের বা দলের পক্ষ সমর্থনের এবং লক্ষীভূত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। ইহার ফলে লেখকগণের ব্যক্তিগত মত, সংস্কার ও বিশ্বাস, বহু স্থলে প্রকৃত ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সেই জন্য এই ইতিবৃত্ত বা জীবনীগুলি একতরফা, একঘেয়ে ও পক্ষপাতদুষ্ট।

## পরবর্তী লেখকগণের অবহেলা

কিন্তু মুছলমান ঐতিহাসিকগণ ইহা করেন নাই। তাঁহারা যে ঘটনা সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছেন, যাহা কিছু শুনিতে পাইয়াছেন, তাহার একটি এবং একটুকুও ঢাকিয়া রাখিয়া নিজেদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এমন কি, যাহা দ্বারা হযরতের চরিত্রে দোষারোপ হইতে পারে বা কোরআন সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে* নিজেদের পুস্তকে এরূপ বিবরণগুলিকেও স্থান দান করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। ফলতঃ উদার ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের প্রধান কর্তব্য—সকল প্রকার ঐতিহাসিক বিবরণ, প্রচলিত সংস্কার ও কিংবদন্তি নিরপেক্ষভাবে নিজেদের পুস্তকে সঙ্কলন—তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পরীক্ষা ও যাচাই করা, ইতিহাস-দর্শনের হিসাবে তাহার মধ্য হইতে সত্য মিথ্যা এবং বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্যগুলিকে বাছাই করিয়া সাজাইয়া দেওয়া, পরবর্তী লেখকগণের কর্তব্য ছিল। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, পরবর্তী লেখকেরা তাহা করেন নাই, বরং করা অনাবশ্যক—এমন কি অন্যায় বলিয়াও মনে করিয়াছেন। এই মনোভাবের ফল কালক্রমে এমনই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল যে, সেই অন্ধকার যুগের এক অশুভ প্রভাতে মুছলমান হঠাৎ বলিয়া বসিল—সাহিত্য বল, ইতিহাস বল, ভূগোল বল, খগোল বল, দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, হাদীছ বল, তফছির বল, ফেকাহ বল, অছুল বল, সমস্তের পূর্ণতা চরমভাবে হইয়া গিয়াছে। তাহার কোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্তন, পরিবর্জন বা পরিবর্ধন আর সম্ভব নহে, সঙ্গতও নহে। এই ধারণার শোচনীয়তা কালক্রমে তীব্রতর হইয়া, ইতিহাসের ও ইতিহাস দর্শনের আদি শিক্ষাগুরু মুছলমানের জ্ঞান ও বিবেক এবং মন ও মস্তিষ্ককে এমন মারাত্মকরূপে অভিশপ্ত করিয়া দিল যে, তাহারা তখন মনে করিতে লাগিল—ঐ প্রকার সংশোধনের চেষ্টা করা তাহাদের পক্ষে যুগপৎ ভাবে বৃথা ও অন্যায়। এমন কি, গতানুগতির এই দারুণ অভিশাপের

---

* খ্রীষ্টান লেখকগণ বাছিয়া বাছিয়া এই রেওয়ায়তগুলিকে নিজেদের পুস্তকে স্থান দান করিয়া থাকেন।

শোচনীয় প্রভাবে, আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র ও ব্যাকরণ অলঙ্কারাদির বিচার আলোচনা ও তাহার উৎকর্ষ সাধনের পথও, খোদা না করুন, বোধ হয় চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আত্মবিস্মৃত রোগী যেমন সুযোগ ও স্বাধীনতা পাইলে, স্তূপীকৃত সু ও কু পথ্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কু এবং অধিকতর অনিষ্টকর যাহা, প্রথমে তাহাই তুলিয়া মুখে দেয়, সেইরূপ পক্ষাঘাতগ্রস্ত মন ও মস্তিষ্ক সমন্বিত মুছলমান, ঐ সকল ইতিহাসের মূল ও মহান শিক্ষাগুলিকে দূরে ফেলিয়া তাহার মধ্যকার প্রত্যেক কু, প্রত্যেক কদর্য এবং প্রত্যেক কালকূটকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। স্থান ও সময় বিশেষে দৈবগতিকে এক-আধটুকু সু-ও সেই সঙ্গে তাহাদের উদরস্থ হইলেও, সেই বিষকুণ্ডে পড়িয়া তাহাও বিষে পরিণত হইয়া গেল।

## অবহেলার পরিণাম

এই সময় আরবী ও পার্সী ভাষায় ইতিহাস বা হযরতের জীবনী সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইল, তাহাতে সূত্র-পরম্পরা ও 'রাবীগণের' নাম ইত্যাদি একেবারে বাদ দেওয়া হইল। পরবর্তী লেখকগণ, পূর্বতন ঐতিহাসিকগণের দুই-এক খানা পুস্তক সম্মুখে রাখিয়া, সংক্ষেপে বিস্তৃতভাবে, সেইগুলিকে—অনেক সময় পূর্ববর্তী লেখকগণের ভাষায় অবিকল নকল করিয়া—সাজাইয়া দিয়াছেন মাত্র। এইরূপ নকল কেবল ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ নহে। জামখশরীর 'কাশশাফকে' 'বাইজাভী' এবং 'মাদারেক' প্রভৃতি তফছিরের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, এই প্রকার 'নকলের' বহু আশ্চর্যজনক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু মজার কথা এই যে, একটা কথা 'কাশশাফ' হইতে উদ্ধৃত করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করিবেন না, অনেকে 'কাশশাফের' কথা শ্রবণ করাকেই পাপ বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহার যুক্তি-প্রমাণগুলির আলোচনা ত দূরের কথা। কিন্তু যখন 'বাইজাভী শরীফ' বা 'মাদারেকের' মারফতে 'জামখশরীর' ঠিক সেই কথাগুলি হু-বহু তাঁহারই ভাষায় উল্লেখ করা হয়, তখন আর যুক্তি-প্রমাণ দেখিবার দরকারই হয় না। কারণ ইঁহারা হইতেছেন—'ছুন্নৎ-জমাতের' খুব বড় আলেম ! এইরূপে ইতিহাসে ওয়াকেদীর কথা অভিজ্ঞেরা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার সেক্রেটারী এবনে ছাআদের পুস্তকে যখন ওয়াকেদীর সেই রেওয়ায়তগুলি বর্ণিত হয়, তখন আবার অনেকেই চোখ বুজিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ চোখ বুজিয়া গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এই রোগ ক্রমে ক্রমে যখন খুব শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইল, তখন হইতে সূত্র বা সনদের ঝঞ্ঝাট হইতে মুছলমানেরা মুক্তিলাভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল যে, পরবর্তী কোন লেখকের পুস্তকে কোন কথা লিখিত থাকিলেই, তাহার সত্যতায় আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। ঐ লেখক কোন সূত্রে তাহা অবগত হইলেন, সেই সূত্রগুলি বিশ্বাস্য কি-না, যুক্তি-প্রমাণের হিসাবে সে কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় কি-না, এ সকল বিষয়ের চিন্তা করার আর দরকার রহিল না। ধর্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে করণীয় যাহা কিছু ছিল, 'বোজর্গানে-দীন' সে সমস্ত যেন শেষ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কোন ফৎওয়ার কেতাবে এইরূপ লেখা আছে, ইহা বলিয়া দিলেই যেমন সেই কথার প্রামাণিকতা যথেষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়া গেল—ইহাতে একটু 'চুঁচড়া' করিলে তুমি ছুন্নৎ-জমাতের চৌহদ্দির বাহিরে গিয়া পড়িবে—সেইরূপ ঐতিহাসিক বিষয়গুলিও ক্রমে এই অবস্থায় উপনীত হইয়া, যখন ধর্মের সারৎ সাররূপে পরিকল্পিত এবং সূত্র-সনদ ও যুক্তি-প্রমাণ বর্জিত অবস্থায় পরবর্তী লেখকগণের পুস্তকে সন্নিবেশিত হইতে লাগিল, তখন হইতে প্রত্যেক মিথ্যা এবং প্রত্যেক অস্বাভাবিক ও অনৈতিহাসিক কিংবদন্তি, ইতিহাসে এবং তাহা হইতে হুবায় উন্নীত হইয়া ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল। কালে পার্সী ও উর্দু কেতাবের ''آورده اند'' ও ''روایت ہے'' মুছলমানের পক্ষে চরম যুক্তি ও পরম প্রমাণ বলিয়া নির্ধারিত হইতে লাগিল।

তাই আজ তোমাকে যেমন আল্লাহকে এক বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, সেইরূপ ৩৩৩৩ হাত দীর্ঘ উজ-বেন-ওনকের* কেচ্ছাতেও একীন করিতেই হইবে। তুমি যেমন আল্লাহর 'আর্শ কুর্ছিতে'' বিশ্বাস করিবে, সেইরূপ তোমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, 'কো-কাফ পাহাড়' (ককেসস পর্বত) সমস্ত দুনিয়াকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং আছমানের প্রান্তগুলি তাহার উপরে স্থাপিত হইয়া আছে ইত্যাদি। বিশ্বাস না করিলে তুমি মুছলমানই থাকিতে পারিবে না। প্রমাণ ঃ—

"এয়ছাহি কহিল নবী কেতাবে খবর।"

---

* উজ-বেন-ওনক সম্বন্ধে নানা প্রকার আজগবী গল্প আমাদের ইতিহাস ও তফছিরে লেখা আছে। তাহার শরীরের দীর্ঘতা ৩৩৩৩ হাত, সমুদ্রে তাহার হাঁটু পানি, সে সমুদ্রের বড় বড় (সম্ভবতঃ তিমি) মছগুলিকে সূর্যের গায়ে ঠাসিয়া ধরিয়া কাবাব করিয়া খাইত। নূহের বিখ্যাত তুফানের সময়—যখন উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের উপর দিয়া পাহাড়ের মত ঢেউ চলিয়া গিয়াছিল, সে 'তুফানে' তাহার মাত্র বুক পানি হইয়াছিল। শেষে হজরত মুছা একখণ্ড খুব লম্বা লাঠি লইয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক বহু উর্দ্ধে উঠিয়া তাহার পায়ের গোড়ালির উপর আঘাত করেন। এত বড় যে উজ-বেন-ওনক, সেই আঘাতে ৩৫০০ বৎসর বয়সে হালাক হইয়া গেল। জালালুদ্দীন ছয়ুতী তাঁহার অভ্যাস মত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যও একখানা পুস্তিকা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু পূর্বকালের বিশস্ত মোহাদ্দেছগণ এই গল্পগুলিকে মিথ্যা ও 'মৌজু' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এবনে কাওজী বলিয়াছেন ঃ—

وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله - انما العجب
ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير و وغيره ولا
يبين امره......ولا ريب ان هذه وامثاله من وضع زنادقة اهل
الكتاب الذين قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل واتباعهم -
(موضوعات كبير - صفحه ٩٧ دهلى)

অর্থাৎ—"যে মিথ্যাবাদিগণ আল্লাহর নামে এরূপ উপকথা রচনা করিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা সেই সকল মুছলমান পণ্ডিতের অসম সাহসিকতা অধিকতর আশ্চর্যজনক, যাঁহারা এই হাদীছটার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা না করিয়া কোরআনের তফছির প্রভৃতিতে তাহাকে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। ....ইহা ও ইহার অনুরূপ বিবরণগুলি ধর্মদ্রোহী খৃষ্টান ও ইহুদীদিগের রচিত গল্পমাত্র, এবং তাহারা যে এ সকল গল্প রচনা করিয়া নবী ও রছুলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (মাউজুআতে কবির, ৯৭ পৃষ্ঠা।) এই শ্রেণীর দূরদর্শী মোহাদ্দেছগণের অনুমান যে কত সত্য, নিম্নের উদ্ধৃতাংশ হইতে তাহা অবগত হইতে পারা যাইবে। টি, পি, হিউজ বলিতেছেন ঃ—

Uj—عوج the son of Ug. A giant who is said to have been born in the days of Adam.......The Og of the Bible, concerning whom as Suyuti wrote a long book taken chiefly from Rabbinic tradition. (Edwal. Gesch. I. 306.). An apocryphal book of Og was condemned by Pope Gelasius. (Dec. VI. 13.) —Dictionary of Islam p 649

য়িহুদীদিগের অবিশ্বাস্য পুস্তক ও কিংবদন্তি হইতেই যে উজ-বেন-ওনকের গল্পটি সঙ্কলিত, এই বিবরণ দ্বারাও তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ
## মোস্তফা-চরিতের তিনটি সূত্র

পূর্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, হযরতের জীবনী এবং তাঁহার চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার তিনটি সূত্র বা উপকরণ আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে। প্রথম কোরআন, দ্বিতীয় ছহি ও বিশ্বাস্য হাদীছ, তৃতীয় ইতিহাসের একাংশ। এইগুলির ঐতিহাসিক মর্যাদা ও গুরুত্ব কতদূর আছে, এখানে সংক্ষেপে সে সম্বন্ধেও দুই-একটা কথা বলিতে হইতেছে।

### কোর্‌আন

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যে সব বাণী (কালাম) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারই নাম "কোর্‌আন।" মুছলমানের জ্ঞান বিশ্বাস মতে কোরআনের বাণীগুলির ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র সন্নিধান হইতে সমাগত। এই কোরআন হযরতের সময়েই লিপিবদ্ধ করা হয়, স্বয়ং হযরত ও অন্যান্য বহুসংখ্যক ছাহাবী সম্পূর্ণ কোরআন কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছাহাবীগণের নিকট সম্পূর্ণ কোরআন বা তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশ লিপিবদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এতে আরবদিগের অসাধারণ স্মরণশক্তি, তাহার উপর কোর্‌আনের ললিত-মধুর পদগুলির স্বাভাবিক আকর্ষণ। অধিকন্তু মুছলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার ইহ-পরকালের যথাসর্বস্ব ঐ কোর্‌আনের পদ ও পংক্তিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোরআনের একটি বর্ণ মাত্র উচ্চারণ করিলে, "দশটি পুণ্যলাভ" হয়— ইত্যাকার বিশ্বাসের ফলে, ছাহাবীগণ সকলেই কোর্‌আন পাঠ করিতে অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া পড়েন। অতি মূর্খ ও অজ্ঞ মুছলমানকেও নামাযে আবৃত্তি করার জন্য কোর্‌আনের কতকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেই হয়। পক্ষান্তরে কোরআন ভুলিয়া গেলে, তাহার কঠোর দণ্ডের কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অবস্থায়, ছাহাবীগণের মধ্যে যিনি যতটা কোরআন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, তাহার কোন অংশ ভুলিয়া গিয়া যাহাতে তাঁহারা পাপের ভাগী না হন, সে জন্য তাঁহারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ সম্পূর্ণ কোর্‌আন যে হযরতের সময় তাঁহারই নির্দেশক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং স্বয়ং হযরত ও তাঁহার বহু সংখ্যক ছাহাবা যে সম্পূর্ণ কোরআন কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

হযরতের পরলোক গমনের পর, প্রথম খলিফা মহাত্মা আবু বকর, হযরতের সিন্দুকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় রক্ষিত কোরআনের মুসাবিদাখণ্ডগুলিকে সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া দেন। এই সময় অন্যান্য লোকদিগের নিকট কোর্‌আনের যে সকল অংশ ছিল, সেগুলিকে ইহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখা হয়। তৃতীয় খলিফা মহাত্মা ওছমানের আমলে, বহু খণ্ড কোরআন নকল করাইয়া সেগুলিকে সরকারীভাবে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মোছলেম সাম্রাজ্যের শাসনকর্তাগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। ফলতঃ কোরআন হযরতের আমলে যাহা ছিল, আজও ঠিক সেই অবস্থাতেই মুছলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার সমসাময়িক ইতিহাস হিসাবে জগতে কোর্‌আনের যে তুলনা নাই, অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রকেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

এছলাম ধর্মকে ও তাহার প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে জগতের সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করার একমাত্র উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত পাশ্চাত্য লেখক নিজেদের শ্রম ও প্রতিভার অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারাও এই সত্যটাকে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উদাহরণ হিসাবে স্যার উইলিয়ম মুইরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুইর সাহেব তাঁহার Life of Mohammad পুস্তকের ভূমিকায় বলিতেছেন ঃ

"There is probably in the world no other book which has remained twelve centuries with so pure a text," অর্থাৎ—জগতে এরূপ পুস্তক সম্ভবতঃ আর একখানিও নাই, (কোরআনের ন্যায়) দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া যাহার ভাষা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

বিখ্যাত পণ্ডিত হ্যামার (Von Hammer) বলিতেছেন ঃ

"We hold the Quran to be as surely Mohammad's word as the Mohamedans hold it to the word of God," অর্থাৎ—মুছলমানরা যেরূপ নিশ্চিত ভাবে কোরআনকে আল্লাহর বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, আমরাও ঠিক সেইরূপ উহাকে (কোরআনকে) নিশ্চিত ভাবে মোহাম্মদের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি।*

হেরা-পর্বতগুহার সেই প্রথম প্রতিধ্বনি হইতে মোছলেম অধঃপতনের এই শোচনীয়তম যুগ পর্যন্ত, কোরআনের প্রত্যেক ছুরা, প্রত্যেক আয়ৎ, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক বর্ণ এবং প্রত্যেক বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত কিরূপ কঠোরতম সাধনার দ্বারা রক্ষা করা হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। অতএব চন্দ্র সূর্যের অস্তিত্বে যেমন সন্দেহ নাই, দুই আর দুই-এ মিলিয়া চার হয়—ইহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তদ্রূপ প্রচলিত কোরআন যে বর্ণে বর্ণে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার সময়কার ঠিক সেই কোরআন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ খৃষ্টান লেখকগণও, এছলামীয় শাস্ত্রাদির সূক্ষ্ম ও স্বাধীন আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে, তাহা স্পষ্টরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। লিডেন ইউনিভার্সিটির আরবী অধ্যাপক (Professor C. Snouck Hurgronje) সি. স্নাউক হারগ্রোঞ্জে, মুছলমান ধর্ম সম্বন্ধে আমেরিকায় যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা ১৯১৬ সালের শেষ ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে একজন গোঁড়া খৃষ্টান, তাঁহার পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই তাহা জানা যায়। আরবী সাহিত্য ও এছলামিক শাস্ত্রাদিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য তিনি জীবনব্যাপী সাধনা করিয়াছেন। এমন কি, এই জন্য নিজের প্রাণের মায়া না করিয়া তিনি ছদ্মবেশে কয়েক মাস পর্যন্ত জেদ্দা ও মক্কায় অবস্থান করেন, (১৮৮৪-৮৫)। এবং হাজীদিগের সহিত মিলিয়া হজ্জ পর্বও সমাধা করেন। অধ্যাপক পল ক্যাসানোভা (Paul Casanova)** ওয়েলের (Weil) অন্ধ অনুকরণে কোরআনের দুইটি আয়তের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ করিয়াছেন। প্রফেসর হারগ্রোঞ্জে বলিতেছেন, Noldeke আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্বে তাঁহার Geschichte des Quran*** নামক পুস্তকে ঐ ভিত্তিহীন সন্দেহের অপনোদন করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় ক্যাসানোভার কথায় আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিতেছেন :

---

* যথাক্রমে ৩য় সংস্করণের ২১ ও ২৬ পৃষ্ঠা।

** প্রথম সংস্করণ ৩৯৭ পৃষ্ঠা।

*** তাঁহার পুস্তকের নাম Mohammad et la fin du monde, Paris, 1911

সাধারণতঃ, ইউরোপীয় লেখকগণের পুস্তকগুলি পাঠ করিলে, অজ্ঞতা, অসমসাহসিকতা ও গোঁড়ামিতে তাহাদের মধ্যে যে, কে বড় কে ছোট, তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। হিডেলবার্গের প্রফেসর Weil কর্তৃক প্রণীত পুস্তক ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ওয়েল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও ঐতিহাসিক ভাব সম্পন্ন হইলেও কি কারণে জানি না, তাঁহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, "কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের ঘটনা ও শেষ বিচার, মোহাম্মদের জীবনকালেই অনুষ্ঠিত হইবে, এই মর্মের কয়েকটা আয়াত 'কোরআনে' ছিল। কিন্তু মোহাম্মদের মৃত্যু হইয়া গেলে যখন দেখা গেল যে, ঐ পদগুলি মিথ্যা হইয়া যাইতেছে, তখন নবীন দলের নেতারা কয়েকটা আয়াতের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া মোহাম্মদও যে মরিবেন এবং মৃত্যুর পর আবার তিনি যীশুর ন্যায় স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিবেন, লিখিত ও মুখস্থ কোরআনগুলিতে এই সকল কথা যোগ করিয়া দিয়া, ভক্তগণের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।" মেঘের আড়ালে আড়ালে যীশু খৃষ্টের স্বর্গাধিরোহণ ও গগনমার্গে প্রতিষ্ঠিত পিতার সিংহাসনে উপবেশন এবং পুনরায় তাঁহার প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি গল্পগুলি সৃষ্টি করিবার আবশ্যক হইয়াছিল এই জন্য যে, যীশু কর্তৃক পুনঃ পুনঃ পরিব্যক্ত স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তাঁহাকে লোকান্তরিত হইতে হয়। প্রাথমিক যুগের মেষপালকগণ, এই জন্য প্রতিমুহূর্তে প্রভুর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিত। বাইবেল-উক্ত এই বিশ্বাস লেখকের মাথার মধ্যে 'জল-জল' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, আলোচ্য প্রলাপোক্তি ঐ বিশ্বাসের জঘন্য অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। মহাজনগণ সম্বন্ধে প্রচলিত অতিমানসিকতার অন্ধবিশ্বাসের মূলোৎপাটন করাই যে কোরআনের একটি প্রধানতম শিক্ষা, কোরআনের যে-কোন অধ্যায় পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে। হযরতের জীবনকালেই কিয়ামত হইবে, এরূপ কথা কোরআন কস্মিনকালেও স্থানদান করে নাই—করিতেও পারে না, অধিক আয়াস স্বীকার না করিয়াও কোরআন ও হাদীছ হইতে ইহার বিপরীত সহস্র প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু অধ্যাপক ওয়েল ও ক্যাসানোভার সমস্ত অনুমানই তাঁহাদের কথা মতেই মাঠে মারা যাইতেছে। কারণ তাঁহাদের কথা মতে 'মৃত্যুর পর মোহাম্মদ আবার দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিবেন' এরূপ উক্তি নবীন মণ্ডলীর নেতৃবর্গ কোরআনে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছিলেন—কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ কোন উক্তি কোরআনের কোথাও নাই। অতএব তাঁহাদের এই গল্পটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হটোক্তি, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে।

In our Sceptical times there is very little that is above criticism, and one day or other we may expect to hear Mohammed never existed. The arguments for this can hardly be weaker than those of Casanova against the authenticity of the Qoran. (Ps 16-17).

অর্থাৎ—আমাদের এই সন্দেহবাদের যুগে সমালোচনার অতীত বড় কিছু নাই। এবং একদিন না একদিন আমাদিগকে ইহাও হয় তো শুনিতে হইবে যে, কখনও মোহাম্মদ বলিয়া কোন লোকের অস্তিত্বই ছিল না। ইহার যে 'যুক্তি', তাহা কোরআনের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে ক্যাসানোভার যুক্তি অপেক্ষা কোন অংশেই দুর্বল হইবে না। (১৬—১৭ পৃষ্ঠা)।

## প্রথম নিয়ম

কোরআনে হযরতের জীবনী সংক্রান্ত বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে ঃ—

কোরআনে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, কোন ইতিহাসে বা চরিত-পুস্তকে—এমন কি হাদীছের রেওয়ায়েতেও—যদি তাহার বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয়, তবে কোরআনের বিপক্ষে অন্য সকল পুস্তকের বা রাবীর বর্ণনাকে আমরা অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস্য বলিয়া নির্ধারণ করিব।

## কোরআনের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে একটি সংশয়

এখানে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, কোরআনের সমস্ত ঐতিহাসিক বর্ণনাকে আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে যাইব কেন ? বিপক্ষরা বলিতে পারেন—হযরত মোহাম্মদ ভ্রমবশতঃ বা ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা করিয়া কোরআনে ঐ সকল ঘটনা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। যেখানে এইরূপ সন্দেহের সম্ভাবনা আছে, সেখানে দৃঢ় প্রতীতি জন্মান অসম্ভব। কিন্তু এ কথাটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সমস্ত ছাহাবীর অর্থাৎ হযরতের সমসাময়িক মুছলমানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী—সে বাণীতে অসত্য বা বাতেল কোন দিক দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কোরআন নিজেই পুনঃ পুনঃ এইরূপ দাবী করিয়া দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছে যে, সে সত্যময় আল্লাহ্‌র পূর্ণ সত্য কালাম, মিথ্যা ও বাতেল কোন দিক দিয়া কস্মিনকালেও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কোরআনের সত্যতায় প্রাথমিক যুগের মুছলমানদিগের এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহার উপদেশ ও নির্দেশ মতে তাঁহারা দুনিয়ার কঠোর হইতে কঠোরতম অনল-পরীক্ষাকে অবলীলাক্রমে গ্রহণ ও সাফল্য সহকারে বহন করিয়াছেন। ধক-ধক প্রজ্বলিত অঙ্গার শয্যায় শায়িত হইয়া, শূলে ক্রুশে আরোহণ ও শত্রুর বিষ-বাণকে হৃৎপিণ্ডে আলিঙ্গন করিয়াও, তাঁহাদের এই বিশ্বাসের বিন্দুমাত্রও লাঘব হয় নাই।

কোরআনে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, হযরতের জীবিতকালে সহস্র সহস্র মুছলমান অ-মুছলমান—সেই সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী—সেই সময় জীবিত ছিলেন। এ অবস্থায় যদি কোরআনে কোন ঘটনা মিথ্যা করিয়া লিখিত হইত, তাহা হইলে আরবের লক্ষ লক্ষ এছলাম বৈরী অ-মুছলমান, তাহা লইয়া কোরআনকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিত। পক্ষান্তরে সত্যের সেবক ছাহাবিগণ যখন দেখিতে পাইতেন যে, কোরআনে স্পষ্ট মিথ্যার সমাবেশ করা হইতেছে—তখন, কোরআনের প্রতি, কোরআনের বাহক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতি এবং কোরআনের ধর্ম—এছলামের প্রতি তাঁহাদের ঐরূপ অটল অচল ও অটুট বিশ্বাস বিদ্যমান থাকা কখনই সম্ভবপর হইত না। সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে কোন মিথ্যা বা অপ্রকৃত কথা কোরআনে বর্ণিত হইলে, সেই দিনই এছলামের যবনিকাপাত হইয়া যাইত। ফলতঃ ইতিহাসের হিসাবে

দুনিয়ায় কোরআনের সমতুল্য অন্য কোনও পুস্তক বিদ্যমান নাই, ইহা নিরপেক্ষ অ-মুছলমান পাঠক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

## দ্বিতীয় নিয়ম—হাদীছ

**ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা, ছহী ও বিশুদ্ধ হাদীছের বিপরীত বা তাহার সহিত অসমঞ্জস হইলে, ঐ বর্ণনা অবিশ্বাস্য ও অগ্রাহ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।***

এখানে আমাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হাদীছ শাস্ত্র ও তারিখ (ইতিহাস) এক নহে। অর্থাৎ ইতিহাসের বর্ণিত বিবরণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষা হাদীছে বর্ণিত বিবরণগুলির মূল্য বহু গুণে অধিক। মহানুভব মোহাদ্দেছগণ সত্যের সেবা ও তাহার উদ্ধারের জন্য যে প্রকার কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন, যেরূপ কঠোর নিয়ম-কানুন দ্বারা হাদীছগুলিকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, দুনিয়ার কোন মূল ধর্ম-শাস্ত্রের রক্ষার জন্যও তাহার শতাংশের একাংশ সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকগণ, মোহাদ্দেছদিগের ন্যায় সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। ইতিহাস সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতাই পূর্বে স্বীকৃত হইত না। আরবী ইতিহাসে যে সত্য-মিথ্যা এবং প্রকৃত-অপ্রকৃত সকল প্রকার বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়া আছে, ইহা সর্ববাদিসম্মত অভিমত। পাঠকগণ এই গ্রন্থের বহুস্থলে দেখিতে পাইবেন—ঐতিহাসিকগণ যাহা বলিতেছেন, হাদীছে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। উদাহরণস্থলে বদর যুদ্ধের মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মন্তব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিতেছেন—হযরত কোরেশদিগের সিরিয়াগামী কাফেলা লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করাতেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু আবু-দাউদ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কোরেশ- প্রধানগণ মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ্-বেন-ওবাই প্রভৃতির সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল—এবং তাহাদিগের অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য, হযরত নিতান্ত বাধ্য হইয়াই অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক স্থলে হাদীছ গ্রন্থ সমূহের বিবরণের সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা ইতিহাস পুস্তকগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিকতঃ আমরা ইতিহাসের বিবরণগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া, হাদীছের বর্ণিত ঘটনাগুলিকে গ্রহণ করিব।

## তৃতীয় নিয়ম—বিচার

মুসলমান মাত্রই ধর্মের হিসাবে কোরআন মান্য করিতে বাধ্য, কারণ তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে, কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম। তাহার পর, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলিতে, অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, যাহা কিছু করিয়াছেন অথবা যাহা কিছুর অনুমোদন করিয়াছেন, মুছলমান মাত্রই তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। কারণ হযরত প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে 'বাণী' (অহি) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব (ধর্ম সম্বন্ধে) তাঁহার ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা মুছলমানের ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু, এই দুয়ের 'পর যিনি যাহা বলিবেন বা লিখিবেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত মাত্রেই ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং তাহা সর্বদাই পরীক্ষাসাপেক্ষ। যদি আমরা তাঁহাদের কথার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কোন প্রকার পরীক্ষা ও আলোচনা না করিয়া, কাহারও মুখে বা কোন পুস্তকে কিছু শুনিয়া বা দেখিয়াই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লই, তাহা হইলে, অন্ততঃ পরোক্ষভাবে ঐ লোকটিকে সম্পূর্ণ ভ্রমহীন

---

* হাদীছ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ৪র্থ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ত্রুটিহীন মা'ছুম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ তাহাকে নবীর আসনে এবং তাঁহার কথাকে কোরআনের আয়াতের স্থলে বসাইয়া দিয়া, আমরা নিজেদের দীন-ঈমানের সর্বনাশ সাধন করি। আজকাল আমাদের দেশের বহু আলেম, নিজেদের রুচি ও বিশ্বাসমতে, 'শের্ক-বেদআৎ', কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসাদির প্রতিকার করার জন্য সময় সময় আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—বরং ঐ সকল পাপের মাত্রা যে দিন দিন আরও বাড়িয়া চলিয়াছে—ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই মারাত্মক রোগের আসল জীবাণুগুলিকে ইঁহারা চিনিতে পারেন না। বরং অনেক সময় সেইগুলিকেই জীবনী-শক্তির প্রধান উপকরণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার সংক্রমণের সহায়তাই তাঁহারা করিয়া থাকেন। যিনি জীবনে কখনও কোন মুছলমানকে এইরূপ জঘন্য শের্ক-বেদআৎ হইতে মুক্ত করার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি নিজের অকৃতকার্যতার কারণগুলি সম্বন্ধে নিভৃতে চিন্তা করিয়া দেখিলে, আমাদিগের সহিত একবাক্যে—প্রকাশ্যতঃ সাহস না করিলেও অন্ততঃ মনে মনে—স্বীকার করিবেন যে, 'বোজর্গানে-দীন' ও 'ছলফে ছালেহীন' বলিয়া মুছলমান সমাজে যে সকল 'তাগুতের' সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সমস্ত সর্বনাশের মূল। তুমি হাজার রকম প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছ, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহাকেও ছেজদা করিতে নাই, আর কাহাকেও 'হাজের-নাজের' (সর্বগ, সর্বজ্ঞ) বলিয়া বিশ্বাস করিতে নাই। কিন্তু কোন একখানা চটি উর্দু কেতাবের কোন কোণে যদি লেখা থাকে যে, অমুক অলিউল্লাহ্ নিজের মুর্শেদকে ছেজদা করিয়াছিলেন, অথবা অমুক আলেম বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ্ আল্লাহর অংশ বিশেষ,—অথবা একজন লোক দাঁড়াইয়া বলিয়া দিল—"এ বেটাদের কথা শুন না, এরা পীর-ফকীর, অলি-দরবেশ কিছুই মানে না, এরা নেচারী, দেওবন্দী, ওহাবী"—বাস, তোমার সমস্ত যুক্তি, সমস্ত প্রমাণ, একেবারে মাটি হইয়া গেল। মুছলমান জাতির সংস্কার করিতে হইলে, তাহার মস্তিষ্কের সংস্কার অগ্রে করিতে হইবে। তাহার মাথার মধ্যে এই প্রশ্ন জাগাইয়া দিতে হইবে যে, কোন একটা কথা মানিয়া লইবার পূর্বে প্রশ্ন করিতে হয়—"কেন মানিব ?" আল্লাহ্ ঐরূপ মানিতে বলিয়াছেন কি ? আল্লাহর রছুল উহা মানিতে উপদেশ দিয়াছেন কি ? যদি এই দুই প্রশ্নের উত্তর 'না' হয়, তবে জিজ্ঞাসা করিব—ঐরূপ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিব, মাথা হেঁট করিয়া মানিয়া লইব—'কেন ?' ইহার উত্তরে বলা হইবে, অমুক ইমাম বলিয়াছেন, অমুক পীর করিয়াছেন, অমুক আলেম লিখিয়াছেন—ইঁহারা হইতেছেন বোজর্গানে-দীন, ইত্যাদি। অর্থাৎ মক্কার কোরেশগণ কোরআনের যুক্তি-প্রমাণের নিকট পরাজিত হইয়া যাহা বলিয়াছিল, এবং জগতের প্রত্যেক কুসংস্কারকলুষিত জাতি যে সকল যুক্তি-তর্কের দ্বারা নিজেদের জ্ঞান ও বিবেককে প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে, এখানেও তৎসমুদয়ের পুনরাবৃত্তি করা হইবে। ফলতঃ অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, বীর হনুমানের পুঁথি এবং "মোহাম্মদীয়" পঞ্জিকাও আজকাল ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় বিষয়ের প্রমাণস্থলে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।* মুছলমানকে আজ আবার নূতন করিয়া শিখাইতে হইবে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুল

---

* একদা আমি কোন বক্তৃতায় কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম—এগুলি আলি হনুমানের বা সোনাভানের পুঁথির কথা নহে—ইহা কোরআন, আল্লাহর কালাম। স্থানীয় মুনশী ছাহেব ঐ সকল 'বাংলা কেতাব' পড়িয়া যে অঞ্চলে আসর জমকাইয়া থাকেন, সুতরাং এই কথাগুলি তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কেতাব আনাইয়া সেই ওয়াজের মজলিছেই দেখাইয়া দিলেন যে "এ কেতাবের গলত, কেউ আজনা করতে পারবে না। এই দেখ, ভাই সকল, ছাফ লেখা আছে :

"হযরত আলী আর বীর হনুমান, অযোধ্যাতে মহাযুদ্ধ লোলো পাহলোয়ান"

বলা আবশ্যক যে, তর্কে এমন ছাফ পরাজয় আমার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই। নিন্দ তাবিলে ভঙ্গভঙ্গ নাই, মফস্বলে এই কথা বলিলে, পাঁজির গুরুত্ব পাঁজরে উপলব্ধি করার সুযোগ ঘটিবে।

ব্যতীত, যিনি যত বড় পীর–দরবেশ অলি বা আলেম হউন না কেন, যুক্তি-প্রমাণ ও দলিলের বিপরীত হইলে তাঁহার কথা মানিব না, কারণ ইহা সম্পূর্ণ অনৈছলামিক শিক্ষা। এই শিক্ষা ও বিশ্বাসের ফলেই মুছলমানের যত সর্বনাশ হইয়াছে, এ কথাগুলি মুছলমান জনসাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে—অবশ্য নিজেরা অগ্রে বুঝিয়া লইবে। যিনি ইহা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিলেন, সমাজ সংস্কারের কাজ একমাত্র তাঁহারই দ্বারা সম্ভবপর হইবে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব, হযরতের রেছালৎ ও কোরআনের সত্যতা প্রতিপাদন করার জন্য, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোরআনে শত শত যুক্তি-প্রমাণ দিতেছেন, জ্ঞান বিবেক ও চিন্তাশীলতার সহিত সেই প্রমাণগুলির সারবত্তা অনুধাবন করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছেন,—সেখানে যুক্তি-প্রমাণের আবশ্যক হইল, আর একজন 'বোজর্গ', বা বোজর্গ বলিয়া কল্পিত, কিংবা কল্পিত বোজর্গের নাম করিয়া, সত্য-মিথ্যা, সঙ্গত-অসঙ্গত যাহা কিছু বলা হইবে, বিনা প্রমাণে, এমন কি প্রমাণের বিরুদ্ধেও, আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান বিবেককে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে! বলা বাহুল্য যে, ইহা সম্পূর্ণ অনৈছলামিক অন্ধবিশ্বাস এবং এই অন্ধবিশ্বাসের মূলোৎপাটন করাই এছলামের প্রধান শিক্ষা। বর্তমান সন্দর্ভে আমাদের বক্তব্য এই যে, কোরআন এবং ছহী ও বিশ্বাস্য হাদীছ ব্যতীত, অন্য কোন সূত্রে আমরা যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ অবগত হইব, তাহার সত্য-মিথ্যা, বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য এবং প্রামাণিক-অপ্রামাণিক হওয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া লইবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। আরবী পার্সী ভাষায় লিখিত পুস্তক মাত্রই মুছলমানের ধর্মশাস্ত্র নহে।

## তৃতীয় নিয়ম—রায় ও রেওয়ায়ৎ

বহুস্থলে হাদীছ রেওয়ায়ৎ করার সময়, তাহার বর্ণিত ঘটনা সম্বন্ধে রাবী নিজের অনুমান বা অভিমত এমন ভাবে ব্যক্ত করিয়া দেন যে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, তাহাও মূল হাদীছের অংশ বলিয়া ভ্রম হয়। ফলে এই ভ্রমের কারণে রাবীর রায়ও রেওয়ায়তে পরিণত হইয়া যায় এবং তাহাতে বহু প্রমাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। দুই একটা উদাহরণ দিয়া এই বিষয়টা পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিব। মোছলেম, তিরমিজী প্রভৃতি বহু হাদীছ গ্রন্থে এবনে আব্বাছ কর্তৃক একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছটির মর্ম এই যে, হযরত বিনা ওজরে দুই অক্তের ফরজ নামায জমা'* করিতেন। এমাম তিরমিজী তাঁহার কেতাবের শেষ ভাগে নিজেই বলিতেছেন যে, "আমার পুস্তকের এই হাদীছটি ছহী হওয়া সত্ত্বেও তাহার উপর মুছলমানদিগের আমল নাই—উহা সর্বসম্মতিক্রমে পরিত্যক্ত।" বোখারীর হাদীছ ছহী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, অথচ তাহাকে পরিত্যক্ত বলিয়া বাদ দেওয়া হইতেছে, ইহা বড়ই মারাত্মক কথা। আসল কথা এই যে, "হযরত মদীনায় নামায জমা' করিয়াছিলেন"—হাদীছের এই অংশটুকু রেওয়ায়ৎ। আর উহার "কোন প্রকার ভয়, পীড়া, ছফর ব্যতীত অর্থাৎ বিনা ওজরে উম্মতের পক্ষে আছানি করার উদ্দেশ্যে"—এই অংশগুলি রাবীর ব্যক্তিগত রায়,—তাঁহার অনুমান ও অভিমত মাত্র। আমরা হাদীছ হইতে বড় জোর এইটুকু সপ্রমাণ করিতে পারি যে, হযরত মদীনায় দুই অক্তের নামায জমা' করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে এবনে-আব্বাছের মত আমাদের দলিল নহে। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, বিনা ওজরে নামায জমা' করার কোনই শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। মোটের উপর কথা এই যে, কোন ঘটনার ঐতিহাসিক ভিত্তি বা কোন মছলা সপ্রমাণ করার সময় রাবীর

---

* দুই অক্তের নামায একসঙ্গে পড়াকে 'জমা' করা বলা হয়।

মতামতটাকে মূল হাদীছ হইতে বাছিয়া ফেলিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, এইরূপে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণগুলি রাবীগণের অভিমত ও অনুমানের সহিত মিশ্রিত হইয়া, হাদীছ ও ইতিহাসের বহুস্থানে নানাবিধ কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

ইউরোপীয় লেখকগণ সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে ঃ "হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মোহাম্মদ খুব সাধুপ্রবৃত্তি কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু মদীনায় গমনের পর প্রতিশোধ গ্রহণের বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উপযুক্ত বল সঞ্চিত হইলে, তাঁহার মতি বদলাইয়া যায় এবং তিনি মক্কাবাসীদিগের সিরিয়াগামী 'কাফেলা' লুণ্ঠন করার জন্য রণসম্ভারাদি লইয়া মদীনার বাহিরে আসেন। ইহাই 'বদর' যুদ্ধের এবং মক্কাবাসীদিগের সহিত পরবর্তী যুদ্ধ-বিগ্রহসমূহের মূল কারণ। মোহাম্মদ যদি কাফেলা-লুণ্ঠনের চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে মক্কাবাসীদিগের সহিত তাঁহার আর কোন প্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।" ইহাই হইতেছে হযরত রছুলে করীমের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রধান অভিযোগ। ইতিহাসে যে সকল বিবরণ আছে, তাহার খোলাসা এই যে—"হযরত মক্কার কাফেলা লুণ্ঠন করার জন্য কয়েক শত লোক লইয়া মদীনা হইতে বহির্গত হইলেন।" খৃষ্টান লেখকগণ বলিতেছেন, ইহা খুব বিশ্বস্ত হাদীছ ; স্বয়ং হযরতের ছাহাবিগণ এই রেওয়ায়তের বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা বলিব—খুব ঠিক কথা, রেওয়ায়তে ছাহাবার সাক্ষ্য যেটুকু—"হযরত কয়েক শত লোক লইয়া মদীনার বাহিরে গমন করিলেন—" তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু 'কাফেলা লুণ্ঠন করিবার জন্য'—বিবরণের এই অংশটুকু বৃত্তান্ত ঘটিত সাক্ষ্য নহে, বরং উহা বর্ণনাকারীদের অনুমান ও অভিমত মাত্র। তাঁহারা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই বহির্গমনের যে কারণ নির্ণয় করিয়াছিলেন, বৃত্তান্তের সহিত নিজেদের সেই আনুমানিক মতগুলিও বলিয়া দিয়াছেন। এই অংশটুকু সাক্ষ্য নহে, বরং সাক্ষীর অভিমত। সাক্ষী বিশ্বাস্য হইলে, তাহার সাক্ষ্যটুকু গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু সাক্ষীর বিশ্বস্ততার অজুহাতে তাহার অভিমতগুলিকে অবশ্যগ্রাহ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট উপর-আদালতে যে সাক্ষ্য দেন, জজ সাহেব তাহা মূল্যবান ও বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু সেই জজ সাহেবই আবার যুগপৎভাবে, সেই মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেটের অনেক হুকুম রদ করিয়া দেন, অনেক সময় তাঁহার 'রায়'কে ভুল ও অসঙ্গত বলিয়া নির্ধারণ করেন। অন্য দিক দিয়া দেখুন, এমাম বোখারী তাঁহার পুস্তকে যে সকল হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছেন, আমরা সকলে সেগুলিকে বিশ্বস্ততম হাদীছ বলিয়া স্বীকার করি। কারণ তাঁহার ন্যায় সতর্ক, সত্যবাদী ও অভিজ্ঞ সাক্ষী দুর্লভ। কিন্তু, ইমাম ছাহেব তাঁহার পুস্তকে যেখানে নিজের মতামত প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহার তাৎপর্য উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি, এবং আবশ্যক হইলে, তাঁহার অভিমতগুলিকে অগ্রাহ্যও করিয়া থাকি। ফলে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে ও অভিমতে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, ইতিহাস এমন কি শরিয়তের মছলা আলোচনার সময়, সেই পার্থক্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি প্রদান করা হয় না বলিয়া, অনেক সময় আমাদিগকে অনর্থক সমস্যার সৃষ্টি করিতে হয়।*

## চতুর্থ নিয়ম—অসাধারণ ও অস্বাভাবিক

অসাধারণ ও অস্বাভাবিক, দুইটা স্বতন্ত্র বরং পরস্পর বিপরীত কথা। আমরা অনেক সময় অসাধারণ ঘটনাগুলিকে অস্বাভাবিক বলিয়া কল্পনা করতঃ নানাদিক দিয়া নিজেদের জ্ঞান ও চিন্তার উৎকট বিপ্লব উপস্থিত করিয়া থাকি। বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে

---

* সাক্ষ্য গ্রহণের নাম 'রেওয়ায়ৎ', আর কিয়া প্রমাণে কাহারও অভিমত গ্রহণ করাকে—লেখার পরিভাষায়—'তক্‌লিদ' বলা হয়। রেওয়ায়ৎ গ্রহণ ও তক্‌লিদে আকাশ-পাতাল প্রভেদ

এমন কত অসাধারণ ব্যাপারের সন্ধান পাইয়াছেন, অসাধারণ হইলেও যাহার সংঘটন সম্বন্ধে বিজ্ঞান-জগতের কোন সন্দেহ নাই। যুক্তি, বিচার ও পর্যবেক্ষণের ফলে, অজ্ঞাতপূর্ব বিশ্ব-রহস্যের যে অংশটুকু নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছে বলিয়া আজ বিজ্ঞান-জগৎ দৃঢ়তার সহিত দাবী করিতেছে, এই সত্যটুকুও তাহারই অংশীভূত। জগতে জীবের সৃষ্টি কেমন করিয়া ও কোন পদার্থ হইতে হইল,—সেকালের আরস্তাতলিস (Aristotle) হইতে একালের পাস্তুর পর্যন্ত সকল বৈজ্ঞানিকেরই ইহা প্রধান আলোচ্য ছিল। প্রথমে লোকের ধারণা ছিল, সূর্যের আলোকে পৃথিবী হইতে যে বাষ্প উঠিয়া থাকে, তাহা হইতে জীবের সৃষ্টি হয়। তাহার পর স্বতঃজননবাদ এবং বহুদিনের পর পাস্তুর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক তাহার খণ্ডন। আমাদের ন্যায় বিজ্ঞান-জ্ঞান-বর্জিত লোক, সৃষ্টিতত্ত্বের এই সমস্যা সম্বন্ধে, বৈজ্ঞানিকগণের জটিল যুক্তিজালের মধ্যে বিপন্ন হইতে সমর্থ হইয়াও, যখন তাহার সারংসার অবগত হইতে চায়—তখন বৈজ্ঞানিকগণের বহু-বিশ্রুত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রতি তাহার আর পূর্বের ন্যায় ততটা শ্রদ্ধা থাকে না। তাঁহারা বলিলেন—"জীব-জগৎ অসংখ্য পরিবর্তনের ফল মাত্র। এই পরিবর্তন প্রথমে অজৈব শক্তি শোষক ও বাহক পদার্থের প্রভাবে সংঘটিত হয়, পরে আরও জটিল পদার্থের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পদার্থও এই কার্যে নিয়োজিত হয়। নানা সংযোগ ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অঙ্গার হইতে অঙ্গারক বাষ্প, অঙ্গারক বাষ্প হইতে ক্লোরোফিল, তাহা হইতে প্রোটোপ্লাজম এবং এই প্রোটোপ্লাজম হইতে জীবের জন্ম। সুতরাং জড় হইতেই জীবের জন্ম।" এখানে আমাদের প্রশ্ন এই যে, 'অজৈব শক্তি শোষক ও বাহক পদার্থগুলির প্রভাব এখনও অক্ষুণ্ণ আছে কি-না, এবং অঙ্গার, অঙ্গারক বাষ্প, ক্লোরোফিল ও প্রোটোপ্লাজম, যে সকল উপকরণের সংযোগ ও পরিবর্তন দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, সেগুলি প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে কি-না ? যদি না গিয়া থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই নিয়মের রাজ্যে প্রথমের সেই সংযোগ ও পরিবর্তনের প্রাকৃতিক নিয়মটার কি পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে ? যদি না হইয়া থাকে, তবে আজ আবার অঙ্গার হইতে অঙ্গারক বাষ্প এবং তাহা হইতে ক্লোরোফিল ও ক্লোরোফিল হইতে প্রোটোপ্লাজম এবং তাহা হইতে জীবের জন্ম হইবে না কেন ? এ কেমন নিয়মের রাজ্য ! পক্ষান্তরে, যদি বর্ণিত পদার্থগুলির সে প্রভাবের 'ব্যত্যয়' ঘটিয়া থাকে,—ঐ উপকরণগুলি যদি শেষ হইয়া গিয়া থাকে, তবে, পূর্ব যুগের সংঘটিত যে ঘটনাকে তুমি আজ অতিপ্রাকৃত বলিতেছ ।কারণ তাহা আর ঘটিতে পারিতেছে না। তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই ঐরূপ একটা 'সন্তোষজনক' কৈফিয়ত দেওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক যাহা বলিবেন এবং তাহা দ্বারা অবৈজ্ঞানিক আমরা যাহা বুঝিলাম, তাহার সারমর্ম এই যে, জড় হইতে জীব এবং জীব হইতে প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। নিরেট অবৈজ্ঞানিক আমি যখন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, জড় হইতে উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ হইতে প্রাণী জগতের উৎপত্তি—এ কেমন কথা ! জনকজননীর শুক্র ও শোণিত ব্যতীত প্রাণীর জন্ম কখনই হইতে পারে না, এ ব্যাপারটা একেবারে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে। বিজ্ঞানের সেবক যেন করুণ ও বিদ্রূপ মিশ্রিত উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলেন, "না হে না, এটা অস্বাভাবিক না।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা ঠাকুর, বেশ কথা ! যদি ইহা অস্বাভাবিক না হয়, তবে এখন আর হয় না কেন ?" বৈজ্ঞানিক বলিবেন—'প্রাণী জন্মের পূর্বে জড় পদার্থ সমূহে এমন সকল উপকরণের সমাবেশ হইয়াছিল, যাহাতে তখন তাহা হইতে প্রাণীর উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। সেই (প্রাণী জন্মের প্রথম তারিখ) হইতে আজ পর্যন্ত, সেই সব কারণ ও উপকরণগুলির সমাবেশ না ঘটাতে আর সেরূপ হইতে পারিতেছে না, বোধ হয় আর কখনও পারিবে না।'

পাঠক এখন দেখিলেন, প্রাণীজগতের প্রথম সৃষ্টি-দিবসে জড় হইতে জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর কখনও—একবারের জন্যও—তাহা সম্ভব হয় নাই। তবুও বিজ্ঞান তাহাকে অস্বাভাবিক বলিতেছে না। ফলতঃ এই আলোচনার দ্বারা জানা গেল যে, অসাধারণ ও অস্বাভাবিক এক কথা নহে।

## পঞ্চম নিয়ম— বৈজ্ঞানিক ফ্যাশান

কোন একটা ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করা মাত্র, সেটাকে অতি-প্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক ও Supernatural বলিয়া একদম উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। স্বীকার করি, এই জগৎটা নিয়মের রাজ্য, এবং সে নিয়মের যে ব্যভিচার ও ব্যতিক্রম হইতে পারে না, অনেক বৈজ্ঞানিকই একথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বহি-কেতাব পড়িয়া, বা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়া, আমরাও গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—হযরতের অমুক মোজেজায় আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। পল্লীগ্রামে ডোম-চামারেরা যেমন বাবুশ্রেণীর আদর্শ মনুষ্যদের দেখাদেখি 'এলবার্ট ফ্যাশান' কাটিতে ব্যগ্র হয়, অথচ তাহা দ্বারা তাহারা যে কি বিশেষ সুফলাভ করিবে, তাহা তাহারা জানে না—সেইরূপ আমরা অনেক সময় নিজেরা কিছু জানিবার-শুনিবার চেষ্টা না করিয়াও, কেবল ঐরূপ 'বৈজ্ঞানিক ফ্যাশানের' খাতিরে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা প্রবল জোরে বলিয়া থাকি যে, আমরা ঐ সকল বিবরণে বিশ্বাস করি না। কারণ ঐগুলি অতি-প্রাকৃতিক ব্যাপার—প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের বিপরীত, সুতরাং উহা কখনও ঘটিতে পারে না।

আমরা এই শ্রেণীর বন্ধুদিগকে বিজ্ঞানের সহিত লড়াই করিতে কখনই বলি না। বরং তাঁহাদিগের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বিভিন্নপন্থী প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের আলোচনা মনোযোগ দিয়া পাঠ করুন। আমাদের বিশ্বাস, তাহা হইলে অবিলম্বেই তাঁহাদিগকে সংযতবাক হইতে হইবে। তখন তাঁহারা হিউম ও টেণ্ডালের প্রতিকূলে ওয়ালাস, হক্সলী, ক্রুকস ও লজের ন্যায় বৈজ্ঞানিকের মত দেখিতে পাইবেন। তখন বৈজ্ঞানিকের সহিত একমত হইয়া তাঁহাকেও বলিতে হইবে—"মনুষ্যের অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ, তখন এইটা প্রকৃতির নিয়ম, উহার কোথাও ব্যভিচার নাই বা হইতে পারে না, এরূপ নির্দেশ অন্যায়, অসঙ্গত, অসমীচীন ও অবৈজ্ঞানিক, এরূপ দুঃসাহসিকতা বুদ্ধিমানকে সাজে না।"

"মাধ্যাকর্ষণের সার্বভৌমিকত্ব, জড়ের অনশ্বরতা, শক্তির অনশ্বরতা প্রভৃতি কয়েকটি গোটাকত প্রাকৃতিক নিয়ম লইয়া কিছুদিন হইতে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বড়ই বাকপটুতা প্রদর্শন করিতেন। আজকাল অনেকে সাবধান হইয়া কথা কহেন। ঐ সকল নিয়মের ব্যভিচার অকল্পনীয় নহে, অসম্ভবও নহে। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, অতএব উহা অসম্ভব,—একথা কোন কাজের কথাই নয়। প্রাকৃতিক নিয়ম কি তাহাই যখন পুরা সাহসে বলিতে পারি না, তখন ঐ উক্তি হঠোক্তি মাত্র। প্রকৃতির এক দেশের সহিত আমার পরিচয়, লেনাদেনা কারবার রহিয়াছে ; কিন্তু সেই পরিচিত প্রদেশের বাহির হইতে যদি কোন নূতন ঘটনা আসিয়া হঠাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ বলিবার কাহারও অধিকার নাই।"* আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের হিসাবে, এই বিষয়টা অজ্ঞাত, সুতরাং অতি-প্রাকৃত সুতরাং অসম্ভব—এই যুক্তিটি যে কতদূর ভুল, বহু ধীমান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিয়াছেন। Psychical Research Society-র কার্যপ্রণালী ও ঐ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তদন্তের ফলাফল সংক্রান্ত

---

* স্বর্গগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত 'জিজ্ঞাসা' পুস্তকের 'অতি-প্রাকৃত' শীর্ষক সন্দর্ভ হইতে গৃহীত।

পুস্তকগুলি পাঠ করিলেও, সন্দেহ ও সংশয়াক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অনেকটা শান্তিলাভ করিতে পারিবেন।*

## ষষ্ঠ নিয়ম—অসম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী

'এই প্রকার ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে, অতএব উহা ঘটিয়াছে', এই প্রকার কথা বলা আর ন্যায়-দর্শনের হত্যাসাধন করা একই কথা। আমরা ৫ম নিয়মে বলিয়াছি, কোন একটা ব্যাপার অলৌকিক বলিয়া ধারণা হইলে, কেবল এই ধারণা মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া, সেই ঘটনার সমস্ত সাক্ষীকে ভ্রান্ত বা মিথ্যাবাদী বলিয়া নির্ধারণ করা অন্যায়। এজন্য ঐ বিবরণের সাক্ষ্য-প্রমাণ দলিল-দস্তাবেজ যাহা কিছু আছে, সে সব খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমে সাক্ষীগণের বিশ্বাস্য হওয়া সম্বন্ধে এবং তাহার পর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সাক্ষী পরম্পরার প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই বিচার আলোচনার পর আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদি অবলম্বনে সূক্ষ্ম পরীক্ষা। এই প্রকার পরীক্ষার পর যে-সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইবে, তাহাতে নিশ্চয় বিশ্বাস করিব—বৈজ্ঞানিক তাহাকে অত্যদ্ভুত বলিয়া নির্ধারণ করিলেও করিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, সাক্ষী-প্রমাণের পরীক্ষা যথেষ্টরূপে করিতে হইবে। সাক্ষীর নিজের সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রভাব কতদূর, তাহার দৃষ্টি-বিভ্রম, শ্রুতি-বিভ্রম, জ্ঞান-বিভ্রম ইত্যাদি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি-না, সাধারণভাবে সাক্ষীদিগের বিশ্বস্ততা পরীক্ষার পর এই সকল বিষয়ও উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের অধিকাংশ লেখকের যুক্তির ধারা এই যে, তাঁহারা প্রথমে যথেষ্ট ভাবপ্রবণতাপূর্ণ ভাষায় আল্লাহ তা'আলার সর্বশক্তিমানত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। তাহার পর এই সর্বশক্তিমানত্বের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যেক ঘটনার সম্ভবপরতা প্রতিপন্ন করেন। যথা ঃ—"যে আল্লাহ এত বড় চাঁদ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তিনি কি চাঁদকে দু-টুকরা করিতে পারেন না ?" যাহারা এ-কথা বলে, তাহারা নাস্তিক, কারণ তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে সর্বশক্তিমান বলিয়া মানে না, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে মানে না।"

আমরা এই শ্রেণীর বন্ধুদের সহিত গম্ভীরভাবে 'তর্কযুদ্ধে' প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত নহি। আমরা তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি স্বীকার করিয়া নিবেদন করিব, আল্লাহ্ করিতে পারেন সব—তোমাকে আমাকে তিনি এখনই পাগল করিয়া দিতে পারেন। তাই বলিয়া কি তুমি আমাকে বা আমি তোমাকে পাগল বলিয়া গণ্য করিব ? তোমার বাটীতে আমার নিমন্ত্রণ হওয়া এবং তোমার পক্ষে কাবাব কোপ্তা কালিয়া কোর্মা প্রভৃতি ক'কারাদি দ্বারা আমার তাপ-তেজাদির বৈজ্ঞানিক গহ্বরটাকে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া খুব সম্ভব, কেবল সম্ভবই নহে, ইহার অনুরূপ দুর্ঘটনা

---

* ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক এবং বিজ্ঞান-বিশারদ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমবায়ে এই সমিতি গঠিত হয়। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Moral Philosophyর শিক্ষক, অধ্যাপক আদম্স (Adams) এবং Henry Sidgwick যথাক্রমে এই সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। সমিতির অধীন ছয়টা স্বতন্ত্র শাখা-সমিতি গঠিত হয়। প্রত্যেক শাখার উপর একটি বিশেষ, বিষয় তদন্ত করার ভার দেওয়া হয়। অধ্যাপক নেবকোর, স্যার উইলিয়াম ক্রুক, লর্ড টেনিসন, Lord Raeyleigh, এডমণ্ড-গার্নি, অধ্যাপক ব্যারেট ও এই শ্রেণীর বহু প্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ইহার সদস্য নির্বাচিত হন। যে সকল 'অতি-প্রাকৃতিক' ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া জনসাধারণ বিশ্বাস করে, তাহা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর কি-না, তাহাই তদন্ত করিবার জন্য এই সমিতি বহু অর্থব্যয়ে ও বিরাট আয়োজনে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন। 'অতি-প্রাকৃত' বলিয়া মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল বিবরণকে উড়াইয়া দিয়াছেন, এই শ্রেণীর কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর কি-না, সমিতি সোজাসুজি পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা তাহা স্থির করিয়াছেন। দেখ Ency Britanica, ১৩শ সংস্করণ, ২২ খণ্ড, ৫৪৪—৭ পৃষ্ঠা।

আমাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। তাই বলিয়া পাঠকের বাড়ী আজ আমি 'হরদম' দাওৎ খাইয়াছি মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব কি ? 'ইহা সম্ভব কি অসম্ভব' তাহা লইয়া তোমাদের সহিত আলোচনা করিতে চাই না। ইহা যে 'ঘটিয়াছে'—ঐতিহাসিকভাবে তাহার প্রমাণ দাও, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এইখানেই—অন্ততঃ এছলাম সম্বন্ধে—সমস্ত গোলযোগের শেষ হইয়া যাইবে।

## সপ্তম নিয়ম—প্রমাণের তারতম্য

"যে ঘটনা যত অদ্ভুত ও যত অসাধারণ, তাহার সাক্ষ্য-প্রমাণও সেই অনুপাতে ততই দৃঢ় ও মজবুত হওয়া চাই।" যে ঘটনা যত সাধারণ, তাহা ততই সহজে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে যে ঘটনা যত অসাধারণ, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমাদিগকে ততই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। মনে করুন, ঢাকার একজন লোক কলিকাতায় আসিয়া বলিল,—'ঢাকায় বৃষ্টি হইয়াছে।' সকলে ইহা সহজে বিশ্বাস করিবে। আর একজন বলিল—'ঢাকায় শিলাবৃষ্টি হইয়াছে।' মানুষ একটু চমকিত হইবে, তবে এই সংবাদটাও সহজে বিশ্বাস করিয়া লইবে। কিন্তু আর একজন যদি বলে—"চট্টগ্রামে ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। দশ দশ সের ওজনের এক একটা বরফের পাথর পড়িয়াছে, তাহার আঘাতে কর্ণফুলির বড় বড় সওদাগরী জাহাজগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।" শ্রোতা অমনি বলিবে—"সত্যি না-কি ? কই এ সংবাদটা ত কোন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় নাই !" অতঃপর শ্রোতা অন্য সূত্রে এই সংবাদটির সত্যতা পরীক্ষা করার চেষ্টা করিবে।

মনে কর, একখানা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইল ঃ 'প্রবল ভূমিকম্পের ফলে, বিগত ভাদ্র মাসের ২১শে তারিখে, হিমালয় পর্বতটি সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া যায়। তাহার পর কোহকাফ হইতে কালা-দেউব দল আসিয়া উহাকে টানিয়া ভারত মহাসাগরে ফেলিয়া দেয়। পাহাড়টি তিন দিবারাত্র ভারত মহাসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় রুশ হইতে ইংলণ্ডগামী একখানা জার্মান সমরপোত ঐ পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ডুবিয়া যায়। জাহাজের জিনিসপত্রে যেমনই সমুদ্রের পানি লাগিল, অমনি সেগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইহাতে ভারত মহাসাগরের সমস্ত পানি ভীষণ বাড়বানলে দগ্ধীভূত হইয়া একদম ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। সমুদ্রের কতকগুলি মাছ উপকূলস্থ বড় বড় গাছে চড়িয়া কোন গতিকে প্রাণ বাঁচাইয়াছে, অবশিষ্টগুলি সমস্তই পুড়িয়া মারা গিয়াছে। যাহা হউক, সুখের বিষয় এই যে, এই পর্বত-বিভীষিকা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ৪র্থ দিবস অর্থাৎ ২৪শে ভাদ্র তারিখের পূর্ণিমা তিথিতে—সূর্যগ্রহণের ফলে, যখন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল—সেই সময়, একটা ভয়ানক তুফান উঠিয়া পাহাড়টাকে আবার পূর্বস্থানে বসাইয়া দিয়াছে। আমাদের জনৈক বিশ্বস্ত সংবাদদাতা স্বচক্ষে দেখিয়া জানাইয়াছেন যে, বাস্তবিক পর্বতটি পূর্ববৎ যথাস্থানে সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে।" আল্লাহর কুদরৎ, তিনি সর্বশক্তিমান, সব করিতে পারেন, এই প্রকার যুক্তি খাটাইয়া আমাদের বন্ধুরা বলিবেন—ইহাতে আশ্চর্যের কথা কি আছে ? যে আল্লাহ সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইতে পারেন, যিনি আগুনে দাহিকা শক্তি দিতে পারেন, তিনি কি সমুদ্রে পাহাড় ভাসাইতে বা জলে দাহিকা শক্তি দিতে পারেন না ? শরীরে যথেষ্ট বল না থাকিলে এ যুক্তির প্রতিবাদ করিতে যাওয়া অন্যায়। তবে আমাদের কর্তব্য এই যে, এই বিবরণের সাক্ষী যাঁহারা, তাঁহাদিগকে আমরা পূর্ব-বর্ণিতরূপে সকল প্রকার পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করিয়া দেখিব। সাক্ষীর প্রদত্ত বিবরণগুলির সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারও সঙ্গে সঙ্গে করিয়া যাইব। তাহার পর

সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ভাবে যদি এই বিবরণের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লইব। আমাদের বৈজ্ঞানিক পাঠকগণ সম্ভবতঃ এখানে একটু বিচলিত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা বলিবেন, 'প্রমাণ হাজার বিশস্ত হউক, তাই বলিয়া এমন একটা আজগুবী অতি-প্রাকৃত কথা বিশ্বাস করিয়া লইব ?'—লইবেন ছাড়া আর উপায় কি ? যাহা ঘটিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহা অলৌকিক থাকিল কই ? অস্বাভাবিক হইলে ঘটিত না। যখন ঘটিয়াছে, তখন আর অস্বাভাবিক বলিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইবার আবশ্যক নাই। ঐ প্রকারে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের পর এছলামের নামে এমন কোন বিষয়ের আরোপ করা সম্ভবপর হইবে না, যাহার সহিত বিজ্ঞানের (Science) পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণাদি—সমুদ্ভূত কোন সত্যের অসমঞ্জস ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। বাজারে প্রচলিত এই শ্রেণীর আজগুবী কেচ্ছাগুলির একটিও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। তবে এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিকদিগের প্রত্যেক "থিওরী"ই বৈজ্ঞানিক সত্য নহে। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা বৈজ্ঞানিক নিত্যই নিজের পূর্ব "থিওরীর" ভ্রম বাহির করিয়া ফেলিতেছেন। আজ যাহা সত্য, কাল তাহা বোকামী জনিত মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। আমরা এইরূপ অনুমান জনিত 'থিওরী'র কথা বলিতেছি না ; বরং পর্যবেক্ষণজনিত অপরিবর্তনীয় স্থির ও স্থায়ী সিদ্ধান্তের কথা কহিতেছি। এখানে আমরা খুব জোর গলায় দাবী করিয়া বলিতেছি—এছলামের কোন বিবরণ বা বিশ্বাস ঐরূপ কোন বৈজ্ঞানিক সত্য বা স্থির সিদ্ধান্তের বিপরীত নহে।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## হাদীছ সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্বের আলোচনার সার এই যে, হযরতের জীবনী সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ বিশ্বস্তসূত্রে আমাদের হস্তগত হইবে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। এ সম্বন্ধে যত দিক দিয়া যত প্রকার বিবরণ বা ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, কোরআন তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা কোরআনকে হযরত মোহাম্মদের রচনা বলিয়া মনে করিবেন, Contemporary Records বা সমসাময়িক বিবরণ হিসাবে তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে, হযরতের সময়কার সেই কোরআন এখনও দুনিয়ায় প্রচলিত আছে, তাহাতে বিন্দু-বিসর্গের পরিবর্তন হয় নাই—হওয়া সম্ভবপরও নহে। আজ যদি জগতের সমস্ত কোরআন (মাআজাল্লাহ) সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া হয়, কাল সকালে অতি সহজে লক্ষ খণ্ড কোরআন আবার লিখিত হইয়া যাইবে। হযরতের আমল হইতে আজ পর্যন্ত কোরআন সম্বন্ধে মুছলমানেরা শুধু হাতের লেখা বা কলের ছাপার উপর কখনই নির্ভর করেন নাই, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে শত শত 'হাফেজ' ছিলেন এবং এখনও আছেন। এই শহরে অনুসন্ধান করিলে, শত 'হাফেজ' অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারিবে। ফলতঃ কোরআন হযরতের জীবনী সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান উপকরণ, তাহা অমুছলমানকেও স্বীকার করিতে হইবে।

কোরআনের পর হাদীছ। হযরতের জীবনীর বহু বিবরণ হাদীছ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। বিশেষতঃ হযরতের চরিত্র-মাহাত্ম্য ও তাঁহার ২৩ বৎসর নবী-জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস, শাসন ও বিচার, বাণিজ্য ও কৃষি, আন্তর্জাতিক আইন-কানুন, সমর-নীতি, দেশ-সেবা প্রভৃতি সংক্রান্ত শিক্ষা সম্যকরূপে অবগত হইতে

হইলে,—আত্মা সম্বন্ধে, কর্মফল সম্বন্ধে, পরকাল সম্বন্ধে, মানবীয় জ্ঞান ও বিবেকের দাসত্ব মোচন সম্বন্ধে এবং আত্মার বিকাশ ও মুক্তি সম্বন্ধে তিনি যে কি মহীয়সী শিক্ষা—কি অতুলনীয় স্বর্গীয় আদর্শ ধরাধামে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলে, হাদীছের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অতএব, হাদীছ, তাহার শ্রেণী বিভাগ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মর্যাদার তারতম্য এবং সেই তারতম্যের হেতু ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ না করিয়া হযরতের জীবনী অধ্যয়ন বা তাহার যথাযথ অনুধাবন করা সঙ্গত বা সম্ভবপর নহে। এই সকল কারণে আমরা প্রথমে যথাসম্ভব সংক্ষেপে সাধারণ পাঠকবর্গকে হাদীছের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিব।

## হাদীছ, রাবী ও ছনদ

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (১) যাহা করিয়াছেন, (২) যাহা বলিয়াছেন, এবং (৩) তাঁহার প্রত্যক্ষ গোচরে যাহা করা বা বলা হইয়াছে—অথচ তিনি তাহার প্রতিবাদ বা তাহাতে কোন প্রকার অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই, মোটের উপর এইরূপ কাজ ও কথার বিবরণের নাম—"হাদীছ"। হযরতের ছাহাবীগণ (সহচরবর্গ) ঐ সকল হাদীছের বর্ণনা করিয়াছেন, তাবেয়ীগণ (যাঁহারা হযরতের দর্শন লাভ করেন নাই—তবে তাঁহার সহচরগণকে দেখিয়াছেন) ছাহাবীদিগের মুখে ঐ সকল হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা আবার পরবর্তী লোকদিগের নিকট তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে কয়েক সিঁড়ির পর, হাদীছের সঙ্কলকগণ সেই হাদীছগুলিকে নিজেদের পুস্তকে সঙ্কলিত করিয়াছেন। 'ক' হযরতকে দেখিয়াছিলেন, 'খ' তাঁহার মুখে শুনিলেন এবং 'গ' আরও পরবর্তী লোক, তিনি 'ক'কেও দেখেন নাই, তিনি 'খ'-এর মুখে শুনিয়াছেন। এইরূপ একে অন্যের মুখে শুনিয়া একটা ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছ-শাস্ত্রের পরিভাষায় এই বর্ণনাকে 'রেওয়ায়েৎ' বলা হয়। ক খ গ এই তিন জন—যাঁহারা ঐ বিবরণ প্রদান করিলেন—তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐ হাদীছের "রাবী"। ক-খ-গ এর সূত্র পরম্পরা অর্থাৎ ক-এর মুখে খ-এর এবং খ-এর মুখে গ-এর শ্রবণ বিবরণ—ইহাকে 'ছনদ' বা 'এছনাদ' বলা হয়। সূত্র-পরম্পরা ব্যতীত—হাদীছের মূল বক্তব্য বিষয় যেটুকু, তাহাকে হাদীছের 'মতন' বলা হয়। একটা উদাহরণ দিতেছি ঃ—

এমাম বোখারী তাঁহার পুস্তকে লিখিতেছেন,—"কাজায়ার পুত্র এহ্ইয়া আমাকে বলিয়াছেন, তিনি বলেন, মালেক আমার নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, মালেক এবনে শেহাবের মুখে, এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ও হাছান হইতে, এবং তাঁহারা নিজেদের পিতা মোহাম্মদ হইতে এবং মোহাম্মদ আলী হইতে বর্ণনা করেন যে, "রছুলুল্লাহ্ খায়বর যুদ্ধের দিন মোৎআ-বিবাহ ও গর্দভ-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।"

ইহা একটা হাদীছ। ইমাম বোখারী হইতে হযরত আলী পর্যন্ত যে নামের তালিকা বা সাক্ষী পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এছনাদ, ছনদ বা সূত্র। এই সূত্রের বর্ণিত এহ্ইয়া, মালেক প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যক্তিই হাদীছের 'রাবী'। হাদীছে বর্ণিত "রছুলুল্লাহ----নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন"—এই অংশটুকু হাদীছের 'মতন'।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কোন্ হাদীছটা বিশ্বাস্য আর কোনটা অবিশ্বাস্য, কোনটা প্রকৃত আর কোনটা প্রক্ষিপ্ত—এই সব বিষয় জানিতে হইলে, সর্বপ্রথমে আমাদিগকে ছনদের বা সাক্ষী-পরম্পরায় বর্ণিত 'রাবী'দিগের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এই পরীক্ষায় টিকিয়া গেলে তবে অন্য সকল দিককার বিচার।

হাদীছের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে রাবীদিগের নানারূপ অবস্থার পর্যবেক্ষণ আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। হাদীছের বর্ণনা ও সঙ্কলনের প্রাথমিক সময় হইতে, এই পর্যবেক্ষণের আবশ্যকতা স্বাভাবিকরূপে, আমাদিগের এমাম ও মোহাদ্দেছগণের মনে তীব্রভাবে জাগরিত হইয়া উঠে। হাদীছ সম্বন্ধে বিশেষরূপে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য, ধর্মের হিসাবেও তাঁহারা যে কতদূর বাধ্য ছিলেন, সম্ভব হইলে আমরা ভবিষ্যতে তাহার একটু পরিচয় প্রদান করিব। যাহা হউক, হাদীছের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎভাবে রাবীদিগের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করার আবশ্যকতাও তীব্রভাবে অনুভূত হইতে লাগিল এবং এই অনুভূতির ফলে আমাদের প্রাথমিক যুগের ইমামগণ, হাদীছের রাবীদিগের জীবনী (Biography) সংগ্রহে তৎপর হইলেন। সেই হইতে 'রেজাল' বা চরিত-অভিধান-শাস্ত্র মুছলমানদিগের ধর্মশাস্ত্রের একটি আবশ্যকীয় উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক যুগের ইমাম ও মোহাদ্দেছগণ তাঁহাদের ও পূর্ববর্তী সময়ের রাবীগণের বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্মের সন তারিখ, ছাহাবী হইলে কোন সময় এছলাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নৈতিক ও মানসিক অবস্থা, ব্যবসায়, পর্যটন, তিনি কাহার বা কাহার কাহার নিকট এবং তাঁহার নিকট হইতে কে কে হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয় নিজেদের পুস্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমে ছাহাবীদিগের যুগে ইহার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। সেই সময়ই প্রথম কিছুকাল হাদীছের বর্ণনার সহিত তাহার রাবীগণের অবস্থাদিও বাচনিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, রাবীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়। ইমাম এহ্য়া-এবন ছাঈদ কাত্তান (মৃত ১৪৩ হিজরী) এ সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। সেই হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত কেবল হাদীছের রাবীগণ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গ্রন্থ রচিত হইয়া যায়। এই সকল পুস্তকের সাহায্যে আজ আমরা অতি সহজে লক্ষাধিক রাবীর সূক্ষ্ম জীবন-বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারি। মুছলমানেরা কেবল হাদীছের রাবীগণের জীবনী সঙ্কলন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, কোরআনের টীকাকার, হাদীছগ্রন্থ সঙ্কলনকারী, ঐতিহাসিক প্রভৃতি জ্ঞানের সকল বিভাগের সেবকগণের জীবনী তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম আলোচনা সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এগুলিকে 'তাবকাৎ' বলা হয়।

ডাক্তার স্প্রেঙ্গারের 'মোহাম্মদ-চরিত' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, ডাক্তার মহাশয় যে এছলামের কত বড় শত্রু, তাহা আর তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। অবশ্য তিনি যে আরবী ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এহেন স্প্রেঙ্গার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "There is no nation, nor has there been any which like them has during twelve centuries recorded the life of every man of letters. If the biographical records of Musalmans were collectetd, we should probably have accounts of the lives of half a million of distinguished persons."

মর্মানুবাদ "—পৃথিবীতে বর্তমান যুগে এমন কোন জাতি নাই, অথবা অতীত যুগেও এরূপ কোন জাতি ছিল না, যাহারা মুছলমানদের ন্যায় দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রত্যেক বিদ্বান, সাহিত্যিক ও লেখক প্রভৃতির জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। মুছলমানদিগের লিখিত জীবন-চরিতগুলি সংগৃহীত হইলে আমরা খুব সম্ভব পাঁচ লক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন-চরিত প্রাপ্ত হইতে পারিতাম।"

ডাঃ স্প্রেঙ্গার সাহেব 'এছাবার' ভূমিকায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর এই ৮০ বৎসরের মধ্যে রেজ্জাল বা চরিত-অভিধান সম্বন্ধে বহু মূল্যবান বহি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উদাহরণস্থলে এবন ছাআদের 'তাবাকাৎ', এবন হাজারের 'তকরীবুৎ-তাহজীব', জাহবীর 'মীজানুল-এ'তেদাল' প্রভৃতি বিরাট চরিত-ইতিহাসগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

## হাদীছ লেখার নিয়ম

যথাযথ ভাবে হাদীছ লিখিয়া রাখার নিয়ম প্রাথমিক যুগে ছিল না। ছাহাবাগণের মধ্যে কেহ কেহ হাদীছ লিখিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় বটে,* কিন্তু সাধারণ ভাবে সকলে তখন বাচনিকভাবে হাদীছ বর্ণনা ও শিক্ষা করিতেন। তাহার পর ছাহাবীগণের মৃত্যু, মুছলমানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন দেশে ছাহাবীদিগের বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়া, তাবেয়ীগণের বিরাট সংখ্যা ও তাহার মধ্যে বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য লোকের সমাবেশ এবং এইরূপ অন্যান্য কারণে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতেই হাদীছ লিপিবদ্ধ করা এছলামের একটা গুরুতর কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হয়। ইমাম মালেকের 'মোয়াত্তা', ইমাম আহমদ-বেন হাম্বালের বিরাট 'মোছনদ', ইমাম শাফেয়ীর 'কেতাবুল-উম্ম', প্রভৃতি এই সময় সঙ্কলিত হয়।** অর্থাৎ এই সময় হইতে লিখিত ভাবে হাদীছ বর্ণনার আবশ্যকতা ধর্মের দিক দিয়া স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইল এবং তদনুসারে সমস্ত হাদীছ লিখিত ভাবে রেওয়ায়ৎ করার ধারা সাধারণ ভাবে প্রচলিত হইয়া গেল। অবশ্য হাদীছ লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা যে ইতিপূর্বেই অনুভূত হইয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

এছলামের মহামান্য খলিফা ওমর এবন-আবদুল আজিজ, তাঁহার খেলাফৎ সময়ে হাদীছ সংগ্রহ করার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ওমর এই জন্য ছঈদ-এবন-এবরাহিম, আবু বকর-এবন-মোহাম্মদ প্রভৃতি বিখ্যাত হাদীছজ্ঞ আলেমগণের প্রতি সরকারীভাবে নির্দেশ প্রদান করেন। (তাবাকাত ২—২, ১৩০ ও ১৩৪ পৃষ্ঠা)। খলিফা তাঁহার পরওয়ানায় বলিয়াছেন ঃ

انی قد خفت دروس العلم وذهاب اهله

অর্থাৎ—"আমার ভয় হইতেছে, এই ভাবে ছাড়িয়া দিলে ধর্মবিদ্যা লুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং তাহার অনুশীলনকারিগণও সঙ্গে সঙ্গে লোপ প্রাপ্ত হইবেন।"

ইমাম মালেক বলিতেছেন ঃ

كان عمر بن عبد العزيز يقول ما كان بالمدينة عالم يأتيني بعلمه

ইহার সারমর্ম এই যে, "খলিফা ওমর-এবন-আবদুল আজিজ মদীনার সমস্ত পণ্ডিতের বিদ্যা (হাদীছ) সঙ্কলন করার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

ওমর-এবন-আবদুল আজিজ ১০১ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। সুতরাং প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে যে বহু হাদীছ বিভিন্ন মোহাদ্দেছ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে জানা

---

* আবদুল্লাহ-এবন-আমর হযরতের আদেশ মতে হাদীছ লিখিয়া রাখিতেন, (আবু দাউদ ২—১৫৭), (বোখারী ১—১৩৩)। হযরত আলীর লিখিত হাদীছ পুস্তকের প্রমাণ, (বোখারী ১—১০৪, জামে-এ-এবনে-আবদুল-বার ৭৭)। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আরও কতিপয় ছাহাবীর নিকট লিপিবদ্ধ হাদীছের সঙ্কলন ছিল।

** ইমাম মালেকের জন্ম ৯৫ হিঃ ও মৃত্যু ১৭৯ হিজরী, ইমাম আহমদের জন্ম ১৬৪ হিজরী এবং মৃত্যু ২৪১ হিঃ ; ইমাম শাফেয়ীর জন্ম ১৫০ হিঃ মৃত্যু ২০৪ হিজরী,— 'একমাল'।

যাইতেছে। আল্লামা এবন আবদুল বার, তাঁহার "জামেউ বয়ানেল এলম" নামক পুস্তকে (মিসরী—৩৬) লিখিতেছেন—"ছঈদ-এবন-এবরাহিম বলেন, ওমর-এবন-আবদুল আজিজ আমাদিগকে হাদীছ সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশানুসারে আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দফতরে হাদীছ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ঐ দফতরগুলি খলিফার আদেশে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল।"

ডাক্তার স্প্রেঙ্গার ও সার উইলিয়ম মুইর* প্রমুখ লেখকগণ বলিতেছেন যে, 'মোহাম্মদের প্রায় এক শত বৎসর পর, খলিফা ওমর-এবন-আবদুল আজিজ, সরকারী ভাবে হাদীছ সঙ্কলনের আদেশ প্রচার করেন। তিনি আবু বকর-এবন-মোহাম্মদকে এই কার্যের জন্য নিযুক্ত করেন, ১২০ হিজরীতে আবু বকরের মৃত্যু হয়।' এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, খলিফা ২য় ওমর, কেবল আবু বকর-এবন-মোহাম্মদকে নিযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ছঈদ-এবন-এবরাহিম (মৃত্যু ১২৫ হিঃ) প্রভৃতি বহু মোহাদ্দেছকেই এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আবু বকরকে, বিশেষ করিয়া। বিবি আয়েশার প্রতিপালিতা—আবদুর-রহমানের কন্যা। আমরার হাদীছগুলি লিখিয়া লইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। মহাত্মা ওমর, ছঈদ-এবন-মোছাইয়েব ও অন্যান্য হাদীছজ্ঞ ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের সমস্ত হাদীছ সঙ্কলন করার চেষ্টা করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, মাত্র দুই বৎসর কয় মাস খেলাফতের পর এই ধর্মপ্রাণ খলিফা ইন্তেকাল করেন। যাহা হউক, তাঁহার সময়ই যে হাদীছের বহু দফতর লিখিত হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্বে মোহাদ্দেছ-প্রবর ছঈদ-এবন-এবরাহিমের সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছি। আবু বকর ও ছঈদের মৃত্যুর সন তারিখের উল্লেখ করা এখানে অনাবশ্যক। খলিফা ২য় ওমরের জীবনে যখন হাদীছের বহু দফতর সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে, হিজরী ১ম শতাব্দীর শেষ বৎসর বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম বৎসরে ঐ পুস্তকগুলির সঙ্কলন কার্য শেষ হইয়াছিল। কারণ খলিফার মৃত্যু হইয়াছে হিজরী ১০১ সালে।

এবন-ছাআদ (মৃত্যু ২৩০ হিজরী) তাঁহার তাবাকাতে, এবনে-শেহাব-জোহরী সম্বন্ধে যে অধ্যায় লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, এমাম জোহরী ও ছালেহ-এবন-কাইছান, হযরতের ও ছাহাবাগণের সমস্ত হাদীছ ও ছোনান লিখিয়া লইতেন। খলিফা অলিদ নিহত হওয়ার পর দেখা গেল যে,—

فاذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائنه يقول من علم الزهرى

অর্থাৎ—"সরকারী কোষাগার হইতে বহু পশুপৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া জোহরীর পুস্তকগুলি স্থানান্তরিত করা হইতেছে।"** এমাম জোহরী ১২৪ হিজরীতে এবং অলিদ ৯৬ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। হাফেজ এবনে-হাজর বলিতেছেন ঃ

واول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على رأس المائة
بامر عمر بن العبد العزيز ثم كثر التدوين ثم التصنيف -

অর্থাৎ—"ওমর-এবন-আবদুল আজিজের আদেশ মতে, এবনে-শেহাব জোহরী ১ম শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথম হাদীছ সঙ্কলন করেন। তাহার পর হাদীছ সঙ্কলন ও তৎসম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়নের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়।" (ফৎহুল বারী ১—১০৬ পৃঃ)।

সুতরাং এই সময়ের পূর্বে যে কতকগুলি হাদীছ পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হয়, তাহাতে আর

---

* মুইর ভূমিকা ১—২৮, স্প্রেঙ্গার ৬৭ পৃষ্ঠা।

** ২—২, ২৬ ও ১৩৬ পৃষ্ঠা।

সন্দেহ নাই। ঐ পুস্তকগুলি যে সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত হয় নাই, এবং নিয়ম কানুনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া প্রকৃত হাদীছ, ছাহাবিগণের মতামত ও খলিফা চতুষ্টয়ের ফৎওয়া ইত্যাদি—সমস্তই যে ঐ সকল দফতরে সঙ্কলিত হইয়াছিল, উল্লিখিত পুস্তক সমূহে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই কারণে, দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগের মোহাদ্দেছগণ উহার হু-বহু নকল না করিয়া, সেগুলির যাচাই-বাছাই করিয়া সুশৃঙ্খলা সহকারে নিজেদের পুস্তকে সাজাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য জোহরী প্রভৃতি পূর্ববর্তী হাদীছজ্ঞ আলেমগণের নিকট হইতে তাঁহারা যে সকল হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বরাত দিয়াই তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে তাঁহারা তৎকালীন খলিফা নামধারী রাজাদের কোষাগারে সংরক্ষিত মুসাবিদাগুলির উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত মোহাদ্দেছগণের অথবা তাঁহাদের শিষ্যগণের নিকট হইতে ঐ সকল হাদীছের রেওয়ায়ৎ গ্রহণ করিয়া হাদীছ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জন্য ঐ সকল পুস্তকের অস্তিত্বের প্রমাণ বা তাহার বরাতের উল্লেখ পরবর্তী গ্রন্থকারগণের বিভিন্ন পুস্তকে খুব কমই দেখা যায়।

আবদুল্লাহ্ (ইবনে-আমর-এবন-আছ) নিজ হস্তে সমস্ত হাদীছ লিখিয়া রাখিতেন। বোখারী, আবু-দাউদ, আহমদ, বাইহাকী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থের বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু-হোরায়রা নিজ হস্তে না লিখিলেও—তিনি লিখিতে জানিতেন না—অন্যের দ্বারা বহু হাদীছ লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন।*

فارانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو مكتوب

عندي (ايضا ص ١٠٥)

আবু-হোরায়রা তাঁহার গৃহে আমাদিগকে কতকগুলি কেতাব দেখাইলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ তাহাতে সঙ্কলিত ছিল। (এই সকল পুস্তক দেখাইয়া) তিনি বলিলেন, ইহা আমার নিকট লিখিত অবস্থায় আছে।**

এই সকল আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, হযরতের জীবিতকালে ও তাঁহার আদেশক্রমে, এবং তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার ছাহাবিগণের সময়ে ও তাবেয়ীদিগের যুগে হাদীছ লিখিয়া রাখার যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

## মাউজু'আৎ বা প্রক্ষিপ্ত সঙ্কলন

কালক্রমে নানা কারণে মিথ্যা হাদীছের প্রচলন আরম্ভ হইলে মোহাদ্দেছগণ*** জাল, ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও 'মাউজু' হাদীছ যাচাই করার জন্য অশেষ অধ্যবসায় সহকারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা বহু অনুসন্ধানের ফলে তৎকালে প্রচলিত বহু ভিত্তিহীন ও 'মাউজু', হাদীছ বাছিয়া বাহির করেন, সেগুলি কালক্রমে পুস্তক আকারে সঙ্কলিত হইতে থাকে, এবং অল্প দিন পরে ইহাও এছলাম সংক্রান্ত একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও প্রক্ষিপ্ত

---

* আবু-হোরায়রা হইতে ৫৩৭৪ ও আবদুল্লাহ্ হইতে ৭০০ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আবদুল্লাহেল্‌বাকী কর্তৃক "ছাহাবাগণের সংখ্যা ও বিভাগ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (আল-এছলাম, ১৩২২, ১৬ ও ৬৫ পৃষ্ঠা)। আবদুল্লাহ্ সিরিয়া গমন করিলে ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের বহু প্রাচীন গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হয়, তিনি তাহা দেখিয়া অনেক রেওয়ায়াৎ বর্ণনা করিতেন, এ জন্য বহু তাবেয়ী এমাম তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন। ফৎহুল বারী ১—১০৫।

** দেখ, ফৎহুল বারী ১—১০৫-৬ পৃষ্ঠা।

*** প্রধানতঃ মোকাদ্দামা বা ভূমিকা ভাগে।

হাদীছগুলি প্রচলিত হওয়ার কারণ, 'মাউজু' হাদীছ চিনিয়া লইবার মোটামুটি লক্ষণ এবং সূক্ষ্ম আইন কানুনও তাঁহারা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এমাম এবনুল মদিনী, এবনে জাউজী, মাক্‌দেছী, এবনে-তায়মিয়াহ, মোল্লা মোহাম্মদ তাহের, শওকানী ও মোল্লা আলী কারী প্রভৃতি বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি এ সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের সাহায্যে আমরা অতি সহজে অনেক "মাউজু" ও বাতিল (প্রক্ষিপ্ত ও ভিত্তিহীন) হাদীছের সন্ধান পাইতে পারি। দুঃখের বিষয়, এই সকল পুস্তক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, আজ বহু মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হাদীছ মাউলুদ ও ওয়াজের মজলিছে বিনা ওজর আপত্তিতে চলিয়া যাইতেছে। কেবল চলিয়া যাইতেছে নহে, বরং উহাই আজ মুছলমানের দীন-ঈমান।

## ওছুলে হাদীছ

নানা দিক দিয়া হাদীছের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা, তাহার শ্রেণীবিভাগ, গুরুত্বের তারতম্য নির্ণয়, অর্থ নির্ধারণ, ইত্যাদি বহু আবশ্যকীয় বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ মোহাদ্দেছগণ কতকগুলি আইন-কানুন নির্ধারণ করিয়া যান। পরবর্তী যুগের মোহাদ্দেছগণ, নানাবিধ দার্শনিক আলোচনা ও তর্কবিতর্কের দ্বারা সেগুলির বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকগুলি "ওছুলে হাদীছ" (Principles of Islamic Tradition) নামে পরিচিত। বর্তমানে হাদীছের গুরুত্বের ন্যায় 'ওছুলে হাদীছের' গুরুত্বও অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা অনেক অধিক। এ সম্বন্ধে এমাম ছাখাভী কর্তৃক 'আলফিয়াতুল হাদীছ' (সহস্রপদী কবিতা), হাফেজ জায়নুদ্দিন এরাকী কর্তৃক 'ফৎহুল মুগিছ' নামক তাহার টীকা, শায়খুল এছলাম তাকিউদ্দিন-এবনে ছালাহ রচিত 'মোকদ্দামা', হাফেজ এবনে হাজর প্রণীত 'নোখবাতুল ফিকর' ও তাহার টীকা, শাহ আবদুল আজীজ প্রণীত 'ওজালায়ে নাফেআ' ও 'বোস্তানুল মোহাদ্দেছিন' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বহু বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থের ভূমিকায় ও তাহার টীকায় 'ওছুলে-হাদীছ' সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান আলোচনা সন্নিবেশিত আছে। উদাহরণস্থলে 'ফৎহুল বারীর' ভূমিকার উল্লেখ বিশেষভাবে করা যাইতে পারে।

আমরা পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে হাদীছের শ্রেণী-বিভাগ, বিশেষ পরিভাষা, হাদীছের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতার কারণ, হাদীছ পরীক্ষার পূর্বাপর প্রচলিত ধারা ইত্যাদি কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় যতদূর সম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করিব। অবশ্য, ইহাতে আলোচনার বিস্তার আরও বাড়িয়া যাইবে, এবং হয়ত ইহা এক শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই আলোচনাগুলি পাঠ করিতে তাঁহাদের যতটা সময় ও শ্রম ব্যয়িত হইবে, উহার সঙ্কলনের জন্য এ অধমকে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সময় ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। মুইর, স্প্রেঙ্গার, মারগোলিয়থ প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণের কল্যাণে আজকাল ঐ বিষয়গুলি আরবী-অনভিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট বহু প্রকারে বিকৃত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। খৃষ্টান লেখকগণ তর্ক-যুদ্ধে মুছলমানদিগকে পরাজিত করার জন্য পাদরী মহাশয়দিগের হস্তের এক একখানা অস্ত্রস্বরূপ এই পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যত প্রকার কারিকুরি ও কারচুপি করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তাঁহারা তাহা করিতে ত্রুটী করেন নাই। এই কারণেও ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা মুছলমান লেখকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ওছুল ও মাউজুয়াত সংক্রান্ত দর্শন ও দার্শনিক ইতিবৃত্ত, পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত ও বৃত্তান্ত-ঘটিত সাক্ষ্য মাত্র। সুতরাং তাহার প্রত্যেক ধারা ও প্রত্যেক কথাই যে আমাদিগকে চোখ বুজিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ বাধ্যতার কোনই কারণ

নাই। যুক্তি প্রমাণের দ্বারা তাহার কোন একটা নিয়ম বা বিবরণ যদি ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে এছলামের শিক্ষা এবং পূর্ববর্তী আলেমগণের অবলম্বিত "ওছুল" অনুসারে, আমরা সেই সকল নিয়ম বা বিবরণের খণ্ডন ও প্রতিবাদ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। মনে কর, একজন খুব বড় মোহাদ্দেছ ওছুলের কেতাবে লিখিতেছেন, "ইমাম চতুষ্টয়ের রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে ইমাম মালেকের 'মোওয়াত্তা' ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক বিদ্যমান নাই।"* আমরা চোখ বুজিয়া এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিব না চোখ মেলিয়া টেবিলের উপরিস্থিত ইমাম শাফেয়ীর 'মোছনাদ', 'কেতাবুল-উম', ওছুল সংক্রান্ত রেছালা رسالة في اصول الفقه —ইমাম আহমদের বিরাট 'মোছনাদ', ইমাম আবু-হানিফার 'ফেকহে আকবর' প্রভৃতির অস্তিত্ব দর্শন করিব ? যদি কোন রেজাল শাস্ত্রকার বলেন যে—"ইমাম মালেক হিজরী ৯৫ সনে জন্মিয়া ১৭৯ সালে পরলোকগমন করিয়াছিলেন, ৮৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়"** তাহা হইলে গণিতের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে পদদলিত করিয়া গ্রন্থকারের এই মন্তব্যটা চোখ বুজিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া কি আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত হইবে ?

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## পরীক্ষার নূতন ধারা

### মূলে ভুল

আমাদের প্রাথমিক ও মধ্য যুগের অধিকাংশ হাদীছ-বিশারদ আলেমের পুস্তক পুস্তিকা ও বিভিন্ন আলোচনা পাঠ করিলে, সাধারণতঃ মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া পড়ে যে, তাঁহারা হাদীছের 'ছনদ' পরীক্ষার বা Textual Criticism-এর প্রতি যতটা তীব্র ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রদান করিয়াছিলেন, দার্শনিক ভাবে হাদীছের সূক্ষ্ম সমালোচনা বা Higher Criticism-এর দিকে সাধারণতঃ তাঁহাদের ততটা আগ্রহ ছিল না। 'ছনদ' সম্বন্ধে যাহা দেখা শোনার দরকার, তাহা দেখা শোনা হইয়া গেলেই, অনেকেই যেন সেই হাদীছটাকে সম্পূর্ণ সত্য ও সর্বতোভাবে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতেন। তাহার পর, যাঁহারা আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইয়া সূক্ষ্ম সমলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সে আলোচনাও প্রধানতঃ সেই সকল হাদীছে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে, যে সকল হাদীছ দ্বারা শরিয়তের কোন হুকুম বা আকিদা*** প্রমাণিত হইতে পারে। তাঁহাদের বিবেচনায় কেবল এই শ্রেণীর হাদীছ সম্বন্ধে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা আবশ্যক—পক্ষান্তরে, ইতিহাস, ফজিলৎ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে, জঈফ বা দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করা অসঙ্গত নহে। এই অবহেলা ও উপেক্ষার জন্য আমরা প্রায়ই অনুযোগ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, পূর্ববর্তী আলেম সমাজ মনে করিতেন যে, ইতিহাস ও তফছির প্রভৃতি পুস্তকে বর্ণিত ঐ সকল রেওয়ায়াৎ দ্বারা ধর্মের অনুষ্ঠান বা বিশ্বাসের কোন প্রকার ইতর বিশেষ বা ক্ষতিবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই তাঁহারা সে দিকে মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন নাই। ইহার আরও কারণ আছে, আমরা তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

---

* 'বোস্তানুল-মোহাদ্দেছিন', শাহ আবদুল আজিজ।

** একমাল।

*** যেমন এই কাজ করা ফরজ, এই কাজ করা হারাম, এই প্রকার হুকুম—অথবা হযরত শেষ নবী, কিয়ামতে মানুষকে কর্মফল ভোগ করিতে হইবে,—এই শ্রেণীর বিশ্বাস।

## সূক্ষ্ম সমালোচনা—আবশ্যকীয় ধারা

এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় ঃ—রেওয়ায়তের হিসাবে হাদীছ 'ছহী' বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, যদি হাদীছের ছনদে বা মতনে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ থাকে, যাহা দ্বারা হাদীছটির অবিশ্বাস্যতা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে সেই হাদীছের ছনদটি নির্দোষ আছে বলিয়া আমরা হাদীছটাকে বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে পারিব না। এমন কি, প্রমাণ যথেষ্ট হইলে, আমরা ঐরূপ ছহী ছনদের হাদীছকেও অগ্রাহ্য করিব।

## দাবী ও প্রমাণ

এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমরা একটা অসমসাহসিকতার কাজ করিয়া বসিয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল মোস্তফা-চরিতের আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকার পর, এক্ষেত্রে কপট বা মোনাফেক সাজিয়া সত্য গোপন করাও এই দীন লেখকের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। আশা করি, বিজ্ঞ পাঠকগণ এই অধ্যায়টির শেষ পর্যন্ত না পড়িয়া কোন একটা অভিমত গঠন করিয়া লইবেন না।

আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রত্যেক হাদীছ গ্রন্থে বহু সংখ্যায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য গ্রন্থের হাদীছ গ্রহণ না করিয়া, কেবল সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ছহী বোখারী ও ছহী মোছলেম হইতে কতকগুলি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই হাদীছগুলির ছনদ ছহী হওয়া সম্বন্ধে কোন তর্কই নাই—কারণ এগুলি বোখারী ও মোছলেমের হাদীছ। আমরা এখন দেখাইব—ছনদ ছহী হওয়া সত্ত্বেও ঐ হাদীছগুলি নির্দোষ, প্রকৃত ও সত্য হাদীছ বলিয়া কোনমতেই গৃহীত হইতে পারে না।

## প্রথম প্রমাণ

বোখারী ও মোছলেমে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। মোছলেমের হাদীছটি স্পষ্টতর হওয়ায়, আমরা উহা হইতে সেই হাদীছটির মর্মানুবাদ করিয়া দিতেছি। আনাছ বলিতেছেন ঃ

يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الاية

অর্থাৎ—"হে মোমেনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর আপনাদের স্বর (ঊর্ধ্বে) চড়াইও না"—এই আয়তটি নাজেল হইলে ছাবেত-এবন-কায়েছ নামক জনৈক ছাহাবীর খুব ভয় হইল—কারণ তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ খুব উচ্চ ছিল। এই জন্য তিনি আর হযরতের খেদমতে উপস্থিত না হইয়া বাটীতে বসিয়া থাকেন। কয়েক দিন এই ভাবে অতীত হইয়া যাওয়ার পর, হযরত রছুলে করীম ছাআদ-এবন-মাআজ নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ছাবেতকে দেখি না কেন, তাঁহার কি অসুখ হইয়াছে ?" ছাআদ-এবন-মাআজ তখন হযরতকে বলিয়া ছাবেতের অবস্থা জানিতে তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। ছাবেতের সহিত ছাআদের সাক্ষাৎকার ঘটিল, কথাবার্তা হইল এবং ছাআদ ছাবেতকে হযরতের প্রশ্নের কথা জানাইলেন। ছাবেত নিজের কণ্ঠস্বর ও সদ্য-অবতীর্ণ আয়াতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আমি নরকগামী হইব।' ছাবেতের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ছাআদ পুনরায় তাহা হযরতকে জ্ঞাপন করিলে হযরত ছাবেতকে অভয় প্রদান করেন। [বোখারী ১৪শ খণ্ড ৩১৮, ৩৬৪ ও মোছলেম (মেশকাত) ৫৭৬ পৃষ্ঠা]

এই হাদীছটি কখনই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ ঃ—

(ক) এই আয়াতটি হিজরীর নবম সনে (যে বৎসর হযরতের নিকট বিভিন্ন স্থান

হইতে প্রতিনিধি-সংঘ Deputation প্রেরিত হইয়াছিল। আকবা প্রভৃতি সম্বন্ধে নাজেল হয়। এই সকল বিষয়ে সকলেই এক মত। (দেখ, বোখারী ও ফৎহুল বারী, তফছির অধ্যায়, ২০ খণ্ড ৩৩৮ পৃষ্ঠা।)

(খ) ছাআদ-এবন-মাআজ পরিখার যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া বানি কোরেজা যুদ্ধের কয়েক দিন পরে, হিজরী পঞ্চম সনের জিকা'দা মাসে শাহাদৎ প্রাপ্ত হন, ইহাও অবিসংবাদিত সত্য (দেখ, বোখারী, মোছলেম, এছাবা, (৩) ১৯৭, তাজরিদ (২) ১৮৫, একমাল—প্রভৃতি)।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, এই আয়তটি নাজেল হওয়ার চারি বৎসর পূর্বে ছাআদের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং নবম হিজরীতে হযরতের ও ছাবেতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ইত্যাদির বিবরণ মিথ্যা বা ভুল। অতএব এই হাদীছটি রেওয়ায়তের বা ছনদের হিসাবে ছহী হইলেও, ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদের সকলকে উহার ভ্রম স্বীকার করিতে হইতেছে।

## দ্বিতীয় প্রমাণ

আনাছ, আয়েশা ও এবনে আব্বাছ বলিতেছেন ঃ—'হযরত ৪০ বৎসর বয়সে নবী হইয়া, ১০ বৎসর মক্কায় অবস্থান করিয়া হেজরত করেন ; এবং মদিনায় আর দশ বৎসর অবস্থান করার পর, নবুয়তের ২০শ সনে, ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। (বোখারী ১৮—১০৯, মোছলেম ২—২৬০ পৃষ্ঠা।)

হযরতের ২০ বৎসর নবুয়ত, মক্কায় ১০ বৎসর অবস্থান এবং ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন—এই তিন কথাই ভুল। তিনি মক্কায় ১৩ বৎসর অবস্থান করিয়া হেজরত করেন, এবং ২৩ বৎসর নবী-জীবন অতিবাহিত করার পরে, ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। বোখারী ও মোছলেমের কথিত রাবিগণ কর্তৃকই ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে অধিক প্রমাণের আবশ্যক নাই। কারণ বোখারী ও মোছলেমে বর্ণিত এই দুইটি পরস্পর বিপরীত বিবরণের উভয়ই যে সত্য হইতে পারে না—সুতরাং একটা বিবরণ যে ভুল—তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি—হাদীছের ছনদ ছহী, অথচ হাদীছটি অগ্রাহ্য।

## তৃতীয় প্রমাণ

আকাবার বায়আৎ গ্রহণের কথা পাঠকগণ যথাস্থানে অবগত হইবেন। এই প্রসঙ্গে বোখারীতে জাবের-এবন-আবদুল্লাহ্ কর্তৃক একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ হাদীছে প্রকাশ—জাবের স্বীয় মাতুল বারা-এবন-মারূরের সঙ্গে ঐ বায়আতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (বোখারী ১৫—৪৬৪) কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বারা জাবেরের মাতুলই নহেন। জাবেরের মাতা আনিছার মাত্র দুই ভ্রাতা—ছা'লাবা ও আমর ; ইহারা ২য় আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। (ফৎহুল্ বারী, ঐ ঐ) সুতরাং এখানে হাদীছে যে একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে অন্ততঃ একটা কিছু 'তাবিল' করিতেই হইবে।

## চতুর্থ প্রমাণ

বোখারীতে বিবি আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ঃ— হযরতের কয়েকজন স্ত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পরলোক গমনের পর সর্ব প্রথমে আপনার কোন স্ত্রীর মৃত্যু হইবে ?" হযরত উত্তর করিলেন—"তোমাদের মধ্যে যাঁহার হাত সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ, তাঁহার।" এই কথা শুনিয়া হযরতের স্ত্রীগণ একটা মাপকাঠি লইয়া নিজেদের হাত মাপিয়া দেখিলেন—বিবি ছওদার হাত সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। বিবি আয়েশা বলিতেছেন ঃ—"অতঃপর আমরা জানিতে পারি যে, দান-ছাদকা করার জন্য তাঁহার হাত দীর্ঘ হইয়াছে। আমাদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথমে এন্তেকাল করেন।" (বোখারী ১—১৯১ পৃষ্ঠা।)

এই হাদীছ হইতে জানা যায় যে, হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁহার স্ত্রীদিগের মধ্যে সর্ব প্রথমে বিবি ছওদার মৃত্যু হওয়ার কথা। কিন্তু তাহা হয় নাই। বিবি ছওদার কতদিন পূর্বে বিবি জয়নাবই সর্ব প্রথমে এন্তেকাল করেন। অতএব এই হাদীছটাকে যথাযথ ভাবে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই হাদীছের বর্ণনায় রাবিগণের মধ্যে কেহ যে এই গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতেই হইবে। এই রেওয়ায়তটি ছহী মোছলেমে আছে। হাওয়ালা দিতে হইবে।। তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে যে, বিবি জয়নাবের হাত সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ছিল, এবং তিনিই সর্ব প্রথম এন্তেকাল করেন। অবশ্য, একদল লোক এই হাদীছে নানা প্রকার উহ্য ও গুহ্য কল্পনা করিয়া, বোখারী-বিদ্বেষিগণের সংশয় অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল কূটতর্ক আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা দেখাইতেছি,—বোখারীতে হাদীছটি যেমন ভাবে আছে, এবং যেমন ভাবে অন্যান্য হাদীছের সোজাসুজি অর্থ করা হয়—এই হাদীছটির সেরূপ অর্থ খাটে না। এই জন্য মোহাদ্দেছ এবনে-বাত্তাল এই হাদীছটাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবনে-জাওজী বলেন—'ইহা রাবী বিশেষের ভ্রম মাত্র।' আশ্চর্যের বিষয়, এই ভ্রম বোখারীতে চলিয়া গিয়াছে। খত্তাবী প্রভৃতিও এই ভ্রম ধরিতে পারেন নাই, খুব আশ্চর্যের কথা বটে। তিনি (খাত্তাবী—বোখারীর হাদীছের সমর্থনে) বলিতেছেন—ছাওদার মৃত্যু হযরতের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা তথা নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ! (আইনী ও ফৎহুল বারী—ঐ হাদীছের টীকা দেখ।)

## পঞ্চম প্রমাণ

হযরত যে উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন, কোরআন হইতেই তাহা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে। (ছুরা আরাফ, ১৯ রুকু, ১৫৭ আয়ৎ, জুমোআ ২য় আয়ৎ, ইত্যাদি। হযরত যে লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, ছুরা আনকাবুতের ৪৮ আয়তে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গে বোখারীতে বারা নামক ছাহাবী কর্তৃক যে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, আলীর হস্ত হইতে সন্ধিপত্র গ্রহণ করিয়া হযরত নিজেই তাহা লিখিয়াছিলেন। (১৭—২২)

হাফেজ এবনে হাজর সহজে রেওয়ায়তের মায়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। এই মায়ামোহে হযরত কর্তৃক বোৎপূজার হাদীছটাকেও তিনি 'সম্বন্ধ' প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এখানেও তিনি রেওয়ায়তটাকে বজায় রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। হাদীছে আছে :— হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখার ভার প্রথমে হযরত আলীর উপরে পড়ে। তিনি লিখিলেন, 'মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহর সহিত আমরা এই মর্মে সন্ধি করিলাম যে—" কোরেশগণ 'রছুলুল্লাহ' শব্দে আপত্তি করিয়া বলিল, 'আমরা ত তোমাকে আল্লাহর রছুল বলিয়া স্বীকারই করি না। আমরা ত তোমাকে আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ বলিয়া জানি, তাহাই লেখ।' হযরত তখন লেখক আলীকে বলিলেন :—"বেশ কথা, "মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ" এই অংশটা কাটিয়া দিয়া "মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ" লিখিয়া দাও।" লেখক তরুণ যুবক, ঈমানের তেজে দৃপ্ত। তিনি বলিলেন—"ও কথা আমি কাটিতে পারিব না, ক্ষমা করিবেন।" তখন আলীর হস্ত হইতে সন্ধিপত্র গ্রহণ করিয়া, হযরত তাহাতে স্বহস্তে লিখিলেন—তিনি ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন না।

হাফেজ এবনে হাজর বলিতেছেন,—ইহাতে দোষ কি? অনেক স্থলে বলা হইয়াছে, হযরত কায়ছারকে পত্র লিখিলেন। হাদীছের মতলব এই যে, হযরত, আলীর হস্ত হইতে সন্ধিপত্রখানা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া কোরেশদিগের আপত্তিজনক অংশটা কাটিয়া দিয়া, আবার তাহা আলীকে ফিরাইয়া

দিলেন এবং আলী। লিখিলেন। অর্থাৎ বক্তনীর ভিতরকার অংশটা উহ্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এই প্রকার উহ্য মানিয়া হাদীছের মতলব করা যদি বৈধ হয়, তাহা হইলে হাদীছের যদৃচ্ছা ব্যাখ্যা করা খুব সহজ হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার পর, লেখকের মূল যুক্তিটি যে কতদূর দুর্বল এবং বর্তমান ঘটনার সহিত কতদূর অসমঞ্জস, তাহাও সহজেই বোধগম্য। "হযরত কায়ছারকে পত্র লিখিয়াছিলেন"—বলিলে, তিনি যে নিশ্চিত স্বহস্তে লিখিয়াছেন, ইহা মনে করা যায় না; প্রথমতঃ রাজকীয় চিঠি-পত্রের ধারাই এইরূপ। দ্বিতীয়তঃ হযরতের চিঠি-পত্র লিখিয়া দিবার ভার বিশেষ বিশেষ ছাহাবীর উপর ন্যস্ত ছিল, ইহা সর্বজন-বিদিত। তৃতীয়তঃ হযরত যে লিখিতে জানেন না—সাধারণভাবে ইহা মুছলমানদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। এ অবস্থায় হযরত কায়ছারকে পত্র লিখিলেন বলিলে সহজেই ধারণা হইবে যে, সরকারী লেখকগণ তাঁহার পক্ষ হইতে লিখিলেন। কিন্তু এখানে হাদীছে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আলীর নিকট হইতে সন্ধিপত্র গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে তাহা লিখিয়া দিলেন। তিনি যে উত্তমরূপে লিখিতে পারিতেন না, এ কথাও হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এ অবস্থায় উদ্ধৃত নজিরের সহিত এই হাদীছের যে একবিন্দুও সামঞ্জস্য নাই, তাহা সহজেই জানা যাইতেছে, অতএব আমরা দেখিলাম যে, বোখারীর এই হাদীছটি কোরআনের স্পষ্ট সিদ্ধান্তের ও সর্ববাদিসম্মত ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত, সুতরাং ছনদ ছহী হওয়া সত্ত্বেও উহা অগ্রাহ্য।

## ষষ্ঠ প্রমাণ

বোখারীতে হযরত আলী কর্তৃক একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ,—বদর সমরে যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া হযরত বলিয়াছেন—

اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة

অর্থাৎ—'তোমরা যাহা ইচ্ছা করিয়া যাও, ( তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না ) তোমাদের জন্য বেহেশত নিশ্চিত।' ( ১৬ খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা )। ইহা এছলামের সমস্ত শিক্ষার বিপরীত কথা। কোরআনে হযরত সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাপ করিলে তাঁহাকেও তাহার কঠোর ফল ভোগ করিতে হইবে। উপরোক্ত এই হাদীছকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত বদরীদিগকে যদৃচ্ছা পাপাচরণ করিবার 'আম' হুকুম দিয়াছেন ইহা অন্যায়, অসঙ্গত ও অনৈছলামিক কথা। হযরত ঐরূপ কথা বলিয়াছেন বা বলিতে পারেন এক মুহূর্তের জন্য আমরা ইহা মনে ধারণাও করিতে পারি না। সুতরাং বলিব, হাদীছে রাবিগণের বর্ণনায় ভুল আছে।

## সপ্তম প্রমাণ

ইমাম বোখারী মোস্তালেক সমর সংক্রান্ত অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলিতেছেন ঃ

وقال موسى بن عقبة سنة اربع

অর্থাৎ—'মুছা-বেন ওকবা বলেন—ঐ যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুছা-বেন-ওকবা ৪র্থ সনের কথা না বলিয়া ৫ম সনের কথা বলিয়াছেন (১৬—১৭)। ইহা নিশ্চয়ই কলমের ভুল; বোখারীতে লিখিত প্রত্যেক বাক্যই যে নির্ভুল নহে, ইহাই এখানে প্রতিপাদ্য

## অষ্টম প্রমাণ

ঐরূপ আর একটি উদাহরণ দিতেছি। বীরমাউনার ঘটনা উপলক্ষে ইমাম বোখারী আনছ

হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে 'হারাম'কে وهو رجل اعرج 'এবং তিনি জনৈক খঞ্জ ব্যক্তি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খঞ্জ কা'ব-এবন-জায়েদ নামক অন্য এক ব্যক্তি। এবারৎ এইরূপ হইবে—فانطلق حرام هو ورجل اعرج—এই বিশৃঙ্খলার জন্য ঐ ব্যাপার লইয়া যে গোলযোগ ঘটিয়াছে, পাঠকগণ যথাস্থানে তাহার পরিচয় পাইবেন। অবশ্য ইহাও লেখার ভুল।

## নবম প্রমাণ

নবুয়তের প্রাথমিক অবস্থায় অহি নাজেল হওয়ার সময় হযরত কোর্‌আনের আয়তগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র স্মরণ করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি মুখ ও জিহ্বা নাড়িতেন, অর্থাৎ মনে মনে সেগুলির আবৃত্তি করিতেন। ছুরা কিয়ামতের لا تحرك به لسانك لتعجل به আয়তে তাঁহাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করা হয়। বোখারীর হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, এবনে আব্বাছ এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করার সময়, হযরত কিরূপে মুখ নাড়িতেন, নিজে মুখ নাড়িয়া শ্রোতাকে তাহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন; ছইদ-এবনে-জোবের এবনে আব্বাছের এই মুখ নাড়া দেখিয়া অন্যান্য লোকদিগকে তাহা প্রদর্শন করেন। অন্য এক রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে—

قال ابن عباس فانا احرك شفتي كما كان رسول الله صلعم يحركهما

অর্থাৎ—'এবনে আব্বাছ কহিলেন,—হযরত যেরূপ ঠোঁট নাড়িতেন, আমি তোমাদিগকে সেইরূপ নাড়িয়া দেখাইতেছি।' (১—১৬)।

মোহাদ্দেছ আবু দাউদ তায়ালছীর মোছনাদে এই আবু-ওয়ানার রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে—

قال ابن عباس فانا احرك لك شفتي كما رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم

অর্থাৎ—'এবনে আব্বাছ বলিতেছেন, আমি হযরতকে যেরূপ ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছি, তোমাকে সেইরূপে নাড়িয়া দেখাইতেছি।' (ফৎহুল বারী, তাফছির-কিয়ামৎ)।

এই সকল হাদীছের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ছুরা কিয়ামতের এই আয়ত নাজেল হইবার পূর্বে—যখন স্মরণ করিয়া লইবার জন্য হযরত মুখ নাড়িতেন—এবনে আব্বাছ সে সময় হযরতকে সেই অবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ, ছুরা কিয়ামত নবুয়তের প্রাথমিক অবস্থায় মক্কায় নাজেল হইয়াছিল, সে সময় এবনে আব্বাছের জন্মই হয় নাই। হিজরীর ৩ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ নবুয়তের ১০ম সনে—এই ছুরা অবতীর্ণ হওয়ার কয়েক বৎসর পরে—তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।* তাঁহার পিতা আব্বাছ ইহার বহু দিন পরে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব, কোর্‌আন নাজেল হওয়ার সময় হযরতের 'ঠোঁট নাড়া' দর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, ছনদের হিসাবে ছহী হওয়া সত্ত্বেও যুক্তির হিসাবে তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে।

## দশম প্রমাণ

বোখারী ও মোছলেমে আনাছের প্রমুখাৎ একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ :—হযরত একদা আবদুল্লাহ-এবন-উবাই মোনাফেকের নিকট উপস্থিত হইলে, আবদুল্লাহ তাঁহার সহিত বেআদবী করে। ফলে, আবদুল্লাহর লোকজনদিগের সহিত

* এছাবা, তাজরিদ প্রভৃতি।

উপস্থিত মুছলমানগণের খুব ঝগড়া মারামারি বাধিয়া যায়। সেই সময় ছুরা হোজরাতের নিম্নলিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :—

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما

অর্থাৎ—"মোমেনদিগের দুই দল যদি পরস্পর লড়াই ঝগড়া করিতে থাকে, তবে তোমরা তাহাদিগের মধ্যে সন্ধি করিয়া দাও।" এই আয়াত নাজেল হইলে, হযরত তাহা সকলকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন, এবং তাহাতেই মারামারি বন্ধ হইয়া গেল।

বোখারী ও মোছলেমে ওছামার যে বর্ণনা আছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, তখনও আবদুল্লাহ (বাহ্যিকভাবে) এছলাম গ্রহণ করে নাই, অথচ আয়তে বলা হইতেছে—দুই দল মুছলমানের কলহ-বিবাদ মিটাইবার কথা। আবদুল্লাহ ও তাহার দলের লোকেরা এই আয়ত নাজেল হওয়ার সময় মুছলমানই হয় নাই। সুতরাং আলোচ্য ঘটনা উপলক্ষে এই আয়তটি নাজেল হইয়াছিল বলিয়া কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না।

নমুনা স্বরূপ আমরা এই কয়টি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে এই প্রকার আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল উদাহরণ দ্বারা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, রেওয়ায়ৎ ছহী হইলেই যে হাদীছ ছহী হইবে, এমন কোন কথাই নাই।*

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### রেওয়ায়ৎ ও দেরায়ৎ

### দেরায়ৎ আধুনিক আবিষ্কার নহে

পূর্বে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা জানা যাইবে যে, হাদীছের সাক্ষী-পরম্পরা বা ছনদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করার পর, আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বা অন্য কোন প্রকার অকাট্য প্রমাণের দ্বারা যদি সেই হাদীছের অপ্রামাণিকতা বা ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে ছনদ ছহী হওয়া সত্ত্বেও সেই হাদীছকে অগ্রাহ্য করা হইবে। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণ এবং সূক্ষ্ম সমালোচনা দ্বারা হাদীছের এই প্রকার দোষ-ত্রুটীর আবিষ্কারকে 'দেরায়ৎ' বলা হইয়া থাকে। এখানে আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, রেওয়ায়ৎ অনুসারে অবিশ্বাস্য হইলে যেমন হাদীছের মর্যাদা হানি হয়, দেরায়ৎ অনুসারে অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও, ঠিক সেইরূপে তাহার গুরুত্বের খর্ব হইয়া যায়। আমাদিগের পূর্ববর্তী পণ্ডিতমণ্ডলী সাধারণভাবে দেরায়তের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান না করিলেও, [illegible] সময় হইতে মধ্যযুগের ঘনান্ধকার অব্যবহিত-পূর্বকাল পর্যন্ত, হাদীছ শাস্ত্রের [illegible] ও সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণ কেবল এই দেরায়তের হিসাবেই বহু হাদীছকে অগ্রাহ্য [illegible] গিয়াছেন, কতকগুলিকে ভিত্তিহীন, প্রক্ষিপ্ত বা 'মাউজু' ও বাতেল বলিয়া নির্ধারণ [illegible] হাদীছের 'ওছুল' ও 'মাউজু আৎ' সংক্রান্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিলে ইহার বহু [illegible] জানিতে পারা যাইবে। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটা নমুনা দিতেছি।

---

* [illegible] লোক এইরূপ দুই-একটা উদাহরণের উল্লেখ করিয়া ইমাম বোখারীর প্রতি [illegible] ইহাও কারণ, হয় অথবা না হয় বিজ্ঞের। রেওয়ায়তগুলিকে ছ বহু লিপিবদ্ধ [illegible] রেওয়ায়তের যে ত্রুটি, তাহার জন্য তাঁহা দায়ী, তিনি নহেন। রেওয়ায়ৎ [illegible] অপ্রামাণিকতা একই কথা।

## প্রথম প্রমাণ

মোল্লা আলী কারী হানাফী লিখিতেছেন :—

حديث من صلى من الفرائض فى آخر جمعة من شهر رمضان
كان ذالك جابرا لكل صلواة فائتة فى عمره الى سبعين سنة باطل
قطعا - لانه مناقض للاجماع على ان شيئا من العبادات لاتقوم
مقام فائتة سنوات - ثم لاعبرة بنقل النهاية ولا شراح الهداية
فانهم ليسوا من المحدثين ولا اسندوا الحديث الى احد من المخرجين -

(المصنوع ٢٩)

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি রমজান মাসের শেষ জুমআয় (শুক্রবারে) কোন ফরজ নামাজ পড়িবে, তাহার জীবনের গত ৭০ বৎসরে যে সমস্ত নামাজ 'কাজা' হইয়া গিয়াছে, এই এক নামাজেই সে সমস্তের ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে।" এই হাদীছটি নিশ্চয়ই বাতেল। কারণ, সর্ববাদিসম্মত অভিমত এই যে, কোন একটি এবাদৎ বহু বৎসরের পরিত্যক্ত বহু সংখ্যক এবাদতের ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না। তাহার পর, নেহায়া এবং হেদায়ার টীকাকারগণের এই হাদীছ নকল করারও কোনই মূল্য নাই। কারণ, প্রথমতঃ তাঁহারা নিজেরাও হাদীছ-বিশারদ (মোহাদ্দেছ) ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ সূত্র-পরম্পরা সহকারে কোন মোহাদ্দেছের নিকট হইতেও তাঁহারা সেই হাদীছটি রেওয়ায়েৎ করেন নাই।" (মছনূ—২৯ পৃষ্ঠা)।

মোল্লা ছাহেব এখানে ফেকহ (ফেকা) শাস্ত্রের এত বড় বড় গ্রন্থকার কর্তৃক উদ্ধৃত হাদীছটিকে যুক্তি বা রেওয়ায়েতের হিসাবে অগ্রাহ্য ও বাতিল বলিয়া দৃঢ়তার সহিত মত প্রকাশ করিতেছেন।

## দ্বিতীয় প্রমাণ

আবদুল্লাহ্ এবনে ওবাই মোনাফেক, এছলামের ভীষণ শত্রু। কোরআনে ও হাদীছে তাহার এছলাম বিদ্বেষের নানাবিধ বিবরণ বর্ণিত আছে। রাবী এবনে-ওমর বলিতেছেন :—আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র হযরতের নিকট আসিলে, হযরত তাঁহাকে নিজের বস্ত্র দিয়া, তদ্দ্বারা আবদুল্লাহর 'কাফন' দিতে আদেশ করিলেন। হযরত অতঃপর আবদুল্লাহর জানাজার নামাজ পড়ার জন্য গাত্রোত্থান করিলে, ওমর তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া বলিলেন—"হযরত, আপনি আবদুল্লাহর জানাজা পড়িতে যাইতেছেন ? সে ত মোনাফেক ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।" তখন ওমরের উত্তরে হযরত নিম্নের আয়তটি পাঠ করিলেন :—

استغفرلهم اولا تستغفرلهم ان تستغفرلهم سبعين مرة فلن

يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله - والله لا يهدى

القوم الفاسقين (توبة)

আয়তের শব্দানুবাদ ঃ—"তুমি তাহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর—যদি তুমি তাহাদের জন্য ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না, কারণ তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলের বিদ্রোহী (কাফের) হইয়াছে ; আল্লাহ্ অনাচার-রত সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (তাওবা ৯ পারা, ১৬ রুকু)।

আয়ত পাঠ শেষ করিয়া হযরত বলিলেন, এই আয়তে আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করা এই উভয়েরই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আয়তে আরও বলা হইয়াছে—"আমি ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্ শুনিবেন না, আমি তাহারও অধিকবার ক্ষমা প্রার্থনা করিব" আয়তের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া হযরত, আবদুল্লাহ-এবনে-ওবাই মোনাফেকের জানাজার নামাজ পড়াইলেন। (বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি)

এই হাদীছের মর্মানুসারে, উদ্ধৃত আয়ত হইতে হযরত এই অর্থ বুঝিয়াছিলেন যে ঃ—(ক 'ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর' এই উক্তির দ্বারা আল্লাহ্ তাঁহাকে করা না-করা উভয়ের অধিকা দিয়াছেন—নিষেধ করেন নাই। (খ) ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন না ইহার মর্ম এই যে, উহার অধিকবার (যেমন ৭১ বা ৭২ বার) ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আয়তের এই প্রকার মর্ম গ্রহণ করা, হযরতের কথা ত দূরে থাকুক, আরবী ভাষায় সামান্য ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিও নিজের পক্ষে লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করিবেন। উহার স্পষ্ট মর্ম এই যে, মোনাফেকদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা না করা উভয়ই সমান—বৃথা। তুমি ৭০ বার (অর্থাৎ বহুবার, পুনঃ পুনঃ) তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। হাফেজ এবনে হাজর এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ—

استشكل فهم التخيير من الآية حتى اقدم جماعة من الاكابر على

الطعن فى صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين

وسائر الذين اخرجوا الصحيح على تصحيحه (فتح البارى)

অর্থাৎ—"এই আয়ত হইতে 'অনুমতি'র মর্ম গ্রহণ, মহাসমস্যা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এমন কি, প্রধানতম মোহাদ্দেছগণের একদল এই কারণে—বোখারী ও মোছলেম একসঙ্গে উহার রেওয়ায়াৎ করা আর সকলেই একবাক্যে উহাকে 'ছহী' বলা এবং হাদীছটি বহু বিভিন্নসূত্রে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও—এই হাদীছটির বিশুদ্ধতার উপর আক্রমণ করিয়াছেন।"

কাজী আবু বকর বাকেল্লানী 'তকরিব' পুস্তকে, এমামুল হারামায়েন তাঁহার 'মোখতাছারে' ও 'বোরহানে', ইমাম গাজ্জালী তাঁহার 'মোস্তাছফা' নামক গ্রন্থে এবং এতদ্ব্যতীত টীকাকার দাউদী, এবনে মুনীর ও বহু গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ, 'এই হাদীছটি প্রামাণিক নহে' বলিয়া অভিমত প্রকাশ

করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "কর বা না কর" এই পদ হইতে করিবার অনুমতি সূচিত হয় বলিয়া ধারণা করা সঙ্গত নহে। তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ৭০ বলিতে নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাইতেছে না—আরবীতে উহা "বাহুল্য" জ্ঞাপনার্থে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আয়াতের মর্ম এই যে, তুমি যতবারই প্রার্থনা কর না কেন, সমস্তই বৃথা, উহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে না। তাঁহাদের তৃতীয় যুক্তি এই যে, এই ঘটনার বহু বৎসর পূর্বে, আবু তালেবের মৃত্যু উপলক্ষে নিম্নলিখিত আয়তটি অবতীর্ণ হয় ঃ—

ماكان للنبى والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولوكانوا اولى

قربى الاية - (توبة)

অর্থাৎ—"মোশরেকগণ আত্মীয় হইলেও, তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী বা মোমেনগণের পক্ষে বিধেয় নহে।" (তাওবা ২—১১) এই আয়ত বর্তমান থাকিতে, হযরতের পক্ষে আবদুল্লাহর জন্য জানাজার নামাজ পড়া বা ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব হাদীছটি অবিশ্বাস্য। (বোখারী, ফৎহুল বারী, ১৯ খণ্ড ২০৩ হইতে ২০৬ পৃষ্ঠা)।

পাঠক দেখিতেছেন—কেবল যুক্তির হিসাবে, এহেন সর্ববাদী স্বীকৃত ছহী হাদীছকেও একদল শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ অগ্রাহ্য করিয়া দিতেছেন।

### তৃতীয় প্রমাণ

বোখারীতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আমর এবন-মাইমুন বলিতেছেন ঃ—'নবুয়তের পূর্বে একটা বাঁদর জেনা (ব্যভিচার) করায় অনেক বাঁদর সেখানে সমবেত হইয়া তাহাকে 'রজম'* করিল, আমিও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া 'রজম' করিয়াছিলাম।' কোন কোন মোহাদ্দেছ যুক্তির দিক দিয়া এই হাদীছটাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—বাঁদরের আবার বিবাহ কি, আর তাহার জেনাই বা কি ? বাঁদর সকল যুগে সকল দেশে আছে, কিন্তু এমন ব্যাপার আর কখনও দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। রাবী বাঁদরদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া পাথর মারিতে লাগিলেন, তবুও সেগুলো পালাইল না—ইহা অস্বাভাবিক কথা। এই প্রকার যুক্তির দিক দিয়া তাঁহারা হাদীছটাকে অবিশ্বাস করিয়াছেন। মোহাদ্দেছ এবন-আবদুল বার কোন গতিকে হাদীছটাকে রক্ষা করার জন্য বলিতেছেন—'হইতে পারে ঐগুলা আসলে বাঁদর নয়—জ্বেন !' (ঐ, ঐ, ১৫—৪৩৩)

### চতুর্থ প্রমাণ

ছহী মোছলেমের এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরতের পিতৃব্য আব্বাছ ও জামাতা আলী এবং আরও কতিপয় ছাহাবী, ২য় খলিফা হযরত ওমরের নিকট উপস্থিত হইলেন। আব্বাছের সহিত হযরত আলীর বৈষয়িক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, আব্বাছ সেই সংস্রবে হযরত ওমরকে বলিলেন;—"হে আমীরুল মোমেনিন !

اقض بينى و بين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن -

অর্থাৎ—"এই মিথ্যাবাদী, পাপাত্মা, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতকের সহিত আমার গোলযোগের বিচার করিয়া দিন।" মহাত্মা ওমর উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—'ইহা লইয়া আপনারা আবু বকরকে ঐরূপ মিথ্যাবাদী, পাপাত্মা, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আবু

---

* বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচার করিলে তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করাকে 'রজম' করা বলা হয়।

বকরের মৃত্যুর পর আমাকেও আপনারা ঐরূপ মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, পাপাত্মা ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিয়াছেন।' (২য় খণ্ড ৯০—৯১ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীছে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত আলী ও আব্বাছ মহাত্মা আবু বকর ও ওমরকে মিথ্যাবাদী, পাপাত্মা, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিতেন এবং আব্বাছ ৪র্থ খলিফা হযরত আলীকে ঐরূপ কদর্য ভাষায় গালাগালি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই মহাজনগণের পক্ষে ইহা কদাচিৎ সম্ভবপর নহে—এই যুক্তি অনুসারে কোন কোন মোহাদ্দেছ নিজেদের পুস্তকে হাদীছের এই অংশটা বাদ দিয়া লিখিয়াছেন, মা'জরী বলেন—'যদি তা'বিলের (প্রকারান্তরে রূপক প্রভৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করার) পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা এই হাদীছের রাবীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিব।' ( নওভী ২—৯০, ৯১ )। এখানে আমরা দেখিতেছি, যুক্তির হিসাবে মোহাদ্দেছগণ এই ছহী হাদীছটাকে অগ্রাহ্য করিতেছেন।

## পঞ্চম প্রমাণ

কস্তলানী রচিত "আল-মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়াহ" আধুনিক চরিত-লেখকগণের প্রধান অবলম্বন। ইহাতে শত শত ভিত্তিহীন বাতেল ও 'মাউজু' হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। একটি নমুনা দিতেছি— "হযরত বলিয়াছেন, সাবধান, তুষার হইতে সতর্ক থাকিও, তোমাদের ভ্রাতা আবু দার্দা ইহাতেই নিহত হইয়াছেন।"

এই হাদীছে জানা যায়, আবু দার্দা হযরতের পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। হযরতের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে, ৩য় খলিফা হযরত ওছমানের খেলাফৎকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। (এছাবা, ৬১১২ নং) অতএব যুক্তির হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, হাদীছটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাই হাফেজ এবনে হাজর অগত্যা বলিতেছেন—'হাদীছটির ছহী-ছনদ পাওয়া গেলেও, উহার একটা তাবিল করার আবশ্যক হইবে।'

## ষষ্ঠ প্রমাণ

বোখারীর সৃষ্টি-প্রকরণে, আবু-হোরায়রা কর্তৃক কথিত একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে—হযরত বলিয়াছেন, আল্লাহ্ যখন আদমকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ৬০ হাত। (১৩—২২১)। হাফেজ এবনে হাজর ইহার টীকায় লিখিতেছেন :— "এখানে একটা সমস্যা উপস্থিত হইতেছে যে,—আদিম জাতি সমূহের যে সকল স্মৃতিচিহ্ন এখনও বর্তমান আছে—যেমন ছামুদদিগের গৃহাদি—তাহা হইতে তাহাদের দেহ পরিমাপের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। তাহারা বহু প্রাচীন যুগের লোক, আমাদের সহিত তাহাদের যে কাল ব্যবধান, তাহাদের সহিত আদমের কাল ব্যবধান তদপেক্ষা অল্প। কিন্তু ছামুদ জাতির যে সকল চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা তাহাদের শরীরের (আমাদের দেহ অপেক্ষা অধিক) দীর্ঘতা আদৌ প্রমাণিত হয় না। এই পরম্পরা ধরিয়া আদম পর্যন্ত চলিলে, তাঁহার দেহ যে ৬০ হাত দীর্ঘ ছিল, একথা কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। এইরূপ প্রকাশের পর তিনি নিরুপায় হইয়া বলিতেছেন :—

ولم يظهر لى الى الآن ما يزيل هذا الاشكال - ( فتح - ١٣ - ٢٢١ )

অর্থাৎ—"এই সমস্যার যে কি সমাধান হইতে পারে, তাহা আজ পর্যন্ত আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।" (১৩—২২১)

দর্শন বিজ্ঞানের এবং পুরাতত্ত্বের আধুনিক আবিষ্কারে এই সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতিহাসিক এবন-খাল্দেদুন তাঁহার ইতিহাসের সুবিখ্যাত ভূমিকা খণ্ডে নানা প্রকার দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এই সকল অন্ধ বিশ্বাসের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই হাদীছে আর একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, কোন মাপের ৬০ হাত ? হযরতের সময়কার হাতের, না আদমের সময়কার হাতের ? এবন-হাজর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন যে, আদম নিজের হাতের ৬০ হাত দীর্ঘ ছিলেন। কিন্তু আমরা দাদা ছাহেবের দেহের এই স্বরূপটি কল্পনাই করিতে পারিতেছি না। আমরা এই কলিকালের মানুষ নিজেদের দেহের হিসাবে, আর পূর্বকালের নরদেহ ও নরকঙ্কাল দেখিয়া জানি যে, মানুষ নিজের হাতের (মোটামুটি) পৌনে চার হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে।* নিজের হাতের ৬০ হাত দীর্ঘ হইলে ব্যাপারটা যে কিরূপ বেখাপ ও বেমানান হইয়া দাঁড়াইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, ক্রমে ক্রমে আমরা খর্বাকৃতি হইয়া পড়িয়াছি, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, অনুপাতে হাতের দীর্ঘতার এত তারতম্য হওয়ার কারণ কি ?

## সপ্তম প্রমাণ

বোখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে আবু-হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ঃ—হযরত বলিয়াছিলেন—'হযরত এবরাহিম কিয়ামতের দিন স্বীয় পিতা আজরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া তাহার মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন যে—'কিয়ামতে আমাকে অবমানিত করিবে না, হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার সহিত এই ওয়াদা করিয়াছ,' ইত্যাদি। (তাফছির, পারা ১৯—১৮৮) মোহাদ্দেছ এছমাইলী (জন্ম ২৭৭ হিজরী) বলেন ঃ—'এই হাদীছটি কখনই ছহী হইতে পারে না; কারণ হযরত এবরাহিম জানিতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা খেলাফ করিবেন না—মোশরেককে আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন না, অতএব ইহাকে তিনি কখনই নিজের অবমাননা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।' অন্যান্য কতিপয় মোহাদ্দেছ বলেন—'এই হাদীছটি কোরআনের স্পষ্ট শিক্ষার বিপরীত। কারণ ঐ আয়তে বলা হইয়াছে যে, হযরত এবরাহিম স্বীয় পিতার সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারেন যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন হইতে তিনি তাহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছেদ করিলেন। ইহা দুর্নিবার কথা, সুতরাং কিয়ামতে আবার তাহার জন্য প্রার্থনা বা তাহার দুর্দশাকে নিজের অপমান বলিয়া ধারণা করা, সঙ্গত বা সম্ভব নহে। হাফেজ এবনে হাজর ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই বাকবিতণ্ডার সহিত আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা কেবল এইটুকু দেখিতেছি যে, কেবল যুক্তির হিসাবে অন্ততঃ কতিপয় বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এই হাদীছের প্রামাণিকতা অস্বীকার করিয়াছেন।

## অষ্টম প্রমাণ

বোখারী, মোছলেম, আবু দাউদ ও নাছাই প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে একজন লোক দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'আমার গোছলের হাজত হইয়াছিল, কিন্তু পানি পাই নাই।' হযরত ওমর তাঁহাকে বলিলেন—(গোছল না করিয়া) 'নামাজ পড়িও না।' আম্মার নামক ছাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি বলিলেন—"আপনি এ কি বলিতেছেন ? আপনি ও আমি, এক সঙ্গে এক অভিযানে প্রেরিত হইয়াছিলাম, সেখানে আমাদের উভয়ের গোছলের হাজত হয়, কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। ইহাতে আপনি নামাজ পড়িলেন না, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া নামাজ পড়িলাম। তাহার পর আমি হযরতের নিকট এই বিবরণ বর্ণনা করায় তিনি বলিলেন—"তায়াম্মোম করিয়া লইলেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইত।" হযরত ওমর ইহা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন ঃ—

---

* মিসরীয় মমীগুলি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

اتق الله يا عمار! فقال ان شئت لم احدث به فقال نوليك ما توليت -
(تيسير الوصول ٢ ص ٥٢)

অর্থাৎ—'আম্মার ! আল্লাহর ভয় করিয়া কথা বল।' আম্মার ইহাতে বলিলেন—'যদি আপনার এইরূপই অভিপ্রেত হয়, তবে আমি আর এই হাদীছ বর্ণনা করিব না।' তখন হযরত ওমর বলিলেন—অন্যথায় আমি তোমাকে ইহার জন্য উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিব। (তাইছিরুল-ওছুল ২, ৫৭ ।। মোছলেমের আর একটি রেওয়ায়তে জানা যায়—আবু মুছা, আবদুল্লাহ এবনে মাছউদের নিকট আম্মারের এই হাদীছের উল্লেখ করিলে, আবদুল্লাহ প্রতিবাদ স্থলে হযরত ওমরের উপরোক্ত মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেন।

এই হাদীছ অনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত ওমর, আম্মার (ছাহাবী)-এর বর্ণনা অবিশ্বাস্য মনে করিয়াছেন, অথবা বলিতে হইবে যে, হাদীছের রাবিগণের মধ্যে কেহ রেওয়ায়তে অজ্ঞাতরূপে একটা ভয়ঙ্কর বিভ্রাট ঘটাইয়া দিয়াছেন।

## নবম প্রমাণ

ছহী মোছলেমের একটি হাদীছ এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এবন-ওমর কোন একজন সদ্য-বিয়োগ-বিধুর আত্মীয়ের মুখে ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া একজন লোক দ্বারা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দেন। নিষেধের সময় তিনি বলেন—'আমি হযরতের মুখে শুনিয়াছি, আত্মীয়-স্বজনের ক্রন্দনের জন্য মৃত ব্যক্তির উপর আজাব (সাজা) হয়।' বিভিন্ন রাবী এবন-ওমর হইতে এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। বিবি আয়েশা এই হাদীছের কথা শুনিয়া বলিলেন—"কখনই না, আল্লাহর দিব্য, হযরত কখনই এইরূপ কথা বলেন নাই যে, অন্য একজনের ক্রন্দনের জন্য মৃত ব্যক্তির আজাব হয়। তিনি প্রমাণ স্থলে বলেন, আল্লাহ কোরআনে বলিয়াছেন—

لا تزر وازرة وزر اخرى —"একজনের পাপ-ফল অন্য জন ভোগ করিবে না।"

এবন-ওমরের এই রেওয়ায়ৎ শ্রবণ করিয়া বিবি আয়েশা আরও বলিলেন :—

انكم لا تحدثونى عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطى -
(مسلم ١-٣٠٢-٣)

অর্থাৎ—"তোমরা যাঁহাদের নিকট হইতে আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করিতেছ, তাঁহারা মিথ্যাবাদী নহেন। কিন্তু কথা এই যে, অনেক সময় মানুষের শ্রুতি-বিভ্রম ঘটিয়া থাকে।" (মোছলেম ১ম ৩০২—৩ পৃষ্ঠা)। বিবি আয়েশা যুক্তির হিসাবে এই হাদীছটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কারণ, অন্যথায় স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত নিজেই কোরআনের শিক্ষার বিপরীত কথা বলিয়াছেন। বিবি আয়েশার সিদ্ধান্ত এই যে, রাবী সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হইলেই হাদীছ বিশুদ্ধ হয় না, হাদীছ শুনিতে ও বুঝিতে অনেক সময় ভ্রম হইয়া থাকে। এই শ্রুতি-বিভ্রমের কথাটা সাক্ষ্য আইনের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেক রাবীর হাদীছ শ্রবণ ও বর্ণনার সময় শ্রুতি ও জ্ঞান-বিভ্রম ঘটিতে পারে। বিদূষী বিবি আয়েশা যখন শুনিলেন, এবন-ওমর বলিতেছেন, হযরত বলিয়াছেন, 'আমি যাহা বলি, বদর যুদ্ধের শহিদগণ তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন'—তখন তিনি দেরায়তের এই Principle অনুসারে স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন যে, "ইহা এবন-ওমরের ভুল, কারণ ইহা কোরআনের বিপরীত কথা। কোরআনে আছে :—انك لا تسمع الموتى।

অর্থাৎ—হে মোহাম্মদ। তুমি মৃতগণকে নিজের কথা শুনাইতে সমর্থ নহ।" (রুম ২১—৮, নামল ২০—২)*

## দশম প্রমাণ

ইমাম বাইহাক্কী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ী খলিফা হারুনর-রশীদের নিকট উপস্থিত হইলে, ইমাম মোহাম্মদ-এবন-হাছান, তাঁহাকে হত্যা করার জন্য খলিফাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। খলিফা হারুনর-রশীদের সময় ইমাম আবু ইউছফের সহিত ইমাম শাফেয়ীর সাক্ষাৎ (তর্ক-বিতর্ক ও আবু ইউছফের ঘোরতর পরাজয়) হইয়াছিল, ইত্যাদি। ইমাম বাইহাক্কী ইমাম শাফেয়ীর প্রশংসা-কীর্তনের জন্য ঐ সকল 'হাদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, উহাতে ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউছফের মর্যাদার হানিকর অনেক কথাই আছে। অধুনা এই গল্পগুলির ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। যাঁহারা ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁহার শিষ্যগণকে জনসমাজে খর্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা প্রায়ই ঐ শ্রেণীর বহু গল্পের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, ঐ গল্পগুলির ষোল কড়াই কানা। কারণ, ইমাম শাফেয়ী হারুনর-রশীদের নিকট আসিয়াছিলেন ইমাম আবু ইউছফের মৃত্যুর পর। সুতরাং হারুনর-রশীদের দরবারে তাঁহাদের দেখা-সাক্ষাৎ ও তর্ক-বিতর্কের কথা সমস্তই মিথ্যা। ইমাম শাফেয়ীকে হত্যা করার জন্য ইমাম মোহাম্মদের সঙ্কল্পের কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ মাত্র। এবন-হাজর বলিতেছেন :

---

* আমরা যাহা বলি, কবরস্থিত মৃত ব্যক্তি বা তাহার আত্মা সমস্তই শুনিতে পায়, এই বিশ্বাসটাই হইতেছে মুছলমানদিগের কবর-পূজার মূল ভিত্তি। বোজর্গ লোকেরা সুপারিশ করিবেন, কোরআন নিজেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে, আল্লাহর কি স্বর্গ মর্তের কিছু অজানা আছে যে, সে জন্য একজন উকিল বা মোক্তারের দরকার ? এখানে একটি মাত্র আয়ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء

شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في

الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون - يونس - ٢٥

অর্থাৎ—'এবং আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া, তাহারা এমন সকল (বস্তু বা ব্যক্তির) এবাদত করে, যাহা তাহাদিগের কোন ক্ষতি করিতে পারে না ও উপকারও করিতে পারে না, অথচ তাহারা বলিয়া থাকে ইহারা আল্লাহর সমীপে আমাদের সুপারিশকারী।' (হে মোহাম্মদ) তুমি বল, তোমরা কি স্বর্গ ও মর্তের সেই বিষয়গুলি আল্লাহকে জানাইয়া দিতেছ যাহা তিনি জ্ঞাত নহেন ? ইহাদের বর্ণিত অংশীবাদ (শেরেকের অপবাদ) হইতে তিনি পবিত্র।" (ছুরা ইউনুছ ২৫ রুকু)। শেরক মানে শরীক করা—অস্বীকার করা নহে, অস্বীকার করা বা অমান্য করাকে 'কোফর' বলা হয়। যে আল্লাহকে স্বীকার করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর 'গুণ' অন্যকে অংশী বা শরীক করে, সেই মোশরেক। সমস্ত দুনিয়ার এবং সকল যুগের মোশরেকগণের প্রধানতম যুক্তি এই যে, আল্লাহ ত আছেনই। তবে—যেমন দুনিয়ার হাকিমের এজলাসে কোন দরখাস্ত করিতে হইলে উকিল মোক্তার নিতে হয়, সেইরূপ আল্লাহর দরবারেও পীর মোর্শেদ ও মুনি ঋষিগণের সুপারিশ লইতে হয়। কোরআন এই আয়তে (ও অন্যান্য আয়তে) শেরকের এই মূল ভিত্তির উপর কুঠারাঘাত করিতেছে, যেখানে বিচারকের দয়া ও জ্ঞানের অভাব, উকিল মোক্তার সেখানে। কোরআনে অন্যত্র বলা হইয়াছে—মোশরেকগণ, যুক্তির নিকট পরাজিত হইয়া বলে—আমরা প্রকৃতপক্ষে পীরদিগের পূজা করি না, তবে আমাদের উদ্দেশ্য, উহাদের পূজা নজর দিলে তাঁহারা আমাদিগকে আল্লাহর নিকটবর্তী করিয়া দিবেন। পাঠকগণকে আয়তের তাৎপর্য ও মুছলমান সমাজের বর্তমান সাধারণ অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখিতে বলিতেছি।

وان اخرجها البيهقى فى مناقب الشافعى موضوعة مكذوبة

অর্থাৎ—"যদিও বাইহাকী, শাফেয়ী প্রভৃতির গুণানুবাদ স্থলে এই হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন, তবুও ইহা জাল ও মিথ্যা।"*

## একাদশ প্রমাণ

ঠিক এইরূপ ইমাম আবু হানিফার প্রশংসা কীর্তন ও ইমাম শাফেয়ীর নিন্দা প্রচার করার জন্যও পক্ষান্তরে এই প্রকার মিথ্যা হাদীছ প্রস্তুত করারও ত্রুটী হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, হানাফী মজহাবের শ্রেষ্ঠতম ফেকহের ফেকার কেতাবেও ঐ সকল জাল হাদীছের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়! এক রেওয়ায়তে প্রকাশ—ছাহাবী আবু হোরায়রা বলিতেছেন, হযরত বলিয়াছেন—

يكون فى أمتى رجل يقال له محمد بن ادريس - اضر على أمتى

من ابليس - يكون فى أمتى رجل يقال له ابو حنيفة - هو سراج أمتى

অর্থাৎ—"আমার ওম্মতে মোহাম্মদ-এবন-ইদ্রিছ (ইমাম শাফেয়ীর নাম) নামে একটি লোক জন্মিবে, সে আমার ওম্মতের পক্ষে ইবলিছ অপেক্ষাও অধিক অনিষ্টকারী হইবে। পক্ষান্তরে আমার ওম্মতে আর একটি লোক হইবেন, তাঁহাকে আবু হানিফা বলিয়া সম্বোধন করা হইবে, তিনি হইতেছেন আমার ওম্মতের প্রদীপ।" (খাতিব)। এই 'ছেরাজো ওম্মতি'র হাদীছ লইয়া কত কাটাকাটি মারামারি! অথচ মূলে ইহারও গোল করা কলা—হাদীছটি একদম জাল।** দুঃখের বিষয়, অনেকেই ভুলিয়া যান যে, এই 'হাদীছ' অনুসারে ইমাম আবু-হানিফাকে 'এই ওম্মতের চেরাগ' বানাইতে হইলে, তাহার প্রথমাংশে অনুসারে ইমাম শাফেয়ীকেও 'ইবলিছের অধম' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়!

প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক যুগে যখন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু হানিফার অনুরক্ত ও শিষ্যসেবকগণের মধ্যে ইমামদ্বয়ের নানা প্রকার মতবিরোধ উপলক্ষে, কলহ-বিবাদ এমন কি ভীষণ শোণিতপাত পর্যন্ত হইতেছিল, সে সময় উভয় দলের গোঁড়া লোকেরা প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করার জন্য জেদের বশবর্তী হইয়া নিজেদের ইমামের প্রশংসা ও বিপক্ষ ইমামের কুৎসামূলক এই সকল মিথ্যা হাদীছ জাল করিয়াছিলেন। তাহার পর কয়েক শতাব্দী পরে, রাজকীয় চেষ্টার ফলে ইহাদের কলহ-বিবাদের মিটমাট হইয়া যায়, এবং সেই হইতে সাধারণ লেখকগণ উহার প্রথম অংশটা বাদ দিয়া শেষের অংশটুকু উদ্ধৃত করিতে থাকেন।

## দ্বাদশ প্রমাণ

মোহাদ্দেছ এবন-আবি-খায়ছামা তাঁহার 'তারিখে', নিম্নলিখিত হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন—"আবু বকর-এবন-আইয়াছ বলিতেছেন, তিনি আওফের মুখে শুনিয়াছেন যে, খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার—আওফের—উপর আপতিত হইয়া তাঁহাকে নিহত করে।" (ফৎহুল মুগীছ, ৬৮)। এই হাদীছটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আওফ নিহত হওয়ার পর, নিজেই নিজের হত্যা ব্যাপারটা আবু বকরকে বলিয়া গিয়াছিলেন।

---

* 'মাউজুআতে কাবির' ৯৪,৮৫ পৃষ্ঠা। বায়হাকী এত বড় মোহাদ্দেছ হওয়া সত্ত্বেও ইমাম শাফেয়ীর অযথা গুণানুবাদ এবং ইমাম আবু হানিফার অযথা দোষকীর্তনের উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর বহু প্রমাণহীন বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

** দেখ, 'আলফোওয়ায়েদুল-মাজমুআহ' ১৫৩, 'মাউজুয়াতে কবির' ১২৮, মাওলানা আবদুল হাই কৃত 'হেদায়ার ভূমিকা' প্রভৃতি।

রেওয়ায়তের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণকালে এই প্রকার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণ যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়।

### ত্রয়োদশ প্রমাণ

বোখারীর একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত এবরাহিম তিনবার মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। ইমাম ফাখরুদ্দিন রাজী এই উপলক্ষে বলিতেছেন,—

হযরত এবরাহিমের ন্যায় একজন মহামহিম নবীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘোষণা করা অপেক্ষা এই হাদীছের কোন একজন রাবীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া স্বীকার করা সহজ। ফলতঃ বোখারীর হাদীছ যুক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া ইমাম ছাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিতেছেন। (তফছিরে কবির)

### চতুর্দশ প্রমাণ

বোখারীতে 'জমায়াত সহকারে নফল নামাজ'-প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাহমূদ এবন-রবী' বলিতেছেন—হযরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলিবে, সে বেহেশ্‌তে যাইবে।" আবু আইউব আনছারী এই হাদীছ শুনিয়া বলিলেন—"আমার বিশ্বাস, হযরত কখনই এরূপ কথা বলেন নাই।" বোখারীর হাদীছ—সুতরাং রেওয়ায়তের হিসাবে ইহা নির্দোষ। কিন্তু তবু আবু আইউব আনছারীর ন্যায় মহামান্য ছাহাবী ঐ হাদীছটাকে যুক্তি বা দেরায়তের হিসাবে অবিশ্বাস করিতেছেন। কারণ, তাঁহার মতে, ঈমানের সঙ্গে আমলের আবশ্যক।

### পঞ্চদশ প্রমাণ

হযরত কাফেরদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা শয়তান কর্তৃক বাধ্য হইয়া, কোরআন আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার আয়তের মধ্যে কোরেশদিগের ঠাকুর লাৎ ও ওজ্জার নামে তাহাদের প্রশংসাবাচক দুইটি জাল আয়ত পাঠ করেন, এবং পাঠান্তে যেন লাৎ ও ওজ্জাকেই ছেজদা করিতেছেন, এইরূপ ভাবে ছেজদা করেন। কাজেই কোরেশগণ মনে করিল, মোহাম্মদ লাৎ ও ওজ্জার নামে ছেজদা করিতেছেন, এই ভাবিয়া তাহারা সকলে হযরতের সঙ্গে ছেজদা করিল। দীর্ঘ সময় পরে, জিব্রিল ফেরেশ্‌তা আসিয়া এই অন্যায় কার্যের জন্য কৈফিয়ত তলব করিলে পর, তবে ঐ অংশটা বাদ দেওয়া হয়। এই হাদীছটি তফছির ও হাদীছের অনেক কেতাবেই আছে। এবন-হাজর রেওয়ায়তের সম্মান রক্ষার জন্য এহেন হাদীছকেও সমূলক প্রমাণ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু অনেক ইমাম ও আলেম এই হাদীছকেও এছলাম বৈরীদিগের তৈরী জাল ও ভিত্তিহীন বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

### ষোড়শ প্রমাণ

একটি হাদীছে আছে ঃ— الباذنجان شفاء من كل داء — অর্থাৎ—'বেগুন সকল রোগের ঔষধ'। মোহাদ্দেছগণ বলিতেছেন, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষভূত সত্যের বিপরীত, সুতরাং অবিশ্বাস্য। (মাউজুআৎ, ১০০।) সুতারাং আমরা বুঝিলাম যে, প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কোনও রেওয়ায়ৎ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

### সপ্তদশ প্রমাণ

একটি হাদীছে আছে ঃ—"কথার সময় হাঁচি পড়িলে জানিতে হইবে যে, কথাটা ঠিক।" মোল্লা আলী কারী লিখিতেছেন ঃ

هذا وان صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه فانا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله-

অর্থাৎ—'কেহ কেহ এই হাদীছটিকে ছহী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ

সত্যের বিপরীত; কারণ মিথ্যা কথার সহিত হাঁচি একই সময় পড়িয়া থাকে, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া থাকি'। সুতরাং প্রত্যক্ষ সত্যের দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে এই হাদীছটি জাল। (ঐ, ঐ)

### অষ্টাদশ প্রমাণ

হাদীছের কেতাবগুলির মধ্যে বোখারীর পরই মোছলেমের স্থান শায়খুল এছলাম ইমাম এবনে তাইমিয়া ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

فانه نوزع فی عدت احادیث مما خرجها، وکان الصواب فیها

مع من نازعه کما روی حدیث الکسوف ان النبی صلعم صلی

بثلث رکوعات، وکما روی انه صلی برکوعین والصواب انه

لم یصل الا برکوعین، وانه لم یصل الکسوف الامرة واحدة یوم

مات ابراهیم - وقد بین ذالک الشافعی وهو قول البخاری

واحمد بن حنبل (الی قوله) ومعلوم انه لم یمت فی یومی کسوف

ولا کان ابراهیمان - (کتاب التوسل والوسیلة، طبعة المنار، ۳-۱۰۲)

অর্থাৎ—"মোছলেম যে সকল হাদীছ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতকগুলির বিশুদ্ধতা অস্বীকার করা হইয়াছে এবং তাহাই ন্যায়সঙ্গত। যেমন তিনি রেওয়ায়ৎ করিতেছেন যে, হযরত সূর্যগ্রহণের নামাজে তিনবার 'রুকু' দিয়াছিলেন। দুই রুকু দেওয়ার রেওয়ায়তও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন; দুই রুকুর হাদীছটাই কিন্তু ঠিক; ইহা নিশ্চিত যে, হযরত তাঁহার জীবনে একবার মাত্র—যেদিন তাঁহার পুত্র এবরাহিমের মৃত্যু হয়—সূর্যগ্রহণের নামাজ পড়িয়াছিলেন। শাফেয়ী স্পষ্টাক্ষরে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন, বোখারী ও আহমদ-বেন-হাম্বলও ইহাই বলেন। ......ইহাও নিশ্চিত যে, এক এবরাহিম (বিভিন্ন সূর্যগ্রহণের দিনে) দুই দিন করিয়া মরেন নাই, অথবা এবরাহিমও দুই জন ছিলেন না।" (কেতাবুল অছিলা, মিছরী, ১০২-৩।)

### ঊনবিংশ প্রমাণ

এই সূর্যগ্রহণ, মাসের কোন তারিখে হইয়াছিল,—ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে,—

وکان ذلک یوم عاشر الشهر کما قاله بعض الحفاظ وفیه

رد لقول اهل الهیئة - الخ -

অর্থাৎ "চান্দ্রমাসের ১০ই তারিখে ঐ সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল—কোন কোন হাফেজ এই কথা বলিয়াছেন। অতএব চান্দ্রমাসের শেষ (অমাবস্যা) দিবস ব্যতীত যে সূর্যগ্রহণ হইতে পারে না, জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই দাবী এতদ্দ্বারা বাতেল হইয়া গেল।"* কোন কোন হাফেজ বলিলেন—

---

* মেরকাত—সূর্যগ্রহণের নামাজ-প্রকরণ।

সুতরাং যুগপ্রন্থের পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ সত্যটা একেবারে বাতেল হইয়া গেল। যাহা হউক, সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণ যুক্তির দিক দিয়া এইরূপ বর্ণনার ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এমাম এবন-তাইমিয়া উল্লিখিত পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

ومن نقل انه مات فى عاشر الشهر فهو كذب -

অর্থাৎ—'যে ব্যক্তি একথা বলে, যে মাসের দশম তারিখে এবরাহিমের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, সে মিথ্যাবাদী।'

## বিংশতি প্রমাণ

মোহম্মদ বাজ্জারে, এবন-মাছউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ১১ই রমজান তারিখে পরলোকগমন করেন। (ফৎহুল বারী ১৮—৯৮) কিন্তু এবন-শাইবা, আবু ছাইদ খুদরির প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন—১৮ই রমজান তারিখে আমরা হযরতের সঙ্গে খাইবার অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলাম। স্বয়ং এবন-হাজর বলিতেছেন, 'হাদীছটি হাছান বটে, কিন্তু তবুও ইহা ভ্রম। কারণ রমজান মাসে হযরত মক্কা বিজয় অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন।' ( ঐ, ১৬-৩)

এই দুইটি হাদীছ ছাহাবিগণ কর্তৃক বর্ণিত। কিন্তু, যেহেতু ঐ বিবরণগুলি প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত, সেই জন্য আমরা ঐগুলিকে অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইতেছি।

একটি হাদীছে বর্ণনা করা হইয়া থাকে যে, 'হযরত খাইবারের ইহুদীদিগকে 'যিজ্‌য়া' কর হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন এবং এজন্য তাহাদিগকে একখানা ছনদও লিখিয়া দিয়াছিলেন।' মোল্লা আলী কারী* যুক্তির হিসাবে নিম্নলিখিতরূপ কারণ দর্শাইয়া এই হাদীছটিকে অসত্য ও বাতিল বলিয়া নির্ধারণ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ

(১) বর্ণিত ছনদ বা দলিলে ছায়াদ-এবন-মাআজ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ হাদীছে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি পরিখা সমরের সময় পরলোক গমন করেন। অর্থাৎ বর্ণিত ঘটনার পূর্বে ছায়াদের মৃত্যু হইয়াছে।

(২) মাআবিয়াকে এই দলিলের লেখক বলিয়া হাদীছে বর্ণনা করা হইয়াছে। অথচ তিনি এই ঘটনার (এক বৎসর) পরে মক্কা-বিজয়ের পর—৮ম সনে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার লেখক হওয়া অসম্ভব অতএব হাদীছটি মিথ্যা।

(৩) ইহা সপ্তম সনের ঘটনা। যিজ্‌য়ার হুকুম তখনও হয় নাই। তাবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীতে যিজ্‌য়ার আয়ৎ নাজেল হয়। সুতরাং হাদীছটি অসত্য।

(৪) ঐ দলিলে লেখা আছে (বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) যে, ইহুদীদিগকে বেগার খাটান হইবে না। অথচ হযরতের সময় বেগার লইবার পদ্ধতি আদৌ প্রচলিত ছিল না।

(৫) বিশেষ করিয়া খাইবারের ইহুদীদিগকে যিজ্‌য়া হইতে মুক্তি দেওয়ার কোন কারণ নাই।

দুঃখের বিষয় এই যে, সমালোচনার এই ধারা অধুনা এক প্রকার পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই সকল উদাহরণ দ্বারা আমরা দেখিলাম যে—

(ক) আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ও যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা যদি কোন হাদীছের অবিশ্বাস্যতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে, তাহার ছনদ ছহী হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

(খ) যুক্তির হিসাবে, এইরূপে হাদীছ অগ্রাহ্য করা আধুনিক লেখকগণের নূতন আবিষ্কার নহে। ছাহাবিগণের যুগ হইতে বিজ্ঞ মোহাদ্দেছগণের সময় পর্যন্ত এই ধারা অনুসারে হাদীছের বিচার করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

এখানে আর একটা নিবেদন এই যে, শেষোক্ত উদাহরণগুলির মধ্যে কোন কোনটি সম্বন্ধে, যাঁহারা রেওয়ায়ৎ গ্রাহ্য করেন এবং যাঁহারা অস্বীকার করেন—এই দুই দলে বাদানুবাদ

---

* মাউজুআৎ ১০৩ পৃষ্ঠা।

চলিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আমরা ঐ মতানৈক্যের বিচার ও মীমাংসা করার জন্য উদাহরণগুলি উপস্থিত করি নাই। আমাদের একমাত্র প্রতিপাদ্য এই যে, বহু গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ ও ইমাম, যুক্তির হিসাবে ঐ সব হাদীছের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যেক স্থলে সঙ্গত কি-না—এক্ষেত্রে তাহা আমাদের দ্রষ্টব্য নহে। আমাদের মহামান্য মোহাদ্দেছগণও যে সূক্ষ্ম-বিচার বা দেরায়তের এই ওছুল (Principle)-কে স্বীকার করিয়াছেন, মোটের উপর ইহাই আমাদের প্রতিপাদ্য।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## হাদীছের শ্রেণীবিভাগ

হাদীছের পরিভাষা, বিভাগ ও তাহার নিয়মাবলী সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ না করিয়া লইলে, এছলামের ইতিবৃত্ত বা হযরতের জীবনী যথাযথভাবে আলোচনা করা, বা তৎসংক্রান্ত সূক্ষ্ম আলোচনাগুলি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হইবে না। কেবল ইতিহাস ও জীবনীই নহে—এছলামের কোন একটা অংশ সম্বন্ধে উত্তমরূপে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, হাদীছের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তাই আমরা নিম্নের কয়েক অধ্যায়ে হাদীছ সংক্রান্ত কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করিব। বিভিন্ন পুস্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং নানা প্রকার মতানৈক্য ও জটিল তর্ক-বিতর্কের স্তূপের মধ্য হইতে, সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়া যে কতটা শ্রমসাধ্য ব্যাপার, অভিজ্ঞ পাঠক তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছেন। যাহা হউক, আল্লাহ্‌ যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, সেই অনুসারে, সটীকা 'নোখবাতুল ফেকর', 'মোকদ্দমা এবনুছ-ছালাহ্‌', 'ফৎহুল মুগীছ', 'মোকদ্দমা মোহাক্কেক দেহলবী', শাহ্‌ আবদুল আজিজ কৃত 'ওজ্জালায় নাফেয়া' এবং বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থ ও তাহার টীকা সমূহের উপক্রমণিকা হইতে নিম্নে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

**হাদীছের প্রাথমিক বিভাগ ঃ**

সর্বপ্রথমে হাদীছ তিন ভাগে বিভক্ত—

১ম, হযরত যে সকল কথা বলিয়াছেন,—ইহাকে 'কাওলী', قولى হাদীছ বলা হয়।

২য়, হযরত যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ—এগুলির নাম 'ফেলী' فعلى হাদীছ।

৩য়, হযরতের সম্মুখে যে কোন কাজ করা হইয়াছে, অথচ হযরত তাহার কোনরূপ প্রতিবাদ করেন নাই অর্থাৎ হযরত মৌনাবলম্বন দ্বারা সেই কার্যে প্রকারান্তরে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এই শ্রেণীর হাদীছগুলিকে 'তাকরিরী' تقريرى বলা হয়।*

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, হযরত যাহা বলিয়াছেন যা করিয়াছেন অথবা মৌনাবলম্বনে যে কার্যে প্রকারান্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেইরূপ কাজ ও কথার বিবরণের নাম—'হাদীছ'।

---

* তাকরিরী হাদীছ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হওয়া চাই যে, হযরতের সম্মুখে ঐ কাজ করা হয় ও হযরত তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এবং সে সময় বা তাহার পরবর্তী কোন সময়ে সেই কাজের বা সেই শ্রেণীর কাজের প্রতি কোন প্রকার অসন্তোষ বা বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করেন নাই। পূর্ববর্তী পুস্তকাকারগণের পুস্তকে, আমরা যতদূর দেখিতে পারিয়াছি, ঐ প্রকার কোন নিয়ম স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ না থাকায়, এই ধারাটি স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইল।

কিন্তু পরবর্তী যুগে এই 'হাদীছ' শব্দের ব্যবহার এত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে যে, ছাহাবীদিগের কথা ও কাজ, এমন কি ক্রমে তাঁহাদের বহু পরবর্তী লোকদিগের উক্তিও হাদীছ নামে কথিত হইয়া থাকে।

## ছনদ হিসাবে বিভাগ

ছনদ হিসাবেও হাদীছ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। হাদীছের সনদ বা সূত্রপরম্পরা যদি হযরত পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে,—যেমন ছাহাবী বলেন, হযরত এইরূপ করিয়াছেন বা বলিয়াছেন,—তাহা হইলে সেই হাদীছকে 'মারফু' مرفوع বলা হয়। যদি ছাহাবীর পরবর্তী লোকেরা—তাবেয়িগণ—বলেন যে, অমুক ছাহাবী এইরূপ করিয়াছেন বা এই কথা বলিয়াছেন, তাহা হইলে এই বিবরণের নাম 'মওকূফ' হাদীছ। যেমন তাবেয়ী বলেন, ওমর এইরূপ বলিয়াছেন, আবু বকর ইহা করিয়াছেন, ইত্যাদি। যে হাদীছের শেষ সীমা কোন তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়া স্থগিত হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যাহাতে কোন তাবেয়ীর কথা বা কাজের বর্ণনা করা হয়, তাহাকে 'মাক্‌তু' مقطوع হাদীছ বলা হয়। যেমন, "কেহ বলে, হাছান বাছরী ইহা বলিয়াছেন, বা কা'ব-আহবার ইহা করিয়াছেন"—ইত্যাদি।

হাদীছের শেষ রাবী হইতে প্রথম বা মূল রাবী পর্যন্ত, একজন রাবীও যদি পরিত্যক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই হাদীছকে 'মোত্তাছাল' متصل বা সংলগ্ন-সূত্র হাদীছ বলা হয়। আর যদি উহার মধ্য হইতে কোন রাবী পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 'মোনকতা' منقطع বা ছিন্ন-সূত্র বলা হয়। ইহার আবার তিন শ্রেণী আছে—আমাদের তাহার আবশ্যক নাই। আমরা মোটের উপর মোত্তাছাল ও গায়র-মোত্তাছাল متصل وغير متصل বা সংলগ্ন-সূত্র ও অসংলগ্ন-সূত্র বলিয়া দুই ভাগ করিয়া উপস্থিতের মত ক্ষান্ত থাকিতে পারি। এখানে আমরা দেখিতেছি, পূর্বোক্ত 'মারফু, মাওকূফ ও মাক্‌তু' হাদীছগুলি আবার সংলগ্ন ও অসংলগ্ন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

## ছাহাবা ও তাবেয়ীর সংজ্ঞা

ছাহাবী শব্দে দীর্ঘ-ঈকার বা ى সম্বন্ধ-বাচক অন্ত্য। যাঁহারা হযরতের 'ছোহবৎ' বা সাহচর্য লাভ করিয়াছেন, অভিধানের হিসাবে তাঁহাদের সমষ্টিগত নাম 'ছাহাবা'। এই সমষ্টির প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে ছাহাবী বলা যাইতে পারে। ছাহাবীর শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা লইয়া ঘোর মত-বিরোধ দেখা যায়। অধিকাংশের মত এই যে, "যে কোন মুছলমান—মুছলমানে থাকার অবস্থায় হযরতের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন এবং মুছলমান থাকার অবস্থায় তাঁহার মৃত্যুও হইয়াছিল, ছাহাবী বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইবে।" (নোখবা, ৮১।

"যে কোন ব্যক্তি (মুছলমান হওয়ার শর্ত এখানে নাই !) কোন ছাহাবার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন, তিনি তাবেয়ী।" (ঐ, ৮৪)

অতএব যে কোন ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও পৌত্তলিক কোন একজন ছাহাবাকে দেখিয়াছে, সেও তাবেয়ী।

ছাহাবীদিগের ঠিক সংখ্যা কত, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। হযরতের পরলোক গমনের পূর্বে মক্কা, হেজাজ, এমন, ওমান, বাহরায়ন, এমামা, হাজরা-মাওত, নাজদ, নাজরান, দাওমাতুল-জান্দাল, খায়বার, তাবুক, গাছছান প্রভৃতি আরবের প্রায় সমুদয় প্রদেশের যাবতীয় লোক এছলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় লেখকগণের মতেও তাঁহাদের সংখ্যা দশ লক্ষের কম হইবে না।

এই দশ লক্ষের মধ্যে ১ লক্ষ ১৪ হাজার জন হযরতের সাহচর্য বা দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, মোহাদ্দেছ আবু জোরআ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।* যাহা হউক, মোটামুটি ভাবে আমরা ছাহাবীদের সংখ্যা এক লক্ষ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি।** ইঁহাদের মধ্যে সর্বশেষে পরলোক গমন করিয়াছেন— আবু-তোফেল আমের-এবন-ওয়াছেলা। ইঁহার মৃত্যু হয় হিজরী ১০২ সনে।*** হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে মুছলমানগণ কোন্ কোন্ দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং এই লক্ষাধিক ছাহাবী কিরূপে দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, অভিজ্ঞ পাঠককে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। এখানে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ইহা মহামতি খলিফা ওমর-এবন-আব্দুল আজীজের রাজত্বের শেষ সময়। এই সময়, মধ্য-এশিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে বহু ছাহাবা ছড়াইয়া পড়েন। ঐ সকল প্রদেশের সমস্ত মুছলমান ও অমুছলমান, যাঁহারা কখনও কোন মতে জনেক ছাহাবীর দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যখন তাবেয়ী পদবাচ্য, তখন এই তাবেয়ীদিগের সংখ্যা যে কত, এবং তাঁহাদের বর্ণিত 'মাওকুফ' এবং 'মাকতু' হদীছের গুরুত্ব যে কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

## রাবী হিসাবে বিভাগ

সূত্র-পরম্পরায় যে সকল রাবীর নাম আছে, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের হিসাবে হাদীছ আবার তিন প্রকার—ছহী, হাছান ও জঈফ।

## ছহী হাদীছের সংজ্ঞা ও শর্ত

ছহী হাদীছের প্রত্যেক রাবীই নিম্নলিখিত গুণ-সম্পন্ন ও দোষ-বর্জিত হইবেন ঃ

১ম, আদালৎ বা সাধুতা এবং ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্মভীরুতা তাঁহাদের প্রকৃতিগত হইবে। অর্থাৎ তাঁহারা কোন অবস্থায় কোন প্রকার শের্ক (অংশীবাদ), বেদআৎ (ধর্মের অতীত আচার বা বিশ্বাস) ও 'ফেছকে'**** স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারেই লিপ্ত থাকিবেন না।

২য়, কাপুরুষতা, নীচ প্রকৃতি, সুরুচিহীনতা এবং এই শ্রেণীর সকল প্রকার ঘৃণিত কার্য ও জঘন্যভাব হইতে তাঁহারা দূরে থাকিবেন। অর্থাৎ ধর্মের ন্যায়, রুচির দিক দিয়াও কোন প্রকার হীনভাবে বা নীচকার্যে তাঁহারা লিপ্ত হইবেন না।

৩য়, প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ মাত্রায় ধারণা-শক্তি-সম্পন্ন 'تام الضبط' হইবেন। অর্থাৎ ঃ—

(ক) বিবরণগুলিকে এমন সতর্কতার সহিত স্মরণ করিয়া রাখিবার পূর্ণশক্তি তাঁহাতে থাকিবে, যাহাতে যে কোন সময় আবশ্যক, তিনি সেই সম্পূর্ণ বিবরণটা যথাযথভাবে আবৃত্তি করিতে পারেন। অথবা—

(খ) বিবরণ শ্রবণের সময় হইতে তাহা বিবৃত করার সময় পর্যন্ত, নিজের পুস্তকে এমন সাবধানতা ও যোগ্যতার সহিত তিনি সেগুলিকে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাতে কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

মনে করুন—'ক' একজন রাবী এবং তিনি যে সত্যবাদী ও নীতিবান তাহাও সর্ববাদী স্বীকৃত। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কিংবা বার্ধক্য, রোগ শোক বা অন্য কোন প্রকার আকস্মিক কারণে, তাঁহার স্মৃতিশক্তি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে অথবা তিনি অন্ধ হইয়া যাওয়ায় বা অন্য কোন কারণে

---

* 'মোকদ্দমা এবনুছ-ছলাহ' ১৭১ : তাদরিব ১৩৬ পৃঃ।

** বিস্তৃত আলোচনার জন্য মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী বিরচিত ছাহাবীর সংখ্যা ও শ্রেণী শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন,—'আল-এছলাম', ১৩২৯ সন।

*** 'এছাবা' ২য় খণ্ড ৬৭০ ও 'মাউজুআৎ'।

**** যাহা ধর্মতঃ অবশ্য-কর্তব্য—ওয়াজেব, তাহা ত্যাগ করা বা যাহা অবশ্য-ত্যাজ্য (হারাম) তাহা করা "ফেছক"। যেমন নামাজ রোজা ত্যাগ বা মদ্যপান, নরহত্যা, ব্যভিচার ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়া। যে এইরূপ করে সে "ফাছেক"।

তাঁহার পুস্তকের মুসাবিদা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—অথবা অন্য কোন লোকের পক্ষে সেই মুসাবিদায় কোন কথার যোগ বিয়োগ করার সুবিধা ঘটিয়াছে,—এ অবস্থায় সত্যবাদী ও নীতিবান 'ক'-এর হাদীছ 'ছহী' বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

৪র্থ, হাদীছটি মোত্তাছাল-ছনদ (সংলগ্ন-সূত্র) সহকারে বর্ণিত হওয়া চাই। সুতরাং যে হাদীছের রাবী-পরম্পরা হইতে এক বা একাধিক রাবী পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা 'ছহী' সংজ্ঞাভুক্ত হইবে না।

৫ম, রেওয়ায়তটি 'মোআল্লাল' معلل হইবে না।

'মোআল্লাল' সেই হাদীছকে বলা হয়, যাহাতে প্রকাশ্যতঃ কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং 'ছহী' হওয়ার সমস্ত শর্তই তাহাতে পাওয়া যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাতে এমন সকল প্রচ্ছন্ন ও মারাত্মক দোষ-ত্রুটী থাকে যে, বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যের পক্ষে সে দোষগুলির অনুধাবন করা অসম্ভব। যেমন, হাদীছের বর্ণিত বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ছাহাবীর উক্তি, কিন্তু পরবর্তী রাবী ভুলক্রমে (বা অন্য কোন কারণে) তাহাকে হযরতের উক্তি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বহু অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার ফলে এই সকল সূক্ষ্ম ও মারাত্মক ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে।

৬ষ্ঠ, হাদীছটি 'শাজ', شاذ হইবে না ;—অর্থাৎ সে হাদীছের রাবী নিজ অপেক্ষা বিশ্বস্ততম রাবীর বর্ণিত হাদীছের বিপরীত কোন বিষয়ের বর্ণনা করিবেন না।

এই ছয়টি কঠোর শর্ত যে হাদীছের মধ্যে পূর্ণভাবে পাওয়া যাইবে, তাহাকে 'ছহী' বলা হইবে।

## হাছান হাদীছ

যদি রেওয়ায়তে ছহী হাদীছের অন্য সকল শর্ত পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কেবল ৩য় দফার বর্ণিত শর্ত সম্বন্ধে তাহাতে কিছু ত্রুটী থাকিয়া যায়, অথচ নানা সূত্রে ঐ হাদীছের রেওয়ায়ৎ হওয়ায় ঐ ত্রুটীর প্রকারেতঃ ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ হাদীছকে صحيح لغيره (অন্যের সাহায্যে ছহী) বলা হয়। আমরা ইহাকে ২য় শ্রেণীর ছহী বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

কিন্তু যদি ঐ প্রকারে ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সেই হাদীছকে 'হাছান' বলা হয়।

## জঈফ হাদীছ

ছহী ও হাছান হাদীছ সম্বন্ধে বর্ণিত এক বা একাধিক শর্তের অভাব ঘটিলে সেই হাদীছকে 'জঈফ' বা দুর্বল বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, যে হাদীছে যত অধিক সংখ্যক শর্তের অভাব হইবে, সে হাদীছ তত অধিক পরিমাণে জঈফ (দুর্বল) বলিয়া নির্ধারিত হইবে।

এই বর্ণনায় আমরা দেখিলাম যে, রাবীর প্রতি দুই দিক দিয়া দোষারোপ হইতে পারে। প্রথম, তাঁহার নৈতিক অবস্থার দিক দিয়া এবং তাহার পর (হাদীছ গ্রহণ ও তাহা যথাযথ ভাবে বর্ণনা বিষয়ে) তাঁহার স্মরণশক্তি ও সতর্কতার দিক দিয়া। এই সকল দোষারোপকে মোহাদ্দেছগণের ভাষায় 'তাআন' طعن বলা হয়।

## রাবীর ১০ প্রকার দোষ বা 'তাআন'

রাবীর প্রতি তাঁহার ধর্ম ও নীতির দিক দিয়া পাঁচ প্রকার এবং স্মরণ ও ধারণা শক্তি ইত্যাদি হিসাবে পাঁচ প্রকার, একুনে ১০ প্রকার 'তাআন' বা দোষারোপ হইতে পারে। প্রথম পাঁচ প্রকার দোষ হইতেছে ;—

(১) যদি প্রমাণিত হয় যে, কোন হাদীছের রাবী কখনও হাদীছ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তাহা হইলে সেই হাদীছকে 'মওজুআ' موضوع প্রক্ষিপ্ত বা জাল আখ্যা দেওয়া হইবে। যেমন, প্রমাণিত হইল যে, আবদুল্লাহ এক সময় নিজে একটা মিথ্যা হাদীছ তৈরী করিয়াছিল, বা

অজ্ঞাতসারে সে কোন মিথ্যা হাদীছকে বেমালুম ভাবে চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা হইলে সে জীবনে যখন যে কোন হাদীছ বর্ণনা করিবে, তাহা জাল বা 'মাউজু' বলিয়া পরিগণিত হইবে।*

(২) যদি রাবীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত মতে হাদীছ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলার কোন প্রমাণ না থাকে, কিন্তু তদ্ব্যতীত সাধারণভাবে তাহার মিথ্যা কথা বলার অখ্যাতি থাকে, তাহা হইলে এইরূপ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ 'মাৎরুক' বা পরিত্যক্ত বলিয়া কথিত হয়।

ওছুল-শাস্ত্রকারেরা বলেন,—প্রথম দফার বর্ণিত রাবীর হাদীছ কস্মিনকালেও কোন অবস্থাতেই গৃহীত হইতে পারিবে না। কিন্তু দ্বিতীয় দফার বর্ণিত রাবী যদি 'তওবা' করে এবং তাহার পর সত্যবাদিতার সমস্ত লক্ষণ ও প্রমাণ তাহাতে পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার—সংশোধনের পরে বর্ণিত—হাদীছগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে। কচিৎ কদাচিৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তাহার হাদীছকে মাৎরুক বা পরিত্যক্ত বলিয়া নির্ধারণ করিতে একদল মোহাদ্দেছ প্রস্তুত নহেন।

(৩) যদি হাদীছের মধ্যে এক বা একাধিক রাবী এরূপ থাকেন যে, রেওয়ায়তে তাঁহাদের নাম ও পরিচয়ের উল্লেখ নাই এবং অপর কোন বিশ্বস্ত সূত্র দ্বারাও ঐ পরিত্যক্ত-নামা রাবীর পরিচয় জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে ঐ হাদীছকে 'মোবহাম' مبهم বা অস্পষ্ট বলা হয়। অস্পষ্ট হাদীছ অগ্রাহ্য। কারণ রাবী বিশ্বস্ত কি-না, হাদীছ সম্বন্ধে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রথম আবশ্যক। কিন্তু রাবীর নাম ধাম জানা না থাকিলে সে পরীক্ষা অসম্ভব। অনেক সময়, বিশেষতঃ ইতিহাসে, রাবিগণ বলেন—'আমি একজন ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি, একজন বিশ্বস্ত লোক আমাকে বলিয়াছেন'—ইত্যাদি। ইহাও অগ্রাহ্য। কারণ যে রাবী এই কথা বলিতেছেন, তাঁহার জ্ঞান বিশ্বাস মতে অপ্রকাশিত নামের রাবীটি ভাল ও বিশ্বস্ত হইতে পারেন; কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, তাহার বিশ্বাস ভুল, তিনি যাঁহাকে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেছেন, বাস্তবিক তিনি বিশ্বস্ত নহেন।**

কোন কোন লেখক বলিয়াছেন—যদি রেওয়ায়তে ছাহাবার নাম পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ হইবে না। কারণ সেখানে পরীক্ষার কোন আবশ্যক নাই।—ছাহাবীরা সকলেই ত বিশ্বস্ত। কিন্তু আমাদের মতে ইহা সমীচিন সিদ্ধান্ত নহে। ইহাতে এক লক্ষ ছাহাবীর প্রত্যেককে সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত (বা প্রকারান্তরে মা'ছুম) বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, ছাহাবার নাম জানা না থাকিলে, সেই রেওয়ায়ত কখনই বিশ্বাস্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। হয়ত, তাবেয়ী এমন ছাহাবীর বরাত দিয়া হাদীছ বর্ণনা করেন, যে ছাহাবীর সহিত তাঁহার কস্মিনকালেও সাক্ষাৎ হয় নাই। অথবা অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত সূত্রে সেই ছাহাবী হইতে তাঁহার বর্ণনার বিপরীত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। কিংবা যে ছাহাবীর কথা উহ্য রাখা হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে হাদীছের বর্ণিত ঘটনায় উপস্থিত থাকাই অসম্ভব। পক্ষান্তরে, সেই ছাহাবীর বিচক্ষণতা কতদূর, তাঁহার স্মরণশক্তি কিরূপ, ইত্যাদি ২য় দফার কোন ত্রুটি তাঁহাতে আছে কি-না, তাহা জানিবারও কোনই উপায় থাকে না।

(৪) রাবী কোন প্রকার 'ফেছক' কাজে লিপ্ত হইবেন না।

এছলাম ধর্মানুসারে যাহা অবশ্য কর্তব্য (যেমন, নামাজ রোজা ইত্যাদি) তাহা ত্যাগ করা অথবা যাহা অবশ্য পরিহার্য বা হারাম, (যেমন মিথ্যা কথা বলা, পর-দার গমন, মদ্যপান, নরহত্যা ইত্যাদি) তাদৃশ কোন কাজ করাকে 'ফেছক' বলা হয়। ইহার আভিধানিক অর্থ—ব্যভিচার।

(৫) রাবী কোনরূপ 'বেদআতে' সংশ্লিষ্ট হইবেন না।

---

* 'মাউজু' হাদীছ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

** ইহার একটা স্পষ্ট উদাহরণ দিতেছি : ঐতিহাসিক এবন-এছহাক একস্থানে বলিতেছেন, আমি একজন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু তদন্তে জানা যায় যে, এয়াকুব নামক ইহুদী তাঁহার সেই বিশ্বস্ত রাবী। 'মীজান'—মোহাম্মদ এবন এছহাক।

### বেদ্‌আতের সংজ্ঞা

ধর্মতঃ যে সকল কাজ করিলে কোন পুণ্য নাই বা না করিলে কোন পাপ নাই, এহেন কাজকে অবশ্য-কর্তব্য বা অবশ্য-পরিহার্য অর্থাৎ পুণ্য ও পাপের কারণ বলিয়া মনে করা—এবং এছলাম যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতে বলে নাই বা নিষেধ করে নাই, এরূপ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস পোষণ করা; এই শ্রেণীর আমল ও আকিদা অর্থাৎ অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের নাম—'বেদআৎ'। বলা আবশ্যক, বেদআতের সম্বন্ধ অধিকতর বিশ্বাসের (আকিদার) সহিত। কুসংস্কার ও কুলাচার কালক্রমে ধর্মের আসন অধিকার করিয়া বসে এবং ইহার ফলে মনুষ্যের যে ক্ষতি হয়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এছলাম প্রথম হইতে উহার মূলোৎপাটন করিয়া রাখিয়াছে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা কঠোর তাকিদ সহকারে মুছলমানদিগকে ঐ শ্রেণীর 'বেদআৎ' হইতে আত্মরক্ষা করিতে আদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। এই নিরক্ষর সংস্কারক, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধেও যে কিরূপ গভীর জ্ঞান ও সর্বদর্শী অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই ব্যাপার হইতেও তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

রাবীর চরিত্রাদির দিক দিয়া তাহার প্রতি যে পাঁচ প্রকার দোষারোপ হইতে পারে, তাহা উপরে বর্ণিত হইল। এখন স্মৃতি ও যোগ্যতাদির দিক দিয়া তাহার প্রতি যে পাঁচ প্রকার দোষারোপ হওয়া সম্ভব, নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে—

১। অবহেলা—রাবী হাদীছ শ্রবণ করার সময় বা তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে অবহেলা করিতেন।

২। ভ্রমপ্রমাদ—অন্য লোকের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিবার বা হাদীছ শুনাইবার সময় তাঁহার অনেক ভুল হইত

৩। রাবী হাদীছের 'ছনদে' বা 'মতনে' বিশ্বস্ত রাবীদিগের বিপরীত কথা বলিয়া থাকেন।

৪। হাদীছ বর্ণনায় রাবীর মনে অধিক সন্দেহের উদ্রেক হওয়া, অথবা এক হাদীছের ছনদ বা মতনকে অন্য হাদীছের ছনদ বা মতনে ঢুকাইয়া দেওয়া, 'মাওকুফ' হাদীছকে 'মারফু' বলিয়া বর্ণনা করা, ইত্যাকার 'অহম' বা বিভ্রম যদি কোন রাবী সম্বন্ধে সপ্রমাণ হয়।

৫। রাবীর স্মরণশক্তিতে দোষ থাকে।

আমাদের মোহাদ্দেছগণ, হাদীছ পরীক্ষার জন্য যে প্রকার কঠোর ও সূক্ষ্ম আইন-কানুন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, বেদ, বাইবেল প্রভৃতি জগতের কোন মূল ধর্মগ্রন্থের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যও কেহ তাহার শতাংশের একাংশ সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। যে সকল খ্রীষ্টান লেখক হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত করার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা হাদীছের সহিত তাঁহাদের মূল ধর্মশাস্ত্র বাইবেলের ঐতিহাসিক ভিত্তির তুলনায় সমালোচনা করিলে বাধিত হইব

উপরে যে পরিভাষাগুলি বর্ণিত হইল, উপস্থিতের মত আমাদের জন্য তাহাই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আশা করি।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### "'মারফু' হুকমী"

আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে 'মারফু' হাদীছের সংজ্ঞা অবগত হইয়াছি। হযরত যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, অথবা তাঁহার সম্মতিক্রমে যাহা করা বা বলা হইয়াছে, সেইরূপ কাজ ও কথার বর্ণনা যে হাদীছে আছে, তাহাকে 'মারফু' হাদীছ বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, যে হাদীছ 'মারফু'

নহে অর্থাৎ—রছুলুল্লাহ্ পর্যন্ত যাহার সূত্র পৌঁছে না, এছলামের হিসাবে তাহার সহিত আমাদের বিশেষ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ছাহাবী বা তাবেয়ীদিগের প্রত্যেকেই আমাদের নবী বা রছুল নহেন বা তাঁহাদিগকে আমরা অভ্রান্ত নিষ্পাপ ও মা'ছুম বলিয়াও মনে করি না। সুতরাং তাঁহাদের কথা বা কাজকে আল্লাহর কোরআন ও রছুলের হাদীছের ন্যায় অবশ্য-মান্য বলিয়া আমরা স্বীকারও করি না। কেবল স্বীকার করি না— তাহাই নহে, বরং এইরূপ স্বীকার করাকে এছলামের অতীত ও অতিরিক্ত একটা নূতন ধর্মের সৃষ্টি ও স্পষ্ট ধর্মদ্রোহ বলিয়া বিশ্বাস করি। আশা করি, আমাদের সহিত অনেকেই—অন্ততঃ বাহ্যতঃ—ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

## 'মারফু হুক্‌মী' হাদীছের ব্যাখ্যা

হাদীছের কেতাবে এবং ইতিহাস ও তফছির গ্রন্থে, এমন বহু হাদীছ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ছাহাবী ও তাবেয়ী একটা ঘটনার উল্লেখ করেন মাত্র। কিন্তু ঘটনাটা যে তিনি কি সূত্রে অবগত হইলেন, সে কথা আদৌ প্রকাশ করেন না। অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, ঐ হাদীছের মূল বর্ণনাকারী যিনি, তাঁহার বর্ণিত ঘটনায় তাঁহার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনে করুন, এবন-আব্বাছ বহু হাদীছে হযরতের জন্ম সময়ের অবস্থা এবং তৎকালে নানা প্রকার অলৌকিক কাণ্ডকারখানা সংঘটিত হওয়ার কথা বর্ণনা করিতেছেন। এবন-আব্বাছ এই সকল বিবরণ কাহার মুখে শুনিয়াছেন, তিনি তাহা কিছুই বলেন নাই। অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হযরতের ৫০ বৎসর বয়সের সময় এবন-আব্বাছের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এরূপ অবস্থায় এই হাদীছগুলিকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা হইবে ? মোহাদ্দেছগণ সাধারণভাবে বলিতেছেন যে, ঐগুলিও 'মারফু' হাদীছ অর্থাৎ উহাও হযরতের কথা ও কাজের ন্যায় গণ্য হইবে। দুই-একজন মোহাদ্দেছ, যাঁহারা এই দলছাড়া হইয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন,—এ কেমন কথা ? ঘটনার সাক্ষী যিনি তাঁহার জন্ম হইল ঘটনার ৫০ বৎসর পরে, তিনি কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন তাহাও তিনি বলিবেন না, অথচ আপনারা বলিতেছেন—ধরিয়া লইতে হইবে যে, তিনি হযরতের নিকট হইতে শুনিয়াই বলিয়াছেন ; এ কেমন যুক্তি ! কিন্তু অধিকাংশ যে দলে তাঁহারা বলিতেছেন, ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা অসম্ভব হইলেও এবং 'হযরতের মুখে শুনিয়াছি', ইহা না বলিলেও, মনে করিয়া লইতে হইবে যে, তিনি নিশ্চয়ই হযরতের বা অন্য কোন প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবার মুখে শুনিয়াই বলিয়াছেন।

## 'মারফু হুক্‌মী'র শর্ত চতুষ্টয়

তাঁহারা বলিতেছেন ঃ

(১) যে সকল ছাহাবী ইহুদী বা খৃষ্টানদিগের পুঁথিপুস্তকাদি হইতে কোন বিবরণ গ্রহণ বা বর্ণনা করেন না, তাঁহারা যদি এমন কোন বিষয়ের সংবাদ দেন যাহাতে এজ্‌তেহাদ* (logical deduction) করার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বর্ণনাগুলিও 'মারফু' হাদীছ বলিয়া গণ্য হইবে। যেমন পয়গম্বরগণের অতীত কেচ্ছা-কাহিনী, দুনিয়ার সৃষ্টি সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ব, অথবা ভবিষ্যতে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপ্লব-বিদ্রোহ, ফেৎনা-ফছাদ ইত্যাদি সংঘটিত হইবে ; কিংবা যেমন কিয়ামতের ময়দানের বিভীষিকার বর্ণনা ; অথবা কোন বিশেষ কার্যের জন্য কোন বিশেষ ছওয়াব বা আজাবের (পুণ্যের বা দণ্ডের) প্রতিশ্রুতি। এই সকল বিষয় হযরতের মুখ হইতে না শুনিয়া বলিবার কোনই উপায় নাই।

(২) অথবা, ছাহাবী যদি এমন কোন কাজ করেন যে, এজ্‌তেহাদ দ্বারা সেরূপ কাজ করা অসম্ভব—অর্থাৎ, হযরতকে সেইরূপ কাজ করিতে না দেখিলে, তাঁহারা সেইরূপ কাজ করিতেন না—তাহা হইলে ছাহাবীর সেই কাজও হযরতের কাজের ন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

---

* দার্শনিকভাবে, যুক্তিতর্কের হিসাবে সকল দিক আলোচনা পূর্বক একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে 'এজ্‌তেহাদ' বলা হয়

(৩) অথবা, ছাহাবী যদি প্রকাশ করেন যে, হযরতের সময় আমরা এইরূপ করিতাম বা এইরূপ করা হইত—ইত্যাদি, তবে তাহাও 'মারফূ' হাদীছবৎ পরিগণিত হইবে। সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে যে, ঐ কাজ মন্দ হইলে হযরত তাহা নিষেধ করিয়া দিতেন। পক্ষান্তরে উহার নিবারণ আবশ্যক হইলে আল্লাহ্ হযরতকে ঐ সকল কাজের বিষয় জানাইয়া দিতেন।

(৪) অথবা ছাহাবী বলেন—'ছোন্নৎ এইরূপ'—ইত্যাদি।

(শেখ আবদুল্লাহক ...'মোকদ্দমা')।

হাফেজ এবন-হাজর এ সম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি দিতেছেন ঃ

لان اخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة الا النبي صلعم او بعض من يخبر من الكتاب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني - (شرح نخبة - ص ۲۲)

অর্থাৎ,—"যে সকল কথা নিজে বিবেচনা করিয়া বা যুক্তি খাটাইয়া বলা চলে না, ছাহাবিগণ যখন সেইরূপ কথা বলিবেন, তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, অন্য একজন কাহারও মুখে শুনিয়াই তাঁহারা বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ছাহাবিগণ হয় হযরতের মুখে শুনিবেন, অথবা পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্র হইতে যাঁহারা গল্প বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাহারও মুখে অবগত হইবেন—ইহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সেই জন্য শেষোক্ত শ্রেণীকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর হাদীছ 'মারফূ হুকমী' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ('নোখবা' ৭৭)

## উপরোক্ত আলোচনার সার

এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের পূর্ব যুগের আলেমমণ্ডলী ছাহাবিগণের সমস্ত কথা ও কাজকে একেবারে বিনা শর্তে (Unconditionally) 'মারফূ হুকমী' বা প্রকারতঃ 'মারফূ' বলিয়া মানিয়া লন নাই। তাঁহারা বহু আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা এমন কতকগুলি নিয়ম গঠন করিয়া দিয়াছেন, যাহার দ্বারা 'প্রকারতঃ মারফূ' হাদীছগুলিকে ছাহাবিগণের ব্যক্তিগত কার্যকলাপ হইতে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সকল নিয়মের মূলেও যে যুক্তিবাদ, তাহা আমরা অল্প পূর্বেই দেখিয়াছি। সুতরাং তাঁহাদের উল্লিখিত যুক্তিগুলি আমরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।

তাঁহারা যে সকল নিয়ম গঠন করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা সহজে এই সার সংগ্রহ করিতে পারি যে, ঐ হাদীছগুলিকে হযরতের হাদীছবৎ মান্য করার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ না থাকায় তাঁহারা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে, যে হাদীছগুলি তাঁহাদের মতে যুক্তির হিসাবে 'মারফূ' বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য, সেগুলিকে তাঁহারা 'মারফূ' বা প্রকারতঃ হযরতের হাদীছ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। "যেখানে প্রত্যক্ষ শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব, সেখানে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে"—এই যে মূলধারা বা Principle, সকলেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। তবে যুক্তির হিসাবে তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তটি এবং তদুদ্ভূত নিয়মগুলি সঙ্গত কি-না, সে স্বতন্ত্র কথা। আমরা এখন এই বিষয়টির একটু আলোচনা করিব।

ওছুল-লেখকগণের সমস্ত যুক্তির মূল ভিত্তি নিম্নলিখিত ধারণাগুলির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে ঃ—

(ক) ছাহাবিগণের মিথ্যা বলা অসম্ভব—তাঁহাদের প্রত্যেকই আদল।

(খ) কতকগুলি কথা বা সংবাদ এরূপ আছে, যাহা অবগত হইতে হইলে, হয় তাহা হযরতের মুখে শুনিতে হইবে ; অথবা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের পুস্তকাদি পাঠে বা তাহাদিগের প্রমুখাৎ অবগত হইতে হইবে। এই দুই সূত্র ব্যতীত তাহা অবগত হইবার উপায়ান্তর নাই।

(গ) কোন ছাহাবী যখন ঐরূপ কোন কথা বলিবেন অথবা কোন অতীত বা ভবিষ্যৎ সংবাদ প্রদান করিবেন, তখন নিশ্চিতরূপে মনে করিতে হইবে যে, হয় তিনি প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া কিংবা ইহুদী বা খ্রীষ্টানদিগের মুখে শুনিয়া তাহা অবগত হইয়াছেন, অথবা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার মুখে তিনি ঐ সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছেন।

অতএব যখন কোন ছাহাবী ঐরূপ কোন কথা বলিবেন, এবং তিনি যে তাহা ইহুদী বা খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া না যাইবে,—তখন, পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুসারে, অগত্যা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, সেই ছাহাবী হযরতের নিকট হইতে অবগত হইয়াই ঐ সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কাজে কাজেই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও, প্রকারতঃ ঐগুলি হযরতের উক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

## অন্যায় সিদ্ধান্ত

আমাদের মতে ঐ যুক্তি পরম্পরার মধ্যে লুক্কায়িত প্রধান অন্যায় সিদ্ধান্ত (Fallacy) এই যে, উপরোক্ত লেখকগণ কোন কাজ করার প্রমাণাভাবকে, সেই কাজ না করার যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। আবদুল্লাহ্ ইহুদীদিগের নিকট হইতে রেওয়ায়াৎ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, অতএব (তাঁহাদের মতে) ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে, তিনি ইহুদীদিগের রেওয়ায়াৎ কখনই গ্রহণ করেন নাই। ইহা অন্যায় ও অদার্শনিক সিদ্ধান্ত, সুতরাং যুক্তির হিসাবে অগ্রাহ্যনীয়। জগতে এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের দানশীলতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ লোক-চক্ষের অগোচরে তাঁহারা দানশীল। এরূপ অনেক ব্যভিচারী লোকও আছে, যাহাদের ব্যভিচারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলতঃ عدم ثبوت الاخذ গ্রহণ করা প্রমাণিত না হওয়াকে, ثبوت عدم الاخذ গ্রহণ না করার প্রমাণ বলিয়া নির্ধারণ করা যাইতে পারে না।

## এই সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা

হযরতের ইন্তেকালের পূর্বে এবং খলিফা চতুষ্টয়ের সময়ে, কোন্ কোন্ দেশ ও কোন্ কোন্ জাতি এছলামের পতাকাতলে সমাগত হইয়াছিল, পাঠক মনে মনে তাহার একটা হিসাব অনুমান করিয়া লউন। তাহার পর, ঐ সকল দেশের অধিবাসিগণের ধর্মবিশ্বাস, চিরাচরিত সংস্কার এবং তাহাদের মধ্যে প্রচলিত পুরাণ-কাহিনী, রূপকথা ও কিংবদন্তি ইত্যাদির অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, হযরতের সমসাময়িক অন্ততঃ দশ লক্ষ মুছলমান পূর্বে পৌত্তলিক, পার্সিক, ইহুদী বা খ্রীষ্টান ছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের সমস্ত শাস্ত্রে, সাহিত্যে ও পুরাণ-পুঁথিতে সে সময় যাহা বিদ্যমান ছিল এবং যে সকল বিশ্বাস ও সংস্কার, অতীত ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত যে সকল কিংবদন্তি ও রূপকথা তখন তাহাদিগের মধ্যে বাচনিকভাবে প্রচলিত ছিল, সমসাময়িক মুছলমানগণের পক্ষে তাহা অজ্ঞাত না থাকা অসম্ভব। পক্ষান্তরে, তৌরেৎ ও ইঞ্জিল ব্যতীত ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ, পুরাণশাস্ত্র, পরকালতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আরও যে বহু সংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা প্রচলিত ছিল, আমাদের পূর্বতন আলেমবর্গ সম্ভবতঃ তাহা যথাযথভাবে অবগত হওয়ার সুযোগ পান নাই। কিন্তু আজ ইউরোপের জ্ঞানলিপ্সার কল্যাণে ঐ সকল পুস্তকের অধিকাংশেরই উদ্ধার, এমন কি অনুবাদ পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। যে সকল হাদীছকে 'মারফু হুকমী'— সুতরাং হযরতের উক্তি— বলিয়া কল্পনা করা হইতেছে এবং যে সকল হাদীছই আজ এছলামের অশেষ কলঙ্ক ও নানাবিধ

আলদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে. ইহুদীদিগের তালমুদ ইত্যাদি ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত ঐ শ্রেণীর পৌরাণিক পুস্তকাদিতে তাহার অধিকাংশের মূল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এই তালমুদের ইংরাজী অনুবাদ এখন প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা সহজে উহার মর্ম অবগত হইতে পারিতেছি। উক্ত-বেন ওনক্কের গল্পটি যে কিরূপে ইহুদীদিগের বাজে মার্কা গল্পের পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। যাহা হউক, এখানে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, বংশগত ও পারিপার্শ্বিক বিশ্বাস ও সংস্কার ও স্বদেশে ও স্বসমাজে বহুলভাবে প্রচারিত কিংবদন্তিগুলি নবদীক্ষিত মুছলমানদিগের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। যে সকল ইহুদী ও খৃষ্টান প্রকাশ্যভাবে এছলামের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হয় নাই—অথচ তাহারা মনে মনে এছলাম সম্বন্ধে যথেষ্ট বিদ্বেষ পোষণ করিত, তাহারা মুছলমানদিগকে এছলামধর্মে বিশ্বাসহীন ও নিজেদের ধর্মে আসক্ত করার জন্য, প্রচুর টীকা-টিপ্পনী সহযোগে ঐ শ্রেণির বিবরণগুলির প্রচার করিত। এই ভাবে নানা কারণে ঐ সকল বিবরণ জ্ঞাত থাকা বা হওয়া ছাহাবিগণের এবং তাঁহাদের সমসাময়িক অন্যান্য মুছলমানদিগের পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। বরং অবস্থা গতিকে সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, তাহাদিগের পক্ষে ঐ প্রকার বিবরণগুলি অবগত না হওয়াই অস্বাভাবিক। অধিকন্তু আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, খৃষ্টান ও ইহুদীদিগের নিকট হইতে রেওয়ায়ৎ গ্রহণ বা বর্ণনা করা, শরা' অনুসারে বৈধ বলিয়া নির্ধারিত ছিল :—

حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج *

খৃষ্টান-রাজ্য সমূহ জয় করার সময়, বিভিন্ন স্থান হইতে নানা প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুরাণ পুথি ছাহাবীদিগের হস্তগত হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা হইতে ভূত ভবিষ্যতের নানারূপ বিবরণ ও তথ্য সমসাময়িক মুছলমানদিগের মধ্যে বর্ণনাও করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ্-এবন-আমর-এবন-আছের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ছাখাভী তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ

فانه كان قد حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب

اهل الكتاب، وكان يخبر بها من الامور المغيبة حتى كان بعض

اصحابه ربما قال حدثنا عن رسول الله صلعم ولا تحدثنا

عن الصحيفة - (حاشية نخبة الفكر)

অর্থাৎ —"এরমুক যুদ্ধে ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের বহু পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি সেই সকল পুস্তক অবলম্বন করিয়া বহু অজ্ঞাত ঘটনা বর্ণনা করিতেন। এমন কি, তাঁহার কোন কোন শিষ্য অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, হযরতের হাদীছ বর্ণনা করুন—ঐ সকল কেতাবের বিবরণ বর্ণনা করিবেন না।"

উপরের বর্ণিত যুক্তিগুলির দ্বারা আমরা সহজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের বংশগত কিংবদন্তি ও প্রবাদ এবং তাহাদের বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি স্বতঃ বা পরতঃ ছাহাবীদিগের অধিকাংশেরই জানা ছিল। এ অবস্থায়, ছাহাবী ও তাবেয়িগণ ঐ সকল পুস্তক-পুস্তিকায়, নিজেদের পরম্পরাগত বিশ্বাস ও সংস্কারের এবং স্বদেশে ও স্বসমাজে প্রচলিত

---

* 'বোখারী', 'তিরমিজি'—আবদুল্লাহ-এবন-আমর-এবন-আছ হইতে। তবে হযরত ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহাদের পুরা-কাহিনীগুলি সম্বন্ধে সত্য বা মিথ্যা বলিয়া কোন প্রকার মতামত পোষণ করিও না। কিন্তু আজকাল সেইগুলিকে সত্য বলিয়া না মানিলেই কাফের হইতে হয়।

জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির উপর নির্ভর করিয়া বহু অজ্ঞাত বিবরণ ও ভাবী ঘটনাদি গল্পচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ প্রকার বর্ণনা করাতে ধর্মতঃ কোন দোষই নাই, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। সেগুলিকে সত্য বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করাই যখন হাদীছ অনুসারে নিষিদ্ধ, তখন এই গল্পগুজবগুলি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ আবশ্যকতাও সাধারণভাবে অনুভব করা হয় নাই। কিন্তু কালক্রমে অবস্থা একেবারে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে* এবং আজ মুছলমান, হযরতের স্পষ্ট আদেশের বিপরীত, ঐ বিবরণগুলিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাকেই এছলামের প্রধানতম উপকরণ বলিয়া মনে করিতেছে। যাহা হউক, যেহেতু প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ছাহাবা ও তাঁহাদের সমসাময়িকগণ—প্রায় সকলেই—হয় বংশগতভাবে, না হয় পারিপার্শ্বিকতার অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে, অথবা পুরাতন শ্রুতিগ্রন্থাদি অধ্যয়নের ফলে—ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের সংস্কার ও প্রবাদ (Tradition) সমূহ অত্যধিক পরিমাণে জ্ঞাত ছিলেন।

## আমাদিগের সিদ্ধান্ত

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে :—

(ক) যে সকল ছাহাবী খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করিয়া এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আর অপরের নিকট হইতে "গ্রহণের" কোন আবশ্যকতা ছিল না। ইহুদী ও খ্রীষ্টানের গৃহে জন্মলাভ করায় ও তথায় সেই অবস্থায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত লালিত পালিত ও বর্ধিত হওয়ায়, তাঁহাদের সংস্কার ও প্রবাদগুলি ইঁহাদের অস্থিমাংসের সহিত জড়ীভূত হইয়া যায়। সুতরাং তর্কীভূত স্থানসমূহে প্রমাণের ভার অন্য পক্ষেরই স্কন্ধে ন্যস্ত হইবে—অর্থাৎ তাঁহাদিগকেই সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, আলোচ্য 'মারফু হুক্মী' হাদীছের আখ্যায়ক ছাহাবী, উপরে বর্ণিত সকল প্রকার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন এবং বর্ণনার সূত্র সমূহের মধ্যে কোন সূত্রে ঐ বিবরণটি অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর ছিল না। বলা বাহুল্য যে, এই ধারণাগুলির মধ্যে এছলাম যেগুলির সংস্কার করে নাই, তাহা সেই ভাবে রহিয়া গিয়াছিল। এবং যেহেতু হযরত ফলিতজ্যোতিষ ইত্যাদির ন্যায় এগুলিকে অবিশ্বাস করিতে আদেশ প্রদান করেন নাই, অতএব পূর্ববৎ বা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সহকারে সেগুলি তাঁহাদের মধ্যে রহিয়া যায়। কাজেই অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের কেতাব হইতে রেওয়ায়ৎ না করিলেও, অর্থাৎ রেওয়ায়ৎ করার প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, তাহাদের পৌরাণিক বিবরণ ও সংস্কারাদি ছাহাবীদিগের দ্বারা বর্ণিত হইবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। বলা আবশ্যক যে, অধিকাংশ ঘটনায় এইরূপ হইয়াছে এবং এরূপ ক্ষেত্রে ওছুলকারগণের দাবী যে অসঙ্গত ও সেই দাবী অনুসারে দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করা যে অসম্ভব, বিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

(খ) যে সকল ছাহাবী ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম ত্যাগ করিয়া এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে এবং স্থানবিশেষে জেতা খ্রীষ্টানদিগের অধীনতার অবশ্যম্ভাবী কুফলে, তাহাদিগের সংস্কার ও পৌরাণিক কাহিনীগুলি—বহু স্থানে বিকৃত অবস্থায়—এই শ্রেণীর নব-দীক্ষিত মুছলমানগণের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হেজাজের দশ লক্ষ আরব হযরতের সময় এছলাম অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের প্রভাব ইহাদের উপর কিরূপ গভীর ও স্থায়ীভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল, পাঠকগণ এই পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে তাহার বিস্তর উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। মদিনার আওছ ও খজরজ বংশীয়রা ঘোর পৌত্তলিক ছিল, তবুও তাহারা বৈরাগ্যের দীক্ষা লাভ করিবার জন্য নিজ পুত্রদিগকে ইহুদী পুরোহিতগণের হাসতে প্রদান করিয়া আপনাদিগকে খুব সৌভাগ্যশালী ও মহাপুণ্যবান বলিয়া মনে করিত। হেজরতের পূর্বে প্রথম আক্কাবার যে বায়আৎ, তাহার মূলেও মদিনাবাসী ইহুদিগণের 'মেছিয়া' (মছিহ) বা শেষ পয়গম্বর সংক্রান্ত সংস্কারের প্রভাব কতদূর গাঢ়ভাবে কাজ করিয়াছিল, ইতিহাসের ছাত্রবর্গ তাহা সম্যকরূপে অবগত আছেন।

---

* হযরত ওমর কর্তৃক তৌরাতের নকল আনয়ন .......

ওছুলকারগণের বর্ণিত প্রতিজ্ঞার প্রথম অংশটাও যুক্তির হিসাবে অস্বীকার্য। প্রথমে, স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে, কোন ছাহাবী কোন অবস্থায় মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না। এই কথা মানিয়া লইলে কি ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই যখন যাহা বলিয়াছেন—তাহা সমস্তই সত্য ? আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এইরূপ ধারণা করা মারাত্মক দার্শনিক ভ্রম। একজন সত্যবাদী লোক অনেক সময় এরূপ কথা বলেন, যাহা সত্যও নহে—মিথ্যাও নহে, বরং নানা কারণে উৎপন্ন—তাঁহার দর্শন, শ্রবণ বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিভ্রম মাত্র। আবদুল্লাহর অমুক কথা সত্য নহে—অতএব তিনি মিথ্যাবাদী, ইহা অন্যায় যুক্তি ; কারণ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে একটা তৃতীয় স্তর আছে—তাহা হইতেছে ভ্রম ও প্রমাদ। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, ছাহাবিগণ মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, কেবল এইটুকু বলিলেই ওছুলকারদিগের প্রতিজ্ঞা ও তদুদ্ভূত সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। বরং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে ইহাও সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, তাঁহারা যুগপৎভাবে অভ্রান্ত ; অর্থাৎ—যেমন কোন অবস্থায় কোন ছাহাবী মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, তদ্রূপ কোন অবস্থায় তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও দ্বারা কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদও সংঘটিত হইতে পারে না। শায়খুল এছলাম ইমাম এবনে-তাইমিয়া এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ

واما الغلط فلايسلم منه اكثر الناس بل فى الصحابة من

قد يغلط احيانا وفيمن بعدهم - و لهذا كان فيما صنف فى

الصحيح احاديث يعلم انها غلط الخ - (كتاب التوسل - ص ٩٢)

অর্থাৎ—"কিন্তু অধিকাংশ লোকই ভ্রম-প্রমাদ হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না। ছাহাবীদিগের মধ্যে এরূপ লোকও ছিলেন, যাঁহারা সময় সময় ভ্রম করিতেন, তাঁহাদিগের পরবর্তী সময়েরও এই অবস্থা। এই জন্য 'ছহী' আখ্যায় যে সকল হাদীছ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এরূপ হাদীছ সকল আছে, যাহা ভ্রম বলিয়া পরিজ্ঞাত।" ('কেতাবুত-তাওয়াছ্ছোল'—৯৬ পৃষ্ঠা।

## ছাহাবা ও আদালৎ

ছাহাবিগণ সকলেই 'আদল'—এই দাবীর উপর আলোচ্য প্রতিজ্ঞাটির ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। প্রতিজ্ঞার এই মূল ভিত্তিটি কতদূর দৃঢ়, এখন আমরা তাহা পরীক্ষা করার চেষ্টা করিব।

যিনি "আদালৎ"-গুণসম্পন্ন তাঁহাকে আদল বলে। আদালৎ কাহাকে বলে ? ওছুলকারগণের প্রদত্ত সংজ্ঞাতেই বর্ণিত হইয়াছে ঃ—"মানুষের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক শক্তির উদ্বোধন ঘটা যাহাতে তিনি (ক) কোন প্রকারের অংশীবাদ বা শেরেকে লিপ্ত হইতে পারিবেন না, (খ) যাহাতে তিনি কোন ওয়াজেব বা অবশ্য কর্তব্য কাজ ত্যাগ করিতে অথবা কোন অবশ্য পরিহার্য বা হারাম কাজ অবলম্বন করিতে পারিবেন না, (গ) যাহাতে তিনি অনৈছলামিক কোন সংস্কার বা বিশ্বাস পোষণ করিতে পারেন না, (ঘ) এবং যাহাতে তিনি ঘৃণিত রুচির কোন কাজ করিতে পারেন না। মানুষের এই গুণের নাম আদালৎ এবং যাহার মধ্যে এই গুণ আছে, তিনিই আদল।"

ওছুল লেখকগণ বলিতেছেন, ছাহাবিগণ সকলেই আদালৎ গুণসম্পন্ন। কাজেই উপরে বর্ণিত (খ) দফার নির্দেশ অনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা কোন প্রকার হারাম কার্য করিতে পারেন না। মিথ্যা কথা বলাও হারাম, অতএব তাঁহারা মিথ্যা কথাও বলিতে পারেন না।

এছলামের বিধানানুসারে—মিথ্যা কথা বলা, মদ্যপান, ব্যভিচার, জুয়াখেলা, চুরি করা, মুছলমানকে গালাগালি দেওয়া, সুদ গ্রহণ, মুছলমানের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন, নগুলী মধ্যে বিক্রম

ঘটান, আত্মকলহ ইত্যাদি সমস্তই হারাম। কোন মুছলমানকে হত্যা করা হারাম, হত্যাকারী কোফরের সীমায় প্রবেশ করে। যাহা হউক, এই শ্রেণীর অনেক কাজই এছলামে হারাম বা অবশ্য পরিহার্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

'ছাহাবিগণ সকলেই আদল—তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না—" ইহাই হইতেছে ওছুল লেখকগণের সমস্ত যুক্তির ভিত্তি, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমাদের দুইটি কথা আছে। ছাহাবীদিগের মধ্যে একজন লোকও যে, কস্মিনকালে হযরতের নামে (অর্থাৎ হযরত বলিয়াছেন বলিয়া) একটি মিথ্যা হাদীছও কল্পনা করেন নাই,—Pious Fraud বলিয়া খ্রীষ্টান সাধু ও যাজকগণের মধ্যে যে ধর্মসঙ্গত জালিয়াতির প্রচলন ছিল, ছাহাবিগণ যে তাহা জানিতেন না,—কোন ন্যায়নিষ্ঠ ঐতিহাসিকই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু মিথ্যা করিয়া হযরতের নামে হাদীছ জাল করিয়া প্রচার করা এক কথা, আর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বংশের বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কারের এবং বিভিন্ন ধর্ম হইতে দীক্ষিত লক্ষাধিক ছাহাবীর প্রত্যেক নরনারী সম্বন্ধে এইরূপ নিশ্চিত Positive দাবী করা যে, তাঁহাদের কেহ জীবনের কোন অবস্থাতেই একটিও মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, ইহা অন্য কথা।

ছাহাবিগণকে ভক্তি করা এবং মোটের উপর সঙ্গত ভাবে তাঁহাদের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুছলমানের কর্তব্য। কিন্তু ভক্তি বলিতে অন্ধভক্তি বুঝায় না, অনুসরণের অর্থ ধর্মশাস্ত্র এবং জ্ঞান ও বিবেকের মুণ্ডপাতও নহে। দুনিয়ায় সকল ধর্ম-সমাজের ইতিহাস একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, এই শ্রেণীর অন্ধভক্তি হইতেই তাহাদের মধ্যে নর-পূজার সৃষ্টি হইয়াছিল। গায়ের-মা'ছুমকে মা'ছুম বলিয়া বিশ্বাস করাই অর্থাৎ যাঁহাকেই সাধুসজ্জন বলিয়া মনে করা হইবে, তিনিই সম্পূর্ণ ভাবে ভ্রম-প্রমাদের অতীত, কোন অবস্থাতেই ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাসই হইতেছে নর-পূজার ভিত্তি-প্রস্তর।

বড়ই দুঃখের ও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর লেখকগণ সাধারণ ভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব নহে।* আল্লাহর মহামহিম নবী, পূর্ণ এছলামের আদি-প্রকাশস্থল হযরত এবরাহিম তিনবার মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, যাহারা বোখারীর হাদীছ এমন কি কোরআন হইতে এই কথা সপ্রমাণ করিয়া থাকেন—শীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা নবী বংশের দ্বাদশ জন ইমামকে অভ্রান্ত ও মা'ছুম বলিয়া বিশ্বাস করার কারণে যাঁহারা শীয়াদিগের প্রতি কঠোর মন্তব্য প্রকাশে একটুও কুণ্ঠিত হন না—তাঁহারা সেই সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে ছাহাবিগণের পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, কিরূপে লক্ষাধিক নরনারীকে অভ্রান্ত, নিষ্পাপ ও মা'ছুম, এমন কি হযরত এবরাহিমের ন্যায় মহামহিম নবী অপেক্ষাও বহু গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা আমরা কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে জিজ্ঞাসা করি—হযরতের জীবনকালে মিথ্যা, জেনা, চুরি, মদ্যপান ও নরহত্যা ইত্যাদি হারাম কার্য কোন ছাহাবী কর্তৃক কখনও সম্পাদিত হয় নাই, এ কথা কি কেহ বলিতে পারেন? ঐ সকল পাপ কার্যের জন্য কতিপয় ছাহাবী নরনারীর দণ্ডভোগের কথা কি হাদীছে বর্ণিত হয় নাই? জিজ্ঞাসা করি, ওছমান, তাল্হা, জোবের প্রমুখ মহামান্য ছাহাবিগণকে হত্যা করা, পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া এবং ছাহাবীদিগের হস্তেই বহু সংখ্যক ছাহাবী হত্যা—এ সমস্তই কি এছলামের অনুমোদিত হালাল ও পুণ্য কার্য?** এইরূপ কার্য সম্পাদন করাতেও কি ছাহাবীর আদালৎ গুণের কোনই হানি হয় না? যদি দুই চারিজন ছাহাবী কর্তৃকও এই শ্রেণীর পাপ কার্য সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ওছুলের হিসাবে এইরূপ চরম সিদ্ধান্ত করা যে, তাঁহাদের মধ্যে একজনও কোন সময় ও কোন

---

* তাঁহারা বলেন—ইহা আল্লাহর ক্ষমতাতীত নহে—কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। তবে বাস্তবে উহার অস্তিত্ব নাই, কারণ তিনি পবিত্র ও দোষত্রুটিহীন।

** কোরআন ও বহু ছহী হাদীছে ইহার উল্লেখ আছে।

অবস্থায় একটি মিথ্যা কথাও বলিতে পারেন না, কখনও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই জন্য আমরা on principle এই অভিমতকে অস্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি।

## ছাহাবিগণ মা'ছুম নহেন

ফলতঃ ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছাহাবিগণ সকলেই মানুষ। তাঁহাদের অধিকাংশই অধিকাংশ সময়ে সাধারণভাবে অতি উজ্জ্বল, অতি নির্মল ও অতি মহান চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মানুষের ও মুছলমানের হিসাবে সেগুলি যে আমাদের ইহ-পরকালের পুণ্যময় আদর্শ স্বরূপ, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা অভ্রান্ত নহেন, নিষ্পাপ বা মা'ছুম নহেন, নবী বা রছুল নহেন। অতএব সময় সময় মানবীয় দুর্বলতার অলঙ্ঘনীয় প্রভাবে, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পদস্খলন হওয়াও অসম্ভব নহে। অধিকন্তু যে বিশাল সমষ্টি ছাহাবা নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক ব্যক্তিই ঠিক সমানভাবে এবং যথাযথরূপে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার চরিত্র-মাহাত্ম্যের প্রণিধান ও অনুসরণের—স্থানে স্থানে অনুচিকীর্ষা থাকা সত্ত্বেও—সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, হযরত আবু বকর ও ওমরকে বা আয়েশা ও আছমাকে, জ্ঞান-গরিমার ও চরিত্র-প্রভাবের দিক দিয়া আমরা যে সম্মান ও ভক্তির চক্ষে দর্শন করিব, এক লক্ষ দশ হাজার ছাহাবীর প্রত্যেক নর-নারীকে যাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত এরূপ আছেন, যাঁহারা জীবনে একদিন মাত্র দূর হইতে মোস্তফা-চরণ দর্শন বা তাঁহার বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—সে চক্ষে দর্শন করিতে পারি না। এই মানবীয় দুর্বলতা ও অসতর্কতার জন্য কোন কোন ছাহাবী 'উম্মুল মোমেনিন' (মোছলেমকুল জননী) বিবি আয়েশার প্রতি ঘৃণিত অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মছজিদে বসিয়া এক দল ছাহাবী দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়া দিলেন যে, হযরত তাঁহার সমস্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়াছেন। অবশেষে হযরত ওমর এই সংবাদ শ্রবণে স্বয়ং হযরতের নিকট তদন্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সংবাদটি বেল-আশাই ভিত্তিহীন।* হাদীছের কেতাব হইতে এইরূপ আরও বহু উদাহরণ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

## ছাহাবার হযরতের নাম উল্লেখ না করার কারণ কি ?

এই প্রসঙ্গে মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, ছাহাবিগণ হযরতকে দেখিয়া বা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াই যদি আলোচ্য কাজগুলি করিয়া এবং তর্কীভূত কথাগুলি বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সে কথা প্রকাশ করেন না কেন ! একই ছাহাবী অন্যান্য ঘটনা উপলক্ষে বলিতেছেন যে, আমি অমুক সময় হযরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি, অমুক স্থানে তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, হযরতের সম্মুখে বা তাঁহার জীবনকালে এইরূপ কাজ করা হইয়াছিল, হযরত তাহাতে আপত্তি করেন নাই। কিন্তু আলোচ্য হাদীছগুলি সম্বন্ধে তাঁহারা এরূপ কোন কথা বলেন না, বা আভাসে ইঙ্গিতে ঘুণাক্ষরেও এমন কোন ভাব প্রকাশ করেন না, যাহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা হযরতের মুখে শুনিয়া বা তাঁহাকে দেখিয়া ঐ কথা বলিতেছেন বা ঐ কাজ করিতেছেন। অধিকন্তু হযরতের কাজ ও কথাগুলিকে স্পষ্টতঃ হযরতের কাজ ও কথা বলিয়া প্রকাশ করিলে, লোকের নিকট তাঁহার মর্যাদা ও গুরুত্ব লক্ষ কোটি গুণে বাড়িয়া যাইত। এতৎসত্ত্বেও তাঁহারা কেন যে এত সতর্কতার সহিত তাহা গোপন করিতে যাইবেন, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ফলতঃ জোর-জবরদস্তি করিয়া লক্ষাধিক 'গায়ের মা'ছুমের' ক্রিয়া কলাপকে মোস্তফা-চরিত্রের উপর চাপাইয়া দেওয়ার এবং লক্ষ ছাহাবীর শতাব্দীব্যাপী কৃতকর্মের গুরুতর দায়িত্বভারকে এছলামের উপর অর্পিত করার কোনই হেতুবাদ, কোনই যুক্তি বা কোনই প্রমাণ নাই। সুতরাং 'মারফু হুকমী' বা

---

* বোখারী, ১—৯৫। বিজ্ঞ পাঠকগণকে এই প্রসঙ্গে 'কেতাবুল আগানী' পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রকারতঃ 'মারফূ' বলিয়া হাদীছের যে প্রকার ওছুলকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন, অধম লেখক তাহা স্বীকার করিতে সক্ষম নহে।

## অসম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী

যুগপৎভাবে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছাহাবিগণের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব, আমরা এই দাবী অস্বীকার করিতেছি মাত্র। কেহ বলিলেন—আব্দুল্লাহ্ খুব সৎ লোক, তাঁহার পক্ষে মিথ্যা কথা বলা সম্ভবপর নহে। যিনি এই কথা বলিতেছেন, তাঁহাকেই ইহার প্রমাণ দিতে হইবে। আমি যদি বক্তার এই দাবী অস্বীকার করি, তবে তাহার মানে এ হয় না যে, আমি আবদুল্লাহ্‌কে মিথ্যাবাদী বলিতেছি। মানুষের পক্ষে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করা অসম্ভব নহে, অথচ কোটি কোটি নর-নারী বিষও খাইতেছে না—আত্মহত্যাও করিতেছে না। অর্থাৎ আমার পক্ষে যাহা অসম্ভব নহে, তাহা যুগপৎভাবে অবশ্যম্ভাবীও নহে ;—আমি জীবনে কখনই তাহা নাও করিতে পারি।

## মারফূ হুক্‌মীর দুইটি শর্ত

কোন হাদীছকে 'মারফূ' বলিয়া হুকুম দিবার জন্য ওছুলকারগণ দুইটি শর্ত নির্ধারণ করিয়াছেন। প্রথম এই যে, রাবী আহলে-কেতাব হইতে রেওয়ায়ৎ গ্রহণ করেন না। ইহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, ছাহাবীর সেই কথায় এজ্‌তেহাদ করার সম্ভাবনা না থাকে,—অর্থাৎ যুক্তিতর্ক দ্বারা বিবেচনা করিয়া তাদৃশ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর না হয়। এই দুই শর্তে ঐ হাদীছটি 'মারফূ' বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই "এজতেহাদের গুঞ্জায়েশ" কথাটার অর্থও আমরা সম্যকরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এজতেহাদ বলিতে, আজকালকার পরিভাষায় যাহা বুঝাইয়া থাকে, তাহার তিন শ্রেণীর ও বহু শর্তের সকলগুলি খাটাইয়া দেখিয়া এজতেহাদ করিয়া বলা সম্ভব কি-না—তাহা যে কিরূপে নির্ধারিত হইবে, আমরা তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। ওছুলকারগণ—আমরা যতদূর সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—এই এজতেহাদের কোন সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন—এজতেহাদের সম্ভাবনা নাই, যেমন মালাহেম। কিন্তু ইহা ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা নহে—উদাহরণ। ইহার একটা ধরাবাঁধা নিয়ম না হইলে প্রত্যেক বিষয়ে মতভেদ হইতে পারিবে। তুমি বলিবে, এই বিষয়ে বুদ্ধি-বিবেচনার কোন অধিকার নাই; আমি বলিব, খুব আছে। ইহার মীমাংসা কিরূপে হইবে, ওছুলকারগণ তাহার কোন স্পষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি নাই। একটা উদাহরণ দিতেছি ঃ—ওছুল লেখকগণ যে সকল বিবরণে এজতেহাদের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহার উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন, যেমন মালাহেম—অর্থাৎ ভবিষ্যতের যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি সংক্রান্ত বর্ণনা। তাঁহারা বলিতেছেন, কাহার সহিত কোন্ সময় কোন্ জাতির যুদ্ধ বাধিবে—ইত্যাকার কথা কেহ বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাইয়া বলিতে পারে না। কিন্তু আমি বলিব, কেন পারিবে না ? সময় ও অবস্থা বিশেষে জ্ঞানী ও দূরদর্শী রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিতেরা, ভাবী যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে অনুমান করিয়া অনেক কথা বলিয়া দিতে পারেন। এই চোখের সম্মুখে ইউরোপ জোড়া কাল-সমরের যে নারকীয় অভিনয় হইয়া গেল, বার্ণহার্ডি প্রমুখ লেখকেরা তাহার কথা এবং তাহাতে সংঘটিত বড় বড় ব্যাপারগুলির বিবরণ পূর্ব হইতে অনুমান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। বার্ণহার্ডি কৃত "জর্মনী ও ভাবী যুদ্ধ" পুস্তক* পাঠ করিয়া দেখিলেই সকলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ফলতঃ আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অশোভনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও, ন্যায় ও যুক্তির খাতিরে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কোন হাদীছকে 'মারফূ হুক্‌মী' বলিয়া স্বীকার করাকে আমরা যুক্তিহীন, অসঙ্গত ও অন্যায় বলিয়া মনে করি। অতিভক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, জ্ঞান ও ধর্মের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, ছাহাবিগণ যাহা বলিয়াছেন বা

---

* ইহার ইংরাজী, বাংলা ও উর্দু অনুবাদ হইয়া গিয়াছে।

করিয়াছেন, তাহার জন্য ছাহাবিগণই দায়ী ; হযরতের বা এছলামের তাহার জন্য কোন জওয়াবদিহি নাই। অতএব কোন ঘটনায় অনুপস্থিত কোন ছাহাবী যদি সেই ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা বলেন, তাহা হইলে সাক্ষ্য আইনের দার্শনিক যুক্তি-তর্কানুসারে আমরা সাক্ষ্যের হিসাবে তাঁহার কথার ঐতিহাসিক মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিব এবং বিচার ফল অনুসারে তৎসম্বন্ধে মতামত নির্ধারণ করিব। বলা আবশ্যক যে, অন্যায় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লক্ষাধিক ছাহাবীর শতাব্দীব্যাপী কার্য কলাপের, তাঁহাদের সংস্কার ও বিশ্বাসের এবং অনুমান ও বিভ্রমাদির দায়িত্ব হযরতের তথা এছলামের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়ায় এবং সেগুলিকে হযরতের বাক্য ও কার্য বলিয়া গণ্য করায়, এছলামের পবিত্র জ্ঞান ভাণ্ডারে যে পিণ্ডীকৃত অন্ধতা এবং পুঞ্জীভূত অন্ধকার সঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, বহু শতাব্দীর চেষ্টা ব্যতীত তাহা সম্যকরূপে বিদূরিত হওয়া সম্ভব নহে।

# নবম পরিচ্ছেদ

## জাল ও অপ্রামাণিক ও মাউজু' হাদীছ

### হাদীছের জাল হওয়ার মূল কোথায়

যে সকল হাদীছের দ্বারা দীনের কোন মছলা অর্থাৎ হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজেব প্রভৃতি শরিয়তের কোন আদেশ নিষেধ প্রমাণিত না হয়, আমাদের মোহাদ্দেছগণ সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা বা কঠোরভাবে তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক মনে করেন নাই। একদিকে এই সতর্কতার অভাব, অন্যদিকে নানা স্বাভাবিক কারণের প্রাদুর্ভাব, এই দুয়ের সম্মিলনে শত সহস্র মিথ্যা এবং জাল ও অপ্রামাণ্য 'হাদীছ' হযরতের ও ছাহাবিগণের নামে—ধর্মের বাজারে চালাইয়া দিবার যে সকল চেষ্টা হইয়াছিল, আমরা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

### ছাখাভীর অভিমত

ইমাম ছাখাভী রচিত 'আলফিয়া'র (আরবী সহস্রপদীর) টীকাকার, হাফেজ জাইনুদ্দীন-এরাকী উছুলের একজন বিখ্যাত ইমাম। তাঁহার 'ফৎহুল মুগীছ' নামক পুস্তক হইতে প্রথমে কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতবর্গ একবাক্যে অস্বীকার করিলেও, একদল লোক বলিয়াছেন যে, ترغيب و ترهيب বা লোকদিগকে সৎকার্যে রত করার বা অসৎ কার্য হইতে নিরস্ত রাখার জন্য হযরতের নাম জাল করিয়া হাদীছ তৈয়ার করিয়া লওয়া সঙ্গত। কারণ মিথ্যা হাদীছ বানাইতে হযরত যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে من كذب علي আছে। 'আলাই-য়া' অর্থে 'আমার বিরুদ্ধে'—এইরূপ ভাব বুঝায়। অতএব অর্থ এই হইল যে, যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা হাদীছ বলিবে। বিরুদ্ধে বলা—যেমন, কেহ তাঁহাকে যাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে। আমরা তাঁহার ও তাঁহার ধর্মের সমর্থনের জন্যই হাদীছ বানাইব, বিরুদ্ধাচরণের জন্য নহে। অতএব ঐ নিষেধ বা তাহার দণ্ড আমাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে।"*

### জালিয়াতগণের শ্রেণীবিভাগ

"জাল হাদীছ প্রস্তুতকারিগণ কয়েক দলে বিভক্ত। একদল নিজেদের সদসৎ উদ্দেশ্য সফল

---

* ১১০ পৃষ্ঠা। 'মোকাদ্দামাত এবনুছ-ছালাহ্ ৪৪, ৪৫ পৃষ্ঠা ও 'নোখবা' ৫৮, ৫৯ পৃষ্ঠাতেও এই সকল কথা বর্ণিত হইয়াছে।

করার জন্য নিজেরাই হাদীছের বাক্যগুলি রচনা করিয়া লইয়াছে। আর একদল, জ্ঞানী ব্যক্তিগণের, সাধুসজ্জনবর্গের, ছাহাবিগণের অথবা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত উক্তি ও কিংবদন্তিগুলিতে, এক একটা মিথ্যা ছনদ (সূত্র) জুড়িয়া দিয়া সেগুলিকে হযরত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছে। আকীলি, মোহাম্মদ-এবন-ছঈদ হইতে রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন ঃ—

لابأس اذاكان كلام حسن ان يضع له اسناد

অর্থাৎ—"বাক্যটি যদি সৎ হয়, তবে তজ্জন্য একটা সূত্র-পরম্পরা গড়িয়া লওয়াতে, অর্থাৎ মিথ্যা করিয়া তাহাকে হাদীছে পরিণত করাতে, কোনই দোষ নাই।" "তিরমিজি' বলেন, আবু মোকাতেল খোরাছানী লোকমান হাকিমের উপদেশ সম্বন্ধে আওন-এবন-শাদ্দাদ হইতে বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেন। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে বলিলেন, আপনি—'আওন আমাকে বলিয়াছেন' এরূপ কথা বলিবেন না। কারণ আওনের নিকট হইতে আপনি ঐ সকল হাদীছ নিশ্চয়ই শ্রবণ করেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া আবু মোকাতেল বলিলেন, "ইহাতে দোষ কি, বাবা ? এই কথাগুলি ত খুবই ভাল। .........জরকাশী—আমাদের গুরু ও

مقصد রচয়িতা আবু আব্বাছ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আরও বিস্ময়জনক। তাঁহারা বলেন,—

কিয়াছবাদী ফেকাওয়ালাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, কিয়াছের দ্বারা কোন কথা প্রমাণিত হইয়া গেলে, সেই কথাকে হাদীছে পরিণত করার জন্য, হযরতের নামে অর্থাৎ হযরত বলিয়াছেন বা করিয়াছেন এইরূপ বলিয়া—একটা মিথ্যা ছনদ গড়িয়া লওয়া জায়েজ। এবং এই নিমিত্ত তাঁহাদের পুস্তকগুলিকে তুমি এমন হাদীছ সমূহে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইবে—যাহার ছনদ ত দূরের কথা। মতনগুলিই সাক্ষ্য দিতেছে যে, সেগুলি তৈরী ও জাল। সেগুলি ঠিক যেন ফেকাহওয়ালাদের ফৎওয়া, নবী-রাজের বাক্যের সহিত তাহার কোনই সামঞ্জস্য নাই—এবং এই জন্য তাঁহারা নিজেদের হাদীছগুলির কোন ছনদই দেন না।"

"আলায়ী বলেন,—সকল দলের অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী اهل الزهد—যাহারা খুব পরহেজগারী দেখাইয়া থাকে,* এবনে ছালাহ্ এই কথা বলিয়াছেন। এবং এইরূপেই অনিষ্টকর সেই সকল المتفقهة—ফেকহ্‌বাদীরা, যাহারা নিজেদের কিয়াছের ফলগুলিতে ছনদ জুড়িয়া

দিয়া সেগুলিকে হযরতের হাদীছে পরিণত করাকে সঙ্গত কাজ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই দুই দল (সুফী ও ফেকাহবাদী) ব্যতীত আর যাহারা আছে, যেমন জিন্দীকের দল প্রভৃতি, তাহাদিগকে অনায়াসে ধরিয়া ফেলা যাইতে পারে। কারণ, নিতান্ত মূর্খ ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর সকলেই তাহাদের রচিত হাদীছগুলিকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়া লইতে সক্ষম। এইরূপ, বাদশাহ্ ও আমীরগণের মোছাহেবদিগের এবং কথক বা ওয়াজ ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা বর্ণিত মিথ্যা হাদীছগুলির অবিশ্বাস্যতাও সহজে ধরা যাইতে পারে। আমাদের গুরু বলেন, সেই হাদীছগুলিকে ধরিতে পারা সর্বাপেক্ষা কঠিন—যাহার বর্ণনাকারিগণ ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলেন না, কিন্তু ভ্রমবশতঃ ছাহাবা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের কথাগুলিকে হযরতের কথা বলিয়া বর্ণনা করিয়া বসেন।" (১১১ পৃষ্ঠা)

এই শ্রেণীর ভ্রমপ্রমাদের কতকগুলি নজির দেওয়ার পর, গ্রন্থকার বলিতেছেন—"কতিপয় হাদীছ বর্ণনাকারী এরূপ ছিলেন, যাঁহাদের স্মরণ বা দর্শন শক্তি অথবা পুস্তকের মুসাবেদা নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, যাহা তাঁহাদের হাদীছ নহে—ভ্রমক্রমে তাঁহারা সেগুলিকে নিজেদের হাদীছ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ক্ষতি অত্যন্ত মারাত্মক, হাদীছের সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ ইমামগণ ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে এই গলদগুলি ধরিতে পারা সম্ভবপর নহে।। ১১২ পৃষ্ঠা।।

---

* ইমাম আলায়ী ছুফীদিগের কথা কহিতেছেন। ইহাদের দ্বারা কিরূপ অসংখ্য মিথ্যা হাদীছের সৃষ্টি হইয়াছে, পরে তাহা বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত হইবে

তফছির, ইতিহাস ও অপেক্ষাকৃত অল্প মর্যাদার হাদীছ গ্রন্থ সমূহের বিবরণগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে তাহাতে এমন বহু হাদীছ দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহা ছাহাবিগণের বা স্বয়ং হযরতের উক্তি বা কার্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। অথচ নানা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, সেগুলি অসংলগ্ন, অবিশ্বাস্য ও অপ্রামাণিক। বিশেষ করিয়া তফছির ও ইতিহাসে—এই শ্রেণীর রেওয়ায়ৎগুলি পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। আমরা আজকাল সেগুলিকে হাদীছ বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। এই সকল স্থলে আমরা সাধারণতঃ যে সকল ভ্রম-প্রমাদের বশবর্তী হইয়া থাকি, এই সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভে তাহা সবিস্তার আলোচনা অসম্ভব। তাই সর্বজনমান্য দুই জন মোহাদ্দেছের পুস্তক হইতে নমুনা স্বরূপ তাহার দুইটা উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি।

## প্রমাদের নমুনা

আল্লামা জাইনুদ্দীন এরাকী বলিতেছেন ঃ

و قد ترد "عن" ولا يقصد بها الرواية، بل يكون المراد سياق قصة
سواء ادركها ويكون هناك شئ محذوف تقديره "عن قصة فلان"
وله امثلة كثيرة، من ابينها ما رواه ابن ابي خيثمة في تاريخه" ثنا
ابي ثنا ابو بكر بن عياش عن ابي الاحوص يعني عوف بن مالك انه
خرج عليه خوارج فقتلوه. وبه قال موسى بن هارون. فقلد بن
صبن البرق التمهيد عنه. وكانت الشيخة الاولى جائزا عندهم
ان يقولوا عن فلان ولا يريدون بذلك الرواية، وانما معناه عن
قصة فلان - (فتح المغيث - ص ٧٥)

ইহার মর্ম এই যে ঃ—"অনেক সময় রেওয়ায়তে "আন" শব্দের উল্লেখ থাকে। সাধারণতঃ ইহার অর্থ হইবে—"হইতে"। যেমন বলা হয়, "আন এবনে আব্বাছ" অর্থাৎ এবন আব্বাছ হইতে বর্ণিত। কিন্তু আবার বহু স্থানে উহার অর্থ "হইতে" না হইয়া 'সম্বন্ধে' হইবে। এরূপ স্থলে, "আন ওমর" এই পদের অর্থ 'ওমর হইতে বর্ণিত', এইরূপ না হইয়া 'ওমর সম্বন্ধে কথিত' এইরূপ হইবে। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। তাহার মধ্যে আবু খায়ছামা কর্তৃক তাঁহার 'তারিখে' বর্ণিত হাদীছটি খুবই স্পষ্ট আবু খায়ছামা বলেন—আমার পিতা বলিয়াছেন, আবু বকর-এবন-আইয়াশ, আওফ-এবন-মালেক সম্বন্ধে বলিতেছেন, যে, খারেজীগণ তাঁহার প্রতি আপতিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। এখানে 'আন' মানে 'সম্বন্ধে' না হইয়া 'হইতে' (অর্থাৎ প্রমুখাৎ বর্ণিত। অর্থ লইলে, হাদীছটির মর্ম এইরূপ দাঁড়াইবে যে, খারেজিগণ আওফকে হত্যা

করিয়া ফেলার পর, সেই আওফই আবার শাহ্ বক্রের নিকট নিজের নিহত হওয়ার বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এবন-আবদুল-বার, মুছা এবন-হারুনের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—প্রাথমিক যুগের আলেমগণ 'আন্ ফোলানিন' বলিতেন, কিন্তু ইহা'র 'অমুক হইতে এই রেওয়ায়ৎ বর্ণিত' অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'অমুকের গল্প সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে' এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করিতেন।" ('ফৎহুল্ মুগিছ', ৬৮ পৃষ্ঠা)।

শাহ্ অলিউল্লাহ বলিতেছেন ঃ

جمعے از قدماے مفسرین آں تعریض را بپیشوائے خود سازند و محملے مناسب آں
تعریض فرض کنند و آں را در رنگ احتمال تقریر کنند۔ متاخرین در شبہ افتند و چوں
اسالیب تقریب دراں زماں منقح نشدہ بود، تقریب علی سبیل الاحتمال بتقریب بالجزم
بسیار ست کہ مشتبہ شود۔ یکے را بجائے دیگر گیرند۔ و ایں امر مجتہد فیہ است۔ نظر و
عقل را دریں گنجائش است ..... (فوز الکبیر۔ ص۔ ۴۱)

ইহার সারমর্ম ঃ—"প্রাচীন তফছিরকারগণের মধ্যে অনেকের ধারণা এই যে, তাহারা এক একটা বিষয় ও এক একটা বিবরণ সম্বন্ধে পরোক্ষরূপে (Allusively) বর্ণিত একটা আনুমানিক ঘটনার সামঞ্জস্য উদ্ভব করার চেষ্টা সর্বদাই করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহারা এক একটা সম্ভাব্য ঘটনা খুঁজিয়া বাহির করেন এবং 'এইরূপ হওয়া সম্ভব' মনে করিয়া পরোক্ষভাবে সেইরূপে তাহার বর্ণনা করেন। সে কালে বর্ণনা প্রণালী পরিমার্জিত না হওয়াতে, পরবর্তী যুগের লেখকগণ ঐ সকল সম্ভাব্য বলিয়া বর্ণিত ব্যাপারকে নিশ্চয় ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এইরূপে বহুস্থলে 'সম্ভব ও সংঘটিত' এই দুই শ্রেণীর ব্যাপারগুলিকে এক সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে লোকে একটাকে অন্যের স্থলে গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু এ বিষয়টি হইতেছে এজতেহাদের, ইহাতে জ্ঞানের যথেষ্ট অধিকার আছে।" অর্থাৎ জ্ঞান বা যুক্তি দ্বারা আমরা এই শ্রেণীর হাদীছগুলির আবার বাছাই করিয়া ফেলিতে পারি। ('ফওজুল-কবির', মোহাম্মদী প্রেস, ৪১ পৃষ্ঠা)।

## এছরাইলী রেওয়ায়তের প্রভাব

শাহ্ ছাহেব আরও বলিতেছেন ঃ

نکتہ دوم آنکہ نقل از بنی اسرائیل بسیار ست کہ در دین ما داخل شدہ بجواز
آنکہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم قاعدۂ مقررہ است۔

অর্থাৎ—"আর একটি গূঢ়তত্ত্ব এই যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে (আগত বিশ্বাস সংস্কার ও কিংবদন্তিগুলি) প্রচুরভাবে আমাদের ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের স্বীকৃত

শাস্ত্রীয় বিধান এই যে, "ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের বর্ণনাগুলিকে সত্য বা মিথ্যা কোন প্রকার বলিও না।" অর্থাৎ এই শাস্ত্রীয় বিধান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও লেখকগণ ঐ সকল বিবরণকে সত্যরূপে গ্রহণ ও বর্ণন করিয়াছেন। ( ঐ ঐ)।

## তফছীর ও ইতিহাসে ঐ রেওয়ায়তগুলির প্রাদুর্ভাব

আল্লামা এবনে খাল্‌দুন জগতে সর্বপ্রথমে দার্শনিক হিসাবে ইতিহাসের সমালোচনা করেন, ইঁহার ইতিহাসের ভূমিকাখণ্ড (মোকাদ্দমা) বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারের একটা অনুপম সম্পদ। এবনে খল্‌দুন উক্ত ভূমিকায় লিখিতেছেন ঃ—

"আরবদিগের মধ্যে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ বা জ্ঞান বিদ্যমান ছিল না। অসভ্যতা ও মূর্খতায় তাহারা আচ্ছন্ন ছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব, তাহার পুরা-কাহিনী, তাহার বৈচিত্র্য এবং অন্যান্য বিষয়ে যখন তাহাদের কোন কথা জানিবার আবশ্যক হইত, তখন তাহারা আপনাদের প্রতিবাসী ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিত। কিন্তু সে সময়ে আরবে যে সকল ইহুদী বাস করিত, মূর্খতায় তাহারাও আরবদিগের সমান ছিল। ঐ শ্রেণীর জনসাধারণের পক্ষে তৌরেৎ সম্বন্ধে যেরূপ এবং যতটা জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, তাহারা তদতিরিক্ত কিছুই জানিত না।" অর্থাৎ তৌরেৎ সম্বন্ধেও তাহাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ও নানা কাল্পনিক কাহিনীতে পর্যবসিত ছিল। উহাই হাত ফেরতা হইতে হইতে আমাদের ইতিহাস ও তফছিরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, এবনে খল্‌দুন এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন ঃ

وملؤا كتب التفسير بهذه المنقولات واصلها كما قلنا عن اهل التوراة

الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلون بذلك

الخ (مقدمة ابن خلدون)

অর্থাৎ—"আমাদের লেখকগণ ঐ সকল কিংবদন্তি ও গল্প-গুজব নকল করিয়া তফছিরের কেতাবগুলিকে ভরিয়া দিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল গল্পের মূল মূর্খ ও অজ্ঞ মরুপ্রান্তরবাসী ইহুদিগণের নিকট হইতে গৃহীত। অথচ তাহারা যাহা নকল করিতেছেন, তাহার সত্যাসত্য তাঁহারা পরীক্ষা করিয়াও দেখেন নাই।" (মোকদ্দামা এবনে খল্‌দুন)।

দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের প্রাথমিক যুগের আলেমগণ ধর্মের হিসাবে অনাবশ্যক বলিয়া যে সকল হাদীছের পরীক্ষা সম্বন্ধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, অতিরঞ্জন পটু লেখকগণের কৃপায় এবং অতিভক্ত মুছলমানদিগের কল্যাণে, কালে তাহাই এছলামের সর্বাপেক্ষা আবশ্যক, বিশ্বাস্য ও অবশ্য মান্য অংশে পরিণত হইয়া গিয়াছে। উপরে বর্ণিত সূক্ষ্ম নিয়মগুলির প্রতিও মধ্যযুগে সাধারণভাবে ও অন্যায়রূপে অবহেলা প্রদর্শন করা হইয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফল এই দাঁড়াইল যে, সে সময় ধর্মের নামে, এমন কি ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে, যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক পুস্তকের প্রত্যেক কথাকেই পরবর্তী যুগের লেখকগণ চোখ বুজে করিয়া প্রামাণ্য শাস্ত্রোক্তিরূপে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই দুরবস্থার পূর্ণতার ও পূর্ণ পরিণতি দুই শতাব্দী পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন কেবল 'রেওয়ায়েৎ হায়' বা 'কেতাবে খবর' এই কথাটুকু বলিয়া ছাপার অক্ষরে তুমি যাহা ইচ্ছা প্রকাশ কর না কেন, অতিভক্ত ও অন্ধভক্ত মুছলমান তাহা স্বীকার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবে না। এমন কি, আমরা এরূপ অনেক

লোকও দেখিয়াছি, যাহাদিগের জ্ঞানের সহিত তাহাদের বিশ্বাসের সামঞ্জস্য নাই।* তাহাদের জ্ঞান বলিতেছে, ঐ গুলা মিথ্যা। কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের ভূত এমনভাবে তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া আছে যে, তাহার ফলে তাহারা নিজেদের জ্ঞানফলকে মস্তকের এক কোণে ধামাচাপা দিয়া আত্মবঞ্চনাপূর্বক স্বস্তি লাভ করিয়া থাকে। তাই আজ উর্দু কেচ্ছা-কাহিনী এবং মৌলুদ কাওয়ালী প্রভৃতিতে, এমন কি ওয়াজ-নছিহত শিক্ষার পুস্তক সমূহেও এই সব রেওয়ায়াতের কল্যাণে এমন হাজার হাজার অনৈছলামিক, অপ্রামাণিক, অনৈতিহাসিক, গাঁজাখুরি গালগল্প ও মূর্খ-জন মনঃপূত হাস্যজনক জনশ্রুতি স্তূপীকৃত হইয়া আছে যে, জ্ঞান, বিবেক ও ঐতিহাসিক সত্যের—এমন কি বহু স্থলে এছলামের মূলনীতির—সহিত স্থায়ী ভাবে অবনিবনাও না করিয়া, কেহ সেগুলিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। হায়, হায় ! যে মহিমময় মহাপুরুষের পবিত্র হৃদয় আকাশের ন্যায় প্রশস্ত, সমুদ্রের ন্যায় গভীর এবং পর্বতের ন্যায় অটল,—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অধিকারবাণী দ্বারা বিশ্বজনগণের অন্তরে অন্তরে জীবনের প্রেরণা জাগাইবার জন্যই যাঁহার আবির্ভাব,—এহেন মোস্তফা-চরিত এই শ্রেণীর হতভাগ্য লেখকগণের কৃপায় আজ অন্ধকারে অজ্ঞানে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, বিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী মোহাদ্দেছগণের অবলম্বিত নীতি (Principle) নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সূক্ষ্ম গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংঘর্ষে বা বিধর্মী লেখকগণের আক্রমণে আমাদের গ্রন্থকারগণকে বর্তমানের ন্যায় মর্মবিদারক আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া জ্ঞানী সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না।

## দশম পরিচ্ছেদ

### হাদীছ মাউজু' হওয়ার কারণ কি ?

প্রাথমিক যুগের বিচক্ষণ মোহাদ্দেছগণ হাদীছ-শাস্ত্রের পবিত্রতা ও প্রামাণিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জ্ঞানের সেবায় নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অথচ এই সকল হাদীছ সম্বন্ধে তাঁহারা এরূপ মারাত্মক উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন, বাহ্যতঃ ইহা খুবই আশ্চর্যের কথা বলিয়া মনে হয়। সাধারণ পাঠকবর্গের এই কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য নিম্নে এতাদৃশ অবহেলার কারণ সম্বন্ধে কয়েকজন সর্বজনমান্য মোহাদ্দেছের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

### মূলের ভুল

''মাউজু' বা জাল হাদীছ ব্যতীত, অন্য সকল প্রকারের দুর্বল (জঈফ) হাদীছ সম্বন্ধে ইমামগণ শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সকল হাদীছের সূত্র মাত্র বর্ণনা করিয়া, অর্থাৎ ঐ সব হাদীছের দুর্বলতার বিষয় বিশেষরূপে প্রকাশ না করিয়া দিয়া, ক্ষান্ত থাকেন। অবশ্য ওয়াজ-নছিহৎ, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব, কার্যবিশেষের পাপ বা পুণ্য এবং এই প্রকারের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে এই কথা। কিন্তু যেখানে হাদীছের দ্বারা হালাল-হারাম, ফরজ-ওয়াজেব, কোন আকিদা এবং শরিয়তের এইরূপ অন্য কোন হুকুম প্রমাণিত হয়, সেখানে কেবল হাদীছের সূত্র বর্ণনা-পূর্বক ক্ষান্ত না হইয়া অভ্যন্তরস্থ দোষ-দুর্বলতাগুলি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিয়া দেওয়াও তাঁহারা হাদীছ সঙ্কলকের কর্তব্য বলিয়া মনে করেন।''

---

* [illegible] = Knowledge and belief। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস।

"এই প্রকারে, হাদীছের অবস্থাভেদে পরীক্ষার শৈথিল্য বা কঠোরতা অবলম্বন, ইমাম আহমদ-এবন-হাম্বল, এহ্য়া-এবন-মুইন, এবন-মোবারক প্রভৃতি বহু ইমাম কর্তৃক বর্ণিত ও সমর্থিত হইয়াছে। এমন কি, বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবু-আহমদ-এবন আদি ঐ শৈথিল্যের সিদ্ধতা সপ্রমাণ করার জন্য একটি স্বতন্ত্র "ভূমিকা" লিখিয়াছেন। খতিব তাঁহার 'কেফায়া' পুস্তকের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মোহাদ্দেছ এবন-আবদুল-বার বলিতেছেন ঃ—ফাজায়েল (কোন সময়ের, দেশের, ব্যক্তির বা কার্য্যাদির সুখ্যাতি ও পূণ্য) সংক্রান্ত হাদীছগুলি কিরূপ লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইতেছে, (অর্থাৎ তাহারা বিশ্বাস্য কি-না) তাহার তদন্ত করা আমরা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। হাকেম, আবু জাকারিয়ার মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ঃ—"যখন হাদীছের দ্বারা কোন হালাল, হারাম না হয় বা কোন হারাম হালাল না হয়, এবং তাহা দ্বারা শরিয়তের কোন প্রকার আদেশ নিষেধও প্রতিপন্ন না হয়, তখন তাহার 'ছনদ' সম্বন্ধে আমরা শিথিলতা প্রদর্শন করিব এবং কে তাহার রাবী তাহাও ততটা দেখিতে যাইব না। ইমাম বাইহাকী তাহার 'মাদ্খাল' গ্রন্থে মোহাদ্দেছ এবন-মাহদীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিতেছেন ঃ—"যখন হযরতের নামে করিয়া হালাল-হারাম বা শরিয়তের অন্য কোন হুকুম সংক্রান্ত কোন হাদীছ রেওয়ায়েৎ করা হইবে, তখন আমরা যথেষ্ট সতর্কতা ও কঠোরতার সহিত সেই হাদীছের ছনদ বা সূত্র পরম্পরার ব্যক্তিগণের বিশ্বাস্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কিন্তু তদ্ব্যতীত ফাজাএল, ছওয়াব, আজাব প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন হযরতের নামে কোন হাদীছ বর্ণনা করা হইবে, তখন আমরা সেই হাদীছের ছনদ সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন করিব। ......ইমাম আহমদ বলিতেছেন—এবন-এছ্হাক* এরূপ ব্যক্তি যে, হযরতের জীবন-চরিত, যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বিষয় সংক্রান্ত হাদীছগুলি তাঁহার নিকট হইতে লিখিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে হালাল-হারাম আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে আমরা (দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেখাইলেন) এইরূপ ( মজবুত ও কঠোর) লোকদিগকে চাই।"**

## তফছির ও ইতিহাস সম্বন্ধে চিরাচরিত উপেক্ষা

সর্বজনমান্য মোহাদ্দেছগণের এই সকল মন্তব্য পাঠে আমরা জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা হালাল-হারাম, ফরজ-ওয়াজেব বা আকিদা (ধর্মবিশ্বাস) সংক্রান্ত হাদীছগুলি ব্যতীত, অন্যান্য হাদীছের রাবী বা সাক্ষী-পরম্পরার ব্যক্তিবর্গের বিশ্বস্ত হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করা আবশ্যক মনে করেন নাই। এ সম্বন্ধে শিথিলতা অবলম্বন প্রথম হইতে নির্দোষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ফল কি হইয়াছে, কয়েকজন গণ্যমান্য মোহাদ্দেছের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাহাও দেখাইয়াছি। যাহা হউক, তফছির ও ইতিহাস ইত্যাদি পুস্তকের পুরা-কাহিনী এবং ঐ সকল পুস্তকে ভবিষ্যৎ ঘটনাদি সম্বন্ধে উদ্ধৃত বিবরণগুলি, প্রথম হইতে কিরূপ অবিশ্বস্ত ও অপ্রামাণিক কিংবদন্তি সমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আছে, এবং আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ইমাম ও আলেমগণ প্রথম হইতেই ঐগুলিকে কিরূপ উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাহার কয়েকটা উদাহরণ পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। এখন আমরা ইমাম আহমদ-এবন-হাম্বলের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

---

* ইনি একজন প্রাচীনতম জীবনী লেখক, এবনে হেশামের একমাত্র অবলম্বন ইনিই। বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য

** 'ফৎহুল মুগীছ'—১২০ পৃষ্ঠা, ইত্যাদি।

## ইমাম আহমদের মত

ইমাম ছাহেব বলিতেছেন ঃ—

ثلثة كتب ليس لها اصول - المغازى والملاحم والتفسير ؛

অর্থাৎ—"তিন শ্রেণীর পুস্তকের কোনই ভিত্তি নাই—প্রথম হযরতের জীবনী ও যুদ্ধ বিবরণ, দ্বিতীয় জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সংক্রান্ত বর্ণনা, তৃতীয় তফছির।" খতিব বলেন, "ইহা বিশেষ শ্রেণীর পুস্তকের কথা। ঐ সকল পুস্তকের রাবীদের 'আদালৎ' না থাকায়, যাঁহারা নানা প্রকার গল্প-গুজব বর্ণনা করিয়া ওয়াজের মজলিস জমাইয়া থাকেন, তাঁহারা আবার উহার সহিত নানা প্রকার নকল যোগ করিয়া দেওয়ায় এইরূপ অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহার সবগুলিরই এই অবস্থা। যে সকল ঘটনা ঘটিবার অপেক্ষা করা হইতেছে এবং যে সকল 'ফেৎনার' এন্তেজার করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে অল্প কয়েকটা হাদীছ ব্যতীত আর সমস্তই ভিত্তিহীন ও অপ্রামাণিক।" এখন তফছিরের কথা। তাহার মধ্যে খুব বিখ্যাত কাল্বী ও মোকাতেলের তফছির। ইমাম আহমদ কাল্বীর তফছির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—উহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্তই মিথ্যা। তিনি ঐ তফছির পাঠ করাও হারাম বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছিলেন। জোরকানী বলেন—মোকাতেলের তফছিরও তাহারই কাছাকাছি। জীবনী ও 'মাগাজী'র মধ্যে মোহাম্মদ-এবন-এছহাকের পুস্তকই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কিন্তু তিনিও খৃষ্টান ও ইহুদীদিগের নিকট হইতে রেওয়ায়ৎ গ্রহণ করিতেন। ('মাউজুআতে' মোল্লা আলী, ৮৬ পৃষ্ঠা)।

## জাল হাদীছের লক্ষণ

কিরূপে এবং কি উদ্দেশ্যে, জাল ও মিথ্যা হাদীছগুলির প্রচলন হইয়াছিল এবং হাদীছ-শাস্ত্র বিশারদ বিশিষ্ট আলেমগণ ঐ সকল জাল ও মিথ্যা হাদীছকে চিনিয়া লইবার জন্য কি কি নিয়ম ও উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন, নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহারও একটু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞ পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমরা বরাবরই "জাল ও মিথ্যা" এই দুইটি বিশেষণ এক সঙ্গে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। ইহার তাৎপর্য এই যে, অধিকাংশ মোহাদ্দেছ, হাদীছের জাল হওয়া সপ্রমাণ না হইলে, অর্থাৎ 'অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক কারণে জাল করিয়াছে' এইরূপ নিশ্চিত (Positive) প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত, কোন হাদীছকে জাল বা 'মাউজু' বলিয়া আখ্যাত করেন না। সেই জন্য আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, তাঁহারা এক একটা হাদীছকে باطل لا اصل له —ভিত্তিহীন ও বাতিল বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু তাহাকে 'মাউজু' বলিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। ইমাম এবনে জওজী প্রমুখ আলেমগণের সহিত, সাধারণ মাউজুআৎ সঙ্কলকগণের যে স্থানে স্থানে মতভেদ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশের মূল এইখানে। অবশ্য, এই বিতর্কের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে মতপার্থক্য, তাহা প্রধানতঃ শব্দের কলহ, উভয় দলের মতে জাল ও মিথ্যা হাদীছগুলি সমান ভাবে অবিশ্বাস্য ও অগ্রহণীয়। কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়া পার্থক্যটা কাল্পনিক হইলেও, কতকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয়ে মোহাদ্দেছগণ উভয়ের অবস্থানগত প্রভেদ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। যেমন তাঁহারা বলিতেছেন—জাল বা মাউজু হাদীছ কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে লেখককে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতে হইবে যে, হাদীছটি জাল। কিন্তু বাতেল ও ভিত্তিহীন ইত্যাদি দোষযুক্ত দুর্বল (জইফ) হাদীছগুলি সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ কঠোর আদেশ প্রদান করেন নাই।

## হাদীছ জালের কারণ ও উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত লোকেরা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মিথ্যা হাদীছ প্রস্তুত করিয়াছে :—

১। **জিন্দিকগণ** ঃ মুছলমানদিগের মধ্যে একদল লোক ছিল, যাহারা আপনাদিগকে বাহ্যতঃ মুছলমান বলিয়া পরিচিত করিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে নানা সূত্রে এছলামের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টায় রত থাকিত। এই সমস্ত লোক এছলামের মূলনীতি এবং বিশ্বাসগুলির প্রতি লোকদিগকে শ্রদ্ধাহীন করার জন্য বা প্রকারতঃ এছলামের প্রতি বিদ্রূপ করার নিমিত্ত, হযরতের নাম করিয়া বহু সহস্র হাদীছ জাল করিয়াছিল।*

২। **অতি পরহেজগারগণ** ঃ অতিরিক্ত পরহেজগারীর দাবীদার এক দল তথাকথিত ছুফী নানা প্রকার অভিনব এবাদৎ গড়িয়া লইয়া তাহার ছওয়াব ও ফজিলৎ সম্বন্ধে বহু জাল হাদীছ তৈয়ার করিয়াছেন। এই জাল হাদীছগুলির সমর্থনের জন্য তাঁহারা যে যুক্তি দিয়া থাকেন তাহা আরও বিস্ময়কর।

৩। **মোকাল্লেদগণ** ঃ কতিপয় মোকাল্লেদ নিজ নিজ মজহাবের ইমামের গুরুত্ব বর্দ্ধন অথবা প্রতিপক্ষ মজহাবের ইমামের গৌরবহানি করার জন্য, অতি ঘৃণিত গোঁড়ামির বশবর্তী হইয়া নানা প্রকার জাল হাদীছ ও রেওয়ায়ৎ গড়িয়া লইয়াছেন। ইমাম আবু হানিফার প্রশংসা ও ইমাম শাফেয়ীর নিন্দাবাদের জন্য প্রস্তুত জাল হাদীছের নমুনা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

৪। **মোছাহেবগণ** ঃ রাজা-বাদশাহ্‌ ও আমীর-ওমরার মোছাহেবগণ প্রভুদিগের খোশ-খেয়ালের সমর্থন বা তাঁহাদের রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্ত, বহু মিথ্যা কথাকে হযরতের হাদীছ বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে।

৫। **ওয়ায়েজগণ** ঃ নিজেদের ওয়াজের (কথকতার) অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট যশ অর্জন বা তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থোপায় করার নিমিত্ত, একদল ওয়াজ ব্যবসায়ী নানাপ্রকার আজগুবী ও ভিত্তিহীন গল্প-গুজবকে হাদীছ বলিয়া চালাইয়া দিতেন। আজকালও ওয়াজ ও মৌলুদের মজলিছে 'রেওয়ায়ৎ হায়' বলিয়া এই শ্রেণীর বহু মিথ্যা কথা হাদীছের নামে চালাইয়া দেওয়া হয়।

'মোকাদ্দামা'—এবনুছ-ছালাহ' 'নোখবাতুল ফেকর', 'ফৎহুল মুগীছ' প্রভৃতি গুছুল গ্রন্থ হইতে উপরের লিখিত বিষয়গুলি সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। এই পাঁচ প্রকার জালিয়াতের কর্ম ফলের বিস্তৃত আলোচনা করা এ ক্ষেত্রে অসম্ভব। তবে এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতে হইতেছে যে, আমাদিগের প্রাথমিক যুগের মোহাদ্দেছগণ এই সকল জালিয়াতের দুষ্কর্মগুলিকে ধরিয়া ফেলার জন্য যে সকল অণুবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। এখন সেই অণুবীক্ষণগুলিকে ঝাড়িয়া-পুছিয়া—এবং আবশ্যক ও সম্ভব হইলে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার উপযোগিতাকে অপেক্ষাকৃত বাড়াইয়া লইয়া—জাল হাদীছগুলি বাছাই করার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা কখনই বিফল হইবে না। কতিপয় হাদীছ বিশারদ পণ্ডিত কেবল 'মাউজু' বা জাল হাদীছ সঙ্কলন করার জন্য, এক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এবনে জওজীর 'মাউজুআৎ', العلل المتناهية ঐ পুস্তক সম্বন্ধে ছয়ুতীর সমালোচনা, ইমাম এবনুল মাদিনী, এবনে-তাইমীয়াহ্‌, এবনুল কাইয়েম, মাকদেসীর পুস্তক সকল, ছয়ুতীর 'আল-লা-আলী-উল

---

* জিন্দিক জিন্দের বা পার্সিক ধর্মাবলম্বী। ইহাদের মধ্যে অনেকে প্রকাশ্যতঃ মুছলমান হইয়াছিল এবং এছলামের আচ্ছাদনে আপনাদের ধর্ম চালাইবার ও এছলামের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল। অনেক বেদআতের মূল এইখানে।

মহনুআহ্', ইমাম শওকানী কৃত 'আলফাওয়াএদুল মাজমুয়া', মোল্লা আলী কারী কৃত 'মাউজুআতে কবির' এবং 'আল্লুলুওল মারছু', 'তামইজুৎ-তাইয়েবে মেনাল-খাবিছ' প্রভৃতি পুস্তক দ্বারা সত্য ও মিথ্যা হাদীছ পরীক্ষা করা কত সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

## কেরামিয়া ও ভণ্ডছুফিগণের অভিমত

ওছুল লেখকগণ বলিতেছেন—"কতিপয় কেরামিয়া এবং ছুফী বলিয়া দাবীদার ব্যক্তি ব্যতীত, আর সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, যে কোন উদ্দেশ্যে হউক না কেন, মিথ্যা হাদীছ তৈয়ার করা বা তাহার প্রচারে সাহায্য করা হারাম।" (লোখ্বা', ৫৮)— "ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর সেই সমস্ত অতি পরহেজগার দল, যাহারা নিজেদের খেয়াল অনুসারে সদুদ্দেশ্যে মিথ্যা হাদীছ জাল করিয়া লইয়াছে।" (এবনুছ-ছালাহ, ৪৪। কিন্তু আমাদের মতে, যে সকল লোক মিথ্যা হাদীছ প্রস্তুত করাকে বাহ্যতঃ হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, এবং এইরূপে মোহাদ্দেছগণের ও মুছলমান জনসাধারণের সন্দেহ-দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া অতি সঙ্গোপনে জাল হাদীছ চালাইয়া দিবার চেষ্টায় রত থাকিত, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ইহাদের মধ্যে একদল লোক অতিশয় মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা প্রথমে বহু ছহী ও নির্দোষ ছনদ স্মরণ করিয়া লইত। এমন কি, এই শ্রেণীর কোন কোন লোক, কোন কোন ইমামের নিকট হইতে দুই চারিটা ছহী হাদীছের রেওয়ায়তও সত্য সত্যই গ্রহণ করিত। তাহার পর ঐ সকল ছনদের মধ্য হইতে এক একটা ছনদ গ্রহণ করিয়া, তাহার সহিত দুই-একটা করিয়া জাল হাদীছও জুড়িয়া দিত। এই ব্যাধি প্রাথমিক যুগেই যে কিরূপ মারাত্মক হইয়াছিল, হাদীছ সংক্রান্ত ইতিবৃত্তে তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকগণকে প্রকৃত অবস্থা জানাইবার জন্য নিম্নে তাহার মধ্য হইতে দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

## ইমাম আহমদ ও জনৈক জালিয়াত

আহমদ-এবনে-হাম্বল ও এহ্য়া-এবনে-মুইন ইমামদ্বয় রসাফা মছজিদে নামাজ পড়িয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন কথক—ওয়াজ-ব্যবসায়ী লোক—দাঁড়াইয়া ওয়াজ আরম্ভ করিল। ওয়াজে জুড়িয়া দিবার অল্পক্ষণ পরেই সে নিম্নলিখিতরূপে হাদীছ বর্ণনা করিতে লাগিল—"আহমদ-এবনে-হাম্বল ও এহ্য়া-এবনে-মুইন আমাকে এই হাদীছ বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—আবদুর রাজ্জাক আমাদিগকে হাদীছ বলিয়াছেন, তিনি বলেন—আমাকে মা'মার বলিয়াছেন, এবং মা'মার কাতাদা হইতে ও কাতাদা আনাছ হইতে বর্ণনা করেন। আনাছ বলেন—হযরত বলিয়াছেন, "মানুষ যখন লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্ কলেমা পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তাহার প্রত্যেক শব্দ হইতে এক একটা পাখী সৃষ্টি করেন, ঐ পাখীগুলির সোনার ঠোঁট আর মণিমুক্তার পালক" ইত্যাদি। এইরূপে সে অবলীলাক্রমে এক পাতা দীর্ঘ একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়া ফেলিল। ইমামদ্বয় অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন—তাঁহারা স্বপ্নেও যে হাদীছের কথা চিন্তা করেন নাই, আজ তাঁহাদের সম্মুখে ও তাঁহাদেরই নামে, আল্লাহর মছজিদে ও ওয়াজের মজলিছে তাহা অবলীলাক্রমে চালাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা দেখিয়া ইমামদ্বয় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। অবশেষে ইমাম আহমদ, ইমাম এহ্য়াকে বলিলেন, 'আপনি কি উহাকে বলিয়াছেন?' বলা বাহুল্য যে, তিনি দৃঢ়তার সহিত উহা অস্বীকার করিলেন। যাহা হউক, ওয়াজ শেষ হইলে, এহ্য়া-এবনে-মুইন তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—'আপনি এই হাদীছটি কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন?'

উত্তর ঃ—আহমদ-এবনে-হাম্বল ও এহ্য়া-এবনে-মুইনের নিকট হইতে।

এহয়া ঃ— এহয়া-এবনে-মুইন আমারই নাম, আর ইনিই ইমাম আহমদ।

বক্তা ঃ—আপনি এবনে-মুইন ?

এহ্য়া ঃ—হাঁ, আমিই।

বক্তা ঃ— ওঃ আমারই ভুল। লোকের মুখে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, এহ্য়া-এবনে-মুইন একটি নিরেট হস্তীমূর্খ। এতদিন পরে আজ আমারও তাহাতে বিশ্বাস হইল।

ইমাম এহ্য়া ঃ— আচ্ছা বেশ ! আমি যে একটা নিরেট হস্তীমূর্খ, এ জ্ঞানটা জনাবের আজ জন্মিল, ইহার কারণ কি ?

বক্তা ঃ—তোমাদের কথায় বোধ হয়, যেন তোমরা দুই জন ব্যতীত আহমদ-এবনে-হাম্বল আর এহ্য়া-এবনে-মুইন আর কেহই হইতে পারে না। আমি ১৭ জন আহমদ-এবনে-হাম্বলের নিকট হইতে হাদীছ গ্রহণ করিয়াছি। এই কথা বলিয়া লোকটা ইমামদ্বয়কে নানা প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে করিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

## এবনে-জরিরের বিপদ

এইরূপে একজন ওয়ায়েজ একদিন বাগদাদে এক ওয়াজের মজলিছে—

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا

এই আয়তের ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিল যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহর সঙ্গে আরশের উপর উপবেশন করিবেন। তফছির ও ইতিহাসের বিখ্যাত ইমাম, এবনে-জরির তাবরী ইহার প্রতিবাদ করায়, বাগদাদের জনসাধারণ তাঁহার বিরুদ্ধে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে, এবং ইহার ফলে তাঁহাকে কয়েক দিন পর্যন্ত গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া লুকাইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু ইহাতেও লোকের ক্রোধের পরিসমাপ্তি হয় নাই। তাহারা ইমাম ছাহেবের বাটীতে এত প্রস্তর বর্ষণ করে যে, তাঁহার দরজার সম্মুখে প্রস্তরখণ্ডগুলি স্তূপাকারে জমিয়া যায়। (মাউজুআতে কবির, ১০—১৪)

৬। সদুদ্দেশ্যে ঃ লোকদিগকে ভয় বা প্রলোভন দেখাইয়া সৎ কর্মে লিপ্ত করার বা অসৎ কর্ম হইতে নিবৃত্ত রাখার জন্য বহু হাদীছ জাল করা হইয়াছে।

৭। তর্ক-বিতর্ক ঃ অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের সহিত তর্কস্থলে হযরতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন কল্পে, নানা প্রকার মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত কেয়ামতের দিন আল্লাহর সহিত আরশে উপবেশন করিবেন, খৃষ্টানদিগের সহিত তর্ক-বিতর্কের ফলে এই হাদীছটির সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

৮। যুদ্ধ-বিগ্রহে উত্তেজিত করার জন্য ঃ লোকদিগকে বিজাতীয়দিগের সহিত জেহাদে উৎসাহিত করার নিমিত্ত, অথবা মুছলমান আমীর ও বাদশাহগণের আত্মকলহে, ব্যক্তি বা দলবিশেষের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য, বহু জাল হাদীছের প্রচলন করা হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত এই শ্রেণীর হাদীছের প্রচলন দেখা গিয়াছে। স্বনামখ্যাত মোজাদ্দেদ মহাত্মা ছৈয়দ আহমদ মরহুম শহীদ হওয়ার পর, তাঁহার কতিপয় ভক্ত, পীরালিগের অনুকরণে কতকগুলি হাদীছ তৈয়ার করিয়া প্রচার করেন যে, ছৈয়দ ছাহেব এখন গায়েব আছেন। কিছুদিন পরেই তিনি আবার জাহের হইবেন فيقاتل كفرة لاهور এবং লাহোরের কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। এই উপলক্ষে যে اربعين বা 'চল্লিশ হাদীছ' নামক পুস্তিকার প্রচার করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক হাদীছই যে জাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৯। এক শ্রেণীর আলেমরূপী লোক ঃ ইহাদের যোগ্যতা কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও জন-সমাজে মোহাদ্দেছগণের মর্যাদা দর্শনে ইহাদেরও সেইরূপ সম্মান অর্জনের খুব আকাঙ্ক্ষা হইত। কাজেই নানা প্রকার আজগুবী ও মূর্খজন-চমকপ্রদ মুখরোচক মিথ্যা হাদীছ প্রস্তুত করিয়া, তাহারা অজ্ঞ-জনসাধারণের ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা করিত।

১০। ছুফিগণ ঃ ইহাদের একদল 'সদুদ্দেশ্যে' বহু হাদীছ জাল করিয়া সমাজে তাহার প্রচলন করিয়াছে, এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পক্ষান্তরে ইহারা খুব দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করে যে, স্বপ্নযোগে অথবা কাশ্‌ফ মোরাকাবা ইত্যাদির দ্বারা ইহারা সর্বদাই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। এই সময় তাহারা হযরতের মুখে বহু হাদীছ শ্রবণ করে। বলা আবশ্যক যে, ইহা ঐ শ্রেণীর ছুফীদিগের সাধারণ বিশ্বাস এবং পীরের বারজাখ, মৃত পীরের সাক্ষাৎ লাভ, তাছাউওরে-শেখ বা গুরুধ্যান ইত্যাদি বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের মূল ভিত্তিও এইখানে। এইরূপে তাহারা যে কথাগুলিকে স্বপ্নযোগে বা কাশফ ইত্যাদির দ্বারা হযরতের নিকট হইতে অবগত হইয়াছে বলিয়া মনে করে, সেইগুলি বর্ণনা করার সময়, ভিতরের কথা ভাঙ্গিয়া না বলিয়া, কেবল 'হযরত বলিয়াছেন' এইটুকু মাত্র বলিয়া সেগুলিকে প্রকাশ করে। তাহার পর লোকে উহাকে হাদীছ মনে করিয়া ঐগুলির রেওয়ায়তও করিতে থাকে। এবনুল-আরবী ছুফীদিগের শেখে-আকবর বা মহাগুরু বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন; তিনি 'ফতুহাতে-মক্কিয়া' প্রভৃতি পুস্তকে বিস্তৃতভাবে এই কথার আলোচনা করিয়াছেন। ইহারা যে কেবল কতকগুলি মিথ্যা হাদীছের প্রচলন করিয়াছে তাহাই নহে, বরং বহু ছহী ও প্রামাণ্য হাদীছকে নিজেদের স্বপ্নাদি লব্ধ জ্ঞানের দোহাই দিয়া মিথ্যা ও অপ্রামাণ্য বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছে। মোহাদ্দেছগণ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, অমুক হাদীছটি মিথ্যা বা জাল। কিন্তু তাহারা বলিতেছে—"জাল বলিলেই জাল ? আমরা স্বপ্নযোগে বা কাশফ দ্বারা হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছি। হযরত স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, ঐ হাদীছটি কখনই মিথ্যা নহে,—বরং উহা খুব সত্য হাদীছ, আমি ঐরূপ বলিয়াছি।" পক্ষান্তরে তাহারা এইরূপে আবার বহু সত্য হাদীছকে অবিশ্বাস্য ও জাল বলিয়া নির্ধারণ করিয়া থাকে।*

১১। অসতর্কতা ও অন্ধভক্তি ঃ এক শ্রেণীর লোক অসতর্কতা ও অন্ধভক্তির বশীভূত হইয়া বহু মিথ্যা হাদীছের প্রচলন করিয়াছেন। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির কোন কথা তাঁহাদের বিশ্বাস অনুসারে মূল্যবান বলিয়া প্রতীত হইলে, তাঁহারা মনে করিয়া লন যে, হযরত ব্যতীত এমন সুন্দর কথা আর কে বলিবে ? এই খেয়াল মাত্রের বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা ঐ প্রবচনগুলিকে অসঙ্কোচে হযরতের উক্তি বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। শাহ্ আবদুল আজীজ ছাহেব বলেন—'এই শ্রেণীর লোকদিগের সীমা-সংখ্যা নাই, জনসাধারণের অধিকাংশই এই অনাচারে লিপ্ত ছিল।'**

মোহাদ্দেছগণ মিথ্যা ও জাল হাদীছের সৃষ্টি ও প্রচলন সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি ও কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা উপরে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। এ কথাগুলির সমস্ত একত্রে একখানা পুস্তকে পাওয়া যাইবে না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপরের বর্ণিত কেতাবগুলির মাউজু হাদীছ সংক্রান্ত অধ্যায় সমূহ পাঠ করিয়া দেখিলে, এই সমস্ত বিবরণের মূল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

---

* জাতি ও ব্যবসায় বিশেষকে সমাজে ঘৃণিত করিবার জন্য হযরতের নামে বহু মিথ্যা হাদীছ জাল করা হইয়াছে। তন্তুবায়, কারিকর, হাজাম ও নাপিত সমাজের গ্লানিকর হাদীছগুলি জাল ও অবিশ্বাস্য।

** 'ওজালা'—১৩ পৃষ্ঠা।

মোল্লা আলী কারী হানাফী 'মাউজুআতে কবির' পুস্তকে احوال الوعاظ বা 'ওয়াজকারীদিগের অবস্থা' শীর্ষক যে অধ্যায়টি লিখিয়াছেন, আমরা আরবি-অভিজ্ঞ পাঠকগণকে একবার তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই সুদীর্ঘ অধ্যায় হইতে কয়েকটা কথা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে ঃ—

১। হযরত আবু বকর ও ওমর কাহারও মুখে কোন হাদীছের বর্ণনা শুনিতে পাইলে, বর্ণনাকারীকে সেই হাদীছ সংক্রান্ত অন্য সাক্ষী উপস্থিত করিতে আদেশ করিতেন। হযরত আলী রাবীকে হলফ দেওয়াইতেন।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ছাহাবীদিগের কথা। একজন ছাহাবী হাদীছ বলিতেছেন, আর এছলামের মহামান্য খলিফাগণ তাঁহাকে নিজ কথার সমর্থনের জন্য অন্য সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করিতে আদেশ প্রদান করিতেছেন, হলফ দেওয়াইতেছেন—অন্যথায় কঠোর দণ্ড প্রদানের ভয়ও প্রদর্শন করিতেছেন। এছলামের সেই সুবর্ণযুগে স্বয়ং খোলাফায়ে রাশেদীন ছাহাবীদিগের হাদীছ সম্বন্ধেই যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বহু দিক দিয়া বিশেষভাবে ভাবিবার বিষয়। সেই স্বর্ণযুগের—সত্যযুগের অবস্থা যখন এই, তখন অন্যে পরে কা কথা ?

২। অধিকাংশ কথক ও ওয়ায়েজ তফছির ও তাহার রেওয়ায়ৎ এবং হাদীছ ও তাহার মর্যাদার ক্রম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন।

৩। ইহাদের একটা আপদ এই যে, ইহারা অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট এমনভাবে কতকগুলি কথা বলে, জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা যাহার মর্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। প্রামাণ্য ও ছহী হইলেও ঐ সকল উক্তি দ্বারা নানা প্রকার বাতেল আকিদা বা ভ্রান্ত বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

৪। ইমাম আহমদ কৃত 'মোছনাদে' ছহী ছনদে, তবরানীতে حسن ছনদে এবং অন্যান্য বহু হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, তামীমদারী নামক জনৈক ছাহাবী কেচ্ছা বয়ান করার জন্য মহাত্মা ওমরের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে, প্রথমে তিনি অনুমতি প্রদান করেন নাই। শেষে, তামীমের বিশেষ অনুরোধে, ওমর তাঁহাকে একবার মাত্র অনুমতি দিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রথম মজলেছের পরই আবার হযরত ওমর তাহা বন্ধ করিয়া দেন। সেই মজলেছে, তিনি যে সকল কেচ্ছা বর্ণনা করেন, তজ্জন্য হযরত ওমরের আদেশে তামীমকে দোররা (দেররাহ্) বা কোড়া মারা হয়। দোররা মারার কথা স্বয়ং তামীমের প্রমুখাৎ এবনে-আছাকের কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

তামীম একজন খৃষ্টান-সন্ন্যাসী ছিলেন, হিজরীর নবম সনে এছলাম গ্রহণ করেন। ইনি প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিনের অধিবাসী। এই খৃষ্টান-সন্ন্যাসী এছলাম গ্রহণ করার পর, দাজ্জাল প্রভৃতির বিবরণ ও পুরাণ কাহিনী, জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং নবিগণের কেচ্ছা-কাহিনী ইত্যাদি নিজের সংস্কার ও বিশ্বাস মতে মুছলমানদিগের মধ্যে বর্ণনা করেন। এই জন্যই হযরত ওমর তাঁহাকে দোররা মারিবার হুকুম দিয়াছিলেন। মছজিদে প্রদীপ জ্বালাইবার প্রথা প্রথমে এই তামীম কর্তৃকই প্রচলিত হয়। হযরত ওছমানের শহীদ হওয়ার পর ইনি সিরিয়ায় চলিয়া যান।* কা'ব আহবারের অধিকাংশ রেওয়ায়তও এই শ্রেণীভুক্ত।

---

* 'এছাবা', ৮৩৩ নং ও 'একমাল' প্রভৃতি।

গ্রীক, রোমান, পার্সিক, সিরিও, খ্রীষ্টান ও ইহুদী প্রভৃতি জাতি হইতে দীক্ষিত মুছলমানদিগের পূর্ব-সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রভাবে, নির্মল সুন্দর এছলামে কলঙ্ক কলুষ স্পর্শিবার আশঙ্কা করিয়াই, দূরদর্শী খলিফাগণ ঐ সকল গল্প ও সংস্কারগুলির প্রচার-পথ রুদ্ধ করার নিমিত্ত এইরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, পরবর্তী যুগে, বিশেষতঃ মামুন ও মো'তাছেমের সময়ে, বিজাতীয় বিশ্বাস ও এছলাম-বিরোধী সংস্কারগুলি নানা রূপ ধরিয়া ও বহুবিধ ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া, সাধারণ মুছলমানদিগকে অতি মারাত্মক ভাবে প্রবঞ্চিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মুছলমানদিগের মধ্যে আজ যে এত মতবিরোধ ও এত সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, তাহার প্রধান কারণ এই যে, খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং গ্রীক ও পার্সিক প্রভৃতি জাতির বহু সংখ্যক লোক বাহ্যতঃ মুছলমান সাজিয়া সাধুতার ভান দ্বারা জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিয়া রাখিয়া অতি সন্তর্পণে এছলামের সর্বনাশ সাধনের এবং নিজেদের পূর্ব মতগুলিকে প্রবল করার চেষ্টা অবিশ্রান্তভাবে করিয়া আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, পারস্য বিজয়ের পর এই গুপ্ত বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করে। "বাতেনী" প্রভৃতি তথাকথিত আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় ও মনছুর হাল্লাজ প্রমুখ সাধু নামধারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক উপস্থাপিত উপপ্রবাদগুলির চরম লক্ষ্যও ইহাই ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য শাহরস্তানী ও এবনে হাজম প্রণীত ملل ونحل এবং ওস্তাদ আবু মনছুর বাগদাদী প্রণীত الفرق بين الفرق প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই সময় বরামেকা বংশীয়েরা নিজেদের পুরাতন অগ্নি-পূজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে মক্কার মছজিদে প্রজ্বলিত অঙ্গার-পাত্র স্থাপন এবং তাহাতে সুগন্ধি দ্রব্য নিক্ষেপ করার জন্য হারুন রশীদকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল।*

(৫) আবু দাউদ ও নাছাই পুস্তকদ্বয়ে ছহী ছনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছাহাবীদিগের সময় খলিফা বা তৎকর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যের পক্ষে এই প্রকার ওয়াজ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাবরানীর এক রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত বলিয়াছেন,— এছরাইল বংশীয়েরা এই সকল পৌরাণিক গল্প-গুজবে মত্ত হইয়াই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৬) এবনে মাজা এবনে ওমর হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরতের বা আবু বকর ও ওমরের সময় এই সকল গল্পের প্রচলন ছিল না। আখেরী জামানায় (পরবর্তী যুগে) মুছলমানগণও যে ঐ সকল গল্পে-গুজবে মজিয়া ধ্বংস পাইতে বসিবে, হযরত তাহারও স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। (তাবরানী)

## পৌরাণিক গল্প-গুজবগুলি ধ্বংসের কারণ হয় কেন ?

এই হাদীছগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য। কালক্রমে পৌরাণিক উপকথা ও কল্পিত কিংবদন্তিগুলি যখন কোন জাতির প্রধান আলোচ্য ধর্ম শাস্ত্ররূপে পরিণত হয়, তখন সে জাতি ক্রমে ক্রমে নিজের মূল শাস্ত্রের শিক্ষা এবং তাহার নবীর প্রকৃত ও মহান আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া, নিজের জাতীয় বিশেষত্ব হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে। ইহুদী জাতি এইরূপে তালমুদের মোহে মজিয়া তৌরাৎকে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাই

* শেষোক্ত পুস্তকের ১৭০ পৃষ্ঠা দেখুন।

স্বাধীনতা সংক্রান্ত তৌরাতের ও হযরত মুছার গৌরব-গর্ব উদ্ভাসিত মূল শিক্ষা ও প্রকৃত আদর্শ হইতে দূরে অপসৃত হইয়া, আজ তাহারা চিরকালের জন্য পরপদানত ও দাসত্ব-শৃখলে আবদ্ধ—সুতরাং মনুষ্যত্বের সকল গরীয়ান সম্পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। খ্রীষ্টান যীশু-সংক্রান্ত আজগুবী গল্প-গুজবগুলির মধ্যে প্রকৃত যীশুকে হারাইয়া বসিয়াছে। তাই আজ কোটি কোটি খ্রীষ্টান, মুখে যীশুর নামে সহস্র প্রকার গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিয়াও, সামান্য সামান্য রাজসিক স্বার্থের অনুরোধে কঠোর জড়বাদী হইয়া, বুভুক্ষু শার্দুলের ন্যায় একে অন্যের কণ্ঠনালী ছিন্ন করিতেছে, নিজ ভ্রাতারই তপ্ত শোণিতপানে তৃপ্তিলাভ করিতেছে। তাই আজ কলের কামান, হাউটজার তোপ, বিমান-পোত, বিষবাষ্প, ট্যাঙ্ক, আণবিক বোমা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মারণযন্ত্র ও সমর-উপকরণগুলি, ক্ষিত্যপতেজঃমরুদ্ব্যোম বিদ্দুক করিয়া লক্ষ বজ্র-নিনাদে যীশুর প্রেমশিক্ষার বর্তমান মর্মবিদারক পরিণতির মাতম করিতেছে। জগতের প্রাচীনতম ও সভ্যতম জাতি বলিয়া দাবীদার হিন্দুকে দেখ—পুরাণ মহাভারতাদির কাল্পনিক কাহিনীগুলিতে, কৃষ্ণলীলার গল্প-গুজবে, অসভ্য এবং অনার্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ভূতপ্রেত ও দৈত্যদানবের প্রতীক পূজায় তন্ময় হওয়ার ফলে, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া দুনিয়ার সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, তাহাদের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে এবং বেদ-বেদান্ত ও গীতাদি শাস্ত্রের মহীয়সী শিক্ষা হইতে তাহাদিগকে কত দূরে সরাইয়া দিয়াছে ! যে হিন্দুজাতির প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনবিজ্ঞান বস্তুতই জগতের প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার, তাহারই কোটি কোটি সন্তান নিজেদের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে এই মীমাংসা করিয়া লইয়াছে যে, 'ঐশিক বাণী বেদের' একটা বর্ণ-উচ্চারণ করা ত দূরে থাকুক—তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলেও, তাহারা তজ্জন্য মহাপাতকের ভাগী হইবে। আত্মবিস্মৃতির দ্বারা মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম সম্পদকে—আল্লাহর মহত্তম দানকে—এমন কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান, ইহাই হইতেছে মনুষ্যত্বের চরম পতন। সহস্র বৎসরের সাধনায় হিন্দুর এই স্বোপার্জিত আত্মবিস্মৃতি দূরীভূত হইবে কি-না, তাহা বলা যায় না। এখানে অশেষ পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আজ মুছলমানেরও এই দশা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্বন্ধে গভীর বা সূক্ষ্ম তত্ত্বের উদ্রেক করার আবশ্যক নাই। বাজারে প্রচলিত মৌলুদের কেতাবগুলিতে মোস্তফা-চরিত্রের প্রকৃত মাহাত্ম্যের কতটুকু আভাস পাওয়া যায়, আর তাহাতে ঐ শ্রেণীর মিথ্যা গল্প-গুজবের পরিমাণ কত, পাঠকবর্গ নিজেরাই একবার তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে যথেষ্ট হইবে। মুছলমান আজ কিসে সন্তুষ্ট, কেন তাহার মস্তিষ্ক এমনভাবে অভিশপ্ত হইল ?—'বিশ্বের জ্ঞান মাত্রই মুছলমানের হারানিধি', 'যেখানে পাইবে, সেখান হইতেই তাহা কুড়াইয়া লইবে'.—* স্বর্গের এই পুণ্য আলোক যে জাতির পথ-প্রদর্শক, সে আজ দুনিয়ার অন্ধকার মাত্রকেই, অজ্ঞান মাত্রকেই নিজের ধর্মজীবনের একমাত্র উপকরণ ও অবলম্বন বলিয়া এমন অবোধের ন্যায় আঁকড়াইয়া ধরিতেছে—দীর্ঘকাল অন্ধকারে অবস্থান হেতু, আজ আলোকের আভা মাত্রেই তাহার চোখ ঝলসিয়া যাইতেছে—কোনও সৎ কোনও মহৎ, কোনও বিশাল কোনও বিরাট ভাবই আজ তাহার সেই অভিশপ্ত মন ও মস্তিষ্ককে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—ইহার মূলেও সেই সত্যের প্রত্যাখ্যান, সেই আত্মের বিস্মৃতি ! কোরআন ও মোস্তফাকে ত্যাগ করিয়া কোরআন ও মোস্তফা-সংক্রান্ত কিংবদন্তি ও কাল্পনিক কেচ্ছা-কাহিনীতে তন্ময় হওয়ার

---

* كلمة الحكمة ضالة المؤمن الخ এই মর্মের হাদীছটির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য কর্মফল !! ইঞ্জিনের আগুন নিবিয়া গেলে তাহার সমস্ত কলকব্জা—সুতরাং গোটা ট্রেনটা—যেমন সম্পূর্ণরূপে অচল ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইয়া গেলে জীবদেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যেমন মুহূর্তে আড়ষ্ট ও অকর্মণ্য হইয়া যায়—ঠিক সেইরূপ, মানবীয় মস্তিষ্ক যখন অন্ধবিশ্বাসে ও কুসংস্কারে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন জ্ঞানের বিদ্যুৎ আর সেখানে কোন দ্যোৎনা জাগাইতে পারে না তাই এছলাম বলিতেছে—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই তিন হইতেছে তোমার চলন্ত ইঞ্জিন ! জ্ঞান—মূল শক্তিকেন্দ্র আগুন ; ভক্তি—উত্তপ্ত বাষ্পীভূত—জল; আর কর্ম হইতেছে তোমার ইঞ্জিনের কল-কব্জা। ইঞ্জিনের আগুনের স্থলে কয়েক ঝুড়ি মাটি আর জলের স্থলে কতকগুলি উপলখণ্ড রাখিয়া দিলে, তাহা দ্বারা কখনও কি ইঞ্জিনের কল-কব্জায় স্পন্দন আসিতে পারিবে ? না, কখনই নহে। স্মরণ রাখিও, অন্ধবিশ্বাস জ্ঞান নহে, কুসংস্কার ভক্তি নহে, এবং বিকারের আক্ষেপ কর্ম নহে তাই হযরত বলিয়া দিতেছেন, القاص ينتظر المقت—'পুরাকাহিনী-কথক ধ্বংসেরই অপেক্ষা করিয়া থাকে'। কারণ যত অন্ধবিশ্বাসের মূল ঐখানে। ব্যক্তিগণের সমষ্টির নাম জাতি, সুতরাং ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহা সত্য, জাতি সম্বন্ধেও তাহা সত্য দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনের পরিচালক যাঁহারা—তাঁহাদের মধ্যে কাহারও এ-অবস্থার অনুভূতি হইলেও—ইহার মূল কারণ আবিষ্কারে তাঁহারা সমর্থ হইতেছেন না। তাই আজ তাঁহারা ইঞ্জিনের সংস্কার না করিয়া—তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া বাষ্প সৃষ্টির চেষ্টা না করিয়া, স্টেশনের কুলীদিগের ন্যায় পিছন হইতে ঠেলা দিয়া, ট্রেনটা চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং অবশেষে ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতেছেন, আর পণ্ডশ্রমের যত রাগ হতভাগ্য ট্রেনটার উপর ঝাড়িয়া বলিতেছেন—"না, একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে—এ গাড়ী আর চলিবে না।"

## জাল হাদীছের লক্ষণ

শায়খুল এছলাম তাকিউদ্দীন এবনে ছালাহ্, ইমাম এবনে জাওজী, ইমাম এবনুল কাইয়েম, হাফেজ জাইনুদ্দীন এরাকী, হাফেজ এবনে হাজর, মোল্লা আলী কারী, শাহ্ আবদুল আজীজ প্রভৃতি ইমামগণ প্রক্ষিপ্ত বা মাউজু হাদীছের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই লক্ষণগুলি দ্বারা আমরা সহজেই জাল হাদীছ চিনিয়া লইতে পারি। বহু আলেম জাল হাদীছগুলি পুস্তকাকারে একত্র সঙ্কলন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলে, প্রচলিত বহু অপ্রামাণিক ও আজগুবী হাদীছের মূল অবগত হইতে পারা যায়। তাঁহাদের বর্ণিত লক্ষণগুলি নিম্নে অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতেছে।

(১) **স্বীকারোক্তি** ঃ যে বা যাহারা হাদীছ জাল করিয়াছে, তাহার বা তাহাদের স্বীকারোক্তির দ্বারা জানা যায় যে, ঐ হাদীছটি মাউজু। এইরূপ স্বীকারোক্তির বহু নজির তাঁহাদিগের পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২) যে সকল হাদীছে প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয়, যেমন 'বেগুন সকল রোগের ঔষধ'—এই প্রকার হাদীছ মাউজু বলিয়া নির্ধারিত হইবে।

(৩) এছলামের স্বীকৃত মূল-নীতির বিপরীত। যেমন বলা হইয়াছে যে, 'হযরত কোরআন পড়িতে পড়িতে লাৎ ওজ্জাদি কোরেশদিগের ঠাকুরগণের স্তুতিবাচক দুইটি আয়ৎ তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন।' অথবা যেমন, কারিকর বংশের বিরুদ্ধে নানা প্রকার গ্লানিকর কথা

হাদীছের নামে প্রচার করা হয়। এগুলি হযরতের হাদীছ হইতেই পারে না। কারণ উহা যথাক্রমে এছলামের সারাংসার একেশ্বরবাদ ও সাম্যনীতির বিপরীত।

(৪) যাহা কোরআন, ছহী হাদীছ ও اجماع قطعي কাতয়ী এজমার* বিপরীত ; অথচ তাহার অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

(৫) যে সকল হাদীছে সামান্য সামান্য কাজের জন্য খুব বড় বড় ছওয়াবের (পুণ্যের) বা সামান্য সামান্য কাজের জন্য কঠোর দণ্ডের ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে।

(৬) যে হাদীছে কোন জঘন্য ভাবের সমাবেশ আছে।

(৭) যে হাদীছের ভাষা অসাধু।

(৮) যে হাদীছে এমন কোন ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে, বস্তুতঃ যদি তাহা ঘটিত, তাহা হইলে সে ঘটনার সময়ে বিদ্যমান সমস্ত লোকই তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিত। অথচ একজন মাত্র লোক সেই ঘটনার কথা ব্যক্ত করিতেছেন।

(৯) যে হাদীছে এমন ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা ঘটিয়া থাকিলে, বহু লোক তাহার বর্ণনা করিত। অথচ একজন মাত্র রাবী ব্যতীত আর কেহই তাহার উল্লেখ করেন না।

(১০) যে হাদীছে অনর্থক ও বাজে কথার সমাবেশ আছে।

(১১) যে হাদীছের বর্ণনা সত্য নহে, অর্থাৎ যাহা Fact-এর বিপরীত। যেমন বলা হইয়াছে 'সূর্যতাপ-তপ্ত পানিতে স্নান করিলে কুষ্ঠ রোগ হয়।'

(১২) খাওয়াজা খেজের সম্বন্ধে বর্ণিত সমস্ত রেওয়ায়ৎ। **

(১৩) কোরআনের প্রত্যেক ছুরার নির্দিষ্টরূপে বিশেষ ফজিলতের কথা যে হাদীছে আছে। কাশশাফ, বাইজাভী, আবু ছউদ প্রভৃতি তফছিরকারেরা চোখ বন্ধ করিয়া এই জাল হাদীছগুলিকে নিজেদের পুস্তকে স্থান দান করিয়াছেন।

(১৪) যে সকল হাদীছে জ্ঞান-বিরুদ্ধ কথা আছে।

(১৫) জীবনে একবারও হাদীছ জাল করিয়াছে বা জানিয়া শুনিয়া জাল হাদীছের প্রচার করিয়াছে—এরূপ ব্যক্তি কোন হাদীছের রাবী হইলে সেই হাদীছ জাল বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে।

(১৬) যুক্তি, সূক্ষ্ম সমালোচনা ও আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দ্বারা জানা যায় যে, এই হাদীছটি ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও জাল।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### অষ্টম, নবম ও দশম পরিচ্ছেদের সার সঙ্কলন

এই দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা আমরা দেখিলাম যে—

(১) হাদীছ বলিয়া যে সকল বিবরণ প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক উভয় প্রকারের রেওয়ায়তই বিদ্যমান রহিয়াছে।

(২) প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক হাদীছগুলি বাছাই করার জন্য, আমাদের প্রাচীন ইমাম ও আলেমগণ ঐতিহাসিক প্রমাণ ও সূক্ষ্ম সমালোচনার (Textual and Higher Criticism) হিসাবে, যে সকল নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিজ্ঞ

---

* বিশ্বস্ত ইমামগণের সমবেত অভিমত।

** ইহার সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন।

সমালোচকের পক্ষে প্রকৃত ও প্রক্ষিপ্ত হাদীছগুলিকে বাছিয়া লওয়া বহু পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছে।

(৩) ইতিহাসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাও মুছলমানেরা ধর্মের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিতেন।*

(৪) এছলামিক ইতিহাসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য মুছলমানগণ প্রথম হইতেই যেরূপ বিচক্ষণতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য তাঁহারা যেরূপ সার্থক পরিশ্রম করিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই।

(৫) অ-মুছলমান লেখকগণ বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া যে সকল মিথ্যা, জাল ও অপ্রামাণ্য হাদীছ অবলম্বন করিয়া, হযরতের চরিত্রের ও এছলামের শিক্ষার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন এবং পক্ষান্তরে অন্ধ ভক্তগণের অবিমৃষ্য ও অন্ধানুকরণ-প্রিয় মুছলমান লেখকগণ কর্তৃক উদ্ধৃত যে সকল তথাকথিত হাদীছ দ্বারা প্রকারতঃ হযরতের ও এছলামের গৌরব হানি করা হইয়া থাকে, পরীক্ষার তুলাদণ্ডে তুলিয়া আমরা ঐ উভয় শ্রেণীর হাদীছগুলির গুরুত্ব ও মর্যাদা যাচাই করিয়া লইতে এবং এইরূপে অতি সহজে সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করিতে পারি।

(৬) মুছলমান পণ্ডিতগণ প্রকৃত ইতিহাসের ও ইতিহাস-দর্শনের জন্মদাতা ও পরিপোষক। গোঁড়ামি তাঁহাদিগকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি এবং ইতিহাস যে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস, তাঁহারা তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতেন অবিকন্তু ধর্মের নামে গোঁড়ামি ও ভাব-প্রবণতার হুজুকে মাতিয়া তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য বিস্মৃত হন নাই। যতই কেন চমকপ্রদ কথা হউক না কেন, আর বক্তা যতই বড়লোক হউক না কেন, কঠোর পরীক্ষার বিষয়ীভূত না হইয়া তাঁহাদের কোন কথাই গ্রহণ করা হয় নাই। অবশ্য ইহা বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও ন্যায়নিষ্ঠ মোহাদ্দেছগণের কথা। ইঁহাদের অবলম্বিত নীতি বা ওছুলের (Principle) অনুসরণ করিলে আমরা এখনও সহজে সত্য ও মিথ্যা হাদীছের পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি

(৭) হযরতের জীবন-চরিত অবগত হইবার প্রথম সূত্র কোরআন, দ্বিতীয় সূত্র বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত হাদীছ এবং তৃতীয় সূত্র পরীক্ষিত ঐতিহাসিক বিবরণ।

(৮) আমাদের তফছির ও ইতিহাসে অনেক বাজেমার্কা ও ভিত্তিহীন গল্প-গুজবও বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে ইহুদী, খ্রীষ্টান, পার্সিক প্রভৃতি জাতির অনেক সংস্কার ও বিশ্বাসও নানা কারণে ঐ সকল পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়া গিয়াছে। অতএব এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

## পূর্ববর্তী জীবনী লেখকগণ

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন-চরিত অবগত হওয়ার তৃতীয় স্তরের অবলম্বন হইতেছে এছলামের সাধারণ ইতিহাস এবং তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষভাবে রচিত আরবী পুস্তকগুলি, পাঠকগণ ইহা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রধান পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

## আরবী ইতিহাস ও জীবন-চরিত

এছলামের অসামান্য রাজর্ষি খলিফা ওমর এবনে আবদুল আজিজের অনুরোধ মতে 'আছেম' নামক আনছার বংশীয় জনৈক আলেম, দেমশকের জামে মছজিদে লোকদিগকে

---

* বোখারী ও মোছলেমের হাদীছ বর্ণনা ও এছলাম সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলি দ্রষ্টব্য।

হযরতের জীবনী এবং সেই সময়কার 'মাগাজী' বা যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বিবরণ শিক্ষা দিতে থাকেন।*

## ইমাম জোহরী

কিন্তু হযরতের জীবনী স্বতন্ত্রভাবে পুস্তকাকারে সঙ্কলন— যতদূর জানিতে পারা যাইতেছে—ইমাম জোহরীর পূর্বে কেহই করেন নাই। ইমাম ছাহেব সর্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত। খলিফা ওমর-এবন আবদুল আজিজ ইঁহার পরম ভক্ত ছিলেন।** 'কেতাবুল মাগাজী' লিখিবার জন্য ইনি পরিশ্রমের একশেষ করেন। হযরত সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করার জন্য ইনি মদিনার গৃহে গৃহে গমন করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং যিনি যতটুকু বলিতে পারিয়াছেন, তাহা তখনই লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। ইমাম ছাহেব ইমাম বোখারীর গুরুপর্যায়ভুক্ত। হিজরী ৫০ সনে ইঁহার জন্ম এবং ১২৪ সনে মৃত্যু হয়। খলিফা আবদুল মালেক এবন-মরওয়ান ও ওমর-এবন আবদুল আজিজ প্রভৃতির নিকট ইঁহার যেরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল এবং ওমর-এবন আবদুল আজিজের 'মাগাজী' সংগ্রহে যেরূপ আগ্রহাতিশয্য ছিল, তদ্দর্শনে ইহা অনুমান করা হইয়া থাকে যে, শেষোক্ত খলিফার নির্দেশক্রমেই ইমাম ছাহেব 'কেতাবুল মাগাজী' রচনা করিয়াছেন।

খলিফাগণের সহানুভূতি লাভে ইমাম জোহরীর শিক্ষাধীন মোস্তফা-চরিতের এই অংশটি এছলামিক সাহিত্যে একটা বিশেষ Subject-এর আকার ধারণ করিয়াছিল। এবং ইহার ফলে ইমাম মুছা-এবন-ওকবা ও মোহাম্মদ-এবন-এছহাকের ন্যায় জীবনী লেখক, ইমাম জোহরীর শিষ্যগণের মধ্যে হইতে বাহির হইতে লাগিলেন।

## মুছা-এবন-ওকবা

মুছা-এবন-ওকবা একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ—ইমাম মালেকের ওস্তাদ। জীবনী লেখার সময়ও তিনি মোহাদ্দেছ-জনোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিতে বিস্মৃত হন নাই। 'ছেহা ছেত্তা' ও অন্যান্য হাদীছের টীকাকারগণ ও পরবর্তী ঐতিহাসিকবর্গ বহুস্থলে তাঁহার পুস্তক হইতে অনেক বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। কিন্তু অশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার মূল পুস্তকখানি, বহুদিন প্রচলিত থাকার পর, এখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মুছা ১৪১ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।***

## এবন এছহাক

ইমাম জোহরীর দ্বিতীয় শিষ্য মোহাম্মদ এবন এছহাক। মুছা এবন ওকবার ন্যায় ইনিও একটি দাসবংশ হইতে সমুদ্ভূত। আবদুল মালেক এবন হেশাম নামক হিমইয়র রাজ-বংশের জনৈক পণ্ডিত মোহাম্মদ এবন এছহাকের পুস্তকের কঠিন শব্দের অর্থাদিমূলক কতকগুলি টীকা সঙ্কলিত করিয়া উহা সম্পাদন করেন। ইহাই এখন 'ছিরতে-এবন হেশাম' নামে বিখ্যাত। ২১৩ হিজরীতে এবন হেশামের মৃত্যু হয়।****

---

* 'তাহ্‌জিব', আছেম-এবন-ওমর-এবন-কাতাদা।

** এছাবা—১১, তাহ্‌জিব।

*** 'তাহ্‌জিব', মুছা-এবন-ওকবা।

**** জোহরী বওয়াল-ওনক, হেশামের ভূমিকায়, এবনে খাল্লেকান হইতে উদ্ধৃত।

এবন এছহাকের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ঘোর মতবিরোধ দেখা যায়। আল্লামা জাহাবী বিভিন্ন অভিমতকে একত্র সংকলন করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, ইমাম মালেক প্রমুখ বহু বিজ্ঞ ইমাম ও মোহাদ্দেছ, এবন এছহাককে "অবিশ্বাসী মিথ্যাবাদী, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে পুরাকাহিনী গ্রহণকারী এবং নিতান্ত অবিশ্বস্ত দাজ্জাল" বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বলিয়াছেন, "ধর্মসংক্রান্ত কোন হাদীছ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তবে ইতিহাস ইত্যাদি সংক্রান্ত রেওয়ায়েৎ গ্রহণ করা যাইতে পারে।" এবন এছহাকের প্রতি বহু কঠোর অভিযোগ আরোপ করা হয়। হেশাম এবন ওরওয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতেন—কারণ, এবন এছহাক তাঁহার (হেশামের) স্ত্রীকে ফাতেমার নিকট হইতে হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করেন। হেশাম দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা। তাঁহার ধর্ম-মত লইয়াও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। তিনি কাদ্‌রিয়া (قدريه) মতের অনুসরণ করিতেন এবং এই অভিযোগে আমীর এব্‌রাহিম কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্তও হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি তৃতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের মুখে শুনিয়া বা তাহাদের পুস্তকাদি হইতে সঙ্কলন করিয়া জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, পূর্বতন নবীদিগের বিবরণ ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী নিজের পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতেন। তাঁহার খুব গোঁড়া সমর্থকও একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মজার কথা এই যে, বহু স্থানে এই রেওয়ায়েৎগুলিতে রাবীদিগের নাম প্রদান না করিয়া, তাহার পূর্বে 'বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি' বা 'বিশ্বস্ত রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন', ইত্যাদি কথাগুলি যোগ করিয়া দিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন। যাহা হউক, এবন এছহাকের স্ব-পক্ষীয়গণ বলিতেছেন—ইহাতে দোষ কি ?

স্বয়ং জাহাবী বলিতেছেন :

قلت، ما المانع من رواية الاسرائيليات عن اهل الكتاب مع

قوله صلعم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج - وقال اذا حدثكم

اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم - فهذا اذن نبوي في

جواز سماع ما يأثرونه في الجملة كما نسمع منهم ما ينقلونه

من الطب - ولا حجة في شيئ من ذلك انما الحجة في الكتاب

والسنة - (ميزان الاعتدال ج ۲ - ص ۳۴۴)

অর্থাৎ— "আমি বলি, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে তাহাদের কিংবদন্তি ও পৌরাণিক কাহিনীগুলি গ্রহণ করায় বাধা কি আছে ? হযরত বলিয়াছেন, উহাদের বিবরণ গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, তাহাদের মুখে যাহা শ্রবণ করিবে, তাহাকে সত্য বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিও না। ইহা হযরতের অনুমতি,—তাহাদের সকল প্রকারের কিংবদন্তি শ্রবণ করার বৈধতা ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে।

যেমন, আমরা তাহাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত উক্তিগুলি শ্রবণ করিয়া থাকি। কিন্তু ঐগুলির একটাও প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। 'প্রমাণ' একমাত্র কোরআন ও হাদীছের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।" (মীজান, ২য় খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা।)

সাধারণতঃ মুছলমানগণ ইহার প্রথম অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে তাহাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলি গ্রহণ করার যে অনুমতি আছে, এ-কথাটা তাঁহারা খুবই শুনিতে পান ; কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যে সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ হইয়াছে—এ-কথাটা তাঁহাদের কর্ণকুহরে আদৌ প্রবেশ করে না। অথচ অনুমতির অর্থ এই যে, তাহা করিলে পাপ হইবে না—না করিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহা নিষিদ্ধ, তাহা পরিত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই, অন্যথায় নিষেধ অমান্য করার জন্য পাপী হইতে হইবে। পুরাণ পূজার মোহে মত্ত হইয়া মুছলমান আজ এই মোটা কথাটাও বুঝিতে সমর্থ হইতেছে না। নচেৎ হযরতের স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও সেগুলিকে অবশ্য বিশ্বাস্য বলিয়া কখনই গ্রহণ করা হইত না। এই সময় হইতে যে সর্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছিল, পারস্য বিজয়ের পর জিন্দীকদিগের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন প্রভাবে তাহা পূর্ণ পরিণত হইয়া যায়। যাহা হউক, এবন এছহাকের পক্ষ সমর্থনের জন্য যাহা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা তাঁহার প্রতি আরোপিত অভিযোগগুলির সম্পূর্ণ খণ্ডন হইতেছে না। আমরা দেখিতেছি, তিনি বলিতেছেন—

حدثني الثقة—'বিশ্বস্ত রাবিগণ আমার নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন'—অথচ পরে তদন্তের দ্বারা জানা গেল যে, এয়াকুব নামক জনৈক ইহুদী তাঁহার সেই বিশ্বস্ত রাবী। জাহাবীর কৈফিয়তে অন্যান্য অভিযোগেরও উত্তর হইতেছে না।*

এবন হেশাম কর্তৃক সম্পাদিত এবন এছহাকের এই পুস্তকখানি হযরতের জীবনী সংক্রান্ত প্রচলিত পুস্তকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। চরিত-অভিধান সমূহে বর্ণিত এই সকল কঠোর মন্তব্যের ও মতবিরোধের সার এই যে, এই পুস্তকে প্রকৃত, এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে গৃহীত, সকল প্রকারের বিবরণই আছে। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণগুলিকে—বিশেষ করিয়া যখন সেগুলি লইয়া আমাদের ভিতরে বাহিরে বিসংবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়—কঠোর দার্শনিক পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। "এবন এছহাক লিখিয়াছেন,"—এই কথাটুকু বলিয়া প্রমাণস্থলে তাঁহার কথামাত্রকে অবলম্বন করা, সত্যসন্ধ ঐতিহাসিকের পক্ষে সঙ্গত হইবে না।** এখানে ইহাও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে যে, মোহাম্মদ এবন এছহাকের পুস্তকের স্থানে স্থানে বিভিন্ন ছাহাবীর উক্তি বলিয়া যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। ইতিহাসে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এবন এছহাক সাময়িক কবিদিগের নিকট ফরমাইশ করিয়া ঐ কবিতাগুলি লেখাইয়া লইয়াছিলেন। স্থানে স্থানে এবন হেশামের মন্তব্যেও ঐ পদ্যগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতা সম্যকরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

কোন কোন মোহাদ্দেছ এবন এছহাকের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এমন কি, ইমাম বোখারী তাঁহার "যুজউল-কেরআৎ" পুস্তিকায় এবন এছহাকের রেওয়ায়ৎ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার 'তারিখ' পুস্তকদ্বয়ের অধিকাংশ রেওয়ায়ৎই এবন এছহাক হইতে গৃহীত। তবে ছহী বোখারীতে এবন এছহাকের একটি রেওয়ায়েতও গৃহীত হয় নাই।

---

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'মীজানুল এ'তেদাল', ২য় খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা হইতে ৩৪৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

** ১৫১ হিজরীতে মোহাম্মদ এবন এছহাকের মৃত্যু হয়। 'একমালে' ১০৭ সাল লেখা হইয়াছে, ইহা ভুল। 'মীজান', ঐ, ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

## ওয়াকেদী

ঐতিহাসিক পরম্পরার হিসাবে, এবন এছহাকের পর, ওয়াকেদীর নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইহার নাম মোহাম্মদ এবন ওমর, কিন্তু ওয়াকেদী নামেই অধিক খ্যাত। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদ্বয়ের ন্যায় ওয়াকেদীর পূর্বপুরুষও দাসবংশ হইতে সম্ভূত। ১৩০ হিজরীতে ইহার জন্ম হয় এবং ২০৭ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। প্রাচীন পণ্ডিত ও মোহাদ্দেছগণ একবাক্যে তাঁহাকে অবিশ্বস্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইঁহাকে "ঘোর মিথ্যাবাদী" বলিয়া উল্লেখ করতঃ বলিয়াছেন যে, ওয়াকেদী ইচ্ছাপূর্বক হাদীছগুলি ওলট পালট করিয়া থাকে। এবন মুইন, দারকুৎনী, এবন-আদী প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ তাঁহাকে "অপ্রামাণ্য ও জঈফ" বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ইমাম নাছাই, আবু হাতেম ও এবনুল মাদিনীর ন্যায় মোহাদ্দেছগণ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, ওয়াকেদী নিজেই মিথ্যা করিয়া হাদীছ জাল করিতেন। ইমাম জাহাবী বলিয়াছেন ঃ—قد استقر الاجماع على وهنه—'ওয়াকেদীর দুর্বলতা (অপ্রামাণ্যতা) সম্বন্ধে আলেমমণ্ডলী সম্পূর্ণ একমত।' ইমাম আবু দাউদ এবন মাদিনীর প্রমুখাৎ বলিতেছেন যে, ওয়াকেদী ত্রিশ হাজার অভিনব (গরীব) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।*

ফলতঃ মুছলমান গ্রন্থকার ও ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে ওয়াকেদীর স্থান অতি নিম্নে। মোহাদ্দেছগণ ও সাধারণ আলেমবর্গ, চিরকালই তাঁহাকে অবিশ্বস্ত বলিয়া নির্ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টান লেখকগণের প্রধান অবলম্বন—এই ওয়াকেদী। রেভারেণ্ড টি, পি, হিউজেস তাঁহার Dictionary of Islam পুস্তকে লিখিতেছেন—

Al-Waqidi............A celebrated Moslem Historian, much quoted by Muir in his "LIFE OF MAHOMET অর্থাৎ—"ওয়াকেদী একজন যশস্বী মুছলমান লেখক। মুইর সাহেব তাঁহার 'মোহাম্মদ-চরিতে' ইহার উক্তি বহুলভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।"**

ওয়াকেদী হযরতের জীবনী সম্বন্ধে দুইখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। একখানির নাম 'কেতাবুছ-ছিয়ার' كتاب السيرة অন্য খানা 'কেতাবুৎ-তারিখ অল-মাগাজী অল-মাবআছ' كتاب التاريخ و المغازى و المبعث—নামে খ্যাত। ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন—"ওয়াকেদীর পুস্তকগুলি পুঞ্জীভূত মিথ্যা।" পৌরাণিক কাহিনী এবং ইতিহাস ও জীবনীসংক্রান্ত পুস্তকগুলিতে যে সকল আজগুবী ও জঘন্য রেওয়ায়ৎ দেখিতে পাওয়া যায়, ওয়াকেদীই তাহার অধিকাংশের মূল।

## এবন ছাআদ

মোহাম্মদ এবন ছাআদ নামক ওয়াকেদীর সমসাময়িক আর একজন ঐতিহাসিক ছিলেন। ইনি সাধারণতঃ এবন ছাআদ ও কাতেবুল ওয়াকেদী নামে পরিচিত। ওয়াকেদীর সেক্রেটারীরূপে কাজ করিলেও, ইনি স্বাধীনভাবে الطبقات الكبير নামে একখানা বিরাট চরিত-অভিধান রচনা করেন। এই পুস্তকখানি সাধারণতঃ 'তবকাতে এবন ছাআদ'—الطبقات ابن سعد

---

* 'মীজান', ১—৪২৫-২৬ পৃষ্ঠা।

** ৩৬৪ পৃষ্ঠা। ইউরোপীয় লেখকগণের পুস্তকগুলি সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

নামে খ্যাত। এই পুস্তকখানিও বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু জর্মনীর হতভাগ্য কাইছার, নিজে এক লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়া এই পুস্তকখানির উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করেন, এবং এজন্য বহু বিজ্ঞ লোকের সমবায়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি আরও অনেক অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় জগতের বিভিন্ন পুস্তকালয় হইতে ইহার বিক্ষিপ্ত অংশগুলি (কারণ সম্পূর্ণ পুস্তক কোথায়ও বর্তমান ছিল না) সংগৃহীত হয়। ইউরোপের ১২ জন আরবী-বিশারদ পণ্ডিত বহু পরিশ্রমসহকারে এই পুস্তকের ১২ খণ্ডের সংশোধনাদি কার্য সম্পন্ন করেন। অবশেষে পণ্ডিতপ্রবর এডওয়ার্ড সাখোর (Von Edward Sachau) সম্পাদকতায় ১৯০৯ সালে হল্যাণ্ডের রাজধানী লিডেন নগর হইতে উহা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের সহিত জর্মন ভাষায় নানা আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনামূলক বিস্তৃত ভূমিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। এবন ছাআদ এই পুস্তকের প্রথম তিন খণ্ডে হযরতের জীবনী বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। অন্য খণ্ডগুলি ছাহাবী ও তাবেয়ীদিগের বিস্তৃত চরিত-অভিধান। হযরতের জীবনী সম্বন্ধে এই খণ্ডগুলি হইতেও বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

এবন ছাআদ নিজে একজন মোহাদ্দেছ, অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ সাধারণতঃ তাঁহাকে বিশ্বস্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।* এবন এছহাকের পুস্তকের ন্যায় ইঁহার গ্রন্থখানিও যথেষ্ট সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন। এবন ছাআদ্ এই পুস্তকে ওয়াকেদী হইতে অনেক বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রত্যেক বিবরণের সহিত তাহার সূত্র প্রদান করায় ওয়াকেদীর রেওয়ায়তগুলি অনায়াসে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে।**

## বোখারীর 'তারিখ'

উপরে যে সকল পুস্তকের উল্লেখ করা হইল, তাহা কেবল হযরতের জীবনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বা ছিরৎ ও মাগাজী সম্বন্ধে লিখিত। ইহা ব্যতীত, মুছলমান ইমাম ও আলেমগণ সাধারণ ইতিহাস হিসাবে যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সময়ের হিসাবে ইমাম বোখারী কৃত 'ছগীর' ও 'কবির' নামক ইতিহাসদ্বয় সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। 'কবির' বা বৃহৎ ইতিহাস ভারতবর্ষের কোন পুস্তকালয়ে আছে কি-না—জানি না। ইউরোপের জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতগণ উহা প্রকাশ করার চেষ্টা আজও করেন নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, এহেন ইমামের এমন একখানা মূল্যবান পুস্তক আজও মুদ্রিত হইতে পারে নাই। মাওলানা শিবলী মরহুম তুরস্ক-ভ্রমণের সময় আয়াসুফিয়ার স্বনামখ্যাত জামে মছজিদে উহার অনুলিপি দর্শন করিয়াছেন।*** ইমাম বোখারীর 'ছগীর' বা ছোট ইতিহাসখানি মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাস বা হযরতের জীবনী সম্বন্ধে উহাতে জানিবার বেশী কিছু নাই। ইমাম ছাহেব ১৯৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের (শুক্রবারের) পূর্ণিমা রজনীতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়ালে ঈদ রজনীতে ৬২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।****

---

* 'মীজান ও তহ্‌জিব'—মোহাম্মদ এবন ছাআদ।

** এবন ছাআদ ১৬৮ সনে বছরায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৬২ বৎসর বয়সে—২৩০ হিজরীতে বগদাদে পরলোক গমন করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলাজরী তাঁহার শিষ্য।

*** 'ছিরৎ' শিবলী—১৮ পৃষ্ঠা।

**** 'একমাল'—৪২ পৃষ্ঠা।

## এবন জরীর তাবরী

ইমাম বোখারীর অব্যবহিত পরে, সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও তফছিরকার ইমাম আবু জা'ফর মোহাম্মদ এবন জরীর তাবরীর অভ্যুদয় হয়। ইঁহার تاريخ الملوك والامم 'তারিখুল-মুলুকে অল্-উমাম' বা রাজন্যবর্গ ও জাতি সমূহের ইতিহাস, ১২শ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট ইতিহাস। ইহার কয়েক খণ্ডে হযরতের জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিও ইউরোপের জ্ঞানবন্ধু পণ্ডিতগণের যথেষ্ট পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইতিহাসের ন্যায়, ইমাম ছাহেবের তফছিরখানিও কোরআনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত একখানি বিশাল বিশ্বকোষ। ৩১০ হিজরীতে ইমাম ছাহেব পরলোক গমন করেন। মোহাদ্দেছগণ সকলেই ইঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। ইমাম ছাহেব একটু শীয়া ভাব-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া, কোন কোন ব্যক্তি* গোঁড়ামির বশবর্তী হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ইমাম জাহাবী তাহাকে 'অন্যায় গালাগালি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম বা অন্য কোন বিষয়ে সমস্ত কথায় যদি কেহ আমার সহিত একমত হইতে না পারে, তাহা হইলে ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপেও তাহার আর কোনই মূল্য ও গুরুত্ব থাকিবে না, এই সঙ্কীর্ণতার ভাব মধ্যযুগের মুসলমানদিগের মধ্যে খুবই প্রবল হইয়া উঠে। শীয়া বা ছুন্নীদিগের হাদীছ গ্রন্থ সমূহের চিরবিচ্ছেদের একটি প্রধান কারণ—এই অনৈছলামিক সঙ্কীর্ণতা। ইমাম জাহাবী এই সকল কথার আলোচনা করার পর বলিতেছেন যে, এবন জরীর একজন ثقة صادق—বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী গ্রন্থকার। কিন্তু তাই বলিয়া ما ندعي عصمته من الخطاء—'তাঁহার যে ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে না, এমন দাবী আমরা কখনই করি না।'** জাহাবীর এই মন্তব্য যে নিতান্ত সঙ্গত, তাহা বলাই বাহুল্য। ইমাম এবন জরীর তাঁহার ইতিহাসে যে সকল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, শাস্ত্রীয় প্রমাণ, দার্শনিক গবেষণা বা সূক্ষ্ম সমালোচনার দ্বারা যদি তাহার কোনটি ভ্রান্ত বা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে সেটাকে বাদ দিতে পারি। জরীরের ন্যায় সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত গ্রন্থকারের পুস্তক সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা, কিন্তু ওয়াকেদীর ন্যায় লেখকদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের সমস্ত কথাই মোটের উপর অবিশ্বাস্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। তবে তাহার মধ্যে যদি কোনটা বিশ্বস্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কেবল সেইটি গ্রহণীয়।

## এবন কাইয়েম

জীবনী ও ইতিহাস সংক্রান্ত যে সকল পুস্তকের নাম উপরে বর্ণিত হইল, পরবর্তী লেখকগণের ইহাই প্রধান অবলম্বন। তবে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক বিবরণ উপলক্ষে হাদীছ ও শরিয়ৎ-সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ইমাম এবন কাইয়েম বিরচিত "জাদুল মাআদ" পুস্তকখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

* হাফেজ আহমদ এবন আলী ছোলায়মানী ইনি বলিতেছেন, এবন জরীর শীয়াদিগের জন্য জাল হাদীছ প্রস্তুত করিতেন।—'মীজান'।

** 'মীজান', ২—৩৫৭।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### মুছলমান গ্রন্থকার কর্তৃক অন্যান্য ভাষায় লিখিত জীবনী

### 'খোতবাতে আহমদিয়া'

উর্দু ভাষায় হযরতের জীবনী আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করিয়াছেন,* স্বনামখ্যাত স্যার ছৈয়দ আহমদ মরহুম। এই প্রসঙ্গে তাঁহার "খোতবাতে আহমদিয়া"র নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, সেল, মুইর ও স্প্রেঙ্গার প্রমুখ ইউরোপীয় লেখকগণের ও খৃষ্টান মিশনারীদিগের অযথা আক্রমণে মোছলেম-ভারত যখন বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, জাতির সত্যকার সেবক ও শ্রেষ্ঠতম নেতা ছৈয়দ আহমদই সে সময় সর্বপ্রথমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—এছলামের জয় পতাকাকে দৃঢ় হস্তে ধারণ করিয়া। 'খোতবাতে আহমদিয়া' তাঁহার এই সময়ের মূল্যবান দান। প্রধানতঃ মুইর ও স্প্রেঙ্গারের আক্রমণগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া, ছৈয়দ ছাহেব এই পুস্তকের বিভিন্ন সন্দর্ভে প্রাক্-এছলামিক যুগের আরব দেশ ও আরবীয় জাতির বৃত্তান্ত, কোরেশ গোত্রের বংশ পরিচয়, হযরত রছুলে করীমের বাল্য জীবনী এবং কোরআন, হাদীছ ও তফছির সম্বন্ধে নানাবিধ সূক্ষ্ম বিচার ও স্বাধীন আলোচনা দ্বারা প্রতিপক্ষের আক্রমণগুলির অসারতা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেন। তাঁহার Essays on the Life of Mohammad পুস্তকখানি ইহারই ইংরাজী সংস্করণ।

আমরা স্যার ছৈয়দের সাধনার চরম ভক্ত হইলেও, এখানে ন্যায়ের অনুরোধে ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাঁহার অন্যান্য লেখার সাধারণ দোষটি এই পুস্তকেও সংক্রমিত হইয়াছে। সেই দোষটি হইতেছে পাশ্চাত্য আদর্শের অন্ধ অনুকরণ-প্রবৃত্তি। বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তিনি যেন ধরিয়া লন যে, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে ইউরোপের গৃহীত বিচার-আদর্শ সমস্তই নিখুঁৎ এবং বৈজ্ঞানিক-পাশ্চাত্যের প্রচারিত মতবাদ মাত্রই বৈজ্ঞানিক সত্য। এইরূপ একটা ধারণা পোষণ করিয়া তিনি এছলামকে লইয়া ঐ সব আদর্শ ও মতবাদের সহিত সমঞ্জস করার চেষ্টা করিতে থাকেন। ইহাতে স্থানে স্থানে হিতে বিপরীত ফল হইতেও দেখা যায়। এই দোষ ব্যতীত পুস্তকখানি অন্য সবদিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান।

### 'রাহ্‌মাতুল্-লিল্-আলামীন'

হযরতের সম্পূর্ণ জীবনী হিসাবে, সুবিজ্ঞ লেখক জনাব কাজী মোহাম্মদ ছোলায়মান ছাহেবের "রাহ্‌মাতুল-লিল-আলামীন" পুস্তকখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক প্রণালীতে এবং কোরআন ও হাদীছকে প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া কাজী ছাহেব এই পুস্তকখানি বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত রচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা সরল ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় সাধারণ পাঠকের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

### 'ছিরতে নবভী'

মরহুম আল্লামা শিব্‌লী বিরচিত 'ছিরতে নবভী' ছয় খণ্ডে সম্পাদিত এক বিরাট পুস্তক। 'মোস্তফা-চরিত' রচনার শেষ সময় পর্যন্ত ইহার মাত্র দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়। অগাধ অর্থব্যয়ে ও বহু বিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে এবং স্বয়ং মাওলানা মরহুমের সম্পাদনে দীর্ঘ এক যুগের অবিরাম

---

* ফার্সী ভাষায় হযরতের জীবনী সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে কোন উল্লেখযোগ্য পুস্তক রচিত হইয়াছে বলিয়া আমি এ যাবৎ জানিতে পারি নাই।

সাধনার ফলে এই মূল্যবান পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তককে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনী সম্বন্ধে একটা বিরাট বিশ্বকোষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকের স্থানে স্থানে যে সব দোষ-ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়, আগামী সংস্করণে তাহার সংশোধন হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করি।

হযরতের জীবনী সম্বন্ধে ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি বহি-পুস্তক উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলির অধিকাংশই বিশৃঙ্খল অনুবাদ বা বেমালুম নকল ব্যতীত আর কিছুই নহে। মাওলানা এবরাহিম সিয়ালকোটী ছাহেবের "তারিখে নবভী" এবং মরহুম খলিফা মোহাম্মদ হোছেন ছাহেব কৃত "এ'জাজুৎ-তানজীল" পুস্তকের জীবনী সংক্রান্ত অধ্যায়টি অক্ষরে অক্ষরে এক।*

মুছলমান লেখকগণ হযরতের জীবনী সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় যে সব বহি-পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যকার কয়েকখানা বিশেষ মূল্যবান পুস্তকের নাম নিম্নে উল্লেখ করিয়া দিতেছি ঃ—

(1) Essays on the Life of Mohammad. Sir Syed Ahmad. London, 1871.

(2) Life of Mohammad. Syed Amir Ali. London. 1873.

(3) A Critical Exposition of the Popular Jihad. Maulavi Cherag Ali. Calcutta, 1885.

(4) Life of Mohammad. Mirza Abul Fazl. Calcutta.

(5) Life of Mohammad. Salmin. (Illustrated by Benet) Paris.

(6) The Prophet and Islam. Abdul Hakim Khan M.B. Patiala. 1916.

(7) Mohammad the Prophet. Maulana Mohammad Ali M.A.L.L. B. Lahore, 1924.

(8) The Ideal Prophet. Khwaja Kamal-ud-din. Woking, 1925.

উপরে আরবী, উর্দু ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত যে সব জীবনীর উল্লেখ করা হইল, তাহার গ্রন্থকারগণের অনেকেই আজ পরলোকগত। তাঁহাদের সকলের রূহের জন্য আল্লাহ্‌র হুজুরে অন্তরের সহিত মাগফেরাত কামনা করিতেছি। মোস্তফা-চরিতের লেখক হিসাবে আমি ইঁহাদের অনেকের কাছেই অল্পবিস্তর পরিমাণে ঋণী।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## হযরতের জীবনী ও পাশ্চাত্য লেখকগণ

মুছলমান জাতি, এছলাম ধর্ম ও তাহার প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান সমাজে দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের এই আলোচনার ইতিহাসকে দুইটি স্বতন্ত্র যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম যুগের ইতিহাস ক্রুসেড যুদ্ধের উপক্রম-উপসংহারের কার্যকারণ পরম্পরা ও তাহার ফলাফলের সহিত সংশ্লিষ্ট। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই যুগের প্রাদুর্ভাব পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত হইয়াছে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতে।

---

* মাওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী ছাহেবের পুস্তক পরে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি নানা দিক দিয়া উপাদেয় হইয়াছে।

কোরআন, এছলাম, মুছলমান ও হযরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে এই দুই যুগে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় যে বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া আছে, ইংরাজীর মধ্যবর্তিতায় আমরা তাহার একাংশের নিয়মিত আলোচনা করিতেছি। এই আলোচনার ফলে আমাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সত্য ও মিথ্যা বলিয়া যে দুইটি ধারণা দুনিয়ার মানব সমাজের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত আছে, "এছলাম ও মোহাম্মদ" সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করার সময় পাশ্চাত্যের মনীষী সমাজে তাহার অস্তিত্ব ও পার্থক্য একেবারেই স্বীকৃত হয় নাই। সত্যের অপচয় ও মিথ্যার প্রচারের দিক দিয়া ইহার অধিকাংশ উপকরণই জগতের সাহিত্যভাণ্ডারে সম্পূর্ণ অতুলনীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের সাহিত্য এ সম্বন্ধে একই পর্যায় ভুক্ত। কিন্তু অন্যদিক দিয়া এই দুই যুগের সাহিত্যের মধ্যে কতকটা পার্থক্য আছে। প্রথম যুগের সাহিত্যগুলি রচিত হইয়াছিল খ্রীষ্টান জগৎকে মুছলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলার জন্য—সেই যুগের খ্রীষ্টান সমাজের রুচি ও সংস্কার অনুসারে। সুতরাং ঐতিহাসিকের ছদ্মবেশ ধারণ করার কোন দরকারই তখনকার লেখকগণ অনুভব করেন নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য অভিন্ন হইলেও, শেষোক্ত লেখকগণ ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের সমস্ত আধুনিক উপাদান-উপকরণের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন—যুগের দরকার অনুসারে সেই হিংসা-বিদ্বেষ-প্রসূত দুরভিসন্ধিগুলিকে নূতন রূপ দিয়া প্রকাশ করার জন্য। ফলতঃ উভয়-যুগের পাশ্চাত্য লেখকগণের মূল লক্ষ্য ও মানসিকতা অভিন্ন।

এই সাহিত্যের ক্রমাগত গতিধারার বিস্তারিতভাবে পরিচয় দেওয়া এ-ক্ষেত্রে সম্ভবপর হইতেছে না। তবু প্রকৃত অবস্থার কতকটা আভাস দেওয়ার জন্য এই সাহিত্যভাণ্ডার হইতে দুই-একটা নমুনা নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

## "মিথ্যা-ঈশ্বর মোহাম্মদ"

নানাপ্রকার কদর্থ প্রকাশের জন্য হযরত মোহাম্মদকে এই শ্রেণীর লেখকগণ নানা বিকৃত নামে অভিহিত করিতে থাকেন। ইহার মধ্যে 'মাহউণ্ড' (Mahaund), 'মেকন' (Macon), এবং Mammet বা Mawmet, তাঁহাদের অধিক প্রিয় বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, এই 'মামেট' বা 'মাউমেট' শব্দটি 'বোৎ' বা প্রতিমা অর্থে গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা ইহা হইতে Mammetry বা প্রতিমা-পূজা এবং Maumery বা প্রতিমাগার প্রভৃতি শব্দ সৃষ্টি করিয়া লন।

এই সময়কার বিভিন্ন শ্রেণীর বহি-পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "মোহাম্মদ নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করেন।" কাজেই ঈশ্বরত্বের সিংহাসন লইয়া "মোহাম্মাদকে যীশুর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া" ইউরোপের শিক্ষিত লোকেরাও হযরতকে "আরব জাতির পরমেশ্বর" ও "জাল ঈশ্বর" বলিয়া অভিহিত করিতে থাকেন। এই সময়কার খ্রীষ্টান লেখকগণ প্রচার করিতে থাকেন যে—"আরবগণ মোহাম্মদ নামক একটি পুতুল-প্রতিমের পূজা করিত। মোহাম্মদ নিজের জীবনকালে স্বহস্তে এই পুতুলটি নির্মাণ করেন এবং উহাকে অ-ভঙ্গুর করার জন্য একটি পিশাচের সাহায্যে ও যাদুমন্ত্রের দ্বারা উহাতে একটা ভয়ঙ্কর রকমের শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া দেন যে, এই পুতুলটি খ্রীষ্টানদিগের প্রতি এমন আশ্চর্যজনক হিংসা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে যে, তাহাদের কেহ সাহস করিয়া এই প্রতিমার নিকট যাইতে চাহিলেই কোন একটা গুরুতর বিপদে পতিত হইত। এমন কি, ইহাও কথিত আছে যে, কোন পক্ষীও উহার উপর দিয়া উড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ আহত হইয়া পড়িত ও সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যাইত।"*

মোহাম্মদ প্রতিমার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এই শ্রেণীর লেখকগণ বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একটা নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

---

* History of Charles the Great, Ch. IV, ৬—৭ পৃষ্ঠা, T. Rodd কর্তৃক অনুবাদিত (১৮১২)—হইতে গৃহীত।

'একদা সেলিম (মুছলমান) ছোলতান সমরকন্দের অন্তর্গত এক প্রান্তরে ছাউনী ফেলিয়াছিলেন, বার হাজার লোক তাহার ছায়ায় উপবেশন করিত। এই ছাউনীর ঊর্ধ্ব-দেশে মোহাম্মদের প্রতিমূর্তি চারিটি চুম্বক পাথরের স্তম্ভের মধ্যে এমন সুকৌশলে স্থাপিত হইয়াছিল যে, তাহা শূন্যে মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিত। চতুর্দশ জন রাজকুমার আসিয়া এই প্রতিমার সম্মুখে বলিদান করিতেন। তাহার পর প্রতিমূর্তির সম্মুখে ধূপধূনা জ্বালাইয়া ও নিজেদের নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিতেন—হে মহিমময় মোহাম্মদ, তুমি আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর কর।"*

আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক একটা গোটা স্তোত্র সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন—ফিলিস্তিনের মুছলমান স্ত্রীলোকেরা তাহাদের ভগবান মোহাম্মদের নিকট কি ভাবায় প্রার্থনা করিত। তাহারা বলিত ঃ—

"সকল প্রশংসা আমাদের ঈশ্বর মোহাম্মদের জন্য, দয়াময় তিনি,—আনন্দ-ধ্বনি কর, তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিদান কর। তবেই আমাদের ভীষণ শত্রুগণ দমিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।"**

## মদ্য ও শূকর মাংস

মদ্যপান ও শূকর মাংস ভক্ষণ এছলাম ধর্মে অতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আলোচ্য যুগের লেখকগণ এই নিষেধাজ্ঞার একটা অদ্ভুত রকমের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। Father Jerome Dandini তাঁহার "A Voyage to Mount Lebanus" গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে—"মোহাম্মদ মূছা নবী অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্যজনক কোন অলৌকিক কাণ্ড প্রদর্শন করিয়া নিজেকে তাঁহা অপেক্ষা বড় নবী বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। এই জন্য তিনি কয়েকটা জলপূর্ণ পাত্র ভূ-গর্ভে লুকাইয়া রাখেন। কিন্তু কয়েকটা শূকর ঐ স্থানের মাটি খুঁড়িয়া ফেলে এবং ইহাতে মোহাম্মদের "বুজরুকী" দেখাইবার সমস্ত অভিসন্ধিই নষ্ট হইয়া যায়। ইহারই ফলে ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি শূকরকে অপবিত্র ও তাহার মাংসকে নিষিদ্ধ বলিয়া অনুজ্ঞা প্রচার করেন।"***

বিখ্যাত খ্রীষ্টান ধর্ম যাজক হেনরী স্মিথ রাণী এলিজাবেথের সময়কার লোক। তিনি স্বনামখ্যাত Roger of Wendover-এর প্রমুখাৎ নিম্নলিখিত গল্পটির উল্লেখ করিয়াছেন—

"একদা পানোন্মত্ত অবস্থায় মোহাম্মদ তাঁহার প্রাসাদে বসিয়া আছেন, এমন সময়, তাঁহার পুরাতন রোগটির আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া তিনি খুব তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় সকলকে বলিয়া গেলেন যে, কোন দেবদূতের আহ্বানে তিনি উঠিয়া যাইতেছেন। এ অবস্থায় কেহ যেন তাঁহার অনুসরণ না করে, অন্যথায় দেবদূতের কোপে পড়িয়া তাহাকে নিধনপ্রাপ্ত হইতে হইবে। রোগাক্রমণের ফলে মাটিতে পড়িয়া আঘাতপ্রাপ্ত না হন—এই উদ্দেশ্যে, অতঃপর তিনি একটা গোবরগাদার উপর উঠিয়া বসিলেন। সেই সময় রোগাক্রমণের ফলে তিনি সেখানে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে লাগিল। ইহা দেখিতে পাওয়া মাত্র একপাল শূকর সেখানে ছুটিয়া আসিল ও তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিল এবং এইরূপে মোহাম্মদের জীবন-লীলার অবসান হইয়া গেল। এই সময় শূকরের চীৎকার শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গ সেখানে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের প্রভুর শরীরের অধিকাংশই শূকরদল খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন তাহারা দেহের

---

* পূর্বোক্ত, ১৯ পৃষ্ঠা।

** English History (১ম খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা)–Orderic Vitalis.

*** ৮ম অধ্যায়

অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে একটি স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত কাষ্ঠ পেটিকার মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং সকলে একত্র হইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে—স্বর্গের দেবদূতেরা প্রভুর শরীরের অল্পাংশ মাত্র মর্ত্যবাসীদিগের জন্য রাখিয়া, আনন্দ কোলাহল সহকারে তাহার অধিকাংশ স্বর্গধামে লইয়া গিয়াছেন। মুছলমান জাতির শূকরের প্রতি ঘৃণার মূল কারণ ইহাই।"*

প্রথম যুগের লেখকগণের শোচনীয় অজ্ঞতা ও জঘন্য মিথ্যাবাদের পরিচয় লাভের জন্য এই নমুনা কয়টিই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আশা করি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আলোচনা করিলে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক ও রাজনৈতিক নেতাদিগের এই শ্রেণীর বহু মিথ্যা রটনার সন্ধান জানিতে পারিবেন—

(১) Boyle's Critical Dictionary. art, 'Mahomet'.

(২) Remarkable Prophecy. John Megee. 8th edition.

(৩) The Accounts of Prophet in 'Lithgow's Travels. (Reprint 1906).

(৪) Sandy's Travels to Turkey. 5th edition, 1652.

(৫) Complete History of the Turks. Vol. ii, Chap iii, pp 99,100 (1701).

(৬) Islamic Library.

(৭) History of Magic. By Nandaeus, Ch. XIV, 1657.

(৮) Weber's Metrical Romances, Vol, ii, 1810.

(৯) History of the Crusades. By T. Archer (History of the Nations series) Ch. V, P 90.

(১০) Strange and Miraculous News from Turkey sent to our English Ambassador of a woman who was seen in the firmament with a book in her hand at Medina Talnabi. London, 1642 ( Lowndes).

(১১) True News from Turkey, being a relation of a Strange Apparition, or Vision seen at Medina Talnabi in Arabia, together with the speech of the Turkish priest ( upon the vision ) Prophesying the Downfall of Mahomet's religion and the setting up of Christ's. London, 1664 ( B. M. )

(১২) Prophecies of Christopher Kollerus, etc...and the Miraculous conversion of the Great Turk, and the translating of the Bible into the Turkish language. 2nd edition, 1664 ( Hazlitt ).

(১৩) Great and Wonderful Prophecies, and Astrological Prediction of the Downfall of the Turkish Empire. The Glorious Conquest of the Emperor, and King of Poland against all the Bloody Enemies of the Christian Faith. Printed for J. C. in Duke Lane, 1684 ( Hazlitt ).

(১৪) The Prophecies of a Turk concerning the Downfall of Mahometanism and of the setting up the Kingdom and Glory of Christ's, for which he was condemned and put to death, by diver's cruel and inhuman torture. Truly related as it was taken out of the Turkish History of Constantinople. p. 1384. London, 1687 ( Guildhall Library ).

---

* Flowers of History. ( প্রথম খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা ) Bohn, 1819.

(১৫) A Great Vision seen in Turkeyland, and a wonderful Prophecy of a Turk concerning the subversion of that empire and the downfall of Mahometanism. Reprinted, 1702 ( Bib. Coll. W. C. Hazlitt ).

এই শ্রেণীর পুস্তকগুলি বিস্তারিত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর, এক কথায় এগুলিকে সঙ্কীর্ণ ধর্মবিদ্বেষ, শোচনীয় অজ্ঞতা ও জঘন্যতম মিথ্যাবাদের এক একটা বিরাট বিশ্বকোষ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

## দ্বিতীয় যুগের সূচনা

এছলাম ধর্ম ও তাহার প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে নূতন ধরনের বহি-পুস্তক লিখিত হইতে আরম্ভ হয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে, এ-কথা পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। এই যুগের লেখকগণের একটা ধারাবাহিক তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই দীর্ঘ তালিকার মধ্যে গীবন, হীগিন্‌স, কারলাইল ও ডেভেনপোর্টের লেখা পড়িলে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, হযরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে সত্য উদ্ধার ও অসত্যের প্রতিবাদ করার জন্য তাঁহারা চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। নানা কারণে তাঁহাদের এই সাধু চেষ্টা সর্বত্র সফলতা লাভ করিতে পারে নাই—সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এ-কথা আজ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই শ্রেণীর ইংরাজ লেখকগণের সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহসের ফলেই "এছলাম ও মোহাম্মদ" সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের বহু শতাব্দীর বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারের ঘোর পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া যায় এবং আমাদের মতে ইউরোপে এছলাম প্রচারের প্রথম সূচনা হয় এই সময় হইতে। ইঁহারা ব্যতীত অন্যান্য লেখকগণ হযরতের জীবনী সম্বন্ধে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় যেরূপে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, মোস্তফা-চরিত সাধারণতঃ তাহারই সমষ্টিগত প্রতিবাদ। সুতরাং এখানে ঐ পুস্তকগুলির বিস্তারিত আলোচনা করার কোন দরকার আছে বলিয়া মনে হয় না।'

দ্বিতীয় যুগের লেখকগণের তালিকা ঃ—

১। Muhamedis Imposture. W. Bedwell. London, 1615.
২। Mahomet Unmasked. W. Bedwell. London, 1642.
৩। Religion and Manners of Mohametans. Joseph Pitts. Exon. 1704.
৪। The True Nature of the Imposture. Dean Prideaux. London, 1718.
৫। Life of Mahomet. Count Boulain-Villiers. London, 1731.
৬। Sale's Translation of the Koran, 1731.
৭। Decline and Fall of the Roman Empire. E. Gibbon. London, 1776.
৮। The Rise of Mahomet Accounted for. N. Alcock. London, 1796.
৯। History of Mahomedanism. C. Mills. London, 1817.
১০। Mahomedanism Unveiled. Rev. C. Forster. London, 1829.
১১। An Apology for the life of Mahomed. G. Higgins. London, 1829.
১২। History of Mahomedanism. W. C. Taylor. London, 1834.
১৩। Hero As Prophet. Thomas Carlyle. London, 1840.
১৪। Life of Mohammed. Rev. George Bush. New York, 1844.
১৫। Life of Mahomet. Washington Irving. London, 1850.
১৬। Life of Mohamed, by Abul Fada. Translated by Rev. W. Murray. No Date.

১৭। Life of Mohamed. A. Sprenger. Calcutta, 1851.
১৮। Life of Mahomet. William Muir. London, 1858.
১৯। Imposture Instanced in the Life of Mahomet. Rev. G. Akehurst. London, 1859.
২০। Apology for Mahomed and the Quran. John Davenport. London, 1889.
২১। Mahomed and Mahomedanism. R. Bosworth Smith. London, 1874.
২২। Notes on Mahomedanism. Rev. T. P. Hughes. London, 1877.
২৩। Islam and its Founder. J. W. H. Stobart. London, 1878.
২৪। Mahomed, Budha and Christ. Marcus. Dods. London, 1878.
২৫। Mahomed. D. S. Margoliuth. London, 1906.
২৬। Rise and Progress of Mahometanism. Dr. Henry Stubbe. London.
২৭। Mahomedanism. Dr. G. W. Leitner. London.*

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

### খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সমূহের সহিত তুলনা

মুইর প্রমুখ খ্রীষ্টান লেখকগণ বড় গলা করিয়া কোরআন ও হাদীছের প্রামাণ্যতার সমালোচনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা নিজেদের চোখের কড়ি-কাঠটা কিন্তু দেখিতে পান নাই। সদুদ্দেশ্যে ধর্মশাস্ত্রে যদৃচ্ছা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার বা Pious fraud-এর প্রচলন প্রথম হইতেই তাঁহাদের মধ্যে কতদূর সাংঘাতিকভাবে প্রচলিত ছিল—বাইবেল পাঠেই তাহার আন্দাজ পাওয়া যাইতে পারে। তাই সাধু পল বলিতেছেন—"কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন ?" ( বাইবেল, রোমীয় ৩—৭ )। বলা বাহুল্য যে, বর্তমান খ্রীষ্টান ধর্ম প্রকৃতপক্ষে যীশুর নামে এই পলেরই ধর্ম (Pauline Christianity)। সাধু পলের এই নীতি বাক্যটা খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ কর্তৃক বহু শতাব্দী ধরিয়া বিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে অনুসৃত হইয়াছিল। বিশপ Eusebius খ্রীষ্টান ধর্মের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার ন্যায় জালিয়াত এই ঘোর কলিকালেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি-না সন্দেহ। তিনি নিজেই বলিতেছেন—"I have related whatever might be rebounded to the glory, and I have suppressed all that could tend to the disgrace of our religion". অর্থাৎ—"যাহা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে আমি সে সমস্তই বাইবেলে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি, এবং যাহা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্মের গৌরবহানি হইতে পারে, আমি সে সমস্তকেই গোপন করিয়া ফেলিয়াছি।" (৬৬ পৃঃ) সাধু পলের অনুসরণ করিয়া সাধু

---

* শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের 'মহম্মদ-চরিত' ব্যতীত, বাংলা ভাষায় লিখিত অন্য কোন জীবনী পাঠ করার সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং সেগুলি সম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করার অধিকারও আমার নাই। ইহা এক হিসাবে আমার দুরদৃষ্ট হইলেও এতদ্দ্বারা উপস্থিত আমি অনেকটা স্বস্তি লাভ করিতে পারিয়াছি। যাহা হউক কৃষ্ণকুমার বাবু একজন ভক্ত ভাবুক ও সুলেখক। 'মোহাম্মদ-চরিতে' ইহার যথেষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইসোবিয়াস মূল ধর্মশাস্ত্র বাইবেলের উপর কিরূপ হাত ছাফ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার নিজ মুখের এই স্বীকারোক্তি দ্বারাই জানা যাইতেছে। মোশিমের (Mosheim) প্রামাণিকতা খ্রীষ্টানমণ্ডলীর কর্তারাও অস্বীকার করেন না। তিনি বলিতেছেন—"প্লেটো ও পিথাগোরাসের মতানুবর্তীরা সদুদ্দেশ্যে বা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাকে সঙ্গত বলিয়া মনে করিত। যীশুর আগমনের পূর্বে মিসরবাসী ইহুদিগণ তাহাদিগের নিকট হইতে এই মত—Maximটি যেরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, বহু সংখ্যক প্রাচীন পুস্তকাদি দ্বারা তাহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে। "And the Christians were infected from both these sources with the same pernicious error, as appears from the number of books attributed falsely to great and venerable names"—"এবং প্লেটো ও পিথাগোরাস এবং ইহুদীদিগের বর্ণিত উভয় সূত্র হইতে এই মারাত্মক প্রমাদটি খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও সংক্রামক হইয়া পড়ে, সে সময় (মোশিম এখানে ২য় শতাব্দী পর্যন্তের কথা কহিতেছেন) মহাজনদিগের নামে মিথ্যা করিয়া যে সকল পুস্তক (ধর্মশাস্ত্র) প্রচলিত করা হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হইতেই ইহা সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।"

"—But in the fourth century....it was an act of highest merit to deceive and lie whenever the interests of the priesthood be promoted thereby." অর্থাৎ—"কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীতে, যখনই প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা কথার দ্বারা পাদরীদিগের কোন প্রকার স্বার্থোদ্ধারের সম্ভাবনা হইত, তখনই ঐরূপ প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা একটা মহত্তম গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত।"

ব্লন্ডেল (Blondel) খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অবস্থা সম্বন্ধে বলিতেছেন—"Whether you consider it the immoderate impudence of impostors, or the deplorable credulity of believers, it was a most miserable period, and exceeded all others in *pious frauds*." অর্থাৎ—"প্রতারকদের অপরিমিত ধৃষ্টতা কিংবা বিশ্বাসীদের শোচনীয় বিশ্বাস প্রবণতা, যাহাই মনে কর না কেন, যে এক অতীব শোচনীয় কালই ছিল, এবং তখন ধার্মিকতার জুয়াচুরি অপর সকল (রকমের জুয়াচুরি)-কে অতিক্রম করিয়াছিল।"

ক্যাসাউবন (Casaubon) বলিতেছেন—"I am much grieved to ovserve, in the early ages of the *Church*, that there were very many who deemed it praiseworthy to assist the divine word with their own fictions, that their new doctrine might find a reader admittance among the wise men of the Gentiles". (80-82). অর্থাৎ—"অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াই আমাকে বলিতে হইতেছে যে, (খ্রীষ্টান) ধর্মমণ্ডলীর প্রাথমিক যুগে, তাহাদের ধর্ম-মতগুলি বিজ্ঞ অখ্রীষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক যাহাতে সত্বর গৃহীত হয়, এই উদ্দেশ্যে নিজেদের কল্পিত মিথ্যা রচনার দ্বারা স্বর্গীয় বাণীর সাহায্য করাকে, অনেকেই গৌরবজনক কার্য বলিয়া মনে করিতেন।

"——And whenever it was found the New Testament did not at all points suit the interests of its Priesthood, or the views of political rules in league with them, necessary alterations were made, and all sorts of pious frauds and forgeries were not only common but justified by many of the fathers." (52) অর্থাৎ—"এবং যখনই দেখা যাইত যে, নূতন-নিয়ম বা বাইবেল, ইহার পুরোহিতদিগের স্বার্থের কিংবা তাহাদের দলস্থ রাজনৈতিক শাসনকর্তাগণের উদ্দেশ্যের অনুকূল হইতেছে না, তখনই তাহার আবশ্যকমত পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইত এবং শুধু যে সকল প্রকার সাধুতার জুয়াচুরি কিংবা জালিয়াতি করাই সাধারণ হইয়া পড়িয়াছিল

তাহা নহে, বরং অনেক পুরোহিত কর্তৃক তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণও করা হইয়াছিল।"*

অন্যের কথা বলিতেছি না, স্বয়ং প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টান সাধু ও পাদরিগণ সামান্য স্বার্থের খাতিরে মূল ধর্মশাস্ত্রে কিরূপ নির্মম প্রবঞ্চনা ও জঘন্য জাল-জুয়াচুরি করিয়াছেন, এবং বর্তমান নূতন-নিয়ম। বাইবেল পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হওয়ার পরও, বহু শতাব্দী ধরিয়া এই জালিয়াতির স্রোত কিরূপ প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল—প্রাথমিক খ্রীষ্টীয় চার্চের ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে ইউরোপে স্বাধীনভাবে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, গোঁড়া পাদরী ও খ্রীষ্টানদিগের রচিত পুস্তকগুলিতেও ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। John William Burgon, B. D. তাঁহার "The Causes of the Corruption of the Traditional Text of the Holy Gospels" নামক পুস্তকে** বাইবেল-বিকৃতির অন্যান্য বহু কারণ দিবার পর 'বিশ্বাসীদিগের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক বিকৃতি' শীর্ষক অধ্যায়ের ভূমিকায় লিখিতেছেন ঃ—'অত্যন্ত প্রাথমিক যুগে বাইবেল পুস্তকগুলি যে অতি সাংঘাতিকভাবে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর একটি কারণ—স্বধর্মের পবিত্রতা রক্ষার্থ বিশ্বাসীদিগের ভ্রান্ত উৎকণ্ঠা—"These persons......evidently did not think it at all wrong to tamper with the inspired Text. If any experession seemed to them to have a dangerous tendency, they altered it, or transplanted it, or removed it bodily from the sacred page.........About the immorality of the proceeding, they evidently did not trouble themselves at all. On the contrary, the piety of the motives seems to have been held to constitute a sufficient excuse for any amount of license", অর্থাৎ—"এই সকল লোক যে ধর্মপুস্তকগুলিকে বিকৃত করা আদৌ কোন দোষের কাজ বলিয়া মনে করিতেন না, তাহা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। ঐ সকল পুস্তকের কোন উক্তি তাঁহাদের পক্ষে মারাত্মক বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাঁহারা তাহা বদলাইয়া দিতেন, তাহা স্থানান্তরিত করিয়া অথবা সম্পূর্ণ পদটি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে একেবারে অপসারিত করিয়া ফেলিতেন। .........ইহা যে নীতিবিগর্হিত অসৎকার্য, তাহা চিন্তা করার কষ্ট তাঁহারা আদৌ স্বীকার করিতেন না। বরং পক্ষান্তরে সাধু উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ঐরূপ করা হইতেছে—এই খেয়ালকেই তাঁহারা নিজেদের কার্যের সন্তোষজনক কৈফিয়ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

ভল্টেয়ারের উক্তিও এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন ঃ—

"The First Christians were reproached with having forged several acrostic verses in the name of Jesus Christ, which they attributed to an ancient Sybil. They were also accused with having forged letters purporting to be from Jesus Christ to the king of Edessa, at the time no such king was in existence, those of Mary, others from Seneca to Paul ; letters and acts of Pilate ; false gospels, false miracles, and a thousand other impostures, so that the number of books of this description, in the first two or three centuries after Christ, was enormous.

"The great question which agitated the Christian Church, touching the divinity of Christ, was settled by Council of Nicea,

---

* এই মন্তব্যগুলি "Christian Mythology Unveiled" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত

** এডওয়ার্ড মিলার এম-এ কর্তৃক সম্পাদিত।লণ্ডন, ১৮৯৬। ২১১ পৃষ্ঠা।

convoked by the Roman Emperor, Constantine, 324 after Christ. The fact of Christ's divinity was denied and disputed at this Council by not less than eighteen Bishops and two thousand inferior Clergy ; but after many angry discussions and disputes, Jesus was declared to be the only son of God, begotten by God, the Father. Arius, one of the eighteen dissenting bishops, headed the Unitarian party, namely, those who denied Christ's divinity, and being on the account, considered as heterodox, he was sent into exile, but was, soon after, recalled to Constantinople, and having succeeded in making his doctrines paramount, they became established throughout all the Roman Provinces, notwithstanding the efforts of his determined and constant opponent, Athanasius, who headed the Trinitarian party. It is recorded in the supplement of the proceedings of the same Council of Nicea the Fathers of the Church being considerably embarrassed to know which were the genuine and which the non-genuine books of the Old and New Testament, placed them altogether indiscriminately upon an after, when those to be rejected are said to have fallen upon the ground !"

"The second Council was held at Constantinople in 381 A. D. in which was explained whatever the Council of Nicea had left undetermined with regard to the Holy Ghost, and it was upon this occasion that there was introduced the Formula, declaring that the Holy Ghost is truly the Lord proceeding from the Father, and is added to and glorified together with the Father and the Son. It was not till the ninth century that the Latin Church gradually established the dogma that the Holy Ghost proceeded from the Father on the Son. In 431 the third general Council assembled at Ephesus, decided that Mary was truly the mother of God, so that Jesus had two natures and one person. In the ninth century occurred the great schism between the churches, after which no less than twenty-nine sanguinary schismatic Latin and Greek contests took place at Rome to the possession of the Papal chair."

(Voltaire Quoted by Sir Syed, 6th Essay, 23—24).

"আদি খৃষ্টানেরা যীশুখৃষ্টের নামের কতকগুলি (Acrostic) পদ বা আয়ৎ জাল করার অপরাধে ভৎসিত হইয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহারা একজন প্রাচীন সাইবিলের উপরই এই দোষের আরোপ করিয়াছেন। যীশুখৃষ্টের নিকট হইতে ইডিসার রাজার নামে কতকগুলি পত্র জাল করিবার অভিযোগেও তাঁহারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কারণ, যীশুর সময় বস্তুতঃ ঐ নামে কোন রাজার অস্তিত্বই ছিল না। মেরীর পত্র সমূহ, সেনেকা হইতে পলের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র সমূহ, পীলেটের পত্র ও বাবস্থা সমূহ তাঁহারা জাল করিয়াছিলেন। মিথ্যা বাইবেল, মিথ্যা কেরামত এবং অন্যান্য হাজার হাজার প্রতারণা তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং খৃষ্টের পর প্রথম দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে উপরোক্ত প্রকারের পুস্তকের সংখ্যা বহুতর ছিল।

"খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব লইয়া যে বিরাট প্রশ্নটি খ্রীষ্টান ধর্মমণ্ডলীর হৃদয় আন্দোলিত করিতেছিল, খ্রীষ্টের পর ৩২৪ অব্দে রোমক সম্রাট কনস্টেন্টাইন কর্তৃক আহূত নিসিয়া সভায় তাহা মীমাংসিত হয়। এই সভায় অন্ততঃ অষ্টাদশ জন বিশপ এবং দুই সহস্র সাধারণ পাদরী যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন এবং তাহা লইয়া বিরুদ্ধ-তর্ক করেন। কিন্তু অনেক দ্বন্দ্ব-বাদানুবাদ ও বিরুদ্ধ তর্ক-বিতর্কের পর, যীশুকে 'পিতা পরমেশ্বর কর্তৃক জাত তাঁহার একমাত্র পুত্র বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বিরুদ্ধবাদী অষ্টাদশ বিশপের অন্যতম এরিয়াস একত্ববাদী অর্থাৎ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে আস্থাহীন ব্যক্তিদিগকে পরিচালিত করেন, এবং এই কার্যের জন্যই ধর্মদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি নির্বাসিত হন। কিন্তু অবিলম্বেই কনস্টান্টিনোপোলে পুনরাহূত হইয়া নিজের ধর্মমতকে প্রবল করিতে সমর্থ হন। ত্রিত্ববাদিগণের নেতা—তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিত্য-অরি এথানাসিয়াসের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁহার ধর্মমত সমূহ সমস্ত রোম দেশ জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ নিসিয়া সভার কার্য-বিবরণীর অতিরিক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টান ধর্ম-মণ্ডলীর পুরোহিতগণ তৌরাৎ ও ইঞ্জিলের মধ্যে কোনটি খাঁটি এবং কোনটি নকল, তাহা স্থির করার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যাকুল হইয়া সকলগুলি একসঙ্গে বেদীর উপর এলোমেলো ভাবে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। উহার মধ্যে যেগুলি গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেগুলি rejected বা বাতিল বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল।*

"খ্রীষ্টান পুরোহিতগণের দ্বিতীয় সভা কনস্টান্টিনোপোলে ৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে বসিয়াছিল। নিসিয়া সভায় "পবিত্র-আত্মা" সম্বন্ধে যাহা অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছিল, এই সভায় তাহা পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। এবং এই সভাতেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, প্রভুর পবিত্র আত্মাই বস্তুতঃ পিতা হইতে সমুৎপন্ন এবং পিতা ও পুত্রের সহিত একত্র সম্মিলিত এবং একই সঙ্গে গৌরবান্বিত হইয়াছেন। পবিত্র-আত্মা পিতা এবং পুত্র হইতে জাত হইয়াছেন,—এই ধর্মমত, নবম শতাব্দীর পর হইতে ক্রমশঃ লাটিন ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দের ইফিসিয়াসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সাধারণ সভায় ইহা নির্ধারিত হয় যে, মেরী প্রকৃতই ঈশ্বরের জননী, সুতরাং যীশুর দুইটি স্বভাব এবং একটি দেহ। নবম শতাব্দীতে লাটিন এবং গ্রীক ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহার পর পোপের পদ লইয়া মতভেদের জন্য রোম শহরে অন্যূন ঊনত্রিশটি মারাত্মক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।"—ভলটেয়ার।

আমাদের যেমন কোরআন, হিন্দুর যেমন বেদ, খ্রীষ্টানের তেমনই বাইবেল। খ্রীষ্টান ভ্রাতারা বাইবেলের প্রত্যেক বর্ণকে স্বর্গীয় আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই স্বর্গীয় বাণী মূল ধর্মশাস্ত্র বাইবেল সম্বন্ধে তাঁহারা যে ব্যবহার করিয়াছেন—স্বনামখ্যাত খ্রীষ্টান সাধু ও পাদরী মহাশয়েরা, নিজেদের নীচ স্বার্থের বশবর্তী হইয়া যেরূপ নির্মম ও জঘন্যভাবে তাহাকে কলুষিত করিয়াছেন—তাহার দ্বারা তাঁহাদের অন্যান্য পৌরাণিক পুস্তক ও ইতিহাস গ্রন্থ এবং খ্রীষ্টীয় সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তিগুলির শোচনীয় দুরবস্থার কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।** আমরা নিরপেক্ষ পাঠকগণকে, এছলামের তৃতীয় পর্যায়ের

---

* শাস্ত্র পরীক্ষার কি অদ্ভুত দার্শনিক উপায়। কতকগুলি পুস্তক বিশৃঙ্খলভাবে বেদীর উপর গাদি মারিয়া দেওয়া হইল, যেগুলি গড়াইয়া পড়িয়া গেল, সেগুলি মিথ্যা !! এই নিসিয় বা নিকিয় সভায়, ভোট দিবার পূর্বে একজন পাদরীর মৃত্যু হয়, তাঁহার কবরের উপর একখণ্ড পুস্তকের গাদি দিয়া তাঁহার ভোট লওয়া হইয়াছিল।

** এই পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা অসম্ভব। আমরা উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম তাহা বাইবেল-বিভ্রাটের এক অংশের অতি সংক্ষিপ্ত নমুনা মাত্র। এ-সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পুস্তক রচিত হওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে Rational Press Association কর্তৃক প্রকাশিত বাইবেল সংক্রান্ত পুস্তকাবলী, Ency. Br. Ecc. History, Bible Untrustworthy, স্যার উইলিয়াম মুর কর্তৃক 'তারিখে কালিছা', প্রফেসর সৈয়দ নওয়াব আলী এম-এ কর্তৃক 'তারিখে তোমদ্দুনে ইসলাম' প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকের ইতিহাস অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গতঃ প্রচলিত ইঞ্জিল ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইতিহাসগুলির সহিত খ্রীষ্টানদিগের মূল- ধর্মশাস্ত্রের প্রামাণিকতার তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

## বৈদিক সাহিত্য

ভারতবর্ষ (বাংলা-পাক-ভারত) মানব সভ্যতার প্রাচীন বিকাশ ক্ষেত্র। আল্লাহর সন্নিধান হইতে সমাগত "বেদ" বা পরম জ্ঞান যে এ-দেশের মহাপুরুষদের মধ্যবর্তিতায় যথাসময়ে ও যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে গ্রন্থচতুষ্টয় আজ আমাদের দেশে বেদ বলিয়া পরিচিত এবং ব্রাহ্মণ আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি যে সব পুঁথি-পুস্তক পরবর্তী যুগে তাহার সহিত সংযোজিত হইয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, সেগুলির সমষ্টিগত রূপকে অপৌরুষেয় ধর্মগ্রন্থ বলিয়া কোনমতেই স্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হইবে না। বেদ নামে পরিচিত যে পুঁথি-পুস্তকগুলি বর্তমান সময়ে দুনিয়ায় প্রচলিত আছে, ঐতিহাসিক হিসাবে তাহার ভিত্তিহীনতার সামান্য একটু আভাস দেওয়াই এখানকার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই প্রশ্নের বিচার করিতে হইলে, আমাদিগকে সর্বপ্রথমে দেখিতে হইবে যে, বেদের মন্ত্র, স্তোত্র, প্রার্থনা ও ব্যবস্থাদি রচিত বা প্রকাশিত হইয়াছিল—কবে, কোন্ যুগে ? এই মন্ত্র ও স্তোত্রাদি প্রকাশিত হওয়ার প্রথম সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা পরিসমাপ্তি হইতে কত যুগ বা কত শত বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল ? এইরূপে, বেদ প্রকাশ পরিসমাপ্তি হওয়ার কত শতাব্দী পরে সেগুলি সংহিতাকারে সঙ্কলিত বা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল ? এই সঙ্কলক বা লিপিকারগণের নাম কি, তাঁহারা কোন্ যুগের লোক ? দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণের হিসাবে এই সব প্রশ্নের কোন প্রকার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া এ যাবৎ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই

শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এ-দেশের যে-সব শাস্ত্রী বা পণ্ডিত বেদের মূল উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ই তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বেদের অঙ্গীভূত শতপথ ব্রাহ্মণের "অগ্নের্ঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্বেদঃ সূর্যাৎ সামবেদঃ" শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া স্বামীজী বলিতেছেন—"প্রথমে সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা এই কয় ঋষির আত্মায় এক এক বেদ প্রকাশ করিয়াছেন।" কিন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান (প্রথমে) বেদের উপদেশ দিয়াছেন।" তাই মনুসংহিতার ১-২৩ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি উত্তর দিতেছেন—"পরমাত্মা আদি-সৃষ্টি সময়ে মনুষ্যদিগকে উৎপন্ন করিয়া অগ্নি আদি চারি মহর্ষি দ্বারা ব্রহ্মাকে চারিবেদ প্রাপ্ত করাইয়াছেন এবং উক্ত ব্রহ্মা অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা হইতে ঋক, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব বেদ গ্রহণ করিয়াছেন।"* চতুর্থ বেদের বিষয়টা প্রতিপন্ন করার জন্য এখানে অঙ্গিরা ঋষি ও অথর্ব বেদকে কিরূপ অসঙ্গতভাবে টানিয়া আনা হইয়াছে, অভিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শতপথের ও মনুসংহিতার বচনে ঋক, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদের উল্লেখ আছে মাত্র, অথর্ব বেদ বা অঙ্গিরার নামগন্ধও সেখানে নাই। তাই মনুসংহিতার আলোচ্য শ্লোকের টীকায় কুল্লুক ভট্টাচার্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম ঋক যজুঃ সাম সংজ্ঞং বেদত্রয়ং অগ্নি বায়ুরবিভ্য আকৃষ্টান, সনাতনং নিত্যম।" যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে আমরা নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, শাস্ত্র বা শাস্ত্রী আমাদের উপস্থাপিত জিজ্ঞাসাগুলির প্রকৃত উত্তরদানে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক।

---

* সত্যার্থ প্রকাশ, সপ্তম সমুল্লাস, ২০৮ পৃষ্ঠা।

আধুনিক লেখকগণের মধ্যে যে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনীষীগণের বহিপুস্তক পাঠ করার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে, সেই সব পুস্তকের মধ্যেও উপরোক্ত জিজ্ঞাসাগুলির কোন সন্তোষজনক উত্তর দেখিতে পাই নাই। পাঠকগণ পূর্বে দেখিয়াছেন যে, বেদ রচনার অব্যবহিত পরবর্তী যুগ হইতে মনুসংহিতার যুগ পর্যন্ত বেদের সংখ্যা ছিল তিনটি মাত্র, অথর্ববেদ তখনও বেদ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। এ সম্বন্ধে ডক্টর দেশমুখ বলিতেছেন—"In the begining only the first three Vedas were recognized as cannonical" অর্থাৎ—"প্রাথমিক যুগে মাত্র প্রথম তিনখানি বেদ বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইত।"* আধুনিক লেখকগণের আলোচনা পাঠে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, ঋগ্বেদ ব্যতীত অন্য কোন বেদের বিশুদ্ধতার প্রতিও তাঁহারা বিশেষ আস্থাবান নহেন। সামবেদের প্রায় সমস্তটাই ঋগ্বেদ হইতে ধার করা হইয়াছে, যজুর্বেদে কিছু কিছু মৌলিক রচনা থাকিলেও তাহার পদগুলি অত্যধিক সংখ্যায় ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে, অথর্ববেদের কতকগুলি অংশ, বিশেষতঃ তাহার 'দশম পুস্তক'খানিও ঋগ্বেদের অনুবৃত্তি মাত্র—এই শ্রেণীর বহু যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করিয়া তাঁহারা ঋক-নামক প্রাচীনতম বেদের প্রতিই নিজেদের অধিকতর আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন।** তাঁহাদের বেদ-বিদ্যার প্রধান গুরু ম্যাকসমুলার স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন—ঋগ্বেদই হইতেছে "Only real or historical Veda, though there are other books called by the same name." অর্থাৎ—"অন্য কয়েকখানা পুস্তক বেদ নামে কথিত হইলেও ঋগ্বেদই হইতেছে একমাত্র ও ঐতিহাসিক বেদ"।*** এই সব প্রমাণ ও অভিমত অনুসারে, সাম ও যজুঃ নামে প্রচলিত পুস্তক দুইখানিকেও খাঁটি, সুরক্ষিত ও ঐতিহাসিক বেদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

ঋগ্বেদের ঐতিহাসিকতার প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে ম্যাকস মুলার নিজেই লিখিতেছেন—No country can be compared to India as offering opportunities for a real study of the genesis and growth of religion. I say intentionally for the growth, not for the history of religion : for history, in the ordinary sense of the word, is almost unknown in Indian literature. But what we can watch and study in India better than anywhere else is, how religious thought and religious language arise, how they gain force, how they spread, changing their forms as they pass from mouth to mouth, from mind to mind, yet always retaining some faint contiguity with the spring from which they rose at first."

এই উদ্ধৃতাংশের সারমর্ম এই যে, "ধর্মের মূল উৎপত্তির ও ক্রমবিকাশের গবেষণা করার যে সুযোগ ভারতবর্ষ প্রদান করিয়াছে, তাহার সহিত জগতের অন্য কোন দেশের তুলনা হইতে পারে না। আমি ধর্মীয় বিকাশের কথা বলিয়াছি—ধর্মের ইতিহাসের কথা বলি নাই—ইচ্ছা করিয়াই কারণ ইতিহাস শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ভারতীয় সাহিত্যে তাহা অপরিজ্ঞাত-প্রায় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে ভারতীয় সাহিত্যে আমরা যে সব বিষয় লক্ষ্য ও অনুশীলন করিতে পারি, সেগুলি

---

* ডঃ পি. এস. দেশমুখ কৃত **The Origin and Development of religion in Vedic Literature**—১৮ পৃষ্ঠা।

** ঐ, ১৯০ পৃষ্ঠা। *** Origin and Growth of Religion—১৭৫ পৃষ্ঠা।

হইতেছে—ধর্মীয় চিন্তা ও ধর্মীয় ভাষার উৎপত্তি হইল কিরূপে, কিরূপে তাহা শক্তি সঞ্চয় করিল, কিরূপে বিস্তারলাভ করিল ? মুখ হইতে মুখান্তরে ও মন হইতে মনান্তরে অন্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্মীয় সাহিত্যগুলির আকার-প্রকার কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছিল, এবং ইহা সত্ত্বেও, যে মূল উৎস হইতে সেগুলির প্রথম উত্থান ঘটিয়াছিল, তাহার সহিত একটা ক্ষীণ-সংস্পর্শ বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল ?''* এই সব দিক দিয়া বর্তমান সময়ের বৈদিক সাহিত্যের সার্থকতা যে যথেষ্ট আছে, কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রচলিত বেদ নামক গ্রন্থগুলির এই ক্ষীণ স্পর্শ হইতে প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে প্রচলিত প্রকৃত বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করাও সম্ভবপর নহে। কারণ—যে পুস্তকের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, সে সম্বন্ধে কোন প্রকার দার্শনিক বিচার করার সুযোগই ঘটিতে পারে না। স্বনামখ্যাত Albert Webb দীর্ঘকালের গবেষণার পর স্বীকার করিয়াছেন ঃ—''… the case is sufficiently unsatisfactory, when we come to look for definit chronological dates. We must reconcile ourselves to the fact that any such search will, as a general rule, be absolutely fruitless. (The history of Indian Literature, Translated by John Mann, P 6—7).

বেদ মন্ত্রগুলির প্রকাশের, এবং পরবর্তী যুগে তাহার সঙ্কলনের অবস্থা ও সময় নির্ধারণে সামান্য কিছু সহায়তা করিতে পারে, এমন কোন উপকরণও ভারতের প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বিশেষজ্ঞদের সাধারণ অভিমত ইহাই। ম্যাক্স মূলার এবং তাঁহার অনুকরণে অন্যান্য আধুনিক পণ্ডিতেরা বৈদিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ লক্ষণগুলির বিচার করিয়া তাহাকে কাল্পনিকভাবে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগের জন্য এক-একটা যুগ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। যথা ঃ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) | সূত্র যুগ | ৫০০ | খ্রীঃ পূঃ |
| (২) | ব্রাহ্মণ যুগ | ৬০০—৮০০ | ,, ,, |
| (৩) | মন্ত্র যুগ | ৮০০—১০০০ | ,, ,, |
| (৪) | ছন্দ যুগ | ১০০০— | ,, ,, |

ইহাদের মতে, বৈদিক সাহিত্য সঙ্কলিত, সুবিন্যস্ত ও ঋক যজুঃ সাম ও অথর্ব নামক চারিখানি বিভিন্ন পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছিল মন্ত্রযুগে, এবং ঋগ্বেদের পদ্য সাহিত্যের পরিণত বিকাশ ঘটিয়াছিল ছন্দ যুগে। কিন্তু এই বিকাশের প্রথম সূচনা হইয়াছিল ছন্দ যুগের কতকাল পূর্বে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া ম্যাক্স মূলার বলিয়াছেন—

"How far back that period, the so-called Khandas period, extended, who can tell ? Some scholars extend it to two or three thousand years before our era,—" অর্থাৎ—"এই তথাকথিত ছন্দ-যুগী বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তি আরম্ভ হইল সর্বপ্রথমে কোন সময় হইতে, কে তাহা বলিতে পারে ? বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছিল খ্রীষ্টের দুই বা তিন হাজার বৎসর পূর্বে।"** স্বনামখ্যাত পণ্ডিত লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের মতে, বৈদিক সাহিত্যের যুগ হইতেছে খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর হইতে আরম্ভ

* Origin, ১৩৫ পৃষ্ঠা।
** ,, ১০৬ পৃষ্ঠা

করিয়া ২৫০০ বৎসর পর্যন্ত।* সুতরাং এই সমস্ত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের অনুমান অনুসারে বলা যাইতে পারে যে, বেদ মন্ত্রগুলি ঋষিদিগের কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল, আজ হইতে পাঁচ–ছয় হাজার বৎসর পূর্বে এবং বৈদিক সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হইয়াছিল তাহার পরবর্তী সময়ে, অন্ততঃ এক সহস্র বৎসর ধরিয়া। পক্ষান্তরে বৈদিক সাহিত্যের সঙ্কলন হইয়াছিল ইহারও বহু বহু শতাব্দী পরে। ভারতীয় আর্যদের মধ্যে লিখনের প্রচলন হওয়ার পর, বেদ ও বৈদিক সাহিত্যগুলিকে সর্বপ্রথমে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল কবে ও কাহাদ্বারা— তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। "বেদের যে সব মুসাবিদা ভারতবর্ষে পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটিই এক হাজার খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে লিখিত।"** প্রচলিত অপ্রামাণিক ও অলৌকিক কিংবদন্তি অনুসারে বেদমন্ত্রগুলির প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহা নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত, বৈদিক সাহিত্য ও সংহিতাগুলি রক্ষিত হইয়াছিল, বেদ–প্রকাশক ঋষিগণের বা ঋষি–পরিবারবর্গের অথবা তাঁহাদের বিভিন্ন শিষ্য–গোষ্ঠীর দ্বারা বাচনিকভাবে। এই ঋষি পরিবারগুলি পরস্পরের প্রতি কিরূপ বিদ্বিষ্ট ও কলহশীল ছিলেন, আর্যাবর্তের বহু শাস্ত্রীয় পুঁথি–পুস্তকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজী শিক্ষিত পাঠকগণ, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের A History of Civilization in Ancient India পুস্তকের (১ম খণ্ডের) ৭ম অধ্যায়টি পাঠ করিলে ইহার কতকটা পরিচয় পাইতে পারিবেন।

মোটের উপর কথা এই যে, প্রচলিত বেদ চতুষ্টয়ের কোন প্রকার ঐতিহাসিক ভিত্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব এই জন্যই, 'বেদের আদি প্রকাশক' ব্রহ্মের পৌত্র এবং অথর্ব বেদের রচয়িতা ঋষি অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির সময় হইতে বৌদ্ধ ও মহাভারতীয় যুগ পর্যন্ত, আর্যাবর্তের বহু মুনি–ঋষি ও শাস্ত্রকার বেদের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে এখানে, ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭—১—১, ভগবদ্গীতা ১১—৪৮, মাকস মুলারের Origin and Growth of Religion পুস্তকের ১৪২ হইতে ১৪৬ পৃষ্ঠা, রমেশচন্দ্র দত্তের Civilization in Ancient India পুস্তকের (২য় খণ্ড) ১৬২ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাইতেছি। স্বয়ং মহাভারতেই বেদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসিত হইয়াছে ঃ— "বেদাধ্যয়ন–মাত্র দ্বারা ধর্ম নিশ্চয় করা যায় না, কেননা ব্যবস্থার অভাব নিবন্ধন বৈদিক ধর্ম অতি দুর্জ্ঞেয়। * * * অতএব অব্যবস্থিত বৈদিক ধর্মের ধর্মত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে। * * * * আমরা শুনিয়াছি, যুগে যুগে বেদ–সকলের হ্রাস হইয়া যাইতেছে, অতএব কালভেদে বেদেও যখন ধর্মের অন্যথা দেখা যায়, তখন সেই অনবস্থিত বেদবাক্য অশ্রদ্ধেয় * * * 'বেদবাক্য সকল সত্য'—ইহা কেবল লোক ভুলান কথা মাত্র।***

জেন্দ–আভেস্তা

পার্সী জাতির পুরাতন ধর্ম–পুস্তকের নাম "আভেস্তা"। যে প্রাচীন ভাষায় আভেস্তা–গ্রন্থ সর্বপ্রথমে লিখিত হইয়াছিল, তাহা জেন্দ বা زند বলিয়া পরিচিত। পরবর্তী যুগে আভেস্তার কতকগুলির অংশের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য প্রভৃতি জেন্দ ভাষায় লিখিত হইয়া মূল গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল, এই অংশটি শেষে জেন্দ–নামে পরিচিত হইয়া যায়। আভেস্তার সহিত জেন্দ–খণ্ডের এই সংযোগ ফলে পার্সিকদের ধর্ম–পুস্তকখানি শেষে যে আকার ধারণ করে, তাহার নাম দেওয়া হয়— 'আভেস্তা জেন্দ' বলিয়া। পাশ্চাত্য লেখকগণের ব্যবহার–দোষে বর্তমানে ইহা জেন্দাভেস্তা নামেই অধিকতর খ্যাত হইয়া গিয়াছে।

---

* Arctic Home in the Vedas —লোকমান্য ১৬৭ পৃষ্ঠা

** Origin. ১৫৫ পৃষ্ঠা।

*** মহাভারত, শান্তি পর্ব, ২৬৯ অধ্যায়

জরদশ্‌ত, জরতশত্র বা Zoaraster নামক জনৈক ধর্ম-সংস্কারকের প্রতি মূল আভেস্তার লিখিত বাণীগুলি হোরমজ্‌দ বা পুরাতন পার্সিকদের কল্পিত শ্রীভগবান-বিশেষ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। কিংবদন্তি অনুসারে, এই বাণীগুলি প্রাপ্ত হইয়া জরদশ্‌ত তখনকার প্রচলিত "মাগী" ধর্মের সংস্কার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই জরদশত কোথায় ও কোন যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার কোন সন্ধানই দিতে পারে না। নানারূপ কল্পনা ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ জরদশতকে খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বৎসরের মানুষ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মূল আভেস্তা গ্রন্থ, অথবা তাহার পরবর্তী সংস্করণের জেন্দ-আভেস্তার অস্তিত্ব যে বহু যুগ পূর্বে জগতের পৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহা সর্ববাদী-সম্মত সত্য। পার্সী জাতির প্রাচীন লেখক দিনকার্দ (Dinkard) নিজে যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতেও স্পষ্টাক্ষরে জানা যাইতেছে যে, জেন্দ-আভেস্তার মাত্র দুইখানি 'কপি' বিদ্যমান ছিল, ইহার একখানি পুড়াইয়া দেওয়া হয়, অবশিষ্ট গ্রন্থখানি আলেকজাণ্ডার কর্তৃক পার্সীপুলি ধ্বংসের সময় গ্রীকদের হস্তগত হয়, এবং পার্সিক জাতির অন্যান্য সমস্ত ঐতিহাসিক দার্শনিক ও ধর্মীয় পুস্তকাদির সঙ্গে সঙ্গে আভেস্তার এই কপিখানিও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়।* আলেকজাণ্ডার কর্তৃক পারস্য আক্রমণ ও পার্সীপুলী ধ্বংস, মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০ সালের ঘটনা। সুতরাং আজ হইতে ২২৬৮ বৎসর পূর্বে পার্সীদের মূল ধর্মগ্রন্থ আভেস্তা যে দুনিয়া হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ ভাবে জানা যাইতেছে।

গ্রীক ও পার্সিকদিগের সংঘাত সংঘর্ষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকে। খুব সম্ভব এই জন্য কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পার্সিক পণ্ডিত বা রাজপুরুষগণ নিজেদের ধর্মগ্রন্থের এই সর্বনাশের কোন প্রকার প্রতিকার করার প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন নাই। অবশেষে Vologeses নামক রাজার নির্দেশে পার্সিক পণ্ডিতরা নূতন করিয়া নিজেদের ধর্মপুস্তক রচনায় বা সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন, এবং সাসানী বংশের রাজত্বকালে, ৩য় ও ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে, তাঁহারা তৎকালীন পাহলভী ভাষায় একখানা পুস্তক সঙ্কলন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, এই পুস্তকই অতঃপর আভেস্তা বলিয়া গৃহীত হইবে। নূতন আভেস্তা পাহলভী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণ এই যে, মূল আভেস্তার জেন্দ-ভাষা ও তাহার বর্ণমালা এই যুগে অবোধ্য ও অপ্রচলিত হইয়া পড়ে, কয়েকজন পণ্ডিত-পুরোহিত ব্যতীত আর কেহই তাহা পড়িতে বা বুঝিতে পারিত না।

নূতন ভাষায় ও নূতন বর্ণমালায় এই নূতন আভেস্তা রচিত হইয়াছিল, প্রধানতঃ পুরোহিতদিগের স্মৃতি, পৌরাণিক উপকথা, আচার-পদ্ধতি, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তি প্রভৃতির সাহায্যে। পুরাতন আভেস্তার বিক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষ হিসাবে যাহা কিছু সঙ্কলন করা তখনও সম্ভব ছিল, তাহাও নূতন সঙ্কলনে স্থানলাভ করিল। জরদশতের গাথা বা হদীছ বলিয়া প্রচলিত বহু অপ্রামাণিক "রেওয়ায়ৎ"-ও মূল কেতাবের অঙ্গীভূত হইয়া গেল। এই সময় সঙ্কলকরা যে, সঙ্কলিত উপকরণগুলি ব্যতীত নিজেদের রচিত বহু অংশ তাঁহাদের নূতন আভেস্তায় যোগ করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কি প্রাচীন ভাষা ও বর্ণনা

---

* পাশ্চাত্য লেখক ও প্রাচ্য ঐতিহাসিকগণের সর্ববাদিসম্মত অভিমত ইহাই। এখানে Markham's History of Persia, Melcolm's History of Persia, Dr. Tiele's Religion of the Iranian peoples, Brown's Literary History of Persia এবং Jakson's Zoraster প্রভৃতি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

ভঙ্গিমার অনুকরণ করিয়া তাঁহারা যে নিজেরা অনেক কথা জাল করিয়া নূতন মুসাবিদায় ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন, নিরপেক্ষ লেখক মাত্রই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। অন্যদিকে, মূল আভেস্তার প্রধান অংশটা সাসানী যুগের এই সঙ্কলনের সময় এমনভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল যে, আলোচ্য নকলে তাহার কোন রূপ কাল্পনিক আভাস দেওয়াও সঙ্কলকদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।*

নূতন ভাষায় নূতন উপকরণে এবং 'সাত নকলে আসল খাস্তারূপে' আভেস্তা নামে যে পুস্তকখানি সাসানী রাজাদের সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে বিশেষতঃ তাতারীদিগের অত্যাচারে তাহারও অধিকাংশ (অধ্যাপক জ্যাকসনের মতে দুই-তৃতীয়াংশ) সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সাসানী-সঙ্কলনের যে ধ্বংসাবশেষ এখন পার্সিকদিগের ধর্ম-পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা প্রাথমিক আব্বাছী খলিফাদিগের উদারতা ও সরকারী তহবিলের অর্থ-ব্যয়েরই ফল।**

এই সব বিবরণ হইতে নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, আভেস্তা নামে যে ধর্ম-পুস্তকখানি জরদশত কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, পার্সিকদের মধ্যে প্রচলিত আভেস্তা-জেন্দ নামক পুস্তকের সহিত তাহার সম্বন্ধ সংস্রব খুবই কম। এই সব বিষয়ের প্রমাণের জন্য তাবরী, শাহরস্তানী, দবস্তানে মজাহেব, Markham's History of Persia, Brown's Literary History of Persia, Jackson's Zoroaster প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

---

* Ency. Britannica, Art. Zend-Avesta

** ডাঃ ধাল্লাকৃত "Zoroastrian Theology ১৯৩৭, মাঃ শিবলীর "বাছায়েল" ১৭১ পৃষ্ঠা।

# ইতিহাস ভাগ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### প্রাক্-এছলামিক যুগের আরব

প্রকৃতির কোন শুভ প্রভাতে—সৃষ্টির কোন শুভ্র উষার প্রথম আলোকরেখা এই ভূমণ্ডলের গাঢ় তিমিরজালকে অপসৃত করিয়াছিল এবং কবে ও কিরূপে মানব আসিয়া এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়াছিল, জগতের জ্ঞানিজনগণ অতীতের অন্ধকারময় রহস্য-ভাণ্ডার হইতে সে তত্ত্বের উদ্ধারসাধনের জন্য আবহমান অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সত্য কথা এই যে, এই অনুসন্ধানের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে রহস্যের জটিলতাও যেন ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মানবের অভিমান-ক্ষুব্ধ জ্ঞান, অবশেষে ক্লান্ত কলেবরে সেই অসীম অতীতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিতে বাধ্য হইতেছে—উহা যুগপৎভাবে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় !

ভূমণ্ডলে প্রথম মানব-আবির্ভাবের কতদিন পরে—দূর অতীতের কোন অজ্ঞাত যুগে, আরবের চির-উষর মরু-প্রান্তর ও চির-ধূসর অচল চূড়াগুলি মানব সন্তানের প্রথম সাক্ষাৎলাভে পুণ্য হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার বিশেষ কোন সন্ধান দিতে পারে না। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতি প্রাচীন কালের যে সকল বিবরণ আরবীয় কিংবদন্তির মধ্যবর্তিতায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব। পক্ষান্তরে তাহার বিশেষ কোন আবশ্যকতাও নাই। কারণ আরবদেশের ও আরবীয় জাতি সমূহের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সঙ্কলন ও তাহার সত্যাসত্যের বিচার—এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। তবে, ইতিহাসের যে সুবর্ণ যুগের এবং সেই যুগের যে মহাপুরুষের জীবনী এই পুস্তকের একমাত্র আলোচ্য, তাঁহার বংশ-পরিচয় জ্ঞাত হওয়ার জন্য, পুরাতন ইতিহাসের যতটুকু আবশ্যক, আমরা সংক্ষেপে তাহারই বর্ণনা করিব।

### ইতিহাসের উপকরণ

কোন দেশের প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের কোন তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, সর্বপ্রথমে সেই দেশের প্রচলিত ও পরম্পরাগত কিংবদন্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পর সেই দেশের প্রচলিত আচার-ব্যবহার, প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মানুষ্ঠান এবং বিভিন্ন বংশীয় লোকদিগের বর্তমান অবস্থা ও অনুষ্ঠান ইত্যাদির অনুসন্ধান করিতে হয়। ভূগর্ভগত নানা উপকরণের উদ্ধার করিয়াও এ-সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। ফলতঃ এই শ্রেণীর প্রমাণপুঞ্জের উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ইহাই প্রাচীন পুরাণ ইতিবৃত্তের প্রধান সম্বল। এইগুলিকে বিনাবিচারে সরাসরিভাবে অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিলে, জগতের প্রাচীন জাতি সমূহের সমস্ত পুরাতত্ত্বই অবিশ্বাস্য হইয়া যাইবে।

### আরবের প্রথম বিশেষত্ব

আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীদিগের প্রাক-এছলামিক যুগের অবস্থাগুলি সম্যকরূপে আলোচনা করিলে, কয়েকটা উজ্জ্বল ও দৃঢ় সত্য এবং তাহাদিগের কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। এ-ক্ষেত্রে আমরা সর্বপ্রথমে দেখিতে পাইব যে, আরবের

বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষুদ্র-বৃহৎ জনপদগুলি, এক-একটা বংশ বা গোত্রের স্বতন্ত্র আবাসভূমি,—অর্থাৎ কেবল সেই বংশের বা গোত্রের লোকেরা সেই সকল জনপদে বাস করিয়া থাকে। অন্য কোন বংশের বা গোত্রের লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একত্র বাস করিতে আরবগণ সাধারণতঃ অনভ্যস্ত। আমরা ইহাও দেখিতে পাইব যে, বংশের প্রথম পুরুষ বা কোন প্রধান ব্যক্তির নামে, সেই সকল বংশের এবং বহুস্থলে সেই সকল জনপদেরও নামকরণ হইয়া থাকে।

## দ্বিতীয় বিশেষত্ব

কোন বিদেশী জাতির জ্ঞানের প্রভাব বা সেই প্রভাবগত মানসিক দাসত্ব, আরব দেশে সাধারণভাবে কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বহু শতাব্দী অবধি তাহারা জগতের অজ্ঞাত এবং জগৎ তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। তদন্তর বহির্জগতের সহিত পরিচয় হওয়ার পরও বিদেশের কোন প্রভাব আরব দেশে কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাই খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্র আরব উপদ্বীপে আমরা মোটামুটি অক্ষর-জ্ঞান-বিশিষ্ট কয়েকজন মাত্র লোকেরই সন্ধান পাইতেছি।

## তৃতীয় বিশেষত্ব

আরবের তৃতীয় বিশেষত্ব—তাহার কবিত্ব। আরবের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যেন স্বভাব-কবি। সম্পদে-বিপদে আনন্দ বা শোক প্রকাশের সময়, সমরাঙ্গনে নিজের বীরত্ব প্রতিপাদন করার সময়, উৎসবে ও বার্ষিক মেলায় নিজের বংশ-গৌরব ও প্রতিপক্ষ বংশের কুৎসা প্রচার করার সময়, উত্তেজিত আরব যাহা কিছু বলিত, তাহাই কবিতা ;—কেবল কবিতাই নহে, বরং তাহা বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। বিশেষ করিয়া শোক ও ক্রোধের সময়, আরব নর-নারী হঠাৎ (Extempore) যে সকল গাথা আবৃত্তি করিত, সেগুলিকে যথাক্রমে পর্বতগাত্র-নির্গতা তরতর-প্রবাহিতা নির্মল নির্ঝরিণীর এবং আগ্নেয়গিরির ভীষণ ভৈরব অগ্ন্যুৎপাতসম্ভূত অনল-প্রবাহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

## চতুর্থ বিশেষত্ব

আরবের চতুর্থ এবং প্রধানত বিশেষত্ব—তাহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। এছলামের প্রথম আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব-যুগে, আরবদিগের মধ্যে প্রাচীন ও মধ্য-যুগের যে সকল কবিতা প্রচলিত ছিল, তাহা এক লক্ষের অধিক হইবে।* আরবগণ তাহাদের অসাধারণ স্মৃতি-শক্তিবলে, এগুলিকে আবহমানকাল যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আরব সমাজ সাধারণতঃ এইরূপ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল বটে, কিন্তু ইহার জন্য আরবে কতকগুলি লোক বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইতেন। তাঁহারা সাধারণতঃ 'খতিব' বা বক্তা, 'শায়েব' বা কবি এবং 'নোচ্ছাব' বা বিভিন্ন গোত্রের বংশ-পরিচয়-বিশারদ, এই সকল নামে অভিহিত হইতেন। বাৎসরিক উৎসব, মেলা ও হজ্জ উপলক্ষে বিভিন্ন গোত্রের লোক একত্র সমবেত হইলে, প্রত্যেক গোত্রের বক্তা, কবি ও বংশ-বিবরণ-বেত্তাগণ নিজেদের জ্ঞান ও ধীশক্তির পরিচয় দিতেন এবং তাহা লইয়া প্রকাশ্য সম্মিলনক্ষেত্রে তুলনায় সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, এমন কি শান্তিভঙ্গ পর্যন্ত হইয়া যাইত।

বর্তমান যুগের বিজ্ঞতম খ্রীষ্টান লেখক, মিসরবাসী পণ্ডিত জর্জী জিদান বলিতেছেন : "আরবগণ নিজেদের পিতৃ-পিতামহাদির নাম বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া রাখিতেন। আরবে এমন একটি সম্প্রদায় ছিল, এই সমস্ত বংশ-বিবরণ স্মরণ করিয়া রাখাই যাহাদের বিশেষ কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইত। লোকে নিজেদের বংশ-বিবরণ তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। আরবগণ নিজেদের পূর্ব-পুরুষগণের নামানুসারে কোন কোন নগরের নামকরণও করিয়াছিল।"

---

* "বুলুগুল-আরব" পুস্তকে বর্ণিত 'আরবদিগের কবিত্ব' শীর্ষক প্রস্তাব বিশেষতঃ উহার ২৪ পৃষ্ঠা এবং এবনে খাল্লেকান ১-১২১, 'আল-মজমুয়া-জাহেরা' ১-৪২০, 'তারিখ্‌আদুল ওলারা' ১৫১, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য

"প্রাথমিক যুগ হইতে এছলামের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত, নিজেদের বংশ-পরিচয় এবং তাহার মূল ও শাখা-প্রশাখার সম্পূর্ণ বিবরণ যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য, প্রত্যেক গোত্রের লোকই বিশেষরূপে আগ্রহ প্রকাশ করিত। এজন্য প্রত্যেক গোত্রের অন্ততঃ দুই একজন 'নোচ্ছাব' বা বংশ-বিবরণবিৎ ব্যক্তি বেতনভুক্ কর্মচারীরূপে নিযুক্ত থাকিতেন।" (তমদ্দুন-আরব—৩৮ পৃষ্ঠা)।*

## পঞ্চম বিশেষত্ব—স্বাধীনতা

সমগ্র আরব দেশে কখনও কোন রাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই অধিবাসীদিগের ধন-প্রাণ কখনই নিরাপদ ছিল না। পক্ষান্তরে এমন কোন নৈতিক অনুশাসন বা সর্বজনমান্য সামাজিক নিয়মপদ্ধতিও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, যাহা দ্বারা লোকের ধন-প্রাণ ও মানসম্ভ্রম কথঞ্চিতভাবেও নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত। এই কারণে তাহারা ব্যক্তিগত বা বংশগতভাবে, অন্য গোত্রের বা গোত্রস্থ ব্যক্তিবিশেষের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইত। কেহ কাহারও প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিলে, উৎপীড়িত ব্যক্তি বা তাহার স্বজনগণ, অত্যাচারীর নিকট হইতে তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় করার চেষ্টা করিত। এজন্য তাহারা স্বগোত্রের প্রধানদিগের দ্বারা অত্যাচারীর গোত্রস্থ প্রধানদিগের নিকট অভিযোগ করিত। এইরূপে আপোসে ইহার মীমাংসা না হইয়া গেলে, 'তরবারিই আমাদের উত্তম বিচারক' বলিয়া উভয় গোত্রের লোক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত। অনেক সময় এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ অতিশয় ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইত। কারণ, যুধ্যমান গোত্রদ্বয়ের মিত্র গোত্রগুলিও সন্ধিশর্তে বাধ্য হইয়া ক্রমে ক্রমে ঐ সকল যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগদান করিত। এই সকল সংঘর্ষের আশু জয়পরাজয় দ্বারা মূল কলহের কোন মীমাংসা হইত না। বরং পরাজিত জাতির লোকেরা, বহু যুগ পরেও, সময় পাইলেই, তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিত। কোন গোত্রের একজন লোক অপর গোত্রের লোক দ্বারা নিহত হইলে, 'রক্তের ক্ষতিপূরণ-দাবী' ও প্রতিশোধ-স্পৃহা, নিহত ব্যক্তির স্বগোত্রীয়দিগকে বংশ-পরম্পরাক্রমে অস্থির করিয়া রাখিত এবং যুগযুগান্তর পরে যখনই তাহারা বিপক্ষ গোত্রের কোন লোককে হাতে পাইত, তখনই তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিত। এই সকল কারণে আরবগণ তাহাদের বংশ ও গোত্রের মূল এবং তাহার শাখা-প্রশাখাগুলির বিবরণ যথাযথভাবে স্মরণ রাখিবার জন্য এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিত।

আরবের এই সকল বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করার পর, আমাদিগকে এখানে আরও দুই-একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

## জাতিভেদ

'জাতিভেদ' বলিতে আমাদের দেশে যাহা বুঝায়, আরবে ঠিক সেইরূপ জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও, প্রাক্-এছলামিক যুগে, সেখানে যে বংশগত ও গোত্রগত কৌলীন্য প্রথার প্রভাব অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এই বংশ-মর্যাদা লইয়া বিভিন্ন গোত্রের লোকদিগের মধ্যে অহঙ্কার, ঘৃণা ও হিংসাবিদ্বেষ যথেষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল। এই কৌলীন্য রক্ষার জন্য কূলের শত প্রকার আঁটা আঁটি, গোত্র-গোষ্ঠীর সিঁড়ি-পিঁড়ির ও শাখা-প্রশাখার হিসাব রক্ষা, কোথায় সেগুলির মূল এবং ক্রমে ক্রমে কিরূপে শাখা-প্রশাখা বা গোত্র ও গোষ্ঠীগুলির সৃষ্টি হইল—ইত্যাদি তথ্য তাহাদিগকে খুব আগ্রহের সহিত সংরক্ষণ করিতে হইত। নচেৎ কৌলীন্যের তুলনায় সমালোচনা অসম্ভব হইয়া পড়িত এবং কবে কাহার দোষে কোন গোত্র 'পতিত' হইয়া গেল, তাহা স্থির করাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত।

---

* ইহা উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত 'তামাদ্দোনল-এছলাম' পুস্তকের ৩য় খণ্ড।

## পুরোহিত বংশ

বিভিন্ন গোত্রের জন্য স্বতন্ত্র ঠাকুর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার প্রথা আরব দেশে সাধারণভাবে প্রচলিত থাকিলেও, মক্কানগরে প্রতিষ্ঠিত কা'বাকে তাহারা সকলেই নিজেদের সাধারণ ও শ্রেষ্ঠতম ধর্ম-মন্দির বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা বৎসর বৎসর নির্দিষ্ট সময় তীর্থার্থে মক্কায় উপস্থিত হইয়া কা'বা প্রদক্ষিণ, বলিদান ইত্যাদি বহু প্রকার ধর্মানুষ্ঠান পালন করিত। পুরুষানুক্রমে তাহারা এইরূপ তীর্থযাত্রা করিয়া আসিতেছিল। এই তীর্থে যে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইত, মক্কাবাসী বংশ-বিশেষের (কোরায়শের) লোকেই তাহার পৌরোহিত্য করিতেন। সমগ্র আরবের এই মহামান্য মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণের এবং মন্দিরস্থিত ঠাকুর-দেবতাগণের পূজা-অর্চনা করার ও তাহাদিগকে ভোগাদি প্রদানের সমস্ত অধিকারও এই বংশের একচেটিয়া ছিল। যাত্রীদিগের তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত সকল প্রকারের কাজই একমাত্র এই বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সেবায়েত বংশের লোকেরা যে এতৎপ্রকার গৌরবজনক অধিকার লাভ করিলেন এবং আরবের অন্যান্য সকল বংশের ও সকল গোত্রের লোকেরা যে তাঁহাদিগের সেই অধিকার লাভে আবহমানকাল সম্মতি দান করিয়া আসিল, ইহার কারণ কি ? উল্লিখিত সেবায়েত-বংশীয়েরা দাবী করিতেন যে, তাঁহাদেরই পূর্বপুরুষ হযরত এছমাইল ও তাঁহার পিতা হযরত এবরাহিম এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই এছমাইলই উহার প্রথম সেবায়েত। অতএব তাঁহাদের পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার সেবাধীনে রক্ষিত এই মন্দিরের সকল প্রকার তত্ত্বাবধানের ও পৌরোহিত্যের একমাত্র অধিকারী তাঁহারাই। তাঁহারা আরও বলিতেন যে, যেহেতু আরব দেশে এই ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠারূপ মহত্তম কার্য আমাদেরই পূর্বপুরুষ এছমাইল কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যেহেতু মক্কাতীর্থের সমস্ত অনুষ্ঠানই এছমাইল ও তাঁহার পিতা এবরাহিম কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং যেহেতু আমাদের আদি পিতা এছমাইল, অভূতপূর্ব আত্মবলিদান দ্বারা আল্লাহর আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন,—অতএব বংশ-মর্যাদায় ও কৌলীন্য-গৌরবে-সুতরাং পৌরোহিত্যের সকল প্রকার অধিকারে—আমাদিগের সহিত অন্য কাহারও তুলনা হইতে পারে না। অতএব সেবায়েত ও পুরোহিত হওয়ার অধিকার আমাদিগের ব্যতীত অন্য কাহারও নাই এবং থাকিতেও পারে না। অন্যান্য বংশের লোকেরাও সেবায়েত বংশের এই সকল বিবরণকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। কারণ তাহারাও আবহমানকাল হইতে নিজেদের পূর্বপুরুষগণের প্রমুখাৎ এছমাইল-বংশীয়দিগের সম্বন্ধে ঐ পুরাবৃত্তগুলি শ্রবণ করিয়া আসিতেছিল—এবং যুগপৎভাবে তাহারা ইহাও দেখিয়া আসিতেছিল যে, তাহাদিগের পূর্বপুরুষগণ স্মরণাতীত যুগ হইতে ঐ বৃত্তান্তগুলিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, এছমাইল ও তৎপিতা এবরাহিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহু অনুষ্ঠানের স্মৃতি রক্ষার জন্য ছাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যে প্রধাবন, বলিদান বা কোরবানী, মিনায় শয়তানের প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ, মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি কার্যগুলিকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে।

## আরবের ইহুদী

হযরত এছমাইলের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হযরত এছহাকের সন্তানগণ, পূর্বে বানি-এস্রাইল বলিয়া আখ্যাত হইত। ইহারা সকলেই ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল। বলা বাহুল্য যে, আরবের ইহুদী অধিবাসীবৃন্দ, প্রচলিত তৌরেৎ নামক পুস্তকের প্রক্ষিপ্ত বর্ণনানুসারে বিশ্বাস করিত যে, 'প্রতিজ্ঞার সন্তান' এছমাইল নহেন—বরং এছহাক, এবং পিতা এবরাহিম এছহাককেই বলিদানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু, এছমাইল যে আরবে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং কা'বা মন্দিরের সেবায়েতগণ যে এছমাইলেরই বংশধর, সে সম্বন্ধে তাহারা কখনও কোন প্রকার সংশয় উপস্থিত করে নাই।

আরবের যে সকল বিশেষত্ব ও বিবরণ উপরে বর্ণিত হইল, সেগুলি একত্রে আলোচনা করার পর, প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ পাঠককেই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের বংশ-

বিবরণ ইত্যাদি ইতিবৃত্ত অবগত হওয়ার যেরূপ বিশুদ্ধ উপকরণ ও প্রামাণ্য সূত্র আরবদিগের নিকট ছিল, জগতে তাহার তুলনা নাই। অন্ততঃপক্ষে এতটুকু স্বীকার করিতেই হইবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ও অপরাপর জাতির পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে শ্রেণীর প্রমাণ ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রচলিত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি নির্ধারিত হইয়াছে, আরব-পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত যুক্তি-প্রমাণগুলি তাহা হইতে কোন অংশেই দুর্বল নহে।

আরবের সমস্ত পুরাবৃত্ত, সমস্ত জনশ্রুতি, সকল প্রকার কিংবদন্তি, সমস্ত সাহিত্য, সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান এবং আরববাসী সকল বংশের ও সকল গোত্রের পুরুষানুক্রমিক পরম্পরাগত ও বহু যত্নে সংরক্ষিত সমস্ত বংশ-বিবরণ, স্মরণাতীত কাল হইতে একবাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে যে, হযরত এবরাহিমের পুত্র এছমাইল ও তাঁহার মাতা হাজেরা আরবদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন ও কা'বার প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং কোরেশগণ সেই হযরত এছমাইলেরই বংশধর। যে জরহুম বংশে হযরত এছমাইলের বিবাহ হইয়াছিল, তাহারাও বংশ-পরম্পরাক্রমে এই বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিয়াছে। অতএব ঐ বিবরণের সত্যতা ও প্রামাণিকতা অস্বীকার করার ন্যায় হঠকারিতা আর কি হইতে পারে, পাঠকগণ তাহা বিচার করিয়া দেখুন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### পাদরীদিগের প্রমাদ

বিগত অর্ধ শতাব্দী হইতে কতিপয় খ্রীষ্টান লেখক, নানা কারণে এই সুর ধরিয়াছেন যে, 'মোহাম্মদের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়া থাকে, সেগুলি অপ্রামাণ্য উপকথা মাত্র।' তাঁহারা বলেন যে, হযরত এবরাহিম বা এছমাইল মক্কায় আগমন করেন নাই, এবং কা'বা-প্রতিষ্ঠার সহিত তাঁহাদের কোনই সংস্রব নাই। অধিকন্তু হযরত এবরাহিম এছমাইলকে কখনই কোরবানীর জন্য উপস্থিত করেন নাই, কারণ 'সদা প্রভু যিহোবা আবরাহামের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এছহাকে এবং পরে তাঁহার পুত্রগণে বর্তায় এবং ক্রমে ক্রমে বংশ-পরম্পরাক্রমে সেই নিয়ম ও আশীর্বাদ দাউদের মধ্যবর্তিতায় প্রভু যীশুখ্রীষ্টে গিয়া বর্তায়।'

### চাঞ্চল্যের কারণ

খ্রীষ্টান লেখকগণের মনে এ-সম্বন্ধে এতটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে তাঁহাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের কৌলীন্য প্রতিপাদন করা। কারণ, বাইবেলের বরাত দিয়া যীশুকে দাউদ বংশ-সম্ভূত—সুতরাং বংশ পরম্পরাক্রমে এবরাহিমের সহিত সংস্থাপিত ঐশিক নিয়মের এবং তৎপ্রতি সমাগত আশীর্বাদের অধিকারী প্রমাণ করা ব্যতীত (বাইবেল অনুসারে) যীশুর অন্য বিশেষত্ব কিছুই নাই।

এ সম্বন্ধে এছলামের শিক্ষা কি, কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াৎগুলি হইতে তাহা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে :—

وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمت فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما
قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين - ( البقرة - ع ١٥ )

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون
عما كانوا يعلمون - ( البقرة - ع ١٦ )

অর্থাৎ—"এবং যখন আল্লাহ্ কতিপয় বাক্যের দ্বারা এবরাহিমকে পরীক্ষা করিলেন আর তিনি তাহা পূর্ণরূপে সম্পাদন করিলেন, তখন আল্লাহ্ (এবরাহিমকে) বলিলেন,—আমি তোমাকে লোকদিগের ইমাম বানাইব। এবরাহিম বলিলেন,—আর আমার বংশধরদিগের মধ্য হইতে ?—(আল্লাহ্ এবরাহিমের এই প্রার্থনার উত্তরে) বলিলেন,—অত্যাচারী ব্যক্তিগণ কখনই আমার প্রতিশ্রুতি পাইতে পারে না।" (সূরা বাকারা, ১২৪ আয়ৎ।।

"(এবরাহিম, এছমাইল ও এছহাক) সে সমস্ত লোক (নিজেদের কাজ সম্পন্ন করিয়া) চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের কর্মফল তাহারা ভোগ করিবে এবং তোমাদের কর্মফল তোমরা ভোগ করিবে, বস্তুতঃ তাহাদের কার্যকলাপের জবাবদিহি তোমাদিগকে করিতে হইবে না।" (সূরা বাকারা, ১৪১ আয়ৎ।।

## এছলামের শিক্ষা

এই দুইটি আয়ৎ দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, বংশ-পরম্পরাগত কৌলীন্য এবং উত্তরাধিকারসূত্রে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও আশীর্বাদ লাভের যে সকল উপকথা খৃষ্টান ও ইহুদিগণ রচনা করিয়াছিলেন, কোরআন দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের ঐ 'উত্তরাধিকারসূত্রে আশীর্বাদ ও প্রতিশ্রুতি' লাভের যে হাস্যজনক উপকথাটি খৃষ্টের ধর্মের মূল ভিত্তি এবং মুছলমানগণ এছমাইলের পক্ষ হইতে যে 'আশীর্বাদ ও প্রতিশ্রুতির' জ্যেষ্ঠাধিকার লইয়া "স্বত্ব-সাব্যস্ত" করিয়া বসিবেন বলিয়া তাঁহারা এতদূর চঞ্চল হইয়া পড়িতেছেন, এছলাম তাহাকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার একটা জাজ্বল্যমান নিদর্শন বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। এই আয়ৎগুলি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে যে, মানুষের মাহাত্ম্য, তাহার সত্যকার মর্যাদা এবং আল্লাহ্‌র সমীপে তাহার সম্মান—একমাত্র তাহার সুকৃত কর্মফলের দ্বারা অর্জিত হইয়া থাকে। ধর্মের হাটগোলে মরামানুষের হাড় আনিয়া, ভানুমতীর ভেল্কি দেখাইয়া কার্যোদ্ধার করিতে এছলাম কখনই সম্মত হয় নাই।

যাহা হউক, আমরা যখন খৃষ্টান লেখকগণকে জিজ্ঞাসা করি,—'মহাশয়েরা যে সকল দাবি করিতেছেন, তাহার প্রমাণ কি ?' তাঁহারা তখন আনন্দ-উৎফুল্ল চিত্তে বলিয়া উঠেন 'প্রমাণ বাইবেল, পুরাতন নিয়ম।'

## বর্তমান তাওরাতের ঐতিহাসিক মূল্য

কিন্তু বাইবেল, বিশেষতঃ তাহার পুরাতন নিয়ম বা Old Testaments-এর ঐতিহাসিক ভিত্তিতে এবং তাহার প্রামাণিকতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, জগতে অপ্রামাণিক বলিয়া আর কিছুই বাকী থাকে না। খৃষ্টান লেখকগণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দুর পৌরাণিক গ্রন্থগুলিকে অবিশ্বাস্য উপকথা ও আরব্য-উপন্যাসের সমশ্রেণীর কাল্পনিক গল্প বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ঐ পুস্তকগুলির বর্ণিত মূল উপাখ্যান সমূহের ঐতিহাসিক ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, ঐ সকল উপাখ্যান-রচয়িতাগণের বর্ণনা আজ পর্যন্ত কতকটা অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বাইবেল, বিশেষতঃ তাহার 'পুরাতন নিয়ম' সংজ্ঞাভুক্ত পুস্তকগুলি সম্বন্ধে একথাও বলা যাইতে পারে না। খৃষ্টান লেখকগণ সর্বপ্রথম ঐ পুস্তকগুলির প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করুন, তৎপর তাহার উপর নির্ভর করিয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদিগকে পরাজিত করার চেষ্টা করিবেন।

ইহুদী জাতি ও তাহাদিগের ধর্ম-পুস্তকগুলির বহু শতাব্দীব্যাপী পাপাচার ও দুর্দশার ইতিহাস পাঠ করিলে, ঐ পুস্তকগুলির অপ্রামাণিকতা সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে, স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন করার আবশ্যক হয়। কাজেই এখানে আমরা সংক্ষেপে দুই-একটি কথার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

সোলেমান ইহুদীদিগের রাজা। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহুদী জাতি দ্বাদশ দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ইহার মধ্যে দুইটি দল—ইহুদা ও বেনয়ামিন—সোলেমানের পুত্র রহাবিয়ামকে নিজেদের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। অবশিষ্ট দশ দল উত্তর দিকে সামারিয়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া সুবর্ণনির্মিত গো-বৎসের পূজা আরম্ভ করিয়া দিল।* শেষে খ্রীষ্টপূর্ব ৭২২ অব্দে আসিরিওগণ এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং ইহুদীদিগকে বন্দী করিয়া নিনেভায় লইয়া যায়। এই দশটি বংশ এইরূপে ধ্বংস বা পৌত্তলিকদিগের মধ্যে লীন হইয়া একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে রহাবিয়াম-প্রতিষ্ঠিত রাজত্বও খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে বাবেলিয়ান-রাজ (বখতে-নছর— بخت نصر) নবুখদনিৎসর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। যেরুশেলম বা বাইতুল-মোকাদ্দাছ মন্দিরে তখন তৌরাতের মুসাবিদা এবং অন্য পবিত্র পদার্থগুলি সংরক্ষিত হইত। এই আক্রমণে, নবুখদনিৎসর রাজার আদেশে, ঐ মন্দিরটিতে অগ্নি প্রদান করিয়া তৌরাৎ ইত্যাদি সহ তাহাকে একেবারে ভস্মাবশেষে পরিণত করা হয়। রাজ-সৈন্যগণ এই সময় ইহুদীদিগকে অতি নির্মমভাবে হত্যা করিতে থাকে এবং হতাবশিষ্ট সমস্ত ইহুদী নর-নারীকে তাহারা বন্দী করিয়া লইয়া যায়। তাহার পর, খ্রীঃ পূঃ ৫৩২ অব্দে, পারস্য রাজ কোরসের দয়ায় আবার ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং শেষে রাজা আর্তখস্তের আমলে ইস্রা বা আজরা নামক এক ব্যক্তি পারস্যরাজ কর্তৃক (যে কোন কারণে হউক) নানা প্রকার সাহায্য লাভ করিয়া, বাবিল হইতে যেরুশেলমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ইহুদীদিগের সম্মুখে কতকগুলি কাগজ-পত্র উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, এইগুলি মোশির (Moses) ব্যবস্থা বা তৌরাৎ।**

প্রথম পঞ্চ-পুস্তক এইরূপে সঙ্কলিত হওয়ার পর, নহিমিয়া নামক আর এক ব্যক্তি 'নবিম' نبيم নামক দ্বিতীয় ভাগের পুস্তকগুলি সঙ্কলন করেন। অর্থাৎ কতকগুলি লেখা উপস্থিত করিয়া ইনি বলেন যে, এইগুলি নবিম বা বাইবেলের ২য় ভাগ। (মাকাবির ২য় পুস্তক ২—১৩ দেখ)।

ইহার পর, কিছু দিন যাইতে না যাইতে, ইহুদীদিগের উপর গ্রীক রাজাদিগের আক্রমণ আরম্ভ হয়। আলেকজান্ডার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের সময়, ইহুদিগণ একরূপ অর্ধ-স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিয়াছিল বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ বিদেশী ও বিধর্মী রাজাগণের আক্রমণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং আভ্যন্তরিক বিপ্লবের ফলে, ইহুদীদিগের ধর্ম-কর্ম ও পুরাতন ধর্ম-শাস্ত্রাদির যে দুর্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, খ্রীঃ পূঃ ১৬৮ অব্দে আন্তাকিয়ার রাজা এন্টিনিউস ইহুদী জাতি, তাহাদের ধর্ম ও জাতীয়তা এবং তাহাদের ধর্মশাস্ত্রগুলিকে ধ্বংস ও চিরতরে বিলুপ্ত করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া আবার তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে ইহুদীদিগের দুর্দশার আর সীমা রহিল না। রাজাজ্ঞায় প্রথমে ধর্ম-পুস্তকগুলি পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলা হইল। তাহার পর কঠোর রাজাদেশ প্রচারিত হইল যে, অতঃপর আর কেহ ইহুদী ধর্ম-পুস্তক পাঠ করিতে পারিবে না। এইরূপে মুখে মুখে আবৃত্তি করাও বন্ধ হইয়া গেল। পক্ষান্তরে রাজার আদেশে যেরুশেলমে জয়ীস—زئيس দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মাকাবী নামক জনৈক দেশহিতৈষী ব্যক্তির উদ্যোগে এন্টিনিউস রাজার পরাজয় ঘটে। এইরূপে স্বজাতিকে পরাধীনতা মুক্ত করার পর, মাকাবী কতকগুলি বহি-পুস্তক ইহুদীদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া সেগুলিকে আজরা ও নহিমিয়ার সঙ্কলিত তৌরাৎ ও নবিম— توره ونبيم বলিয়া প্রকাশ করেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি এই সঙ্গে كتبيم কাতবিম নামক ৩য় ভাগটিও যোজনা করিয়া দেন।

---

* ১ম রাজাবলী, ১২, ১৮—৩০ পদ।

** রাজাবলী, ইস্রা ও নহিমিয় ৭ম অধ্যায় দেখ।

কিছুকাল এইভাবে অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর, ইহুদীদেশে রোমানদিগের প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইল। টাইটেস নামক রোমান রাজা ৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে যেরুশেলম জয় করিয়া, সম্পূর্ণ নগরটি সহ বাইতুল-মোকাদ্দছ বা সোলেমানের ধর্ম-মন্দিরটি পুনরায় ধ্বংস করিয়া ফেলেন। মন্দিরে যে সকল ধর্ম-পুস্তক ছিল, বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তৎসমদুয় রোমীয় রাজধানীতে লইয়া যাওয়া হয়। এদিকে রাজাদেশে ইহুদীদিগকে যেরুশেলম হইতে দেশান্তরিত করিয়া দেওয়া হয় এবং ইহুদী ব্যতীত অন্য জাতীয় লোকদিগকে তাহাদের দেশে বসাইয়া দেওয়া হয়। ১৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদীগণ বিদ্রোহী হইলে, তখনকার রাজা কাইসর-হেডরিনের সহিত তাহাদের আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধেও ইহুদিগণ পরাজিত হয়। তাহাদের প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। যুদ্ধের ফলে, ইহুদীদিগের পক্ষে বৎসরে মাত্র এক দিন ব্যতীত—যেদিন টাইটিউস যেরুশেলম ও সোলেমানের মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন—যেরুশেলমে প্রবেশ করাই নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

এইরূপে ইহুদীদিগের ধর্ম-পুস্তকগুলি পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট ও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে যুগের বিদ্যমান ইহুদী পণ্ডিতগণ, নিজেদের খেয়াল ও আবশ্যক মতে সময় সময় কতকগুলি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করিয়া সেগুলিকে ধর্ম-পুস্তকরূপে উপস্থিত করিতেন। এই সময় যাজকদিগের স্বার্থপরতা ও নীতিহীনতা এবং জনসাধারণের মূর্খতা ও পাপাচার, বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহুদী-ইতিহাসের বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে কালক্রমে প্রকৃত তৌরাৎ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার বর্ণনার সহিত নানা প্রকার কিংবদন্তি, জনশ্রুতি, উপকথা ও যাজকগণ কর্তৃক জালকৃত বিবরণ ও ব্যবস্থাদি, অনুমান ও কল্পনা মাত্রের সহায়তায় মিশ্রিত হইয়া 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইতে হইতে বর্তমান বাইবেল আকারে পরিণত হইয়া যায়।

এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাবিলের বন্দীদশা হইতে মুক্তি লাভের সময় ইহুদীজাতি নিজেদের ধর্মশাস্ত্র ও জাতীয়তা প্রভৃতির ন্যায় তাহাদের মাতৃভাষা 'হিব্রু' (এবরাণী) হইতেও বঞ্চিত হইয়া পড়ে। (নহিমিয় ১৩, ২৩—২৫)। এদিকে, প্রথম হইতেই ইহুদীদিগের নিজেদের মধ্যে ধর্ম লইয়া ঘোর বিসংবাদ উপস্থিত হয়। একদল বলিতে লাগিল—মোশির (Moses মুছার) পঞ্চ-পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই মানিব না। কারণ ওগুলি Revelation অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রকটিত বাক্য বা 'অহি' নহে। ইহারা 'সাদুকী' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় দল ফরিশীয়দিগের। তাহারা বলিতে লাগিল—তৌরাৎ বা তাওরাৎ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম توره شبكتب (وحى مكتوب) বা লিখিত ঐশিক বাণী। মোশির লিখিত প্রথম পঞ্চ-পুস্তক এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীকেই তাহারা توره شبعلفه (وحى لسانى) বা বাচনিক ভাবে রক্ষিত ঐশিক বাণী বলিত। তাহাদের সংস্কার ছিল যে, এই শ্রেণীর 'বাণী'গুলি হারুন ও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যবর্তিতায়, ছিনা ব-ছিনা ইস্রা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। ইস্রা মহা যাজকমণ্ডলীর ১২০ জন যাজককে তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ২৫০ বৎসর পর্যন্ত এই বাণীগুলি ঐ যাজকদিগের বংশধরগণের মধ্যে রক্ষিত হয়। শামাউন্ (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ৩০০) ইহাদের শেষ ব্যক্তি। سفريم বা ধর্মগ্রন্থ-লেখকগণ শামাউনের নিকট হইতে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে تنائيم বা পণ্ডিতগণ (৭০—২২০ খ্রীষ্টাব্দে) তাহা গ্রহণ করেন।*

---

* Jewish Encyclopaedia ১০ম খণ্ড ৩৬১পৃষ্ঠা ; Chagiga Talmud : Rev. A. Streane কর্তৃক অনুবাদিত, ভূমিকা ৭৩৮ পৃষ্ঠা।

এইরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক শতাব্দীতে নানা কারণে, খ্রীষ্টান ও ইহুদীদিগের ধর্ম-পুস্তকগুলির কেবল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনই ঘটে নাই, বরং শত শত জাজ্বল্যমান মিথ্যাকে স্বার্থের খাতিরে বা অজ্ঞতার কারণে ধর্মশাস্ত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে—অসংখ্য জাল ও মিথ্যা পুস্তককে ধর্মশাস্ত্রের স্বর্গীয় ভাববাণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইয়া শেষকালে বাইবেলের যে আকার দাঁড়াইয়াছিল, বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তাহাতেও কাটছাঁট ও রদ-বদল বরাবরই চলিয়া আসিয়াছে।

উদাহরণ-স্থলে বর্তমানে Apocrypha—অ্যাপোক্রাইফা আখ্যায় পরিচিত ৩৫ খানা পুস্তকের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ এগুলিকে জাল বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু রোমান ও গ্রীক সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত সেগুলিকে অপরগুলির ন্যায় নিতান্ত বিশ্বস্ত ঐশিক বাণী ও স্বর্গীয় আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। এই ৩৫ খানা পুস্তকে আবার এমন বহু পুস্তকের নাম জানিতে পারা যায়, যাহার অস্তিত্ব বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। (Apocrypha—চার্লস বিরচিত, অক্সফোর্ড প্রেস, ১৯১৩, দেখ)।

বাইবেল পুরাতন নিয়মের স্থানে স্থানে এমন সব ধর্ম-পুস্তকের নাম পাওয়া যায়, যাহার অস্তিত্ব জগৎ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখানে মোশির 'নিয়ম পুস্তক' (যাত্রা পুস্তক ২৪-৭), 'সদাপ্রভুর যুদ্ধ-পুস্তক' (গণনা ২১-১), 'যাশের পুস্তক' (যিহোশূয় ১০-১৩), 'নাথন ভাববাদীর পুস্তক', 'শীলোনীয় অহিয়ের ভাববাণী', 'ইদ্দো দর্শকের পুস্তক' (২ বংশাবলী ৯-২৯), 'হানানির পুত্র যেহুর পুস্তক' (ঐ ২০-৩৪), 'আমোসের পুত্র যিশাইয় ভাববাণীর পুস্তক' (ঐ ২৬-২২), শলোমনের 'তিন সহস্র প্রবাদ বাক্য' ও 'এক সহস্র পাঁচটি গীত' (১ রাজাবলী ৪-৩২), 'শলোমনের-বৃত্তান্ত পুস্তক' (ঐ ১১-৪২), প্রভৃতির নাম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান বাইবেলের স্বীকার-উক্তি মতেই এই পুস্তকগুলি প্রথমে ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে কোন কারণে হউক, কালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে

## ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক মূল্য

খ্রীষ্টানদিগের ব্যাপার আরও আশ্চর্যজনক। ইঁহারা বাইবেলে কিরূপ জালিয়াতি করিয়াছেন, উপক্রমণিকায় তাহার যৎসামান্য পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এখানে তাঁহাদের নূতন নিয়ম—New Testament বা তথাকথিত ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক ভিত্তির আর একটু আভাস দিয়া রাখিতেছি।

বর্তমানে খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের নামে প্রচারিত চারিখানি মাত্র ইঞ্জিল, প্রেরিতদিগের কার্য-শীর্ষক একখানা পুস্তক, বিভিন্ন মণ্ডলী বা বিশ্বাসীদিগের নিকট লিখিত ২১ খানি পত্র এবং শেষে প্রেরিত যোহনের প্রকাশিত বাক্য, একুনে ৬ খানি পুস্তক ও ২১ খানি পত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু ইতিহাস একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, পূর্বে তাঁহাদের ইঞ্জিলের সংখ্যা ছিল ৩৬ খানি এবং ১১৩ খানি পত্র প্রেরিতদিগের পত্র বলিয়া তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পাঠকগণ Encyclopaedia Britannica-র, Apocryphal Literature শীর্ষক সন্দর্ভে এই সকল পুস্তকের নাম ও বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন

৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে নিসিও কাউন্সিলে তৎকালীন বিদ্যমান সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা লইয়া অবিন্যস্ত ও এলোমেলোভাবে বেদীর উপর গাদা করিয়া দেওয়া হইল এবং তাহার মধ্য হইতে যেগুলি পড়িয়া গেল, সেগুলিকে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল। এই সভায় মরা মানুষের কবর হইতে ভোট

আশ্রয় করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। ধর্ম ও ধর্ম-পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে যে সকল মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এই কাউন্সিলে ভোটের আধিক্য দ্বারা তাহার ন্যায়ান্যায় নির্ধারণ করা হয়। এই সব সঙ্কলনই বর্তমান 'নূতন নিয়ম' নামে পরিচিত হয়। বিখ্যাত পোপ গ্লাসিওস (৪৯২ হইতে ৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) ইহার প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া সরকারী সনদ প্রদান করেন। পক্ষান্তরে ৩২৫ বৎসর পর্যন্ত বাইবেলরূপে গৃহীত ২৮ খানি পুস্তক ও ৯২ খানা পত্র অপ্রামাণিক এবং মাত্র ৬ খানা পুস্তক ও ২১ খানা পত্র প্রামাণিক বলিয়া নির্ধারিত হইয়া গেল।

দীর্ঘ ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীষ্টান সমাজ এই পুস্তকগুলিকে প্রত্যক্ষ ঐশিক বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে, ইউরোপে স্বাধীন ও দার্শনিকভাবে ইতিহাস বিচারের সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বর্তমান বাইবেল সম্বন্ধে অন্যরূপ আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অন্টাস তাঁহার 'যীশু-জীবনী' নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। হেগেলের (Hegel) ইতিহাস-দর্শনানুসারে বাইবেলের (নূতন নিয়মের) বর্ণিত বিবরণগুলির সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, যীশুর জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁহার নানা প্রকার অলৌকিক কার্য সম্পাদন ইত্যাদি ইঞ্জিলের সমস্ত বিবরণ, কল্পিত উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।* খ্রীষ্টান জগতে ইহা লইয়া একটা ভয়ানক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ১৮৭৮ সালে ব্রোণোবায়স তাঁহার 'খ্রিষ্টস' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, প্রচলিত ইঞ্জিলগুলি ঐতিহাসিক হিসাবে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবিশ্বাস্য। অধিকন্তু তিনি ইহাও দাবী করেন যে, বাইবেল-বর্ণিত যীশুর অস্তিত্বই সন্দেহস্থল। তিনি প্রাচীন পুস্তকাদি অবলম্বনে ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যীশুর পার্বতীয় উপদেশ (Sermon on the Mount) প্রভৃতি যে শিক্ষাগুলিকে বাইবেলের বিশেষত্ব বলিয়া প্রকাশ করা হয়, সেগুলি গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদিগের উক্তির অবিকল নকল ব্যতীত আর কিছুই নহে।** স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ওয়েলহাসেন Wellhausen তৎরচিত বাইবেলের টীকায় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তবে যীশু বলিয়া যে একজন লোক ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি সন্দেহ করেন না।***

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ক্যান্টারবেরী নগরে খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণের এক সভায় স্থির করা হয় যে, ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে (প্রথম জেমসের সময়) 'বাইবেলের যে ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহার সংশোধনের আবশ্যক হইয়াছে'। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানারূপ অভিনব আবিষ্কারের ফলে, পুরাতন বাইবেলকে লইয়া পার পাওয়া তখন কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক, সভার পক্ষ হইতে এই কার্যের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ২৭ জন পণ্ডিত এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। কমিটি পূর্ণ দশ বৎসর পরিশ্রম করার পর ১৮৮২ সালে, বাইবেলের এক নূতন সংস্করণ বাহির করেন, ইহাই এখন Revised Version বলিয়া পরিচিত।

এই কমিটির সমস্ত সদস্য বাইবেলের যে স্থানগুলিকে একবাক্যে জাল বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদান করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব—

---

* Weinele ও Widgery কর্তৃক Jesus in the 19th Century and After দেখুন।

** দুঃখের বিষয় এই লেখকগণ বৌদ্ধ ও পার্সীদিগের ধর্ম-পুস্তকগুলির সহিত খ্রীষ্টানী বাইবেলখানা মিলাইয়া দেখেন নাই, অন্যথায় তাঁহারা এ সম্বন্ধে অনেক অকাট্য অভিনব তত্ত্বের সন্ধান পাইতেন।

*** Dr. Arther Drews প্রণীত "Christ-Myth" প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই যীশুর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন; এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম. এ., বেদান্তরত্ন প্রণীত "In Search of Jesus Christ" খুবই উপাদেয় পুস্তক।

| | |
|---|---|
| ১। মথি, ৬-১৩। | ইহাতে যীশুর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন্ত হইয়া |
| ২। মার্ক, ১৬, ৯ হইতে ২০ পদ। | শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং সশরীরে স্বর্গারোহণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। |
| ৩। যোহন, ৫, ৩-৪ পদ। | স্বর্গীয় দূত কর্তৃক 'বৈথেসদা' পুষ্করিণীর পানি কম্পন। |
| ৪। যোহন, ৮-১১। | ব্যভিচারিণী নারীর বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ। |
| ৫। প্রেরিত ৮-৩৭। | যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের 'পুত্র'—এই বিশ্বাস। |
| ৬। যোহনের ১ম পত্র, ৫—৭। | ত্রিত্ববাদ। |

বাইবেল সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে। কিন্তু এই পুস্তকে সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা এই আলোচনার অতি সংক্ষিপ্ত আভাস মাত্র। বাইবেলের ঐতিহাসিক ভিত্তি যে কতদূর দুর্বল, এবং তাহার বর্ণিত বিবরণগুলি যে কিরূপ ভিত্তিহীন উপকথার সমষ্টি, আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা পাঠকগণ তাহা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিয়াছেন।

## বাইবেলে সদাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভের বিবরণ

### সদাপ্রভুর আশীর্বাদ

বংশ-পরম্পরাগত কৌলীন্য অর্জন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও আশীর্বাদ লাভ সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম মুইর ও পাদরী কে, ডি, রেট প্রমুখ খ্রীষ্টান লেখকগণের এতদূর অধৈর্য হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা এছহাককে 'প্রতিজ্ঞার সন্তান' বলিয়া নির্ধারণ করিয়া এবং বংশ-পরম্পরাক্রমে সমাগত সেই প্রতিজ্ঞা ও আশীর্বাদকে যীশুতে বর্তাইয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহেন। যে সকল দলিলের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা এই দাবী করিয়া থাকেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য ও প্রামাণিকতা যে কতটুকু, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এখন, যীশুর পূর্বপুরুষগণ সদাপ্রভুর তথাকথিত আশীর্বাদ লাভের জন্য কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, বাইবেল হইতেই তাহারও একটু নমুনা উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

'মথি লিখিত' ইঞ্জিলের প্রথম অধ্যায়ে এবং লূকের ইঞ্জিলের ৩য় অধ্যায়ের ২৩ হইতে ৩৮ পদে, যীশুর 'বংশাবলী-পত্র' প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, যীশু-জননী মরিয়ম যোসেফ নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী, এই যোসেফ দাউদের সন্তান এবং দাউদ ইছহাকের পুত্র—যাকোবের সন্তান। অতএব, এব্রাহিমের নিকট "সদাপ্রভু যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার পুত্র ইছহাক ও পৌত্র যাকোবের মধ্যবর্তিতায় বংশ-পরম্পরাক্রমে দাউদে, দাউদ হইতে যোসেফে এবং যোসেফ হইতে যীশুতে বর্তিয়াছিল। অতএব ঐ আশীর্বাদ প্রভু যীশু খ্রীষ্টেরই জন্ম ও শোণিতগত অধিকার।"

### যোসেফ ও যীশু

কিছুক্ষণের জন্য আমরা বাইবেল-বর্ণিত এই 'বংশাবলী-পত্র'খানিকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি। সঙ্গে সঙ্গে তর্কশাস্ত্রের সমস্ত বিধিব্যবস্থাকে মস্তিষ্কের এক কোণে চাপা দিয়া রাখিয়া, খ্রীষ্টান লেখকদিগের এই যুক্তিটির সারবত্তাও স্বীকার করিয়া লইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাতেও তাঁহাদের দাবীটি সপ্রমাণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। স্বীকার করিলাম—যোসেফ দাউদের সন্তান এবং ইহাও স্বীকার করিলাম যে,

পিতৃগুণের সঙ্গে সঙ্গে সদাপ্রভুর আশীর্বাদও বংশ-পরম্পরাক্রমে যোসেফে আসিয়া বর্তিয়াছিল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—যীশু এই যোসেফের কে ? যীশু-জননী মরিয়ম গর্ভবতী হইলেন—"হোলি ঘোস্ট" বা পবিত্র-আত্মা হইতে, আর তাঁহার পিতা হইলেন—সদাপ্রভু স্বয়ং। মরিয়মের সহিত যোসেফের "সহবাসের পূর্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে—পবিত্র আত্মা হইতে।" (যোহন, ১৮ ইত্যাদি)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যীশুর শরীরে যোসেফের শোণিত একবিন্দুও বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং যথাক্রমে এবরাহিম, ইছহাক, যাকোব ও যোসেফের বংশানুক্রমিক ও জন্মগত অধিকার—সদাপ্রভুর আশীর্বাদ—যীশুতে বর্তায় নাই। কারণ তিনি যোসেফের সন্তানই নহেন। আশা করি, এই সহজ কথাটা লইয়া অধিক আলোচনা করার আবশ্যক হইবে না।

## যীশুর আশীর্বাদ প্রাপ্তি

যীশুর জননীর স্বামী যোসেফ যাকোবের সন্তান, যাকোব ইছহাকের পুত্র, আর ইছহাকই প্রথমে আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পুত্র যাকোবও এই আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐ আশীর্বাদ ৪২ পুরুষ পরে যোসেফে বর্তিয়াছিল। বেশ কথা ! কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা এই যে, যাকোবই ত আর এছহাকের একমাত্র পুত্র ছিলেন না। আদি পুস্তক (২৫, ২৪-২৬ পদ) পাঠে জানা যাইতেছে যে, যাকোব ও এষৌ দুই যমজ ভ্রাতা। অতএব এষৌকে বাদ দিয়া যাকোব কিরূপে এই অধিকার একচেটিয়া করিয়া লইলেন, এই সমস্যাটা বাইবেল লেখকগণেরও অজ্ঞাত ছিল না। তাই তাঁহারা অতি আশ্চর্যরূপে এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন !

বাইবেলের বর্ণনানুসারে এষৌ প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ঐ ২৬)। আর এই হিসাবে পুত্রত্বের সমান অধিকার ব্যতীত, এষৌয়ের একটা স্বতন্ত্র জ্যেষ্ঠাধিকারও ছিল। পিতা ইছহাক এষৌকেই অধিক ভালবাসিতেন, কিন্তু যাকোব মাতার প্রিয়পাত্র ছিলেন (ঐ, ২৯ পদ)। পিতার স্নেহ ও জ্যেষ্ঠাধিকার থাকা সত্ত্বেও হতভাগ্য এষৌকে কিরূপে বংশ-পরম্পরাগত স্বর্গীয় 'আশীর্বাদ' হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, পাঠকগণ বাইবেল-রচয়িতার মুখে তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন ঃ

## যাকোবের নৃশংসতা

"একদা যাকোব দাইল পাক করিয়াছেন, এমন সময় এষৌ ক্লান্ত হইয়া প্রান্তর হইতে আসিয়া যাকোবকে কহিলেন, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, বিনয় করি, ঐ রাঙ্গা রাঙ্গার দ্বারা আমার উদর পূর্ণ কর। ... যাকোব কহিলেন, অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমার কাছে বিক্রয় কর। এষৌ বলিলেন, দেখ, আমি মৃতপ্রায়, জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি লাভ ?" যাকোব কিন্তু নাছোড়বান্দা, বিশেষ এমন সুবর্ণসুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। তিনি মৃতপ্রায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাতরোক্তির প্রতি একটুও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বেশ দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "তুমি অদ্য আমার কাছে দিব্য কর।" এইরূপে জ্যেষ্ঠাধিকার ত্যাগের দিব্য করাইয়া যাকোব এষৌর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন (আদি পুস্তক, ২৫ অধ্যায়, ২৯—৩৪)। এই ত হইল যাকোবের জ্যেষ্ঠাধিকার প্রাপ্তির স্বর্গীয় বিবরণ। এখন, মূল আশীর্বাদটী কিরূপে তাঁহার হস্তগত হইল, তাহাও দেখা আবশ্যক।

## প্রবঞ্চনামূলক আশীর্বাদ লাভ

বাইবেল, আদি পুস্তকে 'যাকোব ছল পূর্বক পিতার আশীর্বাদ লন'—শীর্ষক একটি অধ্যায় (২৭) আছে। ঐ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, বৃদ্ধ বয়সে এছহাকের চক্ষু নিস্তেজ

হইয়া গেলে, জীবন সম্বন্ধে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময় তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র এষৌকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ; কোন দিন আমার মৃত্যু হয় জানি না। এখন বিনয় করি, —আমার জন্য মৃগ শিকার করিয়া আন। আর আমি যেরূপ ভালবাসি, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমার নিকটে আন, আমি ভোজন করিব ; যেন মৃত্যুর পূর্বে আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করে।" মাতা রিবিকা এই কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। হইবারই কথা, তাঁহার প্রিয় পুত্র যাকোব আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইতেছেন, ইহা একটা সামান্য কথা নহে। কাজেই তিনি যাকোবকে সমস্ত কথা বলিয়া পাল হইতে শীঘ্র একটা ছাগ-বৎস আনিয়া দিতে বলিলেন। মাতৃ-আজ্ঞা ত্বরায় পালিত হইল—রিবিকা স্বামীর পছন্দমত খুব উত্তমরূপে তাহা রাঁধিয়া দিলেন এবং পিতার নিকট এষৌ বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে তাহা খাওয়াইয়া আশীর্বাদটা পূর্ব হইতে অধিকার করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। মাতা-পুত্রের ত্বরিত চেষ্টার ফলে, সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু যাকোবের মনে তখন একটা খটকা উপস্থিত হইল। তাঁহার ভ্রাতা এষৌর সর্বাঙ্গে অনেক লোম ছিল, আর তিনি নির্লোম—"কি জানি, পিতা আমাকে স্পর্শ করিবেন, আর আমি তাঁহার দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক বলিয়া গণ্য হইব ; তাহা হইলে আমি আমার প্রতি আশীর্বাদ না বর্তাইয়া অভিশাপ বর্তাইব।" কিন্তু মাতা রিবিকার বুদ্ধির অভাব ছিল না। তিনি এষৌর ভাল ভাল বস্ত্রগুলি দিয়া যাকোবকে সাজাইয়া দিলেন। আর শরীরের যে স্থানগুলি এছহাক স্পর্শ করিতে পারেন, সে সকল স্থানে ছাগল-ছানার চামড়া বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে আটঘাট বাঁধিয়া যাকোব ছাগমাংস লইয়া পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজকে এষৌ বলিয়া পরিচিত করেন। তিনি যে পিতার উপদেশ মতে প্রান্তর হইতে মৃগ শিকার করিয়া তাঁহার আহারের জন্য তাহা রন্ধন করিয়া আনিয়াছেন, যাকোব বেশ সপ্রতিভভাবে তাহাও ব্যক্ত করিলেন। তখন এছহাক আপন পুত্রকে কহিলেন, "বৎস, কেমন করিয়া এত শীঘ্র উহাকে পাইলে ?" যাকোব পূর্ববৎ সপ্রতিভভাবে উত্তর করিলেন,—"আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার সম্মুখে শুভফল উপস্থিত করিলেন।" কিন্তু ইহাতেও বৃদ্ধের সন্দেহ অপনোদিত হইল না। বাস্তবিক এষৌ কি-না তাহা স্পর্শ করিয়া বুঝিবার জন্য তিনি যাকোবকে নিকটে আসিতে বলিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "স্বর ত যাকোবের স্বর, কিন্তু হস্ত এষৌর হস্ত। বাস্তবিক তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।" তাহার পর ঐ এষৌরূপী যাকোব কর্তৃক পালরূপ প্রান্তর হইতে আনিত ছাগরূপ মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়া পিতা তৃপ্ত হইলেন, এবং পুত্রকে আশীর্বাদরূপ পদার্থটি প্রদান করিলেন।

যাকোব আশীর্বাদ লইয়া যাইতে না যাইতেই এষৌ মৃগয়া হইতে বাটী ফিরিলেন। তিনি মৃগমাংস রন্ধন করিয়া পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। "এই কথা শুনিবা মাত্র এষৌ সাতিশয় ব্যাকুলচিত্তে মহা চীৎকার করিতে লাগিলেন" এবং "তাঁহাকেও আশীর্বাদ করার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতা তাঁহার জন্য কিছুই আশীর্বাদ রাখেন নাই।" এষৌর অনুতাপের আর সীমা রহিল না, তিনি শুধপর ভ্রাতা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—"তাহার নাম কি যাকোব (প্রবঞ্চক) নয় ? বাস্তবিক সে দুইবার আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, আমার জ্যেষ্ঠাধিকার হরণ করিয়াছিল, এবং দেখুন আমার আশীর্বাদও হরণ করিয়াছে।"

যীশুর মাতার স্বামী যোষেফের আদি পুরুষ কি মহৎ উপায়ে কিরূপ মূল্যবান "আশীর্বাদ" লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## এছমাইল ও এছহাক

বাইবেলের প্রামাণিকতা, যীশুর সহিত দাউদ বংশের সম্বন্ধ এবং দাউদের পূর্বপুরুষ যাকোবের আশীর্বাদ লাভের মূল্য সম্বন্ধে, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে সকল কথা আলোচনা করা হইয়াছে, কিছুক্ষণের জন্য সেগুলিকে বিস্মৃত হইয়া, আমরা এখন দেখিবার চেষ্টা করিব যে, বাইবেল হইতে এই বিষয়টি কতদূর সপ্রমাণ হইতেছে।

হযরত এবরাহিম তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কাহাকে কোরবানী করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহার বিচার করার জন্য, সর্বপ্রথমে তাঁহার পুত্র বলিদানের স্থান নির্ণয় করা আবশ্যক। খ্রীষ্টান ভ্রাতাদিগের দাবী অনুসারে, যদি যেরুশেলমই কোরবানী-স্থল বলিয়া নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এছহাককেই কোরবানী করার আদেশ হইয়াছিল। আর যদি এই দাবী প্রমাণিত না হয়, অথবা পক্ষান্তরে আরবদিগের দাবী ও কর্মনাই দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত এছমাইলই কোরবানীর জন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

### কোরবানীর স্থান নির্ণয়

এই স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে বাইবেল বলিতেছে যে, পুত্র বলিদানের জন্য এবরাহিমের প্রতি 'মোরিয়া দেশে' যাইবার আদেশ হইয়াছিল এবং তিনি দুই দিন পথ-পর্যটনের পর, তৃতীয় দিন দূর হইতে সেই স্থানটি দেখিতে পাইলেন।*

এখানে প্রথম তর্ক এই মোরিয়া দেশ লইয়া। মোরিয়া কোথায়, এ প্রশ্নের সদুত্তর আজ পর্যন্ত কেহ দিতে পারিলেন না। বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার পর ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তথাকথিত মোরিয়া প্রদেশের কখনও কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব ছিল কি-না, তাহাই সন্দেহ স্থল। তাঁহারা স্পষ্টতঃ বলিতেছেন যে ঃ "Great Obscurity hangs about this name .....That the Editor of J.E. who gave Gen, 22, 1—19 its present form, meant to attach the interrupted sacrifice to the temple mountain is highly probable ; but he suggests rather than states this, and the fact that he does not make Abraham call the sacred spot 'the Moriah' but ( if the text is right ) 'yahwe yiri' ought to have opened the eyes of the critics."** ইহার সারমর্ম এই যে—"মোরিয়ার ভৌগোলিক তথ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বাইবেলের বর্তমান J. E. মুসাবিদার সম্পাদক যে, যেরুশেলমের মন্দির পর্বতের সহিত প্রস্তাবিত কোরবানীর ঘটনাটা জড়িয়া দিয়াছেন, ইহা খুবই সম্ভবপর। তবে, (যেরুশেলমের পর্বত যে কোরবানী স্থল। বাইবেলের ঐ সম্পাদক এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছেন না, বরং ইহা তাঁহার একটা Suggestion মাত্র। সমালোচকদের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঐ পর্বতের নাম যে মোরিয়া, এই মুসাবিদার সম্পাদক এবরাহিমের প্রমুখাৎ তাহা বলাইতেছেন না। বরং যদি মুসাবিদা সত্য হয়—তিনি ঐ স্থানটাকে 'ইয়্যাহোউই ইয়্‌রি' বলিতে উন্মুখ করিতেছেন।"

বিখ্যাত খ্রীষ্টান লেখক ওয়েলহাসেন (Wellhausen) স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, ইহা বাইবেল-সম্পাদকের ইচ্ছাকৃত জাল মাত্র। তিনি হিব্রু [illegible] কে [illegible] বর্ণে পরিণত করিয়া

---

* আদি পুস্তক ২২, ১—৬ পদ।

** Ency. Biblica. Art Moriah. ৩য় খণ্ড, ৩২০০ পৃষ্ঠা।

[illegible] কে [illegible] তে পরিবর্তিত করিয়াছেন, এবং এইরূপে the Homorites হইতে the Moriah নাম গড়িয়া লওয়া হইয়াছে; অন্যান্য লেখকগণ অন্য কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই নামটি যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, অধিকন্তু যেরুশেলমের মহত্ত্ব প্রতিপাদিত করার জন্য ইচ্ছা করিয়াই যে এক শব্দের স্থানে অন্য শব্দ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, মোটের উপর এ বিষয়ে সকলে এক মত। বিস্তৃত আলোচনার জন্য Ency Biblica "মোরিয়াহ্" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হযরত এব্রাহিম পুত্রকে কোরবানী করার মানসে, 'বীরশেবা' হইতে যাত্রা করিয়াছেন, এবং তৃতীয় দিবসে দূর হইতে 'কোরবানী-স্থল দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমাদের প্রতিপক্ষ বলিতেছেন—যেরুশেলমই কোরবানী স্থল। কিন্তু তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত যে একেবারেই অসমীচীন, মানচিত্র দেখিলে তাহা সহজেই জানা যাইবে। পক্ষান্তরে বাইবেলের সামরতীয় অনুলিপিতে "মোরিয়া"র স্থলে 'মোরা' লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে ঐ কোরবানী-স্থল যেরুশেলম হইতে ন্যূনাধিক আরও ত্রিশ মাইল উত্তরে শেচিম পর্যন্ত সরিয়া যায়। বাইবেল সাইক্লোপিডিয়ার লেখক বলিতেছেন—সামরতীয়গণ দাবী করে যে, তাহাদের দেশে শেচিমের নিকটবর্তী মোরাঃ পর্বতে হযরত এবরাহিমের এই বলি-যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহাদের বাইবেলে Moriah স্থলে Moreh লিখিত আছে। তবে সাধারণ বিশ্বাস এই যে, যেরুশেলমের যে পর্বতে এখন ওমারের মছজিদ নির্মিত হইয়াছে, সেই পর্বতই মোরিয়া ও কোরবানী-স্থল। ইহা লিখিয়াই লেখক বলিতেছেন : "This supposition is attended with some difficulties" অর্থাৎ—"এই অনুমান সম্বন্ধে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হয়, তাহার সমাধান করিতে কতকটা বেগ পাইতে হয়।" কিন্তু সামরতীয়দিগের বাইবেল ও তাহাদের দাবী সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন :

"This....supposition is entitled to some consideration....The distance from Beersheba is rather in favour of Samaritan version, it being a good three days journey between that place and Moreh, while the distance between Beersheba and Jerusalem is too short, unless some delaying circumstance occurred on the road." অর্থাৎ— "এই অনুমান কতকটা বিবেচনার যোগ্য বটে। বীরশেবা ও মোরার মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা সামরতীয় অনুলিপিরই অনুকূলে যাইতেছে। কারণ ঐ দুই স্থানের মধ্যে তিন দিনের পথ। কিন্তু বীরশেবা ও যেরুশেলমের মধ্যে খুব কমই ব্যবধান। যদি পথে বিলম্ব করার কোন কারণ না ঘটিয়া থাকে, তবে ঐটুকু পথ যাইতে তিন দিন লাগিতেই পারে না। (বাইবেলে বিলম্বের কোন কারণই বর্ণিত হয় নাই)।"*

প্রথমোক্ত এনসাইক্লোপিডিয়ার লেখক স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, মোরিয়া শব্দটা is certainly the corruption of a Proper name—যে কোন স্থান বিশেষের নামের পরিবর্তিত আকার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।**

ফলতঃ হযরত এব্রাহিম যে কোথায় নিজ পুত্রকে কোরবানী করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টানেরা তাহা বলিতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে বাইবেলে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, "আবরাহাম সেই স্থানের নাম 'যিহোবা-যিরি' (সদাপ্রভু যোগাইবেন) রাখিলেন।"*** কিন্তু যাত্রা পুস্তকে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩য় পদে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, যিহোবা নাম আবরাহাম, ইছহাক ও যাকোবের নিকট অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং সে

* Bible Cyclopaedia. ২য় খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা।
** Moreh শীর্ষক প্রবন্ধ।
*** আদি ২২—১৪।

বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত এবরাহিম মোরিয়া পর্বতে পুত্র কোরবানী করিতে সঙ্কল্প করেন, অবশেষে মেষ বলি দিয়া 'যিহোবা-যিরি' বলিয়া সে স্থানের নাম রাখেন, সেই বিবরণটা বাইবেল অনুসারেই মিথ্যা ও কল্পিত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ইউরোপের বহু খ্রীষ্টান লেখক নানাবিধ সূক্ষ্ম-সমালোচনা ও বিভিন্ন প্রকারের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, যেরুশেলমের মন্দিরের গৌরব বর্ধনের জন্য, এবরাহিমের পুত্র-বলিদানের ইতিবৃত্তকে যেরুশেলমের নামের সহিত সংসৃষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য পাঠকগণ Ency. Biblica গ্রন্থের উল্লিখিত সন্দর্ভগুলি, ও Isaac শীর্ষক প্রবন্ধের (২য় খণ্ড, ২১৭৪-৭৯ পৃষ্ঠা) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি পাঠ করিবেন আমরা নিম্নে তাহা হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

"The most remarkable of the editorial changes concerns the locality of the sacrifice. It is obvious that such a sentence as 'Go into the land of Moriah..., on one of the mountains which I will tell thee of,' is no longer in its original form, and most critics have thought that 'the Moriah' was inserted (together with the divine name Yahwe- in vv 11-14 ) by the Editor of J. E. This writer was probably a Judahite, and it is supposed that he wished to do honour to the temple of Jerusalem by localising on the hill where it was built one of the greatest events in the life of Abraham." অর্থাৎ—"সম্পাদকগণ কর্তৃক বাইবেলে যে সকল রদ-বদল করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বলিদানের স্থান নির্ণয় সংক্রান্ত পরিবর্তনটি এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে আলোচ্য। ইহা সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, "মোরিয়া দেশে যাও এবং তথাকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব"—এতাদৃশ শব্দ এখন আর পূর্বের আকারে নাই। এবং প্রায় সকল সমালোচকই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্তমান বাইবেলের (জে-ই অনুলিপির) সম্পাদকই মোরিয়া শব্দ (এবং সঙ্গে সঙ্গে ১১-১৪ পদের যিহোভা-শব্দ) যোগ করিয়া দিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই লেখক ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং ইহা মনে করা হইয়াছে যে, যেরুশেলমের মন্দিরটি যে পর্বতের উপর নির্মিত হইয়াছিল, আবরাহামের জীবনের এই মহত্তম ঘটনাকে তাহার সহিত সংসৃষ্ট করিয়া, তিনি ঐ মন্দিরের সম্মান বর্ধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

## জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার

বাইবেল পাঠে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, কোরবানী ও নজর ইত্যাদি প্রথমজাত পুরুষ সন্তানের দ্বারা সমাধা হওয়াই তখনকার কঠোর নিয়ম ছিল। উত্তরাধিকারে ও সামাজিক সম্মানে জ্যেষ্ঠ পুত্রের যে কিরূপ দাবী, তাহা বাইবেলের বিভিন্ন স্থান পাঠ করিলে জানা যায়। এমন কি, অপ্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র যে প্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া নিজের পুত্রত্বের এক অংশ ও জ্যেষ্ঠাধিকারজনিত এক অংশ, একুনে পিতার যথাসর্বস্বের দুই অংশ, এবং কনিষ্ঠ মাত্র একাংশ প্রাপ্ত হইবে, বাইবেল লেখক ইহারও স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থা দিয়াছেন।*

'গণনা পুস্তকে'র ৮ম অধ্যায়ের ১৭শ পদে এই ঐশিক আদেশ স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে ঃ "কেন না মনুষ্য হউক কিংবা পশু হউক, ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাত আমার।" অতএব, আমরা দেখিতেছি যে, খোদাপ্রভুর নামে উৎসর্গ করার জন্য,

* ২য় বিবরণ, ২১ অঃ ১৫—১৭।

এব্‌রাহিমের পুত্রগণের মধ্যে যিনি প্রথমজাত, তিনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও নির্বাচিত করা যাইতে পারে না,--ইহাই শাস্ত্রের কঠোর ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, হযরত এব্‌রাহিম নিজের যে 'অদ্বিতীয় পুত্র'কে ভালবাসিতেন, তাঁহাকেই কোরবানী করার আদেশ হইয়াছিল।*

হযরত এছমাইল, হযরত এব্‌রাহিমের সন্তানগণের মধ্যে প্রথমজাত পুত্র। "আব্রাহামের ছিয়াশি বৎসর বয়সে হাগার আব্রাহামের নিমিত্তে ইছমাইলকে প্রসব করিল।" (আদি ১৫ অঃ ১৬ পদ)। এবং "আব্রাহামের এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র এছহাকের জন্ম হয়।" (ঐ ২১, ৬ পদ)। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, হযরত এছমাইল হযরত এছহাকের ১৪ বৎসরের বড় ছিলেন। অতএব এছমাইলই প্রথমজাত পুত্র, এবং আচার, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ও ঐশিক আদেশ মতে একমাত্র প্রথমজাত পুত্রই—সুতরাং এছমাইলই—কোরবানীর যোগ্যপাত্র ছিলেন।

এছহাকের কোরবানী করার আদেশ হইলে, "অদ্বিতীয় পুত্র" এই বিশেষণের প্রয়োগ একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। কারণ জ্যেষ্ঠ হযরত এছমাইল তখন জীবিত ছিলেন। অতএব এ হিসাবেও আমরা দেখিতেছি যে, হযরত এছহাককে কোন মতেই কোরবানীর আদেশের লক্ষীভূত বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। পুরাতন নিয়মের লেখক ও সম্পাদকগণ এবং স্বার্থপর যাজক ও 'রব্বি'বর্গ যেরূপ সর্ববাদিসম্মতরূপে বাইবেলের আরও শত সহস্র স্থানে জাল করিয়া নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন—এ-ক্ষেত্রেও সেই প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া এছহাক ও তাঁহার বংশধরদিগকে বাড়াইবার ও যেরুশেলেমকে কোরবানী-স্থল বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য, তাঁহারা এখানেও এছহাকের নাম জাল করিয়াছেন। জাল করিতে করিতে তাঁহাদের এমনই দশা হইয়াছে যে, আজ কোরবানী-স্থলের প্রকৃত নাম বাইবেল হইতে উদ্ধার করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হযরত এছহাকের কোরবানী সম্বন্ধে খৃষ্টানদিগের সিদ্ধান্ত যে কতদূর অপ্রামাণিক, অসমীচীন এবং স্বয়ং বাইবেলের স্পষ্ট শিক্ষার বিপরীত, উপরে সংক্ষেপে তাহার যতটুকু আলোচনা করা হইল, আশা করি, এই পুস্তকের জন্য তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।

স্যার উইলিয়াম মুইর ও পাদরী জে. ডি. বেট প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণ এই প্রসঙ্গে কোরআন ও হাদীছের নাম করিয়া নিজেদের যে অসাধারণ অজ্ঞতা, গোঁড়ামি ও বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন, এই পুস্তকে তাহার বিস্তারিত আলোচনা হওয়া অসম্ভব। তবে মুইর সাহেবের বাজে কথা ও আদর্শ পাদরী বেট সাহেবের বর্বরোচিত** গালাগালিগুলি বাদ দিয়া, তাঁহাদের আসল যুক্তিতর্কগুলি সম্বন্ধে আগামী পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে দুই-একটা কথা বলিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

---

* আদি পুস্তক ২২ অঃ ২ ও ১২।

** আমাদের কোন কোন পাঠক বোধ হয় এই বিশেষণটি পাঠ করিয়া দুঃখিত হইবেন। কিন্তু বস্তুতঃ ক্রোধের বশবর্তী হইয়া নহে, বরং প্রকৃত অবস্থার অভিব্যক্তি করার জন্য আমরা সাধ্যপক্ষে সর্বাপেক্ষা মোলায়েম বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছি। পাদরী বেট সাহেবের ভূমিকার প্রথম ছত্র হইতেছে : "The reason for writing this book needs to be stated.—It might well be asked in reference to it—What is the use of crushing dead flies ?" প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এইরূপ দুর্বৃত্তভাবে তিনি আপন খৃষ্টান-জীবনের প্রকৃত আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তক উন্মোচন করিতেই (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) যে স্থানটি বাহির হইল, নমুনা স্বরূপ তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি : "When the Koran and Mecca shall have disappeared from Arabia, then, and then only, can we expect to see the Arab—." The Claims of Ishmael, ২৪১ পৃষ্ঠা। C/o The Reproach of Islam—By T. Gardiner.

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## এছমাইলের কোরবানী সম্বন্ধে কোর্‌আনের উক্তি

খৃষ্টান লেখকগণের প্রথম দাবী এই যে, হযরত এছমাইলকে যে কোরবানী করার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, কোর্‌আনে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার উত্তরে অধিক সময় নষ্ট না করিয়া আমরা নিম্নে কোর্‌আনের কয়েকটি আয়ৎ উদ্ধৃত ও অনূদিত করিয়া দিতেছি ঃ

قال رب هب لی من الصالحین. فبشرناه بغلام حلیم ۞
فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک
فانظر ماذا تری ط قال یا ابت افعل ما تومر ط ستجدنی ان
شاء الله من الصبرین ۞ فلما اسلما وتله للجبین ۞ و
نادینه ان یا ابراهیم - قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی
المحسنین ۞ ان هذا لهو البلاء المبین ۞ وفدینه بذبح
عظیم ۞ وترکنا علیه فی الاخرین ۞ سلم علی ابراهیم ۞ کذلک
نجزی المحسنین ۞ انه من عبادنا المؤمنین ۞ وبشرناه باسحق
نبیا من الصلحین ۞ وبرکنا علیه وعلی اسحق ط ومن ذریتهما
محسن وظالم لنفسه مبین ۞ ( والصفت - ۳ رکوع )

অনুবাদ ঃ "এবরাহিম (প্রার্থনা করিয়া) কহিল,—'হে আমার প্রভু ! আমাকে একটি সৎ (সন্তান) দান কর !' ইহাতে আমরা তাহাকে এক ধৈর্যশালী বালকের সুসংবাদ দান করিলাম। অতঃপর সেই বালকটি যখন এবরাহিমের সহিত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল (অর্থাৎ যুবা বয়সে পদার্পণ করিল), তখন এবরাহিম তাহাকে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র ! আমি স্বপ্নে দেখিতেছি যে (যেন) আমি তোমাকে 'জবহ্' করিতেছি ; অতএব তুমিও ভাবিয়া দেখ, এ সম্বন্ধে তোমার কি মত ?' সে কহিল, 'হে আমার পিতা ! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন (তাহা) করিয়া ফেলুন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইলে, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাইবেন।' অতঃপর যখন উভয় (পিতা-পুত্র) আত্মসমর্পণ করিল এবং পিতা পুত্রকে অধঃমুখে পাতিত করিল, তখন আমরা তাহাকে আহ্বান করিলাম,—'হে এবরাহিম ! তুমি স্বীয় স্বপ্নকে সত্য করিয়া দেখাইলে, এইরূপেই আমরা সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।' আর আমরা এক মহান্ কোরবানীকে তাহার (ঐ পুত্রের) স্থলাভিষিক্ত করিলাম, এবং সেই (মহান কোরবানীতে) পরবর্তী লোকদিগের মধ্যে তাহার (স্মৃতি চির-জাগরূক করিয়া) ছাড়িলাম। এবরাহিমের প্রতি ছালাম—এইরূপেই আমরা সৎকর্মশীল লোকদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি। এবং আমরা তাহাকে এছহাকের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম, যে নবী হইবে সৎলোকদিগের মধ্য হইতে। এবং আমরা তাহাকে (কোরবানীর জন্য উপস্থাপিত প্রথম পুত্রকে) ও এছহাককে বরকৎ (আশীষ) দান করিলাম ;—কিন্তু তাহাদের উভয়ের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ সৎকর্মশীল, আবার কেহ কেহ নিজের আত্মার প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারপরায়ন।" (ছাফফাৎ—৩য়, রুকূ)

এই আয়তে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, হযরত এবরাহিমের এই পরীক্ষার পর তাহার পুরস্কার স্বরূপে ২য় পুত্র এছহাকের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং কোরবানীর সময় যে হযরত এছহাকের জন্ম হয় নাই, তাহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

হযরত এবরাহিম স্বজনগণ কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পর, পুত্র লাভের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং সেই প্রার্থনা মতেই যে-সন্তান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই বলি দিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, প্রার্থনার সময় তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। হযরত এছমাইলই যে সেই প্রার্থনার ফলস্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন, তাহা তাঁহার নাম হইতেও জানা যাইতেছে। আরবীর ন্যায় হিব্রু ভাষাতেও سمع শব্দের অর্থ 'শুনিলেন', এবং ايل শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ এবরাহিমের প্রার্থনা শুনিলেন। আরবী তৌরাতে লিখিত আছে ঃ

وستلدين ابنا و تدعين اسمه اسماعيل لان الرب قد سمع تعبدك ○

অনুবাদ ঃ "তাহার নাম ইশ্মায়েল—ঈশ্বর শুনেন—রাখিবে।" (আদি পুস্তক ১৬—১১)

## একটা সাধারণ ভ্রম

কোরআনের একদল টীকাকার ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের পুস্তক-পুস্তিকা ও বাচনিক কিংবদন্তিগুলিকে কিরূপ নির্মমভাবে কোরআনের তফছীরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, উপক্রমণিকায় আমরা তাহার আভাস দিয়াছি। আলোচ্য প্রসঙ্গেও একদল লোক ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের অন্ধানুকরণের ফলে বলিয়াছেন যে, কোরবানীর জন্য হযরত এছমাইলকে নহে বরং হযরত এছহাককে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল।* তফছীরকারগণের এই শ্রেণীর কথার যে কোনই মূল্য নাই, তাহাও আমরা পূর্বে নিবেদন করিয়াছি।

উপরোক্ত আয়তে এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করার আছে। আয়তে বলা হইয়াছে যে, এক মহিমান্বিত কোরবানীকে, বলিদানার্থ-উৎসর্গিত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছিল। আমাদের তফছিরকারগণ সাধারণভাবে বলিয়া থাকেন যে, হযরত এবরাহিম চোখ খুলিয়া একটি মেষ বা ছাগ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে কোরবানী করিলেন। ইহাও ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। বাইবেলে লিখিত আছে ঃ "তখন আব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখ, তাঁহার পশ্চাদ্দিকে একটি মেষ, তাহার শৃঙ্গ ঝোপে বদ্ধ ; পরে আব্রাহাম গিয়া সেই মেষটিকে লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্তে হোমার্থ বলিদান করিলেন।"**

এই প্রসঙ্গে কাহারও অনুকরণ করার বা প্রকারান্তরে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'আজিম' শব্দ এখানে কোরবানীর বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার অনুবাদ 'মহিমা সম্পন্ন'। কোরআনে বহুস্থলে এই 'আজিম' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অত্যন্ত বৃহৎ, মহৎ, শ্রেষ্ঠ ও মহিমা সম্পন্ন—স্থান বিশেষে ইহার এতাদৃশ অর্থই করা হইয়া থাকে। 'মহিমময়' এই জন্য আল্লাহ্‌র এক নাম 'আজিম'। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, বাইবেলের বা আমাদের কতিপয় তফছিরকারের বর্ণিত ঐ মেষ বা ছাগ, এই 'আজিম' শব্দের বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে কি-না ? পরবর্তী যুগে হযরত এবরাহিমের এই মহাকীর্তির স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে কোরআনে যে ওয়াদার উল্লেখ হইয়াছে, তাহাও যুগপৎ ভাবে এই সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

---

* দেখ—'জাদুল-মাআদ', ১ম খণ্ড, ১৪—১৭ পৃষ্ঠা।

** আদি, ২২, ১৩ পদ।

হযরত এবরাহিমের পবিত্র স্মৃতি, তাঁহার সেই মহাপরীক্ষার প্রথম দিবস হইতে আজ পর্যন্ত মুছলমানগণ কর্তৃক কি ভাবে রক্ষা হইয়া আসিতেছে, বোধ হয় তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই। মুছলমানের হজ-ব্রত হযরত এবরাহিমের অনুষ্ঠান, তাহার প্রত্যেক স্তরে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া আছে।* হযরত এবরাহিমের পুত্র-বলিদানের পরিবর্তে যে মহান কোরবানীকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করার কথা কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা 'ঈদুল আজহা' বা বকর-ঈদের কোরবানী ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জন্যই ত হযরত ঈদুল-আজহার কোরবানী করার সময়, على ملة ابراهيم (এবরাহিমের পদ্ধতি মতে) এই অংশটুকুও দোওয়ার সহিত শামিল করিয়া দিতেন।** হযরত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, এই কোরবানী سنة ابيكم ابراهيم—তোমাদের পিতা এবরাহিমের প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান।***

## দ্বিতীয় সংশয়

খৃষ্টান লেখকগণের দ্বিতীয় দাবী এই যে, হযরত মোহাম্মদ কখনই নিজেকে এছমাইল বংশের বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। انا ابن الذبيحين—'আমি দুইজন বলিরূপে উৎসর্গিত ব্যক্তির পুত্র'**** এই হাদীছের সন্ধান পাইয়া পাদরী বেট আমতা আমতা করিয়া বলিতেছেন, নরবলির প্রথা আরবে প্রচলিত ছিল না, থাকিলেও কচিৎ কেহ তাহার আয়োজন করিয়াছে। অর্থাৎ, একই নিশ্বাসে তিনি উহা স্বীকার ও অস্বীকার করিয়াছেন। নরবলি দানের প্রথা যে আরবে প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরতের পিতামহ তাঁহার পুত্র বা হযরতের পিতা আবদুল্লাহকে বলি দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গেই হযরত বলেন যে, আমি বলিরূপে উৎসর্গিত দুই ব্যক্তির সন্তান। এখানে দুই ব্যক্তির অর্থে, হযরত এছমাইল ও আবদুল্লাহকে বুঝাইতেছে। মাআবিয়া বলিতেছেন—আমরা হযরতের নিকট বসিয়া ছিলাম, এমন সময় একজন দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট বিদেশী আরব আসিয়া হযরতকে يا ابن الذبيحين—"হে যুগল কোরবানের পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিল। হাকেম তাঁহার 'মোস্তাদরাক' গ্রন্থে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত এবরাহিম, পুত্র এছমাইলের পরিবর্তে যে মেষ বলিদান করিয়াছিলেন, তাহার শিং হযরতের সময় পর্যন্ত ঐ ঘটনার পুণ্য স্মৃতি স্বরূপ কা'বায় সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল।$ এছলাম এই নরবলির প্রথা রহিত করার চেষ্টা করিয়াছিল ও তাহাতে অসাধারণ সফলতাও অর্জন করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু হযরতের পরবর্তী যুগেও যে মধ্যে মধ্যে নরবলি দানের সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, হাদীছ গ্রন্থেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে।$$ অভিজ্ঞ পাশ্চাত্য লেখকগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, "The Arabs.........look by preference a human victim" অর্থাৎ আরবগণ নরবলি-দানকে প্রকৃষ্টতর বলিয়া মনে করিত।$$$

অতএব আমরা দেখিলাম যে, হযরত এছমাইলই যে কোরবানীর জন্য উপস্থাপিত হইয়াছিলেন, হযরত মোহাম্মদ তাহা প্রকাশ ও স্বীকার করিয়াছেন।

---

* কোরআন, ছুরা হজ, ৫ম রুকু দেখুন।

** আহমদ এবনে-মাজাহ, দারমী, আবু দাউদ, জাবের হইতে ; 'মেশকাত', বাবুল-উজহিয়া।

*** আহমদ, এবনে-মাজাহ—ঐ।

**** এবনে-জওজীর ন্যায় কঠোর সমালোচকও এই হাদীছকে ছহী বলিয়াছেন।

$ 'মোস্তাদরাক', ২—৫৫৪ পৃষ্ঠা। ছয়ুতী কৃত 'খাছায়েছ' ১—৪৫ ; 'তফছির কবির ও এবনে জরির—ছাফফাত, ৩য় রুকু দেখুন।

$$ হাফেজ এবনে-আছির কৃত 'তাইছিরুল ওছুল'—নজর—২য় খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

$$$ **Ency, Biblica. Art, Sacrifice,** ৪র্থ খণ্ড, ৪১৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

আধুনিক খ্রীষ্টান লেখকগণের আর একটি দাবী এই যে, হযরত এবরাহিম বা এছমাইল আরব দেশে আগমন ও অবস্থান কিংবা কা'বা-গৃহের নির্মাণ করেন নাই। এ-সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়া থাকে। একদল খ্রীষ্টান লেখক বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিয়া মুছলমানদিগের এই সিদ্ধান্তের অসমীচীনতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। আর এক শ্রেণীর লেখক, ইতিহাস-দর্শনের নামে যুক্তি খাটাইয়া নিজেদের অভিমত সপ্রমাণ করার প্রয়াস পান। ইহার উত্তরে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই যে, যুক্তির ও ধর্মের হিসাবে, মুছলমানগণ বাইবেলকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অতএব তাহার প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করার পূর্বে, বাইবেলকে তাহাদের নিকট 'দলিল' রূপে উপস্থাপিত করা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, আরব দেশে আবহমানকাল যে সকল কিংবদন্তি, অনুষ্ঠান, প্রথা পদ্ধতি এবং সংস্কার ও ধর্ম বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে, পরিবর্তন বা প্রক্ষেপের কোন সুযোগ, আবশ্যকতা ও সম্ভবপরতা তাহাতে ঘটে নাই। অতএব লিখিত ইতিবৃত্ত অপেক্ষা তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। এ অবস্থায় বাইবেলের ন্যায় অপ্রামাণিক ও একতরফা পুস্তকের কথা, ঐ সকল আরবীয় কিংবদন্তির বিরুদ্ধে কখনই প্রমাণরূপে উপস্থাপিত হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে অন্য পক্ষ হইতে ভৌগোলিকভাবে যে সকল কূটতর্ক উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা যে অন্যায় যুক্তি বরং হঠোক্তি মাত্র, স্যার ছৈয়দ আহমদকৃত 'খোতবাতে আহমদিয়া' বা Essays on the life of Mohammad এবং Rev. C. Forster, B.D. কৃত Historical Geography of Arabia পুস্তকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই সকল কূটতর্ক পাঠকগণের পক্ষে বিরক্তিকর হইবে ভাবিয়া আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। তবে খ্রীষ্টান লেখকগণ ইতিহাস-দর্শনের নামে যে সব 'যুক্তি' প্রদর্শনপূর্বক আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না।

তাঁহারা বলিতেছেন ঃ

"There is no trace of anything Abrahamic in the essential elements of the superstition. To kiss the Black Stone, to make the circuit of the Kaaba and perform the other observances at Mecca, Arafat and the vale of Mina, to keep the sacred months and to hallow the sacred territory, have no conceivable connection with Abraham, or with the ideas and principles which his descendants would be likely to inherit from him."*

ইহার ভাবার্থ এই যে—"আরবদিগের মধ্যে এমন কোন সংস্কার প্রচলিত ছিল না, যাহার সূত্র-পরম্পরা এবরাহিম পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। কৃষ্ণ-প্রস্তর চুম্বন, কা'বা-গৃহের প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) এবং মক্কা, আরাফাত ও মিনার অন্যান্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রতিপালন করা হইত, এবরাহিমের সহিত সেগুলির কোন সম্বন্ধ নাই, এবং এবরাহিমের বংশধরগণের পক্ষে উত্তরাধিকারিত্বে যে সকল Idea ও Principles প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, তাহার সহিতও ঐগুলির কোনই সংস্রব নাই।"

এই দাবীটি অলীক, ভিত্তিহীন এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত হঠোক্তি মাত্র। প্রাক্-এছলামিক আরবদিগের প্রধান প্রধান সংস্কার ও অনুষ্ঠানগুলির সহিত প্রাচীন এছহাক

---

* মুর, উপক্রমণিকা ১২—১৪।

বংশীয়দিগের সংস্কার ও অনুষ্ঠানের যে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে, ইহুদী জাতির সংস্কার ও অনুষ্ঠানগুলির পুরাতন ইতিহাস এবং তাহাদিগের ব্যবস্থা-সংহিতা সমূহ পাঠ করিলে তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

## আরব ও এছরাইল বংশের সামঞ্জস্য

(১) আরবগণ আবহমানকাল তাহাদের প্রধান ধর্ম-মন্দির কা'বার চতুষ্পার্শ্বস্থ কতকটা স্থানকে 'হারাম' বা পবিত্র স্থান বলিয়া বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিয়া আসিতেছে। এছরাইল বংশীয়গণও ঠিক সেইরূপ তাহাদের প্রধান ধর্ম-মন্দির বায়তুল মোকাদ্দাছের চারিপার্শ্বস্থ কতকটা স্থানকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিত, এবং তাহারাও ঐ নির্দিষ্ট স্থানকে Haram হারাম বলিয়াই আখ্যাত করিত। (Ency. Biblica Art. Jerusalem, ৮ম প্যারা, ২য় খণ্ড, ২৪১২ পৃষ্ঠা)।

(২) আবহমানকাল আরবেরা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে যে, মক্কায় হজ্-ব্রতের প্রচলন হযরত এবরাহিম কর্তৃক আরব্ধ হইয়াছিল। (কোরআন, ছুরা হজ্, ৪র্থ রুকু)। এছরাইল বংশীয়দিগের মধ্যেও এইরূপ বহুজন-সম্মেলন জনক 'হজ্জ'-ব্রতের প্রচলন ছিল। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাহারাও এই ব্রতকে ঠিক এই 'হজ্' নামেই আখ্যাত করিত। আরবগণ যেমন হজে পশু কোরবানী করিত, ইহুদিগণও ঠিক সেইভাবে পশু কোরবানী করিত। (ঐ, Art, Sacrifice, ৪র্থ প্যারা ; ৪—৪১৮৬)।

(৩) এছলামের পূর্বকাল পর্যন্ত, আরবদেশে 'আতীরা ও ফারা' নামক দুই শ্রেণীর বলি-উৎসর্গ বা বিশেষ প্রকারের কোরবানী-প্রথা প্রচলিত ছিল। রজব মাসে বিশেষ করিয়া যে কোরবানী করা হইত, তাহাকে 'আতীরা' বলা হইত। গৃহপালিত পশুর প্রথমজাত শাবককে তাহারা ঠাকুর-দেবতার জন্য বলিদান করিত, ইহাকে 'ফারা' বলা হইত। (বোখারী-মোছলেম-আবু হোরায়রা হইতে)। রজব মাসে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া আতীরাকে 'রাজাবিয়া'ও বলা হইত। (তিরমিজি, আবু-দাউদ, নাছাই, এবনে-মাজা)। রজব মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে ইহা অনুষ্ঠিত হইত। যে ঠাকুরের (অর্থাৎ প্রস্তর বা প্রস্তর নির্মিত মূর্তির) নামে ঐ বলি উৎসর্গীত হইত, বলিদানের পর নিহত পশুর রক্ত লইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ বা লেপন করা হইত। ('মাজমাউল-বেহার,' ২য় খণ্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)। ঠিক আরবদিগেরই ন্যায়, প্রথমজাত শাবক বলিদান করার প্রথা এছরাইল বংশীয়দিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। Biblica বিশ্বকোষের লেখক প্রাচীন ইহুদীদিগের ঐ প্রথার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

"A similar custom existed among the heathen Arabs ; the first birth ( called Fara )..........was sacrificed frequently"—অর্থাৎ, 'পৌত্তলিক আরবদিগের মধ্যে ঠিক ইহার সদৃশ প্রথা প্রচলিত ছিল, পশুর প্রথম বৎস (ইহাকে 'ফারা' বলা হইত) এই উপলক্ষে সচরাচরই বলিদান করা হইত।' নির্দিষ্ট করিয়া রজব মাসে যে-কোরবানী করার প্রথা পৌত্তলিক আরবদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বনি-এছরাইলদিগের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ বলিদানেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। আধুনিক পরিভাষায় উহাকে Spring Sacrifice বলা হয়। ঐ গ্রন্থে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, "The first eight days of the month Rajab....in the old calendar fell in the spring".—অর্থাৎ পুরাতন পঞ্জিকা অনুসারে রজব মাসের প্রথম অষ্টাহ বসন্তকালে পড়িত। (৩য় ও ৪র্থ প্যারা)। ইহুদীরাও আরবদিগের ন্যায় বলিপ্রদত্ত শোণিত লইয়া তাহাদের বেদীর* উপর নিক্ষেপ করিত। (৪৩ প্যারা)।

---

* মূল হিব্রুতে מִזְבֵּחַ শব্দের অর্থ বলির স্থান।

(৪) ঐ পুস্তকের Sacrifice শীর্ষক প্রবন্ধটির সহিত হাদীছ গ্রন্থের 'কেতাবুল-মানাছেক্'-এর হাদীছগুলিকে ও পৌত্তলিক আরবদিগের বলিদান সংক্রান্ত বিবরণগুলিকে এক সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে, উভয়ের মধ্যে এইরূপ আরও বহু সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হইবে। আরবের هدى আর ইহুদীর منحة একই।* অনেকে হয় ত শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, ذبح জবেহ্, قربان কোরবান نذر নজর প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের নির্দিষ্ট পারিভাষিক শব্দগুলিও উভয় জাতির মধ্যে আবহমানকাল অভিন্ন আকারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সে সময় বলিদানই প্রধান ধর্ম কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত, বিভিন্ন বলিদানের উদ্দেশ্য ও তৎসংক্রান্ত সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও প্রাচীন আরব ও ইহুদীদিগের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইবে।

(৫) ক্ষেত্রজাত শস্যের দশমাংশ ধর্মার্থে দান করার প্রথা, আরবদিগের ন্যায় বনি-এছরাইলের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। তাহারাও ইহাকে আরবদিগের ন্যায় ঠিক 'ওশর' নামেই অভিহিত করিত। (ঐ, ঐ, ১৪ প্যারা এবং Taxation ও Tithe দ্রষ্টব্য)

(৬) শাসন ও বিচার পদ্ধতিতেও উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রাচীন আরবের ন্যায় প্রাচীন ইহুদীর মধ্যেও 'চোখের পরিবর্তে চোখ ও দাঁতের পরিবর্তে দাঁত' নীতির প্রচলন ছিল। 'রক্তের পরিশোধ' রক্ত ব্যতীত আর কিছু দ্বারা গৃহীত হইতে পারিত না। কিন্তু বিচার মীমাংসার ফলে আত্মীয়বর্গকে অর্থ দিয়া নিরস্ত করাও হইত। সাধারণতঃ গোত্রপতিরাই স্বগোত্রস্থ ব্যক্তির অপরাধের বিচার করিতেন। উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও উভয় জাতির প্রথার সামঞ্জস্য দর্শনে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। স্ত্রী ও কন্যাদিগকে পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা, এমন কি পিতার বিবাহিত স্ত্রীদিগকে উষ্ট্র-মেষাদি অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে 'ভোগ দখল' করার কুৎসিত প্রথাও, এই দুই জাতির মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। (Ency. Biblica, Law & Justice প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

(৭) আরবদিগের মধ্যে খৎনা করার সাধারণ ভাষায় মুছলমানী দেওয়ার) প্রথা আবহমানকাল হইতে প্রচলিত ছিল। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, কা'বার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হযরত এবরাহিমের সময় হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বাইবেলও বলিতেছে যে, সদাপ্রভু আবরাহামের উপর আদেশ করিয়াছিলেন—"তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বকচ্ছেদ হইবে।........পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানের আট দিন বয়সে ত্বকচ্ছেদ হইবে।"** "আদি পিতা এবরাহিমের 'ছুন্নৎ'" মনে করিয়া আরবগণও, ঠিক এছরাইল বংশীয়দিগের ন্যায়, সপ্তম দিনে সন্তানের মস্তক মুণ্ডন, নামকরণ ও আকীকা ইত্যাদি করিত।*** সাধারণতঃ সপ্তম দিবসে ত্বকচ্ছেদ করাই তাহারা প্রকৃষ্টতর বলিয়া মনে করিত। এছলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও, সপ্তম দিবসে আকীকা করাকে অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করা হইত।****

(৮) হযরত এবরাহিমের নিয়ম ছিল,—তিনি যেখানে ধর্মসংক্রান্ত কোন অনুষ্ঠান বা কোরবানী করিতেন, সেখানে স্মৃতিফলক স্বরূপ একখণ্ড প্রস্তর স্থাপন বা ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই সকল ধর্ম-মন্দিরকে بيت ايل 'বয়ত-ইল' বলা হইত।$ বয়ত অর্থে গৃহ এবং ইল অর্থে আল্লাহ্, অর্থাৎ আল্লাহর ঘর। ফলতঃ এবরানী বয়তিল এবং আরবী বায়তুল্লাহ্, একই শব্দ। পূর্বকার কোন কোন বাইবেলে, বয়তিল শব্দের পরিবর্তে Makkidah 'মাক্কিদাহ্' শব্দের

---

* হিউজেস **Sacrifice**, ৫৫১ পৃষ্ঠা।

** আদি পুস্তক, ১৭ অঃ, ৯—১৪ পদ।

*** আবু দাউদ, রজিন—'মেশকাত'—আকীকা।

**** 'মাজমাউল-বেহার', ১—৩৬০

$ আদি পুস্তক, ১২-৮ প্রভৃতি।

প্রয়োগও দেখা যায়।* বিজ্ঞতম খ্রীষ্টান লেখকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মক্কা শব্দ মূলে আবিসিনীয় (হাবশী) ভাষা হইতে সমুদ্ভূত, উহার অর্থ আল্লাহ্‌র ঘর বা বায়তুল্লাহ্।** এখানে পাঠকগণ হযরত এবরাহিমের স্মৃতিফলক স্বরূপ প্রস্তরখণ্ড প্রতিষ্ঠার সহিত কা'বার (হাজ্‌রে আছওয়াদ) কৃষ্ণ প্রস্তর স্থাপন এবং বায়তিল ও বায়তুল্লার সামঞ্জস্য ইত্যাদি বিষয় এক সঙ্গে আলোচনা করিয়া বলুন যে, মক্কা ও মাক্কিলার এই যে আশ্চর্য মিল, এছরাইলীয় ও আরবীয় জাতিদিগের সমবংশোদ্ভব হইবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে ?

(৯) প্রাচীন এছরাইলীয়দিগের মধ্যে এই প্রথা বিদ্যমান ছিল যে, তাহারা কাহারও নাম বলিবার বা লিখিবার সময়, তাহার পিতার নামও এক সঙ্গে উল্লেখ করিত। যেমন, এলিজা-বেন-এরাকুব, ইহুদা-বেন-তাবী প্রভৃতি।*** আরবদিগের মধ্যেও এই প্রথা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল ; সমস্ত আরবী সাহিত্য এক বাক্যে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই জাতীয় বিশেষত্বেও আরব ও প্রাচীন এছরাইলীয়গণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে।

এছহাক ও এছমাইল বংশের আচার-ব্যবহার, ধর্মানুষ্ঠান এবং বিশ্বাস ও সংস্কারাদিতে যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে, উপরে নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত নয়টি প্রমাণের দ্বারা তাহা সন্তোষজনকরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব স্যার উইলিয়ম মূর প্রমুখ খ্রীষ্টান লেখকগণের সংশয়টি যে একেবারে ভিত্তিশূন্য কল্পনা মাত্র, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এখানে পাঠকগণকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, কেবল ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে আমরা এই সকল তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নচেৎ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার মহিমা প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁহার কুলশীলের আলোচনা একেবারেই অনাবশ্যক। কুল মানুষকে বড় করিতে পারে না, মানুষ বড় হয় তাহার নিজের গুণে— ইহাই এছলামের শিক্ষা।

## মওলানা শিবলীর সিদ্ধান্ত

মওলানা শিবলী মরহুম এই প্রসঙ্গে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তাহার অধিকাংশকেই আমরা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। তাঁহার মতে, হযরত এবরাহিমের প্রতি প্রকৃতপক্ষে পুত্র বলিদানের আদেশ হয় নাই, বরং কা'বার খেদমতের জন্য পুত্রকে উৎসর্গ করিতে বলা হইয়াছিল মাত্র। হযরত এবরাহিম ক্রমক্রমে ইহার এই অর্থ বুঝিলেন যে, তাঁহাকে পুত্র বলি দিতে বলা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অসমসাহসিকতার সমর্থনের জন্য তিনি কোন প্রমাণ উপস্থিত করা আবশ্যক মনে করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে,—

قدیم زمانہ میں بت پرست قومیں اپنے معبودوں پر اپنی اولاد کو بھینٹ
چڑھا دیا کرتی تھیں ــ مخالفین اسلام کا خیال ہے کہ حضرت اسمعیل
کی قربانی بھی اسی قسم کا حکم تھا، لیکن یہ سخت غلطی ہے

অর্থাৎ—"ঠাকুর-দেবতার সন্তোষ সাধনের জন্য নিজ সন্তানদিগকে বলি দিবার প্রথা পৌত্তলিকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল......এছলামের বিপক্ষগণ মনে করেন যে, এছমাইলের কোরবানীও এই প্রকারের একটা আদেশ ছিল, কিন্তু ইহা মস্ত ভুল।"****

---

* **Biblica,** প্রথম খণ্ড, ৪৫২।

** জর্জি-জিদান, الحرب قبل الاسلام

*** **Rev. A. W. Streane, M. A.** কর্তৃক **Chagigah** প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

**** ছিরৎ ১—১০৬।

'ঠাকুর দেবতার সন্তোষ সাধনের জন্য' এবং 'পৌত্তলিকদিগের ন্যায় তাহাদের নামে' বলি দিবার জন্য হযরত এব্‌রাহিম আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এরূপ কথা আজ পর্যন্ত কোন মুছলমান বা অমুছলমান বলেন নাই, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে এ-সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু বলিয়াছেন, মুছলমান অমুছলমান নির্বিশেষে তাঁহাদের সকলের সমবেত অভিমত এই যে, পরীক্ষার জন্য এব্‌রাহিমকে পুত্র বলিদান করিতে বলা হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে বলিই উদ্দেশ্য ছিল না। ফলতঃ আমরা মওলানা মরহুমের এই সকল উক্তির কোন তাৎপর্য বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঐ পুস্তকে এই প্রসঙ্গে যে সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অসঙ্গত ও অসংলগ্ন। লেখক বলিতেছেন—বাইবেলে 'মোরা' নামক স্থানের উল্লেখ আছে,—এই 'মোরা'র আকার পরিবর্তিত হইয়া 'মোরি' হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু এই 'মোরা'ই আরবের মারওয়া পর্বত, ইহাই এব্‌রাহিমের কোরবানী-স্থল। কিন্তু মারওয়া যে হযরত এবরাহিমের কোরবানী-স্থল নহে, বহু ছহী হাদীছ হইতে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। নচেৎ হযরত এব্‌রাহিম পুত্রকে লইয়া তিন মাইল দূরে মেনায় গমন করিবেন কেন ? 'রাময়ুল-জেমার' বা কঙ্কর নিক্ষেপ করার প্রথার মূল কোথায়, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিবেচিত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে লেখক বাইবেলের উল্লিখিত যে 'মোরি' পর্বতের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, অন্যত্র ইহার অবস্থান স্থানের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আলোচ্য 'মোরি' পর্বত শিখিম নামক স্থানে অবস্থিত।* সুতরাং যে স্যার ষ্ট্যান্‌লীর প্রতিবাদার্থে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে, বাইবেলের এই নির্দেশ মতে, এতদ্দ্বারা তাহার সমর্থনই হইয়া যাইতেছে। তিনি গ্রিজিমের নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু গ্রিজিম ও শিখিম পরস্পর সংলগ্ন।

এছহাক বংশের আচার-ব্যবহার ও ধর্মানুষ্ঠানের সহিত আরবদিগের আচারাদির সামঞ্জস্য আছে, ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য লেখক যে তিনটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোনটিই সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলিতেছেন,—'লেবীয় ৮—২৫ পদের দ্বারা জানা যায় যে, হযরত এব্‌রাহিমের শরিয়তের ব্যবস্থানুসারে, যাহাকে বলি বা উৎসর্গের জন্য মনোনীত করা হইত, সে পুনঃ পুনঃ মন্দির বা কোরবানী-স্থল প্রদক্ষিণ করিত।' কিন্তু বাইবেলের ঐ পদে প্রদক্ষিণের নামগন্ধও নাই। নজর বা মানস পূর্ণ না করা পর্যন্ত ইহুদিগণ, মাথার চুল কাটিত না, এই দাবীরও কোনই প্রমাণ দেওয়া হয় নাই।

## ভৌগোলিক ভ্রম

সে যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই যে, বাইবেলের অন্যান্য বিবরণের ন্যায় তাহার ভৌগোলিক বৃত্তান্তগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তিও নানা প্রকার অনাচার, অত্যাচার এবং স্বেচ্ছা বা অজ্ঞতা প্রযুক্ত জালিয়াতের জন্য সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, এমন কি, অবোধগম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই আমরা দেখিতেছি, এই 'মোরিয়া' শব্দ লইয়া ইহুদী, সামরতীয় এবং খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেই এমন মতবিরোধ। ইউরোপের আধুনিক পণ্ডিতগণ, বহু অনুসন্ধান এবং নানাবিধ গবেষণার ফলে এই সকল অনাচারের অনেক সন্ধান বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, বাইবেলের ভৌগোলিক বিবরণগুলি নানাবিধ ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ। এই সকল অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, লেখক ও সম্পাদকগণের স্বার্থপরতা ও অসাধুতার ফলেই মূলের Musri শব্দ ক্রমে 'মোরিয়া'তে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, সিরিয়ার দক্ষিণ প্রদেশের Musri এবং আরব দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত Musri দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রদেশ। অর্থাৎ ঈজিপ্টের 'মুছরী' ও আরবের 'মুছরী' এই উভয় স্থানের নাম একরূপ হওয়ায়, বাইবেলের লেখক ও সম্পাদকগণ প্রাচীন আরবের 'মুছরী'কে ঈজিপ্টের 'মুছরী'র সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া নানা প্রকার গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। বহু স্থলে, হযরত এছমাইল বা তাঁহার মাতা বিবি হাজেরা সম্বন্ধে যে 'মুছরী' প্রদেশের উল্লেখ আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা আরবীয় 'মুছরী' প্রদেশের কথা। বাইবেলের

* বিচারকর্তৃগণ।

লেখকগণ, সম্ভবতঃ অজ্ঞতাবশতঃ, সেই সকল বিবরণকে টানিয়া-হেঁচড়াইয়া ঈজিপ্টের সহিত সমঞ্জস করার চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক খ্রীষ্টান লেখকগণ, এহেন বাইবেলের উপর নির্ভর করিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, মুছলমানদিগের দাবী অসংলগ্ন ও অসঙ্গত; কারণ তাহারা যে সকল স্থানের কথা বলে, তাহা ত ঈজিপ্ট বা মিশরে অবস্থিত।*

হিব্রু বা এবরানী ভাষায় ص ছাদ ও ض জাদ বর্ণের লিখন প্রণালীতে কোনই পার্থক্য নাই, 'মুছরী' ও 'মুজরী' উভয় শব্দ একই 'ছাদ' বর্ণ দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে। সুতরাং আলোচ্য শব্দটিকে আমরা 'মুছরী' বা 'মুজরী' উভয় প্রকারে পাঠ করিতে পারি। আরবের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, আদনানীয় আরবগণ, আরব দেশের চরম উত্তর সীমান্তেও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। আদনানীয় গোত্র সমূহের মধ্যে مضر মুজর অতি প্রাচীন, মুজরের পিতা নাজার نزار আদনানের পৌত্র। দক্ষিণ অঞ্চলের 'কাহতানী' আরবদিগের সহিত বাইবেল লেখকগণের কোন সম্বন্ধ ছিল না। উত্তর অঞ্চলের আদনানী ও এছমাইলী আরবদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে দুই-একটা কথা বলিতে হইয়াছে। আদনানী আরবদিগের মধ্যে মুজর বংশই প্রবল, জনবহুল ও নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া উত্তর আরবের অধিকাংশ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।** এই সব যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আমরা সহজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মুজর বংশীয়দিগের আবাসস্থল বলিয়া লেখকগণ তাহাকে 'মুজরী' নাম দিয়াছেন। যেহেতু 'মুজরী' ও 'মুছরী'র বর্ণমালা হিব্রু ভাষায় অভিন্ন, সুতরাং সহজেই তাহা 'মুছরী' উচ্চারিত হইয়া যায়। এবং অচিরাৎ (North Syrian Musri) উত্তর সিরিয়ার 'মুছরী' আর আরবের 'মুজরী' অভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বাইবেলের সমস্ত ভৌগোলিক ইতিবৃত্তকে নানা প্রকার ভ্রম-প্রমাদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।*** আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নানা প্রকার সূক্ষ্ম আলোচনা ও দার্শনিক গবেষণার ফলে, ক্রমে ক্রমে বাইবেলের ঐ ভ্রম-প্রমাদগুলির আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছেন।****

---

* **Ency. Biblica Ishmael; Mizraim, Moriah** প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

** العرب قبل الاسلام ১ম খণ্ড, ১৬৮—৮৩ পৃষ্ঠা।

*** **Ency Biblica. Mizraim, Moriah, Moreh, Ishmael** প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

**** পাঠকগণ, এছহাক বংশের স্থলে 'এছরাইলীয় বা এছরাইল-বংশীয়' এতাদৃশ পদ বহু স্থানে দেখিতে পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, উভয়ই এক বংশীয়। পূর্বে যে, মহিমান্বিত যাকোবের কথা বলিয়াছি, ইনিই শেষে এছরাইল নাম প্রাপ্ত হন। উহার অর্থ 'ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী'। সদাপ্রভু এক রাত্রিতে যাকোবকে একাকী পাইয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সদাপ্রভু তখন নরাকার ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যাকোবকে কোন মতেই আঁটিয়া উঠিতে না পারায়, তাহার শ্রোণীফলকে আঘাত করেন; কোমরের উরুর হাড় সরিয়া যায়। পরে সেই পুরুষরূপী সদাপ্রভু কহিলেন, 'আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল।' কিন্তু যাকোব নাছোড়বান্দা, তিনি দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন— 'আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না।' যাহা হউক, অবশেষে সদাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার এই যাকোব বা প্রতিপক্ষের নাম বদলাইয়া দিয়া বলিলেন, 'তুমি এখন হইতে এছরাইল নামে খ্যাত হইবে, কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ।' ইহার পর অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর সদাপ্রভু যাকোবের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আদি পুস্তকের ৩২ অঃ ২২—৩০ পদ। অতএব ইহাতে এছহাকের পুত্র যাকোবই এছরাইল।

এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, প্রতিজ্ঞা ও আশীর্বাদ লইয়া খ্রীষ্টানগণ এত বাহাদুরি করিয়া থাকেন, সদাপ্রভু হযরত এবরাহিমকে তাহার লক্ষণ ও শর্ত নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। আশীর্বাদ পাইবার লক্ষণ ও শর্ত এই যে, তাহারা ত্বকচ্ছেদ বা খৎনা করিলে, খৎনা না করিলে এই আশীর্বাদ পাইবে না। এবং এবরাহিমের বংশের মধ্যে যাহারা খৎনা করিবে, সদাপ্রভুর নিয়ম বা প্রতিজ্ঞা ও আশীর্বাদ তাহারাই প্রাপ্ত হইবে। (আদি পুস্তক ১৭ অধ্যায়)। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, যীশু ও খ্রীষ্টানগণ সদাপ্রভুর সেই আশীর্বাদ কোনমতেই পাইতে পারেন না। কারণ তাঁহারা ত্বকচ্ছেদ বা খৎনা না করিয়া এই আশীর্বাদ লাভের একমাত্র শর্তকে ভঙ্গ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হযরত এবরাহিমের পুত্র হযরত এছমাইলের বংশধরগণ অনাদিকাল এই 'নিয়ম' পালন করিয়া আসিতেছেন।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## আরবের ভৌগোলিক বিবরণ

"ধরিয়াছ বক্ষে ওগো ! কার পদ লেখা,
হে আরব ! মানবের আদি মাতৃ-ভূমি ?"

### আরবের ভৌগোলিক বর্ণনা

পাঠক ! একবার সাধারণ মানচিত্রের প্রথম পৃষ্ঠা উন্মোচন করুন। আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যস্থলে যে একটি ক্ষুদ্র দেশ, যেন কোন্ মহানের কোন্ মহামহিমের দক্ষিণপদ চিহ্নরূপে ঐ মহাদেশত্রয়কে জল ও স্থল পথে পরস্পর সংযোজিত করিয়া অবস্থান করিতেছে, উহার নাম আরব দেশ। সপ্ত-সাগর-চুম্বিত-চরণা হইলেও আরব ভূমিকে অনুর্বরা করিয়া রাখাই যেন বিধাতার ইচ্ছা। তাহার কোথায়ও বিশাল ঊষর মরু-প্রান্তর মহাকালের প্রথম প্রভাত হইতে প্রখর মার্তণ্ড কিরণে ঝলসিত হইয়া কেবলই অনল-নিশ্বাস নিক্ষেপ করিতেছে। আর কোথায়ও বা ক্ষুদ্র-বৃহৎ ধূসর পর্বত-পুঞ্জ কোন স্মরণাতীত যুগ হইতে নীরব-নিস্পন্দ যোগীর ন্যায় যেন কাহার ধ্যানে 'তহরিমা' বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আরব দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই জলহীন, তরুহীন মরু-প্রান্তর ও অনুর্বর পর্বতমালায় পরিপূর্ণ হইলেও, প্রকৃতি আবার—বোধ হয় নিজের অসাধ্য-সাধন-পটীয়সী মহীয়সী শক্তির একটু ইঙ্গিত দিবার জন্য—ঐ সকল মরু-প্রান্তরে মধ্যে মধ্যে দুই একটি ক্ষীণস্রোতঃ প্রবাহিনী ও স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণীরও সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। তাই মার্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ ও মরুর অনল নিশ্বাসকে উপেক্ষা করিয়া মধ্যে মধ্যে দ্রাক্ষা-দাড়িম্বাদি নানা শ্রেণীর সুমধুর মেওয়াজাত, সকল প্রকারের শাক-সব্জি ও উর্বর শস্যক্ষেত্ররাজি, সেই অসীম শক্তিময়ের অনন্ত মহিমার জয়-জয়কার করিতেছে।

### প্রাচীন আরব

আরব দেশের পূর্ব-উত্তর সীমায় দজলা বা টাইগ্রীস নদ, পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর, এবং তাহার পশ্চিমে লোহিত সাগর অবস্থিত। সিনাই মরুভূমি ইহার উত্তরে অবস্থান করিয়া আরব সিরিয়া (শাম) দেশকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই দিককার সীমা কখনই সূক্ষ্মভাবে নির্ধারিত হইতে পারে নাই। কাজেই ভৌগোলিকগণের পক্ষে সিরিয়া ও আরবের সীমান্ত রেখা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা কখনই সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। প্রকৃতির বিভিন্ন স্বরূপের বিকাশ ক্ষেত্র এই আরব ভূমিতে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানবের অধিবাস স্থাপিত হইয়াছে। আরবের প্রচলিত কিংবদন্তি ও কোরআনের বিবরণ দ্বারা জানিতে পারা যাইতেছে যে, বর্তমানের আদিম ও প্রবাসী আরবদিগের পূর্বে ঐ দেশে আদ, ছমুদ প্রভৃতি বহু প্রাচীন জাতির অভ্যুদয় ও পতন হইয়াছিল। নানা প্রকার পাপাচারের ফলে, সেই জাতিগুলির অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আরব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণ এই জাতিগুলিকে العرب البائدة 'বায়দা' নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। কোরআন শরীফে ইহাদিগের সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সংশয়বাদী পাশ্চাত্য লেখকগণ, বহু দিন পর্যন্ত তাহার সত্যতায় অনাস্থা প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, কোরআনের বর্ণিত অন্য বহু বিষয়ের সত্যতাও যেমন ক্রমশঃ অধিকতর দৃঢ় হইতেছে, সেইরূপ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্বান্বেষী কর্মীবর্গের অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে, বহু প্রাচীন

নগরের ধ্বংস-স্তূপ হইতে যে সকল প্রমাণ সঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে কোর্‌আনের ঐতিহাসিক বিবরণগুলির সত্যতাও অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম খ্রীষ্টান ঐতিহাসিক পণ্ডিত জর্জি জিদান এই প্রসঙ্গে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,

تؤيد الاكتشافات الحديثة - بل تجد ما ذكره القران صحيحا

অর্থাৎ—"কোর্‌আনের আদ, ছমুদ প্রভৃতি জাতির যে সকল বিবরণ বা এমনের রাজন্যবর্গের যে সকল ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অতিরঞ্জনের নাম-গন্ধ মাত্রও নাই ; বরং বর্তমান যুগের নূতন আবিষ্কারগুলির সহিত তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।"* বায়েদা বা ধ্বংসপ্রাপ্ত আরব জাতি সমূহের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত প্রদান এ-ক্ষেত্রে আবশ্যক নাই। তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানে তাহাদিগের পরিণতি সম্বন্ধে দুই-একটা কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না।

## জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ধারা

আমরা সাধারণতঃ এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকি যে, প্রত্যেক জাতির উত্থানের পর পতন এবং পতনের পর উত্থান—অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য, স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ হইয়া থাকে ও হইতে থাকিবে। বিলুপ্ত আরবীয় জাতি সমূহের 'এব্রৎ'-পূর্ণ বিবরণগুলি দ্বারা কোর্‌আন এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করিতেছে। জগতের ইতিহাসে, আদ ও ছমুদ প্রভৃতির ন্যায় এরূপ বহু জাতির নাম পাওয়া যায়—যাহাদের জাতীয় জীবনে ভাটার পর আর জোয়ার আসে নাই, পতনের পর যাহাদের আর উত্থান হয় নাই। বরং পতনের গতি স্বাভাবিকরূপে পর পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়—কিংবদন্তি ও ধ্বংসস্তূপের কতকগুলি নিদর্শন ব্যতীত—তাহারা এবং তাহাদের জাতীয় অস্তিত্বের যথা-সর্বস্ব চিরকালের জন্য লোপ পাইয়াছে। পতনের পর যদি তাহার যথাযথ কারণ নির্ণয় করা হয় এবং জাতীয় সমষ্টির অধিকাংশ ব্যষ্টির মধ্যে যদি তাহার তীব্র অনুভূতি এবং তজ্জনিত আত্মগ্লানির সৃষ্টি হইয়া যায়, তাহা হইলে জাতির স্তরে স্তরে আত্মকৃতের জন্য প্রায়শ্চিত্তের একটা স্বর্গীয় ভাব আপনা আপনিই জাগিয়া উঠে এবং এইরূপে পতনের পর জাতির উত্থান সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে পতনের অনুভূতি নাই, যেখানে জাতির আপাদমস্তকের প্রত্যেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতকেই বিশ্রামের আরামদায়ক অবকাশ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছে, যেখানে আত্মগ্লানির পরিবর্তে আত্ম-বিস্মৃতির প্রাদুর্ভাব, যেখানে ব্যক্তিগণ নিজেদের বর্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত—সেখানে কেবলই পতন,—সে পতনের আর উত্থান নাই। সহৃদয় মুছলমান পাঠকগণ এখানে স্বজাতির বর্তমান অবস্থাটা এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করিয়া দেখুন !

## আরব আরেবা

বায়েদা আরবগণের সকল গোত্রের সমস্ত লোকই যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল, এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। নানা প্রকার নৈসর্গিক আপদ বিপদে উহাদিগের অধিকাংশ লোকই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। অবশিষ্ট যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা পরে নবাগত জাতি সমূহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বায়েদাগণের লোপপ্রাপ্তির পর, যাহারা প্রথমে আরব দেশে অধিবাস স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগকে "আরবে-আরেবা" বা আদিম আরব বলা হয়। ইহারা আপনাদিগকে কাহতান বা য়োকতানের বংশধর বলিয়া মনে করে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে আরবগণ, অনেক সময় Joktan বা য়োকতানকে কাহতানরূপে

---

* আল্‌-আরব, প্রথম, ১০ পৃষ্ঠা।

পরিবর্তিত করিয়া উচ্চারণ করিত বটে, কিন্তু য়োকতান ও কাহতান যে একই ব্যক্তি, তাহা তাহারাও অবগত ছিল এবং প্রাচীনতম আরব ঐতিহাসিকগণও তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এবনে এছহাক এই দুই নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন।* রেভারেন্ড ফরস্টার বলিতেছেন যে, 'টলেমী' ( بطليموس ) কৃত প্রাচীন ভূগোলে আমরা কাহতান নাম এবং কাহতান বংশের বিবরণ আবিষ্কার করিয়াছি। এই কাহতান যে আরবীয় কাহতান এবং বাইবেলের য়োকতান (Jokytan), তাহাও জানা যাইতেছে ** লেখক অন্যত্র বলিতেছেন*** ঃ

"The antiquity and universality of the national tradition which identifies the Cahtan of Arabs....with the Joktan... of the Scripture is familiar to every reader."

অর্থাৎ—'বাইবেলের (Joktan) য়োকতান ও আরবের কাহতান যে অভিন্ন, আরব দেশের এই জাতীয় বিবরণটি, অতি প্রাচীনকাল হইতে সর্ববাদিসম্মতরূপে চলিয়া আসিতেছে।'

আরবীয় কিংবদন্তি ও বাইবেলের বর্ণনা সমস্বরে বলিতেছে যে, নূহের পুত্র শেম বা শাম, শামের পুত্র অর্ফকশদ এবং তাহার পুত্র শালহ, শালহের পুত্র আবের, আবেরের পুত্র য়োকতান।****

বাইবেলে কথিত হইয়াছে যে, এই য়োকতানের ১৩টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদিগের নামগুলি এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুলিপি করিতে করিতে, এমনই বিগড়াইয়া গিয়াছে যে, বাংলা ইংরাজী বাইবেল দেখিয়া সেগুলির প্রকৃত উচ্চারণ নির্ণয় করা অসম্ভব। এই নামগুলির সহিত আলোচ্য সম্পর্কের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, আমরা প্রথমে আরবী ও পরে বাংলা বাইবেল হইতে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

(১) الموداد আলমোদদ ; (২) سالق শেলক ; (৩) حضرموت হৎসর্মাবৎ ; (৪) يارح যেরহ ; (৫) هدورام হদোরাম ; (৬) اوزل উষল ; (৭) دقلة দিক্ল ; (৮) عوبال ওবল ; (৯) ابيمايل অবীমায়েল ; (১০) سابا শিবা ; (১১) اوفير ওফীর ; (১২) حويلة হবীলা ; (১৩) يوباب যোবব। অধিকাংশ নামগুলি কিরূপে ক্রমে ক্রমে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে, ইহা হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। আরবী অনুবাদক যে শব্দের অনুলিপি করিয়াছেন حضرموت হদ্বরামওত্, বাংলা অনুবাদক তাহাকে হৎসর্মাবৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, হিব্রু ভাষায় ث 'ছে' বর্ণই নাই। মূলে আছে বিন্দুহীন 'তা' ط—সুতরাং তাহার প্রকৃত উচ্চারণ হইবে—থ,$ সুতরাং আরবী অনুলিপিতে 'ছে' বর্ণের পরিবর্তে ته বা 'থ' হওয়া উচিত ছিল।$$ ইহা স্বীকার না করিলে 'তে' বর্ণ লিখিতে হইবে, 'ছে' কোন মতেই আসিতে পারে না। তাহা হইলে উহার প্রকৃত অনুলিপি হইবে حضرموته হদ্বরামওথ অথবা حضرموت হদ্বরামওৎ। পক্ষান্তরে 'জাদ' বর্ণ হিব্রু ভাষায় নাই, 'জাদ' লিখিতে ছাদ বর্ণেরই ব্যবহার হইয়া থাকে ; সুতরাং حضرموت হদ্বরামওৎ ও حصرموت হজরামওৎ লেখায় কোন পার্থক্য নাই। সেই জন্য

---

* এবনে হেশাম ১—৩৭ ; **Forster** ৮৮।

** ৮০ পৃষ্ঠা

*** ৩৮ পৃষ্ঠা।

**** এবনে হেশামের ভূমিকা এবং বাইবেলের আদি পুস্তক ১০ম অধ্যায়ের ২১ হইতে ৩১ পদ এবং ১ম বংশাবলীর ১ম অধ্যায়ের ১৭ হইতে ২৩ পদ দ্রষ্টব্য। পাঠকগণ ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, [ Y ও J ] এই দুই বর্ণের একটি প্রায়ই অন্যটির স্থানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাইবেলের সর্বত্র এই পরিবর্তন দেখা যায়, ইহা সর্বজনবিদিত নিয়ম।

$ Hebrew Grammar—by Dr. L R. Wolf ১৯ পৃষ্ঠা।

$$ এই হিসাবে 'তৈমিন' লেখা হয়

ইংরাজী অনুবাদকগণ 'Z জেড' দ্বারা ঐ বর্ণের অনুলিপি করিয়াছেন। অতএব নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে যে, ঐ শব্দটি বাংলা অনুবাদকের অবোধগম্য হৎসমাবৎ নহে, বরং হজরামওৎ। য়োকতানের পুত্র এই হজরামওৎ 'এমন' ও 'ওম্মানি'র মধ্যবর্তী যে স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি সেই প্রদেশটি তাঁহারই নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে।*

য়োকতানের বংশধরগণ প্রায় সকলেই আরবে বাস করেন। আলমোদাদের বংশধরগণের কথা টলেমীর প্রাচীন ভূগোলেও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—আলমোদাদী গোত্র Arabia felix বা এমনের মধ্যদেশে বাস করে। হিব্রু ভাষায় দাল ও জাল বর্ণের পার্থক্য নাই, সুতরাং হাদোরাম বা হাজোরাম অভিন্ন। য়োক্তানের পুত্রগণের মধ্যে অধিকাংশই যে আরব দেশে বাস করিয়াছিলেন, একটু মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহা স্পষ্টতঃ জানা যাইবে। আলোচনার দীর্ঘতা বর্জন করার জন্য আমরা নমুনা দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

য়োক্তান ফেলেগের ভ্রাতা, সুতরাং বাইবেল অনুসারে মোটামুটিভাবে ধরা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টের ন্যূনাধিক ২২০০ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আজ হইতে চারি সহস্র এক শতাধিক বৎসর পূর্বে য়োক্তান বা তাঁহার পুত্রগণ আরব দেশে অধিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। য়োকতানী বা কাহতানী বংশীয়গণ, ক্রমে ক্রমে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। হযরত এছমাইলের আগমনের পূর্বে ইহারাই আরবের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী হইয়াছিলেন, তাহার পর বিবি হাজেরা যখন হযরত এছমাইলকে লইয়া মক্কায় আগমন করিলেন এবং হযরত এব্‌রাহিম ও এছমাইলের উদ্যোগে তথায় কা'বার প্রতিষ্ঠা হইল, এবং পরে হযরত এছমাইলের সন্তানাদি দ্বারা তাঁহার বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন নবাগত প্রবাসিগণকে আদিম অধিবাসীরা العرب المستعربة 'আরবে মোস্তা'রেবা'--Aliens or naturalized Arab অর্থাৎ প্রবাসী অভ্যাগত বা নও-আবাদী আরব বলিয়া আখ্যাত করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, সঙ্গে সঙ্গে আরব দেশে দুইটি স্বতন্ত্র 'জাতি'র সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইল। আদিম ও নবাগতদিগের মধ্যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য চিরকালই বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। আদিম অধিবাসিগণ নবাগতদিগকে 'মোস্তা'রেবা বা বিদেশাগত বলিয়া আখ্যাত করিত এবং ইঁহারা আবার পূর্বেকার অধিবাসীদিগকে আদিম বা 'আরেবা' বলিয়া বর্ণনা করিত। দুই জাতির মধ্যে ভাষা ও আচার ব্যবহারেরও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

বাকারার ১২৭ আয়াতে বলা হইয়াছে—কা'বা মসজিদের নির্মাণ (মতান্তরে পুনর্নির্মাণ) করিয়াছিলেন হযরত এব্‌রাহিম, যুবক-পুত্র হযরত এছমাইলকে সঙ্গে লইয়া। কা'বা যে বস্তুতঃ হযরত এব্‌রাহিম কর্তৃকই নির্মিত, ছুরা আল এমরানের ৯৬ আয়তে তাহার কয়েকটা স্পষ্ট নিদর্শনেরও উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

"তাহাতেই অবস্থান করিতেছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ—(যেমন) মকামে-এব্‌রাহিম, আর (যেমন) যে কোন ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়, আর (যেমন) সেখানে যাওয়ার উপায় যাহারা করিয়া উঠিতে পারে, তাহাদের সকলের প্রতি আল্লাহরই উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ সমাধা করা অবশ্য-কর্তব্য হইয়া আছে ; ইহা সত্ত্বেও কেহ যদি (এই সত্যকে) অমান্য করে, তবে (জানা উচিত যে) আল্লাহ সমস্ত বিশ্ব হইতে বেনিয়াজ।"

মকামে এবরাহিম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎলিখিত ছুরা আল এমরানের তফছিরে করা হইয়াছে। এখানে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কা'বা মছজিদের পূর্ব দিকে একটি কাষ্ঠ-নির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ আছে। এই গৃহটি যে স্থানটুকুকে বেষ্টন করিয়া আছে আরবগণ স্মরণাতীতকাল হইতে তাহাকে মকামে-এবরাহিম বা "এব্‌রাহিমের স্থান" বলিয়া অভিহিত

---

* 'মা'জামুল-বোলদান,' হজরামাওৎ

করিয়া আসিতেছে। হজ্জ-ব্রতের সহিত এই স্থানটির সম্বন্ধও চিরন্তন এবং তাহাও হযরত এব্রাহিমের স্মৃতিকে কেন্দ্র করিয়া।

কা'বা মছজিদ নির্মাণের পর হযরত এবরাহিম তাহার প্রাঙ্গণকে 'হরম" বা নিষিদ্ধ স্থান বলিয়া নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, ইহাও সমগ্র আরব জাতির সনাতন বিশ্বাস। মছজিদ-নির্মাতা হযরত এব্রাহিমের নিদর্শন বলিয়া আরব-উপদ্বীপের প্রত্যেক অধিবাসীই সে নিদর্শনের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলে। এই জন্য কা'বা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষই নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। একটা গোটা দেশের সকল শ্রেণীর সমগ্র অধিবাসীর যুগ-যুগান্তরের পরম্পরাগত এই যে অব্যাহত বিশ্বাস এবং কার্যক্ষেত্রে সেই বিশ্বাসের এই যে ব্যতিক্রমহীন বাস্তব অভিব্যক্তি, ইহাই হইতেছে ইতিহাসের প্রকৃত অবদান।

কা'বা যে বস্তুতই হযরত এবরাহিম কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, তাহার অন্যতম প্রমাণ হইতেছে কা'বার চিরাচরিত হজ্জ-ব্রত। হজ্জের প্রত্যেক ক্ষুদ্রবৃহৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গেই হযরত এব্রাহিমের সাধন-স্মৃতি গভীর ও অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। ওয়াদি-এব্রাহিম, ছাফা-মারওয়া, মিনা-মোজদালেফা ও আরাফাত প্রভৃতির সমস্ত ক্রিয়াকর্মই সেই পুণ্য স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ কা'বা মছজিদ যে হযরত এবরাহিম কর্তৃকই নির্মিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। "বাইবেলের Chronology অনুসারে, হযরত এব্রাহিমের মৃত্যু হইয়াছে সৃষ্টি সনের ২১৫১ সালে বা খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৫৩ সনে। এছরাইল-বংশীয়েরা মিসরে অধিবাস স্থাপন করেন সৃষ্টি সনের ২২৯৮ সাল বা খ্রীষ্টপূর্ব ১৭০৬ সনে। সুতরাং হযরত এবরাহিমের মৃত্যুর ১৪৭ বৎসর পরে এছরাইলীয়রা মিসরে গমন করিয়াছিলেন। "এছরাইল-সন্তানেরা ৪৩০ বৎসর কাল মিসরে অবস্থান করিয়াছিলেন" (যাত্রা ১২—৪০)। "মিসর দেশ হইতে এছরাইল-সন্তানদের বাহির হইয়া আসিবার ৪৮০ বৎসরে ...শলোমন সদাপ্রভুর উদ্দেশে গৃহ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।" (১ রাজাবলি ৬—১। "আর সাত বৎসরে ঐ গৃহের নির্মাণ সমাপ্ত হয়" (ঐ, ৩৮ পদ। সুতরাং হযরত এব্রাহিমের মৃত্যুর (১৪৭+৪৩০+৪৮০+৭=)১০৬৪ বৎসর পরে হযরত ছোলায়মান কর্তৃক বায়তুল-মোকাদ্দাছ বা যেরুশেলম-মছজিদের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর অন্ততঃ ৩৬ বৎসর পূর্বে হযরত এব্রাহিম কা'বার নির্মাণকার্য সমাধা করিয়াছিলেন। সুতরাং বাইবেল অনুসারে কা'বা নির্মিত হইয়াছিল বায়তুল-মোকাদ্দাছের পূর্ণ ১১শত বৎসর পূর্বে। এই হিসাব অনুসারে বায়তুল-মোকাদ্দাছের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১০৪ সালে, ইহার সঙ্গে ১৯৩৬ সাল যোগ করিতে হইবে। সুতরাং আজ হইতে (১০৪+১৯৩৬+১১০০=) ৩১৪০ বৎসর পূর্বে হযরত এবরাহিম কর্তৃক কা'বা গৃহ নির্মিত হইয়াছিল।

"কা'বা মছজিদের প্রাচীনত্ব অন্যান্য ঐতিহাসিকের সূত্রেও সপ্রমাণ হইয়াছে। বিখ্যাত গ্রীক-ঐতিহাসিক (Herodotus) হিরোদোতাসের জন্ম হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৪ সালে। আরব দেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি তাহাদের প্রধান বিগ্রহ اللات লাতের উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, লাৎ কা'বা মছজিদে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহদের অন্যতম। আর একজন স্বনামখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক Diodorus Siculus যীশুখ্রীষ্টের এক শতাব্দী পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। আরব দেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "...there is, in this country, a temple greatly revered by the Arabs"—অর্থাৎ, আরব্য দেশে একটি মন্দির আছে, আরব জাতি যাহার অত্যন্ত সম্ভ্রম করিয়া থাকে। স্যার উইলিয়ম মূর এই উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলিতেছেন : "These words must refer to the Holy House of Mecca, for we know of no other which ever commanded such universal homage"* অর্থাৎ—এই শব্দগুলি নিশ্চয়ই মক্কার

* Life of Mohammad, Sir Wm. Muir.—Introduction Ciii

পবিত্র কা'বা মছজিদের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। কারণ, কা'বার ন্যায় সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছে—এরূপ অন্য কোন মছজিদের কথা আমরা অবগত নহি।"*

## দুইটি সমস্যা

প্রথম সমস্যা ঃ

এই আলোচনা প্রসঙ্গে দুইটি অভিনব সমস্যার উদয় হইতেছে। মুছলমান ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহার সমাধান না করিয়া অগ্রসর হওয়া ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কোরআন শরীফের একটি আয়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত এবরাহিম প্রার্থনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ

ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ۔ ( ابراهیم )

"হে আমাদের প্রভু। আমি আমার সন্তান বিশেষকে, তোমার মহিমান্বিত গৃহের (কা'বার) নিকটস্থ শস্যহীন প্রান্তরে অধিনিবেশিত করিয়াছি।"** মূরের দুরভিসন্ধি দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া, আমাদের কোন কোন সম্ভ্রান্ত লেখক*** বলিতেছেন যে, হযরত এবরাহিমের সময়ের পূর্বেই যে কা'বা মছজিদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই আয়ত হইতে তাহা জানা যাইতেছে। কারণ, তাঁহার প্রার্থনা হইতে জানা যাইতেছে যে, আল্লাহ্‌র ঘর বা কা'বা এছমাইলের অধিবাস স্থাপনের পূর্ব হইতেই তথায় অবস্থিত ছিল। ছুরা বাকারায় (১৫ রুকু) বর্ণিত হইয়াছে ঃ

واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت واسماعیل ( بقره )

আলোচ্য লেখক পূর্ব কথিত সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ইহার অর্থ করিতেছেন ঃ

حضرت ابراہیم اور اسماعیل بنیادوں کو اٹھاتے تھے ۔ یعنی اسے دوبارہ بنا رہے تھے ۔ ( نکات القرآن ۔ ص ۹۲ )

অনুবাদ ঃ "হযরত এবরাহিম ও এছমাইল তাহার ভিত তুলিতেছিলেন—অর্থাৎ তাহাকে পুনরায় নির্মাণ করিতেছিলেন।" সুতরাং তিনি প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, কা'বার গৃহটি জীর্ণ বা ভগ্নাবস্থায় ছিল, হযরত এবরাহিম ও এছমাইল তাহার পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন মাত্র। অবশ্য লেখক ইহা দ্বারা কা'বার প্রাচীনত্বই প্রমাণ করিতে চাহেন। 'কা'বা হযরত এবরাহিমের পূর্বেকার মছজিদ বলিয়া মনে হয়' মুর সাহেবের এইরূপ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি আরবের প্রচলিত কিংবদন্তি ও সমস্ত ছহী হাদীছকে—যাহাতে বলা হইয়াছে যে, হযরত এবরাহিম ও এছমাইল সর্বপ্রথমে কা'বা মছজিদ নির্মাণ করেন,—একদম অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। সেই জন্য কা'বাকে প্রাগ-এবরাহিমী যুগের নির্মিত বলিয়া একটা সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য।

হযরত এবরাহিমের মক্কা আগমন সংক্রান্ত কোরআনের বিভিন্ন আয়ত ও সমস্ত হাদীছ একসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, হযরত এবরাহিম মক্কায় আসিয়াছিলেন, কয়েকবার,—একবার মাত্র নহে। এইরূপে কা'বা নির্মাণের পরও দেশে চলিয়া গিয়া যে-বার তিনি পুনরায় মক্কায় আগমন করেন, আলোচ্য প্রার্থনাটি সেইবারের। সুতরাং আর কোন সমস্যাই থাকিতেছে না। লেখক নিজের সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করার জন্য, আবু জর কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীছের প্রথমাংশের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই হাদীছটি সম্পূর্ণ পড়িয়া দেখিলেই তাঁহার মতের অসমীচীনতা অবগত হওয়া যাইবে। আবু জর বলিতেছেন,

---

* আল-এমরানের তফছির—২০১—২০২ পৃষ্ঠা হইতে।

** ছুরা এবরাহিম, ৬ রুকু।

*** মৌলবী মোহাম্মদ আলী এম-এ, এল্‌ এল্‌ বি কৃত কোরআনের উর্দু টীকা—২২৬ পৃষ্ঠা।

আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে রছুলুল্লাহ ! পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে কোন্ মছজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? হযরত বলিলেন—কা'বা। আমি বলিলাম—তাহার পর কোনটি ? তিনি উত্তর করিলেন—বায়তুল-মোকাদ্দাছের (যেরুশেলেমের) মছজিদ। আমি বলিলাম—এতদুভয়ের নির্মাণ কালের ব্যবধান কত ? তিনি বলিলেন—৪০ বৎসর।* 'এই ৪০ বৎসরের' মীমাংসা আমরা পরে করিব। এখানে পাঠক এইটুকু দেখিয়া রাখুন যে, লেখক যে হাদীছের অংশ বিশেষ (মোটা অক্ষরে মুদ্রিত) নিজের পক্ষের প্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেই জানা যাইতেছে যে, যেরুশেলমের 'মছজিদে আকছা' নির্মিত হওয়ার ৪০ বৎসর মাত্র পূর্বে, কা'বার মছজিদ নির্মিত হইয়াছিল।**

দ্বিতীয় সমস্যা ঃ

কা'বা গৃহের নির্মাণ সম্বন্ধে আমরা যে দুইটি সমস্যার উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহার দ্বিতীয়টি এই যে, বায়তুল-মোকাদ্দাছের মছজিদ বা মছজিদে আকছা সর্বপ্রথমে হযরত ইয়াকুব কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, এবং হযরত ইয়াকুব হযরত এব্রাহিমের কা'বা নির্মাণের ৪০ বৎসর পরে এই প্রকার কাজ করার মত উপযুক্ত বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন।*** এই সিদ্ধান্ত দুইটি যথাক্রমে শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণের বিপরীত।

নাছাই আবদুল্লাহ্-এবন-আমর-আছ হইতে, একটি ছহী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।**** ঐ হাদীছে হযরতের শ্রীমুখাৎ উক্ত হইয়াছে যে, হযরত ছোলায়মানই বায়তুল-মোকাদ্দাছ মছজিদ নির্মাণ করিয়াছেন। হযরত ইয়াকুবের প্রথম নির্মাণ বা ছোলায়মানের পুনর্নির্মাণের কোন উল্লেখ সেখানে এবং (আমরা যতটা অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি) অন্য কোন হাদীছে নাই। তবরানীও রাফে-এবন ওমায়রা হইতে, এই মর্মের হাদীছই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এই "পুনর্নির্মাণ" কথাটার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে ছোলায়মান ইয়াকুবের নির্মিত মছজিদের পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তটিকে শাস্ত্রের হিসাবে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিলেও, হযরত এব্রাহিমের কা'বা নির্মাণের ৪০ বৎসর পরে তাঁহার পৌত্র ইয়াকুব যে বায়তুল-মোকাদ্দাছ মছজিদ নির্মাণের যোগ্য হইয়াছিলেন, ঐতিহাসিক হিসাবে তাহা প্রমাণিত হয় না।

পূর্বে কোরআনের আয়ত হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, কা'বা নির্মাণের পর, হযরত এব্রাহিম যেদিন এছমাইলকে কোরবানী করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেইদিন তাঁহাকে ইয়াকুবের পিতা এছহাকের জন্মলাভের ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাপন করা হয়। ইহার কিছুকাল—অন্ততঃ এক বৎসর পরে হযরত এছহাক জন্মগ্রহণ করেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ২৪ বৎসর বয়সে হযরত এছহাকের বিবাহ হইয়াছিল এবং বিবাহের এক বৎসর পরেই হযরত ইয়াকুব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ;—তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, কা'বা নির্মাণের অন্ততঃ ২৬ বৎসর পরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং ৪০ বৎসরের হিসাব ধরিলে বলিতে হইবে যে, চতুর্দশ বৎসর বয়সের বালক ইয়াকুব, বায়তুল-মোকাদ্দাছের বিখ্যাত মছজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। 'অন্ততঃপক্ষের' হিসাব ধরিলে এই কথা, নচেৎ নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, কা'বা নির্মাণের ৪০ বৎসর পরবর্তী সময়ের মধ্যে ইয়াকুবের জন্মই হয় নাই, এমন কি তাঁহার পিতা হযরত এছহাক তখনও বালক মাত্র ছিলেন।

---

* বোখারী, ৩, ২৩৫ হইতে ২৪০ পৃষ্ঠা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

** বোখারী, মোছলেম—মেশকাত ৭২ পৃষ্ঠা।

*** ফৎহুল-বারী—ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা, ১৩ খণ্ড ২৪০—৪১ পৃষ্ঠা।

**** এবনে-হাজর—'ফৎহুল-বারী' ১৩—২৪০।

এখন সম্ভাবতঃ এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে যে, তাহা হইলে কি বোখারী বর্ণিত হযরতের এই উক্তিটি ভুল ? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, হযরতের উক্তি কখনই ভুল নহে, তবে ৪০ বৎসর ব্যবধানের এই উক্তিটিকে হযরতের উক্তি বলিয়া নির্ধারণ করা, নিশ্চয়ই ভুল। বোখারীর এই হাদীছটি মোছলেম ও এবনে খোজায়মা কর্তৃক বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই রেওয়ায়ৎগুলি একত্রে পাঠ করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, ছাহাবী আবু জরের পূর্ববর্তী রাবী এবরাহিম তাইমী ও তাঁহার পিতা এবনে এজিদের কথোপকথনের কতকটা অংশ, এমনই ভাবে হাদীছে সন্নিবেশিত হইয়া গিয়াছে যে, দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা একটু চিন্তা ও আলোচনা সাপেক্ষ। মূল ঘটনা এই যে, এব্রাহিম তাইমী ও তাঁহার পিতা, একদিন পথে বসিয়া পরস্পর কোরআন পাঠ ও শ্রবণ করিতেছিলেন। পিতা এবনে এজিদের পাঠকালে একটা ছেজদার আয়ত বাহির হইয়া পড়ে। তিনি এই আয়ত পাঠ করিয়া সেই পথেই ছেজদা করিলে, পুত্র এবরাহিম ইহাতে আপত্তি করিলেন। এই ঘটনার পর পিতা এই হাদীছটি বর্ণনা করেন ঃ "রাবী এবনে এজিদ বলিতেছেন, আমি আবু জরকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন— আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পৃথিবীর কোন মছজিদটি প্রথম ? তিনি বলিলেন—মছজেদে হারাম বা কা'বার মছজিদ। আমি বলিলাম—তাহার পর কোনটি ? তিনি বলিলেন—বায়তুল-মোকাদ্দাছের মছজিদ। আমি বলিলাম—উভয়ের মধ্যে কত দিনের ব্যবধান ? তিনি বলিলেন—৪০ বৎসর। অতঃপর যেখানে তোমার নামাযের সময় উপস্থিত হয়, সেখানেই তাহা সমাধা করিবে, কারণ আসল পুণ্য হইতেছে নামায পড়াতে।" এখানে শেষের চারি স্থানে আমি ও তিনি সর্বনামের বিশেষ্য লইয়াই যত গোল বাধিয়াছে। সাধারণতঃ ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, এখানে আমি অর্থে মূল রাবী আবু জর এবং তিনি অর্থে হযরত। কিন্তু আমাদের মত এই যে, এখানে প্রথম আমি অর্থে আবু জর এবং প্রথম তিনি অর্থে হযরতকে বুঝিতে হইবে, আর দ্বিতীয় আমি অর্থে পরবর্তী রাবী এবনে এজিদ এবং দ্বিতীয় তিনি অর্থে প্রথম রাবী আবু জরকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ প্রথম মছজিদ কা'বা এবং দ্বিতীয় বায়তুল-মোকাদ্দাছ, এই দুইটি হযরতের উক্তি—সুতরাং অবশ্য বিশ্বাস্য হাদীছ। কিন্তু "আমি বলিলাম—উভয়ের মধ্যে কত কাল ব্যবধান ?" ইহা এবনে এজিদের উক্তি। এবনে এজিদের এই প্রশ্নের উত্তরে আবু জর বলিতেছেন—'৪০ বৎসর', সুতরাং ইহা হাদীছ নহে।

হাদীছ বর্ণনার সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রথম রাবী বা ছাহাবী যখন নিজের ও হযরতের সহিত কথোপকথনের উল্লেখ করেন, তাঁহার পরবর্তী রাবী তাহার বর্ণনাকালে, "তিনি বলিলেন—আমি বলিলাম" قال قلت—এইরূপভাবে তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। বোখারীর রেওয়ায়তে সর্বপ্রথমে একবার মাত্র এইরূপ উল্লেখ আছে, পরন্তু আলোচ্য দুই স্থানে 'আমি বলিলাম' পদের পূর্বে 'তিনি বলিলেন,' এই পদের উল্লেখ নাই। কিন্তু যেহেতু মোছলেমের রেওয়ায়তে আলোচ্য উক্তিদ্বয়ের প্রথম উক্তির পূর্বে قال قلت ثم اى "তিনি (প্রথম রাবী আবু জর) বলিলেন, আমি বলিলাম"—এই পদের উল্লেখ আছে, এই জন্য আমরা দুই কেতাবের রেওয়ায়ৎ একত্র মিলাইয়া, এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেখানেও 'আমি বলিলাম'—এই পদটি প্রথম রাবী আবু জরের এবং তাহার উত্তর—অর্থাৎ 'তাহার পর বায়তুল-মোকাদ্দাছের মছজিদ' এই অংশটিও—হযরতের উক্তি। বলা আবশ্যক যে, মোছলেমে ঐরূপ না থাকিলে, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত হইত না। কিন্তু আমাদের মূল আলোচ্য—শেষোক্ত স্থলে, মোছলেমের বর্ণনাতেও 'আমি বলিলাম' পদের পূর্বে قال বা 'তিনি বলিলেন' পদের উল্লেখ নাই। সুতরাং চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, এখানে আমি অর্থে এবনে এজিদ এবং 'তিনি

বলিলেন' অর্থে প্রথম রাবী আবু জর বলিলেন, এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব আমরা দেখিলাম যে 'কা'বা ও বায়তুল-মোকাদ্দাছ নির্মাণের মধ্যে ৪০ বৎসরের ব্যবধান'—এই উক্তিটি রাবী আবু জরের, ইহা হযরতের উক্তি কখনই নহে।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## এছলামের পূর্বে জগতের অবস্থা

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (স.) আবির্ভাবকালে, জ্ঞান ও ধর্ম এবং সুনীতি ও সভ্যতার সকল দিক দিয়া বিশ্ব-মানবের যে শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। হযরতের পূর্বে দুনিয়ায় বিভিন্ন কেন্দ্রে বহু প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের আর্বিভাব হইয়াছিল, জগতের বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহর কালাম বা "ভগবৎ-বাণী"ও সমাগত হইয়াছিল। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের সমস্ত ইতিবৃত্তের সমবেত সাক্ষ্য এই যে, আলোচ্য সময় মহাপুরুষগণের প্রচারিত সমস্ত জ্ঞান ও শিক্ষা এবং স্বর্গীয় বাণীগুলির যাবতীয় আদর্শ ও প্রেরণা মানুষের মন ও মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অজ্ঞানতার বিভীষিকাময় অন্ধকার আসিয়া, অধর্মের ও অনাচারের নানা পাপ ও গ্লানি আসিয়া মানব জাতির জ্ঞান ও বিবেকের এবং সুনীতি ও সদাচারের উপর তখন নিজেদের অধিকার ও আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়াছিল। বস্তুতঃ তখন অজ্ঞতার নামই হইয়াছিল জ্ঞান, অধর্মের নামই হইয়াছিল ধর্ম, মহাপাতকের নামই হইয়াছিল পুণ্য এবং সকল প্রকার ঘৃণিত ব্যভিচারই তখন গৃহীত হইয়াছিল আদর্শ সদাচার বলিয়া।

এই সময়কার ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ দেখা যাইবে যে, মহাপুরুষদের মধ্যবর্তিতায় যে সব ঐশিক বাণী তখন পর্যন্ত বিশ্ব-মানবের সন্নিধানে প্রকাশিত হইয়াছিল, পণ্ডিত-পুরোহিতদের পাপহস্ত তাহার কতক অংশকে বিকৃত আর কতক অংশকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং প্রকৃত ধর্মগ্রন্থের স্থান অধিকার করিয়াছিল মানুষের স্বহস্ত রচিত কতকগুলি উপশাস্ত্র আসিয়া। অন্যদিকে মহাপুরুষগণের সত্যকার শিক্ষা এবং তাঁহাদের মহান জীবনের প্রকৃত আদর্শ তখন বিকৃতির ও বিস্মৃতির অতল তলে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অথচ এই সঙ্গে সঙ্গে উৎকটরূপে বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল মহাপুরুষগণের নামকরণে সঞ্চিত অন্ধ-বিশ্বাসের যত বীভৎস উপকরণ, নরপূজার যত সর্বনাশী অবদান। মানব জাতির সেই অন্ধকার যুগের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সঙ্কলিত হইয়া আছে, এখানে তাহার উল্লেখ করা সম্ভবপর হইবে না। কেবল তাহার মধ্যকার কয়েকটি প্রাচীন সুসভ্য জাতির তৎকালীন অবস্থার সামান্য একটু আভাস এখানে দিয়া রাখার চেষ্টা করিব মাত্র।

### ভারতবর্ষ

জ্ঞান, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রাচীন আবাসভূমি বলিয়া ভারতবর্ষের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে করা উচিত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সমগ্র হিন্দু সমাজের সমবেত বিশ্বাস অনুসারে বেদই এ দেশের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং অধিকাংশের মতে ইহা অপৌরুষের স্বর্গীয় বাণী। কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তাহার বহু পূর্ব হইতে বেদ-বিদ্যা এখানে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে বসিয়াছিল। বেদের প্রকৃত শিক্ষা নিরাকার একেশ্বরবাদ কি-না, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে আজও যে সে-সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বোধ হয়, ইহাই তাহার কারণ। এ সম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করার অধিকারী আমরা নহি। তবে বেদ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আলোচনা পাঠ করিয়া আমাদের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রকৃত বেদের প্রকৃত শিক্ষা নিরাকার একেশ্বরবাদ ব্যতীত আর কিছুই

নহে। তখনকার দিনে লেখার প্রচলন না থাকাতে প্রকৃত বেদের শ্লোকগুলির এক অংশ কালক্রমে বিলুপ্ত ও এক অংশ অবস্থা-বিপর্যয়ে বিকৃত হইয়া পড়ে এবং বেদ-আবির্ভাবের পরবর্তী যুগে আর্য কবি, নীতিকার ও পণ্ডিতবর্গ যে সব শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার এক অংশও কালক্রমে সেই প্রকৃত বেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। মোটের উপর প্রকৃত বেদের সেই নিরাকার একেশ্বরবাদের বিকার আদি যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাই আমরা দেখিতেছি, বৈদিক যুগ বলিয়া যে দীর্ঘ সময়ের নির্ধারণ করা হয়, প্রকৃতিপূজা ও বহু দেব-দেবীর উপাসনা-অর্চনা সে যুগেও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং এই সব পূজা-অর্চনার সমস্ত শিক্ষা ও প্রেরণা তখনকার আর্যরা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তৎকালে বেদ নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলি হইতেই।

সে যাহা হউক, কুরুক্ষেত্রের কাল সংগ্রামের ফলে আর্য জাতির চিন্তাধারায় যে ঘোর অধঃপতন ঘটিয়াছিল, পরবর্তী অবস্থার সহিত তুলনার সময় তাহার অনেক দলিল-প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের খ্যাতনামা বিদ্বান এবং ঋষি ও মহর্ষিগণ বহুল পরিমাণে মহাভারতের যুদ্ধের সময় নিহত হওয়ায়, বেদ-বিদ্যা ও বেদোক্ত ধর্মের প্রসার নষ্ট হইয়া যায়।* ইহার পরে ভারতের আর্যদিগের মধ্যে ধর্মের নামে যে সব সংস্কার ও অনুষ্ঠানের আবির্ভাব করা হয়, তাহা একদিকে যেমন বেদ-বিরোধী, অন্য দিকে শিক্ষা ও আদর্শের হিসাবে তাহা বিভিন্ন ও পরস্পরের পরিপন্থী। আশ্চর্যের বিষয়, দীর্ঘ ব্যবধানের ও বহু বিভিন্ন মতবাদী পণ্ডিতবর্গের এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী পুথি-পুস্তককেই ধর্মশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে তখনকার আর্যরা কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই ব্যবস্থার ফলে আর্যধর্ম ভারতবর্ষ হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং "হিন্দু ধর্ম" আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে। হিন্দুস্থানে আবির্ভূত হইলেই যে-কোন মতবাদ হিন্দুধর্মের বিশাল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার অধিকারী এবং তাহার প্রত্যেকটিই সত্য ও সঙ্গত—সে ধর্মনীতি বিরোধী হউক, জ্ঞান-বিরোধী হউক, সত্য-বিরোধী হউক আর বেদ-বিরোধী হউক, তাহা বিচার করার আর কোন দরকারই থাকে না।

এই অনাচারের ফলে দুই হাজার বৎসর ধরিয়া যে সব মতবাদ ভারতবর্ষে ধর্মের নামে প্রচলিত হইয়া গেল এবং এই সমস্ত মতবাদের প্রভাবে যে সকল জঘন্য দুর্নীতি ভারতীয় জন-সমাজের স্তরে-স্তরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিল, তাহাকে ধর্মের ঘোরতর ব্যভিচার, জ্ঞানের শোচনীয় অধঃপতন এবং সুনীতি ও সদাচারের জঘন্যতম বিকার ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

বেদের শিক্ষায় দেখা যায়—ঈশ্বর "অজ একপাৎ" তিনি "অকায়ম" তিনি "একমেবা-দ্বিতীয়ম"। অর্থাৎ তিনি জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি মঙ্গলময়। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন কায়া হইতে পারে না এবং 'ন তস্য প্রতিমা অস্তি" অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রতিমা নাই। কিন্তু অন্ধকার যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বেদের সেই অজ, অকায়, অপ্রতিম, একক, অদ্বিতীয় ও নিরাকার ঈশ্বরকে ভারতের ধর্মীয় সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া হইল এবং তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল পণ্ডিত-পুরোহিতের মস্তিষ্ক-প্রসূত অবতার, পুতুল ও প্রতিমা, অগণিত দেবী ও দেবতা, অসংখ্য গুরু ও ভূদেব ব্রাহ্মণ। একদিকে আস্তিক মস্তিষ্কের এই পরিতাপজনক অধঃপতন, অন্যদিকে যুগপৎভাবে চরম নাস্তিকতাবাদের প্রবল প্রাদুর্ভাবে জৈন ধর্মের আবির্ভাব। জৈনরা প্রচার করিলেন যে, "সৃষ্টিকর্তা অনাদি ঈশ্বর কেহ নাই"। নানা কারণে কালক্রমে এই মতবাদই ভারতবর্ষে প্রবল হইয়া উঠিল।

তিন শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র আর্যাবর্তের উপর জৈনদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বেদ ও বৈদিক জ্ঞানের চরম বৈরিতা হেতু জৈন রাজা ও পুরোহিতবর্গ এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজেদের শক্তি ব্যয় করিতে থাকিলেন, বেদাদি সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিকে ধ্বংস করিতে, বেদের সমস্ত

* সত্যার্থ প্রকাশ, ১১শ সমুল্লাস।

শিক্ষা ও নিয়মকে আর্যাবর্ত হইতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিয়া দিতে। এজন্য বেদ-মার্গীদিগের প্রায় সকলেই জৈন মতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন এবং বৈদিক ধর্ম ও বেদার্থ জ্ঞান ভারতবর্ষ হইতে, বোধ হয়, চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

পৌত্তলিক মানসিকতার বিকাশ ও জয়যাত্রার জন্য এইরূপ অন্ধকার যুগই সর্বতোভাবে অনুকূল হইয়া থাকে। কাজেই জৈনদিগের নাস্তিকতাবাদ অনতিবিলম্বে ঘোর পৌত্তলিক ধর্মে পরিণত হইয়া গেল। বেদের নিরাকার ঈশ্বরকে বিসর্জন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নির্মাণ করিয়া লইল নিজেদের তীর্থঙ্করদিগের বহু সংখ্যক বিরাটকায় পাষাণ মূর্তি এবং নিয়মিতভাবে আরম্ভ হইয়া গেল ঈশ্বররূপে বা অবতাররূপে তাহাদের পূজা-অর্চনা। অবতারবাদ ও মূর্তিপূজার মহাপাপ সেই হইতে ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়া গেল এবং ভারতবর্ষের পরবর্তী যুগের সমস্ত ধর্মগত, জ্ঞানগত ও নীতিগত অধঃপতনের সমস্ত সর্বনাশের মূল উৎস হইতেছে ইহাই। শঙ্করাচার্য আসিয়া এই সর্বনাশা স্রোতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার অনুবর্তীরা জৈনদিগকে রাজনৈতিক হিসাবে পরাজিত করিলেন, সহস্র সহস্র জৈন মূর্তি* ও মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সত্যকথা এই যে, জৈন মতবাদের প্রভাবকে ভারতবাসীর মন ও মস্তিষ্ক হইতে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া তাঁহার ও তাঁহার অনুসরণকারীদের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। একটু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, জৈনদের সেই পুরাতন পৌত্তলিকতা ও তাহাদের সেই অবতারবাদকেই তাঁহারা গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধি করিয়া নিয়া এবং তাহার উপর হিন্দুধর্মের ছাপ লাগাইয়া ভারতবর্ষে সানন্দে চালাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময় দেশবাসীকে জৈনদের প্রভাব হইতে মুক্ত করার জন্য হিন্দু পণ্ডিত পুরোহিতবর্গ জৈনদের অনুকরণে হাজার হাজার মূর্তি গঠন করিয়া সেগুলিকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং "জৈনদের ২৪ জন তীর্থঙ্করের অনুকরণে হিন্দুরাও ২৪টি অবতার কল্পনা করিয়া লইয়াছিল," এমন কি, কালক্রমে শঙ্করাচার্যকে শিবের অবতার বলিয়া নির্ধারণ করিতে তাঁহার নিজের শিষ্যরাও দ্বিধাবোধ করেন নাই। এই অবতারবাদের অভিশাপ ভারতবর্ষের পণ্ডিত-পুরোহিতদিগের মস্তিষ্ককে এমনভাবে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদি নিকৃষ্ট জীবকে পর্যন্ত ঈশ্বরের অবতার বলিয়া কল্পনা করিতেও তাঁহারা একটুও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ক্রমে ক্রমে জড়-পূজা, প্রতীক পূজা, প্রকৃতি পূজা, প্রেত পূজা, নর পূজা ও পুতুল পূজার সব অভিশাপ আসিয়া ভারতবর্ষের পুরাতন অনাবিল একেশ্বরবাদকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল।

সুনীতি ও সদাচারের দিক দিয়া এই সময় ভারতবর্ষের যে ঘোরতর অধঃপতন ঘটিয়াছিল, নিষ্ঠুরতায় ও জঘন্যতায় বস্তুতই তাহা অনুপম। মানবতার চরম অবমাননা করিয়া একদিকে তাহারা একের পর এক অবতারের আমদানী করিয়া যখন সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার আসনে বসাইয়া দিতেছিল, ঠিক সেই সময় অন্যদিক দিয়া মানুষকে তাহারা নামাইয়া দিতেছিল শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর স্তরে। "সর্বং ব্রহ্মময়ং" বলিয়া বলিয়া, সাম্যের অতিরঞ্জনে তাহারা সৃষ্টির প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশে ব্রহ্মত্বের আরোপ করিয়া একদিকে তাহারা "নর-নারায়ণের" সেবাকেই, মুক্তির মহত্তম উপায় বলিয়া নির্ধারণ করিতেছিল এবং ঠিক সেই সময় ভারতের পণ্ডিত-পুরোহিতগণ মনু, অত্রি প্রভৃতি সংহিতাকারগণের আল্লাহর কোটি কোটি সন্তানকে শূকর, গর্দভ অপেক্ষাও ঘৃণিত মনে করিতেছিল। তৎকালীন শাস্ত্রকাররা এদেশের শূদ্রদিগকে সম্পূর্ণভাবে অতি জঘন্য দাস জাতিতে পরিণত করার জন্য যে সব নিষ্ঠুর ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুঁথি-পুস্তকে আজও তাহা বিদ্যমান আছে। সংহিতাকারদের নিষ্ঠুর ব্যবস্থার সামান্য একটু নমুনা নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

---

* "শঙ্করাচার্যের সময়েই জৈন প্রধ্বংস হয় ; অর্থাৎ আজকাল যত ভগ্নমূর্তি পাওয়া যাইতেছে, তৎসমস্তই শঙ্করাচার্যের সময়ে ভগ্ন হইয়াছিল।" —দয়ানন্দ সরস্বতী।

"হিন্দুশাস্ত্রে শূদ্র আর দাস একই অর্থবাচক। মনু বলিতেছেন ঃ

শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীত মেব বা
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা। ৪১৩
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে
নিসর্গজংহি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি। ৪১৪

অর্থাৎ—শূদ্র ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক, তাহাকে দাসত্ব করিতেই হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণের দাস্যকর্ম নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন মরণ পর্যন্ত শূদ্রের শূদ্রত্ব নষ্ট হয় না, সেইরূপ শূদ্র, স্বামী কর্তৃক মুক্ত হইলেও, তাহার দাসত্বের মোচন হইতে পারে না।

ভগবান মনু ইহার পর স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থা দিতেছেন যে, "এই দাস যাহা কিছু উপার্জন করিবে, তাহার অধিকারী হইবেন তাহার স্বামী দ্বিজগণ। ব্রাহ্মণ প্রভু শূদ্রের সমস্ত ধন-সম্পদ গ্রহণ করিতে, এমন কি কাড়িয়া লইতে অধিকারী। কারণ—শূদ্রদাসের স্বত্বাস্পদীভূত কিছুই নাই, উহার যাবতীয় ধন উহার প্রভুর গ্রহণীয় (৪১৬—১৭)। রাজাকে বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে এই শূদ্রের উপর, যেন সে সর্বদাই নিজের দাস্যকার্যে নিযুক্ত থাকে। কারণ এই কার্য ত্যাগ করিয়া অশাস্ত্রীয় উপায়ে, ধন উপার্জন করিতে সমর্থ হইলে, সে অহঙ্কারে ধরাকে আকুল করিয়া তুলিবে (৪১৮)।"

এই নির্মম অসাম্যের ভিত্তি স্থাপন করাও হইয়াছে শ্রীভগবানের নাম করিয়া। ঋগ্বেদ বলিয়া দিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছেন ঈশ্বরের মুখ হইতে, আর শূদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার পা হইতে (১০ ঃ ৯০)। মনুও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন (১—৩১)। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া শূদ্রাদি ইতর লোকদিগের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও দণ্ডবিধি-সংক্রান্ত যে-সব ব্যবস্থা রচিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই মর্মবিদারক।

চণ্ডালাদি নীচজাতীয় লোকদিগের বাসস্থান হইবে গ্রামের বাহিরে। কুকুর ও গর্দভ ব্যতীত অন্য কোন পশু তাহারা পালন করিতে পারিবে না। তাহারা ভাঙ্গা ভাঁড় মাত্র ব্যবহার করিবে, লোহার অলঙ্কার ব্যবহার করিবে, শববস্ত্র পরিধান করিবে ও লাওয়ারেস শবগুলি গ্রাম হইতে বাহির করিবে। বৈধ কর্মাদির অনুষ্ঠানকালে ইহাদের দর্শনও নিষিদ্ধ। সাধুরা ইহাদিগকে সাক্ষাৎভাবে অন্নদান করিবেন না, দরকার হইলে ভগ্নপাত্রে ভৃত্যের দ্বারা ইহাদিগকে অন্ন দেওয়া যাইতে পারে। (১০ম অধ্যায়)। ব্রাহ্মণ দিবেন ২ পণ সুদ, কিন্তু ক্ষত্রিয়কে ৩ পণ, বৈশ্যকে ৪ পণ এবং শূদ্রকে ৫ পণ বৃদ্ধি দিতে হইবে ( ৮-১৪২)। শ্রীভগবান বলিতেছেন—শূদ্র যদি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের লোকের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদ করিয়া দিতে হইবে। কারণ ব্রহ্মার পদরূপ নিকৃষ্ট অঙ্গ হইতে তাহার জন্ম হইয়াছে (২৭০)। এমনকি শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে এই কথা বলে যে, "এই ধর্ম তোমার অনুষ্ঠেয়", তাহা হইলেও রাজা তাহার মুখে ও কানে উত্তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিবেন (২৭২)। শূদ্র যদি উচ্চবর্ণের লোককে মারিবার জন্য হস্ত-পদাদি কোন অঙ্গ উত্তোলন মাত্র করে, তবে রাজা তাহার সে অঙ্গ কাটিয়া দিবেন (২৮৩) ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে শূদ্রের পাছা কাটিয়া দেওয়া হইবে (২৮১)। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণীর অঙ্গ স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা (৩৫৯)। অপকৃষ্ট জাতীয় কন্যা যদি সম্ভোগার্থে উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের ভজনা করে, তাহাতে সেই কন্যার কোন দণ্ড হইবে না। কিন্তু অধম জাতির পুরুষ যদি উত্তম জাতির কোন কন্যাকে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা। ৩৬৫—৬৬)। ভর্তাদি কর্তৃক রক্ষিত হউক বা না হউক, শূদ্র যদি দ্বিজাতির কোন স্ত্রীগমন করে, তবে অবস্থাভেদে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ ও প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় ঐরূপ করিলে তাহাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারার হুকুম (৩৭৪—৭৭)। কিন্তু ব্রাহ্মণের জন্য মাকড়-খোকড় ব্যবস্থা। মনু বলিতেছেন ঃ

মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে
ইতরেষান্তু বর্ণানাং দণ্ডঃ প্রাণান্তিকো ভবেৎ। ৩৭৯
ন জ্যাতু ব্রাহ্মণং হন্যাং সর্বপাপেষ্বপি স্থিতম্
রাষ্ট্রাদেনং বহিঃ কুর্য্যাৎ সমগ্র ধনমক্ষতম্। ৩৮০

অর্থাৎ—যে-অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, ইতর লোকদিগের সম্বন্ধে ঐ দণ্ডই বলবৎ থাকিবে। কিন্তু ঐ সকল অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণের শুধু মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হইবে—ইহা শাস্ত্রের ব্যবস্থা। সর্বপ্রকার পাপাচারী হইলেও ব্রাহ্মণকে বধ কখনই করা হইবে না। ঐ অবস্থায় সমস্ত ধন-সম্পদসহ অক্ষত শরীরে রাজা তাহাকে রাজ্যের বাহির করিয়া দিবেন।"*

তখনকার শাস্ত্রকারেরা ভারতবর্ষীয় 'ইতর ভদ্র' সকল শ্রেণীর নারী সমাজের প্রতি যে অমানুষিক অবিচার করিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর শাস্ত্রে, সাহিত্যে ও পুরাণ-ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আজও বিদ্যমান আছে। স্বত্ব ও অধিকার বলিতে নারীর তখন কিছুই ছিল না, নারী তখন সমাজের দুর্বহ বিপদ অথবা কাম চরিতার্থ করার সম্বল মাত্র। যে ভারতের ইতিহাসে গার্গীর ন্যায় বিদুষী মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়, যে গার্গীর ঋগ্বেদ-ভাষ্য পাঠ করিয়া বেদ-বিদ্যা অর্জন করিতে তখনকার পণ্ডিত-পুরোহিতদের একটুও দ্বিধাবোধ হইত না, সেই ভারতের মুনি-ঋষিরা ব্যবস্থা দিলেন যে, তপজপ, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস গ্রহণ, দেবতার পূজা-আরাধনা প্রভৃতি ধর্মকর্মে "স্ত্রী শূদ্রাদির" কোন প্রকার অধিকারই থাকিবে না। যে বেদকে তাঁহারা জ্ঞানময় পরব্রহ্মের মহীয়সী বাণী বলিয়া বিশ্বাস ও প্রচার করিতেন, বিদুষী গার্গীর স্বজনেরা নির্দেশ দিলেন যে, সেই ভাগবৎবাণীর একটি বর্ণ উচ্চারণ, এমন কি শ্রবণ করার অধিকারও নারীর ও শূদ্রের নাই। কোন শূদ্র বা নারী ঐ ঐশিক বাণী শ্রবণ-উচ্চারণরূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইলে রাজা অবিলম্বে তাহার প্রাণবধ করিবেন।**

নারীত্বের আদর্শকে ভারতের আর্যরা তখন যে কিরূপ হীনচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎকালীন শাস্ত্রে, পুরাণে ও সাধারণ সাহিত্যে তাহার বহু নির্মম নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। 'বিশ্ব-মানবের আদি সৃষ্টিকর্তা স্বয়ম্ভু ভগবান মনু' দ্বিজোত্তমগণকে সম্বোধন করিয়া নারীদিগের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নির্দেশবাণী প্রচার করিতেছেন:

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে।। ১৪
পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঃস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্তৃষ্বেতা বিকুর্বতে।।১৫
এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতিনিসর্গজম্।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি।। ১৬
শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ।।১৭

অর্থাৎ "নারীরা সৌন্দর্য অন্বেষণ করে না, যুবা বা বৃদ্ধ তাহাও দেখে না, সুরূপ বা কুরূপ হউক, তাহারা পুরুষ পাইলেই তাহার সহিত সম্ভোগ করে।।১৪। কোন পুরুষকে দর্শন করা মাত্রই তাহার সহিত 'ক্রীড়ায়' রত হওয়ার ইচ্ছা স্ত্রীলোকদিগের জন্মিয়া থাকে, এজন্য এবং চিত্তের স্থিরতার অভাবে স্বভাবতঃ স্নেহ ও শূন্যতা প্রযুক্ত, স্বামী কর্তৃক রক্ষিত হইলেও

---

* ৮ম অধ্যায়।
** অত্রি সংহিতা, ১৩৫ ও ১৯

স্ত্রীলোকেরা স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারাদি কুক্রিয়ায় লিপ্ত হইয়া থাকে। (১৫) স্ত্রীদিগের এইরূপ স্বভাব স্বয়ং বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। (অতএব ঐ স্বভাবের কোন প্রকার পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব)। ইহা বিলক্ষণরূপে অবগত হইয়া, তাহাদের রক্ষণের প্রতি অতিশয় যত্নবান থাকিবে (১৬)।" স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মনুই যে মানব-সৃষ্টির প্রাক্কালে এই সকল পরিকল্পনা করিয়াই অভাগিনীদিগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নারী-চরিত্রের এই অনুপম মহিমাকীর্তনের পর মনু আরও যে সব বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে নারীদিগের অধিকারের আভাসও প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি বলিতেছেন ঃ

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতঃ
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ। ১৮

অর্থাৎ—যেহেতু মন্ত্রদ্বারা স্ত্রীলোকদিগের জাতকর্মাদি সংস্কার হয় না, এজন্য উহাদিগের অন্তঃকরণ নির্মল হইতে পারে না। এবং যেহেতু বেদ স্মৃতিতে তাহাদের কোন অধিকার নাই, এজন্য তাহারা ধর্মজ্ঞও হইতে পারে না। এবং পাপ করিয়া কোন মন্ত্রের আবৃত্তির দ্বারা যে তাহার স্খালন করিয়া লইবে, সে সুযোগও তাহাদের নাই, কারণ কোন মন্ত্রে তাহাদিগের অধিকার নাই।*

নারী পিতার অতি আদরের কন্যা, ভ্রাতার অতি সোহাগের ভগ্নী, স্বামীর সহধর্মিণী স্ত্রী এবং সন্তানের সর্বময়ী জননী। কিন্তু তবুও সমাজ-জীবনের কোন স্তরে স্বাধিকারের হিসাবে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করার সামান্য একটু স্থানও তখন ভারতবর্ষে ছিল না। ভারতের দায়ভাগ নারীকে একপ্রকার গণনার বাহিরে রাখিয়াই সম্পত্তি বন্টনের ব্যবস্থা দিয়াছে। বিবাহে তাহার মতামতের কোন স্থান নাই, বিবাহ বন্ধন ছেদনেরও কোন অধিকার তাহার নাই। অষ্টবিধ শাস্ত্রসম্মত বিবাহের গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের তাৎপর্য অনুসন্ধান করিলে তখনকার নারীসমাজের শোচনীয় দুরবস্থার কথা সম্যকরূপে দৃষ্টিগোচর হইতে পারিবে। অতঃপর নারীকে আমরা দেখিতে পাই তান্ত্রিকের বীভৎস ভৈরবীচক্রে, "অহং ভৈরব স্তং ভৈরবীহ্যাবয়োরস্ত সঙ্গম মন্ত্রে", পঞ্চ-ম-কার সাধনার জঘন্য অনাচারে, ধূ ধূ প্রজ্বলিত চিতাকুণ্ডের সর্বগ্রাসী হুতাশনে অথবা তুমুল তরঙ্গ-তুফান-সঙ্কুল গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে—হাঙ্গর-কুম্ভীরের সর্বনাশী কবলে।

## চীনদেশের অবস্থা

চীনদেশের ধর্ম ও ধর্মপ্রবর্তকদিগের সম্বন্ধে নিশ্চয়তার সহিত কোন কথা বলিতে পারা বর্তমান সময় একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই উপলক্ষে আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের মুখে কনফিউসিয়সের (Confucius) নাম সাধারণতঃ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চৈনিক ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতদের সাধারণ মত এই যে, কনফিউসিয়াস কোন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা কোন দিনই করেন নাই। স্বর্গের কোন বাণী বা প্রেরণা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ দাবীও তাঁহার ছিল না। নিজের সাধনার দ্বারা তিনি যে বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, সেই হিসাবে চীনের সামাজিক জীবনের ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সে যাহা হউক, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত ও শিক্ষা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার মতবাদ বলিয়া যে ধর্মপদ্ধতিটা পরবর্তী যুগে চীনদেশে বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সারকথা প্রকৃতি-পূজা ও পূর্বপুরুষের পূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাজা-ঈশ্বর চীনদেশে আদি যুগ হইতে ১৯১১ সালের বিপ্লব পর্যন্ত নির্বিবাদে সর্বপ্রধান ঈশ্বরের আসন গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহা সত্ত্বেও সেকালের দার্শনিক ও নৈতিক মতবাদ হিসাবে কনফিউসিয়সের শিক্ষায় একটা উচ্চ আদর্শের সন্ধান মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইত। কিন্তু "তাও"-

* মনুসংহিতা, ৯ম অধ্যায়।

মতবাদের আবির্ভাবে সেই আদর্শটিও একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধিকেও "তাও"-মতবাদীরা জনসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহাদের প্রভাবে ও রাজশক্তির সাহায্যে যে সময় সাধারণ শিক্ষার সর্বনাশ সাধিত হয় এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে সমগ্র চীন জাতির মন ও মস্তিষ্ককে ব্যাপ্ত করিয়া একটা ঘোরতর অন্ধকারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। তাও-যাজকরা এই সময় নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করেন ইন্দ্রজাল শিক্ষায়, হিপনোটিজম ও মিসম্যারিজমের ন্যায় সম্মোহন বিদ্যার সেবায়। এজন্য তাঁহারা সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং উত্তরাধিকারী ও ছাত্রাভিষিক্তদিগকে তাহা শিক্ষা দিতেন—এই ছিল তাঁহাদের সমস্ত ধর্মকর্মের মূল আদর্শ। বলা বাহুল্য যে, ঐ সব ঐন্দ্রজালিক শক্তির "বুজরুকী" দেখাইয়া এই যাজকরা জনসাধারণের নিকট নিজেদের অতিমানবতা প্রতিপাদন করিতেন এবং মূর্খ চীনবাসীরা তাহাতে সম্মোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বা ভূদেব বলিয়া পূজা করিত, রাষ্ট্র ও সমাজে তাঁহাদের একাধিপত্য স্বীকার করিয়া লইত।

## বৌদ্ধ প্রভাব

গোদের উপর বিষফোড়ার মত, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে চীনদেশে বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাব আরম্ভ হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে চীনদেশে কোন স্বর্গীয় ধর্মগ্রন্থের বা বিধিবদ্ধ ধর্মীয় মতবাদের সন্ধান না পাওয়া গেলেও, ধর্মের নামকরণে নানা অধর্মের প্রাদুর্ভাব এবং সেই পরস্পর-বিরোধী মতবাদগুলির সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে বহুবিধ অকল্যাণের সমাবেশ সেখানে প্রথম হইতেই ঘটিয়াছিল। তাহার উপর সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল—বুদ্ধদেবের দুর্বোধ্য ঈশ্বরবাদ বা অবোধ্য নিরীশ্বরবাদ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে "অহিংসা পরম ধর্মের" অস্বাভাবিক বৌদ্ধ-আদর্শবাদ। তাও-মতবাদ ও কনফিউসিয়স-মতবাদের সঙ্গে এই নবাগত মতবাদের সংযোগ ঘটায় চৈনিক সমাজের ধর্মগত, জ্ঞানগত ও আদর্শগত পতন অপেক্ষাকৃত দ্রুততরই হইয়া উঠিল। নিরীশ্বরবাদের প্রথম প্রচারক বুদ্ধদেব তখন অবতারের বা স্বয়ং পরমেশ্বরের আসনে পাকাপাকিভাবে সমাসীন। সর্বজগতের সর্বজন পালনের মালিক ঈশ্বরের শরণ লইতে বৌদ্ধদের আপত্তির অবধি ছিল না। কিন্তু বুদ্ধদেবের মূর্তি গঠন করিয়া দিবারাত্র অবিশ্রান্তভাবে তাঁহার পূজা করিতে, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিতে, তাহাদের বিবেকে একটুও বাধিত না। বরং ইহাকেই তাহারা মানব-জীবনের সর্বপ্রধান সাধনা বলিয়া মনে করিত।

বুদ্ধদেব যে প্রকৃতপক্ষে নিরীশ্বরবাদ মত প্রচার করিয়াছিলেন, এরূপ কথা জোর করিয়া বলা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত হইবে না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যে সময় তাঁহার আবির্ভাব হয়, ভারতবর্ষে তখন ঈশ্বরবাদের নামে যে সর্বব্যাপী ব্যভিচারের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে ভারতবাসীর জ্ঞান যেরূপ শোচনীয়ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে তাহা অতি ভয়াবহ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ভারতবাসীর মন ও মস্তিষ্ক সে সময়কার লক্ষ লক্ষ ভূত-প্রেত, পিশাচ-পিশাচী, দৈত্য-দানব ও ঠাকুর দেবতার প্রভাবে একেবারেই আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ দেশবাসীর জ্ঞান ও বিবেককে এই ঈশ্বররূপী ৩৩ কোটি উপদেবতার সর্বনাশী প্রভাব হইতে মুক্ত করার জন্যই তিনি সর্বপ্রথমে প্রচার করেন যে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ যুক্তির হিসাবে গ্রাহ্য নহে। এইরূপে বহু ঈশ্বরবাদের বিষময় ফল হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্যই সম্ভবতঃ তিনি ঈশ্বরবাদ বা নাস্তিকতাবাদ সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্ককে কোন গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। পরবর্তী যুগের লোকে ইহাকে বুদ্ধদেবের নিরীশ্বরবাদের সমর্থন বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছে।

যাহা হউক, বুদ্ধ-মত ও বৌদ্ধ-মত মূলতঃ অভিন্ন নহে, কিন্তু বাস্তব ধর্ম ও সত্য বা আদর্শের হিসাবে পরবর্তীকালে ঐ দুইটি যে সম্পূর্ণভাবে পরস্পর-বিরোধী মতবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার অবকাশ একটুও নাই। বুদ্ধদেব চাহিয়াছিলেন নর-পূজা,

প্রতীক পূজা এবং প্রেত ও পুতুল পূজা ইত্যাদি অভিশাপগুলিকে দুনিয়ার পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে, মানুষের জ্ঞান ও বিবেককে এই সমস্ত যুগযুগান্তরব্যাপী কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া দিতে। কিন্তু বৌদ্ধ মতবাদ তাঁহার সমস্ত শিক্ষা ও সাধনার এই প্রাণবস্তুটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া এই সমস্ত কুসংস্কারের প্রতিষ্ঠায় জগতের সমস্ত পৌত্তলিক ও আদিম অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া ফেলিয়াছিল। অন্যান্য দেশের পৌত্তলিকগণ সময় সময় মানুষকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধরা দেশেরে রাজাদিগকে বংশ-পরম্পরাক্রমে স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছিল। কেবল ইহাই নহে, বরং মানুষের সমস্ত অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ঐ রাজা-ঈশ্বরের অধীন বহু সহকারী ঈশ্বরও তাহারা গড়িয়া লইয়াছিল। ফলে দেশে বড় বড় ঠাকুর-দেবতার যত পুতুলমূর্তি বিদ্যমান ছিল, সেগুলি সমস্তই রাজা-ঈশ্বরের কাউনসিল-চেম্বারে মন্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। এমন কি, স্ব-পরিবারের অধস্তন ঈশ্বর-রূপী এই পুতুলগুলির দ্বারা রাজ্যের শাসন-পালনে কোন প্রকার ত্রুটী ঘটিলে রাজা-ঈশ্বর তাহাদিগকে সেজন্য প্রকাশ্যভাবে দণ্ড দিতেও ত্রুটী করিতেন না। এই হইল বৌদ্ধদের পঙ্ক-বিলুপ্ত নিরীশ্বরবাদের পরিণতি। অন্যদিকে বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-ব্যবস্থার প্রধান আদর্শ ছিল অহিংসা। আহারের জন্য, অথবা ঠাকুর-দেবতার পূজার জন্য কোন প্রকার জীব হত্যা করা বৈধ হইবে না, বুদ্ধের "অহিংসা পরম ধর্ম" নীতির ইহাই ছিল প্রধানতম বাস্তব নির্দেশ। কিন্তু, যে কারণেই হউক, বৌদ্ধমতবাদীরা সর্বভুকত্বের প্রতিযোগিতায় বিশ্ব-মানবকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া ফেলিয়াছে। পশু, পক্ষী ও সরীসৃপের মধ্যে বৌদ্ধের অভক্ষ্য অবধ্য কিছুই নাই।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর আবির্ভাবকালে এই বৌদ্ধ মতবাদ তাহার সমস্ত অকল্যাণকে সঙ্গে লইয়া মহাচীনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছিল। তাও-মতবাদের সঙ্গে এই মতবাদের সংমিশ্রণে তখন সেখানে মানুষের জ্ঞান ও ধর্ম কিরূপ শোচনীয়ভাবে অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

## পারস্যের অবস্থা

ভারতীয় আর্যদের বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সহিত পার্সীদিগের প্রাথমিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের বহু বিষয়ে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা যায়। বেদের মিত্র বরুণাদি দেবতার পূজা পার্সিক ধর্মশাস্ত্রে অবিকল বিদ্যমান আছে। ভারতীয় আর্যদিগের ন্যায় প্রকৃতি পূজাই ছিল তাহাদের প্রাথমিক ধর্মের প্রধান অঙ্গ; এমন কি, বৈদিক দেব-দেবীর নাম পর্যন্ত আজও পার্সিকদিগের ধর্মীয় সাহিত্যে প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় কেবল দেব ও অসুর শব্দের ব্যবহারে—অর্থাৎ ভারতের "দেব" পার্সীদিগের ব্যবহারে "দেও" বা অসুর অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে পার্সীরা 'অহুর' (বা অসুর) শব্দটাকে ব্যবহার করিয়া থাকেন দেবতা অর্থে। বৈদিক হিন্দুদিগের ন্যায় পার্সীদের দেবতার সংখ্যাও ঠিক ৩৩টি নির্ধারিত ছিল।*

আভেস্তা ও গাথা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে অনুমান হয়, জরদশতই পারস্যের পয়গম্বর বা আপ্তপুরুষ ছিলেন। ঐশিক বাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। জরদশত পার্সিকদিগকে আর্য জাতির আদি যুগের অন্ধবিশ্বাস হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে এক, অদ্বিতীয় ও নিরাকার ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় যে, জরদশতের পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাপ্ত ঐশিক বাণী এবং তাঁহার সমস্ত উপদেশ ও গাথা নানা কারণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এমন

---

* বেদে দেবতার সংখ্যা ৩৩টি মাত্র, পুরাণকারেরা তাহাতে ৭টা শূন্য যোগ করিয়া দিয়া উহাকে ৩৩ কোটিতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। দেখুন—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—২য় ভাগ।

কি, আভেস্তার ভাষা পর্যন্ত পারস্য দেশ হইতে নিশ্চিহ্নভাবে লোপ পাইয়া যায়। তখন পূর্বকার সমস্ত অন্ধকার পারস্য দেশে আবার ফিরিয়া আসে এবং ধর্ম-ব্যবসায়ী পণ্ডিত-পুরোহিতরা সেই অন্ধকারের সুযোগে যুগের পর যুগ ধরিয়া নানা অনাচারের সৃষ্টি করিয়া যাইতে থাকেন। স্পষ্ট ও নিরাবিল তাওহীদ-জ্ঞানের অভাব ঘটিলেই পণ্ডিত-পুরোহিতের অন্ধ-প্রতিভা নানা প্রকার পৌত্তলিক-দার্শনিকতার আবিষ্কার করিতে বাধ্য হইয়া যায়, ইহা বিশ্ব-ইতিহাসের সাধারণ অভিজ্ঞতা। পার্সীদের বেলায়ও এ অভিজ্ঞতার কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটে নাই। বলা বাহুল্য যে, আদিম যুগে বা অজ্ঞ মানবের সরল সহজ প্রতীক পূজা ও পৌত্তলিকতার তুলনায় পণ্ডিত সমাজের পৌত্তলিক-দার্শনিকতা বিশ্ব-মানবের জ্ঞান মুক্তির পথে চিরকালই কঠোরতম বিঘ্নরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, এখনও হইতেছে। তাওহীদ জ্ঞানের অভাবে ও এই শ্রেণীর দার্শনিকতার প্রভাবে, অন্যদিকে নানা প্রকার প্রতীক পূজা ও প্রকৃতি পূজার সঙ্গে সঙ্গে, পারস্যে সৃষ্টি হইয়া গেল ইজদ ও আহরমন নামক মঙ্গল ও অমঙ্গলের সৃষ্ট দুইটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং امشا — سپنتا বা ষড়দেবাত্মা—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি কার্যনির্বাহের সমস্ত শক্তি ও অধিকার যাঁহাদের হস্তগত হইয়া আছে।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে সমগ্র পারস্য দেশ হইতে জরদশতের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্ম ও নীতিজ্ঞানের দিক দিয়া পারস্যের তখন যে ঘোর অধঃপতন ঘটিয়াছিল, জগতের সমসাময়িক ইতিহাসেও তাহার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। হযরত নিজের নবুয়ৎ প্রকাশ করেন, পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁর শাসন যুগে। নওশেরওয়াঁর পিতার নাম কোবাদ। এই কোবাদের সময় বিখ্যাত বিপ্লবধর্মী মজ্দকের অভ্যুত্থান ঘটে। মজ্দক ঘোষণা করেন যে, জ'ন, জমিন, জ'র অর্থাৎ কামিনী, কাঞ্চন ও ভূমি লইয়াই মানুষের মধ্যে যত বিপদ-বিসংবাদ আরম্ভ হয় এবং মানুষ সকল প্রকার মহাপাতকে লিপ্ত হয় এই তিনটি উপকরণকে অন্যের তুলনায় অধিক পরিমাণে সম্ভোগ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া। অতএব কোন প্রকার বিচার-বিবেচনা না করিয়া নিয়ম করিতে হইবে যে, স্ত্রীলোক মাত্রই পুরুষ মাত্রের উপভোগ্যা—বিবাহের বন্ধন বা আত্মীয়তার বাধা, এমন কি, স্ত্রীলোকদের সম্মতি-অসম্মতিও এই শয়তানী ভোগ-বিলাসে কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারিবে না। সম্রাটের ধনাগার ব্যতীত, দেশের সমস্ত সোনা-রূপা ও ভূ-সম্পত্তির উপরও সর্বসাধারণের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। সম্রাট কোবাদ, যে কোন কারণে হউক, মজ্দকের এই জঘন্য মতবাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে থাকেন।* ইহার ফলে পারস্য দেশে কয়েক যুগ ধরিয়া শয়তানের পূর্ণ রাজত্ব প্রচণ্ডভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। পরবর্তী যুগে নওশেরওয়াঁ এই সর্বনাশ স্রোতের গতিরোধ করার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু তাহার ফলে এক মহাপাতকের প্রতিক্রিয়ায় আর এক মহাপাতকের সৃষ্টি হইয়াছিল মাত্র। এছলামের সমাধান সমাগত না হওয়া পর্যন্ত, পারস্য দেশ ধর্ম, সুনীতি, সদাচার ও সামাজিক শান্তি লাভ করিতে আদৌ সমর্থ হয় নাই।

## ইহুদী জাতি

ইহুদী জাতির অবস্থাও তখন শোচনীয়—একদিকে তাহারা কর্মবিমুখ হইয়া অহর্নিশ কেবল মছিহের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। মছিহ আসিয়া তাহদের মুক্তিসাধন করিবেন, সমগ্র জগতের উপর আবার ইহুদীদিগের রাজত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন, এই আশায় অলসভাবে বসিয়া আছে। অন্যদিকে, এই আলস্য ও কর্মবিমুখতার ফলে স্বর্গের সমস্ত অভিশাপ

---

* দেখুন—মেলাল, শাহরস্তানী ২—৮৬ Ency. Britannica. 14th Edition. Art. "Persia" সকভাগে মাজদাকের ও জরদশত নাম প্রভৃতি।

আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে পুঞ্জীকৃত হইয়া যাইতেছে। তাহারা তখন নিজেদের ধর্মশাস্ত্র হারাইয়া, হযরত মুছার মূল উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ তখন তাহারা আত্মহারা হইয়া সর্বস্বহারা হইয়া পড়িয়াছে। পৌরহিত্য ধর্ম ও পৌরাণিক আজগুবী গল্পগুজব লইয়া নাড়াচাড়া করা, নিত্য নিত্য ব্যবস্থা শাস্ত্রের বজ্রবাঁধনকে কঠোর হইতে কঠোরতরে পরিণত করা, তখন তাহাদের ধর্মের প্রধান সাধনা। এজন্য আত্মদ্রোহ, বিসংবাদ ও শাস্ত্রীয় জালিয়াতির ব্যবসা তাহাদের মধ্যে উৎকট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খ্রীষ্টানদিগের সহিত বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, যীশুর জন্ম ও স্বর্গারোহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত খ্রীষ্টানী কুসংস্কারগুলি সম্বন্ধে তাহারা অতি কঠোর ও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। জারজ, শাস্ত্রদ্রোহী, কাফের ইত্যাদি বলিয়া—ধর্মদ্রোহের নিমিত্ত অভিশপ্ত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পাপাত্মা বলিয়া, যীশু সম্বন্ধে তাহারা অতি নিকৃষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। পুরোহিত বা রাহেবগণই বস্তুতঃ তখন তাহাদের ঈশ্বর, তাহাদের রচনাগুলিই তখন তাহাদের শাস্ত্র ও মানুষের জ্ঞান বিবেক ও স্বাধীন চিন্তা তখন ঐ কল্পিত শাস্ত্রের নিষ্পেষণে পড়িয়া, মুমূর্ষু অবস্থায় মুক্তিদাতার জন্য আর্তনাদ করিতেছিল।

## খ্রীষ্টান ধর্ম

খ্রীষ্টান-জগতের অবস্থা তখন আরও শোচনীয়। যীশুর প্রকৃত শিক্ষা তখন জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং কতিপয় কল্পিত কিংবদন্তি মাত্র তাহার স্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাহারা তখন শাস্ত্রের নামে এবং সাধুগণের দোহাই দিয়া এই বিশ্বাসের প্রচার করিতেছিল যে, পিতা সম্পূর্ণ ও একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর, পুত্র যীশু একজন স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং পবিত্রাত্মা আর একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর। এক নম্বর ঈশ্বরের আদেশ মতে, দুই নম্বর ঈশ্বর যীশুর মাতা মেরী, তিন নম্বর ঈশ্বর। পবিত্রাত্মা কর্তৃক গর্ভবতী হইয়া যীশুকে প্রসব করিয়াছিলেন। অথচ এই তিনটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর আবার একত্রে এক সম্পূর্ণ ঈশ্বর। তখন পৌত্তলিকতার স্রোত অতি প্রচণ্ড বেগে তাহাদিগকে অধঃপতনের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। যীশুর সঙ্গে তাঁহার মাতা মেরীর মূর্তিপূজা তখন খ্রীষ্টানদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত। ক্রমে ক্রমে পল, পিটার্স প্রভৃতি 'সাধুগণের' প্রতিমূর্তিও ভজনালয়ে স্থাপিত এবং প্রকাশ্যভাবে পূজিত হইতে লাগিল। নামে খ্রীষ্টান হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা পৌন-ধর্মই গ্রহণ করিয়াছিল। খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাহাদিগের মধ্য হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। তখন সভা করিয়া, ভোট লইয়া শাস্ত্র নির্বাচন করা হইত। স্বর্গের পাসপোর্ট (ছাড়পত্র) একমাত্র পোপের আলমারীর মধ্যে বন্ধ হইয়া ছিল। পোপ ঈশ্বরের অবতার বা স্বয়ং ঈশ্বর, সর্বময় কর্তা। খ্রীষ্টানদিগের দ্বারা সৃষ্ট, পুষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা ও মূর্খতার বিপক্ষে টুঁশব্দটি করিবার অধিকার তখন কাহারও ছিল না। এজন্য ধর্মের নামে যে সকল নরহত্যা এবং অত্যাচার করা হইয়াছে, সে সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার পাঠ করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। জগতে অনাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য, ইহারা এই অভিনব মতের সৃষ্টি করে যে, ইহ-জগতে কি আর পর-জগতে কি, কর্মফল বলিয়া কিছুই নাই, পাপ-পুণ্যের দণ্ড বা পুরস্কার নাই। যীশু সকলের পাপভার লইয়া আত্মবলিদান করিয়াছেন, তাহাতেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করিলেই—একদম মুক্তি। শত মহাপাতকের জন্যও আর তোমাকে ইহ-পরকালে একবিন্দুও ক্লেশ পাইতে হইবে না। এই সকল বিশ্বাস লইয়া তাহারা দুনিয়াময়, অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারকে গাঢ়তম করিতেছিল। ক্রীতদাসদিগের প্রতি তাহাদের ব্যবহার কিরূপ নির্মম ছিল, নারী জাতিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং এছলাম প্রচারিত হওয়ার পর একমাত্র এছলামেরই পুণ্য প্রভাবে খ্রীষ্টান ধর্মের ও তাহাদিগের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কিরূপ সংস্কার সাধিত হইয়াছিল যথাস্থানে তাহা প্রমাণাদিসহ সম্যকরূপে প্রদর্শিত হইবে।

ফলতঃ জগতে তখন গাঢ় অন্ধকার—ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার সর্বব্যাপী সূচীভেদ্য অন্ধকার। সে অন্ধকারে সহস্র প্রকার হিংস্র জন্তুর শয়তানী বুভুক্ষা, জ্বালাময় বিষ নিশ্বাস,—লক্ষ দৈত্য-দানবের তাণ্ডব নৃত্য—'আজাজীলের' বীভৎস লীলা। নিজের সমস্ত অকল্যাণ ও বিভীষিকা লইয়া যখন এই অন্ধকার সকল অমঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছিল, তখন প্রকৃতি স্বরচিত ইতিহাসের একটি পুরাতন পৃষ্ঠা উন্মোচন করিয়া শূন্য স্থানে নূতন নাম বসাইবার জন্য আবেশ-অবশ দেহে আরব দেশ-মাতৃকার মুখপানে তাকাইলেন। অমাবস্যা যেন বলিল, আমি নকিব নবীন সুধাকরের আগমনবার্তা ঘোষণা করিতেছি।

## আরবের শোচনীয় অবস্থা

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল এবং হযরত তাহার সংস্কার সাধন করিয়া তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের কোন্ উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহার বিস্তৃত আলোচনা উপসংহার ভাগে করা হইবে। আরব দেশের অতি প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৃত্তান্তের আলোচনায়ও, আমরা সময়ক্ষেপ করিব না। কারণ, আমাদিগের আলোচ্য বিষয়ের জন্য তাহার বড় একটা দরকার নাই। বিশেষতঃ পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, আরবের বিভিন্ন ভগ্নস্তূপ ও বিভিন্ন স্থলের ভূগর্ভ হইতে যে সকল শিলালিপি ও অন্যান্য নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন* তৎসংক্রান্ত আলোচনা ও বাদানুবাদ এখনও শেষ হয় নাই। কোরআনের অনুবাদে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

হযরতের জন্মগ্রহণের প্রাক্কালে, সমস্ত আরব ধর্মহীনতা এবং নানা প্রকার অনাচার-অত্যাচারে জগতের সমস্ত অনাচারকে পরাজিত করিয়া ফেলিয়াছিল। পৌত্তলিকতা, জড়পূজা ও অংশীবাদ বহুদিন হইতেই তাহাদের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাহারা আল্লাহর নাম অনবগত ছিল না বটে কিন্তু সকল দেশের পৌত্তলিকগণ যেমন মাথার উপর একজন 'উপরওয়ালা'তে মুখে বিশ্বাস করিয়াও, পৌত্তলিকতায় ও অংশীবাদে লিপ্ত হইয়া থাকে, আরববাসিগণও সেইরূপ মুখে আল্লাহর নাম করিলেও নিজেদের স্বহস্ত নির্মিত পুতুল-প্রতিমাতে ঈশ্বরত্বের সকল গুণের সমস্ত শক্তির আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিত। এই পূজাতে তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল,—পার্থিব আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া বা পার্থিব কল্যাণ লাভ করা। পরকাল বা পরজীবনে তাহারা বিশ্বাস করিত না। আত্মা যে অবিনশ্বর এবং মৃত্যুর পরও যে তাহা মানব-জীবনের কর্ম-ফল-জনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করে, পাশবিক বৃত্তিসমূহের চরিতার্থ করা ব্যতীত মানব জাতির জন্য যে একটা নীতি ও ধর্মের শাসন আছে, এ-সকল কথা তাহারা জানিত না,—বুঝিত না। কোরআনে আরববাসীদিগের প্রতিবাদ স্থলে যে সকল আয়ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় যে, তখনকার আরব কতকটা নাস্তিক, কতকটা পৌত্তলিক ও কতকটা অংশীবাদী ছিল। পূর্ব-পুরুষদিগের সম্মান করিতে করিতে, ক্রমে তাহাদের সেই সম্মান ও ভক্তি ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। এমন কি, কালে অংশীবাদ ও পৌত্তলিকতার প্রধানতম শত্রু হযরত এবরাহিমের প্রস্তরমূর্তিও তাওহীদের আদিকেন্দ্র কা'বা মছজিদে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কথিত আছে যে, সে সময় কা'বায় ৩৬০টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মক্কাবাসী নিত্য নূতন বিগ্রহের পূজা করিত। কা'বা হইতে দূরে অবস্থিত পল্লীর লোকেরা সেখান হইতে প্রস্তরখণ্ড লইয়া গিয়া আপনাপন গ্রামে বা গৃহে সেগুলিকে 'প্রতিষ্ঠিত' করিত এবং আমাদের দেশের শালগ্রাম শিলার ন্যায় সেগুলির পূজা করিত। গ্রহবৈগুণ্যাদির শান্তির জন্য

* জর্জি জিদান, আল-আরব ভূমিকা।

কল্পিত ভূত-প্রেতাদি পূজা পদ্ধতিও আরবদেশে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। পুতুল-পূজা, প্রেত-পূজা ইত্যাদি ব্যতীত বড় বড় গাছপালার পূজা করার প্রথাও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।* মন্ত্র, তন্ত্র, যাদু, টোটকা দ্বারা এবং তাবিজ ও কবচ ধারণ করিয়া 'উপরি দৃষ্টি' হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিত। ধর্মের ও পূজা-পাঠের আবশ্যক তাহাদের কেবল এই সকল কারণেই ছিল। নচেৎ তাহাদের ধর্মের সহিত, পরকালের ও আধ্যাত্মিকতার বা নীতির কোনই সম্বন্ধ ছিল না। দুনিয়ার যত কুসংস্কার, যত অন্ধবিশ্বাস, সমস্তই তাহাদের মধ্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশাচার তাহাদের প্রধান ধর্ম, তাহা যতই মন্দ হউক না কেন, তাহারা তাহা ত্যাগ করিতে পারিত না। 'আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এইরূপ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাহা কোন মতেই ত্যাগ করা যাইতে পারে না'—জ্ঞান ও বিবেকের শোচনীয় অধঃপতনের এই সমস্ত দা'নতই তাহাদিগের মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

যাহাদের ধর্মজীবনের অবস্থা এইরূপ, তাহাদিগের নৈতিক অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অধিক কথা কি, ব্যভিচার যে দূষণীয়, এরূপ চিন্তাও বোধ হয় তাহারা করিতে পারিত না। পুং মৈথুন, নারীর অস্বাভাবিক মৈথুন ও পশু মৈথুন, এ সকল তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ও নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত। একদিকে একজন পুরুষ অসংখ্য নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া বা তাহাদিগকে বলপূর্বক স্ত্রী ও দাসীতে পরিণত করিয়া নিজের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিত—অন্যদিকে একই নারী একই সময় বহু পুরুষের সহিত পরিণীতা হইয়া পৃথিবীতে নরকের সৃষ্টি করিত। স্বীয় গর্ভধারিণী জননী ব্যতীত, অপর কোনও নারী, এমন কি সহোদরা ভগ্নী ও বিমাতা পর্যন্ত তাহাদের অগম্য ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর, তাহার অন্যান্য তৈজসপত্র ও পশুপালের ন্যায়, পুত্রগণ তাহার স্ত্রী কন্যাদিগকেও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইত এবং অবাধে সেগুলিকে 'ভোগ'-দখল করিত। ফলতঃ ব্যভিচার তখন নির্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত এবং তখনকার আরবগণ এই ব্যভিচারেরও এমন শোচনীয় পরিণতি করিয়াছিল, যাহা দেখিয়া শয়তানের শরীরও বুঝি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত।

সেকালে, অন্যান্য দেশের ন্যায়, আরবেও দাসদাসীদিগের অবস্থা অত্যন্ত মর্মবিদারক হইয়াছিল। কোন নরনারী ও বালক-বালিকাকে, বলপূর্বক ধরিয়া বা চুরি ও লুণ্ঠন করিয়া আনিতে পারিলেই, সে বংশ-পরম্পরাক্রমে লুণ্ঠনকারীর দাসদাসীতে পরিণত হইয়া যাইত। এই দাসদাসীগুলি প্রভুদিগের খেয়াল ও পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইত। প্রভু ইচ্ছা করিলে, কোন বন্দী দাসকে লইয়া ঠাকুর-বিগ্রহের দরবারে বলিদানও করিতে পারিত। প্রভুর ইচ্ছাক্রমে আবার ঐ হতভাগা নরনারী ও বালক-বালিকাগণ, আরবের হাট-বাজারে ছাগ-মেষাদি পশুর ন্যায় বিক্রীত হইয়া যাইত। একদিকে এই অবস্থা, অন্যদিকে এই হতভাগাদিগকে কঠোর পরিশ্রমের কার্যে নিযুক্ত করা হইত। তাহারা বংশানুক্রমে কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে আয় করিত, তাহাতে তাহাদের কোনই অধিকার ছিল না, সে সমস্তই প্রভুর। কদর্য খাদ্য ও সামান্য পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে চিরকালই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। ইহাতে আবার যদি কোনক্রমে কোন কার্যে সামান্য একটু ত্রুটি হইয়া যাইত, তাহা হইলে কোড়ার আঘাতে তাহাদের পিঠের চামড়া ফাটিয়া দর-বিগলিত ধারে রুধির-ধারা নির্গত হইতে থাকিত।

নারী-নির্যাতনের এই নির্মম চিত্র এবং নিজেদের পাশবতার এই সব বীভৎস আদর্শ যুগপৎভাবে তাহাদিগের চক্ষুকে ঝলসিত করিয়া দিত কেবল সেই সময়, যখন তাহারা এই অবস্থার মধ্য দিয়া নিজেদের কন্যাদিগের ভবিষ্যৎ দুর্গতির স্পষ্ট দৃশ্য দর্শন করিতে পারিত। কাজেই কন্যাদিগকে হত্যা করিয়া, তাহাদিগকে জীবন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া, তাহারা এই আপদের দায় হইতে মুক্তি পাইবার

* বলুগুল-আরব, ১—৩৮২।

চেষ্টা করিত। এজন্য পিতা, পল্লী হইতে দূরবর্তী প্রান্তরে পূর্ব হইতে গর্ত খুঁড়িয়া রাখিত এবং হতভাগিনী জননীকে প্রবঞ্চিত করিয়া কন্যাকে লইয়া সেই গর্তে ফেলিয়া দিত। তাহার পর উপর হইতে গুরুভার প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিত। আতঙ্কে আড়ষ্ট শিশুকন্যা রক্ষা পাইবার জন্য বাপ বাপ করিয়া আর্তনাদ করিতেছে, আর পশ্বাধম পিতা উপর হইতে পাথর মারিয়া তাহার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, এই মর্মবিদারক দৃশ্যের বহু বিস্তৃত বিবরণ হাদীছে বর্ণিত আছে। কালে তাহাদের রুচি এতই বিকৃত হইয়া যায় যে, কেবল ভরণ-পোষণের ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য তাহারা শিশু কন্যাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিত।

মদ্যপান ও জুয়াখেলা আরবের আনন্দ ও আমোদের বস্তু—সর্বপ্রধান উপকরণ। সে সময় মদ্যের স্রোতে সমস্ত আরব দেশই ভাসিয়া যাইতেছিল। মদ্যপান ও জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাবের স্বাভাবিক কুফলগুলি তাহাদের মধ্যে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিল। লুণ্ঠন ও নরহত্যা তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবসায়। এই সকল কারণে গৃহ-যুদ্ধ তাহাদের মধ্যে লাগিয়াই ছিল।

খ্রীষ্টান ও ইহুদীগণ বহুদিন হইতে আরব দেশে অধিবাস স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ধর্ম আরবের কোনই সংস্কার করিতে পারে নাই। বরং ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, তাহাদিগের প্রতিবেশ ফলে, আরবের অন্ধকার অধিকতর গাঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই সকল দোষের সঙ্গে সঙ্গে আরবের যে কয়েকটা গুণ, বা বিশেষত্ব ছিল, যথাস্থানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

ذات پاک تو چو در ملک عرب کرده ظهور
زان سبب آمده قرآن بزبان عربی

### শেষ নবী আরবে আসিলেন কেন ?

এইরূপে, অন্ধকার যখন পূর্ণ-পরিণত হইয়া পাপের সকল বিভীষিকা লইয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছিল—যখন শয়তানের তাণ্ডবলীলায় জগতের প্রত্যেক মহাদেশ অতি জঘন্যভাবে কলঙ্কিত ও কলুষিত হইতেছিল—যখন মিথ্যা আসিয়া সত্যের, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার আসিয়া জ্ঞানের, পুরোহিত ও যাজকের বাক্য আসিয়া শাস্ত্রের, পাপ আসিয়া পুণ্যের এবং ব্যভিচার আসিয়া প্রেমের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল—যখন এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ, একই সময়ে একই দুরবস্থায় পতিত হইয়া ত্রাণকর্তার অপেক্ষায় একইভাবে কাতর নয়নে স্বর্গের দিকে তাকাইয়া ছিল—এবং যখন দুর্ধর্ষ মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত আরবীয়দিগের পাশব-জীবনের বিভীষিকা সমূহ শয়তানকেও ভীত, ত্রস্ত ও লজ্জিত করিয়া তুলিতেছিল—সেই সময় খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে, মানবের এই শোচনীয় অধঃপতন এবং ধর্মের এই মর্মন্তুদ গ্লানি দর্শন করিয়া, স্বর্গের সিংহাসন—আল্লাহর আরশ—প্রেমের অভিনব পুলকে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সেই প্রেমময়ের মঙ্গল করাঙ্গুলি, আবার এই ধরাধামে প্রেম-পুণ্যের সাম্রাজ্য স্থাপন করার জন্য স্বর্গের পুণ্যালোকে ধরার বিভীষিকাময় তিমির-পটলকে বিদূরিত করার জন্য তপ্ত তাপিত ধরাধামে, মরণের বিষবাত বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে, কল্যাণের জীবনের, প্রেমের পুণ্যের, ন্যায়ের ধর্মের, জ্ঞানের বিশ্বাসের এবং শক্তির ও মুক্তির স্নিগ্ধ-মধুর ও শান্ত-শীতল পুণ্য-পীযুষধারা প্রবাহিত করার জন্য সঙ্কেত করিতেছিল।

একই সঙ্গে এবং একই তারের বন্যায় ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়াকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য সেই করুণাময়ের ন্যায় দৃষ্টি আরবের উপরই নিপতিত হইল। কারণ জগতের ভাবী ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা ও শান্তিকর্তার জন্য আরবই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান ছিল। আরব ব্যতীত অন্য কুত্রাপি তাঁহার আর্বিভাব হইলে এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারিত না।

## মক্কা পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত

একবার দুনিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ভৌগোলিক হিসাবে আরবদেশ, বিশেষতঃ মক্কা নগরী, মোটামুটিভাবে ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা ইহাও দেখিতে পাইব যে, আরবদেশ হইতে যত সহজে ও যেরূপ অল্প সময়ে, উভয় জলপথ ও স্থলপথ দ্বারা, পৃথিবীর সকল প্রান্তে গমনাগমন করা যায়, অন্য কোন দেশ হইতে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। এই জন্যও জগতের মুক্তিদাতার পক্ষে ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলস্থিত আরবদেশে আবির্ভূত হওয়াই সঙ্গত হইয়াছিল।

## আরবের অন্যান্য বিশেষত্ব

এস্থলে আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। যে সময়ে পৃথিবীতে একজন সংস্কারক ও ত্রাণকর্তার আবশ্যক হইয়াছিল, তখন আরব ব্যতীত জগতের প্রত্যেক জাতিই মানুষের রচিত এক-একটা ধর্মপদ্ধতি বা ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণ করিতেছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জগতে যতগুলি প্রধান প্রধান জাতি ছিল, তাহাদের প্রত্যেকটিই মানুষের রচিত কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসপূর্ণ তথাকথিত ধর্মের চাপে নিজেদের মনুষ্যত্বকে পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়াছিল। আরবেও কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের ইয়ত্তা ছিল না সত্য, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আরবগণ কোনকালেই বর্ণিতরূপ ধর্মশাস্ত্র-বিশেষের ব্যবস্থা মান্য করিয়া চলে নাই। তাহারা প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া তাহার বৈচিত্র্যগুলিকে বিস্মিত নয়নে অবলোকন করিত এবং নিজেদের সামান্য সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তাহার যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিত, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিত। প্রাগৈছলামিক যুগের আরবদিগের সকল প্রকার জ্ঞান ও শিল্পের মূলে এই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। মূলতঃ আরব ভ্রান্ত ও কুসংস্কারগ্রস্ত এবং নানাবিধ মহাপাতকে জর্জরিত হইলেও, তাহাদের ঐ ভ্রান্তি ও কুসংস্কার মহাপাতকরূপে বিদ্যমান ছিল—ধর্মের ছদ্মবেশে নহে। এ-অবস্থায় মানবের রোগ কঠিন ও দুঃসাধ্য হইলেও সম্পূর্ণ নিরাশা-ব্যঞ্জক নহে। কিন্তু তখন অন্যান্য দেশের অবস্থা ছিল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই সমস্ত দেশের লোক যে সকল পাপে ও অনাচারে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল গুরু-পুরোহিত, ধর্মযাজক ও গ্রন্থকারগণের দাসত্ব। বিবেক বলিয়া তাহাদের কিছুই ছিল না, স্বাধীন চিন্তার অধিকার পর্যন্ত তাহাদের ছিল না। অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, শাস্ত্রের নামে কথিত এবং ধর্মের অন্তরালে প্রচারিত প্রত্যেক অনাচার ও মহাপাতককে তাহারা ঘাড় হেঁট করিয়া অবশ্য প্রতিপাল্য অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। এমন কি, স্বাধীনভাবে সে সকল বিষয়ের ন্যায়-অন্যায় আলোচনা করিয়া দেখিবার অধিকার যে মানুষের আছে, এ চিন্তাও তাহারা কখনও করিতে পারিত না। বিবেকের এই ঘৃণিত দাসত্বই মানবের সকল প্রকার অধঃপতনের মূলীভূত কারণ। পৃথিবীর প্রাচীন জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, ঘটনা-পরম্পরায় আবর্জনারাশিকে বাদ দিয়া তাহার অন্তরালে নিহিত ইতিহাসের সার শিক্ষাগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে এই উক্তির সত্যতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

পৃথিবীর সকল অনাচারের প্রতিকার ও সকল অবিচারের প্রতিবিধান করার জন্য যিনি আসিবেন, তাঁহার এমন দেশে আবির্ভূত হওয়া চাই, যেখানে তিনি অল্প চেষ্টাতেই নিজের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কতিপয় উপযুক্ত সহচরকে সহায়রূপে পাইতে পারেন। আরব ব্যতীত আর কুত্রাপি ইহা সম্ভব ছিল না। অন্য সকল দেশে তখন পাপের ও পুরোহিতগণের প্রচণ্ড প্রতাপে, মানুষের জ্ঞান ও বিবেক সম্পূর্ণরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তাআলার মঙ্গলাশীর্বাদে আরবদেশ-মাতৃকাই অভিষিক্ত হইল।

## আরবের স্বাধীনতা

মানুষ নিজ পাপের প্রতিফল স্বরূপ যত প্রকারে অভিশাপগ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে পরাধীনতাই সর্বাপেক্ষা জঘন্য, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং মনুষ্যত্বের দিক দিয়া তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর। পরাধীন ব্যক্তির বাহিরের মানুষটি জীবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তাহার ভিতরের মানুষটি—একেবারে মরিয়া না গেলেও—অসাড়, নিস্পন্দ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। বিদেশী জাতির বা বিজাতীয় রাজার অধীনতায় কালযাপন করিলেই যে কেবল মানব এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহা নহে। বরং স্বজাতির কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা স্বদেশের কোন একটা সম্প্রদায়-বিশেষের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসননীতির অধীনতায় বহুদিন অবস্থান করিতে থাকিলেও মানব-সমাজকে এই শোচনীয় দুর্দশায় উপনীত হইতে হয়। কিন্তু সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে, আরবদেশ ও আরবীয় জাতিসমূহকে কখনই এরূপ কোন প্রকারের হীন ও অধীন-জীবন যাপন করিতে হয় নাই—তাহারা চিরস্বাধীন, চিরমুক্ত। আরব সম্বন্ধে যত প্রকার ইতিহাস ও পুরাণ কথা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় সমস্বরে এই উক্তির সত্যতা ঘোষণা করিতেছে। এমন কি, যে সকল 'মহানুভব' খ্রীষ্টান লেখক, নিজেদের গুপ্ত অভিসন্ধি সফল করার জন্য আরবদেশ এবং মুছলমান জাতির ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও এই কথাটি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাঠকগণ ইহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন।

যিনি জগতের মানব সমাজের মুক্তির জন্য, যুগপৎভাবে তাহাদের দেহ ও মনকে এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাবতীয় পার্থিব শক্তির অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য আবির্ভূত হইবেন, আরবের ন্যায় সম্পূর্ণ মুক্ত ও চিরস্বাধীন দেশ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি তাঁহার প্রথম আবির্ভাব হইতে পারে না। স্বাধীন দেশ-মাতৃকার ক্রোড়ে প্রতিপালিত স্বাধীন আরব, স্বাধীন আরবের অনবনমিত মস্তক, তাহার গৌরব-গরিমায় স্ফীত স্বাধীন বক্ষ, তাহার স্বাধীন বক্ষের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং তাহার অবিচল কর্মশক্তি প্রভৃতি সমস্ত সদগুণ লইয়া এমন এক সাধকদল গঠনের আবশ্যক ছিল, যাহারা সেই ভাবী মুক্তিদাতার অগ্রে পশ্চাতে ও দক্ষিণে বামে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে—আমরা নিজদিগকে স্বর্গের আহ্বান, সত্যের সেবার জন্য তাঁহার দূতের মারফতে বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। তখন আরব ব্যতীত আর কুত্রাপি এইরূপ লোকমণ্ডলীর আবির্ভাব আশু সম্ভবপর ছিল না। তাই আল্লাহ্র ন্যায়বিচারে আরবই জগতের মুক্তিদাতারূপে নির্বাচিত হইল। এই নিমিত্ত যুগযুগান্তর হইতে পৃথিবীর সকল ভাববাদী সেই পুণ্য-জ্যোতিঃ সন্দর্শন মানসে ফারানের পবিত্র পর্বতশিখরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শান্তিকর্তার সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।*

مرحبا سید مکی مدنی العربی

دل و جان باد فدایت چه عجب خوش لقبی

---

* দেখুন—সেলের কোরআন, ভূমিকা ১০ পৃষ্ঠা ও বাইবেল প্রভৃতি।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

ولد الحبيب ومثله لا يولد

---

ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا

دعائے خلیل و نوید مسیحا

## হযরতের আবির্ভাব

৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বানি-হাশেম গোষ্ঠী কোরেশ বংশের মধ্যে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল; এই সময় কা'বা মছজিদের সেবায়েতের সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ঐ গোষ্ঠীর স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছিল। আরবের দুইটি প্রধান বংশ, বানি-এছমাইল বা বানি-আদনান এবং বানি-কাহতান বা বানি-একতান। বানি-আদনান হযরত এছমাইলের মধ্যবর্তিতায় হযরত এবরাহিমের বংশধর, সুতরাং হযরত এবরাহিমের সেই সকল প্রার্থনা—হযরত এবরাহিমের প্রথমা মহিষী এছমাইল-জননী বিবি হাজেরার প্রতি আল্লাহ্‌র সেই প্রতিশ্রুতি—বানি-এছরাইল বংশের ভ্রাতাদিগের (বানি-এছমাইলগণের) মধ্য হইতে "মুছার ন্যায়" ভাববাদী উত্থাপিত করিবার সেই ওয়াদা, নিজের পরলোক গমনের পর শান্তিকর্তার আগমন সম্বন্ধে মহাত্মা যীশুর সেই ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

সোমবার, ৯ই রবিউল্-আউওল, ২০শে এপ্রিল, ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ৬২৮ সংবৎ, ব্রাহ্ম মুহূর্ত বা ছোব্‌হ্-ছাদেকের অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করিলেন।

## জন্মের তারিখ

হযরতের জন্ম-তারিখ নির্ধারণে ঐতিহাসিকগণ নানাপ্রকার বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাবারি, এবনে-খাল্‌দুন, এবনে-হেশাম, কামেল প্রভৃতি ১২ই রবিউল্-আউওল তারিখ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আবুল-ফেদা বলেন, ঐ মাসের ১০ই তারিখে হযরতের জন্ম হইয়াছিল। তবে সমস্ত লেখকই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, রবিউল আউওল মাসে সোমবারে হযরতের জন্ম হয়। আধুনিক মুছলমান লেখকগণ সূক্ষ্মভাবে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১২ই বা ১০ই তারিখ সোমবার পড়িতে পারে না।* উহা ৯ই ব্যতীত আর কোন তারিখ হইতে পারে না। মিসরের স্বনামখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মাহমুদ পাশা ফালকী, স্বতন্ত্র একখানা পুস্তক রচনা করিয়া ইহা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পাশা মহোদয়ের প্রমাণগুলির সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলেন ঃ

(১) ছহী হাদীছে** বর্ণিত আছে যে, হযরতের শিশুপুত্র এবরাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্য গ্রহণ হইয়াছিল।

(২) হিজরী ৮ম সালের জিলহজ্জ মাসে এবরাহিমের জন্ম হয়, ১৭ বা ১৮ মাস বয়সে হিজরীর দশম সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।***

(৩) অঙ্ক করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উল্লিখিত সূর্যগ্রহণ ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী তারিখে ৮টা ৩০ মিনিটের সময় লাগিয়াছিল।

---

* تاریخ دول العرب والاسلام - محمد طلعت بک حرب

** বোখারী—মোছলেম প্রভৃতি।　　*** এছাবা ও বোখারী।

(৪। এই তারিখ ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, হযরতের জন্মসনে ১২ই এপ্রিল তারিখে রবিউল আউওল মাসের ১লা তারিখ আরম্ভ হইয়াছিল।

(৫। জন্মদিনের তারিখ নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু রবিউল-আউওল মাসের ৮ই হইতে ১২ই পর্যন্ত এই মতভেদ সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সোমবার সম্বন্ধেও কাহারও মতভেদ নাই। (মোছলেম)

(৬। ৮ই হইতে ১২ই রবিউল আউওলের মধ্যে ৯ই ব্যতীত সোমবার নাই।

অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, ৯ই রবিউল-আউওল, ২০শে এপ্রিল, সোমবার হযরত (সঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সকল অকাট্য প্রমাণ বর্তমান থাকিতেও, যে সকল খ্রীষ্টান লেখক ঐতিহাসিক গবেষণার লম্বা লম্বা দাবী করিয়া ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে অগাস্ট তারিখকে হযরতের জন্মদিন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং যে সকল মুছলমান লেখক তাঁহাদের অন্ধ-অনুকরণ করিয়া ঐ ভ্রান্তমত সমাজে প্রচারিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাদের অসম-সাহসিকতা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। এই শ্রেণীর লেখকদিগের পুস্তক পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকগণ এছলাম সম্বন্ধে মতামত নির্ধারণ করিয়া থাকেন।

## মাতৃগর্ভে পিতৃহীন

হযরতের পিতা, আবদুল-মোত্তালেবের যুবক পুত্র—আবদুল্লাহ্, তাঁহার জন্ম গ্রহণের কয়েক মাস পূর্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতৃহীনের পিতা মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) মাতৃগর্ভেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। পিতামহ আবদুল মোত্তালেব কা'বা মছজিদে বসিয়া কোরেশ দলপতিগণের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন ; এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ আমেনা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ এই শুভসংবাদ শ্রবণ মাত্রই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার হৃদয় শোক ও আনন্দে যুগপৎ আলোড়িত হইতে লাগিল, তিনি অবিলম্বে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া শিশু পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং সেই অবস্থায় কা'বা মছজিদে আনিয়া তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

## আকিকা ও নামকরণ

আরবের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সপ্তম দিনে আবদুল মোত্তালেব আত্মীয়-স্বজনকে আকিকার উৎসবে নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারাদি সমাপন করিয়া কোরেশ প্রধানগণ আবদুল মোত্তালেবকে শিশুর নাম জিজ্ঞাসা করিলে, বৃদ্ধ আনন্দোৎফুল্ল বদনে উত্তর করিলেন— 'মোহাম্মদ।" সমবেত স্বজনগণ এই অভিনব নাম শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"মোহাম্মদ !" এমন নাম ত আমরা কখনও শুনি নাই। আপনি স্বগোত্রের প্রচলিত সমস্ত নাম পরিত্যাগ করিয়া এই অভিনব ও অশ্রুতপূর্ব নাম রাখিতে গেলেন কেন ?

چه نام است این که در دیوان هستی
برو نامے نبوده بلند ترستی

বৃদ্ধ আবদুল মোত্তালেব উত্তর করিলেন—আমার এই সন্তানটি যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র প্রশংসিত হউক, তাই আমি তাঁহার এই নাম রাখিয়াছি। বিবি আমেনা গর্ভাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই অনুসারে তিনি পুত্রের নাম রাখিলেন—"আহমদ।"*

মোহাম্মদ ও আহমদ এই উভয় নামই হযরতের বাল্যকাল হইতে প্রচলিত ছিল।** কোরআন শরীফেও এই উভয় নামেরই উল্লেখ আছে।

---

* কামেল, ১—১৬৩, এবনে হেশাম, ১—৫৪, খাছাএছ, ১—৭৮, মোস্তাদরাক, ২—২০৬ প্রভৃতি। আবুল-ফেদা, ১—১১০ পৃষ্ঠা। ** বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।

"محمد رسول الله والذين آمنوا" الآية - وما محمد الا رسول"

"আল্লাহর রছুল মোহাম্মদ এবং যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে"—

"মোহাম্মদ একজন প্রেরিত বই আর কিছুই নহেন।"

واذ قال عيسى بن مريم يابني اسرائيل اني رسول الله اليكم

مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من

بعدي اسمه احمد -

"মরিয়মের পুত্র যীশু যখন কহিলেন, হে এছরাইল বংশীয়গণ, আমি (আল্লাহর পক্ষ হইতে) তোমাদিগের দিকে প্রেরিত—আমি আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যতা ঘোষণা করিতেছি এবং আমার পর আহমদ নামে যে প্রেরিত পুরুষ (রছুল) আসিবেন, তাঁহার (আগমনের) সুসংবাদ প্রদান করিতেছি।"

হযরতের এই উভয় নামই যে তাঁহার শৈশবকাল হইতে প্রচলিত ছিল, ইহা অস্বীকার করার ন্যায় হঠকারিতা আর কি হইতে পারে? কোন কোন স্বনামখ্যাত খ্রীষ্টান লেখক এই প্রসঙ্গে যেরূপ চিত্তচাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা কষ্টকর। এই চাঞ্চল্যের কারণ পাঠকগণ একটু পরে জানিতে পারিবেন।

## আমেনার স্বপ্ন

বিবি আমেনা তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু স্বপ্নবৃত্তান্তে কথিত হইয়াছে যে, বিবি আমেনা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—যেন খোদার এক দূত আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, তোমার গর্ভে এক অসাধারণ সন্তান বিদ্যমান হইয়াছে, তুমি তাহার নাম রাখিও "আহমদ"। বিদ্বেষ-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহাতে অস্বাভাবিক বা অসত্য কিছুই নাই। কিন্তু ইহাতেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার লোক জগতে বিরল নহে। অথচ তাঁহাদেরই ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, যীশুর মাতা মেরীর স্বামী, সহবাসের পূর্বে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর গর্ভ হইয়াছে—"পবিত্র আত্মা হইতে।"* তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখিবে। (মথি ১—২১)

ইহা ত গেল স্বপ্নের কথা। বাইবেল পুরাতন নিয়মের আদি পুস্তক, সদাপ্রভুর দূতকে জাগ্রত অবস্থায় হযরত এছমাইলের জননী বিবি হাজেরার সহিত কথোপকথন করিতে দেখা যায়। "—সদাপ্রভুর দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ভ হইয়াছে। তুমি পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম ইসমাইল (ঈশ্বর শুনেন) রাখিবে।" (১৬—১১)

এই পুস্তকের ১৭—১৯ পদে স্বয়ং সদাপ্রভুই হযরত এবরাহিমের সহিত কথোপকথন করিয়া বলিতেছেন "—এবং তুমি তাহার (সারার) গর্ভজাত পুত্রের নাম এছহাক (হাস্য) রাখিবে।"

আমরা মহানুভব খ্রীষ্টান লেখকগণকে স-সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তাঁহাদের বর্ণিত এই ঘটনাগুলি যদি অসত্য ও অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে বিবি আমেনার স্বপ্ন দর্শনের কথা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করা কি তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?

---

* এই পবিত্রাত্মাটি খ্রীষ্টান ধর্মের রক্ষাকবচ। এই অংশটুকু যে অনুবাদকগণের কারচুপি তাহা বলাই বাহুল্য। নচেৎ এ কথাটি বেচারী যোসেফের জানা থাকিলে তিনি মেরীকে ত্যাগ করিতে চাহিবেন কেন?

## যীশুর নামকরণ

এখানে একটা অবান্তর কথার অবতারণা করার জন্য আমরা পাঠকগণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। যীশুর মাতার স্বামী যোসেফকে, সদাপ্রভুর দূত স্বপ্নযোগে তাহার স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানের নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া মথির বর্ণিত উদ্ধৃতাংশে কথিত হইয়াছে। যীশু শব্দের অর্থ যে ত্রাণকর্তা, তাহা বাইবেলের অনুবাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। অনুবাদে গোলযোগ ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু Proper Name-- এ কোন প্রকার গোলযোগ ঘটা সম্ভবপর নহে।

যিশাইয় ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণীতে ছিল যে, 'দেখ সেই কন্যা গর্ভবতী হইবে এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাহার নাম রাখা হইবে ইম্মানুয়েল।" (৭—১৪) বাইবেলের বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদক মথির ঐ বর্ণিত অধ্যায়ে এই ইম্মানুয়েল নামের কোন অর্থ দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে না করিলেও ঐ পুস্তকের আরবী অনুবাদক ঐ স্থানে লিখিতেছেন ঃ

ويدعون اسمه عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا

বঙ্গানুবাদে যিশাইয় ভাববাদীর উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর অনুবাদকালে উহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে।

যীশু ও ইম্মানুয়েল এই শব্দদ্বয়ের ধাতুতে বা অর্থে কোন প্রকার সামঞ্জস্য নাই। ইহাকেই বলে ঃ

কাহাঁকা ইঁটা কাহাঁকা রোড়া—
ভানমতীনে খাম্বা জোড়া।

ইহা ব্যতীত যীশুর নাম প্রথমে যোশুয়া রাখা হইয়াছিল। যে কোন কারণে হউক, পরে এই নাম বদলাইয়া তাঁহার নাম যীশু রাখা হয়। বিখ্যাত গ্রন্থকার রেনান (Renan) যীশুর জীবন চরিতে লিখিতেছেন ঃ

"The name of Jesus, which was given him, is an alteration from Joshua. It was a very common name; but afterwards, mysteries, and an allusion to his character of Saviour were, naturally, sought for in it."

অর্থাৎ—"প্রথমে যীশুর নাম যোশুয়া ছিল, পরে তাহা বদলাইয়া যীশু করা হইয়াছে।"

হযরত তাঁহার পিতামাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন।*

وشق له من اسمه ليجله
فذو العرش محمود وهذا محمد (حسان)

### মোহাম্মদ–আহমদ

বাইবেল পুরাতন নিয়মে মোহাম্মদ নামটি আজও বর্তমান রহিয়াছে। সোলেমানের পরমগীত ৫ম অধ্যায়ের ১০—১৬ পদের অনুবাদে নানা প্রকার অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকিলেও

---

* দেখ, যিশাইর ৯—৬, সেই একমাত্র পুত্রের নাম হইবে আশ্চর্য ..... শান্তিরাজ বাইস্থুহ—ছালাম। পিতামাতার একমাত্র পুত্র এবং ছালামের বা এছলামের প্রধান হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ব্যতীত আর কে হইতে পারে ? তাঁহার নাম শুনিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিল—এ কি অভিনব নাম। আবুল-ফেদা, ১১০ পৃষ্ঠা।

মূল হিব্রু বাইবেলে এস্থলে "মোহাম্মদীম" এই নামটি আজও স্পষ্টাক্ষরে বর্তমান আছে। মোহাম্মদ শব্দের ধাতু আরবী ও হিব্রু উভয় ভাষায় হ-ম-দ, এবং উহার অর্থ প্রশংসা বা স্তুতি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু বাইবেলের অনুবাদকেরা উহার অর্থ করিয়াছেন : كله مشتهيات He is altogether lovely তিনি সর্বতোভাবে মনোহর, ইত্যাদি।

মোহাম্মদ শব্দের পর 'ঈম' বা يم এই অক্ষর দুইটি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। হিব্রু ভাষায় উহা বহুবচনের লক্ষণ, কিন্তু সম্মান বা মহত্ত্ব প্রদর্শন স্থলে এইরূপ বহুবচন ব্যবহারের নিয়ম আরবী ও হিব্রু ভাষাতেও চিরকাল প্রচলিত আছে। এই নিয়ম অনুসারে Elloha (ঈশ্বর) শব্দের সহিত ই-ম যোগ করিয়া (Ellohim) ইলোহিম শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। বহুবচনের লক্ষণ আছে, এই হেতুবাদে এখানে "বহু ঈশ্বর" বলিয়া উহার অর্থ করা সঙ্গত হইবে না। বরং উহার অর্থ হইবে, মহিমময় ঈশ্বর; সেইরূপ মোহাম্মদীম শব্দের অর্থ হইবে—মহিমান্বিত মোহাম্মদ। এইরূপ সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার দুনিয়ার সকল সভ্য ভাষাতেই প্রচলিত আছে।

'আহ্‌মদ' নামও বাইবেলের নূতন নিয়মে বিদ্যমান ছিল, Periklutos শব্দের সামান্য একটু পরিবর্তন করিয়া বাইবেল অনুবাদক Parakeletos বানাইয়া লইয়াছেন। প্রথম শব্দটির অর্থ প্রশংসিত ও স্তুতিকৃত অর্থাৎ মোহাম্মদ বা আহমদ। কেহ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন 'সহায়' আবার কেহ 'শান্তিদাতা' বলিয়া উহার অনুবাদ করিতেছেন। ইংরাজীতে Comforter এবং আরবীতে فارقليط বলিয়া উহার অনুবাদ করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা অন্যত্র এ সকল বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, স্যার উইলিয়ম মুরের ন্যায় খ্রীষ্টান লেখকও নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, প্রাথমিক যুগের আরবী অনুবাদে, যে কোন গতিকে হউক, Parakeletos শব্দের অর্থে নিশ্চয়ই আহমদ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল।*

# নবম পরিচ্ছেদ

## হযরতের জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ব্যাপার

আমাদের এক শ্রেণীর লেখক ও কথক قصاص অদূরদর্শিতার বশবর্তী হইয়া সর্বদাই মনে করিয়া থাকেন যে, অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ড যাঁহার দ্বারা যত অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়া থাকে, তিনি ততই মহৎ এবং ততই প্রশংসিত হইবার অধিকারী। খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের এই ধারণা, ক্রমে আমাদের মধ্যে অতি মারাত্মকরূপে সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, হযরতের চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব এবং তাঁহার জীবনের অতুলনীয় স্বর্গীয় মহিমাগুলির অনুভূতি হইতেও সমাজ ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে। মনুষ্যত্বের যে পূর্ণ আদর্শ এবং মহিমার যে চরম ও পরম পরিণতি, মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনের প্রত্যেক ঘটনার মধ্য দিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, এখন কেহই প্রায় তাহা দেখিতে চাহে না—দেখিতে পারেও না। ফলতঃ আজ আমরা কতকগুলি আজগুবী উপকথার সৃষ্টি করিয়া নিজেদের জ্ঞানকে প্রবঞ্চিত করিয়াই সন্তুষ্ট। পাঠক, মনে করিবেন না যে, আমরা ইহা দ্বারা 'মো'জেজা' অস্বীকার করিতেছি। 'মো'জেজা' নিশ্চয়ই সত্য এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করাও নিতান্ত কর্তব্য। কিন্তু বিশ্বস্তরূপে তাহা প্রমাণিত হওয়া চাই। এজন্য আমাদের পূর্বতন আলেম ও ইমামগণ রেওয়ায়েৎ ও দেরায়েৎ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করিয়া

---

* ১ম অধ্যায়, ৫পৃষ্ঠা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রথম সংস্করণের সহিত মিলাইয়া পড়িলে স্যার উইলিয়মের চিচোঙ্গপনা সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

গিয়াছেন, সত্যকে মিথ্যার আবর্জনারাশির মধ্য হইতে বাছিয়া লইবার যে পথ তাঁহারা আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই যুক্তিসঙ্গত নিয়মাবলী অনুসারে সত্য-মিথ্যা এবং বিশুদ্ধ ইতিবৃত্ত ও কল্পিত উপকথাগুলি বাছাই করিয়া লইবার অধিকার আমাদের আছে। বরং কোরআনের আদেশ অনুসারে প্রত্যেক মুছলমান এইরূপ করিতে, বাধ্য। * اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا - الآية

অভিজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, হযরতের পবিত্র চরিত্রের বা এছলামের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আজ পর্যন্ত যত দিক দিয়া ও যত প্রকারে দোষ-ত্রুটি আরোপ করা হইয়াছে, আমাদের এই শ্রেণীর অতিভক্ত লেখকগণের উপকথা এবং অসতর্ক ঐতিহাসিকবর্গের বহু ঘটনা সঙ্কলন-স্পৃহা ও গড্ডালিকা প্রবাহই তাহার জন্য বহুলাংশে দায়ী।

## অলৌকিক ব্যাপার

কথিত আছে যে, হযরত যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার গর্ভধারিণী বিবি আমেনা এবং তাঁহার পিতামহ আবদুল মোত্তালেব ও অন্যান্য স্বজনগণ নানাপ্রকার অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দর্শন করিয়াছিলেন। হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সূতিকা গৃহ হইতে এক আশ্চর্য 'নূর' বা জ্যোতি বাহির হইয়াছিল, সিরিয়ার 'বোছরা'** নগর পর্যন্ত সেই আলোকের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। পারস্যের বাদশা নওশেরওয়াঁর সৌধচূড়াগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অগ্নিপূজকদিগের যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অগ্নিকুণ্ডগুলি অবলীলাক্রমে নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল জগতের সমস্ত পশু সেদিন মানুষের মত কথা কহিয়াছিল। দুনিয়ার যাবতীয় রাজসিংহাসন উলটাইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন কা'বা মছজিদের ৩৬০টি বোৎ এবং সমস্ত ঠাকুর বা প্রতিমা অধঃমুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। নূতন-নূতন গ্রহ-নক্ষত্রাদির উদয় হইয়াছিল। স্বর্গ হইতে দেবদূতগণ আসিয়া সূতিকা গৃহে জটলা পাকাইতেছিলেন ; এমন কি, বলিতে লজ্জা হয়, তাঁহারা বিবি আমেনাকে প্রসব করাইবার জন্য তাঁহার স্ত্রীঅঙ্গে ডানার পালক বুলাইতেছিলেন। ইহা ব্যতীত তুষারধবল পালকবিশিষ্ট স্বর্গীয় শ্বেতপক্ষীর আবির্ভাব—ইত্যাদি।*** এই গল্পগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং কল্পিত উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধর্মের কথা ত দূরে থাকুক, ইতিহাসের হিসাবেও এই কিংবদন্তিগুলির এক কানাকড়িরও মূল্য নাই।

## আমেনার স্বপ্ন

আমাদের মনে হয়, এই উপকথাগুলির আলোচনার জন্য আমাদিগকে ইতিহাসের সূক্ষ্ম গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। এই লেখকগণের প্রমাণহীন বর্ণনাগুলিকে যদি সত্য বলিয়া স্বীকারও করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ঐগুলির প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করিতে কাহাকেও বেগ পাইতে হইবে না। কারণ, ঐ বর্ণনাগুলির মূল ভিত্তির অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, বিবি আমেনা স্বপ্নযোগে ঐ সকল ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছেন এবং ইহা সকলে সমস্বরে স্বীকারও করিতেছেন।

বানি আমের বংশের জনৈক প্রাচীনের সহিত হযরতের কথোপকথন উপলক্ষে, শাদ্দাদ বেন-আওছের যে বর্ণনাটি ইতিহাসে উদ্ধৃত হইয়াছে, (তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও) তাহাতে স্বয়ং হযরত বলিতেছেন ঃ

ثم رأت فى منامها

* কোরআন, ২৬ পারা ১৩ রুকু।
** মুর সাহেব সর্বত্রই বোস্রা লিখিয়াছেন, উহা ভুল।
*** মাদারেজ, ১—১৬, ১৭ পৃষ্ঠা ; দালাএল প্রভৃতি।

"তাহার পর আমার মাতা স্বপ্ন দেখিলেন—"।*

হাদীছে বিবি আমেনার এই স্বপ্ন দর্শন সম্বন্ধে এইটুকু উল্লেখ আছে। ছারিয়ার পুত্র এরবাজ বলিতেছেন, হযরত বলিয়াছেন :

انا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا امى التى رات حين وضعتنى وقد خرج لها نور اضاء لها قصور الشام -

( شرح السنة ورواه احمد عن ابى امامة )

"আমি এবরাহিমের প্রার্থনা, যীশুর সুসংবাদ এবং আমার মাতা আমাকে প্রসব করার সময় যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন—একটা জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া শ্যামের (সিরিয়ার) সৌধগুলি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে—সেই সকলের সফলতার নিদর্শন। (শারহুছ্ ছুন্না ও মোছনাদে আহ্‌মদ।)

## কল্পিত গল্প

কাজেই আমরা দেখিতেছি যে ইহা স্বপ্ন মাত্র। আমাদের এক শ্রেণীর কথক কল্পনাবলে এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বরং উহার সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য আরও বহু কল্পিত অলৌকিক ঘটনা যোগ করিয়া দিয়া, বিবি আমেনার এই স্বপ্নের ব্যাপারটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য করিয়া তুলিয়াছেন। সাধারণ ইতিহাস লেখকগণ, প্রামাণ্য ও প্রক্ষিপ্ত সকল প্রকার বিবরণ ও কিংবদন্তিগুলিকে তাঁহাদের পুস্তকে সঙ্কলন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। খৃষ্টান লেখকগণ, তাহা হইতে দুই-চারিটা অপ্রামাণ্য প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া, অনভিজ্ঞ পাঠকের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া, হযরতের চরিত্রের প্রকৃত মাহাত্ম্য-বাচক নিতান্ত বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকেও প্রমাণহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। অথচ ইঁহারাই আবার "ওয়াকেদী" প্রভৃতির ন্যায় সর্ববাদিসম্মত অবিশ্বস্ত লেখকের প্রদত্ত বিবরণের—এমন কি কেবল ভিত্তিহীন অনুমানের—উপর নির্ভর করিয়া, হযরতের চরিত্রে কোন গতিকে একটু দোষারোপ করার সামান্য সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। স্যার উইলিয়ম মুর, ডাক্তার স্প্রেঙ্গার, মারগোলিয়থ D. S. Margolioth প্রভৃতি খৃষ্টান লেখকগণের পুস্তকের যে কোন অংশ পাঠ করিলে, ন্যায়দর্শী পাঠক আমাদিগের এই উক্তির সত্যতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মুছলমানদিগের ইতিহাস ও হযরতের জীবনী লেখার নিয়ম ও পদ্ধতি যে কিরূপ অতুলনীয়, এই পুস্তকের উপক্রমখণ্ডে তাহা বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এখানে এইটুকু জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই সকল কিংবদন্তির মূল প্রবর্তক আবু নইম ও হুওর বেন এজিদ প্রভৃতি, রেজাল শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের নিকট কখনই বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। হুওরের ধর্মমতের জন্য, তখনকার মুছলমানগণ কর্তৃক তাঁহাকে দেশান্তরিত হইতে হয় এবং তাঁহার ঘরদুয়ার জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। আবু নইমও একজন অসতর্ক অবিশ্বাস্য, এমন কি, কোন কোন সমসাময়িক পণ্ডিতের মতে মিথ্যাবাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন।** ঐতিহাসিক তুলাদণ্ডে সূক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া লইবার পূর্বে এই শ্রেণীর কথকগণের প্রদত্ত বিবরণ, বিশেষতঃ অস্বাভাবিক ও আজগুবী কিংবদন্তিগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

হযরতের জন্মকালে পৃথিবীর সমস্ত বোৎ হেঁটমুখে ভূপতিত হইয়াছিল, সমস্ত রাজসিংহাসন উলটাইয়া পড়িয়াছিল, পশু মাত্রই মানুষের মত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, রোমরাজের ক্রুশ

---

* কামেল ১—১৬৩ পৃষ্ঠা, সমস্ত ইতিহাসেই স্বপ্নের কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

** মীজান প্রভৃতি।

খসিয়া পড়িয়াছিল ইত্যাদি বিবরণগুলিকে বিনা বিচারে মিথ্যা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ইতিহাসের সহিত যাঁহার একটুও সম্পর্ক আছে, তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, হযরত ওমরের খেলাফত যুগে, পারস্য বিজয়ের পূর্বে, পারস্যের অগ্নিকুণ্ডগুলি একদিনের তরেও নির্বাপিত হয় নাই। হযরতের সময় মক্কা বিজয়ের পূর্বে কা'বা মছজিদের একটি বোৎও স্থানচ্যুত বা ভূপতিত হয় নাই।* পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঠাকুর-প্রতিমা বা বোৎগুলির এবং রাজসিংহাসন সমূহের ভূপতিত হওয়ার বা চতুষ্পদ জন্তুদিগের কথা বলার ঘটনা কোন দেশের কোন ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই।

## অনৈছলামিক কল্পনা

ফলতঃ দুই-একজন অনভিজ্ঞ কথকের কল্পনামাত্র ব্যতীত, ধর্মশাস্ত্রে বা বিশ্বস্ত ইতিহাসে উহার কোন উল্লেখ নাই। বরং একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই শ্রেণীর কিংবদন্তিগুলির মধ্যে এমন অনেক বিবরণ আছে—এছলাম যাহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছে। পাঠকগণের সন্দেহ নিরাকরণ মানসে এখানে একটি উদাহরণ দিতেছি। হযরতের জন্মের অসাধারণত্ব প্রতিপাদন করার জন্য, আমাদের এই শ্রেণীর কথকগণ বলিতেছেন যে, তাঁহার জন্মকালে নূতন গ্রহ-নক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়া পরজাতীয় ও বিদেশীয় গণকবর্গ হযরতের জন্মের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। এই সকল কথা প্রমাণ করার জন্য তাঁহারা অবাধে ভবিষ্যদ্বক্তা, জ্যোতিষী ও গণক-ঠাকুরদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন।** কিন্তু আমরা ছহী মোছলেম, আবু-দাউদ, মোছনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি, হযরত বলিতেছেন ঃ

(ক) لا تاتوا الكهان

কাহেন বা গণকদিগের নিকট যাইও না।

(খ) ليسوا بشئ

উহারা কিছুই নহে অর্থাৎ উহাদের কথার কোন মূল্য নাই।

(গ) من اتى فسئله عن شئ لم يقبل له صلواة اربعين ليلة

যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তাগণের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে—তাহার ৪০ দিনের নামায নষ্ট হইয়া যায়।

(ঘ) من اتى كاهنا فصدقه بما يقول ---- فقد برئ مما انزل على محمد

যে ব্যক্তি গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যায় এবং তাহার কথায় বিশ্বাস করে, কোরআনের ধর্মের সহিত তাহার কোন সংস্রবই থাকে না।

হযরত স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে এই সকল কুসংস্কারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন ঃ

لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته

অর্থাৎ, গ্রহ-নক্ষত্রাদির উদয় বা গতিবিধি দ্বারা—'কাহারও মৃত্যু বা জন্মের নির্দেশ করা যাইতে পারে না'।*** বিশ্বস্ততম হাদীছে জানা যায় যে, হযরত এই শ্রেণীর লোকদিগকে আল্লাহর বিদ্রোহী (কাফের) ও নক্ষত্রপূজক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।**** অন্য এক হাদীছে হযরত বলিতেছেন ঃ

---

* অথচ বলা হইতেছে যে, হযরতের জন্মকালে কা'বার বোৎগুলি টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। —মাদারেজ, ২২১।

** দেখ—মাদারেজ, ১৯—২৩ পৃষ্ঠা, দালায়েলুন-নবুয়ত, খাছায়েছুল-কুবরা, হযরতের জন্ম বৃত্তান্ত।

*** মোছলেম। **** বোখারী, মোছলেম।

انما يفترون على الله الكذب ويتعللون بالنجوم

অর্থাৎ, উহারা নক্ষত্রাদিকে এক-একটা ঘটনার কারণ ও লক্ষণরূপে নির্ধারণ করিয়া আল্লাহর প্রতি মিথ্যার আরোপ করিয়া থাকে।* হযরতের শিশুপুত্র এবরাহিমের মৃত্যুদিবসে সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, মহাপুরুষের পুত্রবিয়োগ ঘটায় আজ সূর্যগ্রহণ লাগিয়াছে। এই সকল কথা হযরতের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহা একটা কুসংস্কার মাত্র। চাঁদ ও সূর্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে দুইটি অভিজ্ঞান মাত্র (অর্থাৎ সৃষ্টির এই শ্রেষ্ঠ পদার্থ দুইটি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শন স্বরূপ। কাহারও জন্ম বা মৃত্যুতে তাহাতে গ্রহণ লাগিতে পারে না।**

ফলতঃ এই শ্রেণীর উপকথাগুলি কেবল অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিকই নহে, বরং যুগপৎভাবে এছলামের দৃষ্টিতে উহা ভয়ঙ্কর কুসংস্কারমূলক পাপ। স্বয়ং হযরতই ঐ সকল কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

## দশম পরিচ্ছেদ

### ربنا ابق لنا محمدا

### ধাত্রীগৃহে

শিশুদিগের লালন-পালন ও স্তন্যদান করার ভার ধাত্রীদিগের হস্তে প্রদান করার নিয়ম, তখন ভদ্র ও অবস্থাপন্ন আরব-গোত্রগুলির মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। নাগরিক ও ভদ্রসমাজের আরব মহিলাগণ, নিজ সন্তানদিগকে স্তন্যদান করা নিজেদের পক্ষে অগৌরবের কথা বলিয়া মনে করিতেন।*** মধ্যে মধ্যে নিকটবর্তী আরব গোষ্ঠীসমূহের স্ত্রীলোকেরা মক্কায় আগমন করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে লালন-পালন করার জন্য লইয়া যাইতেন। অবশ্য শিশুর অভিভাবকগণ এজন্য তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও পুরস্কারদানে কুণ্ঠিত হইতেন না। আরবীয় ভদ্রসমাজে বহুদিন পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। উমাইয়া বংশের খলিফাগণের মধ্যেও,—যখন তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতাপের নিকট পৃথিবীর অন্যান্য নরপতিগণের প্রতিপত্তি ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও—এই প্রথার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তখন এই দেমাশ্ক রাজবংশের শিশুগণ যথানিয়মে বেদুইন আরবদিগের নিকট প্রেরিত হইতেন এবং নির্মল জল বায়ু ও বিশুদ্ধ ভাষার প্রভাব তাঁহাদের জীবনে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হইত। ইতিহাসে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, উমাইয়া বংশের খলিফাগণের মধ্যে একমাত্র অলিদই কোন বিশেষ কারণে রাজকীয় প্রাসাদে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে, আরবী সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান ও অধিকার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।**** মক্কায় 'শরীফ'দিগের মধ্যে আজ পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত আছে। আট-দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহাদের সন্তানগণ দূর আরব পল্লীসমূহের 'বেদুইন' মহিলাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বার্কহার্ডি এইরূপ কতকগুলি 'বেদুইন' বংশের নাম করিয়াছেন। বানি ছাআদ বংশের—হযরত যে বংশে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন—নামও তিনি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।$

---

* বোখারী।

** বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।

*** ছোহেলী এইরূপ অনুমান করেন। শিবলী ১—১২৫ পৃষ্ঠা-টীকা।

**** ছিরত, ১—১২৫ পৃষ্ঠা।

$ মূর, নূতন সংস্করণ ৩ ৫ পৃষ্ঠা-টিকা

## প্রথম ধাত্রী

আবু লাহাবের ছোওয়ায়বা নাম্নী এক দাসী প্রথমে হযরতকে স্তন্যপান করাইয়া ছিলেন।* কথিত আছে যে, হযরতের জন্মসংবাদ এই ছোওয়ায়বাই প্রথমে আবুলাহাবকে দান করেন, ইহার ফলে আবুলাহাব পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিয়া দেয়।** কিন্তু এই মতটি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বিবি খ'দিজার সহিত হযরতের বিবাহের পর তিনি (বিবি খ'দিজা) ছোওয়ায়বাকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আবু লাহাবের নিকট হইতে ক্রয় করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আবুলাহাব তাহাতে সম্মত হয় নাই, ইত্যাকার বিবরণ বহু ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।*** উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ হযরতের চরিত্রের একটি অন্যতম বিশেষত্ব। তিনি যাহার নিকট কোন প্রকারে সামান্য একটুও উপকার লাভ করিয়াছেন, জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতেই তাহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিয়াছেন। ছোওয়ায়বা অল্প সময়ের জন্য তাঁহাকে স্তন্যদান করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি চিরকালই তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রম ও ভক্তির চক্ষে দর্শন করিতেন। মদিনায় হিজরতের পূর্বে, বিবি খ'দিজার আনুকূল্যে, তিনি ছোওয়ায়বাকে মুক্ত করার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছোওয়ায়বার দর্শন পাইলে, হযরত ও বিবি খ'দিজা উভয়েই তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং হিজরতের পরেও হযরত প্রায়ই বস্ত্রাদি উপঢৌকন পাঠাইয়া ছোওয়ায়বার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেন। খায়বার হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত জানিতে পারিলেন যে, ছোওয়ায়বা পরলোকগমন করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া হযরত তাঁহার পুত্র মাছরুহের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, মাতার পূর্বেই পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে। মাতা ছোওয়ায়বার অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন আছে কি-না, তাহার অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের স্বজন বলিয়া কেহই বিদ্যমান নাই।****

পিতৃব্য-পরিবারের একটি লাঞ্ছিতা, উপেক্ষিতা, প্রপীড়িতা ক্রীতদাসী, জগতের সমস্ত নির্মম ও কঠোর দুর্ব্যবহার সহ্য করিবার জন্য যাহার জন্ম, দুই-এক দিনের জন্য অথবা দুই-একবার মাত্র স্তন্যপান করাইয়াছিল, ইহাতে—সংসারের প্রচলিত হিসাবে—তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যত্বের, প্রেম ও পুণ্যের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ সংস্থাপনের জন্য যে মহিমান্বিত মহাপুরুষের আবির্ভাব, তিনি এই সাধারণ নিয়মের অধীন নহেন।$ তাঁহার হৃদয় প্রত্যেক সৎ ও মহৎ ভাবের পূর্ণ বিকাশস্থল। অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই মোহাম্মদ মোস্তফার অনুরক্ত ও ভক্ত বলিয়া, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণকারী দাসানুদাস বলিয়া যাহারা দাবী ও স্পর্ধা করিয়া থাকেন, সেই মুছলমান সমাজই আজ তাঁহার মহান আদর্শ হইতে অধিকতর দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। নবীর জাহেরী ছুন্নৎগুলি লইয়া মারামারি কাটাকাটি করার লোকের অভাব নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার মুখ্য ও মূল ছুন্নতগুলি আজ সাধারণভাবে উপেক্ষিত হইতেছে।

## বিবি হালিমা

হযরতের জন্মগ্রহণের পরেই, যথানিয়মে বেদুইন গোত্রের স্ত্রীলোকেরা প্রতিপাল্য শিশুদিগকে লইয়া যাইবার জন্য মক্কায় আগমন করিলেন। অনাবৃষ্টি ইত্যাদির জন্য সেবার দেশে ভয়ঙ্কর দুর্বৎসর উপস্থিত হইয়াছিল। ধাত্রীব্যবসায়ী স্ত্রীলোকেরা প্রথমে এই পিতৃহীন শিশুর প্রতি বড় একটা লক্ষ্য করিলেন না। এহেন পিতৃহীন বালককে প্রতিপালন করিয়া তৎপরিবর্তে যথেষ্ট পারিশ্রমিক ও পুরস্কার পাওয়া যায় কি-না, এই স্বাভাবিক সন্দেহই ইহার কারণ ছিল। সকলে

---

* কামেল, ১—১৬২ ইত্যাদি। এবনে-হেশাম ও এবনে-খাল্‌দুনে ইহার উল্লেখ নাই।

** মাদারেজ, ২—২৩। *** কামেল, ১—১৬২। **** কামেল, ১—১৬২।

$ বাইবেলে বর্ণিত, স্বীয় গর্ভধারিণী জননীর প্রতি যীশুর দুর্ব্যবহার ইহার সহিত তুলনা করিবেন

এক-একটা শিশুর প্রতিপালন ভার প্রাপ্ত হইল, কিন্তু ভাগ্যবতী হালিমার ভাগ্যে এই এতীম* ব্যতীত অন্য কোন শিশু জুটিল না। তিনি শেষে নিজ স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অগত্যা শিশু মোস্তফার লালন-পালন ভার গ্রহণ করিলেন।** আরবের হাওয়াজেন বংশের বানি-ছাআদ গোত্র, বিশুদ্ধ আরবী ভাষার জন্য আরবের সর্বত্রই বিখ্যাত ছিল। হযরত নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এমন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথোপকথন করিতেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া আরবের প্রধান প্রধান কবি সাহিত্যিকগণকেও আশ্চর্যান্বিত হইতে হইত। হযরত নিজেই বলিয়াছিলেন যে, এই ছাআদ বংশে বর্ধিত হওয়া ইহার অন্যতম কারণ।*** বুঝিয়া দেখিলে ইহা কম মো'জেজা নহে। বিভিন্ন গোত্রের ধাত্রীও অনেক আসিয়াছিল, কিন্তু পিতৃহীন বলিয়া সকলের তাঁহাকে পরিত্যাগ করা, হালিমার পক্ষে অন্য কোন শিশু মিলিয়া না উঠা এবং অবশেষে হযরতকে গ্রহণ করা, এ সমস্তের মধ্যে একটা গূঢ় স্বর্গীয় রহস্য লুক্কায়িত ছিল।

স্যার উইলিয়ম মূর ছাআদ বংশের এবং হযরতের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন সত্য,**** কিন্তু তাঁহার ঐ প্রশংসার অন্তরালে যে গভীর দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে, একটু তলাইয়া দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মূর সাহেব কিছু পরে কোরআনকে হযরতের নিজস্ব রচনা বলিয়া প্রমাণ করার জন্য বহু চাতুরী প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ছাআদ বংশের উল্লেখকালে পূর্বাহ্নেই তাহার ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখার জন্যই উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। হযরতের উক্তিগুলি যে ভাষা ও সাহিত্যের হিসাবে অতিশয় বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল এবং আদর্শরূপে পরিগণিত হওয়ার সর্বতোভাবে যোগ্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টান লেখকগণও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে যাঁহার সামান্য একটুও জ্ঞান আছে, তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরতের ভাষায় ও কোরআনের সাহিত্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোরআন ও হাদীছের অনুবাদ পড়িয়াও এই পার্থক্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

হালিমার পিতার নাম আবু জুয়াএব এবং স্বামীর নাম হার্ছ বা হারেছ। হালিমার এক পুত্র আবদুল্লাহ্ এবং তিন কন্যা—আনিছা, হোজায়ফা ও হোজাফা। এই হোজাফা শায়মা নামেই অধিকতর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হোজাফা বা শায়মা হযরতের প্রতিপালনে তাঁহার মাতাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে।$

বিবি হালিমা যে হযরতের জীবনকালেই এছলাম অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে। এবনে আবি-খোছায়মা, এবনে জাওজী, এবনে হাজর প্রভৃতি মোহাদ্দেছবর্গ, এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। হাফেজ মোগলতাই "আত্তোহফাতুল জাছিমাঃ ফি এছলামে হালিমাঃ" নামে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়া বিবি হালিমার এছলাম গ্রহণের কথা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রেজাল সংক্রান্ত পুস্তকে ইহাও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আবদুল্লাহ-বেন-জাফর বিবি হালিমার নিকট হইতে হাদীছ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন।$$ বিবি হালিমার স্বামী হারেছও যে মুছলমান হইয়াছিলেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এছলাম গ্রহণের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে 'চরিত'কারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে।$$$ হালিমার

---

* এতীম অর্থে পিতৃহীন ও অমূল্য রত্ন।

** এবনে-খাল্লেদুন, কামেল ও এবনে-হেশাম ৫০—২৩—৯০ ইত্যাদি

*** এবনে-ছাআদ ১—৭১ পৃষ্ঠা।

**** মূর, ৭ পৃষ্ঠা।

$ এবনে-হেশাম, ১—৫৫ ইত্যাদি।

$$ এছাবা, ৮—৫৩ জোর্কানী ১—১৭০।

$$$ ঐ ১—২৯৬।

সন্তানবর্গের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ও শায়মার মুছলমান হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, আর দুইজনের এছলাম গ্রহণ করার কোন উল্লেখ আমি প্রাপ্ত হই নাই।*

হালিমার কন্যাদিগের নাম ও সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। এবনে-হেশামের মতে হালিমার এক পুত্র ও দুই কন্যা। তিনি শায়মার মূল নাম খোজামা حذامه বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে এইরূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্যার ছৈয়দ শাইমাকে Sheman বলিয়া তাহার মূল নাম দিয়াছেন Hazama হাজামা حذامه। মাওলানা শিবলী মরহুম তাঁহার জীবনীর প্রথম খণ্ডেও حذيفه وحذافه হোজাফাকে হাজিফা ও হোজাফা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমি ইবনে-ছাআদ ও এছাবা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়াছি।

## ডাঃ স্প্রেঙ্গারের অদ্ভুত মত

ডাঃ স্প্রেঙ্গার বলিতেছেন যে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিবি আমেনার কণ্ঠদেশে ও বাহুতে এক এক খণ্ড লৌহ বিলম্বিত ছিল। ইহা দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, তিনি মৃগী বা মূর্ছা বায়ু Epilepsy, falling disease পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর বিদ্বেষ-বিষ-জর্জরিত অসাধু লোকদিগের কথার প্রতিবাদ করিয়া শ্রম ও সময়ের অপব্যয় করা উচিত নহে। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগেও প্রায় সকল দেশের ও সকল জাতির লোকেরা, বিশেষতঃ তাঁহাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা, কুসংস্কার বশতঃ এইরূপ কবচ-মাদুলি এবং লৌহ বা অন্য ন্য ধাতব পদার্থ শরীরে ধারণ করিয়া থাকেন। নৈসর্গিক আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক খণ্ড লৌহ সঙ্গে রাখার প্রথা, আজও পৌত্তলিক জাতিসমূহের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে। ডাঃ স্প্রেঙ্গারের প্রদত্ত বিবরণটিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, তাহা দ্বারা বিবি আমেনার মৃগী বা মূর্ছা রোগগ্রস্ত হওয়া কোন মতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই শ্রেণীর লেখকেরা এই মিথ্যার ভিত্তির উপর ভবিষ্যতে প্রবঞ্চনার একটা বিরাট সৌধ নির্মাণ করিতে চাহেন, সেইজন্য তাঁহারা প্রথমে এইরূপে প্রস্তুত হইতেছেন। একটু পরেই আমরা এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

হযরত দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত বিবি হালিমার স্তন্যপান করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার "দুধ ছাড়াইয়া" হালিমা তাঁহাকে মাতা আমেনার সমীপে লইয়া আসিলেন। মোস্তফার অপরূপ রূপলাবণ্য এবং স্বাস্থ্যব্যঞ্জক অনুপম দেহকান্তি দর্শনে, তাঁহার স্বজনগণের বিশেষতঃ বিবি আমেনার চোখ জুড়াইয়া গেল। এই সময় মক্কার জল-বায়ু অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, এমন কি তথায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। মাতা দেখিলেন, হালিমার যত্নে এবং মরু-প্রান্তের জল-বায়ুর গুণে, তাঁহার দুলালের শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে মক্কায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব। কাজেই তিনি পুনরায় এই শিশুর লালন-পালনের ভার হালিমার হস্তে প্রদান করাই সঙ্গত মনে করিলেন।

সৌভাগ্যবতী হালিমা, হযরতকে সঙ্গে লইয়া সানন্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অবশ্য তিনি যথানিয়মে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে মাতৃসদনে আনয়ন করিতেন।

পাঁচ বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল**—উপরে সুনীল স্বচ্ছ অনন্ত আকাশ, নিম্নে দূর-বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তর, অদূরে, উপত্যকা ও অধিত্যকার ক্রোড়ে—মৌনী মহাসাধকের ন্যায় স্তব্ধ মৌন বিরাট পর্বতমালা, কোন দূর অতীতের মহাস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। প্রকৃতির চিত্র-বৈচিত্র্য, স্বভাবের মনোমুগ্ধকর মধুর সঙ্গীত, নির্মল আকাশ ও অকলুষ

---

* এছাবা ৫—৮১ ও ৮—১২৩।

** মতান্তরে ছয় বৎসর—এবনে-এছহাক।

বাতাসে, স্বভাবের ক্রোড়ে, বাসন্তী শুক্লপক্ষের বালসুধাকরের ন্যায়, শিশু-মোস্তফা দিনে দিনে কলায় কলায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন। হযরত দুধ-ভ্রাতা-ভগ্নীদিগের সঙ্গে মিশিয়া, কখনও বা মুক্ত প্রান্তরে ছাগপাল চরাইয়া বেড়াইতেন, আর কখনও বা এই রাখাল-রাজ উচ্চ পর্বতে আরোহণ করিয়া বিস্মিতভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। দূরে, অতি দূরে, দৃষ্টির অন্তরালে—চক্রবালে সান্তের সহিত অনন্তের কোলাকুলি—তিনি নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন, আর স্থির হইয়া কি এক গভীর অথচ অজানা ভাবনায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন। ধাত্রী হালিমা বলিতেন—'আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, উত্থান-উপবেশনে, কথোপকথনে বা মৌনাবলম্বনে মোহাম্মদের শৈশব-জীবনের প্রত্যেক কাজেই একটা অতি অসাধারণ মহত্ত্বের ভাব স্বতঃই যেন ফুটিয়া উঠিত।'* ভ্রাতা-ভগ্নীরা তাঁহাকে আপনাদের সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন। মোস্তফার চরিত্র-মাধুর্যে তাঁহারা সকলেই তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত বয়ঃজ্যেষ্ঠা শায়মা অতি শৈশবে হযরতকে লইয়া নাচাইতেন, আর হযরতের নৃত্যের তালে তালে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটির আবৃত্তি করিতেন ঃ**

يا ربنا ابق لنا محمدا    حتى اراه يافعا وامردا

ثم اراه سيدا مسودا    واكبت اعاديه معا والحسدا

واعطه عزا يدوم ابدا -

এই সঙ্গীতের ভাব-ছন্দের অনুবাদ বাংলা ভাষায় নামান আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তবু মোটামুটি আভাস দেওয়ার জন্য উহার মর্মানুবাদ মাত্র নিম্নে প্রদান করিতেছি—

মোহাম্মদ বেঁচে থাক, হে আমাদের খোদা
তারে আমি দেখি যেন—তরুণ, কিশোর—
তারপর সরদার, সর্বসম্মানিত,
হিংসুক ও শত্রু তার হ'ক অধঃমুখী
দাও তাকে সম্ভ্রম, চিরস্থায়ী যাহা।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### الم نشرح لك صدرك؟

### বক্ষ-বিদারণ ব্যাপার

হযরতের শৈশবকালের ঘটনা বর্ণনাকালে, তাঁহার বক্ষ-বিদারণ বা "শাক্কোচ্ছদর" সংক্রান্ত বিবরণটি উপলক্ষ করিয়া খ্রীষ্টান লেখকগণ হযরতের চরিত্রের প্রতি নানাপ্রকার অপ্রীতিকর দোষের আরোপ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, আজ-কালকার নব্যশিক্ষিত মুছলমান যুবকগণ, এই সকল ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া, স্বধর্মের প্রতি—অবশ্য অজ্ঞতা বশতঃ—অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাজেই আমরা এই বিষয়টি লইয়া বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রাচীন ইতিহাস লেখকগণ, প্রায় সকলেই একবাক্যে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। বোখারীতে না থাকিলেও, ছহী মোছলেম নামক বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ

---

* এবনে-হেশাম ১—৫৫, কামেল ১—১৬২, ১৬৩ [illegible] ২/৩—১১।

** মোহাম্মদ বেন মোআল্লা আজদী তাঁহার তারকিছ ترقيص নামক পুস্তকে এই সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়াছেন। এছাবা ৮—১২৩—২৪।

আছে। এমন কি, কোন কোন লেখক কোর্‌আন হইতে এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা সপ্রমাণ করারও চেষ্টা পাইয়াছেন।

আমরা প্রথমে ছহী মোছলেম হইতে এই বিবরণটির অনুবাদ করিয়া দিতেছি ঃ

"আনাছ বলিয়াছেন—একদা হযরত বালকগণের সহিত খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় জিব্রাইল (ফেরেশতা) তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, হযরতকে ধরিয়া চিৎভাবে শায়িত করিলেন, তাঁহার বুক চিরিয়া ফেলিলেন, তাহার পর তথা হইতে তাঁহার হৃদয় (বা হৃৎপিণ্ড—কাল্‌ব) বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে কতকটা জমারক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "শয়তানের অংশ যাহা তোমার মধ্যে ছিল, তাহা এই।" অতঃপর জিব্রাইল হযরতের হৃদয় (বা হৃৎপিণ্ডটাকে) একখানা সোনার তশ্‌তরিতে রাখিয়া জম্‌জমের পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিলেন, পরে হৃৎপিণ্ডের কাটা অংশ জোড়া লাগাইয়া দিলেন, এবং উহাকে যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন। এই সময় বালকগণ দৌড়িয়া হযরতের মাতার অর্থাৎ ধাত্রীর নিকটে গিয়া বলিল, দেখ, মোহাম্মদ নিহত হইয়াছেন। অতঃপর সকলে তাঁহার নিকট চলিয়া আসিল—তখন হযরতের চেহারা বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমি হযরতের বক্ষে সিলাইয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতাম।*

## শাস্ত্রীয় প্রমাণের আলোচনা

উল্লেখযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাদীছ গ্রন্থে এই ঘটনা সম্বন্ধে যতগুলি বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে মোছলেমের এই বিবরণটিতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এই ব্যাপার ধাত্রী হালিমার তত্ত্বাবধানে অবস্থানকালে সংঘটিত হইয়াছিল। অথচ এই আনাছ কর্তৃক মে'রাজের যে সকল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং বোখারী ও মোছলেমে তৎসংক্রান্ত তাঁহার যে সকল 'হাদীছ' বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, এই ঘটনা মে'রাজ-রজনীতেই সংঘটিত হইয়াছিল। বোখারী ও মোছলেমে এই আনাছ হইতে বর্ণিত আর একটি হাদীছে ইহাও জানা যাইতেছে যে, হযরত মক্কায় কা'বা মছজিদে নিদ্রিত ছিলেন। এই অবস্থায় এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি স্বপ্ন দেখেন, পরে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।** সুতরাং এই রেওয়ায়তগুলিকে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরতের বক্ষ-বিদারণের ঘটনা মে'রাজের রাত্রে মক্কা নগরে সংঘটিত হইয়াছিল। ঐ সকল বিবরণের প্রধান রাবী আনাছের বর্ণনা মতে ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, ইহা হযরতের নিদ্রাবস্থার ঘটনা বা স্বপ্ন মাত্র। তাহা হইলে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে জাগ্রত অবস্থায় হযরতের বক্ষ-বিদারণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া যে অভিমত পোষণ করা হইয়া থাকে, তাহা একেবারে মাঠে মারা যাইবে। এই সকল কারণে স্বয়ং ইমাম মোছলেম আনাছের শেষোক্ত রেওয়ায়ৎ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, আনাছের পরবর্তী রাবী قدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص হাদীছের অগ্রের কতকাংশ পরে এবং পরের কতকাংশ অগ্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি হাদীছে কতক কথা বাড়াইয়া ও কতক কথা কমাইয়া দিয়াছেন। অথচ এই হাদীছটি উভয় বোখারী ও মোছলেম কর্তৃকই বর্ণিত হইয়াছে।

---

* মোছলেম, ১—৯২।

** বোখারী, তাওহীদ—১৩—৩৭৫। মে'রাজের দীর্ঘ বিবরণ দিবার পর এখানে স্বয়ং আনাছ বলিতেছেন ঃ استيقظ হযরত নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। বোখারী ও মোছলেমের অন্য রেওয়ায়তেও ইহার সমর্থন হইতেছে। অহির প্রারম্ভ নামক অধ্যায়ে স্বয়ং হযরতের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে—"আমি অর্ধ জাগ্রত অর্ধ নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম......"

ছহী মোছলেমের একটি হাদীছে জানা যায় যে, আনাছ এই ঘটনার বিবরণ আবুজর ছাহাবীর নিকট হইতে অবগত হইয়াছেন। আবুজর স্বয়ং হযরতের মুখে ঐ ঘটনার কথা জ্ঞাত হইয়াছেন। কিন্তু এই হাদীছ হইতেও জানা যাইতেছে যে, আলোচ্য বক্ষ-বিদারণের ঘটনা মে'রাজের রাত্রে—সুতরাং হযরতের নবী হওয়ারও কিছুকাল পরে—মক্কা নগরে তাঁহার নিজ গৃহেই সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং শৈশবে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে, বক্ষ-বিদারণ হওয়ার কোন প্রমাণই এই হাদীছ হইতে পাওয়া যাইতেছে না। বরং এতদ্দ্বারা ঐ বিবরণের ভিত্তিহীনতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। মে'রাজের হাদীছগুলি সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হইবে।

এই ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে স্থান কাল ও অন্যান্য বৃত্তান্ত (Fact) সম্বন্ধে এত অধিক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় যে, পরবর্তী যুগের টীকাকারেরা, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ঃ

قد رقع الشق له صلعم مرارا فعند حليمة وهو ابن عشر سنين ثم عند مناجاة جبريل عليه السلام له بغار حرا ثم في المعراج ليلة الاسراء

অর্থাৎ, হযরতের বক্ষ-বিদারণ ব্যাপার কয়েকবার সংঘটিত হইয়াছিল ঃ (১) একবার হালিমার নিকট অবস্থানকালে, (২) একবার তাঁহার দশ বৎসর বয়ক্রমকালে, (৩) একবার হেরা পর্বত-গুহায় জিব্রাইলের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের সময়ে (৪) এবং একবার মে'রাজের রাত্রে।*

ইহাতেও বৃত্তান্ত ঘটিত সমস্ত অসামঞ্জস্য দূর হয় না। কাজেই "মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখকগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পঞ্চমবার আর একদফা এইরূপ বক্ষ-বিদারণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার স্থান-কালাদি নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে।

প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই বক্ষ-বিদারণ ব্যাপারের উদ্দেশ্য কি ছিল ? সকল রাবী একবাক্যে বলিতেছেন যে ঃ

(১) হযরতের শরীরে বা তাঁহার অন্তঃকরণে শয়তানের অংশ ছিল।

(২) খোদা কর্তৃক নিয়োজিত জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা বা অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণ, তাঁহার হৃৎপিণ্ড চিরিয়া তাহার মধ্যে হইতে জমাট রক্তরূপী ঐ শয়তানের অংশ—বা মতান্তরে কু-প্রবৃত্তি—বাহির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

(৩) শয়তানী অংশ বা কু-প্রবৃত্তির কোন অংশ হৃৎপিণ্ডের গায়ে জড়াইয়া না থাকিতে পারে, এজন্য বেহেশ্‌ত হইতে আনীত সোনার রেকাবীতে রাখিয়া জমজমের পানি দ্বারা তাহা উত্তমরূপে ধুইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(৪) ফেরেশতাগণ বেহেশ্‌ত হইতে একখানা সোনার তশতরী পুরিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস (হেকমত ও ঈমান) আনিয়াছিলেন, এবং হযরতের বুক চিরিয়া তাহার মধ্যে ঐ হেকমত ও ঈমান পুরিয়া দিয়া আবার তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

এই বিবরণ সত্য বলিয়া নির্ধারিত হইলে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে ঃ

(১) হযরত জন্মতঃ বা আদৌ মা'ছুম ছিলেন না।

(২) শয়তানের অংশ তাঁহার মধ্যে অত্যন্ত বলবৎ ছিল।

(৩) এই শয়তানের অংশ, শয়তানী ভাব বা কু-প্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে এত প্রবল ছিল যে,

---

* মেশকাত। মেশকাতের হাশিয়া ৫২৪ পৃষ্ঠা এবং মাওয়াহেব ও মাদারেজ প্রভৃতি।

তজ্জন্য পাঁচবার তাঁহার বক্ষ-বিদারণ করিয়া তাহা নিরাকরণের জন্য স্বয়ং খোদা তাআলাকে নিজের ফেরেশ্‌তাগণের দ্বারা চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

(৪) হযরত নবুয়ৎ পাওয়ার পরেও তাঁহার এই শয়তানী ভাব ও কুপ্রবৃত্তি দমিত না হওয়ায় মে'রাজের রাত্রিতেও তাঁহার হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রচিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছিল।

(৫) নবুয়তের পরও হযরতের হৃদয় ঈমান-শূন্য অবস্থায় ছিল।

হযরতের প্রতি একটুও ভক্তি-শ্রদ্ধা যাহার আছে, এমন কোন মুছলমান কি এই কথাগুলি স্বীকার করিতে সাহসী হইবে ? আমরা ভূমিকায় অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, এরূপ ক্ষেত্রে, রেওয়ায়তের হিসাবে হাদীছ ছহী বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহা পরিত্যক্ত হইবে। কারণ ইহা স্পষ্ট সত্য ও এছলামের মূলনীতির বিপরীত কথা। এখানে পাঠকগণকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আলোচ্য বিবরণটি রছুলের হাদীছ নহে— আনাছ নামক জনৈক ছাহাবীর উক্তি মাত্র।

আমাদের আলেমগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, কোরআনের দুইটি আয়ত যদি পরস্পর বিরোধী হয় এবং যদি তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উভয় আয়তই পরিত্যাজ্য হইবে ঃ اذا تعارضا تساقطا*

কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন অসমাধ্য গরমিল ও আত্মবিরোধ থাকা সত্ত্বেও, মানুষের বর্ণিত এই বিবরণগুলিকে অগ্রাহ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেছেন। কল্পিত গরমিলের জন্য কোরআনের আয়ত বা আল্লাহর বাণী অবাধে পরিত্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু আজগুবী ব্যাপারের এমনই মোহ যে, চরম অসমাধ্য অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, মানুষের কথিত এই বিবরণগুলি কিছুতেই পরিত্যক্ত হইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের ও আশ্চর্যের কথা আর কি হইতে পারে ?

## ঐতিহাসিক সমালোচনা

আসুন পাঠক ! এখন আমরা অন্যদিক দিয়া আনাছের বর্ণিত এই বিবরণটির বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করিয়া দেখি।

আনাছ বলিতেছেন—একদা হযরত বালকগণের সহিত খেলা করিতেছিলেন..... আমি তাঁহার বক্ষে সিলাইয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতাম।

আনাছের পরবর্তী রাবীর কথা অনুসারে, আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম যে, বস্তুতঃ আনাছ এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, আনাছ কি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, না তিনি আর কাহারও মুখে শুনিয়া উহা প্রকাশ করিতেছেন ? যদি তিনি অন্য কাহারও মুখে শ্রবণ করিয়া বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই প্রথম 'রাবী'র নাম জানা আবশ্যক। তিনি কে, কি ভাবের লোক, মুছলমান কি অমুছলমান, বিশ্বস্ত কি-না, তাঁহার পক্ষে এই ঘটনা জানা সম্ভবপর ছিল কি-না, এ-সকল প্রশ্নের মীমাংসা অগ্রে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আনাছ এই প্রসঙ্গে তাঁহার উপরিতন রাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই।

"আনাছ হযরতের মুখে শুনিয়া বলিয়া থাকিবেন"—এইরূপ সিদ্ধান্তও যুক্তিহীন। (উপক্রম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। কারণ ঃ

(১) হযরতের মুখে শুনিয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয় সে কথার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না।

---

* নূরুল-আনওয়ার। লেখক এই মত স্বীকার করেন না, কারণ এই প্রকার আত্মবিরোধ কোরআনে থাকাই অসম্ভব।

(২) মে'রাজ সংক্রান্ত তাঁহার এক বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই বক্ষ-বিদারণ বা শাক্কুচ্ছাদরের বিবরণ তিনি আবুজর গেফারীর মুখে শুনিয়াছেন বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন।* এই হাদীছের আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে। আবুজর গেফারীর বর্ণনা অনুসারে আনাছের এই বিবরণ অসত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে।

(৩) আনাছ যে সময়কার ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাঁহার জন্মই হয় নাই।** হযরত ৫৩ বৎসর বয়সে মদিনায় হিজরৎ করেন, এই সময় আনাছের বয়স ১০ বৎসর মাত্র ছিল। কাজেই বিবি হালিমার নিকট হযরতের অবস্থান তাঁহার জন্মের ৪০ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। অতএব, আনাছ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরূপে পরিগণিত হইতে পারেন না।

(৪) রাবী ছাবেৎ বলিতেছেন,—আনাছ বলিলেন, আমি হযরতের বক্ষে সিলাইয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিতাম।

## সিলাইয়ের চিহ্ন

বালক আনাছ হযরতের বক্ষে যে সিলাইয়ের চিহ্ন দর্শন করিতেন, হযরতের আর কোন সহচর কি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন ? কোন ছহী রেওয়ায়তে ইহার কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় কি ? না, কখনই নহে। হযরতের কেশাগ্র হইতে পদ নখ পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিস্তৃত ও বিশদ বিবরণ, তাঁহার বহু সহচর কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে, এবং বহু হাদীছ ও ইতিহাস-গ্রন্থে ঐ সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু অন্য কেহই এই সিলাইয়ের চিহ্নের উল্লেখ করেন নাই। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া কোন কোন লেখক বলিয়াছেন যে, ঘটনার পর সাময়িকভাবে অল্প দিনের জন্য এই চিহ্নটি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল এবং পরে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আনাছের পক্ষে ত ঐ চিহ্ন দর্শন করা একেবারে অসম্ভব। কারণ আনাছ এই ঘটনার ৪০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পরে যে চিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং দশ বৎসরের বালক আনাছ যে চিহ্নকে সিলাইয়ের চিহ্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন, আজন্ম হযরতের সহচরগণ এবং তাঁহার অতি নিকটাত্মীয়বর্গ, তাহা জানিতে, দেখিতে বা চিনিতে পারিলেন না, ইহা কি কম আশ্চর্যের কথা ?

ভূমিকায় আমরা দেখিয়াছি যে, যে কোন বিবরণ জ্ঞান চাক্ষুষ সত্য বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিপরীত, হাদীছ শাস্ত্রের সর্বজনমান্য ইমামগণ সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বা জাল ও মাউজু' বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। যে সকল হাদীছের দ্বারা এছলাম ধর্মের কোন নীতি (Principle) বা হযরতের মহিমা খর্ব হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহাও ঐ শ্রেণীর অবিশ্বাস্য ও প্রক্ষিপ্ত হাদীছের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ঃ কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানী ভাব নামক জড় পদার্থটি—যাহা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জমাট-বাঁধা রক্ত বা কাল বিন্দুর ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকে—বাহির করিবার জন্য ফেরেশতাগণের 'অপারেশন কেস' লইয়া ধরাধামে উপস্থিত হওয়া, তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া, সোনার তশতরিতে করিয়া 'নূর ও ঈমান' (জ্যোতিঃ ও বিশ্বাস) নামক পদার্থদ্বয়কে বুকের মধ্যে পুরিয়া দেওয়া, এবং এই ঘটনা উপলক্ষে বর্ণিত অন্যান্য বিবরণ পূর্বোক্ত মোহাদ্দেছগণের সর্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে অবিশ্বাস্য ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্ধারিত হইতে পারে কি-না ?

---

* মোছলেম, ১—৯২।

** বোখারী, একমাল, এছাবা,—"আনাছ," হযরতের মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ২০ বৎসর মাত্র

## কোর্‌আনের প্রমাণ

কোর্‌আন শরীফে "আলাম্ নাশ্‌রাহ্" ছুরায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

الم نشرح لك صدرك - الخ

"হে মোহাম্মদ ! আমি কি তোমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করি নাই ?" অর্থাৎ করিয়াছি।

## আয়তের ভ্রান্ত অর্থ

'শার্হ' শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা, প্রশস্ত করা। উন্মুক্ত বা প্রশস্ত হৃদয় বলিলে, জগতের সমস্ত ভাষায় তাহার যে অর্থ হইতে পারে, কোরআনের এই আয়তেও একমাত্র সেই অর্থেই ঐ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ইহার জন্য আমাদিগকে বড় বড় অভিধান ঘাঁটিকাইতে বা টীকাকারগণের মতামত উদ্ধৃত করিতে হইবে না, কোর্‌আনেই ইহার প্রমাণ আছে। ঠিক এই 'শার্হে-ছাদর' পদ, কোর্‌আনের আরও তিন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

يشرح صدره للاسلام - ولكن من شرح بالكفر صدرا -

افمن شرح الله صدره للاسلام

অর্থাৎ-"আল্লাহ্ তাহার হৃদয়কে এছলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন"* "পরন্তু যে ব্যক্তি কোফরের জন্য নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে"** "আল্লাহ্ যাহার হৃদয়কে এছলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন"*** এই সকল স্থানে শার্হে-ছাদর পদের যে অর্থ, আলোচ্য আমপারার আয়তেও তাহা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ গৃহীত হইতে পারে না।

দুই বৎসর বয়সে হযরতের 'দুধ ছাড়ান' হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই হালিমা তাঁহাকে মাতৃসদনে লইয়া যান এবং তাঁহার উপদেশ মতে আবার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনেন। ইহার "কয়েক মাস পরেই" এই ঘটনা ঘটে বলিয়া কথিত হইয়াছে।**** এইরূপ অনূর্দ্ধ তিন বৎসরের শিশু ভাল করিয়া কথা বলিতেই পারে না, অথচ এই রেওয়ায়ৎ অনুসারে, ভূতগ্রস্ত বলিয়া যখন লোকে তাঁহাকে গুণীদের নিকট লইয়া যাইবার পরামর্শ দিতেছিল, সে সময় তিনি ঃ

ما هذا ليس بي شيء مما تذكرون - ان ارادتي سليمة وفؤادي صحيح - الخ

"ব্যাপার কি ? তোমরা যাহা বলিতেছ, আমাতে সে সব কিছুই নাই। দেখ, আমার জ্ঞানের কোন তারতম্য ঘটে নাই, আমার মন সুস্থ ও অচঞ্চল, তাহার কোনই ব্যত্যয় ঘটে নাই" ইত্যাদি বলিয়া পিতামাতা ও স্বজনবর্গকে আশ্বস্ত করিতেছেন।$ আবার বক্ষ-বিদারণ-ব্যাপারের সমস্ত ইতিবৃত্তের আবৃত্তিও করিতেছেন, ইহাও কি কম অস্বাভাবিক কথা ?

যাহা হউক, বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে ফেরেশতাগণ হযরতের বক্ষ-বিদারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের কথকগণ যে গল্পটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত সত্যের কোনই সম্বন্ধ নাই। অসতর্ক রাবীদিগের কল্যাণে, মে'রাজ সংক্রান্ত হযরতের বর্ণিত স্বপ্নের বিবরণটি নানা অত্যাচারের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র।

---

* ৮ পারা ২ রুকু
** ১৪ পারা, ২০ রুকু।
*** ২৩ পারা, ১৭ রুকু।
**** কামেল, ১—১৬৪।

$ কামেল—হেশামী প্রভৃতি।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## মৃগী বা মূর্ছারোগ—ভিত্তিহীন কল্পনা

খৃষ্টান লেখকগণ সাধারণতঃ অসাধারণ আগ্রহের সহিত বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, হজরত আশৈশব Epilepsy (Falling disease) বা মৃগী ও মূর্ছারোগে পীড়িত ছিলেন। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত গল্পটাকে সূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া, বহু মিথ্যা ও কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে তাঁহারা এই জাজ্বল্যমান মিথ্যাকে জগতময় প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা বলেন—হালিমার গৃহে অবস্থানকালে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা হযরতের মূর্ছারোগেরই ফল। এই রোগগ্রস্ত হওয়াতে সময় সময় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন এবং এই রোগের বিকারেই তিনি মনে করিতেন যে, খোদার নিকট হইতে তিনি 'বাণী' বা অহি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

## মূরের পুস্তক

স্যার উইলিয়ম মূর একজন ভদ্র ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ। এ-দেশে উচ্চতম রাজপদে অধিষ্ঠান করার সময় তিনি সরকারী তহবিলের মারফতে মুছলমানেরও অনেক 'নুন' খাইয়াছিলেন। তাঁহার লেখা পড়িয়া অনুমান করা যায় যে, তিনি অল্প-বিস্তর আরবীও জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মযাজকের ফরমাইশ মোতাবেক এবং তাহাদের দুরভিসন্ধি সফল করার জন্যই যে পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহাতে ন্যায় ও সত্যের মস্তকে পদাঘাত না করাই আশ্চর্যের কথা। স্যার উইলিয়ম মূরের লিখিত Life of Mahomet বা মোহাম্মদের জীবন-চরিত নামক পুস্তকের দুইটি সংস্করণ (১৮৫৭ ও ১৮৬১ সালে) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের শেষ সংস্করণ প্রচারিত হওয়ার পর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য মহাত্মা ছৈয়দ আহমদ ছাহেব লণ্ডন হইতে Essays on the life of Mohammed নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। মহাত্মা ছৈয়দ বিশেষ করিয়া মূর সাহেবের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা এবং তাঁহার উল্লিখিত সূত্রগুলির অকিঞ্চিৎকরতা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেন। ইহার পর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মূর সাহেবের পুস্তকের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মূর সাহেব কোন গুপ্ত ও গোপনীয় কারণে বাধ্য হইয়া যে এই পুস্তকে পূর্ব-সংস্করণের প্রাগৈছলামিক যুগের আরবীয় ইতিহাস এবং "Most of the notes, with all the referene to original authorities have been omitted.....throughout amended"* প্রায় সমস্ত টীকা ও মূল পুস্তকের—যাহা হইতে বিবরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে—'বরাত'গুলি একদম হজম করিয়া দিয়াছেন, এবং কেনই বা পুস্তকখানা সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত হইয়াছে, ছৈয়দ ছাহেব মরহুমের পুস্তকের সহিত মূর সাহেবের পূর্ব-সংস্করণের পুস্তকখানা মিলাইয়া দেখিলে তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারিবে।

আলোচ্য প্রসঙ্গে ছৈয়দ ছাহেব মরহুম মূর সাহেবকে এমনি করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে তিনি পূর্ব সংস্করণের লেখাটি সংযত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে তাহা স্বীকার করার মত সৎসাহস তাঁহার নাই বলিয়া নীরবে এই কার্যটি সম্পন্ন করা হইয়াছে।

## মূরের চরম অজ্ঞতা

স্যার উইলিয়ম মূর ইংলণ্ডের একজন অদ্বিতীয় আরবী ভাষাবিদ ও এছলামিক বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত। হেশামীর বর্ণিত উছিবা [illegible] কে উমিবা [illegible] বলিয়া উল্লেখ করিয়া এবং এই উমিবা শব্দের কল্পিত অনুবাদ করিয়া তিনি পূর্ববর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

---

* নূতন সংস্করণ—ভূমিকা।

তিনি পূর্ব সংস্করণে বলিয়াছিলেন ঃ হেশামী ও তাঁহার পরবর্তী লেখকগণ বলেন, অবস্থা দর্শনে হালিমার স্বামী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বালকটি (হযরত) "had at fit" মূর্চ্ছা গিয়াছিল। তিনি পাদটিপ্পনীতে বলিতেছেন যে, আরবীতে এখানে أصيب 'উস্বিব' শব্দ আছে, উহার অর্থ মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়াছে।*

স্যার উইলিয়ম মুরের এই উক্তির প্রত্যেক বর্ণই ভিত্তিহীন কল্পিত ও জাজ্বল্যমান মিথ্যা। কারণ ঃ

১। হেশামী বা তাঁহার পরবর্তী কোন লেখকই বলেন নাই যে, 'বালক মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়াছিল' ( had a fit ) । হালিমার স্বামী ঐ কথা বলিয়াছেন বলিয়া কোথাও ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই

২। ইউরোপের ও মিসরের মুদ্রিত হেশামী আমাদের সম্মুখে আছে, কোথাও 'উস্বিব' শব্দ নাই। বরং সকল সংস্করণে أصيب 'উছিবা' শব্দই বিদ্যমান আছে **

৩ 'উছিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—"প্রাপ্ত হইয়াছে"। আরবী ভাষায় এরূপ স্থলে উহার অর্থ হয়—"ভূত-প্রেত কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছে"। সহজ বাংলায় আমরা যেমন বলিয়া থাকি—'রামকে ভূতে পাইয়াছে'।

৪। আরবী ভাষায় আমাদের সামান্য যতটুকু জ্ঞান আছে, এবং প্রধান প্রধান আরবী অভিধানগুলি বিশেষভাবে তন্ন তন্ন করিয়া যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, স্যার উইলিয়মের উদ্ধৃত এই 'উস্বিব' শব্দের অর্থও কোন মতেই "মূর্চ্ছা (Epilepsy) রোগাক্রান্ত হইয়াছে" হইতে পারে না। বরং খুব সম্ভব য-ও-ব বা য-য-ব صوب وصيب ধাতুমূলক কোন ক্রিয়াবাচক শব্দই আরবী ভাষাতে নাই।

৫। এই বিবরণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইলেও, হালিমার স্বামীর কথায় এই মাত্র জানা যাইতেছে যে, হযরত 'ভূতাবিষ্ট' হইয়াছেন বলিয়া তিনি (হালিমার স্বামী) 'আশঙ্কা' করিয়াছিলেন ঃ

وقل لى ابوه يا حليمة لقد خشيت ان يكون هذا الغلام قد اصيب

"—হে হালিমা ! আমার ভয় হইতেছে যে, বালক (মোহাম্মদ) হয়ত' ভূতাবিষ্ট হইয়াছে।" হেশামী ও তাঁহার পরবর্তী লেখকগণ এই কথারই উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। হেশামী এই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, হালিমা হযরতকে লইয়া বিবি আমেনার নিকটে উপস্থিত হইলে এবং এই সকল কথা কহিলে, তিনি (আমেনা) হালিমাকে বলিলেন ঃ

افتخوفت عليه الشيطان؟ قالت قلت نعم قالت كلا!
ما للشيطان عليه من سبيل - وان لبني لشانا -

"তুমি কি ভয় করিতেছ যে, তাঁহার উপর শয়তানের প্রভাব হইয়াছে?" হালিমা বলিলেন, "হাঁ, তাহাই বটে।" হালিমার উত্তর শুনিয়া আমেনা বলিলেন, 'অসম্ভব । তাঁহার উপর শয়তানের প্রভাব হইতেই পারে না। আমার পুত্রের মধ্যে একটা মহত্ত্বের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।'

এই উক্তি দ্বারা অকাট্যরূপে জানা যাইতেছে যে, মূর্চ্ছা, মৃগী বা অন্য কোন রোগের আশঙ্কা কেহই করে নাই। বরং নিজেদের কুসংস্কারবশতঃ সম্ভবতঃ হযরতের চরিত্রের অসাধারণ ভাব লক্ষ্য করিয়া—তাঁহাদের মনে এইরূপ একটা আশঙ্কা হইয়াছিল।***

---

* ১—২১।

** Gottingen, 1858 বুলাক ১২৯৫ হিজরী।

*** কামেল ২—১৬৪ পৃষ্ঠা।

৭. হেশামীর পরবর্তী লেখকগণ" এই ঘটনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিতেছেন : "হালিমা বলিতেছেন, তাঁহার স্বজনগণ বলিলেন, এই বালকটির 'নজর লাগিয়াছে' অথবা 'এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়' এরূপ কোন জেনে তাঁহাকে পাইয়াছে। অতএব তাঁহাকে আমাদিগের 'গুণীনের' নিকট লইয়া যাও, তিনি দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। (হযরত বলিতেছেন, তাহাদের এই সকল অকারণ আশঙ্কা ও অলীক ধারণার বিষয় অবগত হইয়া) আমি তাহাদিগকে বলিলাম, এ সকল কি (ফাজিল বকাবকি হইতেছে) ? যাহা বলা হইতেছে, আমাতে তাহার কিছুই নাই। (তোমরা দেখিতে পাইতেছ না ?) আমার জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য বা মনের কোনই বিকার ঘটে নাই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। তখন (হালিমার স্বামী) আমার দুধবাপ বলিলেন—তোমরা দেখিতেছ না, সে কেমন নির্বিকারভাবে (জ্ঞানের) কথা কহিতেছে, আমার নিশ্চিত আশা এই যে, আমার পুত্রের কোনই ভয় নাই।"

## খ্রীষ্টান লেখকগণের অসাধুতা

স্যার উইলিয়ম মূর ও তাঁহার সমপ্রকৃতিক খ্রীষ্টান লেখকগণ এই প্রক্ষিপ্ত ও অবিশ্বস্ত বিবরণের বিকৃত শব্দের ভ্রান্ত অর্থের উপর নির্ভর করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; বরং, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত মনে করিয়াই হউক আর অন্যের অন্ধ অনুকরণের ফলেই হউক, আমাদের ছয় ও সাত দফায় উদ্ধৃত কথাগুলিকে তাঁহারা একেবারে বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়াছেন। অথচ ঐ কথাগুলি তাঁহাদের উদ্ধৃত বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে—মাত্র তাহার দুই ছত্র পরে—বর্ণিত হইয়াছে।

মূর সাহেব তাঁহার নূতন সংস্করণে অনেকটা আমতা আমতা করিয়া বলিয়াছেন : "It was probably a fit of Epilepsy" সম্ভবতঃ ইহা মৃগীরোগজনিত মূর্ছা। এই অনুমান যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। কারণ, এই বক্ষ-বিদারণ ব্যাপারটিই ভিত্তিহীন ও অপ্রামাণিক কল্পনা মাত্র।

পুত্রের পঞ্চম বা ৬ষ্ঠ বৎসর বয়সে, মাতা তাঁহার প্রতিপালন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, ইহাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নাই ; এবং এই ব্যাপারের কারণ নির্দেশ করার জন্য কোন লেখকের শিরঃপীড়া হওয়ারও কোন হেতু ছিল না। কিন্তু মূর প্রমুখ খ্রীষ্টান লেখকেরা ইহারও কারণ আবিষ্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই। মূর সাহেব বলিতেছেন :

But uneasiness was again excited by fresh symptoms of a *suspicious nature* ; and she set out finally to restore the boy to his mother, when he was five years of age. (**Page 7**)

মর্মানুবাদ—কিছুকাল পরে মোহাম্মদের পাঁচ বৎসর বয়সে আবার কতকটা গোলমেলে গোছের রোগলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, হালিমা অবশেষে বালককে তাহার মাতার নিকট প্রত্যর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। (৭ পৃষ্ঠা)

ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, ইহা মহানুভব লেখকের সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা উক্তি। প্রক্ষিপ্ত ও অবিশ্বস্ত বলিয়া নির্ধারিত উপকথাগুলিতেও এই বিবরণের কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

## মিথ্যার মূল উৎস

খ্রীষ্টান লেখকগণ প্রায় সকলেই হযরতের এই Epilepsy—falling disease—মৃগী ও মূর্ছা বায়ুরোগের কথা বলিয়াছেন ; অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, কোথায়ও ইহার সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ মরহুম বহু পরিশ্রম করিয়া এই সকল মিথ্যার মূল উৎস খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাঁহার মন্তব্যের অনুবাদ করিয়া দিতেছি :

"বহু গবেষণার ফলে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই ধারণার মূল কারণ, প্রথমতঃ গ্রীক খ্রীষ্টানদিগের কুসংস্কার এবং দ্বিতীয়তঃ লাটিন ভাষায় আরবী পুস্তকের ভ্রান্ত অনুবাদ।"

"প্রিডো (Prideaux) Life of Mahomet বা 'মোহাম্মদের জীবনী' নাম দিয়া যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং যাহা ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই ধারণার সূত্রপাত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ডাঃ পোকক আবুল-ফেদার ইতিহাসের কতকগুলি অংশের যে ভ্রান্ত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই মিথ্যা ধারণার মূল ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার মূল আরবী (Manuscript) এই অনুবাদসহ ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত হয়। আমরা প্রথমে ঐ পুস্তক হইতে মূল আরবী এবং পরে ডাঃ পোককের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

فقال زوج حليمة لها قد خشيت ان هذا الغلام قد

اصيب بالحقيه باهله فاحتملته حليمة وقدمت به الى امه

(এখানে فالحقيه 'ফা-আলহেকিহে' পরিবর্তিত হইয়া" بالحقية "বিল-হাক্কিয়াতে" শব্দে পরিণত হইয়াছে।—লেখক)

পোকক সাহেব লাটিন ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন ঃ

"Tune maritus Halimoe ; multum vereor, inquit, ne puer inter populares suos morbum Hypochondriacum contraxerit.."

মূলের প্রকৃত অনুবাদ হইতেছে ঃ "হালিমার স্বামী তাহাকে বলিলেন, আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, বালকটি (কোন দুষ্টযোনি কর্তৃক) প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তুমি তাহাকে তাহার পরিজনবর্গের নিকট রাখিয়া আইস।" কিন্তু সাংঘাতিক প্রমাদ ঘটায়, ডাঃ পোকক যে অনুবাদ করিয়াছেন, বাংলায় তাহার শাব্দিক অনুবাদ এইরূপ হইবে ঃ "তখন হালিমার স্বামী কহিলেন—আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে যে, বালকটি তাহার সঙ্গীগণের নিকট হইতে Hypochondrical রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।" এই 'হাইপোকনড্রিকাল' পীড়া দ্বারা অবসাদরোগ ও বায়ুরোগকেই বুঝাইতেছে।

পূর্বকথিত মতে 'ফা-আলহেকিহে'কে 'বিল-হাক্কিয়াতে' শব্দে পরিণত করিয়া, এই অঘটন ঘটান হইয়াছে। 'ফা আলহেকিহে' ক্রিয়ার অর্থ তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও, আর হাক্কিয়াৎ স্বত্ব বা নিশ্চয়তাবোধক শব্দ। বাঙ্গালী পাঠকের নিকটও এই 'হাক্কিয়াৎ' শব্দ অপরিচিত নহে। হকিয়তের মোকদ্দমার কথা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু এই বিকৃত পদটির প্রকৃত অর্থ করিতে গেলে তাহা মোটেই খাপ খায় না, কাজেই তিনি কল্পনার সাহায্যে ইহার ঐরূপ একটা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। জন ড্যাভেনপোর্ট তাঁহার Apology নামক পুস্তকে তীব্র কঠোর ভাষায় এই ধারণার ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক গিবনও এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গ্রীক লেখকগণকে এই ধারণার সূত্রপাতকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত নোল্ডেক (Noldeke) দৃঢ়তার সহিত এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।"**

প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত খ্রীষ্টান লেখকগণের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অসাধারণ প্রতিভার ফলে জঘন্যতম মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার কিরূপ সম্প্রসারণ হইয়াছে, আমরা উপরে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিলাম

আরবী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক, দেখিতে পাইতেছেন যে, "বে-আহলিহী" শব্দের 'বে'র অনুবাদ করা হইয়াছে from বা হইতে এবং সম্ভবতঃ ইচ্ছাপূর্বক মূলের حسيبت শব্দকে خشيت শব্দে পরিণত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল কথার উল্লেখ করিতেও লজ্জা বোধ হয়।

---

* সাদ ছৈয়দ, শেষ প্রবন্ধ, ১৫ হইতে ২০ পৃষ্ঠা।

** Prof De Goeje in the first volume of "Noldeke-Fetsohrift-pp 1—5

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## বিপদের উপর বিপদ

### মাতৃবিয়োগ

মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই হযরতের পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিনি ধাত্রী হালিমার নিকট হইতে মাতৃসদনে নীত হওয়ার পর, ষষ্ঠ বৎসর বয়সে জননী তাঁহাকে লইয়া মদিনায় যাত্রা করিলেন। বিবি আমেনার এই মদিনাযাত্রার কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে যে, হযরতের পিতামহের মাতামহী মদিনার নাজ্জার বংশের কন্যা ছিলেন। বিবি আমেনা পুত্রকে লইয়া ঐ আত্মীয়গণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কেহ কেহ এ-কথাও বলিয়াছেন যে, সাধ্বী আমেনা স্বামীর সমাধি দর্শন (জিয়ারত) করিবার জন্য পুত্রকে লইয়া মদিনায় গমন করিয়াছিলেন আমাদের মতে এই সকল মতের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। বিবি আমেনা হয়ত উভয় উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মদিনায় গমন করিয়াছিলেন। তবে প্রথমটি যে গৌণ এবং দ্বিতীয়টি যে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু পাঠক ! এই যাত্রায় আমেনার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, স্বর্গের এক মহান উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে লুকাইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই বুঝি আবদুল্লাহ্‌র সমাধির নিমিত্ত মদিনাকে নির্বাচিত করা হইয়াছিল।

এই যাত্রায় মাতা আমেনা, ওম্মে-আয়মন নাম্নী তাঁহার পরিচারিকাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মদিনা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়, আবওয়া নামক স্থানে বিবি আমেনার মৃত্যু হয়। এই পিতৃমাতৃহীন বালক, পরিচারিকা ওম্মে-আয়মন কর্তৃক মক্কায় নীত হন এবং এইরূপ পিতৃমাতৃহীন শিশুপৌত্রের প্রতি বৃদ্ধ পিতামহের যেরূপ বাৎসল্য হওয়া স্বাভাবিক, আবদুল মোত্তালেব সেইরূপ বাৎসল্য সহকারে তাঁহার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

### পিতামহের মৃত্যু

পাঠক ! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, কি অসাধারণ অবস্থা ! মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই আমাদের মোস্তফা পিতৃহীন হইলেন। পিতার স্নেহ ত' দূরে থাকুক, তাঁহার মুখ দর্শনের সুযোগও তাঁহার ঘটিল না। তিনি গণিত কয়টি দিন মাত্র মায়ের কোলে অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আজ দূর মরুপ্রান্তরে আত্মীয়-স্বজন-বিহীন স্থানে, সেই স্নেহময়ী জননীও শিশু মোস্তফাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মাতৃ-বিয়োগের কঠোর শোক সংবরণ করার পূর্বে দুইটি বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই, কালের কঠোর হস্ত তাঁহাকে পিতামহের স্নেহপূর্ণ বক্ষ হইতেও অপসারিত করিয়া দিল।

### বিপদ স্বর্গের দান

এইরূপ শোকের পর শোক এবং বেদনার পর বেদনা আসিয়া, শিশু মনকে বিশ্বের বেদনা হরণের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এই বেদনাই আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম দান। তাই বালসূর্য-কিরণ-উদ্ভাসিত পূর্বাহ্ণের আলো ও তামসী রজনীর ঘোর অন্ধকারকে সাক্ষী করিয়া, আল্লাহ্ বলিতেছেন—"হে মোহাম্মদ ! আমি তোমাকে এতীম (পিতৃহীন) রূপে ধরায় প্রেরণ করিয়াছিলাম—যেন তুমি বিশ্বের সমস্ত পিতৃহীনের দুঃখ-বেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পার। হে মোহাম্মদ ! আমি তোমাকে নিরাশ্রয়

কাঙ্গাল করিয়া ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলাম—যেন তুমি বিশ্বের সকল নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল ও কাঙ্গালের সমস্ত জ্বালা ও সকল যাতনা বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে পার।"* কবি যথার্থই বলিয়াছেন ঃ

"চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

তাই দুঃখের মধ্য দিয়া, বেদনার মধ্য দিয়া, প্রেমময় বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠতম দান এবং ধর্ম ও মনুষ্যত্বের সার নির্যাস—পর-দুঃখ-কাতরতা ও বিশ্ব-প্রেম, এইরূপে মোস্তফা-হৃদয়ের স্তরে স্তরে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিতেছিল।

## আবু-তালেব

হযরতের বয়স যখন আট বৎসর, তখন ৮২ বৎসর বয়সে আবদুল মোত্তালেবের মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্বে হযরতের পিতৃব্য আবু-তালেবকে শিশুর প্রতিপালন-ভার দিয়া যান। পিতার চরমকালের উপদেশ এবং নিজের স্বাভাবিক স্নেহশীলতাবশতঃ আবু-তালেব হযরতের লালন-পালন করিতেছিলেন। কিন্তু বালক মোস্তফার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চরিত্র মাধুরী এমনই ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, আবু-তালেব তদর্শনে ক্রমশঃ তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন আবু-তালেব শেষ সময় পর্যন্ত, হযরতের প্রতি নিজের এই অনুরক্তির যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, পরের ঘটনাবলী হইতে আমরা তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।**

## খ্রীষ্টান লেখকগণের নীচতা

হযরতের শৈশবকালের অবস্থা বর্ণনাকালে মূর, মার্গোলিয়থ প্রভৃতি লেখকেরা, যেরূপ নীচ ও অসাধু প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। কোন গতিকে হযরতের বাল্য-জীবনের উপর কোন প্রকার দোষারোপ করার সুযোগ না পাইয়া, তাঁহারা অবশেষে অতি সামান্য ও স্বাভাবিক ঘটনাগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন আকারে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের পাঠকগণের মনে হযরত সম্বন্ধে প্রথম হইতেই একটা ঘৃণার ভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়। পিতামহ আবদুল মোত্তালেব শিশু পৌত্রকে অতিশয় ভালবাসিতেন, সমস্ত ইতিহাস একবাক্যে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু মার্গোলিয়থের পক্ষে ইহা অসহ্য। তাই তিনি বলিতেছেন ঃ

The condition of a fatherless lad was not altogether desirable ; and late in life Mohammad was taunted by his uncle Hamzah (when drunk) with being one of his father's slaves.(Page 46)

অর্থাৎ "পিতৃহীন বালকের অবস্থা মোটের উপর প্রীতিকর ছিল না ; এবং মোহাম্মদের শেষ বয়সে তাঁহার পিতৃব্য হামজা (মাতাল অবস্থায়) তাঁহাকে নিজ পিতার দাস বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।"

কিন্তু হামজা যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি মদের নেশায় এমনই উন্মত্ত ও পাশবিকভাবে পরিপূর্ণ যে, তখন তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলীর একটি উষ্ট্রের—জীবন্ত অবস্থায়—পেট চিরিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া ভক্ষণ করিতেছিলেন। হযরত ইহার প্রতিবাদ করায়,

* কোরআন—৩০ পারা, ৯৩ ছুরা
** এই বিবরণগুলি কোন কোন হদীছে এবং সমস্ত ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে

ঐ পাগলপ্রকৃতিগ্রস্ত মাতালটি তাঁহাকে আবদুল মোত্তালেবের গোলাম বলিয়া গালি দিয়াছিল।* হামজার তৎকালীন অবস্থায় উপনীত না হইয়া, কোন ভদ্রলোক যে, তাঁহার ঐ উক্তিটিকে হযরতের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতে পারেন, মার্গোলিয়থ সাহেবের পুস্তক পাঠ করার পূর্বে আমাদের সে ধারণা ছিল না।

হামজা বা অপর কেহ ক্রোধ বা বিদ্বেষবশতঃ স্বাভাবিক অবস্থাতেই যদি আবদুল মোত্তালেবের দাস বলিয়া হযরতকে গালি দিতেন, তাহা হইলেও কি উহা কোনক্রমে হজরতের সম্মানের হানিকর বলিয়া অবধারিত হইতে পারিত ? যীশুর স্বজাতীয় ও সমসাময়িক ইহুদিগণ ত তাঁহাকে মেরীর জারজ পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিত। মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও শাস্ত্রদ্রোহী বলিয়া তাঁহাকে ক্রুশে আবদ্ধ করতঃ নিহত করিয়া (বাইবেলের কথিত মতে) অভিশপ্ত করিয়াছিল। অধিকন্তু খ্রীষ্টানের কথিত পবিত্রাত্মা নামক ঈশ্বর কর্তৃক অন্য ঈশ্বরের (যীশুর) মাতার গর্ভধারণ করা চিরাচরিত প্রাকৃতিক নিয়মের ও জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত কথা —কিন্তু তাই বলিয়া কি বিনা তদন্তে যীশুকে মেরীর জারজ পুত্র বলিয়া নির্ধারণ করা সঙ্গত হইবে ? যদি না হয়, তাহা হইলে এই নীতিসূত্রটি এস্থলে প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ কি ?

মাতাল অবস্থায় হামজা যাহা বলিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা হইতে মার্গোলিয়থ সাহেবের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যদি অসঙ্গত নাও হয়, তাহা হইলেও এখানে সর্বপ্রথমে দেখিতে হইবে যে, বস্তুতঃ পিতামহের তত্ত্বাবধানে অবস্থানকালে হযরত প্রকৃতপক্ষেই উপেক্ষিত বা নির্যাতিত হইতেছিলেন কি-না ? কিন্তু যেহেতু সমস্ত হাদীছ ও সমস্ত ইতিহাস এ সম্বন্ধে একবাক্যে মার্গোলিয়থ সাহেবের উক্তির প্রতিবাদ করিতেছে, তাই তিনি এ-ক্ষেত্রে কোন ইতিহাস হইতে নিজের অভিমতের অনুকূল কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন নাই।

## মূরের অসাধুতা

মূর সাহেবও এইরূপ কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রকারান্তরে হযরতকে চঞ্চলমতি প্রতিপন্ন করার জন্যই এই ঘটনাগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন : "পঞ্চম বর্ষ বয়সে মাতার নিকট রাখিয়া যাইবার জন্য হালিমা তাঁহাকে লইয়া মক্কায় আসিতেছিলেন। মক্কার সীমান্তদেশে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বালকটি হারাইয়া (হালিমার সঙ্গ ছাড়া হইয়া) কোথায় উধাও হইয়া) যায়। হালিমা মহা ফাঁপরে পড়িয়া আবদুল মোত্তালেবকে সংবাদ দিলেন। আবদুল মোত্তালেব নিজের কোন এক পুত্রকে তাহার খোঁজ লওয়ার জন্য পাঠাইলেন। উপর মক্কায় বালকটি তখন এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেখানে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল এবং তাহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল।"

লেখক যে নিতান্ত অসাধু প্রবৃত্তি কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া এই শ্রেণীর ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, প্রথমেই তাহা নিবেদন করিয়াছি। এই ঘটনা সম্বন্ধে দুইটি বিষয় বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। মূর সাহেব হযরতের মৃগীরোগ প্রমাণ করার জন্য যে হেশামীর (মিথ্যা) বরাত দিয়াছিলেন, সেই হেশামীতেই এই বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। হেশামী এই ঘটনার বর্ণনাকারীদের নাম ত প্রকাশ করেনই নাই, অধিকন্তু তিনি এবনে এছহাকের উক্তিটি যে ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এবনে এছহাক নিজেই ঐ বিবরণটি মিথ্যা বলিয়া মনে করেন। এবনে এছহাক বলিতেছেন :

زعم الناس فيما يتحدثون والله اعلم

"সত্য মিথ্যা আল্লাহ জানেন, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন" ইত্যাদি। এই বিবরণে ইহাও দেখা যায় যে, রাত্রির অন্ধকারে লোকের ভিড়ে হালিমা তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মূর

---

* রোগার্ত।

সাহেব ইহাতে যথেষ্ট পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করিয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, মাতৃসদনে প্রেরিত হইবার পূর্বে, হযরত প্রথমে আবদুল মোত্তালেবের নিকট আনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া কা'বা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতে এবং তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। লেখক এই অংশগুলিকে নিজ উদ্দেশ্যের বিঘ্নকারী মনে করিয়া বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়াছেন।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

### অন্যান্য ঘটনা

### খৎনা

হযরত মাতৃগর্ভ হইতে 'মাখতুন' (ত্বকচ্ছেদকৃত) অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বিবরণটি যে ছহী (বিশুদ্ধ) নহে, মুছলমান আলেমগণ ঐতিহাসিক হিসাবে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এমন কি, সপ্তম দিবসে আবদুল মোত্তালেব যে যথা নিয়মে তাঁহার 'খৎনা' করিয়াছেন, হাদীছে ও ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ আছে।* ফলতঃ মুছলমানগণ এই বিষয়টিকে কোন গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। কিন্তু মুর প্রমুখ লেখকগণ এই ব্যাপারটিকে খুব গুরুতর করিয়া তুলিয়াছেন। এবং উহা যে অস্বাভাবিক ও মিথ্যা কল্পনা, ইহা প্রমাণ করার জন্য কালি-কলমের যথেষ্ট অপব্যবহারও করিয়াছেন।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ঐরূপ ঘটনা আদৌ অস্বাভাবিক নহে। সম্ভবতঃ আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই এরূপ দুই একটি বালককে ব্যক্তিগতভাবে অবগত আছেন, যাহাদিগের খৎনা করিবার বা 'মুছলমানী' দিবার আবশ্যক নাই। ইহাকে এ-দেশের মুছলমানেরা 'খোদাই খৎনা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

### হযরত (সঃ) মানুষ

হযরত মাতার সঙ্গে মদিনায় অবস্থানকালে, কবে আত্মীয় বালক বালিকাগণের সহিত খেলা করিয়াছিলেন, কবে ঘরের চালের উপর হইতে পাখী উড়াইয়া দিয়াছিলেন— খৃষ্টান লেখকগণ বহু কষ্টে এইরূপ কয়েকটা ঘটনা আবিষ্কার করিয়া নিজেদের ঐতিহাসিক জীবনকে সার্থক করিয়াছেন। [কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত ছিল যে, মুছলমানেরা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে ঈশ্বর, ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের অবতার বা অতি-মানুষ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের পক্ষে, ঘুণাক্ষরে এইরূপ বিশ্বাস করাও অতি ঘৃণিত মহাপাপ।] এই শ্রেণীর নর-পূজা ও অতি-মানুষের কল্পনা যাহাতে কখনও এছলামে স্থান লাভ করিতে না পারে, এইজন্য মুছলমানের বীজমন্ত্র স্বরূপ কলমায়ে শাহাদতে "মোহাম্মাদান আব্দুহু অ-রাছুলুহু" অর্থাৎ— "মোহাম্মদ আল্লাহর দাস এবং তাঁহা কর্তৃক নিয়োজিত" এই অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোরআন এই শ্রেণীর নর-পূজা, গুরু-পূজা ও অতি-মানুষবাদের তীব্রতর প্রতিবাদ করিয়াছে। কোরআনে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ঃ

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد فمن كان
يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا

---

* মাজমা-উল-বেহার, ১—৩৩৩। জাদুল-মাআদ, ১—১৯। হায়াতু মিয়দিল আক্‌বর ১ : ৫৬ পৃষ্ঠা

"(মোহাম্মদ!) তুমি সকলকে বলিয়া দাও যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগের ন্যায় একজন মানব বই আর কিছুই নহি। আমার নিকট এই ভাববাণী আসিয়া থাকে যে, তোমাদিগের প্রভু—একই প্রভু। অতএব যে ব্যক্তি আপন প্রভুর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা করে, সে সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করুক এবং তাহার প্রভুর পূজা-উপাসনায় আর কাহাকেও অংশভাগী না করুক।*

হযরত স্বয়ং বলিতেছেন ঃ

انما انا بشر اذا امرتكم بشئ من امر دينكم فخذوا به و

اذا امرتكم بشئ من رائى فانما انا بشر- (مسلم)

"আমি একজন মানুষ বই আর কিছুই নহি। অতএব যখন আমি তোমাদিগকে ধর্ম-সংক্রান্ত কোন আদেশ প্রদান করিব, তাহা মানিয়া লইবে, কারণ আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রেরণা প্রাপ্ত না হইয়া ধর্ম-সংক্রান্ত কোন কথা বলি না। কিন্তু আমি যখন নিজের মত অনুসারে তোমাদিগকে (পার্থিব) কোন বিষয়ের আদেশ করি, তখন আমিও তোমাদিগের ন্যায় একজন মানুষ বই আর কিছুই নহি।" অর্থাৎ তাহাতে তোমাদিগের ন্যায় আমারও কোন সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, কোনটা ভুলও হয়।

হযরত বিশেষ তাকিদ সহকারে বলিয়া গিয়াছেন ঃ 'সাবধান! খ্রীষ্টানেরা যেরূপ মরিয়মের পুত্র যীশুকে বাড়াইতে বাড়াইতে অসীম ও নিরাকার "পরম পিতার" আসনে বসাইয়া দিয়াছে, তোমরা যেন আমার সম্বন্ধেও সেরূপ অতিরঞ্জন করিও না, আমি ত' আল্লাহ্‌র একজন দাস ও তাঁহার বার্তাবহ ব্যতীত আর কিছুই নহি।'** .

কোরআন ও হাদীছ হইতে এরূপ শত শত প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এছলামের বিশেষত্ব এইখানে। অতএব হযরত বাল্যকালে একদিন কোন বালকের সহিত খেলা করিয়াছিলেন বা চালের পাখী উড়াইয়া দিয়াছিলেন, অথবা সহচর বালকদিগের সঙ্গে মিলিয়া বন্য বৃক্ষ হইতে "বুচ" ফল পাড়িয়া খাইয়াছিলেন, মানুষের ভিড়ে হারাইয়া গিয়াছিলেন—ইত্যাদি কথার উল্লেখ করায় এই শ্রেণীর লেখকগণ জগতের সম্মুখে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন মাত্র, উহাতে হযরতের মহিমার কোনই ক্ষতি হইতে পারে না।

## হযরতের শিক্ষা

আমাদিগের পাঠক-পাঠিকাগণ হয়ত ভাবিতেছেন—ধাত্রীর আবাসে মাতার স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে এবং পিতামহ ও পিতৃব্যের যত্নে হযরতের জীবনের প্রথম যুগ অতিবাহিত হইতে চলিল, অথচ তাঁহার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হইতেছে না, ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। আরবদেশে বিশেষতঃ কোরেশদিগের মধ্যে, সেকালে সন্তানদিগের লেখাপড়া শিখাইবার নিয়মই ছিল না। এমন কি, ইহার চল্লিশ বৎসর পরেও তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা অঙ্গুলিতে গণনা করা যাইতে পারিত। ফলতঃ আমাদের হযরত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে উম্মি বা নিরক্ষর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি যে লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, আনকাবুৎ ছুরায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (২১ পারা, ১ম

---

* কাহফ, ১১ রুকু।

** মোছলেম—মেশকাত—২৮।

রুক্কু। । তিনি কোন পাঠশালায় গিয়া থাকিলে বা কোন গুরুর নিকট লেখাপড়া শিখিলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও দেশস্থ লোকদিগের তাহা অবিদিত থাকিত না। তাহা হইলে এই সূত্রে তাঁহারা কোরআন অবিশ্বাস করিতেন এবং হযরতকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা পাইতেন। ইহা ব্যতীত হযরতের জীবনের, বিশেষতঃ শেষ ২৩ বৎসরের সমস্ত ঘটনা বিশ্বস্ত হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার কুত্রাপি এমন একটি প্রমাণও পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা তাঁহার অক্ষর-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। বরং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ছাড়াও, তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা দ্বারা ইহার বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যায়। ফলতঃ হযরত যে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। এমন কি, মার্গোলিয়থ প্রমুখ খ্রীষ্টান লেখককেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে ঃ

What is known as education he clearly had not received. It is certain that he was not as a child taught to read and write...... The form of education which consisted in learning by heart the tribal lays was also denied him. (Page 69)

অনুবাদ ঃ শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, মোহাম্মদ তাহা আদৌ প্রাপ্ত হন নাই। ইহা নিশ্চিত যে, শৈশবে তাঁহাকে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। ....... আরবীয় গোত্রসমূহের মধ্যে প্রচলিত 'গাথা'গুলি মুখস্থ করিয়া যে শিক্ষা লাভ হয়, সে শিক্ষাও তিনি প্রাপ্ত হন নাই।

কিন্তু দুই দিন পরে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডারই এই নিরক্ষর বালকের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া ধন্য হইল। জ্ঞানের এমন তথ্য তিনি প্রচার করিলেন,—এমন অজ্ঞাতপূর্ব সত্য লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, যাহা দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইল, মুগ্ধ হইল। যুগে যুগে জ্ঞানের গবেষণা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সেই সকল অজ্ঞাতপূর্ব ও অচিন্তিতপূর্ব তথ্যের সত্যতা ও গুরুত্ব ততই অধিক উপলব্ধি হইতে থাকিবে। এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে কুসংস্কার-জর্জরিত মূর্খ জাতির মধ্য হইতে এক নিরক্ষর বালক সমদ্ভূত হইতেছেন—আর রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, দেশ-শাসন ও প্রজাপালন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি, দর্শন-বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে এমনই সুন্দরভাবে নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেছেন যে, সমস্ত দুনিয়া আজ পর্যন্ত তাঁহার একটির সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না।*

এই নিরক্ষর বালকের হৃদয়ে কোথা হইতে জ্ঞানের উন্মেষ হইল, মোস্তফা-চরিতামৃত সাগরের মূল উৎস কোথা হইতে আসিল ? অনন্ত জ্ঞানের সেই মহীয়ান মহাকেন্দ্র হইতে জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া, মোস্তফার মোবারক হৃদয়কে বিকশিত ও উদ্ভাসিত করিয়াছিল।—ইহার নাম শারহেছ্ছাদর, ইহারই নাম হৃদয়ের সম্প্রসারণ—এক কথায় ইহারই নাম নবুয়ৎ।

ইহা অপেক্ষা মহত্তম মো'জেজা আর কি হইতে পারে ?

یتیمے کہ ناکردہ قرآں درست
کتب خانۂ چند ملت بشست

---

* পুস্তকের ২য় খণ্ডে এই সকল বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইবে।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## সিরিয়া যাত্রা

### বাহিরা রাহেব

কথিত আছে যে, হযরতের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, সেই সময় তিনি স্বীয় পিতৃব্য আবু তালেবের সমভিব্যাহারে শাম বা সিরিয়া দেশে যাত্রা করেন। এই সময় সিরিয়ার বোছরা নগরের এক গির্জায় বাহিরা নামক একজন খৃষ্টান-ধর্মযাজক অবস্থান করিতেন। নানা প্রকার অলৌকিক ব্যাপার যেমন হযরতকে বৃক্ষ প্রস্তরাদির ছেজদা করা, তাঁহার উপর মেঘের ছায়া করা, হযরতের দিকে বৃক্ষ ছায়ার সরিয়া আসা, ইত্যাদি দর্শন করিয়া বাহিরা চিনিতে পারিয়াছিলেন যে, ধর্মশাস্ত্রে যে শেষ নবী আসিবার কথা ছিল, তিনি আসিয়াছেন ; এবং তিনি মক্কাবাসীদিগের এই বাণিজ্য-অভিযানের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। ফলে, বাহিরা কোরেশ বণিকগণকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। হযরত তখন নিতান্ত বালক ছিলেন বলিয়া কোরেশগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণে লইয়া যান নাই, হযরতকে দেখিতে না পাইয়া বাহিরা তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, ইহাতে বণিকেরা বলেন যে, "সেই বালকটি আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া তাহাকে মনজেলে রাখিয়া আসা হইয়াছে।" কিন্তু বাহিরা হযরতের জন্য খুবই ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। ফলে তাঁহাকে তখন নিমন্ত্রণের মজলিছে উপস্থিত করা হয়। ইনিই যে জগতের শেষ নবী এবং বাইবেলের লিখিত সমস্ত লক্ষণই যে ইঁহাতে যথাযথভাবে পাওয়া যাইতেছে, বাহিরা কোরেশ প্রধানদিগকে সে কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। অতঃপর অন্য সকল লোক চলিয়া গেলে এই বৃদ্ধ ধর্মযাজক হযরতকে অনেক প্রশ্ন করেন এবং তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়ায় তাঁহাকে বলেন যে, আপনিই জগতের শেষ নবী। অতঃপর বাহিরা আবু-তালেবকে ভূয়ঃভূয়ঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন যে, ইহুদীদিগের দেশে ইঁহাকে লইয়া যাইও না, তাহা হইলে তাহারা লক্ষণ দেখিয়া ইঁহাকে চিনিয়া লইবে এবং ইঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। অগত্যা আবু-তালেব শীঘ্র শীঘ্র নিজের কাজ-কাম সারিয়া তাঁহাকে লইয়া মক্কায় চলিয়া আসিলেন।*

একটু পরিবর্তন, পরিবর্ধন সহকারে এই গল্পটি প্রায় সমস্ত চরিতপুস্তকে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি, তিরমিজী নামক হাদীছ গ্রন্থে, আবু-মুছা আশআরী হইতে এই মর্মে একটি হাদীছও উল্লিখিত হইয়াছে। এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবু-তালেব হযরতকে সঙ্গে লইয়া বাণিজ্যার্থে সিরিয়া বা শামদেশে যাত্রা করেন। এই যাত্রায় কোরেশ প্রধানগণের মধ্যে অনেকেই আবু-তালেবের সঙ্গী হইয়াছিলেন। ইঁহারা (পূর্ব বর্ণনা অনুসারে) বাহিরা নামক জনৈক খৃষ্টান সন্ন্যাসীর মঠের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের মালপত্র নামাইতেছেন—এমন সময় উক্ত বাহিরা রাহেব সেখানে আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মক্কাবাসীরা পূর্বেও বহুবার ঐ মঠের সন্নিকটে 'পড়াও' করিয়াছেন, কিন্তু রাহেব কখনও তাঁহাদের পানে ফিরিয়া দেখিতেন না। যাহা হউক, বাহিরা ঘুরিতে ঘুরিতে হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই ত' সকল জগতের সরদার, এই ত' আল্লাহর রছুল—আল্লাহ্ ইঁহাকে সর্বজগতের জন্য নিজের করুণারূপে আবির্ভূত করিবেন।" বাহিরার কথা শুনিয়া কোরেশ প্রধানগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সকল তত্ত্ব আপনি কোথা হইতে অবগত হইলেন ? বাহিরা তদুত্তরে বলিলেন—আপনারা যে মুহূর্তে মক্কা হইতে বহির্গত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত হইতে প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডই এই বালককে ছেজদা করিবার জন্য অধঃমুখে ভূপতিত হইয়াছে। এমন কি, তাহাদিগের মধ্যে একটি বৃক্ষ বা একখানা প্রস্তরখণ্ডও বাদ যায় নাই। আর ইহা স্থির নিশ্চিত যে, বৃক্ষ ও প্রস্তর 'নবী' ব্যতীত অন্য কাহাকেও ছেজদা করে

---

* বোখারী, ৫১—৫২৭ প্রভৃতি। হযরতের বয়স তখন ৯—১২ বৎসর। জাদুল-মাআদ, ১—১৭ পৃঃ। আমার মতে যাজকের নাম বোহায়রা নহে—বাহিরা ; এছাবা প্রভৃতি দেখুন।

না। অধিকন্তু আমি ইঁহাকে 'মোহরে নবুয়ত' দেখিয়াও চিনিতে পারিতেছি। অতঃপর বাহিরা স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাদিগের জন্য একটি ভোজের আয়োজন করিলেন। বাহিরা খানা আনয়ন করিলে দেখা গেল যে, হযরত সেখানে উপস্থিত নহেন। অতএব তাঁহার অনুরোধ মতে তাঁহাকে ডাকান হইল। এই সময়ে আর সকলে একটা গাছের ছায়ায় সমবেত হইয়াছেন। হযরত সেখানে আসিতেছেন, এমন সময় দেখা গেল যে, একখণ্ড মেঘ তাঁহার মাথার উপর ছায়া করিয়া আছে। যাহা হউক, হযরত ঐ বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে, উহার ছায়া তাঁহার দিকে সরিয়া গেল! তখন, বাহিরা রাহেব বলিয়া উঠিলেন—"দেখুন, দেখুন, গাছের ছায়া উঁহার দিকে সরিয়া গেল!" অতঃপর রাহেব কোরেশদিগকে পুনঃপুনঃ দিব্য দিয়া বলিতে লাগিলেন'—সাবধান সাবধান, উঁহাকে যেন রুম (খ্রীষ্টান) দিগের নিকট লইয়া যাইবেন না। কারণ, রুমীয়গণ তাঁহাকে দেখা মাত্র লক্ষণ দ্বারা চিনিয়া ফেলিবে এবং তাঁহার প্রাণবধ করিবে।' রাহেব এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময় তাকাইয়া দেখে, সাতশত রুমীয় তথায় উপস্থিত। তাহারা রুম দেশ হইতে আসিতেছে। বাহিরা আগন্তুকগণকে তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিতে লাগিলঃ "সেই নবী এই মাসে বহির্গত হইবে—তাই প্রত্যেক পথে আমাদিগের লোক গিয়াছে এবং এই জন্য আমরাও তোমার এই পথে আগমন করিয়াছি।" যাহা হউক, বাহিরা অনেক বুঝাইয়া-সুজাইয়া আগন্তুকগণকে নিরস্ত করিলেন। তাহার পর রাহেবের অবিশ্রান্ত উপদেশ ও অনুরোধের ফলে, আবু-তালেব হযরতকে মক্কায় ফিরাইয়া দেন এবং وبعث معه ابو بكر بلالا আবু বাকর বেলালকেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। (তিরমিজী, ২য় খণ্ড, নবুয়তের প্রারম্ভ প্রকরণ)। ইহা ব্যতীত হাকেম তাঁহার মোস্তাদরাক গ্রন্থে এই হাদীছ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন।* স্যার উইলিয়ম মূর এবং ডাঃ মার্গোলিয়থ প্রভৃতি খ্রীষ্টান লেখকগণ বিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে বাহিরা ও নাস্তুরা প্রভৃতি খ্রীষ্টান যাজকগণের এই সকল গল্পের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কারণ, এতদ্দ্বারা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, খ্রীষ্টান যাজকগণের শিক্ষা ও সংসর্গের ফলেই হযরতের মনে নূতন ধর্মভাবের উন্মেষ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই গল্পটিই যে একেবারে ভিত্তিহীন উপকথা, নিম্নের আলোচনা হইতে তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

## গল্পের ঐতিহাসিক ভিত্তি

আমরা এই পুস্তকের ভূমিকায় দেখিয়াছি যে, মোহাম্মদ-এবনে-এছহাকের ইতিহাসই বর্তমান ইতিবৃত্তগুলির মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থকার তাঁহার ইতিহাসে বাহিরা-সংক্রান্ত গল্পটি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি তাহার কোন ছনদ বা সূত্র-পরম্পরার উল্লেখ করেন নাই। অর্থাৎ এবনে এছহাক তাঁহার জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্বকার এই ঘটনার বিবরণ যে কোন্ কোন্ রাবীর প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছেন, তাঁহার পুস্তকে তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে এই রেওয়ায়তটির কোনই মূল্য নাই। স্বয়ং এবনে এছহাকই যে এই রেওয়ায়তটিকে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহা তাঁহার রেওয়ায়তের ভাষা হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি এই বিবরণের প্রত্যেক ঘটনার পূর্বে زعموا এবং فيما يزعمون পদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ ঃ "লোকে মনে করে" অথবা "লোকে যেরূপ অনুমান করিয়া থাকে।" সুতরাং এই রেওয়ায়তটি যে ভিত্তিহীন এবং গ্রন্থকার যে তৎসম্বন্ধে নিজের উপর কোন প্রকার দায়িত্ব রাখেন নাই, তাহা তাঁহার ভাষা হইতেই প্রতিপাদিত হইয়া যাইতেছে।

---

* ২য় খণ্ড, ৬১৫ পৃষ্ঠা।

## আভ্যন্তরিক প্রমাণ

এই গল্পে স্বীকার করা হইতেছে যে, বাহিরা রাহেবের মঠ ও কোরেশ বণিকগণের মনজেল পরস্পর সংলগ্ন ছিল। ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, যাহাতে একটি লোকও ভোজে অনুপস্থিত না থাকে, সে সম্বন্ধে বাহিরা কোরেশ বণিকগণকে বিশেষরূপে তাকিদ করিয়া গিয়াছিলেন। তিরমিজীর হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভোজের পূর্বেই বাহিরা কোরেশগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া হযরতকে "নবী" বলিয়া চিনিয়াছিলেন এবং সকলের সম্মুখেই তাহা ঘোষণাও করিয়াছিলেন। পূর্বে যে বাহিরা কোরেশদিগকে কোন প্রকার আমল দিতেন না, তাহাও এই সকল বিবরণে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও কোরেশগণ সকলেই ভোজসভায় উপস্থিত হইলেন, আর বালক হযরতকে মনজেলে ফেলিয়া গেলেন—রেওয়ায়তের এই বর্ণনাটাকে কোন মতেই স্বাভাবিক বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ যে আবু-তালেব পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের 'আবদার অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে সুদূর সিরিয়া পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন', তিনি যে নিমন্ত্রণ-ভোজের সময় তাঁহাকে উষ্ট্রের আস্তাবলে ছাড়িয়া যাইবেন, এ কথায় কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

এই রেওয়ায়তে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, বাহিরা যাজক আবু-তালেবকে বিশেষ তাকিদ সহকারে বলেন যে, এই বালককে লইয়া সিরিয়ার মধ্যে গমন করিবেন না। অন্যথায় তথাকার ইহুদীগণ ইঁহাকে "সেই নবী" বলিয়া চিনিতে পারিবে—এবং হিংসাবশতঃ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু তিরমিজী ও মোস্তাদরাকের বর্ণিত হাদীছে ইহুদীর পরিবর্তে খৃষ্টানের কথা বলা হইয়াছে। এবনে-এছহাকের রেওয়ায়তে বলা হইয়াছে যে, আবু-তালেব শীঘ্র শীঘ্র নিজের কাজ-কাম শেষ করিয়া হযরতকে লইয়া মক্কায় ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাহিরার উপদেশ মতে আবু-তালেব হযরতকে অবিলম্বে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। ইহা ব্যতীত দুই বিবরণে আরও যে সকল অসামঞ্জস্য আছে, বিজ্ঞ পাঠকগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

## হাদীছের পরীক্ষা

আসুন পাঠক ! এখন আমরা মোহাদ্দেছগণের নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে তিরমিজী ও মোস্তাদরাকের বর্ণিত হাদীছটির পরীক্ষা করিয়া দেখি। এ সম্বন্ধে আমাদিগের যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি নিম্নে যথাক্রমে নিবেদন করিতেছি ঃ

(১) স্বয়ং ইমাম তিরমিজী এই হাদীছটির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه

অর্থাৎ—এই হাদীছটি হাছান ও গরীব, এই ছনদ ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা এই হাদীছটি অবগত হইতে পারি নাই ! ইমাম ছাহেব যখন কোন হাদীছকে যুগপৎভাবে 'হাছান ও গরীব' বলিয়া উল্লেখ করেন, তখন তাহার যে কি তাৎপর্য হইবে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু ইমাম ছাহেব নিজেই বলিতেছেন ঃ

هو ما لا يكون في اسناده متهم ولا يكون شاذا - او يروى من غير وجه نحوه

এই উদ্ধৃতাংশের সাধারণতঃ যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, (ক) যে হাদীছে দুর্নামগ্রস্ত কোন ব্যক্তি অথবা 'শাজ' রেওয়ায়ৎ বর্ণনাকারী কোন রাবী নাই এবং (খ) আরও একাধিক রেওয়ায়ৎ দ্বারা ঐ মর্মের হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে ;—এই দুই প্রকারের হাদীছ 'হাছান' নামে আখ্যাত হইতে পারে।* যাহা হউক, এই হাদীছটি যে শেষোক্ত শ্রেণীর 'হাছান' নহে,

---

* অছুলে হাদীছ—সৈয়দ শরীফ জোর্জানী।

তাহা তিরমিজীর প্রদত্ত সংজ্ঞার শেষাংশ হইতে স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যাইতেছে। কারণ আলোচ্য হাদীছটির উল্লেখ করিবার পরই তিনি বলিতেছেন যে, অন্য কোন সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণিত হয় নাই। তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, ইমাম ছাহেব এই হাদীছটিকে প্রথমোক্ত প্রকারের 'হাছান' বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। অর্থাৎ এই হাদীছের রাবীগণের মধ্যে দুর্নামগ্রস্ত বা শাজ হাদীছ বর্ণনাকারী কোন রাবী বিদ্যমান না থাকায় উহা 'হাছান' পর্যায়ভুক্ত হইতেছে। কিন্তু আমরা ইহাকে সমীচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কারণ এই রেওয়ায়তে শাজ হাদীছ বর্ণনাকারী কোন রাবী বিদ্যমান না থাকিলেও, শাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট মোনকার-হাদীছ বর্ণনাকারী রাবী বর্তমান আছেন। তিরমিজীর প্রথম রাবী—ফজল-বেন-ছহল, ইনি বহু মোনকার হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।* তাহার পর এই হাদীছের এক রাবী আব্দুর রহমান বেন-গজওয়ান, হাকেম ও তিরমিজী উভয় ছনদই ইহাতে সম্মিলিত হইতেছে। কোন কোন মোহাদ্দেছ ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য ও সত্যবাদী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ ইহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আবু হাতেম বলেন—এই লোকটি সত্যবাদী বটে, কিন্তু উহার বর্ণিত হাদীছ প্রমাণরূপে উপস্থিত করা যাইতে পারা যায় না। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ইমাম এহয়া-এবনে-ছঈদ কাত্তান ও ইমাম আহমদ-এবনে-হাম্বল এই রাবীকে "অত্যন্ত জঈফ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইহার হাদীছকে 'মোজতারব' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম জাহবী 'মীজানুল-এ'তেদাল' পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

وانكر ما له حديثه — فى سفر النبى صلعم وهو موافق مع ابى طالب الى الشام وقصة بحيرا — ومما يدل على انه باطل قوله ورده ابو طالب وبعث معه ابو بكر بلالا — وبلال لم يكن بعد خلق وابو بكر كان صبيا — (ميزان الاعتدال)

অর্থাৎ—আব্দুর রহমানের মোনকার হাদীছ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মোনকার এই হাদীছটি—যাহাতে আবু-তালেবের সহিত হযরতের সিরিয়া যাত্রা ও বাহিরার গল্পের উল্লেখ আছে। এই হাদীছটি যে বাতিল তাহার একটা প্রমাণ এই যে, "আবুবাকর বেলালকে হযরতের সঙ্গে দিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন"—হাদীছে এইরূপ বিবরণ বিদ্যমান আছে। অথচ বেলালের তখন জন্মই হয় নাই, আর আবুবাকর তখন নিতান্ত বালক ছিলেন।**

তিরমিজীর বর্ণিত এই হাদীছের আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করার পর 'লামআত' পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فلذا ضعفوا هذا الحديث وحكم بعضهم ببطلانه (لمعات)

এই কারণে মোহাদ্দেছগণ এই হাদীছকে জঈফ বলিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহাকে বাতিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।***

অতএব উপরের বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণ সমূহের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে—

(১) ইমাম তিরমিজী এই হাদীছটিকে 'হাছান' বলিয়া উল্লেখ করিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা 'হাছান' নহে। কারণ উহাতে এরূপ দুইজন রাবী আছেন—যাঁহারা মোনকার হাদীছ রেওয়ায়ৎ করেন। অধিকন্তু এই হাদীছের একজন রাবীকে বহু গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ 'জঈফ' বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন।

(২) বহু গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ এই হাদীছটাকে মোনকার, জঈফ ও বাতিল বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন, সুতরাং উহা প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

---

* জহুরে হাদীছ—সৈয়দ শরীফ গোর্জানী

** মীজান, তক্রীব প্রভৃতি।

*** তিরমিজীর টীকায় উদ্ধৃত।

(৩) আলোচ্য হাদীছটিকে 'হাছান' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, উহা ছহী হাদীছের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ যখন স্বয়ং তিরমিজী ঐ হাদীছটাকে যুগপৎভাবে গরীব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন উহার মর্যাদা আরও অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে।

## হাদীছটি যুক্তির হিসাবেও অগ্রাহ্য

দেরায়ৎ বা যুক্তির হিসাবেও দেখা যাইতেছে যে, এই হাদীছটির উপর কোনমতেই আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। কারণ উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবুবাকর বেলালকে হযরতের সঙ্গে মক্কায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অথচ সর্ববাদীসম্মতরূপে তখন আবুবাকর দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক মাত্র। অধিকন্তু এই ঘটনার সময় বেলালের জন্মই হয় নাই। পক্ষান্তরে আবুবাকর যে এই যাত্রায় হযরতের সঙ্গে ছিলেন না, ইতিহাসের ও হাদীছের রেওয়ায়তে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এদিকে বেলালের সহিত আবুবাকরের সংস্রব হয়—উভয়ের এছলাম গ্রহণের পর। যে হাদীছে এবং যে রাবীর হাদীছে এহেন নির্লজ্জ মিথ্যা কথা সন্নিবেশিত থাকে, সে রাবীর সাক্ষ্য বা ঐ প্রকার হাদীছ সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য। সুতরাং উহা প্রমাণস্থলে ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

এই হাদীছে আরও কথিত হইয়াছে যে, হযরত ও তাঁহার স্বজনগণ মক্কা হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে এবং বাহিরার মঠ-সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এমন একখানা প্রস্তর অথবা এমন একটি বৃক্ষ ছিল না—যাহা হযরতকে ছেজদা করার জন্য ভূপতিত হয় নাই। কিন্তু হযরত ইহা দেখিলেন না, আবু-তালেব বা অন্য কোন কোরেশ তাহা দেখিলেন না, দুনিয়ার আর একটি প্রাণীও তাহা দেখিতে পাইল না ;—তাহা দেখিলেন বহুদূরে অবস্থিত বাহিরা রাহেব—তাঁহার মঠের কোণে বসিয়া ! ইহা অপেক্ষা আজগুবী কথা আর কি হইতে পারে ? সে যাহা হউক, আমরা ভূমিকায় দেখাইয়াছি যে, এই শ্রেণীর বিবরণ যে হাদীছে বিদ্যমান থাকে, মোহাদ্দেছগণের মতে তাহাও অবিশ্বাস্য ও অগ্রাহ্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বৃক্ষ ও প্রস্তরের পক্ষে হযরতেক ছেজদা করা এবং ছেজদা করার জন্য ভূপতিত হওয়া, যথাক্রমে এছলামের মূল শিক্ষা এবং নিত্য প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কথা।

এই বাহিরার ব্যাপারটি কল্পনার বাহাদুরী ফলাইতে ফলাইতে অবশেষে এমন জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পরবর্তী লেখকগণ অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াও সে সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহাদের চির প্রচলিত প্রকৃতি অনুসারে তাঁহারা এখানেও দুইজন বাহিরা রাহেবের কল্পনা করিয়া রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।* সে যাহা হউক, বাহিরা-সংক্রান্ত এই বিবরণটি সত্য হইলে উহা হযরতের জীবনের একটি প্রধান এবং চিরস্মরণীয় ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত। অথচ হযরত তাঁহার জীবনে কস্মিনকালেও ঐ ঘটনার আদৌ কোন উল্লেখ করেন নাই। যে সকল কোরেশ বণিক এই যাত্রায় আবু-তালেবের সঙ্গে এবং বাহিরার ভোজদিতে উপস্থিত ছিলেন—তাঁহারা প্রায় সকলেই ত' ক্রমে ক্রমে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল প্রত্যক্ষদর্শীদিগের মধ্যে একজনও আভাসে-ইঙ্গিতে এই ঘটনার বা তাহার কোন অংশের কখনই কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারা যাইতেছে যে, পরবর্তী কোন রাবীর কল্পনাই এই বিরাট বাহিরা-বিভ্রাটটার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

## অন্যপক্ষের প্রথম প্রমাণ ও তাহার খণ্ডন

এই আলোচনা প্রসঙ্গে বিপক্ষ পক্ষ হইতে যে সকল যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়া থাকে, এখানে সংক্ষেপে তাহারও আলোচনা করা হইতেছে। তাঁহারা বলেন, হাফেজ এবনে

---

* এছাবা।

হাজর এই হাদীছ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহার রাবীগণ সকলেই যখন বিশ্বস্ত, তখন হাদীছটাকে একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন ? তাঁহার মতে হাদীছের শেষাংশটুকু প্রক্ষিপ্ত, সুতরাং সেইটুকু মাত্র বাতিল। অতএব ঐটুকু মাত্র বাদ দিয়া হাদীছের অবশিষ্ট অংশটিকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আমাদিগের মতে হাফেজ ছাহেবের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এ-সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই হাদীছের সমস্ত রাবী যে ثقة বা বিশ্বস্ত নহেন—উপরে ইহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। স্বয়ং হাফেজ এবনে হাজর, আবদুর রহমান-এবনে-গজওয়ানের ভ্রম-প্রমাদ ও তাঁহার মামালিক সংক্রান্ত বাতিল রেওয়ায়তের উল্লেখ করিয়া প্রকারান্তরে আমাদিগের উক্তির সমর্থনই করিয়াছেন।* পক্ষান্তরে হাফেজ ছাহেবের সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি হাদীছের শেষ অংশটুকুকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও হাদীছটাকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। কারণ তখনও প্রশ্ন হইবে যে, ঐ প্রক্ষিপ্ত অংশটুকুকে হাদীছের মধ্যে কে ঢুকাইয়া দিল ? অবশ্য, আলোচ্য হাদীছের কোন একজন রাবীই এই অন্যায় কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায়, যে রাবী ইচ্ছা পূর্বক বা ভ্রমবশতঃ হাদীছে এমন অসঙ্গত ও অসংলগ্ন কথা ঢুকাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার বর্ণিত সমস্ত বিবরণই অবিশ্বাস্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

## বিপক্ষের দ্বিতীয় প্রমাণ ও তাহার খণ্ডন

হাকেম মোস্তাদরাক গ্রন্থে এই হাদীছ বর্ণনা করার পর বলিয়াছেন ঃ

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

অর্থাৎ, বোখারী ও মোছলেমের অবলম্বিত শর্তানুসারে এই হাদীছটি ছহী। অতএব হাদীছটি যখন ছহী এবং মর্যাদায় বোখারী ও মোছলেমের হাদীছের সমান, তখন উহার বর্ণিত বিবরণটিও সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে।**

এ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, আলোচ্য হাদীছটাকে ছহী বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আবুবাকর সে যাত্রায় হযরতের সঙ্গে সিরিয়ায় গমন করিয়াছিলেন, অথচ ইহা সর্ববাদীসম্মত মিথ্যা। পক্ষান্তরে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে, বেলাল নিজের জন্মগ্রহণের বহু বৎসর পূর্বে হযরতের সঙ্গে মক্কায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমরা এহেন জাজ্বল্যমান মিথ্যাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম।

এ সম্বন্ধে আমাদিগের দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, হাকেমের ছহী বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়ার কোনই মূল্য নাই। অভিজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, হাকেম বহু জঈফ, এমন কি জাল ও মাউজু হাদীছকে এই প্রকারে ছহী বলিয়া সার্টিফিকেট দান করিয়াছেন। অধিক দূর যাইতে হইবে না, হাকেম তাঁহার মোস্তাদরাকের যে পৃষ্ঠায় বাহিরার হাদীছটাকে ছহী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পৃষ্ঠাতেই আরও তিনটি হাদীছ তাঁহা কর্তৃক ছহী বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। অথচ রেজাল শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত ইমাম জাহাবী তাঁহার 'তালখিছ' পুস্তকে এই হাদীছত্রয়কে জাল, মাউজু ও বাতেল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বাহিরা সংক্রান্ত হাদীছটির উল্লেখ করিয়াও ইমাম জাহাবী ঐ প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। হাকেমের মোস্তাদরাকের সহিত ইমাম জাহাবীর 'তালখিছ' মিলাইয়া পাঠ করিলে এই প্রকার শত শত প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারিবে। ফলতঃ এ সম্বন্ধে হাকেমের সার্টিফিকেটের কোনই মূল্য নাই। শায়খুল-এছলাম ইমাম এবনে তাইমিয়া বলিতেছেন ঃ

---

* তাহজিবুৎ-তাহজিব ** মোস্তাদরাক, ২—৬১৫ পৃষ্ঠা।

واما تصحيح الحاكم — فهذا مما انكره عليه ائمة العلم
بالحديث- وقالوا ان الحاكم يصحح احاديث وهي موضوعة
مكذوبة عند اهل المعرفة بالحديث.... وكذلك احاديث
كثيرة في مستدركه يصححها وهي- عند اهل العلم بالحديث
موضوعة- (التوسل والوسيلة)

ইহার সারমর্ম এই যে, হাকেমের ছহী বলার কোনই মূল্য নাই। তিনি অনেক সময় মিথ্যা ও জাল হাদীছকেও ছহী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।* উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বাহিরা সংক্রান্ত বিবরণটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

### بالاے سرش ز ہوشمندی * می تافت ستارۂ بلندی

### যৌবনের প্রথম সাধনা

### ওকাজ–মেলাক্ষেত্রে আরব

বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে হেজাজ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে আরবদিগের এক একটা মহাসম্মেলন আরম্ভ হইত। এই সকল সম্মেলনের সময় নিকটবর্তী হইলে লোকের আনন্দ ও উৎসাহের অবধি থাকিত না। আরব জাতির প্রত্যেক গোত্রের এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া যাইত। এই সকল সম্মেলনে বাণিজ্য–সম্ভারাদি ক্রয়–বিক্রয় ত পুরা দমে চলিতই, ইহা ব্যতীত ঐ সকল মেলার বিভিন্ন অংশে সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব কোন্দল এবং বংশ ও গোত্রের বড়াই লইয়া কবি ও কুলজী–বিশারদ পণ্ডিতগণের প্রতিভার পরীক্ষা হইত। বিভিন্ন গোত্রের প্রধান প্রধান কবিগণ কেবল সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা হিসাবেও আসরে অবতীর্ণ হইয়া নিজেদের অসাধারণ ধী–শক্তি ও অনুপম প্রতিভার পরিচয় দিতেন। প্রধান প্রধান বীর ও যোদ্ধাগণ নিজেদের শৌর্যবীর্য ও রণ–পাণ্ডিত্যের এবং অতীত বিজয়–কাহিনীর আবৃত্তি করিয়া সম্মেলন–ক্ষেত্রে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেন। ইহা ব্যতীত, বাজী রাখিয়া ঘোড়দৌড়, জুয়া খেলা, মদ্যপান ইত্যাদি ত হরদম অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতে থাকিত। যে সকল স্থানে এই প্রকার বাজার লাগিত, তাহার মধ্যে ওকাজের মেলাটি ছিল সর্বপ্রধান। পূর্বকথিত মতে, স্বগোত্রের কৌলিন্যের স্পর্ধা ও পরগোত্রীয়গণের কুৎসা–কলঙ্ক রটনা, কবিগণের আখড়াই, বক্তাদিগের সাহিত্যিক লড়াই ও বীরত্বের বড়াই এবং জুয়া, মদ ও ব্যভিচার সেখানকার জাঁকজমকের প্রধান উপকরণ ছিল। অধিকাংশ সময় ইহা দ্বারা যে কত প্রকার সর্বনাশের সূত্রপাত হইত, প্রাগৈছলামিক আরব–ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের পাঠকবর্গ আলোচ্য বৎসরের ওকাজ–সম্মেলনের ফলাফলের একটু নমুনা নিম্নে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।**

### ফেজার সময়

এই ওকাজের মেলাক্ষেত্র হইতেই ফেজ্জার যুদ্ধের কালানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা হেজাজের প্রায় সমস্ত গোত্র ও গোষ্ঠীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আলোচ্য বৎসরে

---

* তাওয়াচ্ছুল, ১০১ পৃষ্ঠা। ** মা'জামুল–বোলদান, ৬—২০৩ প্রভৃতি।

সমবেত আরবগণের অহঙ্কার এবং তাহাদের মূর্খতা ও দুর্ধর্ষতা নানা প্রকারে প্রকট হইয়া উঠে এবং নানা উপলক্ষ ও উপকরণের মধ্য দিয়া ফেজার সমরে পরিণত হইয়া যায়। হযরত কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন—এমন সময় ফেজার যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং পর পর পাঁচ বৎসর পর্যন্ত ইহার কাল-অগ্নিনল অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে। এই সময় হযরতের বয়স যে কত বৎসর হইয়াছিল—ঐতিহাসিক হিসাবে তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। চরিতকার ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এক দল বলিতেছেন—হযরতের দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ফেজার যুদ্ধের সূত্রপাত এবং তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাহার অবসান হইয়াছিল। এবনে-হেশাম ও এবনে-এছহাক প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, হযরতের চতুর্দশ বৎসর বয়সে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং তাঁহার বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ঐ যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়।* আমার মতে শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি অধিকতর সমীচীন। কারণ সর্ববাদীসম্মতরূপে জানা যাইতেছে যে, হযরত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতৃব্যগণ শেষ যুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন।

ফেজার সমরের মূল কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অল্পবিস্তর মতভেদ বিদ্যমান থাকিলেও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথমে কোরেশ ও কায়েছ বংশের মধ্যে এই যুদ্ধের সূচনা হয়। তাহার পর আরবের প্রচলিত প্রথানুসারে এই দুই গোত্রের আত্মীয় ও বন্ধু, অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও দুই পক্ষে যোগদান করিয়া এই ভীষণতার চিত্রকে ভীষণতর করিয়া তুলিতে থাকে। এই যুদ্ধের শেষভাগে হযরতকেও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয়। এই সময় হযরত যে স্বীয় পিতৃব্যগণের সঙ্গে ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। হযরত ইহাও বলিয়াছেন যে—

كنت انبل على اعمامى اى ارد عنهم نبل عدوهم اذا رموهم بها

"আমি আমার পিতৃব্যগণকে শত্রুপক্ষের 'তীর' হইতে রক্ষা করিতেছিলাম—অর্থাৎ শত্রুপক্ষ তাঁহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলে আমি সেই তীর ফিরাইয়া দিতাম।" খ্রীষ্টান লেখকগণ, এই উপলক্ষে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, হযরত এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এজন্য যথেষ্ট পণ্ডশ্রম স্বীকারও করিয়াছেন। অথচ যে انبل শব্দের দ্বারা তাঁহারা নিজেদের অভিমত সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, রেওয়ায়তে তাহার অর্থও সাথে সাথে স্পষ্টীকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমস্ত অভিধানই এই অর্থের সমর্থন করিতেছে। ইমাম ছোহেলী প্রমুখ পণ্ডিতগণ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হযরত এই যুদ্ধে আদৌ অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই।** আর যদি সপ্রমাণই হয় যে, এই যুদ্ধে হযরত অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাহা দ্বারা কিছুই আসিয়া যাইবে না। সমস্ত ইতিহাসের বর্ণনা হইতে অকাট্যভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোরেশের বিপক্ষগণই নিতান্ত অন্যায় করিয়া এই যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিল। কাজেই কোরেশগণের পক্ষে অস্ত্রধারণ করাতে ন্যায় ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে।

## হযরতের জীবন্ত মো'জেজা

চারিবারের জয়পরাজয় ও বহু বলিদানের পর পঞ্চম বৎসর সন্ধিসূত্রে এই কালসমরের আশু অবসান হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, হযরত যুদ্ধক্ষেত্রে একপ্রকার নিস্পন্দভাবে স্বীয় পিতৃব্যগণের সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরতের পিতৃব্য জোবের এবনে আবদুল মোত্তালেব এই যুদ্ধে 'আলম-বরদার' বা

---

* সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহের সহিত এবনে-হেশাম ১—৬২, মোস্তদরাক ২—৬০৩ প্রভৃতি মিলাইয়া দেখুন।

** হালবী, এবনে-হেশাম, শিবলী প্রভৃতি।

পতাকাধারীর কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই দুইটি ব্যাপারে আল্লাহ্‌র এক মঙ্গল ইঙ্গিত লুকাইয়া ছিল বলিয়া মনে হয়। জোবের ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ পূর্বেও বহু ন্যায় বা অন্যায় সমরে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বে স্বহস্তে বহু স্বদেশবাসী ও আত্মীয়-স্বজনকে সম্মুখ সমরে নিহত করিয়াছেন। সমরক্ষেত্রে মরণ-বিভীষিকার নিষ্ঠুর, নির্মম এবং তাণ্ডব ও বীভৎস দৃশ্য তাঁহারা অনেকবার দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কস্মিনকালেও তাহাতে তাঁহাদের বুকে একটুও বেদনার সৃষ্টি হয় নাই, বেদনা ত দূরের কথা, বরং সে দৃশ্য দর্শনে তাঁহাদের পাশব আনন্দ শতগুণে বাড়িয়াই গিয়াছে।

কিন্তু পাঠক ! এবার জোবেরের সে পাশবভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। তিনি সমরক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসার অব্যবহিত পর হইতে অত্যাচার ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার জন্য—সেজন্য শক্তি সংগ্রহের নিমিত্ত—বদ্ধপরিকর হইলেন। এ অভূতপূর্ব এবং কল্পনার অতীত পরিবর্তনের কারণ কি ? পক্ষান্তরে তরুণ যুবক মোস্তফাকে সেই পরামর্শ সভার অন্যতম সমর্থকরূপে দেখা যাইতেছে, তিনি আজীবন দৃঢ়তার সহিত সেই সভার সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ রাখিতেছেন—তাহার প্রত্যেক শর্তটি পালন করার জন্য আন্তরিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন, ইহারই বা হেতু কি ? যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এবং তথায় হযরতের ও তাঁহার পিতৃব্য জোবেরের একত্র অবস্থান ইত্যাদি ঘটনা, সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে পাঠক মাত্রই ইহার কার্যকারণ পরম্পরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস; তাহা হইলে লেখকের ন্যায় তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে, সমরক্ষেত্রে দুইটি মাত্র প্রাণী নীরবে এই কাল অভিনয়ের শোচনীয়তার আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রথম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)—যিনি যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া ধীর-গভীর দৃষ্টিতে এই অহেতুক-অনাচার ও তাহার পরিণতি দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় তাঁহার পিতৃব্য জোবের—পতাকা রক্ষার জন্য যিনি নিশ্চয়ই যুদ্ধে যোগদান করিতে সমর্থ হন নাই। উভয় পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র যে যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র অবস্থান করিতেছিলেন, ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব এই সকল অবস্থার অনুশীলন দ্বারা সঙ্গতভাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এবার হযরতের সহিত চিন্তার আদান-প্রদানের ফলেই জোবেরের মনে এই নূতন ভাবের অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই জন্যই সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি অনতিবিলম্বে এই অভিনব 'সত্যসেবক সঙ্ঘ' গঠন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

## হল্‌ফল ফজুল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা

এই সময় মক্কায় আবদুল্লাহ্‌ এবনে জদআন নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। সততা, দানশীলতা ও অতিথিসেবার জন্য তিনি আরবময় বিশেষ-খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ছহী মোছলেম প্রভৃতি গ্রন্থে বিবি আয়েশার রেওয়ায়তে ইঁহার এই সকল সদ্গুণরাজি সম্বন্ধে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, বাহ্যতঃ জোবেরের আহ্বান মতে হাশেম, জোহরা প্রভৃতি বংশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি আবদুল্লাহ্‌র গৃহে সমবেত হইলেন। সভার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া রাখা হইয়াছিল, কাজেই আহূত ব্যক্তিগণ ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আবদুল্লাহ্‌র গৃহে সমবেত হইলে সকলে ঐ সকল অনাচারের প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পূর্বে নিয়ম ছিল, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, স্বগোত্রস্থ বা স্ববংশস্থ কোন ব্যক্তি অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন লোক শত অন্যায় অত্যাচার করিলেও সকলকে তাহার সমর্থন করিতেই হইবে; ইহাতে অন্যায় অত্যাচারের বিচার করাই অন্যায় বলিয়া নির্ধারিত হইত। আলোচ্য পরামর্শ সভার সদস্যবর্গ স্থির করিলেন—আরবের এই ব্যবস্থা নিতান্ত অন্যায় এবং ইহাই তাহার সর্বনাশের প্রধান কারণ, অতএব এই অন্যায় ও অধর্মের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন ঃ

(ক) আমরা দেশের অশান্তি দূর করার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

(খ) বিদেশী লোকদিগের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

(গ) দরিদ্র ও নিঃসহায় লোকদিগের সহায়তা করিতে আমরা কখনই কুণ্ঠিত হইব না।

(ঘ) অত্যাচারী ও তাহার অত্যাচারকে দমিত ও ব্যাহত করিতে এবং দুর্বল দেশবাসীদিগকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিব।*

কোন কোন ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

تعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن مع المظلوم حتى يودى
اليه حقه، مابل بحر صوفة -

অর্থাৎ, সমবেত জনগণ আল্লাহ্‌র নামে হলফ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, তাঁহারা উৎপীড়িত ও অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থন করিবেন এবং অত্যাচারীর নিকট হইতে লোকের স্বত্বাধিকার আদায় না করিয়া নিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। যতদিন সমুদ্রে একটি লোম সিক্ত করার মত পানি অবশিষ্ট থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা বলবৎ রহিবে।** এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কিছুদিন পর্যন্ত বেশ কাজ হইয়াছিল, তবে কালক্রমে বিশেষতঃ এছলাম আবির্ভূত হওয়ার পর কোরেশ দলপতিগণ এই প্রতিজ্ঞার কথা এক প্রকার বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি এই নূতন ভাবের প্রথম ভাবুক এবং যিনি এই নবীন প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা, তিনি জীবনের কোন মুহূর্তে এই প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হন নাই। বদর যুদ্ধের বন্দীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার সময় তিনি এই প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছিলেন। একদা এই প্রসঙ্গের উল্লেখকালে হযরত জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন ঃ

لو قال قايل من المظلومين يا آل حلف الفضول! لاجبت -
لان الاسلام انما جاء باقامة الحق ونصرة المظلوم -

"আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে—'হে ফজুল প্রতিজ্ঞার ব্যক্তিবৃন্দ !" আমি নিশ্চয় তাহার সেই আহ্বানে সাড়া দিব। কারণ, এছলাম আসিয়াছে ত কেবল ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং উৎপীড়িত, অত্যাচারিতকে সাহায্য করিতে।"***

## এই অধ্যায়ের শিক্ষা

অনেকে মনে করিয়া থাকেন—কেবল নামায, রোযা ইত্যাদি কয়েকটা ফরজ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার নামই এছলাম। ইহা ব্যতীত মানুষের প্রতি মানুষের অন্য যে সকল কর্তব্য আছে, সেগুলিকে তাঁহারা দুনিয়াদারী ও রাজনীতি বলিয়া উল্লেখ করেন এবং তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অনৈছলামিক বরং এছলামের সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা। নিজের, নিজের স্বজনগণের, প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীদিগের এবং বিশ্ব-মানবের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে, তাহা যথাযথভাবে পালন করাই এছলাম। মানুষকে আল্লাহ্ যে স্বত্ব ও অধিকার দান করিয়াছেন, তাহা তাহাকে আদায় করিয়া লইতে হইবে—সঙ্ঘবদ্ধভাবে অত্যাচারীর নিকট হইতে সেই অধিকার বলপূর্বক আদায় করিয়া দিতে হইবে। এজন্য কর্মীসঙ্ঘ গঠন, সেবকগণের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে এক কেন্দ্রে সমবেতকরণ এবং সেই সমবেত শক্তি

---

* প্রায় সকল ইতিহাসে এই প্রতিজ্ঞার উল্লেখ আছে। এইগুলি সকলের সার সঙ্কলন।

** হালবী, ১—১৩৩ ; তাবকাত ১—৮২, প্রভৃতি।

*** দাহলান, ১—১০২ ; হালবী, ১—১৩১ পৃষ্ঠা ;

দ্বারা অত্যাচার দমনের চেষ্টাই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রথম ছুন্নত—তাঁহার জীবনের মহান আদর্শ। পক্ষান্তরে আলোচ্য প্রতিজ্ঞায় নিরপেক্ষতার যে মহান আদর্শটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। শাসন ও বিচারক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতার অভাব ঘটিলে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মানবের ভীষণ অধঃপতন হইয়া থাকে। এই নিরপেক্ষতার অভাব হেতু নেতা ও পরিচালকগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তিরও খর্ব হইয়া যায়। জালেম আত্মীয় হউক আর পর হউক, মুছলমান হউক আর অমুছলমান হউক, সেদিকে কোন প্রকার দৃকপাত না করিয়া তাহার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে, ইহাও এই অধ্যায়ের শিক্ষা। পূর্বে যে দেখিতে দেখিতে দুনিয়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এছলাম ধর্মের প্রসার ঘটিয়াছিল, ইহা তৎকালীন মুছলমানদিগের গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতার ফল নহে। বরং তখন মুছলমান সমাজ এছলাম ধর্মের আদর্শ স্বরূপে দুনিয়ার সম্মুখে দেখাইয়াছিল তাহারা কত উদার, কত মহান। তাহারা দেখাইয়াছিল, সত্যের সেবা এবং ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষাই তাহাদের মোছলেম-জীবনের প্রধানতম কর্তব্য। মোছলেম জাতীর চরিত্রের এই অনুপম বিশেষত্বই তখন জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে কোটি কোটি নর-নারী স্বেচ্ছায় তাওহীদ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। কিন্তু এখন এ-আদর্শেরও একান্ত অভাব এবং এই অভাবের কুফলও ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, দুনিয়ার লোক পুথি-পুস্তকের স্তূপ হাঁটকাইয়া কোন ধর্মের বিচার করে না। সাধারণতঃ ধর্মের বিচার হয় সেই ধর্মাবলম্বী লোকদিগের আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাহাদের ভাব, চিন্তা ও মানসিকতার মধ্য দিয়া। চিন্তাশীল পাঠক ও ভক্তি-ভাজন আলেমবৃন্দকে এই কথাগুলি একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

## প্রথম যৌবনের বৃত্তি ও ব্রত

হযরত বাল্যকালে বিবি হালিমার পুত্রগণের সহিত ছাগল চরাইতে যাইতেন, এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বোখারী, মোছলেম প্রমুখ বিখ্যাত হাদীছগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াও—সম্ভবতঃ বাণিজ্যে লিপ্ত হইবার পূর্বে—তিনি ছাগ-মেষাদি পশুপাল চরাইয়া তাহা দ্বারা জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করিতেন। এই সময় মক্কার এই তরুণ যুবক পশুপাল লইয়া দূর প্রান্তরে এবং উচ্চ উপত্যকা ভূমিতে উপস্থিত হইতেন। ছাগ শিশুগুলি উপত্যকার উপর লাফাইয়া বেড়াইত, আবার মায়ের ডাক শুনিয়া ছুটিয়া তাহার কোলে আসিত। এই অবোধ পশু এবং তাহার সদ্যজাত শিশু, প্রেম ও বাৎসল্যের এই স্তবকগুলি কাহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে—এ প্রশ্ন তাঁহার মনে সতত জাগিয়া উঠিত। কখন তিনি উপত্যকা ভূমি হইতে একটা সুপক্ক ফল আহরণ করিয়া মুখে দিতেন। আহা, কত মিষ্ট ইহা, কেমন মধুর ইহা। যিনি এই ফলগুলি পয়দা করিয়াছেন, যিনি তাহার মধ্যে এমন মধু ঢালিয়া দিয়াছেন, না জানি তিনি কত মিষ্ট, কত মধুর—এভাব তাঁহার অন্তঃকরণে জাগিয়া উঠিত। দূর চক্রবালে সান্তের সহিত অনান্তের কোলাকুলি দেখিয়া তিনি অনেক সময় ভাবে বিভোর হইতেন এবং কোন এক অজ্ঞাত অনন্তের পরিচয় পাইবার জন্য বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিতেন। আবার নগরে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার কর্মযোগের সাধনা আরম্ভ হইত। কোথায় কোন পিতৃহীন অন্নের অভাবে ক্রন্দন করিতেছে, কোথায় কোন বিধবা-অনাথা কি বেদনায় চোখের জল ফেলিতেছে, তখন তিনি তাহার সন্ধান লইতেন—তাহার প্রতিকার ও অপনোদনের চেষ্টা করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার তখনকার বৃত্তি এবং ইহাই ছিল তখনকার ব্রত। এই ভাবে তাঁহার জীবনের ২৪টি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। হযরতের পিতৃব্য আবু-তালেব, ভ্রাতুষ্পুত্রের এই সময়কার অবস্থা দর্শনে আনন্দে ও গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছেন ঃ

وابيض يستسقى الغمام بوجهه    ثمال اليتامى عصمة للارامل

স্ফটিকবর্ণ যে, তাহার বদনমণ্ডলের দোহাই দিয়া মেঘপুঞ্জ পানি ভিক্ষা করিয়া থাকে। সে যে নিঃস্ব অনাথের শরণ—সে যে দুঃখিনী বিধবার রক্ষক।*

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

### তাহেরা ও আল্-আমীন

عشق اول در دل معشوق پیدا می شود
تا نسوزد شمع کی پروانه شیدا می شود

### বিবি খদিজা

বিবি খদিজা প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারিণী। রূপে, গুণে ও বংশমর্যাদায়, মোটের উপর তিনি হেজাজের অদ্বিতীয় মহিলা বলিয়া পরিকীর্তিত হইতেন। কোছাই হযরতের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ, বিবি খদিজার বংশ-শাখাও এই কোছাই-এ গিয়া তাঁহার সহিত মিলিয়া যাইতেছে। পূর্বে যথাক্রমে আবুহালা ও আতিক নামক দুই ব্যক্তির সহিত বিবি খদিজার বিবাহ হইয়াছিল। কয়েকটা পুত্র-কন্যা রাখিয়া তাঁহারা উভয়েই পরলোক গমন করেন। যে সময়কার কথা বলিতেছি, তখন বিবি খদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর। তাঁহার পিতা খোওয়ায়লেদ ফেজার যুদ্ধের পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত চরিত-অভিধান সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, চরিত্রের পবিত্রতা ও স্বাভাবিক শুদ্ধাচারের জন্য বিবি খদিজা আরবদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এমন কি, এজন্য লোকে শেষে তাঁহাকে নামের পরিবর্তে 'তাহেরা' (শুদ্ধাচারিণী বা সতী-সাধ্বী) বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল এবং কালে মূল নাম চাপা পড়িয়া এই জনগণ-প্রদত্ত উপাধিই তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল।**

### হযরতের নূতন নাম

হযরত বাল্যকালেই জনসাধারণের নিকট 'ছাদেক' বা সত্যবাদী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠা ও সাধুতা এবং স্বভাবগত অন্যান্য মহিমার জন্য তিনি জনসমাজে 'আমীন' বা সাধু বলিয়া খ্যাত হইতে লাগিলেন। আমরা এই অধ্যায়ে যে সময়কার কথা আলোচনা করিতেছি, তখন হযরত পঁচিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। এই সময়েই তাঁহার সদ্গুণরাজি এমনইভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে যে,

ليس له صلعم اسم - بمكة الامين لما تكامل فيه من خصال الخير -

তাহার ফলে তাঁহার অন্যান্য নামগুলি ঢাকা পড়িয়া যায় এবং তখন মক্কায় 'আমীন' ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন নামই ছিল না।*** কুদরৎ যেন নিজ হস্তে এমনই করিয়া

---

* এছলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কোরেশগণ হযরতের প্রাণের বৈরী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন আবু তালেব হযরতের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন। উদ্ধৃত অংশটি সেই কবিতার ১১০টি পদের মধ্যে একটি পদ। মাজমাউল-বেহার ১—১৬৩ পৃষ্ঠা। উদ্ধৃত পদটি যে সেই কবিতার অংশ, হাদীছ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই জন্য এখানে কেবল এইটুকু উদ্ধৃত হইল। দেখুন—কানজুল-ওম্মাল, এবনে-আসাকেরের প্রমুখাৎ বর্ণিত হযরতের উক্তি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা।

** এস্তিয়াব ২—৭১৮ ; এছাবা ৮—৬০ পৃষ্ঠা, মাওয়াহেব ১—৩৮।

*** দালায়েল ১—৫৪, হালবী ১—১৩২, খাছাএছ ১—১০ ও ১১ পৃষ্ঠা। বাইবেল নূতন নিয়ম, যোহন ৯ অধ্যায় ১১—১২ পদ দেখুন

মোছলেম জগৎ-জননী সাধ্বী তাহেরাকে সাধু আল্ আমীনের সহধর্মিণী'র যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন। এই দুইটি নাম পরিবর্তন বাস্তবিকই দুনিয়ার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা স্বর্গের মঙ্গল ইঙ্গিত বা ধরাধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাস মাত্র।

## খদিজার আহ্বান

মক্কার বাণিজ্য অভিযানের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, সেজন্য সকলে প্রস্তুত হইতেছে। বিবি খদিজার দাস ও কর্মচারীবৃন্দও সেজন্য নিজেদের বিপুল বাণিজ্য-সম্ভারাদি গোছগাছ করিয়া লইতেছেন। এমন সময় বিবি খদিজার প্রেরিত একটি লোক আসিয়া হযরতকে তাঁহার অভিবাদন জানাইয়া বলিল—'বিবি খদিজা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন।' কিছুক্ষণ পরে হযরত বিবি খদিজার বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি স-সম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন যে, 'হে পিতৃব্য পুত্র !

انى دعانى الى البعثة اليك مابلغنى من صدق حديثك
وعظم امانتك وكرم اخلاقك - الخ

'আপনার সত্যনিষ্ঠা, আপনার বিশ্বস্ততা ও মহানুভবতা এবং আপনার চরিত্র-মহিমা বিশেষরূপে অবগত আছি বলিয়াই আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম। আপনি যদি আমার কাফেলার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি যাহার পর নাই বাধিত হইব। অবশ্য এজন্য আমি আপনাকে অন্যাপেক্ষা দ্বিগুণ (বখরা বা পারিশ্রমিক) দিতে প্রস্তুত আছি।' হযরত তখনই এই প্রস্তাবের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি যথোচিত অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া পিতৃব্য আবু-তালেবকে এই সাক্ষাতের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করতঃ তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন। হযরতের মুখে বিবি খদিজার প্রস্তাবের কথা অবগত হইয়া আবু-তালেব যাহার পর নাই আনন্দিত হইলেন। একে আবু-তালেবের 'পোষ্য পরিবার' অনেক, তাহার উপর দেশবিকার মন্বন্তর। আবু-তালেব বিবি খদিজার প্রস্তাবকে 'গায়বী তাঈদ' বলিয়া মনে করিলেন। বিবি খদিজার বাণিজ্য-অভিযানের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হওয়া বৈষয়িক হিসাবে কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এবনে-ছাআদ প্রমুখ চরিতকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে সময় একা তাঁহার বাণিজ্য-সম্ভার অন্যান্য সকল বণিকের সমবেত সম্ভারের সমান হইত। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আবু-তালেব বিবি খদিজার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

কাফেলা প্রস্তুত হইল, বিবি খদিজা তাঁহার সুযোগ্য ও বিশ্বস্ততম দাস মায়ছারাকে সঙ্গে দিলেন এবং তাহাকে হযরতের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে বিশেষ তাকিদ করিলেন। কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল।

সাধারণ ইতিহাসগুলি পাঠ করিলে মনে হয় যে (ক) হযরত একবার বিবি খদিজার বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। (খ) ইহাই হযরতের জীবনের প্রথম ও শেষ বাণিজ্য। কিন্তু এই দুইটি সিদ্ধান্তই যে অপ্রকৃত, হাদীছ ও রেজাল শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এছলামের পূর্বে যাঁহারা হযরতের সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ-এবনে-আবুল হামছা ও কায়েছ-এবনে-ছায়েব মাখজুমী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা নিজ মুখেই হযরতের সাধুতা ও মধুর স্বভাবের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।* পক্ষান্তরে বিবি খদিজার বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া হযরত যে পুনঃপুনঃ শাম, এমন প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন, হাদীছ হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে তিনি দুইবার (এমনের) جرش জোরেশ নামক স্থানে বাণিজ্য-যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, এই উপলক্ষে অন্ততঃ একবার হোবাশা নামক স্থানে যাত্রা করার

---

* আবু দাউদ ২য় খণ্ডের নিজিস্ব বাব এবং এছাবা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। হযরত যে মায়সারার সমভিব্যাহারে দুইবার সিরিয়ায় গমন করিয়াছিলেন, এই সকল বিবরণে আমরা তাহাও জানিতে পারিতেছি।* হোবাশার বাজারে হাকিম-এবনে-হেজামের সহিত ক্রয়-বিক্রয়ের সংবাদও এই সকল বিবরণে পাওয়া যায়।

## বিবি খদিজার উপর মোস্তফা চরিত্রের প্রভাব

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার গুণগরিমা অবগত হইয়া সাধ্বী খদিজা পূর্ব হইতেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কার্যক্ষেত্রে ব্যবসায়-কর্ম উপলক্ষে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা এবং অনুপম চরিত্রমাধুরীর বিষয় সম্যকরূপে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই অনুরাগ ক্রমে ক্রমে পবিত্র প্রেমে পরিণত হইল এবং তিনি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার সহধর্মিণী হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হযরত অবিবাহিত তরুণ যুবক, আর খদিজা কয়েকটি সন্তানের গর্ভধারিণী চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা। তাঁহার রূপ-গুণ বিশেষতঃ তাঁহার ধন-সম্পদের জন্য কোরেশ-প্রধানগণের অনেকেই তাঁহাকে 'পয়গাম' দিয়াছিলেন, কিন্তু বিবি খদিজা সে সকল প্রস্তাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। সেই খদিজার মন আজ আশা-আশঙ্কায় উদ্বেলিত। বিবি খদিজার সহচরী এবং উভয় পক্ষের আত্মীয়া বিবি নফিছাকে তখন হযরতের মনের ভাব জানিবার জন্য প্রস্তুত করা হইল।

## বিবাহের প্রস্তাব

বিবি নফিছা এই ঘটনার কথা নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ "আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম—আপনি বিবাহ করিতেছেন না কেন ? হযরত বলিলেন—বিবাহ করিবার মত সম্বল আমার নাই, কি করিয়া বিবাহ করিব ! আমি বলিলাম—তাহার সুব্যবস্থা যদি হইয়া যায় ? মনে করুন, এমন কোন মহিলা যদি আপনার সহধর্মিণী হইতে চান, যিনি ধনে-মানে, কুলে শীলে এবং স্বভাব-চরিত্রে অতুলনীয়া। তাহা হইলে আপনি কি তদ্রূপ বিবাহে সম্মত হইবেন ? হযরত বলিলেন—তিনি কে, তাহা শুনিতে পারি কি ? তখন আমি খদিজার নাম করিলাম। হযরত আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—সে কথা আপনি কি প্রকারে বলিতেছেন ? আমি বলিলাম—"আমি বলিতেছি এবং আমি ইহা করিয়াও দিব।" এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনে বিবি নফিছা হযরতের মনোভাব জানিয়া লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং বিবি খদিজার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের সফলতার শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পক্ষান্তরে হযরতও পিতৃব্য আবু-তালেবকে এই সকল ব্যাপার জানাইয়া দিলেন। বিবি খদিজার পক্ষ হইতেও তাঁহার আগ্রহের কথা প্রকারান্তরে আবু-তালেবকে জানাইয়া দেওয়া হইল। আবু-তালেব তখন যথানিয়মে বিবি খদিজার পিতৃব্য আমর বেন আছাদের নিকট ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের পয়গাম পাঠাইলেন, এবং সকলের সম্মতিক্রমে এই মহামিলনের দিন, তারিখ ও 'মোহর' ইত্যাদি নির্ধারিত হইয়া গেল।

## বিবাহ

যথাসময়ে কোরেশ-প্রধানগণ ও উভয় পক্ষের আত্মীয়বর্গ বিবি খদিজার গৃহে উপনীত হইলেন। আবু-তালেব ও আমীর হামজা প্রভৃতি হযরতের পিতৃব্য ও দায়াদবর্গও বর লইয়া বিবাহ-সভায় সমাগত হইলেন। সকলের যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনার পর আবু-তালেব উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত খোৎবা (অভিভাষণ) দান করেন ঃ

---

* মোস্তাদরাক—জাহবী এই হাদীছকে বিশুদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন ২—৬১, আবদুর রাজ্জাক—মা'জামুল বোলদান ৩—২০৬, হালবী ১—১২৫, নবৰী প্রভৃতি।

"সেই আল্লাহকে ধন্যবাদ—যিনি আমাদিগকে ইবরাহিমের বংশে ও এছমাইলের গোত্রে পয়দা করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে তাঁহার গৃহের অলি, রক্ষক ও সেবকরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন.....এবং যিনি আমাদিগকে জনসাধারণের নেতা ও নায়করূপে মনোনীত করিয়াছেন। অতঃপর, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ্-তনয় মোহাম্মদকে আপনারা সকলে বিশেষভাবে অবগত আছেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, জ্ঞান-গরিমায় এবং মহত্ত্বে ও মহিমায় তাহার সহিত অন্য কাহারও তুলনা হইতে পারে না—যদিও তাহার ধন সম্পদ অল্প। কারণ ধন-সম্পদ নশ্বর ও নগণ্য। সার্ধ দ্বাদশ 'উকিয়া' মোহর বা কন্যাপণ দানে মোহাম্মদ আপনাদিগের মহিমময়ী কন্যা বিবি খদিজার পাণিপীড়নের প্রস্তাব করিয়াছেন, এখন কন্যাকর্তৃবর্গ সম্প্রদানের কার্য সমাধা করুন।"

তখন ধর্মশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ওয়ার্কা-বেন-নওফেল ইহার উত্তরে বলিলেন : "আপনি আমাদিগের উপর আল্লাহ্‌র যে সকল অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। পক্ষান্তরে আপনাদিগের কুলশীলের মর্যাদা এবং সমস্ত আরবদেশের উপর আপনাদিগের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয়ও সর্বজনবিদিত। আপনাদিগের সহিত আত্মীয়তা করিবার জন্য আমরা সকলেই আগ্রহান্বিত। অতএব হে কোরেশ-সমাজ ! সকলে সাক্ষী থাকুন, আমি বর্ণিত মোহরে মোহাম্মদের সহিত খদিজার বিবাহে সম্মতি প্রদান করিতেছি।" ওয়ার্কার আশীর্বাদ শেষ হইলে বিবি খদিজার পিতার সহোদর ভ্রাতা ওমর-বেন-আছাদ যথানিয়মে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মোবারকবাদ ও আনন্দধ্বনির মধ্যে তাহেরা ও আল্-আমীনের—সাধু মোহাম্মদ মোস্তফা ও সাধ্বী বিবি খদিজার—শুভ সম্মিলনকার্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তখন খদিজার আদেশে পুর-মহিলাগণ গীতবাদ্য আরম্ভ করিয়া দিলেন, হযরতের গৃহেও অলিমার খানা প্রস্তুত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ আবু-তালেব আনন্দে আত্মহারা হইয়া পুনঃ পুনঃ আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাইতে লাগিলেন।*

## নাস্তুরা রাহেবের কেচ্ছা

পাঠকগণ এই পুস্তকের ভূমিকায় কাচ্ছাছ বা কাহিনী-কথকগণের কথা বিস্তারিতরূপে অবগত হইয়াছেন। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই মুছলমান সমাজে এই শ্রেণীর কথকগণের প্রবল প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। ইহাদিগের বর্ণিত কেচ্ছা-কাহিনীগুলি যে নানা অনর্থের মূল কারণ, তাহাও ভূমিকায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ভিত্তিহীন গল্প-গুজবগুলির একটা অন্যতম কুফল এই যে, প্রকৃত পক্ষে উহার দ্বারা হযরতের জীবনের বাস্তব মহত্ত্বগুলি চাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিবরণগুলি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, যেখানে হযরতের অসাধারণ মানসিক বলের ফলে অথবা তাঁহার স্বর্গীয় চরিত্রের প্রভাবে কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা কতিপয় অস্বাভাবিক ঘটনার কল্পনা অথবা কতকগুলি জেন, ফেরেশ্‌তা, নেপথ্যে ঘোষণাকারী হাতেফ বা নজদ দেশীয় বৃদ্ধের রূপধারী শয়তান প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়া আসল জিনিসটাকে একেবারে মাটি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদিগের কল্পিত নাস্তুরা রাহেবের কেচ্ছাটিও এই শ্রেণীর একটা ভিত্তিহীন উপকথা মাত্র

বিবি খদিজা হযরতের সদ্‌গুণরাজি দর্শন করিয়াই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তাহার পর কার্যক্ষেত্রে তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনিতে পারিয়া বিবি খদিজার এই অনুরাগ পবিত্র প্রেমে পরিণত হয়। স্বয়ং বিবি খদিজা যে নিজের অনুরাগের এই সকল কারণের বিষয় পুনঃ

---

* সমস্ত ইতিহাসে সংক্ষেপে বা বিস্তৃতভাবে এই বিবাহের উল্লেখ আছে ; বিশেষ করিয়া দেখুন—এবনে-খাল্দুন, এবনুল জওজি, হালবী এবং মোস্তফা ১—৪৫৮, কানজুল-ওম্মাল ৬—২৯৬ এবং দারমী ও মাওয়াহেব প্রভৃতি

পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, ইতিহাসে ও ছহী হাদীছে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই সকল কথকের ইহাতে তৃপ্তি হইতে পারে নাই। বিবি খদিজার বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া হযরত একবার মাত্র বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন, এই সাধারণ ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা সেই যাত্রায় হযরতের (বাহিরা রাহেব সম্বন্ধে বর্ণিত) শামদেশের বোছরা নগরে গমন এবং তথায় নস্তুরা নামক এক বৃদ্ধ পাদ্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের একটা গল্প প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। সেই দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে কথিত হইয়াছে যে, হযরতকে একটি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া নাস্তুরা রাহেব বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—ইনি কে ? বিবি খদিজার গোলাম মায়ছারা উত্তর করিলেন—উনি জনৈক কোরেশ যুবক। তখন নাস্তুরা আল্লাহর কছম করিয়া বলিতে লাগিল, এই যুবক নিশ্চয় এই উম্মতের নবী হইবেন। কারণ, আজ পর্যন্ত নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিই এই বৃক্ষতলে উপবেশন করেন নাই।* ইহা ব্যতীত এই যাত্রায় হযরতের মাথার উপর সর্বদাই মেঘে ছায়া করিয়া থাকিত। মায়ছারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবি খদিজাকে নাস্তুরা-সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ অবগত করাইয়া বলিলেন যে, তিনি এই যাত্রায় দুই জন ফেরেশ্তাকে হযরতের মাথার উপর ছায়া করিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। ইহাতেই বিবি খদিজা হযরতের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। কতকগুলি লোকের ইহাতেও তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহারা বলিতেছেন ঃ "কোন একটি উৎসব উপলক্ষে কোরেশ মহিলাগণ এক স্থানে আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিলেন। এমন সময় সেখানে এক ইহুদীর (মতান্তরে ইহুদী রূপধারী হাতেফের) আবির্ভাব হইল। সমবেত মহিলাবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া ইহুদী বলিতে লাগিল—মোহাম্মদ এই উম্মতের নবী হইবেন। অতএব তোমাদিগের মধ্যে যাহার সুযোগ হয়, মোহাম্মদের সহিত বিবাহিতা হইবার চেষ্টা কর। ইহুদীর এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, বিবি খদিজা ব্যতীত আর সকলেই তাহাকে গালাগালি দিতে ও ঢেলা-খোলা মারিতে আরম্ভ করিলেন। ইহুদীর এই কথা শুনিয়াই বিবি খদিজা হযরতের অনুরাগিণী হইয়া পড়েন।" ফলতঃ এই গল্পগুলির দ্বারা প্রকারান্তরে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বস্তুতঃ কোন প্রকৃতিগত মহিমা ও স্বাভাবিক গুণ-গরিমার জন্য বিবি খদিজা হযরতের অনুরাগিণী হন নাই। নাস্তুরার উক্তি, ইহুদীর উপদেশ বা ফেরেশ্তার ছায়া না হইলে এই অনুরাগ সৃষ্টির অন্য কোন কারণ ছিল না।

এই গল্পগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রাচীন চরিতকারগণের মধ্যে নামজাদা ওয়াকেদীই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এবনে-ছাআদের বর্ণনাটিও যে প্রকৃত পক্ষে ওয়াকেদীর নিকট হইতে গৃহীত, তাহা তাঁহার নিজ মুখেই প্রকাশ। এবনে-এছহাক ফেরেশ্তার ছায়া করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার পূর্বেই তিনি فيما يزعمون "লোকে যেরূপ মনে করিয়া থাকে তদনুসারে" এই মন্তব্যটি যোগ করিয়া দিয়া ঐ বিবরণের অবিশ্বস্ততাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। হাফেজ এবনে-হাজরের ন্যায় মোহাদ্দেছ বলিতেছেন—"নস্তুরা-সংক্রান্ত গল্পটি এবনে-ছাআদ ওয়াকেদী হইতে রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন, এই গল্পটি বাহিরা সম্বন্ধেই অধিকতর পরিজ্ঞাত।" এদিকে পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, রেওয়ায়তের মর্মানুসারে হযরতের মাথার উপর ছায়া করিয়াছিল মেঘে। কিন্তু মায়ছারা মেঘের ছায়া করার কোন উল্লেখ না করিয়া বিবি খদিজার নিকট দুই জন ফেরেশ্তার ছায়া করার কথা বলিতেছেন—পরবর্তী কথকগণ ইহাতে একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই গল্পের সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য তাঁহারা বলিতেছেন—খুব সম্ভব যাইবার সময় মেঘে এবং আসিবার সময় ফেরেশ্তায় ছায়া করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও কতকগুলি সমস্যা থাকিয়া যাইতেছে। মায়ছারা এবং এই বিবরণের রাবী তাহা হইলে কেবল

* একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এ-কথাটার কোনই তাৎপর্য নাই। সে যাহা হউক, ঠিক এই গল্পটি বাহিরা সম্বন্ধেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা না-কি হযরতের ১২ বৎসর [illegible] বয়সের ঘটনা। আবু বাকর না-কি তাহার সঙ্গে ছিলেন। দেখুন—এছাবা ও হালবিয়াহ।

এক এক দিককার ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন কেন ? পক্ষান্তরে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করার যুক্তি কি ? ইত্যাকার সমস্যাগুলির কোন প্রকার সন্তোষজনক সমাধান করিতে না পারিয়া পরবর্তী কথকেরা আরও একটা অভিনব যুক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—রেওয়ায়তে যে মেঘের কথা এবং মায়ছারার প্রমুখাৎ যে দুইজন ফেরেশতার বর্ণনা আছে, তাহা ত' অভিন্ন। অর্থাৎ ঐ মেঘই দুইজন ফেরেশতা। এই সকল যুক্তির বিচারভার পাঠকগণের উপর অর্পণ করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।*

## ছয়দ বংশের উৎপত্তি

হযরতের কন্যা বিবি ফাতেমার বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে মুছলমান সমাজে ছৈয়দ (বা ছয়দ) নামে অভিহিত হন। বিবি খদিজাই তাঁহার গর্ভধারিণী। হযরতের সমস্ত পুত্র-কন্যাই বিবি খদিজার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। বহু হাদীছে এবং প্রায় সমস্ত ইতিহাসে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে।** আমাদিগের দেশে কিছু আসল এবং বহু নকল ছৈয়দ বিদ্যমান আছেন। ছৈয়দ ছাহেবগণ ব্যতীত মুছলমান সমাজে আশরাফ ও মখদুম আখ্যাধারী আরও বহু 'জাতির' সৃষ্টি হইয়াছে। এই ছৈয়দ ও শরীফ ছাহেবদিগের মধ্যে অনেকেই বিশেষ গর্ব করিয়া বলেন যে, তাঁহাদিগের বংশে বিধবা-বিবাহের প্রচলন নাই। বস্তুতঃ বহু ভদ্র-পরিবারে বালবিধবাগণের বিবাহ দেওয়াও নিতান্ত ঘৃণা ও অপমানের কথা বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহারা ছৈয়দ বলিয়া বিধবা বিবাহ দিতে পারেন না ! কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদিগের এই বড় গৌরবের ছৈয়দ বংশটি বিধবা বিবাহেরই ফল। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, হযরতের সহধর্মিণীগণের মধ্যে একমাত্র বিবি আয়েশা ব্যতীত আর সকলেই বিধবা অবস্থাতেই তাঁহার সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। বিধবা বিবাহে যদি বংশের পতন হয়, তাহাতে যদি কুলে কলঙ্ক স্পর্শিবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে সেই পতন ও সেই কলঙ্ক কোথায় গিয়া পৌঁছে, সে কথাটা আমাদের শরীফ ছাহেবরা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

## হযরতের অসাধারণ সংযম

এই বিবাহ প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, পঁচিশ বৎসরের এক নবীন যুবক, যৌবনের প্রথম ও উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলিকে হেলায় উপেক্ষা করিয়া এতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযম করিয়া রহিলেন, তাহার পর বিবাহ করিলেন পুত্রকন্যাবতী চল্লিশ বৎসর বয়স্কা এক বিধবাকে। বিবাহের ২৫ বৎসর পরে ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার এই স্ত্রীর মৃত্যু হয়—এবং তিনি নিজ যৌবনের পূর্ণ ২৫ বৎসর কাল একমাত্র এই বৃদ্ধাকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াই পরিতুষ্ট থাকেন, যাহারা এহেন আদর্শ সংযমী মহাপুরুষের প্রতি কামুকতার অপবাদ দিতে কুণ্ঠিত হয় না, নরাধম নরাকৃতি শয়তান ব্যতীত তাহাদিগকে আর কোন বিশেষণে আখ্যাত করা যাইতে পারে ?

## মার্গোলিয়থের হঠোক্তি

মহানুভব মার্গোলিয়থ সাহেব, যথায়-তথায় সংলগ্ন-অসংলগ্ন এবং প্রকৃত-অপ্রকৃত নানা প্রকার বরাত দিয়া তাঁহার পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলিকে কণ্টকিত করিতে খুবই অভ্যস্ত। অথচ এস্থলে কোন বরাত না দিয়া তিনি লিখিতেছেন যে, এই বিবাহের সময় মোহাম্মদের বয়স অপেক্ষা খদিজার বয়স কিছু অধিক ছিল বটে, তবে তখন তাঁহার (খদিজার) বয়স যে ৪০ বৎসর হয়

---

* এছাবা, এবনে হেশাম, হলবী প্রভৃতি।

** একটি পুত্র বিবি মারিয়ার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া দুই-একজন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন

নাই, ইহা নিশ্চিত।* এই লেখকই, সর্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক সত্যগুলিকে একেবারে অস্বীকার করা নিজের উদ্দেশ্যের বিঘ্নকর মনে করিয়া, 'কথিত হইয়াছে' 'সম্ভবতঃ' 'অনুমান করা হয়' ইত্যাদি পদ প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় পাঠকবর্গকে প্রবঞ্চিত করিবার একটা সুযোগও পরিত্যাগ করেন নাই। অথচ এমন একটা অভিনব এবং ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা বলার সময় তিনি কোন যুক্তিদান বা প্রমাণ উদ্ধার না করিয়াই, তাহাতে 'নিশ্চিত' বিশেষণ প্রয়োগ করিতে একবিন্দুও দ্বিধা বোধ করিতেছেন না।

এবনে খাল্‌দুন তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, বিবি খদিজার পিতা তখন জীবিত ছিলেন।** ইহাতে ভ্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নাই, কারণ 'আব্' শব্দে আরবীতে পিতা ও পিতৃব্য উভয়কে বুঝায়। কোরআনে হযরত এবরাহিমের পিতৃব্য আজরকে এবরাহিমের 'আব' বা পিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিবাহের সময় বিবি খদিজার পিতা যে জীবিত ছিলেন না, তাহার প্রমাণ অনুসন্ধানের জন্য আমাদিগকে অধিক দূরে যাইতে হইবে না। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, তিনি সমস্ত বিষয়কর্ম পরিদর্শন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রকারের কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থা নিজেই করিতেন। সুতরাং ইহা সহজে বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে তাঁহার পিতা বর্তমান ছিলেন না।

## কথকগণের ঘৃণিত গল্প

বিবি খদিজার বিবাহের প্রস্তাব সম্বন্ধে এক শ্রেণীর কথক, যুক্তি ও ইতিহাসের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, একটা অতি ঘৃণিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ 'কোন কথা বাদ দিব না' এই নীতির অনুসরণকল্পে, সেই বিবরণটিকে নিজেদের পুস্তকে স্থান দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—বিবি খদিজার পিতা খোওয়ায়লেদ এই বিবাহে আদৌ সম্মত ছিলেন না; তাই খদিজা তাঁহাকে বেদম মদ্য পান করাইয়া মাতাল করিয়া ফেলেন এবং অজ্ঞান অবস্থায় তিনি এই বিবাহে সম্প্রদানের কার্য সম্পন্ন করেন। চৈতন্যোদয়ের পর তিনি মহাক্রুদ্ধ হইলেন, এমন কি ইহা লইয়া বর ও কন্যার বংশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে-বাধে হইয়া পড়িয়াছিল। এই শ্রেণীর পুস্তকে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, বিবাহের পূর্বে বিবি খদিজা একদিন হযরতের হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিজের বুকের ও মুখের উপর টানিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এই সময় খদিজা বিবাহের জন্য হযরতকে নানা প্রকার মিনতিও জানাইয়াছিলেন।

আমাদের এক শ্রেণীর কথক কিরূপ ভিত্তিহীন ও জঘন্য উপকথা রচনা করিতে অভ্যস্ত, তাহাই দেখাইবার জন্য এখানে এই বিবরণটি উদ্ধৃত করিলাম। বিবি খদিজার পিতা ফেজার যুদ্ধের পূর্বেই যে পরলোক গমন করিয়াছিলেন ইহা স্থির নিশ্চিত। কিন্তু স্যার উইলিয়াম মুর*** এই বিবরণটি উদ্ধৃত করার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি যে সকল ইতিহাস হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই লিখিত হইয়াছে, এই বিবরণটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। এমন কি তাঁহার বড় আদরের ওয়াকেদী নিজেই বলিয়াছেন যে—

كل هذا غلط ..... والثبت عندنا ..... ان عمها عمرو بن اسد زوجها

رسول الله صلعم وان اباها مات قبل الفجار - (طبری ۲-۱۹۷)

"এ সমস্তই ভুল। প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহার পিতৃব্য ওমর বেন আছাদ তাঁহাকে

---

* ৬৬ পৃষ্ঠা। ** ১—৬২। *** ২৪ পৃষ্ঠা।

হযরতের সহিত বিবাহিত করেন, এবং তাঁহার পিতা ফেজ্জার যুদ্ধের পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন।*

ওয়াকেদীর সেক্রেটারী এবনে ছাআদ লিখিতেছেন :

قال محمد بن عمر - فهذا كله غلط ووهل - والثبت عندنا المحفوظ عن اهل العلم ان اباها خويلد بن اسد مات قبل الفجار وان عمها عمرو بن اسد زوجها رسول الله صلعم -

মোহাম্মদ বেন ওমর বলিয়াছেন : "এই বিবরণগুলির সমস্তই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাদ মাত্র। এবং আমাদিগের প্রামাণ্য ও বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট হইতে পরম্পরাক্রমে স্মৃত কথা এই যে, বিবি খদিজার পিতা ফেজ্জার যুদ্ধের পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতৃব্য ওমর তাঁহাকে হযরতের সহিত বিবাহিত করিয়াছিলেন।"** পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, এই মোহাম্মদ বেন ওমরকেই কথকরা এই বিবরণের মূল রাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য যে, এই সকল গ্রন্থকার মূলতঃ প্রতিবাদ করার জন্যই এই অবিশ্বস্ত ও ভিত্তিহীন বিবরণটি নিজেদের ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং স্যার উইলিয়মের পক্ষে তাঁহাদের প্রতিবাদের উল্লেখ না করিয়া, অথচ তাঁহাদের নামকরণে, ঐ বিবরণটি উদ্ধৃত করা এবং বিবি খদিজার পিতার মৃত্যু-সংক্রান্ত সর্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ না করা—সাধুতার কাজ হইয়াছে কি-না, পাঠকগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

## আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ

এই বিবাহের ফলে সাংসারিক হিসাবে হযরত একটু নিশ্চিন্ত হইলেন এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতর বিকাশ এখন হইতেই আরম্ভ হইল। অর্থাৎ, যে সকল স্বর্গীয় বৃত্তি আশৈশব তাঁহার বিশাল হৃদয়ের স্তরে স্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেগুলি এখন ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করিতে লাগিল—পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাইল। এই সময় তাঁহার চিন্তার ও সাধনার প্রধান বিষয় ছিল দুইটি। তিনি দেখিলেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার সহিত মানুষের যে কি সম্বন্ধ এবং তাঁহার প্রতি তাহার যে কি কর্তব্য—মানুষ তাহা শুধু বিস্মৃত হয় নাই, বরং তাহারা ব্যভিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, মানুষের সহিত মানুষের যে কি সম্বন্ধ এবং তাহাদের পরস্পরের প্রতি যে কি কর্তব্য—মানুষ তাহাও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে, প্রত্যেক পদনিক্ষেপে তাহার অপচয় করিতেছে। জগতের সমস্ত অনাচার-অত্যাচার এবং যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার কারণ ইহাই,—এই কথা মনে করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য তাঁহার করুণ-হৃদয় ও কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা একই সঙ্গে কাঁদিয়া ও জাগিয়া উঠিল

পূর্বেই বলিয়াছি, হযরত বাল্যকাল হইতেই একনিষ্ঠ ভাবুক, পরিশ্রমী সাধক ও দৃঢ়সঙ্কল্প কর্মী। কাহার শিশু সন্তান কোথায় কাঁদিতেছে, সে ক্রন্দনের স্বর কর্ণে প্রবেশ করিলে যাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত, এবং শেষে সেই 'পরের ছেলে'টিকে মায়ের কোলে তুলিয়া দিয়া যিনি শান্তি পাইতেন—বিধবার বিমর্ষ মুখ ও পিতৃহীনের বেদনাব্যঞ্জক শূন্য দৃষ্টি দর্শনে যাঁহার ভিতরের মানুষটি আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিত—পতিতের উদ্ধার, বাধিতের সেবা, বন্দের মুক্তি, মুক্তের শুদ্ধি, পাপের দমন ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠা, যাঁহার জীবনের একমাত্র কর্তব্য ছিল—তিনি স্বদেশের ও স্বজাতির কর্তব্যহীনতার এই চরম দুর্দশা দর্শনে ব্যাকুল না হইয়া থাকিতেই পারেন না। তাই তাঁহার হৃদয়ে নিত্য নূতন ভাব ও নূতন চিন্তার উন্মেষ হইতে লাগিল এবং তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে সে পুণ্য হৃদয় অহরহঃ আলোড়িত বিলোড়িত হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু তখনও সময় হয় নাই। এই আন্দোলন ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এখনও তাঁহাকে আরও ১৫ বৎসর অতিবাহন করিতে হইবে।

---

* তাবরী ২—১৯৭, এছাবা ৮—৬১ পৃষ্ঠা।  ** তাবকাত ১—৮৫।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

## بنائے کعبۂ دوبکر زمانۂ طور نہیم !

## কা'বার পুনর্নির্মাণ

### পুনর্নির্মাণের আবশ্যকতা

কা'বা গৃহটি নিম্নভূমিতে অবস্থিত থাকায় বর্ষার জলস্রোত প্রবল বেগে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত। ইহাতে গৃহটি প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িত। ইহার নিবারণকল্পে উহার চারিদিকে একটি প্রাচীর নির্মাণ করা হয়, কিন্তু জলস্রোতের প্রবল বেগে তাহাও বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য কা'বা গৃহটিকে নূতন করিয়া নির্মাণ করার সঙ্কল্প কিছুদিন হইতে কোরেশ প্রধানগণের মনে স্থান লাভ করিয়াছিল। এই সময় আর একটি দুর্ঘটনার ফলে এই সঙ্কল্পটি আরও দৃঢ় হইয়া উঠে।

'কা'বা' প্রথমে ছাদ বিশিষ্ট গৃহাকারে নির্মিত হয় নাই, চারিদিকে প্রাচীর দিয়া একটা স্থানকে বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছিল মাত্র। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি, তাহার কিছুদিন পূর্বে কোন একজন লোক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্বক কা'বা গৃহে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর বিগ্রহের বহু মূল্যবান অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া লয়, ইহাতে উপরে ছাদ আঁটিবার সঙ্কল্পও সেবায়েতগণের মনে স্থান লাভ করে। এই প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে একটি কূপ ছিল, পূজার নৈবেদ্যাদি তাহাতে নিক্ষেপ করা হইত। এই আবর্জনারাশি পচিয়া ঐ অন্ধকূপটির অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিছুদিন পরে কোথা হইতে একটি সাপ আসিয়া ঐ কূপে অবস্থান করিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে ঐ সাপটিকে প্রাচীরের উপর বেড়াইতেও দেখা যায়। ইহাতে স্থানীয় লোকের মনে বিশেষ ত্রাসের সৃষ্টি হয়। একদিন সাপটি প্রাচীরের উপর বেড়াইতেছিল, এমন সময় একটা বাজপক্ষী 'ছোঁ' মারিয়া তাহাকে লইয়া গেল। ইহাতে সকলে মনে করিল যে, তাহারা মন্দির সংস্কারের সঙ্কল্প করিয়াছে, সেই পুণ্যফলে দেবতা সদয় হইয়াছেন এবং এই বাজকে পাঠাইয়া তাহাদিগকে ঐ সর্পভীতি হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন।*

### কোরেশের সম্মিলিত চেষ্টা

যাহা হউক, কোরেশ বংশের সকল গোত্র একত্র হইয়া কা'বা নূতন করিয়া নির্মাণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। এই সময়, গ্রীকদিগের একখানা বাণিজ্য জাহাজ বাত্যাবিতাড়িত হইয়া জেদ্দা বন্দরের নিকট সমুদ্র উপকূলের সহিত সংঘর্ষিত হয় এবং প্রবল সংঘর্ষের ফলে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। কোরেশের লোকেরা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া অলীদ ও অন্য কতিপয় লোককে জেদ্দায় প্রেরণ করেন। অলীদ ও তাহার সঙ্গীগণ জেদ্দায় পৌঁছিয়া জাহাজের অনেকগুলি তখতা কিনিয়া আনিলেন এই তখতাগুলি ছাদ নির্মাণের কাজে লাগিয়াছিল।

এই সময় সূত্রধরের কাজ কে করিয়াছিল, ইহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় এবন ছাআদ বলিতেছেন যে, বাকুম নামক একজন রুমী ঐ জাহাজের আরোহী ছিল।** অলীদ তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনেন। এই বাকুমই যে সূত্রধরের কাজ করিয়াছিলেন, তাহার কোন স্পষ্ট বিবরণ এবনে ছাআদের লেখায় পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এবনে-হেশাম (এবনে এছহাক হইতে) বর্ণনা করিতেছেন যে, এই সময় মক্কায় জনৈক কিবতী জাতীয় সূত্রধর বাস করিত, সেই তাহাদিগকে কতকটা যোগাড়-যন্ত্র করিয়া দিয়াছিল।***

---

* এবনে-হেশাম ১—৬৫ হইতে ৬৭ প্রভৃতি, প্রায় সকল ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে

** তাবকাত, ১—৯৩।

*** এবনে-হেশাম, ১—৬৫

## ঘোর বিরোধ

যাহা হউক, কোরেশ বংশের সকল গোত্রের লোক একত্র হইয়া গৃহের নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত হইল। বলা বাহুল্য যে, প্রথম হইতে বেশ একতা ও শৃঙ্খলার সহিত কাজ চলিতেছিল, দ্বন্দ্ব-কলহের কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পূর্বের নির্ধারণ অনুসারে প্রত্যেক বংশের লোকেরা আপন অংশ গাঁথিয়া তুলিল। কিন্তু হজরে আসওয়াদ বা কৃষ্ণ প্রস্তর কাহারা স্থাপন করিবে, ইহা লইয়া এই সময় মহাবিতণ্ডা উপস্থিত হইল। ইহাই হইতেছে আসল প্রাধান্যের নিদর্শন, অতএব প্রত্যেক গোত্রের লোকই দাবী করিতে লাগিল যে, আমরাই প্রস্তর স্থাপনের একমাত্র অধিকারী ! এই বিতণ্ডা ক্রমে ঘোর বিবাদে পরিণত হইল এবং দুর্ধর্ষ আরবজাতির এই কোন্দল কোলাহলে মক্কা নগর যেন মহাতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সামান্য সামান্য কারণে বা বিনা কারণে, যুগযুগান্তর ধরিয়া ও বংশ-পরম্পরা-ক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, নরশোণিতের তপ্তধারায় দেশকে প্লাবিত করিয়াও যাহাদের প্রতিহিংসা নিবৃত্তি হইত না, তাহারা সকলে আপনাপন কৌলিন্যগৌরব ও পূর্বপুরুষের মর্যাদার নামে সমরে প্রবৃত্ত হইতেছে, না জানি হেজাজ-জননীর ভাগ্যে কি আছে !

এই কোন্দল-কোলাহলে চারিদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু মীমাংসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। অবশেষে তাহারা দেশ-প্রথানুসারে, 'রক্তপূর্ণ-পাত্রে হাত ডুবাইয়া' মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা করিল। বলা আবশ্যক যে, ইহা আরবের ভীষণতম প্রতিজ্ঞা। রোষ কষায়িতলোচন দুর্ধর্ষ আরবদিগের মধ্যে রোল উঠিল—'শাণিত তরবারি শোণিতের অক্ষরে ইহার মীমাংসাপত্র লিখিয়া দিউক, বৃথা বাকবিতণ্ডায় কাজ নাই।' নিমেষের মধ্যে চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনা বাজিয়া উঠিল।

## আল-আমীনের আবির্ভাব

'স্থির হও', 'স্থির হও'—শুভ্রশির দীর্ঘশ্মশ্রু আবু-উমাইয়া দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন—"স্থির হও,—আমার কথা প্রণিধান কর !" বৃদ্ধের গম্ভীর মর্মবেদনা—পূর্ণ গভীর আহ্বানে সকলে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তিনি সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'এই শুভকর্ম-সমাধানের পর তোমরা অশুভের সূত্রপাত করিও না। বিধাতার উপর নির্ভর কর এবং অপেক্ষা করিয়া থাক। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথমে কা'বা ঘরে প্রবেশ করে, এই বিসংবাদের মীমাংসা-ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া তোমরা ক্ষান্ত হও, শান্ত হও !' বৃদ্ধের এই সমীচীন প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন, এবং সকলে রুদ্ধশ্বাসে আগন্তুকের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সে সময়কার আশঙ্কা আতঙ্ক-মিশ্রিত অধৈর্যভাব সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কি জানি কে প্রথমে কা'বা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে, কি জানি সে কাহার পক্ষের লোক হইবে—কি জানি সে কি মীমাংসা করিবে ! তাহার মীমাংসা যদি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলেই বা কি করিয়া তাহা মানা যাইবে ! এই উদ্বেগে তাহারা সকলেই পলকহীন নেত্রে কা'বা গৃহের দ্বারদিকে তাকাইয়া আছে—

এমন সময় হঠাৎ সহস্র কণ্ঠে আনন্দ রোল উঠিল :

هذا الامين ! قد رضينا ٥

"Lo it is the Faithful One!" They cried, "We are content!"*

"এই ত আমাদের আমীন ! (বিশ্বাসী)—আমরা সকলেই ইহার মীমাংসায় সম্মত !"

হযরত তাঁহাদিগের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বলিলেন—যে সকল গোত্র কৃষ্ণ প্রস্তর স্থাপনের অধিকারী হওয়ার দাবী করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ পক্ষ হইতে এক একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করুন। অতঃপর হযরতের উপদেশ মত ঐরূপে প্রতিনিধি নির্বাচিত

---

* মুর ২৮ ইত্যাদি।

হইলে, তিনি একখানা উত্তরীয় লইয়া প্রস্তরখানা তাহার উপরে স্থাপন করিলেন এবং ঐ প্রতিনিধিগণকে ঐ বস্ত্রের এক এক প্রান্ত ধরিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতে বলিলেন। হযরতের উপদেশ মতে প্রস্তরখানা যখন যথাস্থানের নিকটবর্তী হইল, তখন তিনি চাদরের উপর হইতে তাহা উঠাইয়া সেই স্থলে রাখিয়া দিলেন।*

হযরতের বিচক্ষণতার ফলে, এই আসন্ন কাল-সমর এইরূপে মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল। হযরতের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে বাল্যকালে আছ-ছাদেক বা সত্যবাদী বলিয়া ডাকিত।** তাহার পর বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই তাঁহাকে আল্-আমীন বা বিশ্বাসী বলিয়া সম্বোধন করিত, সচরাচর কেহ তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিত না। বর্তমান ঘটনা প্রসঙ্গেও আমরা দেখিতেছি যে, সকলে তাঁহাকে এই 'আল্-আমীন' উপাধি দ্বারা সম্বোধন করিতেছে।

## বাইবেলের সাক্ষ্য

যীশু খ্রীষ্টের পরলোক গমনের পর, তাঁহার প্রধানতম শিষ্য যোহনের সদাপ্রভু ভবিষ্যতের যে সকল চিত্র দেখাইয়াছিলেন, তাহা যোহনের স্বপ্ন বা (বাংলা বাইবেলে) যোহনের নিকটে প্রকাশিত বাক্য বলিয়া পরিচিত। যোহন তাহাতে ভাবীনবী, শান্তিদাতা ও ত্রাণকর্তার যে সকল উপাধি ও নামের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা প্রথমে আরবী বাইবেল হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

(١١) ثم رايت السماء مفتوحة ، واذا بفرس والراكب
عليه يسمى الامين الصديق - وبالعدل يقضى ويحارب -
(١٢) وله اسم مكتوب ليس يعرفه الاهو وحده - (الاصحاح التاسع عشر)

(১১। পরে আমি দেখিলাম স্বর্গ খুলিয়া গেল, আর দেখ, শ্বেত বর্ণ একটি অশ্ব, যিনি তাহার উপরে বসিয়া আছেন, তিনি "আমীন ও ছিদ্দিক" বিশ্বাসী ও সত্যময় নামে আখ্যাত এবং তিনি ধর্মশীলতায় বিচার ও যুদ্ধ করিবেন। (১২) এবং তাঁহার একটি লিখিত নাম আছে, যাহা তিনি ব্যতীত অপর কেহ জানে না। ( ১৯ অধ্যায়।

আরবীতে আজ পর্যন্ত ঠিক এই 'আল্-আমীন' ও 'আছ-ছাদেক' শব্দই বর্তমান আছে। যোহন বলিতেছেন যে, ঐ নামে তিনি আখ্যাত হইবেন বটে, কিন্তু ইহা ব্যতীত তাঁহার লিখিত নাম আর একটি আছে, তিনি ব্যতীত সে নামের অধিকারী আর কেহই হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, ঐ লিখিত নামটি—"মোহাম্মদ"। তাঁহার এই নামকরণের পূর্বে আর কাহারও এই নাম রাখা হয় নাই। ইংরাজি বেল্-আদ্‌লে অ-ইউহারেবো' ইহার অনুবাদ,—তিনি ন্যায্যভাবে বিচার ও যুদ্ধ করিবেন। তরবারীর সহায়তা ব্যতীত ন্যায়কে জগতে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। হযরতই সেই ন্যায়বিচার ও ন্যায়যুদ্ধের কর্তা এবং তিনিই যে সেই শ্বেত অশ্বের আরোহী— ইতিহাসে ও হাদীছে তাহার অসংখ্য প্রমাণ বর্তমান আছে।

## কৃষ্ণ প্রস্তর একটা স্মৃতিফলক মাত্র

হজরে আছওয়াদ বা কৃষ্ণ প্রস্তর সম্বন্ধে অন্য-ধর্মাবলম্বী লেখকগণ যৎপরোনাস্তি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। হযরত এবরাহিম ও তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে চিরাচরিত পদ্ধতি ছিল যে, প্রান্তরে বা অন্য কুত্রাপি উপাসনা ও বলিদানের স্থান মনোনীত হইলে, তথায় তাঁহারা চিহ্ন স্বরূপ এক একখানা প্রস্তর স্থাপন করিতেন। বাইবেলেও ইহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

---

* তাবরী ২—২০১, এবনে-হেশাম ২—৬০, তবকাত ১—৯৩, কামেল ২—১৬।

** অফা-উল-অফা, ১—১৮৬ পৃষ্ঠা।

হযরত এবরাহিম ও এছমাইল মক্কায় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যথানিয়মে সেখানেও একখানা প্রস্তর রাখিয়াছিলেন। প্রস্তরখানা ঘোর-কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় শেষে উহা হজরে আছওয়াদ্ বা কৃষ্ণ প্রস্তর নামে খ্যাত হয়। বংশের আদি পুরুষের স্মৃতিফলক মনে করিয়া আরবগণ স্বভাবতঃই ঐ কৃষ্ণ প্রস্তরের সমাদর করিত। কিন্তু ঘোর পৌত্তলিকতার যুগেও কখনই তাহার কোনপ্রকার 'পূজা' হয় নাই। কাবা গৃহে, পূজার্থে যে সকল বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাদের নামের দ্বারাই তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু এই প্রস্তরখানা কখনও বা কেবল 'প্রস্তর' আর কখনও বা 'কৃষ্ণ প্রস্তর' নামে চিরকাল অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ পৌত্তলিকতার যুগেও ঠাকুর-বিগ্রহের আসনের ত্রিসীমায় তাহার স্থান হয় নাই। মক্কা বিজয়ের পর হযরত যখন দেবং-বিগ্রহগুলি কা'বা হইতে অপসারিত করিয়া ফেলেন, তখন এই জন্যই ঐ প্রস্তরটিকে স্বস্থানচ্যুত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করা হয় নাই। অথচ এই প্রস্তরখানা জগতে একজন আদি ধর্মপ্রবর্তক ও সংস্কারক এবং কোরেশ বংশের আদি পিতা মহাপুরুষ হযরত এবরাহিমের পুণ্যস্মৃতি ও যুগ-যুগান্তরের মূর্তিমান ইতিহাস, বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কাজেই উহা পূর্ববৎ স্বস্থানে রহিয়া গেল। হযরত এবরাহিম প্রথমে হজ প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া, মুছলমানগণ এখন হজ্জব্রত যাপনকালে (কা'বা প্রদক্ষিণ করিবার সময়) ঐ প্রস্তরের নিকট হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন, আবার তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে একবারের প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) শেষ হইল বলিয়া মনে করেন।

একদা হজের মওছুমে সমবেত জনমণ্ডলীকে শুনাইয়া হযরত ওমর এই প্রস্তরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন (إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر — (متفق عليه) "আমি নিশ্চিতরূপে অবগত আছি যে তুমি একখণ্ড প্রস্তর মাত্র, কাহারও উপকার বা অপকার করার কোন শক্তিই তোমার নাই।"*

যাহার উপকার করার ক্ষমতা নাই, যাহার অপকার করার শক্তি নাই, যাহা চিরকালই 'প্রস্তরখণ্ড' বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কখনই কোন প্রার্থনা-উপাসনাদি করা হয় না, যাহাকে পৌত্তলিক আরবগণও কখনও বিগ্রহ বলিয়া মনে করে নাই,—পরিতাপের বিষয় এই যে, হযরতের প্রতি পৌত্তলিকতার দোষারোপ করার জন্য, অমুছলমান লেখকেরা তাহা লইয়া অন্যায় বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

### إنك لعلى خلق عظيم

### সাংসারিক জীবনের কয়েকটা ঘটনা

### জায়েদের সৌভাগ্য

জায়েদ নামক একটি বালক, তাহার বংশের শত্রুপক্ষ কর্তৃক কোন ক্রমে ধৃত হইয়া বিক্রয়ের জন্য মক্কার 'ওকাজ' মেলায় আনিত হয়। তখকার নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধে বা অন্য কোন প্রকারে কোন বিদেশী অথবা শত্রু জাতীয় নর-নারী ও বালক-বালিকাকে ধরিয়া আনিতে পারিলেই তাহারা বংশ-পরম্পরাক্রমে ধৃতকারীর দাসদাসীতে পরিণত হইয়া যাইত। প্রভু ইচ্ছামত তাহাদিগকে যে কোন কাজে লাগাইতে, তাহাদিগের দ্বারা অকথ্য পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিতে এবং গরু-ছাগলের মত যখন ইচ্ছা তাহাদিগকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিত। ইহা কেবল আরব দেশেরই কথা নহে, পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ নির্মমতা বিরাজ করিতেছিল।

---

* বোখারী, ৬—১০৮ ; মোছলেম, ১—৪১২।

জায়েদকেও বিক্রয়ার্থ বাজারে আনা হইল। তখন বিবি খদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম, প্রচলিত চারিশত রৌপ্য মুদ্রা দিয়া তাঁহার জন্য জায়েদকে খরিদ করিয়া আনেন। হযরতের সহিত বিবাহের পর বিবি খদিজা হযরতের সেবার জন্য জায়েদকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন।

হযরত জীবনে এই প্রথম ক্রীতদাসের প্রভু হইলেন। 'মানুষ একমাত্র আল্লাহর দাস বা আল্লাহ মানুষের একমাত্র প্রভু' বলিয়া যে মহিমময় 'মুক্তিদাতা' তাওহীদের সুগম্ভীর ঝঙ্কারে, মানবের মন ও মস্তিষ্ককে অন্য সমস্ত পার্থিব ও কল্পিত শক্তির দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবেন, বিশ্ব-মানবের সেই মুক্তিদাতা মোহাম্মদ মোস্তফার নিকট কি দাস ও প্রভুর পার্থক্য থাকিতে পারে ? বলা বাহুল্য যে, জায়েদ অবিলম্বে মুক্ত হইলেন। মুক্তিলাভের পর জায়েদ হযরতের আশ্রয়ে এমন আদর ও যত্নের সহিত লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন যে, মক্কাবাসীরা তাঁহাকে মোহাম্মদের পুত্র জায়েদ (জায়েদ-এবনে-মোহাম্মদ) বলিয়া আখ্যাত করিতে লাগিল।*

বহুদিন পরে জায়েদের পিতা হারেছ ও তাঁহার পিতৃব্য কাআব মক্কায় আসিলেন এবং হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন:—"হে আবু তালেবের পুত্র, হে সরদার-জাদা! আমরা জায়েদের জন্য আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং একটু বিবেচনা করিয়া মুক্তিপণ নির্ধারণ করিয়া দিন।" আগন্তুকগণের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া, হযরত আনন্দ-বিস্ময়-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন—"এই কথা! ইহা ব্যতীত আর কিছু"—অর্থাৎ এই সামান্য বিষয়ের জন্য এত কাকুতি-মিনতি কেন ? অতঃপর হযরত আগন্তুকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জায়েদ মুক্ত স্বাধীন, আমি এই ব্যাপারে তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। সে যদি স্বেচ্ছায় আপনাদিগের সহিত যাইতে চাহে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, অবশ্য সেজন্য কোন প্রকার বিনিময়ের আবশ্যক হইবে না। কিন্তু, সে যদি স্বেচ্ছায় যাইতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন মতেই তাহাকে যাইতে বাধ্য করিতে পারিব না।" তখন জায়েদকে তাহার মত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন,—'হযরত! আপনিই আমার পিতা, আপনিই আমার পিতৃব্য, আপনিই আমার সর্বস্ব। জায়েদ জীবনে-মরণে ঐ রাজীব চরণের শরণ হইতে যেন বঞ্চিত না হয়।' ফলতঃ জায়েদ হযরতের চরণ-সেবা ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অভিভাবকেরাও দেখিলেন যে, স্পর্শমণির সংস্পর্শে যেমন লৌহ কাঞ্চনে পরিণত হয়—এই কয়দিনের সাহচর্যে—তাঁহাদের পুত্র সেইরূপ সম্পূর্ণ নূতন মানুষে পরিণত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু এই সময় হযরত বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের অন্তরের অন্তস্তলে একটা ক্ষুব্ধ অভিমান লুকাইয়া আছে। তাঁহাদের পুত্রকে লোকে দাস বলিবে, এ অপমানের বোঝা তাঁহাদিগকে বংশানুক্রমে সহ্য করিতে হইবে, ইহার প্রতিকার কি প্রকারে হইবে ?**

## ক্রীতদাস পুত্র হইল

হযরত ইহা অনুভব করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জায়েদকে সঙ্গে লইয়া কা'বা গৃহের নিকট সমবেত জনগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন ঃ

يا من حضر اشهدوا ان زيدا ابني يرثني وارثه

"হে সমবেত জনগণ! আপনারা সাক্ষী থাকুন, এই জায়েদ আমার পুত্র ; সে আমার ও আমি তাহার উত্তরাধিকারী।"*** অতঃপর বহু সামরিক অভিযানে এই জায়েদ সেনাপতির পদে

---

* বোখারী।

** এছাবা ৩—২৫, একমাদ, মাজমা-উল-বেহার।

*** জাদুল-মাআদ, ১—২৯৬ প্রভৃতি।

বৃত হইয়াছিলেন।* এই জায়েদের প্রতি হযরত চিরকালই যেরূপ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, হাদীছের পুস্তকসমূহে তাহার অনেক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) নবী-জীবনে দাস প্রথাকে সমূলে উৎপাটিত করার যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই চেষ্টা যে কতদূর ফলবতী হইয়াছিল, তাহা আমরা যথাস্থানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ ! এখানে এইটুকু দেখিবেন যে, এছলাম স্বীয় আবির্ভাবের পূর্বেই ঘৃণিত, উপেক্ষিত ও অত্যাচার-জর্জরিত দাসকে প্রভুর ঔরসজাত পুত্রের আসনে বসাইয়া দিয়াছিল। প্রেমের, সাম্যের ও মহত্ত্বের এমন স্বর্গীয় চিত্র আর কুত্রাপি দেখা যায় কি ? ইহা বচনসর্বস্ব উপদেষ্টার অর্থহীন ভাবপ্রবণতা নহে—ইহা কার্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের মহান আদর্শ—পুণ্যের সার্থক ও জীবন্ত অনুষ্ঠান।

## কর্ম-জীবনে সাফল্য

যে ব্যক্তি কখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই, যাঁহাকে কখনও সংসারের নিদারুণ অভাব-অভিযোগের কঠোর পরীক্ষায় পড়িতে হয় নাই, তাঁহার সাধু জীবনের মূল্য খুব অধিক বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের হযরত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি এই কর্মক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন। এই কর্মক্ষেত্রের কঠোর পরীক্ষাতেই তিনি সাধু সত্যবাদী ও বিশ্বাসী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার প্রাণের বৈরীরাও তাঁহাকে 'সাধু আল-আমীন' বলিয়া সম্বোধন করিত। হিজরতের পূর্বাহ্ণেও তাহারা নিজেদের মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও টাকাকড়ি এই 'অবধ্য বধ্য মহাশত্রুর' নিকটেই গচ্ছিত রাখিত। তাই আবু জেহেলের ন্যায় ভীষণ শত্রুও বলিতে বাধ্য হইয়াছিল—"মোহাম্মদ ! আমি তোমাকে কখনই মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করি না, তবে তোমার যাহা ধর্ম, আমার মনে তাহা আদৌ স্থান প্রাপ্ত হয় না।"**

দেশপ্রথা অনুসারে, ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া হযরত স্বীয় জীবিকা অর্জন করিতেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মানুষের সাধুতা বা অসাধুতা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ন্যায় উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কিছুই হইতে পারে না। হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহ একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, এই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন রুচির বহু লোকের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনে এক দিনের জন্যও কাহারও সহিত ঐ উপলক্ষে কোন প্রকার বাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হয় নাই।*** হযরতের সঙ্গে যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সাক্ষ্যে এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে।****

## কোরেশ কৌলিন্যের কঠোর প্রতিবাদ

কা'বা গৃহই আরবদেশের প্রধান দেবালয়, ৩৬০টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিগ্রহ (মূর্তি ও চিত্র) এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত। কোরেশগণ ঐ গৃহের সেবায়েত। কাজেই তাহাদের মনে একটা বড় রকমের প্রাধান্যভাব সদাই বিরাজমান ছিল। কা'বা গৃহ নূতন করিয়া নির্মাণ করার পর তাহাদিগের এই অহঙ্কারের ভাবটা বহু গুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই তাহারা যুক্তি-পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, আমরা মন্দিরের সেবক ও বিগ্রহের পূজারী। অতএব পূজা প্রদক্ষিণাদির প্রথা-পদ্ধতিতেও আমাদিগের একটা সম্মানসূচক বিশেষত্ব থাকা আবশ্যক। তাই তাহারা ঘোষণা করিয়া দিল যে, হজ্জের সময় কোরেশ বংশের লোকেরা—অন্যান্য লোকের ন্যায়— আরাফাৎ প্রান্তরে যাইবে না। পক্ষান্তরে যে সকল পরজাতীয় লোক হজ্জ করিতে আসিবে, তাহাদিগকে নিজেদের জাতিগত বিশেষত্ব মূলক পোশাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কোরেশের পোশাক পরিধান করিয়া আসিতে হইবে, অন্যথায়, তাহাদিগকে উলঙ্গাবস্থায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। লোকে এখান

---

* বোখারী। ** শেফা, ৬৯। *** এছাবা, এস্তিআব, কামেছ-বেন-ছায়েব।
**** আবু-দাউদ, এছাবা, এস্তিআব, ছায়েব, আবদুল্লাহ-বেন-আবু হামজা।

আসিয়া বাহিরের বস্ত্র পরিধান করিতে বা বাহিরের খাদ্য খাইতে পারিবে না। এই প্রকার অনেক শর্ত নির্ধারিত হইল। এছলামের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ চলিয়াছিল।

কিন্তু এ ব্যবস্থা হযরতের মনঃপূত হইল না, তিনি ইহা মান্যও করিলেন না। তিনি ঘোষণা করিতে লাগিলেন, সকল মানুষের অধিকার এবং দায়িত্ব সমান—জন্ম, অর্থ বা পৌরোহিত্যের দাবীতে তাহার ইতর-বিশেষ হইতে পারে না। হযরত প্রতিবাদ স্বরূপ নিজেই আরাফাৎ প্রান্তরে গিয়া জনসাধারণের সহিত মিলিত হইলেন।* ইহা একটা সামান্য ঘটনা নহে। অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া জানিতে ও বুঝিতে পারেন অনেকেই। এমন কি অনেকে আবার সময় সময় তাহাকে অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হন না। কিন্তু অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া বোঝা বা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করা বিশেষ কোন পৌরুষের কথা নহে। এরূপ ক্ষেত্রে সমস্ত দেশ ও সমগ্র জাতির আচার ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে—কার্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হওয়া ও তাহাকে প্রতিহত করার বাস্তব চেষ্টাই হইতেছে মহাপুরুষের কাজ। হযরত ন্যায়ের, প্রেমের ও সাম্যের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি নিজের সাধ্যানুসারে ন্যায় ও সাম্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন।

## স্বাধীন চিন্তা ও ভাবুকতা

স্বাধীন চিন্তা ও ভাবুকতা হযরতের জীবনের একটা উজ্জ্বল বিশেষত্ব। তিনি যখন স্বজাতীয় ও স্বদেশস্থ লোকদিগকে পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ও বহুবিধ পাপাচারে লিপ্ত হইতে দেখিতেন, তখন তাঁহার মন নানাপ্রকার চিন্তায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তিনি এই সকল পূজার হেতু ও সংস্কারের মূল কারণ চিন্তা করিয়া দেখিতেন, আর চকিতের ন্যায় সেগুলির নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেন। বাল্যজীবনে ও যৌবনের প্রারম্ভেও তাঁহার এই অবস্থা ছিল।

## দরগাহ্ পূজার প্রতি হযরতের আজীবন ঘৃণা

এই সময় জায়েদ-বেন-আমর নামক একজন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করিতেন। ইনিও পৌত্তলিকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদা কোরেশের লোকেরা তাহাদের একটা "স্থানে" ছাগ বলি দিয়া তাহার মাংস রন্ধনপূর্বক হযরতকে এবং জায়েদকে খাইতে দেয়, বোধ হয় পরীক্ষা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। 'হযরত উহা খাইতে অস্বীকার করিলেন।' হযরতের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জায়েদ, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া দিলেন যে, 'স্থানে' লইয়া গিয়া যে পশু বলি দেওয়া হইয়াছে, আমি তাহার মাংস খাইতে পারি না।**

মূল হাদীছে 'আনছাব' শব্দ আছে। আমাদিগের দেশে ইট ও মাটির ঢিবা প্রস্তুত করিয়া যেরূপ দরগাহ বানান হয় এবং তাহাতে যেমন খাসি ও মুরগির হাজত-নায়াজ দেওয়া হয়, তখন আরবেরা ঐরূপ প্রস্তরের দরগাহ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পশু বলি দিত। এই 'স্থান'গুলিতে কোন বিগ্রহ বা প্রতিমা থাকিত না।***

এই দরগাহে বা 'স্থানে' যে ছাগ বলি দেওয়া হইয়াছিল, হযরত এছলামের পূর্বেও তাহা ভক্ষণ করিতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু আজকালকার মুছলমানেরা বিশেষতঃ এক শ্রেণীর 'শরীফ' আখ্যাধারী ব্যক্তি, যথায় তথায় ঐ প্রকার 'স্থান' প্রস্তুত করিয়া খাসি-মোরগের ঘ্রাণ খাইবার জন্য, তীর্থের কাকের মত সেখানে হা করিয়া বসিয়া থাকেন, এবং অজ্ঞ মুছলমানদিগকে এই ঘৃণিত পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে উৎসাহিত করেন, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের কথা আর কি হইতে পারে ?

---

* এবনে-হেশাম, ১—৬৭, ৬৯ পৃষ্ঠা। ** বোখারী, ১৫—৪২৪। *** ফৎহল বারী।

এছলাম প্রবর্তনের পূর্বে, ধর্মের দিক দিয়া হযরতের জীবনে ও সাধারণ পৌত্তলিক কোরেশগণের জীবনে যে কোন পার্থক্য ছিল না, ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদিগের খ্রীষ্টান লেখকেরা যে কিরূপ 'সাধুতার' পরিচয় দিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটি নমুনা দিতেছি। এই নমুনা দেখিয়া তাঁহাদের অন্যান্য মন্তব্যগুলির 'গুরুত্ব' উপলব্ধি করা পাঠকগণের পক্ষে সহজ হইয়া যাইবে।

'মার্গোলিয়থ' সাহেব তৎপ্রণীত জীবনীতে লিখিতেছেন ঃ

"He with Khadijah performed some domestic rite in honour of one of the godesses each night before retiring." (Page 70).

অর্থাৎ 'মোহাম্মদ ও খদিজা উভয়ই নিদ্রা যাইবার পূর্বে, পারিবারিক প্রথানুসারে, প্রতি রাত্রিতে এক দেবীর পূজা করিতেন।' (৭০ পৃষ্ঠা)

মার্গোলিয়থ সাহেব আরবী জানেন বলিয়া নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য খ্রীষ্টান লেখকগণের পুস্তক হইতে তিনি যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা কেবল এই বিষয়টির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি ইমাম আহমদ এবনে হাম্বলের মোছনাদের এক হাদীছের বরাত দিয়াছেন। সুতরাং এইটিই আমাদের বিচার্য।

আমরা প্রথমে মোছনাদ হইতে মূল হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

عن عروة قال حدثني جار لخديجة بنت خويلد انه سمع النبي
صلعم وهو يقول لخديجة اى خديجة ! "والله لا اعبد اللات
والعزى والله لا اعبد ابدا" قال فيقول خديجة "خل اللات
خل العزى" قال كانت صنمهم التى كانوا يعبدون ثم يضطجعون

শাব্দিক অনুবাদ ঃ—ওরওয়া বলেন, 'খোওয়ায়লেদের কন্যা খদিজার জনৈক প্রতিবাসী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একদা শুনিলেন, হযরত খদিজাকে বলিতেছেন—"হে খদিজা ! আল্লাহর দিব্য, আমি লাৎ ও ওজ্জার পূজা করি না, আল্লাহর দিব্য কখনও করিব না।' ঐ প্রতিবাসী বলেন, খদিজা ইহার উত্তরে বলিলেন—দূর করুন লাৎকে, দূর করুন ওজ্জাকে (অর্থাৎ উহাদের উল্লেখ করার কোন আবশ্যক নাই)। ঐ প্রতিবাসী বলিলেন—উহা তাহাদের সেই বিগ্রহ, তাহারা (পৌত্তলিক আরবগণ) শয়ন করিবার পূর্বে যাহার পূজা করিত।

এই হাদীছে كانوا-يعبدون-يضطجعون এই তিনটি ক্রিয়াও هم সর্বনাম ও বহুবচনমূলক, ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, পৌত্তলিকগণ শয়ন করিবার পূর্বে তাহার পূজা করিত। হযরত ও খদিজার কথা হইলে বহুবচনমূলক ক্রিয়া প্রযুক্ত না হইয়া দ্বিবচনমূলক শব্দের ব্যবহার করা হইত। হযরত লাৎ ও ওজ্জার পূজা করেন না এবং করিবেন না বলিয়া আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বিবি খদিজা তাঁহার মতে মত দিতেছেন ; আবার সেই সঙ্গে স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া ঐ বিগ্রহের পূজা করিতেছেন, এ কথার কি কোন অর্থ হইতে পারে ?

এই প্রকার অজ্ঞতা' বা দ্বেষপ্রণোদিত জঘন্য প্রবঞ্চনা খ্রীষ্টান লেখকগণের পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।

## সত্যান্বেষী দল

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখন পৌত্তলিকতা, দেশাচার, কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস বীভৎস আকারে, সমগ্র আরব দেশটাকে একেবারে আচ্ছাদিত করিয়া

ফেলিয়াছিল। জ্ঞানের এই ঘোর অধঃপতনের দিনেও আরবের কয়েকটি হৃদয় সত্যের আলোক পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। আমরের পুত্র জায়েদের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইঁহার সহিত হযরতের যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, পূর্ব বর্ণিত বোখারীর হাদীছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি ব্যতীত ইতিহাসে, বিবি খদিজার খুল্লতাত-পুত্র অর্কা, জাহশের পুত্র ওবেদুল্লাহ, হাওয়ায়েছের পুত্র ওছমান ও হায়েদার পুত্র কোচ সম্বন্ধেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারাও প্রচলিত ধর্ম অস্বীকার করিয়া সত্য ধর্মের অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। অর্কা শেষে খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তিনি হযরতের 'নবী' হইবার অব্যবহিত পরে পরলোক গমন করেন।

হযরত খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান—অন্ততঃ তাহার মূল সূত্রগুলি—সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা সপ্রমাণ করার জন্য আমাদের খ্রীষ্টান লেখকগণ অশেষ পণ্ডশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। নমুনাস্বরূপ স্যার উইলিয়ম মূরের প্রধান যুক্তিটি সম্বন্ধে দুই--একটি কথা বলিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

### মূরের প্রগলভতা

স্যার উইলিয়ম বলিতেছেন ঃ জায়েদের পিতৃমাতৃ উভয় কুলেই খ্রীষ্টান ধর্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং যদিও জায়েদ এত অল্প বয়সে নিজ গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে বিস্তৃত ও সম্যকরূপে ঐ ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর ছিল না, তবুও সম্ভবতঃ ঐ ধর্মের শিক্ষার কতকটা 'ছাপ' তাঁহার মনে ছিল, এবং ঐ ধর্মের কতকগুলি কিংবদন্তি ও পুরাকথা তাঁহার স্মরণ রহিয়া গিয়াছিল। পিতা-পুত্রের মধ্যে ইহা লইয়া আলোচনা হইয়া থাকিবে। (৩৩ পৃষ্ঠা।

জায়েদের পিতৃমাতৃ কুলে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এ উক্তিটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন. এই ভিত্তিহীন উক্তিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াও যদি বিচার করা হয়, তাহা হইলেও লেখকের যুক্তির অসারতা তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি হইতেই স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়া যাইবে। জায়েদের পিতামাতা খ্রীষ্টান ছিলেন, একথা লেখকও সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই। তাঁহার গোত্রের কে কোথায় খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া, যে বালকটি অতি অল্প বয়সে আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাসরূপে বিদেশে বিক্রীত হইয়াছিল, বিবি খদিজার সহিত হযরতের বিবাহের সময়ও যে জায়েদ অনধিক পঞ্চদশ বৎসরের একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন—তাঁহার পক্ষে খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা এবং হযরতের পক্ষে তাঁহার নিকট সেই ধর্ম শিক্ষা করার কল্পনা—হয় পাগলের প্রলাপ—না হয় বিবেকের আত্মহত্যা।

## বিংশ পরিচ্ছেদ

آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ !

### সময় নিকটবর্তী হইতেছে

### ভাব ও চিন্তা

সময় ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। হযরতের হৃদয় ক্রমশঃ নানা ভাবে বিভোর ও নানা চিন্তায় উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে, নানাপ্রকার অস্পষ্ট অথচ অস্ফুট প্রেরণা অহরহ তাঁহার মানসকক্ষে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। ৩০ বৎসর বয়স হইতে তাঁহার জীবনে একেবারে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তাহার সূচনা হইয়াছিল আরও দুই বৎসর পূর্ব হইতে। তখন হইতে সদাসর্বদা তাঁহার নয়নযুগল কি যেন এক অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিতে

লাগিল, তাঁহার কর্ণকুহরে কি যেন এক অশ্রুতপূর্ব সুললিত স্বরতরঙ্গ বাজিয়া উঠিত, অথচ তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না।* এই অবস্থায় অধিকাংশ সময়ই তিনি বিশেষরূপে শুচিসম্পন্ন হইয়া গভীরভাবে ধ্যান ও উপাসনায় নিমগ্ন হইতেন।** সময় যখন আরও নিকটবর্তী হইয়া আসিল, তখন নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে—প্রভাতরশ্মির ন্যায় একটা শুভ্র আলোক তিনি অনেক সময় দেখিতে পাইতেন।

কিছুদিন পরে ভাবের আবেশ যখন আরও গভীর হইয়া উঠিল, তখন লোকালয়ের কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া গিয়া নিভৃত নিস্তব্ধ স্থানে ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকা তাঁহার নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

## নিভৃত চিন্তা ও আত্মার বিকাশ

এই সময় হযরত মক্কা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী হেরা পর্বতের এক অপ্রশস্ত গুহায় বসিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। বিবি খদিজা প্রকৃত সহধর্মিণীর ন্যায় স্বামীর জন্য কয়েকদিনের আহার্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। হযরত তাহা লইয়া হেরায় গমন করিতেন, কয়েকদিন পরে সেই খাদ্য ও পানীয় ফুরাইয়া গেলে বাটীতে আসিয়া ঐরূপ সামান্য খাদ্য ও পানীয় জল লইয়া আবার হেরার সাধন-গুহায় গমন করিতেন। এই ভাবে দিনের পর দিন ও রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল—হযরত নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন। তখন তাঁহার ভিতর-বাহিরে কেবল 'নূর'—কেবল জ্যোতিঃ।***

এই সময় হযরত যে রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মার স্তরে স্তরে যে 'জানে জানাঁর'—যে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, যে শান্ত-শীতল করুণ-কোমল করাঙ্গুলি সংস্পর্শে তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে রোমাঞ্চময় অনন্ত সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল—সে হইতেছে ভাবরাজ্যের কথা। সংসারের ক্রিমিকীট আমরা—আমাদিগের পক্ষে হয়ত তাহা অবোধগম্য হইতে পারে, কিন্তু তবুও তাহা ধ্রুব সত্য। সে আলোক-রাজ্যের, আবেশ-রাজ্যের বিধিব্যবস্থা স্বতন্ত্র—অনভিজ্ঞের পক্ষে অবোধগম্য। তবে আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া ও নানাপ্রকার জটিল যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, ধর্মশাস্ত্রের স্পষ্ট উক্তিগুলিকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া ও দলিয়া-মথিয়া, সমসাময়িক বিজ্ঞানের—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকদিগের অভিমতের সহিত সেগুলির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা এই শ্রেণীর বন্ধুবর্গকে, কোন প্রকার মতামত প্রকাশের পূর্বে, Theosophy ও Spiritualism সংক্রান্ত অন্ততঃ একখানা পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আল্লাহর এই বিশাল সৃষ্টিরাজ্যে এমন কত সত্তা ও কত শক্তি আছে, যেগুলিকে আমরা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু বিজ্ঞান তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। এই যে বিশ্বব্যাপিয়া তড়িত তরঙ্গ ইথারের প্রবাহ ও অণু-পরমাণুর সংযোগ বিয়োগের অনন্ত-লীলা, ইহার মধ্যে কয়টার 'তাৎপর্য' (কিংবা মাহাত্ম্য) আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে ?

কিন্তু ইহা আমাদের একমাত্র যুক্তি নহে। 'অহি' (Inspiration), ফেরেশতা, মে'রাজ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আমরা স্থানে স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, ইহাতে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই, বরং ইহা প্রত্যক্ষ ও অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক সত্য

---

* এবনে-খালদুন, ২—১৪

** বোখারী, মোছলেম

*** বোখারী, মোছলেম, তিরমিজী।

## হেরা পর্বত

হেরা পর্বত মক্কা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। চারিদিকে জনমানবহীন, বিস্তৃত মরু-প্রান্তর। সূর্যের কিরণ, চাঁদের আলো, আর শীত ঋতুর স্নিগ্ধ মনোরম বাতাস ব্যতীত, সঙ্গী-সহচর যেখানে আর কিছুই ছিল না। এই নিভৃত-গিরিগহ্বরে ধ্যানমগ্ন মোস্তফা-হৃদয়ের যে অধীর ব্যাকুলভাব ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয়—তাহা কেবল অনুভব করিবার বিষয়, লেখনী দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা যায় না। বাষ্পরাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া ধরাবক্ষকে কেবলই আলোড়িত করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অথচ তখনও তাহা ধরণীর বক্ষ অভিষিক্ত করিয়া স্নিগ্ধ-মধুর সলিল প্রবাহরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই, ভিতরে কেবলই স্পন্দন—কেবলই কম্পন। সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গমস্থলে উপনীত হইয়া, মোস্তফা-হৃদয়ের অবস্থাও এইরূপ হইয়াছিল।

## সাধনার সিদ্ধি

এইরূপে, যে দিন হযরত চান্দ্রমাসের হিসাবে ৪১ বৎসর বয়ক্রমে পদার্পণ করিলেন, সেদিন তাঁহার এই সাধনার সিদ্ধি, ধ্যানযোগের পরিসমাপ্তি বা কর্মযোগের প্রারম্ভ। ইহার তারিখ নির্ণয় উপলক্ষে নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায়। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ, প্রচলিত প্রথানুসারে, নিজেরা কোন প্রকার বিচার-মীমাংসায় প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল পূর্ববর্তী কয়েকজন লোকের মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক, তফছিরকার ও মোহাদ্দেছগণ সকলেই কিন্তু একবাক্যে বলিতেছেন যে, সেদিন সোমবার ছিল। সোমবারের রোজা সম্বন্ধে যে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, সোমবার সর্বপ্রথমে কোর্‌আন অবতীর্ণ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ইহা স্বয়ং হযরতের উক্তি।*

## প্রথম অহির সময় নির্ণয়

মাজমা-উল-বেহারে রমজান বা রজব কিংবা রবিউল-আউওলের ১২ই বলিয়া প্রথম অহির তারিখ নির্ধারিত করা হইয়াছে।**

মওলানা আবদুল হক (মোহাক্কেক দেহলবী) বিভিন্ন অভিমতগুলির বিচার করিয়া বলিতেছেন যে, রবিউল-আউওল মাসে প্রথম কোর্‌আন অবতীর্ণ হওয়াই ঠিক কথা।***

এই প্রকার মতভেদ হওয়ার কয়েকটা কারণ আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ কোর্‌আন শরীফের দুইটি আয়ৎ হইতে মনে করিয়া লইয়াছেন যে, কোর্‌আন প্রথমে রমজান মাসে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আয়ৎ দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

شهر رمضان الذى انزل فيه القرءان

অনুবাদ ঃ রমজান মাস 'যাহাতে' কোর্‌আন অবতীর্ণ হইয়াছে। (২ পাঃ ৭ রুঃ)

انا انزلناه فى ليلة القدر

অনুবাদ ঃ আমি উহা (কোর্‌আন) 'শবে-কাদর' রাতে অবতীর্ণ করিয়াছি। (৩০ পাঃ "ইন্না আনজালনা" ছুরা)।

রমজান মাসেই যে প্রথম কোর্‌আন অবতীর্ণ হইয়াছিল, এই অভিমতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য তাঁহারা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, হযরতের প্রতি প্রথম অহি রমজান মাসেই নাজেল হইয়াছিল। কিন্তু এই কথা বলিয়া তাঁহারা উদ্ধার পান নাই। পরবর্তী

---

* ছহী মোছলেম, তাবকাত ১—১২৭, ২৯ ; তাবরী ২—২০৩ ; এবনে-হেশাম ১—৮৫ ; কামেল ২—১৬ ; জাদুল-মাআদ ১—১৮, হালবী ইত্যাদি।

** খাতেমা, ৫২৮ পৃষ্ঠা।  *** ১—৩৮।

লোকেরা বলিলেন, ইহা হইতে পারে না, কারণ পুরা ২৩ বৎসর ধরিয়া এবং সকল মাসেই অবতীর্ণ হইয়া তবে কোর্‌আন পূর্ণ হইয়াছে। অতএব রমজান মাসে অবতীর্ণ হইল, এ কথার কোন মূল্য নাই। অপর একদল মিটমাট করিয়া দিবার জন্য বলিলেন, আসল কথা এই যে সম্ভবতঃ পুরা কোর্‌আন শরীফ 'লওহে মাহফুজ' হইতে নীচের আছমানে রমজান মাসেই অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার পর আবশ্যকমত অল্প অল্প করিয়া ২৩ বৎসরে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে, ইহা তাঁহাদের অনুমান মাত্র, এ-সম্বন্ধে কোরআন বা হাদীছের কোন প্রমাণই তাঁহাদের কাছে নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদের কথামতে পুরা কোরআন লওহে মাহফুজ হইতে সাতওঁয়া আছমানে অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁহারা কেহই লওহে মাহফুজের নিকটে বা সপ্তম আছমানে উপস্থিত ছিলেন না। আমরা জমিনের ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতেছি, লওহে মাহফুজ বা সাতওঁয়া আছমানের সহিত এই আলোচনার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ছহী হাদীছের ও স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্যের বিরুদ্ধ তাঁহাদের অনুমানটা কোন মতেই স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এই প্রকারে মূলে ভুল করিয়া, সেই ভুলের শাখা-প্রশাখা বাহির না করিয়া, সূক্ষ্মভাবে হাদীছ-তফছিরের আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সকল কষ্টকল্পনার কোনই আবশ্যকতা নাই। উল্লিখিত আয়ৎ দুইটিতে 'ফী' শব্দের অর্থ 'যাহাতে' ও 'যাহার বিষয়ে' উভয় প্রকারেই হইতে পারে। হাফেজ এবনে কাইয়েম বলিতেছেন ঃ

قالت طائفة انزل فيه القرآن اى فى شانه وتعظيمه

অর্থাৎ একদল পণ্ডিত বলেন, আয়তে 'ফী' শব্দের অর্থ এই যে, রমজানের শান ও তাহার সম্ভ্রম সম্বন্ধে কোরআন নাজেল করা হইল।* সুতরাং আয়ৎ দুইটির এরূপ অর্থ হওয়াও সিদ্ধ ঃ

(১) রমজান মাস যাহার সম্বন্ধে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।

(২) আমি শবে-কাদর সম্বন্ধে কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি।

তফছির বা কোরআনের টীকায় অনেক স্থলে দেখা যায় ঃ

هذه الاية نزلت فى ابى بكر هذه الاية نزلت فى عمر

এই আয়াতটি আবুবাকর সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, এই আয়াতটি ওমর সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, এই আয়াতটি অমুক ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে। কোরআন হইতে এরূপ বহু আয়ৎ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যাহাতে তাঁহারা সকলে এক বাক্যে 'সম্বন্ধে' বা 'ব্যাপদেশে' বলিয়া 'ফী' শব্দের অর্থ করিয়া থাকেন।**

এই সোজা কথাটির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমাদিগের অধিকাংশ টীকাকার, কেবল অনুমান মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সমস্ত কোরআন রমজান মাসে 'লওহে মাহফুজ'*** হইতে নীচের আছমানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইহা তাঁহাদের আত্মরক্ষার্থ কল্পিত অনুমান মাত্র, শাস্ত্রে ইহার কোনই প্রমাণ নাই।

রমজান মাসে কোরআন নাজেল হইয়াছে, কোরআনের গৌরব ও ফজিলতের প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু আয়তগুলি উপক্রম ও উপসংহারসহ উদ্ধৃতরূপে

---

* রুহুল-মাআনী, বায়জাভী ও গারায়েব প্রভৃতি।

** আমার রচিত আমপারার তফছিরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি।

*** কোরআনে—ছুরা বুরুজে বর্ণিত আছে ঃ بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ বরং উহা মহিমময় কোরআন যাহা 'লওহে' লিখিত এবং যে লওহটি হেফাজত করা হইয়া থাকে। লওহে মাহফুজের অর্থ সতর্কতার সহিত সংরক্ষিত 'লওহ'। লওহ অর্থ প্রশস্ত অস্থি বা কাষ্ঠখণ্ড ও যাহার উপর কোরআন লিখিত হইত। (ছেহাহ, কামুছ, নেহায়া, মজমা-উল-বেহার) যে সকল অস্থি বা কাষ্ঠখণ্ডের উপর কোরআন লেখা হইত এবং স্বাভাবিকভাবে সেগুলির রক্ষাই হেফাজত করা হইত—এখানে লওহে-মাহফুজ বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে।

আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, রমজানের বিশেষত্ব বর্ণনা করণার্থ কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, আয়াতগুলি স্পষ্টতঃ এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। ২য় আয়াতে শবে কদরের ফজিলতের বর্ণনা ইহার একটি প্রমাণ।

আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা অতিশয় সরল ও সহজ বোধগম্য কথা। কারণ—

(ক) আমরা যখন স্বীকার করিতেছি যে, রবিউল আউওল মাসে হযরতের জন্ম হইয়াছিল, তখন (তাহার পূর্ববর্তী) ছফর মাসেই যে তাঁহার বৎসর পুরিয়া যাইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কাজেই তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর পুরিয়া যাইতেছে—ঐ ছফর মাসে। অতএব রবিউল-আউওল মাসেই যে সর্বপ্রথমে কোরআন নাজেল হইয়াছিল, এ-কথা সকলকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

(খ) রবিউল-আউওল মাসের ৯ম দিবসে হযরতের জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং রবিউল-আউওলের ৮ম দিনে বৎসর পুরিয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ এই হিসাব অনুসারে মোহাদ্দেছ এবনে আবদুলবর প্রমুখ অধিকাংশ মোহাদ্দেছ ৮ই রবিউল আউওলকে প্রথম অহির তারিখ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।* কিন্তু ৮ই পূর্ব বৎসরের শেষ দিবস, ৯ই হইতে পর বৎসরের প্রথম দিবস আরম্ভ হয়। হিসাব করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বৎসরের ৮ই তারিখে সোমবার পড়ে না, ৯ই তারিখ সোমবার।** অতএব হযরতের ৪১ বৎসর বয়সের প্রথম দিবস, সোমবার ৯ই রবিউল-আউওল তারিখে যে সর্বপ্রথমে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং সেই দিনই যে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়ৎ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে; এই ৯ই রবিউল-আউওল সোমবার যে হযরতের জন্মদিন তাহা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি।

হযরত কোন্ তারিখে কোরআন ও নবুয়ৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা বিশেষ আবশ্যক। এছলামের ইতিহাসের সূত্রপাত হয় এই দিনে। ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনার কালনির্ণয়ও উহার উপর সম্যকরূপে নির্ভর করিতেছে। ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলে ধর্মের দিক দিয়াও ইহার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। তাই আমরা একটু বিস্তারিতভাবে এই প্রসঙ্গটির আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

হযরতের নবুয়তের প্রারম্ভ উপলক্ষে নানাপ্রকার অশাস্ত্রীয় ও ভিত্তিহীন উপকথা কোন কোন পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এছলামের ও হযরতের জীবনীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এবনে আছির সেগুলিকে 'কুয়ো আতিবোতেল' বলিয়া তাহার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। (কামেল ২—১৬)। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে এখানে একটা নমুনা দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। তাঁহারা বলিতেছেন, শয়তান ও তাহার অনুচরবর্গ পূর্বে আছমানে গিয়া সেখানে দুই চারিটা কথা শুনিয়া আসিত এবং তাহার প্রত্যেকটির সহিত ৯৯টি মিথ্যা যোগ করিয়া মানুষের নিকট প্রচার করিত (এই করিয়াই ত তাহারা চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণাদির সংবাদ পূর্ব হইতে প্রচার করিয়া দিতে পারিত। নচেৎ এ-সব গায়েবী খবর জানিবে কি করিয়া ?)। যাহা হউক, একদা শয়তানের দল পূর্ব অভ্যাস মতে আছমানে উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় তাহাদিগকে উল্কার কেন্দ্র ফেলিয়া মারা হইতে লাগিল। শয়তানেরা এই নূতন ব্যাপার দেখিয়া একেবারে অবাক, কারণ ইহার পূর্বে উল্কাপাত হইত না। তখন শয়তানদের সভা বসিল এবং যুক্তি পরামর্শের পর চারিদিকে অনুসন্ধান হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটা গোয়েন্দা শয়তান সংবাদ আনিল যে, হযরত নবী হইয়াছেন। তখন সকলে আসল কথা বুঝিতে পারিল। যাহা হউক, সেই হইতে শয়তানদের আছমানের খবর আনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে ! আর দুনিয়ার উল্কাপাত যে মাত্র এই সাড়ে তের শত বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পাঠকগণ তাহাও অবগত হইয়াছেন !!

* জাদুল-মাআদ ১—১৮, মাওয়াহেব ১—৩১ পৃষ্ঠা।

** শেষোক্ত যুক্তিটি কাজী মোহাম্মদ ছোলেমান ছাহেবের পুস্তক হইতে গৃহীত, আমি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি নাই।

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

## كشف الدجى بجماله

صبح اُمید که بد معتکف پردۂ غیب
گو برون آے! که کار شب تار آخر شد

### সত্যের আত্মপ্রকাশ

আজ ৯ই রবিউল-আউওল সোমবারের (৬১০ খ্রীষ্টাব্দ) সুপ্রভাত, জগতের পক্ষে বড়ই শুভ ও বড়ই মহিমময়। আজিকার এই শুভদিনে স্বর্গের পূর্ণ জ্যোতিঃ আল্লাহ্‌র শেষ বাণী, প্রেমে পুণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া পাপতাপদগ্ধ ধরাধামে আত্মপ্রকাশ করিল। আজিকার এই কল্যাণ মুহূর্তে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের এবং শয়তানের বিরুদ্ধে স্বর্গের সমরভেরী বাজিয়া উঠিল। সকল সুষমায় সমস্ত শুভ্রতায় এবং যাবতীয় মাধুরীতে ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া হযরত হেরার অপ্রশস্ত গহ্বরে বসিয়া আছেন,—ধ্যানমগ্ন যোগী, যোগমগ্ন সাধক সকল প্রাণ ঢালিয়া দিয়া আবেশ-অবশ চিত্তে, ভাবের কোন আকুল স্রোতে কোন অনন্তের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। কিছুদিন হইতে তাঁহার ভিতরে বাহিরে—'ইয়া মোহাম্মদ! আন্তা রাছুলুল্লাহ' (হে মোহাম্মদ, তুমি আল্লাহর রাছুল) বলিয়া যে স্বর-তরঙ্গের ধ্বনি প্রতিধ্বনি অহরহ জাগিয়া উঠিতেছিল, রুহুল-আমীনের সেই স্বর আজ একেবারে স্পষ্ট, জ্যোতির্ময়রূপে তিনি আজ প্রত্যক্ষীভূত।

আমরা হাদীছের বিশুদ্ধতম গ্রন্থ বোখারি ও মোছলেম হইতে, এই সময়কার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

### অহির প্রারম্ভ

বিবি আয়েশা বলিতেছেন ঃ হযরত প্রথম প্রথম স্বপ্নযোগে 'অহি' বা ভাববাণী প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, প্রত্যেক স্বপ্নই প্রভাতের শুভ্র রশ্মির ন্যায় স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষীভূত হইত। তাহার পর তিনি নিভৃতে অবস্থান করিতে ভালবাসিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি হেরা'র গিরিগুহায় নির্জনে বসিয়া কত দিবস-যামিনী ধ্যান ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাহার পর খাদ্য ও পানীয় জল শেষ হইয়া গেলে খদিজার নিকট আগমন করিতেন এবং তিনি উহা গোছাইয়া দিলে তাহা লইয়া পুনরায় হেরায় চলিয়া যাইতেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর, একদা হযরত ঐ গুহায় অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় (হক) 'সত্য' তাঁহার নিকট আগমন করিল। অতঃপর তাঁহার নিকট ফেরেশতা আসিলেন এবং বলিলেন—'পাঠ কর।' হযরত বলিয়াছেন যে, আমি বলিলাম—'আমি পড়াশুনা জানি না!' তখন তিনি (ফেরেশতা) আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন, পরে ছাড়িয়া দিয়া আবার বলিলেন,—'পাঠ কর।' (পূর্ববৎ তিনবার এইরূপ হওয়ার পর) তিনি বলিলেন ঃ

اقرأ باسم ربك الذى خلق - خلق الانسان من علق -
اقرأ وربك الاكرم - الذى علم بالقلم - علم الانسان مالم يعلم -

"তোমার সেই প্রভুর নামে পাঠ কর—যিনি (সমস্তই) সৃষ্টি করিয়াছেন,—
"(যিনি) আলক হইতে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন,—
"পাঠ কর—তোমার সেই মহিমময় প্রভু,—
"যিনি (সাধারণতঃ) লেখনীর সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন,—
"মানবকে (লেখনীর সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত) তাহার অবিদিত-পূর্ব জ্ঞান দান করিয়াছেন।"

হযরত এই বাক্যগুলি লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন তাঁহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছিল—তিনি খদিজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর ! খদিজা তাহাই করিলেন। অতঃপর সেই ত্রাস দূর হইয়া গেলে, হযরত খদিজাকে হেরার সমস্ত বিবরণ অবগত করিয়া বলিলেন—"আমার নিজের সম্বন্ধে ভয় হইতেছে।" তখন খদিজা বলিলেন—"কখনই নহে, আল্লাহ্‌র দিব্য, তিনি কখনই আপনাকে অপদস্থ করিবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের উপকার করিয়া থাকেন, অভাবগ্রস্ত লোকদিগের অভাব পূরণ করিয়া থাকেন, উপার্জন করিতে অক্ষম যাহারা—তাহাদিগের উপার্জনকারী আপনি, অতিথির আশ্রয় আপনি, ঘোর বিপদের মধ্যেও আপনি সত্যের সহায়তা করিয়া থাকেন।" অতঃপর খদিজা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় খুল্লতাত-পুত্র অর্কা-এবনে-নওফেলের নিকট লইয়া গেলেন, এবং বলিলেন, ভ্রাতঃ ! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর। অর্কার প্রশ্নে হযরত হেরার সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বলিলেন। তখন অর্কা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন ঃ "কুদ্দুস্ কুদ্দুস্ (Holy Holy)। মুছার প্রতি আল্লাহ্ যে নামুছ (Nomos) প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই নামুছ। "হায় হায়, আজ যদি আমি যুবাবস্থায় থাকিতাম ! যখন তোমার স্বজাতীয়রা তোমাকে দেশান্তরিত করিয়া দিবে, তখন যদি আমি বাঁচিয়া থাকিতাম !" এই কথা শুনিয়া হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি আমাকে স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে ? অর্কা বলিলেন—"নিশ্চয়ই, কেবল তোমার বলিয়া কথা নহে। তুমি যে সত্যকে প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার সেবক মাত্রকেই তদীয় দেশবাসীগণের কোপানলে পড়িতে হইয়াছে। হায়, আমি যদি ততদিন বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি নিজের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাকে সাহায্য করিব।" কিন্তু ইহার অল্প দিন পরেই অর্কা পরলোক গমন করিলেন। অতঃপর কিছুদিন পর্যন্ত 'অহি' বন্ধ রহিল। (তাবরী ২০—২৭০ প্রভৃতি। বোখারী, মোছলেম, অহির প্রারম্ভ প্রকরণ।)

## আত্মহত্যার চেষ্টা

বোখারীতে এই সঙ্গে সঙ্গে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, অহি বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর হযরতের অস্বস্তি ও চিন্তা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি পর্বত-শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে মধ্যে মধ্যে সংকল্প করিয়াছিলেন।* কিন্তু বোখারীর বর্ণিত হাদীছের এই অংশটুকু হযরতের বা বিবি আয়েশার, এমন কি তাঁহার পরবর্তী রাবীরও উক্তি নহে। ইহা তৃতীয় বর্ণনাকারী জোহরীর বর্ণনা। বর্ণনায় এই অংশটুকু এমনভাবে মূল হাদীছের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা অনভিজ্ঞ পাঠক সহজেই ভ্রান্ত হইতে পারে।** অতএব ঐ অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নহে।

১২৪ হিজরীতে জোহরীর মৃত্যু হয়।*** সুতরাং তাঁহার কথামাত্র সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। ইহার কোন ছনদ জানা থাকিলে জোহরী এই বিবরণ বর্ণনাকালে কখনও তাহা গোপন করিতেন না। ফলতঃ পর্বত হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করার গল্পটি একেবারে ভিত্তিহীন। হাদীছের সর্ববাদীসম্মত নীতি অনুসারে, বিশেষতঃ এইরূপক্ষেত্রে তাহা আদৌ ধর্তব্য ও বিশ্বাস্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বোখারীতে বিভিন্ন স্থানে এই হাদীছটির উল্লেখ আছে।**** কিন্তু মূল বর্ণনার কোন ব্যতিক্রম না ঘটিলেও, বিভিন্ন বর্ণনায় বহু শব্দের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই মূল রাবী বিবি আয়েশা যে ঐ সকল স্থলে ঠিক কোন শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, অথবা তিনি হযরতের মুখে ঠিক কি শব্দ শুনিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। হাদীছের শব্দগুলি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, উহার একাংশ বিবি আয়েশার

---

* ২৮—৪৭৫ পৃষ্ঠা। ** ফৎহুল-বারী, ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা দেখুন।
*** একমাল। **** অহির প্রারম্ভ, তাবির, ঐ ছুরার তফছির।

নিজের কাঁদা এবং অপরাংশ হযরতের কথা। বিবি আয়েশা যতটুকু হযরতের মুখে শুনিয়াছিলেন, 'হযরত বলিলেন' বলিয়া তিনি তাহা স্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন।

## ত্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক

যাহা হউক, মোটের উপর এই হাদীছ হইতে ইহা জানা যাইতেছে যে, হেরা পর্বত গুহাতেই (ফেরেশতার মারফত) সর্বপ্রথমে কোরআন শরীফের 'একরা-বেএছমে' ছুরার প্রথমার্ধ হযরতের উপর নাজেল হইয়াছিল। এই বিবরণ হইতে ইহাও স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, হযরত পূর্ব রচিত কোন একটা 'মতলব' লইয়া নিভৃত সাধনায় প্রবৃত্ত হন নাই। হযরত ভাবের আবেগে বিভোর ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে কোথায় যাইতেছেন, যাইতে যাইতে কোথায় গিয়া পৌঁছিলেন, তাহাও তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই পূর্ণজ্যোতির প্রথম সন্দর্শনে, নামুছে আকবরের প্রথম সাক্ষাৎলাভে তিনি একটু বিচলিত বা ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে সত্য আসিয়াছিল—যে কর্তব্য পালনের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহা সহজ কাজ নহে। বিশ্ব-মানবের মুক্তিবাণী লইয়া তাঁহাকে জগতে মুক্তির ঘোষণা করিতে হইবে। কেবল ঘোষণাই নহে, অন্যের ন্যায় কেবল বাচনিক কর্তব্য সম্পাদন—অথবা কেবল একটি দেশের একটি জাতির মঙ্গলসাধনের জন্য তিনি আসেন নাই। তাঁহাকে মুক্তির পতাকা দিয়া পাঠান হইয়াছিল—বিশ্বের বিশাল কর্মক্ষেত্রে। অধিকন্তু তিনি কেবল ভাবের প্রচারক নহেন, তিনি যুগপৎভাবে কর্মযোগেরও মহাসাধক। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের ত্রিমার্গগামিনী সাধনধারা একাধারে তাঁহাতে আসিয়া আশ্রয় লইবে। কাজেই এই কঠোর কর্তব্যভার প্রাপ্ত হইয়া প্রথমাবস্থায় একটু বিচলিত হইবারই কথা। হাদীছে বা ইতিহাসে যদি ইহার উল্লেখ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতাম।

## বিবি খদিজার হেতুবাদ

সান্ত্বনা দিবার সময় বিবি খদিজা হযরতকে যে কয়টি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন এবং যেগুলিকে ভিত্তি করিয়া তিনি হযরতকে আশ্বাস দিতেছেন, তাহা বিশেষভাবে অবধান করার বিষয়। হযরতের কথা শুনিয়া তাঁহার সহধর্মিণী বিবি খদিজা আল্লাহর দিব্য করিয়া দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ভাষায় বলিতেছেন—'স্বামিন ! আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আনন্দিত হউন ! আল্লাহ্ আপনাকে কখনই বিপর্যস্ত করিবেন না। স্বজনবর্গের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আপনি—পর-দুঃখভার-বহনকারী মহাজন আপনি, কাঙ্গালের সেবক আপনি, যাহার কেহ নাই তাহার আপনজন আপনি,—আল্লাহ্ আপনাকে কখনই বিপর্যস্ত করিবেন না।'- নবুয়তের পূর্বেও এই প্রেম ও সেবাবৃত্তিই হযরতের জীবনের বিশেষত্ব ছিল। বলা বাহুল্য যে, ইহা হযরতের আজন্ম প্রতিপালিত ছুন্নৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর ছুন্নৎগুলি আজ মুছলমান সমাজে বাজে কাজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে !

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ! আপনারা এখন একবার এই মহাসেবকের মহিমান্বিত আদর্শের সহিত, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং মুছলমান সমাজের বর্তমান আদর্শকে মিলাইয়া দেখুন। হায় ! হায় !! যাহারা মোহাম্মদ মোস্তফার 'ওম্মতী' বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে আজ কোথাও তাঁহার এই স্বর্গীয় চরিত্রের আভাসও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ ইহাই হইতেছে হযরতের ৬৩ বৎসর জীবনের প্রধান আদর্শ, এছলামের সকল শিক্ষার, সকল অনুষ্ঠানের এবং সমুদয় ব্যবস্থার সার নির্দেশ।

কোরআন শরীফের যে আয়ৎ কয়টি সর্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাও এস্থলে বিশেষভাবে আলোচ্য। প্রথমেই বলা হইতেছে ঃ

'হে ভাবুক ! হে প্রেমিক ! ভ্রান্ত হইও না। জড়জগতের যা কিছু শক্তি, যা কিছু সৌন্দর্য দেখিতেছ, তাহা স্বতঃ নহে, স্বয়ম্ভু নহে। তাহা শক্তি ও সৌন্দর্যের অনন্ত কেন্দ্র আল্লাহ্ হইতেই সম্ভূত। তিনিই বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টিকর্তা।' সৃজনকারী ও সৃষ্টির অথবা কারণ ও কার্যের মধ্যে যে কি পার্থক্য এবং তাহাদের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, ভাবুক, জ্ঞানী ও সংস্কারকের পক্ষে তাহা স্থির করা প্রথম কর্তব্য। পৃথিবীতে ধর্মের নামে যত অনাচার-অবিচার সংঘটিত হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মানব সৃষ্টিকর্তাকে তাঁহার আসন হইতে নামাইয়া আনিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে লইয়া সেই আসনে বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। সমস্ত রোগের এই মূল বীজটিকে ধরিয়া কোরআন এক কথায় বলিয়া দিতেছে—বিশ্ব-চরাচরের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্, বিশ্বের যাহা কিছু সমস্তই একমাত্র তাঁহারই সৃষ্টি। বিশ্ব-চরাচরের যাহা কিছু সমস্তই যখন তাঁহার সৃষ্টি, তখন সৃষ্টির পূর্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং তাহা অনাদি নহে, সুতরাং তাহা অবিনশ্বর নহে, সুতরাং কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরত্বের আরোপ করা অযৌক্তিক ও অদার্শনিক, কাজেই অন্যায়।

আল্লাহ্র যে গুণবাচক নামটি যে স্থানের ঠিক উপযুক্ত, কোরআন শরীফে সেস্থলে ঠিক সেই নামের ব্যবহার করা হইয়াছে। পাঠক দেখিতেছেন, আলোচ্য আয়তে আল্লাহ্ বা অন্য কোন গুণবাচক নাম ব্যবহার না করিয়া 'রব' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ সৃষ্টির বিবরণের সহিত এই নামের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ। কোরআন শরীফের ভাষার অন্যতম বিশেষত্ব এইখানে। 'রব' শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেই, পাঠক আমাদিগের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। রাগেব এস্‌ফাহানী বলিতেছেন ঃ

الرب في الأصل بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا

অর্থাৎ মূলতঃ 'রব' শব্দের অর্থ প্রতিপোষণকারী—কোন বস্তুকে ক্রমে ক্রমে, তাহার পূর্ণতায় উপনীত করিয়া দেওয়াকে প্রতিপোষণ বলা হয়।

সুতরাং ঐ শব্দের অর্থ হইতেছে—যিনি বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও পদার্থ সমূহের ক্রমবিকাশ বিধায়ক। সৃষ্টির সহিত ক্রম-বিকাশের যে কি সম্বন্ধ, অন্য কোন নাম ব্যবহার করিলে তাহা অবিদিত থাকিয়া যাইত। পাঠক দেখিতেছেন—সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই অভিব্যক্তিবাদের কথাও কেমন সুন্দররূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর এই অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কালে মানবের সৃষ্টি ইত্যাদি লইয়া নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদের সৃষ্টি করা হইবে। তাই কোরআন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সম্পদ মানব সম্বন্ধে বলিতেছে—'যিনি মানবকে 'আলক্' হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।'

"আলক"—অভিধানে ইহার অর্থ—শোণিত বা তাহার কোন এক পরিবর্তিত অবস্থা, প্রেম, আসক্তি বা প্রেমসহকারে আকর্ষণ, জোঁক বা জোঁক জাতীয় ক্ষুদ্র কীট, মানবদেহস্থ সূক্ষ্ম কীট, প্রভৃতি। (কামুছ, মাজমা-উল-বেহার)। এখানে উহার বর্ণিত সমস্ত অর্থ সমানভাবে প্রযোজ্য। এই জন্য আমি উহার বাংলা প্রতিশব্দ দিতে পারি নাই। কেবল 'জমাটরক্ত' বলিয়া উহার অর্থ করিলে যাহার পর নাই অন্যায় করা হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুসারে, মানুষের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে 'প্রোটোপ্লাজম' হইতে—জোঁক বা জোঁক জাতীয় কীটের আকারে। তৎপর তাহার জন্ম হয় পিতামাতার প্রেমাসক্তি ও প্রেমাকর্ষণের ফলে। মাতৃগর্ভে তাহার দেহগঠনের প্রধান উপকরণ হইল—শোণিত ও শুক্র। ইহার মধ্যে আবার শুক্রকীটই তাহার শরীর গঠনের প্রধান উপকরণ। ঐ কীটগুলিও জোঁক জাতীয় এবং সূক্ষ্মদেহ। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, 'আলক' শব্দের বর্ণিত সমস্ত অর্থই এখানে সমানভাবে প্রযোজ্য হইতেছে। সূফী সম্প্রদায়ের কোন কোন লেখক বলেন—এখানে আলাক শব্দের অর্থ প্রেম। অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন প্রেম হইতে।

আল্লাহ্ সৃষ্টির পর নিষ্ক্রিয় বা নির্গুণ অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন না, 'তিনি মহিমময়।' মানবের প্রতি তাঁহার মহিমার শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে বিদ্যা ও জ্ঞান। বিদ্যা উপলক্ষ ও জ্ঞান তাহার লক্ষ্য। লেখনী অর্থাৎ বহি-পুস্তকের সাহায্যে বিদ্যার্জন করিতে হয়, এবং বিদ্যার দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। এই জ্ঞানের সেবা দ্বারা মানুষ অজ্ঞাত-পূর্ব সত্যগুলি প্রাপ্ত হইতে পারে।

মানুষের মস্তিষ্কের প্রধান বিকার এই ছিল যে, সে লেখনী-প্রসূত কোন বহি-পুস্তকে যাহা দেখিয়া লইয়াছে, অতিভক্তি বা পরম্পরাগত সংস্কার-ফলে সে তাহাকে চোখ বুজিয়া মানিয়া লইয়াছে। ধর্ম বা অন্য প্রকার জ্ঞানের সকল বিভাগের এই অবস্থা ছিল। জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার এই 'পক্ষাঘাতই' মানবের সকল সর্বনাশের মূল কারণ। তাই কোর্‌আন সর্বপ্রথমে এই বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছে। ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, বিদ্যা ও জ্ঞান এই চারিটি মূল বিষয় হইতেছে সকল সংস্কারের বীজ-স্বরূপ। মানবের পুথিগত বিদ্যাই জ্ঞান নহে। উহা জ্ঞানলাভের উপলক্ষ হইতে পারে—যদি তাহাতে বা তাহার ব্যবহারে কোন প্রকার বিকার না স্পর্শিয়া থাকে। লেখনীর সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া অর্থাৎ মানবের বিশ্বাস, সংস্কার ও ভাবাদির প্রভাব শূন্য হইয়া ঐ উপকরণ ও উপলক্ষগুলির দ্বারা কাম্য, লভ্য ও আকাঙ্ক্ষণীয় যে জ্ঞান, এইরূপে খোদার দেওয়া বিবেকের—আত্মার আলোকের—দ্বারা তাহাকে চিনিতে ও লাভ করিতে হয়। কোরআনে প্রথম-ক্রমে পুথিগত বিদ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পূর্ণতা হইতেছে দ্বিতীয় আয়তে। স্বাধীনচিন্তা, ভাবুকতা ও আত্মার আলোক দ্বারা এখানে উপনীত হইতে হয়। এই স্তরে উপনীত হইতে পারিলে বিশ্বাস জ্ঞানে পরিণত হয়, তখন আর কোন শঙ্কা বা সন্দেহ থাকে না। ফলতঃ এখানে এছলাম, ঈমান, এলমুল-একিন ও আয়নুল-একিনের মহান তত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের সহিত যোগের কি গভীর সম্বন্ধ, নির্লিপ্ত ও অনাবিল ভাবুকতার সহিত পরমার্থ জ্ঞানের যে কি অভেদ্য বাধ্য-বাধকতা, কোর্‌আনের এই প্রথম আয়তে মানবকে তাহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই শিক্ষার বাস্তব শাশ্বত এবং স্বর্গীয় আদর্শ—মহিমময় মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। নিরক্ষর মোস্তফা অজ্ঞানতার বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে, কেবল সেই আত্মার আলোককে পথ-প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সকল জ্ঞানের জ্ঞেয় ও সকল সাধনার সাধ্য সেই প্রাণাভিরাম পরম প্রিয় 'সচ্চিদানন্দ'কে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হইবার জন্য। তিনি সিদ্ধি ও সাফল্যের উচ্চতম স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন—এই অনাবিল ও মুক্ত ভাবুকতার দ্বারা। পূর্ব সঞ্চিত সংস্কার বা জ্ঞানহীন বিশ্বাস-স্তূপগুলিকে মস্তিষ্কের ত্রিসীমা হইতে পূর্বাহ্ণে দূর করিয়া দিতে না পারিলে, পরমসাধ্য সত্যকে কখনই অনাবিলভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই মস্তিষ্কের দাসত্বই সকল অকল্যাণের মূলীভূত কারণ। হযরত ইহা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আলোচ্য আয়তে তাঁহার সাধনার এই বিশেষত্বটির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

خیز که شد مشرق و مغرب خراب

### সত্য প্রচারের আদেশ

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত আয়তগুলি প্রাপ্ত হওয়ার পর কিছুদিন পর্যন্ত হযরতের নিকট নূতন কোন 'বাণী' আসিল না। চিন্তা, উদ্বেগ ও অধৈর্যের মধ্য দিয়া কয়েকদিন এইভাবে চলিয়া গেল। একদিন হঠাৎ তিনি পূর্ববৎ সেই পরিচিত শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দেখিলেন, স্বর্গ-মর্ত্যের মধ্যস্থলে এক আসনের উপর উপবিষ্ট—হেরার পূর্ব পরিচিত সেই

ফেরেশতা। তখনও তাঁহার ত্রাস হইল এবং তিনি বাটীতে আসিয়া পূর্ববৎ কাপড় গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। (বোখারী, মোছলেম।) তখন নিম্নলিখিত আয়তগুলি অবতীর্ণ হইল—

يا ايها المدثر- قم فانذر- وربك فكبر- وثيابك فطهر-
والرجز فاهجر- ولا تمنن تستكثر- ولربك فاصبر-

হে সংস্কারক! দণ্ডায়মান (প্রস্তুত) হও এবং মোনবমণ্ডলীকে তাহাদের পাপের অবশ্যম্ভাবী কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দাও ঃ—

এবং স্বীয় প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা কর ;—
এবং নিজ পরিচ্ছদগুলিকে শুচি সম্পন্ন কর,
এবং সর্বপ্রকার কলুষকে পরিবর্জন কর ;

এবং অধিকতর প্রত্যুপকার প্রাপ্তির ইচ্ছায় উপকার করিও না ;

এবং (সত্যের প্রচারে তোমাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে যে কঠোর পরীক্ষায় পড়িতে হইবে, তুমি তাহাতে বিচলিত হইও না, বরং) স্বীয় প্রভুর (সন্তোষ লাভের) জন্য ধৈর্যধারণ করিও।*

## আল্লাহো আকবর—এছলামের বীজমন্ত্র

জ্ঞানযোগের সিদ্ধির পর, আজ হইতে মহাপুরুষের কর্মযোগের আরম্ভ হইল। মৌনী ভাবুককে স্বীয় কর্তব্যপালনের জন্য দৃঢ়তার সহিত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে আদেশ আসিল। তাঁহার প্রচারক-জীবনের প্রকৃত স্বরূপ ও প্রচারের মূল বিষয়টিও বর্ণিত আয়ত সমূহে স্পষ্টতঃ বলিয়া দেওয়া হইল। আল্লাহ্ই যে শ্রেষ্ঠতম, মহত্তম ও বিরাটতম—অর্থাৎ একমাত্র তিনিই বড়, ইহা প্রচার করিবার আদেশ হইল। এছলাম ধর্ম ও মোছলেম জাতীয়তার বীজমন্ত্র এই—"আল্লাহো আকবর।" এই ধ্বনিই সূতিকাগৃহে মোছলেম শিশুর কর্ণে সর্বপ্রথমে প্রবেশ করে। তাহার পর সকালে-সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে-অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে ইহারই প্রতিধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে মুখরিত হইতে থাকে। ঈদে-উৎসবে, হজ্জে-তশরিকে সর্বত্রই এই "আল্লাহো আকবর"—এবং অবশেষে ধর্ম সমরের মরণ কণ্টকিত জীবন-প্রাঙ্গণে শাণিত কৃপাণকে বক্ষে ধারণ করিয়া সে যখন পুণ্যময় নিত্যজীবন লাভ করিতে যায়—মোছলেম অস্তিত্বের সেই চরম সফলতার কল্যাণ মুহূর্তেও সে নিজের চারিদিকে উহারই মুখরণ শ্রবণ করিতে থাকে। ইহাই হইতেছে—এছলামের কর্মযোগের আদি মন্ত্র।

"আল্লাহো আকবর"—এই মহামন্ত্রের অর্থ, আল্লাহ্ বৃহত্তম, মহত্তম। সুতরাং তাঁহা ব্যতীত আর সমস্তই ক্ষুদ্রতম, হীনতম। বৃহত্তম ও মহত্তমকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রতম ও হীনতমকে গ্রহণ করিবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জগতের সমস্ত স্বার্থ, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত ভয়, সমস্ত বিভীষিকা তাঁহার মোকাবেলায় হীনতম ও নিকৃষ্টতম—অতএব বৃহত্তমের সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে তাহা অবশ্য পরিত্যাজ্য। কিন্তু পৃথিবীর কোন হীন স্বার্থের লোভে অথবা কোন ক্ষুদ্র বিভীষিকার ভয়ে তাঁহাকে বা তাঁহার কোন আদেশকে পরিত্যাগ করা যায় না। কারণ তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ বা তাঁহার আদেশকে তুমি আর বৃহত্তম বলিয়া স্বীকার করিলে না? এই ভাবে বিভোর ও এই জ্ঞানে তন্ময় না হইতে পারিলে "আল্লাহো আকবর" মন্ত্রের সাধনা সফল হইতে পারে না।

## নেতার কর্তব্য

দেশের সেবক ও সমাজের সংস্কারক পদে যিনি বৃত হইবেন, সর্বপ্রথমে তাঁহাকে আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে, সকল প্রকার কলুষ—দৈহিক এবং মানসিক অশুদ্ধি ও বিকার—সম্পূর্ণরূপে

---

* বোখারী, মোছলেম ; তাবারী, কামেল, এবনে-হেশাম, তয়ালছী প্রভৃতি।

পরিবর্জন করিতে হইবে, তাঁহাকে নিজে পবিত্রতার আদর্শ হইতে হইবে। পক্ষান্তরে সত্যের সেবক, জাতির সংস্কারক ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তাঁহার কর্তব্য-পথ অসংখ্য বিষকন্টকে পরিপূর্ণ। নিজের কর্তব্য জ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আল্লাহ্‌র নামে শক্তিসঞ্চয় করিয়া, তাঁহাকে পর্বতের ন্যায় অটল ও আকাশের ন্যায় বিশাল হৃদয় লইয়া দৃঢ়তার সহিত সেই বিষকন্টক সমাকীর্ণ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। যে ভণ্ড, যে কপট, অথবা যে নিজেই কর্তব্যের গুরুত্ব ও সাধনার সত্যতা সম্যকরূপে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহার পক্ষে এইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন একেবারে অসম্ভব। ইহার পূর্ণ ও নিখুঁত আদর্শ আমরা একমাত্র হযরত মোস্তফার জীবনেই দেখিতে পাই।

এই আয়তে আরবীতে 'মোদাছের' শব্দ আছে। উহার ধাতু 'দাল-ছে রে'—বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গাচ্ছাদন করা এবং এছলাহ বা সংস্কার করা, উহার এই উভয় অর্থই অভিধানে লিখিত আছে

(১) دثر الطائر تدثيرا- درست ساخت طائر آشيانهٔ خود را (منتهى الارب)

(২) دثر الطائر اى اصلح عشه (صحاح)

(৩) مدثر- اى الذى دثر هذا الامر العظيم وعصب به (تفسير ابو السعود)

আমরা ঐ শব্দের যে অনুবাদ করিয়াছি, তাহা যে ভুল বা অভিনব ব্যাপার নহে, ইহার প্রমাণ স্বরূপ উপরে তফছির ও অভিধান হইতে কয়েকটি দলিল উদ্ধৃত হইল। আল্লাহ্ যদি কখনও কোরআনের তফছির লেখার সুযোগ প্রদান করেন,* তাহা হইলে যথাস্থানে এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

## প্রাথমিক মোছলেমমণ্ডলী

এই আয়তগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত এই সত্যসমূহ প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন। প্রথমে নির্বাচিত লোকদিগের নিকট গোপনে গোপনে প্রচার করা হইতে লাগিল। কয়েক-দিনের মধ্যে তাঁহার সহধর্মিণী বিবি খদিজা, তাঁহার খুল্লতাত পুত্র হযরত আলী, তৎকর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত জায়েদ, তাঁহার ধাত্রী উম্মে-আয়মান, তাঁহার বাল্যবন্ধু আবুবাকর ছিদ্দিক, সেই সত্যকে স্বীকার করিয়া এছলাম গ্রহণ করিলেন।

হযরত বেলাল, আমর-বেন আম্বাছা, খালেদ-বেন-ছাআদ, ইহার কিছু দিন পরে এছলাম গ্রহণ করিলেন।

মহিলাগণের মধ্যে বিবি খদিজার পর, আব্বাছের স্ত্রী ওম্মল-ফাজল, আমিছের কন্যা আছমা, আবুবাকরের কন্যা আছমা, ওমরের ভগ্নী ফাতেমা সর্বাগ্রে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

## আলী ও আবুবাকর

এই সৌভাগ্যশালী মহাজনগণের মধ্যে কবে কে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে, বিশেষতঃ আলী ও আবুবাকরের মধ্যে কে আগে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া ঐতিহাসিক সূত্রগুলির মধ্যে অনৈক্য দেখা যায়। কিন্তু একত্রে ইতিহাস ও রেজাল শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আলী, আবুবাকর ছিদ্দিকের পূর্বে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হযরত আবুবাকর তাঁহার পূর্বে প্রকাশ্যভাবে লোকের নিকট নিজের এছলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। এই মহাজনগণের প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে, ইঁহারা সকলেই আমাদের মাথার মণি।

---

* আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া আদায় করিতেছি যে, তাঁহার অপার অনুগ্রহে তফছিরুল কোরআন ৫ খণ্ডে সমাপ্ত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে......।

সুতরাং ইহা লইয়া কোন্দল পাকাইয়া তাঁহাদের জীবনের আসল আদর্শ বিস্মৃত হইয়া যাওয়া, কোন পক্ষেরই উচিত হইতেছে না।

এই সময় আলী হযরতের নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে মক্কায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আবু-তালেবের পরিজন অনেক ছিল, পাছে তাঁহাদের কোন প্রকার কষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় হযরত পিতৃব্য আব্বাছকে সম্মত করাইয়া আবু-তালেবের পুত্র জাফরের ভরণপোষণভার তাঁহার উপরে দিলেন এবং আলীকে নিজে লইয়া আসিলেন। সেই হইতে আলী হযরতের নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন।

হযরত আবুবাকর সচ্চরিত্র, সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ধীর প্রকৃতি, সৎবুদ্ধি ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত বলিয়া বহুলোকের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-কুশল হইত। তিনিও উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া এছলামের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় যে সকল মহাত্মা এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জীবনের পূর্বাবস্থাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবুবাকর এছলাম গ্রহণের পূর্বেও অতি সচ্চরিত্র, সাধুপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও বিচক্ষণ বলিয়া সর্বত্র খ্যাত ছিলেন। হযরতের সহিত বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তিনি হযরতের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম আবদুল্লাহ্ এবনে ওছমান, আবুকোহাফা বলিয়া তিনি খ্যাত ছিলেন। হযরত বেলালকে তিনিই খরিদ করিয়া মুক্ত করেন। ধীর-স্থির চিন্তাশীল ও সাধুসজ্জন বলিয়া এছলামের পূর্বেও সকলে তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। তিনি একজন অর্থশালী বণিক ছিলেন।

বিবি খদিজার পূর্বজীবনের আভাস আমরা পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছি। জায়েদ আশৈশব তাঁহার সেবক, উম্মে-আয়মান আজন্ম তাঁহার পরিচারিকা। আলী তাঁহার খুল্লতাত আবু-তালেবের পুত্র। ইঁহারা সকলেই হযরতের ভিতর-বাহিরের অবস্থা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন, ইঁহারাই সর্বপ্রথমে তাঁহার প্রচারিত সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জীবনে-মরণে কোন প্রকারে তাঁহার অনুসরণে একবিন্দুও ঔদাসিন্য প্রকাশ করেন নাই। ফলতঃ আমরা দেখিতেছি যে, নবুয়তের পূর্বে যাঁহারা হযরতকে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন, তাঁহারাই সর্বপ্রথমে তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। হযরতের পূর্বজীবনও যে কতদূর সৎ ও মহৎ ছিল, ইহা দ্বারা তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

## তিন বৎসর গোপনে প্রচার

তিন বৎসর পর্যন্ত এইরূপ সঙ্গোপন ও সন্তর্পণ সহকারে, নবধর্মের প্রচার চলিতে লাগিল। ফলে হযরত ওছমান, জোবের, আবদুর রহমান-এবনে-আওফ, তাল্‌হা, ছাআদ-এবনে-অক্কাছ, আবুওবায়দা, ওছমান-এবনে মাজউন, ছোহেব রুমী, আবদুল্লাহ এবনে-মাছউদ প্রভৃতি নবধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এই মহাজনগণ শেষে কিরূপ লোমহর্ষক কঠোর পরীক্ষায় নিপতিত হইয়া অসাধারণ মানসিক বল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই পুস্তকের স্থানে স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এই সময় এছলামের সমস্ত কাজই অতি সন্তর্পণে সমাধা করা হইত। হযরত মধ্যে মধ্যে বিশ্বাসিগণকে লইয়া দূর পর্বত-প্রান্তরে চলিয়া যাইতেন, এবং সেখানে প্রাণ ভরিয়া আল্লাহর এবাদত করিতেন। আবু-তালেব এবং আরও কতিপয় কোরেশ ক্রমে ক্রমে ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

## কয়েকটা বিবরণের বিচার

আমরা পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে হযরতের ত্রাসের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি। বোখারীর উল্লিখিত জোহরীর বর্ণনাতে হযরতের আত্মহত্যা করার সঙ্কল্পের কথাও অবগত

হইয়াছি। আবার আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, পর পর দুইবার কোর্‌আন অবতীর্ণ হইবার সময় হযরত ত্রাসে অধৈর্য হইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িতেছেন। ছুরা মোদ্দাচ্ছেরের পর ছুরা মোজ্জাম্মেল, ইহাতেও ত্রাস-জনিত বস্ত্রাচ্ছাদিত হওয়ার কথা বলা হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু এই ত্রাসের ও বস্ত্রাচ্ছাদন-সংক্রান্ত বিবরণের তাৎপর্য ঐ সব বিবরণ হইতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। টীকাকারেরা বলিতেছেন, নবুয়তের গুরুভার সহিবার শক্তি ক্রমে ক্রমে আসিয়া থাকে। পক্ষান্তরে আর এক দলের কথায় জানা যায় যে, ফেরেশ্‌তা দর্শনই তাঁহার ত্রাসের মূল কারণ। অথচ আমরা তাঁহাদিগের বর্ণনা হইতে জানিতে পারিতেছি যে, বক্ষ-বিদারণ ব্যাপার উপলক্ষে পাঁচবার ফেরেশ্‌তাদিগের সহিত হযরতের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ২য় বাণিজ্য-যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার মাথার উপর ছায়া করিয়াছিলেন। পথে-ঘাটে সর্বত্রই বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি তাঁহাকে ছালাম ও ছেজদা করিত। অথচ এখন তিনি ফেরেশ্‌তা দেখিয়া ভয়ে কম্পিত এমন কি ভূপতিত হইতেছেন, এ-কথার তাৎপর্য কি, আমাদিগের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। অধিকন্তু বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, তবু হযরতের এই ত্রাস ও ভীতি বিদূরিত হইল না, ইহাও সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ আলোচনার বিষয়।

এতদ্‌সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীছ ও ঐতিহাসিক বিবরণগুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যায় যে, একই ত্রাস ও বস্ত্রাচ্ছাদনের বিবরণকে রাবীগণ বিভিন্ন ঘটনার সহিত জড়াইয়া দিয়াছেন। বোখারী ও মোছলেমের বর্ণিত এহ্‌য়া-এবনে-আবিকাছিরের হাদীছে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ হাদীছের বর্ণনাকারিগণ, এই গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া হযরতের প্রমুখাৎ উল্লেখ করিতেছেন যে, হেরা পর্বত গুহায় ছুরা মোদ্দাচ্ছেরের আয়তগুলি অবতীর্ণ হইয়াছিল—একরা-বে' এছমে নহে। অথচ ইহা সকল প্রামাণ্য হাদীছের এবং তফছির ও ইতিহাসের সর্ববাদীসম্মত সাক্ষ্যের বিপরীত কথা।*

## রাবীগণের ভ্রম

ইহাও স্থির নিশ্চিত যে, হযরত কখনও পরস্পর বিপরীত দুইটি বিবরণ প্রদান করেন নাই। বোখারী ও মোছলেমের রাবীগণ মিথ্যাবাদীও নহেন। সুতরাং এই ঘটনা বর্ণনাকালে, বৃত্তান্তঘটিত ভ্রম যে তাঁহাদের হইয়াছে, ইহা বলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

আমাদের মতে, প্রথমবারেই ত্রাস ও শৈত্যানুভব** হইয়াছিল। মোদ্দাচ্ছের শব্দের সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিলেও এইটুকু প্রতিপন্ন হইবে যে, এই শব্দে প্রথমবারের বর্ণিত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ছুরা মোজ্জাম্মেলের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। ঐ ছুরার প্রারম্ভে হযরতকে বলা হইয়াছে যে, 'হে বস্ত্রাচ্ছাদনকারী, উঠিয়া রাত্রিতে উপাসনা কর।' মানুষ রাত্রে শয়ন করিবার সময় কাপড় গায়ে দিয়া থাকে। হযরতও এইরূপে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া শুইয়া ছিলেন, আয়তে তাঁহাকে শয্যাত্যাগ করিয়া উপাসনায় রত হইতে বলা হইতেছে মাত্র। ইহা স্বাভাবিক কথা। প্রথম অহির সময়কার ত্রাস ও বস্ত্রাচ্ছাদনের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই।***

ডাঃ মার্গোলিয়থ তাঁহার স্বাভাবিক অসৎ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া বলিয়াছেন যে—আবু-বাকরের সহিত মোহাম্মদের সৌহৃদ্য ঘটিয়াছিল, মাত্র এক বৎসর হইতে। নিজের মতলবের মত লোক বুঝিতে পারিয়া মানব চরিত্রে অভিজ্ঞ সুচতুর মোহাম্মদ তাঁহাকে

---

* জাদুল-মাআদ ১—১৮ পৃষ্ঠা। বোখারী, মোছলেম, আবুছালমা জাবের হইতে। মাওয়াহেব ১—৪১, তিবরান ১১—১৪ পৃষ্ঠা, নওয়াবী ফৎহুলবারী প্রভৃতি। ইমাম নাবাবী এই কথাকে বাতেল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

** বায়জাভী। *** বায়জাভী।

বাছিয়া বাহির করিয়াছিলেন। এই উক্তিটি বর্ণে বর্ণে মিথ্যা। বাল্যকাল হইতেই হযরতের সহিত আবুবাকরের সৌহৃদ্য ছিল।*

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

### প্রকাশ্য প্রচারের আদেশ

### কোর্‌আনের দুইটি আয়ত

তিন বৎসর পর্যন্ত গোপনে গোপনে প্রচারের কাজ চলিতে লাগিল। একমাত্র সত্যের অনুসন্ধিৎসা ও ন্যায়ের প্রভাব ব্যতীত এই নব্য দলের সম্মুখে অন্য কোন প্রলোভন বা আকর্ষণ ছিল না। বরং আত্মীয়-বিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, পুরুষানুক্রমিক ধর্ম ও সংস্কারাদির বর্জন, প্রত্যেক মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা—এই সকল বর্তমান ও ভাবী বিপদকে তাঁহারা এছলামের জন্য আনন্দ সহকারে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময় কোরআন শরীফের যে সকল ছুরা বা আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল, মৎপ্রণীত তফছীরুল কোরআনের সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে তাহার তরজমা ও তাৎপর্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

যাহা হউক, তিন বৎসর পরে এই দুইটি আয়ত অবতীর্ণ হইল—

(ক) وانذر عشيرتك الاقربين

"—এবং তুমি (মোহাম্মদ !) নিজের নিকট-আত্মীয়বর্গকে (পাপ ও ঈশ্বরদ্রোহিতার অবশ্যম্ভাবী ফল সম্বন্ধে) সতর্ক করিয়া দাও।" (১৯—১৫)

(খ) فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين

"অপিচ তোমার প্রতি যে আদেশ হয়, তুমি তাহা স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দাও, এবং মুশরিকদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না। (১৫—৬)

এই দুইটি আয়তের আদেশে ও তাহার প্রকৃতিতে একটু পার্থক্য আছে। ইহার মধ্যে কোনটি অগ্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার স্পষ্ট কোন নির্ধারণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় আয়তের উপক্রম ও উপসংহার দ্বারা মনে হয় যে, সম্ভবতঃ এই আয়তটিই প্রথম আয়তের পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কারণ উহাতে জানা যায় যে, মক্কাবাসীরা কোরআন, তাহার আদেশ-উপদেশ ও বিভিন্ন ছুরার নাম ইত্যাদি লইয়া, উহা অবতীর্ণ হইবার পূর্ব হইতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল; তবে ইহা নিশ্চিত যে, এই দুই আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে অধিক সময়ের ব্যবধান ছিল না।

اصدع শব্দের অর্থ افرق بين الحق والباطل সত্য ও মিথ্যা (হক্ ও বাতেল)-কে অনাবিলভাবে স্বতন্ত্ররূপে বর্ণনা কর। অর্থাৎ সৎকর্মশীল হও, পাপে লিপ্ত হইও না; কেবল এইরূপ উপদেশ দিলে চলিবে না। বরং কোন্ কাজটা সৎ আর কোন্ কাজটা অসৎ, কোনটি পাপ কোনটি পুণ্য, তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতে হইবে।**

---

* এছাবা, এস্তিআব প্রভৃতি।

** কামেল, ২—২২ পৃষ্ঠা। আজকালকার ওয়াজে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, শের্ক বেদআতে লিপ্ত হওয়া মহাপাপ। কিন্তু কোন কাজটা শের্ক আর কোনটা যে বেদআৎ, তাহা বক্তাগণের অনেকেই সাহস করিয়া খুলিয়া বলিতে পারেন না। এই প্রকার সৎসাহসের অভাবে সমাজে শের্ক ও বেদআৎ সংক্রমিত ও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। আলেমগণের কর্তব্য সম্বন্ধে কোরআনে স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে—যাহারা আল্লাহর বাণীর প্রচারক, তাঁহারা আল্লাহকে ভয় করেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করেন না। (৩৩ ঃ ৩৯) এখনকার অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত। দুনিয়ার এমন কোন জুজু নাই, যাহার ভয়ে তাঁহাদের হৃদয় বিহ্বল হইয়া না পড়ে।

এই দুইটি আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী ঘটনাগুলি নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

### প্রচার উদ্দেশ্যে প্রথম সম্মেলন

আল্লাহ্‌র আদেশ মতে, নিকট-আত্মীয়গণকে বুঝাইবার জন্য হযরত সর্বপ্রথমে একটা সামাজিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করিলেন। মহাত্মা আলী নিমন্ত্রিত আত্মীয়গণের জন্য খাদ্যাদির বন্দোবস্ত করিতে হযরতের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। হযরতের আহ্বানক্রমে হাশেম বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, সংখ্যায় ন্যূনাধিক ৪০ জন, রাত্রিকালে হযরতের গৃহে সমবেত হইলেন। হযরত যে কি বলিবেন, তাহা কাহারও-অন্ততঃ আবুলাহাবের, অবিদিত ছিল না। হযরত কথা আরম্ভ করিবেন, এমন সময় সে একটা হট্টগোল বাধাইয়া দিল। সে হযরতকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"দেখ মোহাম্মদ ! তোমার পিতৃব্য ও খুল্লতাতভ্রাতৃবর্গ সকলেই এখানে উপস্থিত, চপলতা ত্যাগ কর। তোমার জানা উচিত যে, তোমার জন্য সমস্ত আরব দেশের সহিত শত্রুতা করার শক্তি আমাদিগের নাই। তোমার আত্মীয়গণের পক্ষে তোমাকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখা কর্তব্য। তোমার ন্যায় স্ববংশের এমন সর্বনাশ আর কেহ করে নাই।' যাহা হউক, প্রথম দিনের সম্মেলনে হযরত কোন কথা বলিবার সুযোগই পাইলেন না।

### দ্বিতীয় সম্মেলন

হযরত প্রথম দিনের এই অকৃতকার্যতায় নিরুৎসাহ হইলেন না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আর একদিন ঐ প্রকার ভোজের আয়োজন করিয়া সগোত্রস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিলেন। পূর্ববৎ সকলে সমবেত হইলে, আহারাদি শেষ হওয়ার পরই, আবুলাহাবকে কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া হযরত বলিতে লাগিলেন—'সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ ! আমি আপনাদিগের জন্য ইহকাল ও পরকালের এমন কল্যাণ লইয়া আসিয়াছি—যাহা আরবের কোন ব্যক্তি তাহার স্বজাতির জন্য কখনও আনয়ন করে নাই। আমি আল্লাহ্‌র আদেশে সেই কল্যাণের দিকে আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। সত্যের এই মহাসাধনায়, কর্তব্যের এই কঠোর পরীক্ষায়, আপনাদিগের মধ্যে কে আমার সহায় হইবেন, কে আমার সঙ্গী হইবেন ?'

স্তব্ধ ও ক্ষুব্ধ সভার একপ্রান্ত হইতে আলী বলিলেন—'হযরত, এই মহাব্রত গ্রহণের জন্য আমি প্রস্তুত আছি।' আলীর কথা শুনিয়া, সকলে তাঁহার পিতা আবু-তালেবকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল,—'দেখিতেছেন, আপনার ভ্রাতৃপুত্রের কল্যাণে এখন আপনাকে স্বীয় বালক পুত্রের অনুগত হইয়া চলিতে হইবে !'*

### অদম্য উৎসাহ

যাহা হউক, হযরতের উৎসাহ ও উদ্যমের সীমা নাই। আত্মবিশ্বাসহীন ভণ্ড বা দুর্বলচেতা লোকেরা প্রাথমিক অকৃতকার্যতায় বিহ্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু অনাবিল সত্য ও অবিচল আত্মবিশ্বাস লইয়া যে সকল মহাপুরুষ কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য পালনে অগ্রসর হন, তাঁহাদের সাফল্যের কল্যাণ-সৌধ অকৃতকার্যতার ভিত্তির উপরই নির্মিত হইয়া থাকে। কারণ, প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ অকৃতকার্যতার প্রাথমিক আঘাতে যখন মুহ্যমান হইয়া পড়ে, তখন সত্যের সেবকগণ অধিকতর উৎসাহ, অধিকতর সাহস ও অধিকতর দৃঢ়তা সহকারে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকেন। সত্যের মহাসেবক ও কর্তব্যের মহাসাধক

---

* সমস্ত ইতিহাসে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃতরূপে এই সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কামেল ২—২৯, তাবরী ২—২৯৭, ৯৮, খালদুন ২—২৪, তাবকাত ২—১৩২, আবুল-ফেদা ১১৬ ইত্যাদি।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন ইহার পূর্ণতম আদর্শ। আত্মীয়-স্বজনগণের এই উপেক্ষা ও দুর্ব্যবহারে তিনি একটুও চঞ্চল বা ক্ষুব্ধ হইলেন না—বরং তাঁহার উদ্যম আরও বাড়িয়া গেল।

## পর্বতের আওয়াজ

তখন আরবের নিয়ম ছিল—কোন ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা হইলে বা কেহ দেশবাসীর নিকট কোন গুরুতর বিষয়ের বিচার-প্রতিকার প্রার্থী হইলে, সে পর্বতের উপর আরোহণ করতঃ, বিশেষ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিত। তাই বিশ্বের বিপদবারণ আর্তশরণ মোস্তফা, আজ প্রভাতে ছাফা পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া ঐরূপ আহ্বান করিতে লাগিলেন। গম্ভীরে-করুণে সে আহ্বান মক্কার গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইল এবং যথানিয়মে মক্কাবাসিগণ সকলে ছাফা পর্বতের দিকে ধাবমান হইল। সকলে সমবেত হইলে, হযরত প্রত্যেক গোষ্ঠীর নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে কোরেশবংশীয়গণ! আজ (এই পর্বত শিখরে দাঁড়াইয়া) আমি যদি তোমাদিগকে বলি—'পর্বতের অন্যদিকে এক প্রবল শত্রুসৈন্য-বাহিনী তোমাদিগের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে,'—তাহা হইলে তোমরা আমার এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে কি?' সকলে সমস্বরে উত্তর করিল—নিশ্চয়, বিশ্বাস না করার কোন কারণ নাই, আমরা কখনই তোমাকে মিথ্যার সংস্পর্শে আসিতে দেখি নাই। হযরত তখন গুরুগম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"যদি তাহাই হয়, তবে শ্রবণ কর! আমি তোমাদিগকে (পাপ ও ঈশ্বরদ্রোহিতার ভীষণ পরিণাম ও তজ্জনিত) অবশ্যম্ভাবী কঠোর দণ্ডের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। হে আবদুল মোত্তালেবের বংশধরগণ! হে আবদে মোনাফের বংশধরগণ! হে জোহরার বংশধরগণ! (এইরূপে কোরেশ বংশের প্রত্যেক গোত্রের নাম করিয়া) আমার আত্মীয়-স্বজনকে উপদেশ দিবার জন্য আমার প্রতি আল্লাহর আদেশ আসিয়াছে। তোমাদিগের ইহকালের মঙ্গল ও পরকালের কল্যাণ হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' না বল।" ইহা শুনিয়া আবুলাহাব বলিয়া উঠিল, 'তোর সর্বনাশ হউক, এইজন্য কি আমাদিগকে সমবেত করিয়াছিলি!'*

## তাওহীদের প্রথম ঘোষণা

মানসিক বিকাশে ও পরমার্থের উন্মেষে, যে মহাপুরুষ আল্লাহর অনুগ্রহে মনুষ্যত্বের ঊর্ধ্বতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন এবং তথা হইতে মানব জীবনের উভয় দিক যিনি সম্যকরূপে দর্শন করিতেছেন—তাঁহার কথা কোরেশের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের মর্মকে স্পর্শ করিতে পারিল না। পুরুষানুক্রমিক সংস্কার, পরম্পরাগত বিশ্বাস, পৌরোহিত্যের প্রলোভন এবং পারিপার্শ্বিক আচারের মোহ এমনই ভাবে মানুষের হৃদয়কে অন্ধ করিয়া থাকে।

'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'—আল্লাহই একমাত্র মা'বুদ, তিনি ব্যতীত অন্য মা'বুদ নাই। জগতের এই সনাতন ও বিস্মৃতপূর্ব মহামন্ত্রটি বহুদিন পরে আজ আবার নূতন করিয়া ছাফা পর্বতের চূড়া হইতে প্রতিধ্বনিত হইল।' 'একম'কে জগতের সকল জাতিই স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে বিশ্বাস অনেকেই করে না। কারণ, তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস না করিলে সেই একম বা 'অহদুহু'র প্রকৃত স্বরূপই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ঈশ্বরত্বের কোন প্রকার গুণ আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাতেও নাই, এই বিশ্বাসের নামই তাওহীদ বা প্রকৃত একেশ্বরবাদ। কে কিরূপ বিশ্বাস করে, কার্যের দ্বারা তাহার

---

* বোখারী, মোছলেম ও তাবকাত ২—১৩৩ প্রভৃতি।

পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত বলিতেছেন, 'ইহ-পরকালের সমস্ত কল্যাণ এই মহামন্ত্রের মধ্যে অবস্থান করিতেছে।' কারণ, মানুষের সকল প্রকার কল্যাণের মূল হইতেছে, তাহার মুক্তি ও স্বাধীনতা। এই মুক্তি বা স্বাধীনতা তাহার আত্মার মুক্তি ও বিবেকের স্বাধীনতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ প্রত্যেক নগণ্য ও কল্পিত শক্তির দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিবে, যতক্ষণ সে সকল শক্তির একমাত্র মহাকেন্দ্রের সহিত নিজেকে সংসৃষ্ট করিতে সমর্থ না হইবে, যতদিন সে পৃথিবীর সহস্র সহস্র 'বড়'কে নিজের উপরওয়ালা বলিয়া মানিয়া লইতে থাকিবে, ততদিন তাহার মন ও মস্তিষ্ক সহস্র প্রকার দাসত্বের শৃঙ্খলে বিজড়িত হইয়া থাকিবে, ততক্ষণ সে 'বড়' হইতে পারিবে না,—সে যে বড় এবং বড় হইতে পারে, এমন কি তাহার যে বড় হওয়া উচিত, সে কল্পনাও তাহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইতে পারে না। চিন্তাশীল পাঠক স্বদেশে-বিদেশে, স্বসমাজে ও অন্য সমাজে আমাদিগের এই কথার বহু প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, এছলামের অনুসরণকারিগণের মধ্যে অনেকেই আজ তাওহীদের প্রকৃত তথ্য বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন।

### এছলামের প্রথম শহীদ

বাহ্যতঃ এই বক্তৃতার দ্বারা উপস্থিতক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুফল ফলিল না বটে, কিন্তু ইহার ফলে হযরতের শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে মক্কার গৃহে গৃহে নানারূপ আলোচনা ও আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই সময় একদিন হযরত কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে কা'বা গৃহে গমন করিয়া, সেখানে এই একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে চাহিলেন। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, সকলে মার-মার করিয়া ছুটিয়া আসিল। এই সময় বিবি খদিজার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত। পুত্র হারেছ-এবনে আবিহালাঃ আসিয়া তাহাদিগের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করায়, কোরেশগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং এই নিরপরাধ মোছলেম যুবকের শোণিতে কা'বার প্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইয়া গেল *। ইহাই এছলামের প্রথম শোণিত-তর্পণ। এছলাম ধর্মের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তাহার ভক্তগণের শোণিতাক্ষরেই লিখিত হইয়াছিল। প্রাথমিক যুগের মুছলমান বচনসর্বস্ব ভক্ত ছিলেন না, তাঁহারা কর্মপ্রাণ ও আত্মত্যাগী ভক্ত ছিলেন।

## চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

### সত্যের বিরুদ্ধাচরণ

### বিরুদ্ধাচরণের ধারা

পৃথিবীতে যখনই কোন সত্য আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে, তখনই তাহার বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছে। এই বিরুদ্ধাচরণের ধারা ও নীতি মূলতঃ সকল ক্ষেত্রেই অভিন্ন। প্রথম প্রথম যখন সেই সত্য আত্মপ্রকাশ করিতে যায়, তখন বিপক্ষীয়গণ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। ঠাট্টা-তামাশা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তখন তাহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকে। সত্যের সেবক যখন এই প্রাথমিক বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন ঐ উপেক্ষা ক্রোধে পরিণত হয় এবং বিপক্ষীয়েরা তখন নীচ গালাগালি ইত্যাদি দ্বারা সেই ক্রোধের অভিব্যক্তি করিতে থাকে। গালাগালি দিয়াও যখন কোন ফল হয় না, তখন তাহারা সত্যকে প্রতিহত করিবার জন্য দল পাকাইতে এবং অপেক্ষাকৃত নির্বোধ ও গোঁড়া লোকদিগকে ধর্মের নামে উত্তেজিত করিতে থাকে। তখন সত্যের

---

* এছাবা।

সেবকগণের বিরুদ্ধে সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাও যখন নিষ্ফল হইয়া যায়, তখন নানাপ্রকার শারীরিক শক্তির প্রয়োগ করা হয় এবং সাধ্যে কুলাইলে অবশেষে শাণিত খড়্গ ও বিষাক্ত কৃপাণ দ্বারা সত্যের মুণ্ডপাত করার চেষ্টা করা হয়। অবশেষে সত্যই জয়যুক্ত হয়—কিন্তু সত্যের সেবক যিনি বা যাঁহারা, তাঁহারা বা তাঁহাদের মানসিক বল, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সঙ্কল্পের ক্রমানুসারে ঐ জয়ের ক্রম নির্ধারিত হইয়া থাকে। হযরত নূহ কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিলেন, কিন্তু অবশেষে হতাশ হইয়া তিনি এক ধ্বংসকারী প্লাবনকে ডাকিয়া আনিলেন। আর যীশু—ইঞ্জিলদিগের কথা অনুসারে—'ইলী ইলী লামা ছাবাক্তানি'—বলিতে বলিতে এবং মৃত্যুর বিভীষিকা দর্শনে ভীত হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে, ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া অভিশপ্ত হইলেন। এই সকল মহাপুরুষগণের সাধনার সফলতার সহিত হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার কৃতকার্যতার তুলনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার সাফল্যের আনুপাতিক গুরুত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে।

যাহারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারাও নিজেদের কার্যকলাপের সমর্থন করার জন্য নিজ নিজ রুচি ও সুবিধা অনুসারে কতকগুলি যুক্তি প্রমাণ ও কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, তাহারা প্রকাশ্যভাবে যে সকল কারণ প্রদর্শন করিতেছে, তাহার অধিকাংশই কৃত্রিম—মূর্খ, নির্বোধ ও জাত্যাভিমানী গোঁড়া লোকদিগকে প্রবঞ্চিত করার জন্য উহা একটা ছলনা মাত্র। উহার মূলে আছে অভিমানের আর্তনাদ, কৌলিন্যের ক্রন্দন, স্বার্থহানির বিভীষিকা আর পৌরোহিত্যের প্রগলভতা। পৃথিবীর সকল যুগের ও সকল দেশের ইতিহাস একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, পুরোহিত জাতীয় ও যাজক শ্রেণীর লোকেরাই চিরকাল সমস্ত সংস্কারের প্রধান শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে।

## কোরেশের বিরুদ্ধাচরণের কারণ

এই কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করার পর, কোরেশ বংশীয়দিগের বিরুদ্ধাচরণের কারণ এবং তাহাদের শত্রুতার ক্রমবৃদ্ধির হেতু, আমরা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিব। কা'বা সমগ্র আরব উপদ্বীপের একমাত্র দেবমন্দির। ৩৬০টি ঠাকুর-বিগ্রহ এমন কি দেবরাজ 'হোবোল'ও এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। সেই মন্দিরের ও সেই সকল দেব-দেবীর সেবায়েত এবং পূজা-অর্চনার পুরোহিত—কোরেশ। এই দেব-দেবীগণের কৃপাতেই তাহারা আজ এক হিসাবে আরব দেশের রাজার আসনে বসিতে পারিয়াছে। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ঘোষণা করিতেছেন যে, মানুষের স্বহস্ত নির্মিত এই পুতুলগুলির পূজা করা একেবারে মূর্খতা। তাহারা একটি মক্ষিকা অপেক্ষাও অক্ষম। মানুষের ভালমন্দ করিবার কোন শক্তি তাহাদিগের নাই। কাজেই কোরেশের নিকট হযরত তাহাদের প্রধানতম শত্রুরূপে পরিগণিত হইতেছেন।

হযরত অহঙ্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, জন্ম, বংশ বা পৌরোহিত্যের জন্য মানুষের কৌলিন্য বা বিশেষ কোন অধিকার জন্মে না। আল্লাহ্ সকলের সমান আল্লাহ্, তাঁহার স্বর্গে ও ধর্মশাস্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার। কোরেশ দেখিল, এই নূতন ধর্মের প্রচারক ঘোষণা করিতেছে—"মানুষ সকলেই আল্লাহর সন্তান"—সকলেই সমান, সকলে পরস্পর ভাই ভাই, ইহাতে কুলীন-অকুলীন নাই। বংশ ও জাতির অহঙ্কার এবং তজ্জন্য আল্লাহর অন্য সৃষ্টজনকে ছোট বলিয়া ধারণা করা মহাপাপ। এছ্লামের এই নীতিগুলি অবগত হইয়া কোরেশ চমকিত হইল।

পৌত্তলিকতা কোরেশের তথা আরবের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। যুগের পর যুগ ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহারা এই পাপে লিপ্ত আছে। হঠাৎ তাহারা তাহার বিরুদ্ধে গুরু-গম্ভীর প্রতিবাদ-ধ্বনি শুনিতে পাইল। সে প্রতিবাদের ভাষা এমন তেজপূর্ণ, তাহার যুক্তিগুলি এমন শক্তিশালী ও অকাট্য, প্রতিবাদকারীর চরিত্র এমন নির্মল ও

মহিমান্বিত যে, কোরেশ দিশাহারা হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। বাপ-দাদার ধর্ম; পুরুষানুক্রমিক সংস্কার ও মুনিঋষিগণের ব্যবস্থা আজ সমস্তই উল্টাইয়া যাইবে ! কি ! আমাদিগের ঠাকুর-বিগ্রহ ও দেব-দেবীরা অক্ষম, অসমর্থ পুতুল ! এমন দেবনিন্দা !! এত স্পর্ধা !!! আমাদিগের মাননীয় পিতৃপিতামহাদি পূর্ববর্তী বোজর্গগণ সকলেই তবে মূর্খ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তবে মহাপাতকী নারকী ! এই সকল চিন্তা ও আলোচনায় কোরেশের ধমনীতে ধমনীতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহাদিগের চিন্তার ও আলোচনার স্রোত দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

আরব তখন নানা পাপে লিপ্ত, নানা অত্যাচারে জর্জরিত, নানা ব্যভিচারে কলুষিত। হযরত সেই সকল অত্যাচার ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করিতে এবং সেগুলির সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতেও আরব তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল। কন্যাহত্যা, দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলি, মদ্যপান, জুয়াখেলা, কুসিদ গ্রহণ, লুণ্ঠন, অপহরণ, ব্যভিচার, দাসদাসীদিগের উপর পাশব অত্যাচার প্রভৃতি তখন আরবের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ—এমন কি ধর্ম ও কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত দুর্নীতির প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং হযরত সেগুলি রহিত করার চেষ্টা করিতেছেন জানিয়া আরবদিগের মধ্যে যে কিরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনের ঘটনা-বিশেষ উপলক্ষে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

যে দুরাচারগণ এই সকল পাপে লিপ্ত ছিল, তাহারা ক্রোধে অধীর হইয়া এছলামের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। মক্কাময় ঘোর কোলাহল উঠিল, সে কোলাহলে আরবের পর্বত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

## একটি প্রশ্ন

হযরতের জীবনী পাঠের সময় চিন্তাশীল পাঠকের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইবে যে, মুষ্টিমেয় মুছলমানদিগকে কোরেশগণ নিহত করিয়া ফেলিল না কেন ? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, পারিল না তাই করিল না। না পারিবার কতকগুলি কারণ ছিল।

আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন গৃহ-বিবাদ, ব্যভিচার ও দুর্নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলে—আরব জাতি সাধারণভাবে এবং কোরেশ বংশ বিশেষতঃ একেবারে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। বংশগত ও গোত্রগত হিংসা-বিদ্বেষ তখন চরমে উঠিয়াছিল। কাজেই কোনরূপ সুযোগ পাইলেই এক বংশ ও এক গোত্রের লোকেরা অন্য বংশ বা অন্য গোত্রের উপর আপতিত হইয়া হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিত। বংশগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা এবং অন্য গোত্রের লোক কর্তৃক নিহত স্বগোত্রীয় লোকের শোণিতের প্রতিশোধ বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার জন্য তাহারা বুভুক্ষু শার্দুলের মত সততই সুযোগের অন্বেষণ করিত।

পূর্বাপর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় তাহারা যুদ্ধের নামে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সামরিক শৃঙ্খলা এবং ক্ষাত্রশক্তিও বহু পরিমাণে বিপর্যস্ত ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল। এই সকল কারণে স্বতন্ত্র বা সম্মিলিতভাবে, মোছলেমমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার সাহস ও শক্তি তাহাদের ছিল না। এই অবস্থার দিকে তাহারা যেমন একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, এছলামের শক্তিও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছিল। অবশেষে যখন, তাহারা নিজেদের ত্রুটিগুলির সংশোধন করিয়া, সমবেতভাবে এছলামের বিরুদ্ধে উত্থান করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন মোছলেমগুলিকে, এমন কি স্বয়ং হযরতকে দেশ-দেশান্তরে প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রাথমিক অবস্থায় আবু তালেবের সহানুভূতি দ্বারা এছলামের যে উপকার হইয়াছিল, একটু পরেই আমরা তাহার পরিচয় পাইব।

এইগুলি হইতেছে বাহ্য কারণ। ইতিহাসের বিবরণগুলির প্রতি মনোযোগ প্রদান করার সময় এই কারণগুলি সর্বপ্রথমে সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু সকল দিককার সমস্ত অবস্থা মনে রাখিয়া একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যাইবে যে, এইগুলি মূল বা প্রধান কারণ নহে। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা, মানবের ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অবস্থার জন্য চরম ও পূর্ণতম আদর্শ।* যখন শত্রুর শক্তি এত প্রবল যে, তাহার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠিত করার সামর্থ্য তোমার নাই, তখন তোমাকে কি করিতে হইবে, কোন উপায় অবলম্বনে জয়লাভ করিতে হইবে—মোস্তফা-জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থার আদর্শের দ্বারা তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায় উপনীত হইয়া হযরত এবং তাঁহার ভক্ত বিশ্বাসীগণ, শত্রুদিগের বিরুদ্ধে ধৈর্যের সমর ঘোষণা করিলেন। তাহারা অত্যাচার-উৎপীড়নকে নীরবে সহ্য করিয়া লইতে লাগিলেন। যে অত্যাচারের নাম করিতেও মানুষের শরীর রোমাঞ্চিত হয়—বুক কাঁপিয়া উঠে, মোছলেম নর-নারীগণ এবং স্বয়ং হযরত অসাধারণ ধৈর্যের সহিত সেই অত্যাচারগুলি সহ্য করিয়া লইতে লাগিলেন। এই সকল অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইল না। অথচ কেহ একমুহূর্তের জন্য নিজের কর্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া যাও, কিন্তু ক্রোধ, প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধস্পৃহা যেন এক মুহূর্তের জন্য তোমার ধমনীগুলিকে উত্তেজিত করিতে না পারে, পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত সহ্য করিয়াও এক মুহূর্তের জন্য নিজেদের কর্তব্য বিস্মৃত হইও না—ইহাই ছিল তখনকার ব্যবস্থা। আমরা দেখিয়াছি, হারেছকে অন্যায়পূর্বক শহীদ করা হইল, চক্ষুর সম্মুখে এই তরুণ যুবকের তপ্ত-তরল শোণিত-স্রোত। কিন্তু অধৈর্যের বা চাঞ্চল্যের চিহ্ন মাত্রও সেখানে পরিলক্ষিত হইল না। সকলে এই মহাপ্রাণ যুবকের প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে তুলিয়া 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-পবিত্র ধ্বনিতে ৩৬০টি বিগ্রহপূর্ণ কাবা-মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া চলিলেন। ইহারই নাম প্রেমের যুদ্ধ, ইহারই নাম ধৈর্যের সমর।

যাহা হউক, হযরতের এই অসাধারণ চরিত্রবল ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অদম্য উৎসাহ কোরেশ-প্রধানগণের পক্ষে একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল এবং তাহারা যুক্তি পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কোন গতিকে নিরস্ত করার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল।

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

یا تن رسد بجانان یا جان ز تن برآید

### মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন

হযরত একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন, কোরেশ বলিল—মোহাম্মদ আমাদিগের দেব-দেবীদিগকে গালি দিতেছে। তিনি পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন, কোরেশ বলিল—মোহাম্মদ আমাদিগের ধর্মের নিন্দা করিতেছে। তিনি আরবের সমস্ত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অত্যাচার-অনাচারের প্রতিবাদ করিলেন, কোরেশ বলিল—মোহাম্মদ আমাদিগের পূর্ব মহাপুরুষগণকে নারকী বলিতেছে। এইরূপে তাহারা মক্কায় একটা জটিল ও ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিল, এবং কয়েকজন লোক একদিন আবু-তালেবের নিকট আসিয়া হযরত সম্বন্ধে অভিযোগ করিল। আবু-তালেব চতুরতার সহিত এদিক-ওদিককার দুই-চারিটি কথা বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

* "আল্লাহর রছুল তোমাদিগের জন্য মহত্তম আদর্শ"—কোরআন।

আবু-তালেবের উপর তখন তাহাদিগের অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে একদিন কোরেশের প্রধান ব্যক্তিবর্গ একত্র হইয়া আবু-তালেবের নিকট উপস্থিত হইল, এবং পূর্ব নির্ধারণ মতে বলিতে লাগিল ঃ "আবু-তালেব ! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদিগের দেব-দেবীদিগকে গালি দিতেছে, আমাদিগের ধর্মের নিন্দা করিতেছে, আমাদিগের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতেছে, আমাদিগের পূর্বপুরুষগণকে ধর্মভ্রষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। অতএব হয় আপনি নিজে তাহাকে শাসন করুন, নচেৎ আমরা তাহার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিব। আপনি যদি তাহার সহায়তা করেন, তাহা হইলে আপনার ও তাহার এক দশা হইবে।" এবারও আবু-তালেব 'পাঁচ রকম' নরম কথা বলিয়া তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিয়া বিদায় করিলেন।

এদিকে হযরত পূর্ণ উদ্যমের সহিত নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহার ফলে কোরেশদিগের মধ্যে হযরতের কার্যকলাপের আন্দোলনই প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হইল। ক্ষুব্ধ কোরেশগণ তখন পরস্পরকে হযরতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে আবার কোরেশ প্রধানগণ, আবার দলবদ্ধভাবে আবু-তালেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল—"দেখুন, আপনার বয়স, আপনার বংশ-গৌরব এবং আপনার সম্ভ্রমের প্রতি আমরা সকলেই সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি। সেইজন্য আমরা পূর্বে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধে আপনাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি তাহার কোনই প্রতিকার করিলেন না। আপনি নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের অত্যাচার আর আমরা কখনই নীরবে সহ্য করিব না। হয় আপনি তাহাকে নিবৃত্ত করুন, নচেৎ আমরা ভবিষ্যতে আপনাকে ও তাহাকে একই দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিব,—দুই দলের মধ্যে এক দল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।" কোরেশ-প্রধানগণের রোষ-কষায়িত লোচন, তাহাদের কঠোর বাক্য এবং ভীষণ প্রতিজ্ঞা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আবু-তালেব বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন কিংকর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া হযরতকে সেই সভাস্থলে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হযরত সেখানে আগমন করিলে আবু-তালেব তাঁহাকে কোরেশ-প্রধানদিগের সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিয়া উপসংহারে বলিলেন—'বাবা একটু বিবেচনা করিয়া কাজ কর, যে ভার সহিবার শক্তি আমার নাই, আমার উপরে তাহা চাপাইয়া দিও না।' হযরত মনে করিলেন, একমাত্র পার্থিব সহায় তাঁহার পিতৃব্যও আজ তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। পরীক্ষা অত্যন্ত কঠোর ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু হযরতের হৃদয় ইহাতে একবিন্দুও বিচলিত হইল না তিনি আবু-তালেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তাতঃ ! আমার প্রতি এই কঠোর ভাব পোষণ না করিয়া, ইঁহারা আমার কথা মানিয়া লউন, তাহা হইলে সমস্ত আরব এক স্বর্গীয় ধর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, সমস্ত আজম* আরবের পদতলে লুটাইয়া পড়িবে।" এই কথা শুনিয়া আবুজাহল ও অন্যান্য সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, 'কি, কি কথা, তোমার পিতার দিব্য, তাহা খুলিয়া বল। একটা কেন, আমরা তোমার দশটা কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি।' হযরত গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহা হইলে সমস্ত আরব এক মহান ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া নূতন জীবন লাভ করিতে পারিবে, সমস্ত আজম আরবের পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। ইহা শুনিয়া সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, আবু-তালেবও হযরতকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি ভীতি ও বিষাদপূর্ণ উপদেশের কথা বলিলেন। তখন, পরীক্ষার সেই কঠোর মুহূর্তে কোরেশ প্রধানগণের সম্মুখেই হযরত পিতৃব্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তাতঃ ! ইহারা যদি আমার দক্ষিণ

---

* আরব ব্যতীত অন্য সকল দেশকে আরবেরা আজম বা মূক বলিয়া থাকে।

হস্তে সূর্য এবং বাম হস্তে চাঁদ আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও আমি এই মহাসত্যের সেবা ও নিজের কর্তব্য হইতে এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হইব না। হয় আল্লাহ্ ইহাকে জয়যুক্ত করিবেন, না হয় আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। কিন্তু তাতঃ ! নিশ্চয়ই জানিবেন যে, মোহাম্মদ কখনই নিজের কর্তব্য হইতে স্খলিত হইবে না।" স্বজাতির হঠকারিতা ও তাহাদের পাপমোহ দর্শনে ব্যথিত-হৃদয় মোস্তফার নয়ন যুগল তখন বাষ্পাকুল হইয়া আসিল। সম্মুখে অতি কঠোর কর্তব্য, তাহা তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে। তাঁহার স্বজাতি, তাঁহার স্বজনবর্গ তাহাতে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর, সাধনপথের এই বাধা-বিঘ্নগুলি তাঁহাকে দূর করিতেই হইবে। ভবিষ্যতের লোমহর্ষণ চিত্র তাঁহার সম্মুখে যেন স্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল—তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। একদিকে কঠোর কর্তব্য পালনে অটল নিষ্ঠা, অন্যদিকে প্রেমের এই মধুর অভিভূতি। কোমলে কঠোরে, উজ্জ্বলে মধুরে সে দৃশ্য কোরেশগণের পক্ষে চমকপ্রদ হইল। তাহারা ক্রোধে অধীর অথচ সত্যের তেজে অভিভূত হইয়া নানা প্রকার কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে আবু-তালেবের গৃহ পরিত্যাগ করিল। হযরত পূর্বেই তথা হইতে সরিয়া গিয়াছেন।

কোরেশ-প্রধানগণের ভীষণ সঙ্কল্প অবগত হইয়া আবু-তালেবের মনে ক্ষণেকের জন্য যে ভীতি-বিহ্বলতা স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হইয়া গেল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া হযরতকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ—'প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র ! নিজের কর্তব্য পালন করিয়া যাও। আল্লাহর দিব্য, আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।' হযরতের চিত্তের বল, তাঁহার অন্তরস্থ সত্যের তেজ ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা হইতেই আবু-তালেব এই তেজ গ্রহণ করিলেন।*

কোরেশগণ দেখিল, তাহাদিগের ভীতি-প্রদর্শনে আবু-তালেব একবিন্দুও দমিলেন না, বরং তিনি মোহাম্মদের পক্ষ সমর্থন করিতে পূর্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তার সহিত কৃতসঙ্কল্প। তখন তাহারা মনে করিল, বৃদ্ধ আবু-তালেবকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিতে হইবে।

## হযরতকে হত্যা করার চেষ্টা

সাধারণতঃ লোকে জগৎকে নিজের হৃদয় দিয়া দর্শন করিয়া থাকে। মানুষ যে কেবল কর্তব্যের অনুরোধে নিঃস্বার্থভাবে কোন কাজ করিতে পারে, অনেকে ইহার ধারণাও করিতে পারে না। তাই কোরেশ-প্রধানগণ কিছুকাল পরে, যুক্তি-পরামর্শ করিয়া একদিন ওমারা-বেন-অলিদ নামক এক সুদর্শন যুবককে সঙ্গে লইয়া আবু-তালেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ 'আমরা এই মহদান্তকরণ, সচ্চরিত্র, সুকবি ও ধনাঢ্য যুবকটিকে আনিয়াছি। আপনি ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন। আপনি ইহার দেখাশুনা করিতে থাকুন, পরিণামে ইহাতে আপনারই ভাল। আপনি এখন ওমারার পরিবর্তে মোহাম্মদকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। আমরা উহার প্রাণবধ করিব। মানুষের পরিবর্তে মানুষ, আপনার প্রতি কোন অন্যায় করা হইতেছে না, ইহাতে আপনার ক্ষতি কিছুই নাই।'

আবু-তালেব বিদ্রূপ মিশ্রিত কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন—আপনারা বিচারের চরম করিয়া দিয়াছেন। আপনাদের ছেলেটাকে আমি আপনাদের উপকারের জন্য অন্নবস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিব, আর তাহার পরিবর্তে আপনারা আমার ছেলেটিকে লইয়া হত্যা করিবেন। চমৎকার আপনাদের বিচার ! যাহা হউক, আমার দ্বারা এ সব কিছুই হইবে না। আপনারা ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন—আবু-তালেব এত নীচ, এত অপদার্থ নহে।**

---

* এবনে-হেশাম ১—৮৮, ৮৯, তাবরী ২—২২০। তাবকাত ১—১৩৪। খালেদুন ২—২৫। তারিখ, বোখারী, কামেল, হালবী ১—২৮৩ হইতে ৮৬ পৃষ্ঠা।

** হেশাম ১—৮৯, তাবকাত ১—১৩৪ প্রভৃতি

আবু-তালেব স্তম্ভিত ও চমকিত হইলেন। কোরেশগণ তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া আবু-তালেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে হাশেম ও মোত্তালেব বংশের সমস্ত লোককে একত্র করিয়া বলিলেন—কোরেশের অন্যান্য গোত্রের লোকেরা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছে, আপনারা আমার সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন কি-না ? আবু-তালেবের এই প্রশ্নে হাশেম ও মোত্তালেব বংশীয়দিগের পুরাতন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এক আবুলাহব ব্যতীত,—তাহারা সকলে সমস্বরে উত্তর করিল—নিশ্চয়ই, আমরা প্রস্তুত আছি।* সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে ইঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, 'হযরতকে পাওয়া যাইতেছে না।' সংবাদ শুনিবামাত্র আবু-তালেব এবং হযরতের অন্য পিতৃব্যগণ তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানেও হযরতের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আতঙ্ক-আশঙ্কায় তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন।

তখন আবু-তালেবের বদনমণ্ডল তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ-কম্পিতস্বরে আদেশ করিলেন—"হাশেম ও আবদুল মোত্তালেব বংশের যুবকগণ ! শাণিত খড়্গ লইয়া প্রস্তুত হও।" আদেশ প্রাপ্তিমাত্র যুবকগণ প্রস্তুত হইল। তখন আবু-তালেব তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন—'সকলে আপনাপন অস্ত্র লুকাইয়া লইয়া আমার সঙ্গে কা'বা মন্দিরে প্রবেশ করিবে। সেখানে কোরেশের যে সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তি বসিয়া আছে, এক-এক জন গিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকটে বসিয়া পড়িবে। সাবধান এবনুল হানজালিয়া (আবুজেহল) যেন বাদ না যায়। মোহাম্মদ যদি নিহত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে..............।

হঠাৎ জায়েদ-এবনে-হারেছা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে আবু-তালেব তাঁহাকে ব্যগ্রতা সহকারে হযরতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জায়েদ এই উত্তেজনার ভাব ও আবু-তালেবের কথা শুনিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"সমস্ত মঙ্গল ! আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এই মাত্র সেখান হইতে আসিতেছি। হযরত নিরাপদে আছেন।" হযরত তখন ছাফা পর্বতের নিকটে জনৈক ভক্তের বাটীতে বসিয়া মোছলেমবৃন্দকে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। জায়েদের দূরদর্শিতা দেখুন। তিনি সবই বলিলেন, কিন্তু হযরত যে কোথায় আছেন, সকলের সম্মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। আবু-তালেবের সন্দেহ মিটিল না তিনি আল্লাহর নামে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, মোহাম্মদকে যদি জীবন্ত দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আর গৃহে প্রবেশ করিব না। জায়েদ কাহাকেও হযরতের অবস্থান-স্থানের সন্ধান না দিয়া, নিজেই দ্রুতবেগে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া দিলে হযরত অবিলম্বে আবু-তালেবের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আবু-তালেব ব্যস্তে-ত্রস্তে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরতের উত্তর শুনিয়া আবু-তালেব তাঁহাকে বাটীর মধ্যে গমন করিতে উপদেশ দিলেন। হযরত এ সম্বন্ধে অধিক জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া নিরুদ্বেগে স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

হযরতকে গৃহে রাখিয়া আবু-তালেব এই যুবকবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া কোরেশদিগের একটি আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজের সঙ্কল্পের কথা বলিয়া যুবকবৃন্দের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা লুক্কায়িত খড়্গগুলি বাহির করিল। তখন আবু-তালেব বজ্র-কঠোরস্বরে বলিলেন—"তোমরা যদি মোহাম্মদকে হত্যা করিয়া থাকিতে, তাহা হইলে আজ

---

* হেশাম ১—৮৯, তাবকাত ১—১৩৫ প্রভৃতি।

তোমাদিগের মধ্যে একটিকেও বাঁচিয়া যাইতে হইত না। তাহার পর ইহার ফলে আমাদিগের সকলকে ধ্বংস হইতে হইত।"

হাশেম ও মোত্তালেব বংশের সমস্ত লোক আবু-তালেবের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, মোহাম্মদের জন্য তাহাদিগকে হত্যা করার উদ্দেশ্য এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছে, কি সর্বনাশ! কাজেই উল্লিখিত কোরেশ-প্রধানগণ, বিশেষতঃ আবুজেহল মহৎপরোনাস্তি ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িল।*

এই ঘটনার পর মক্কাবাসীদিগের বিদ্বেষ ও ক্রোধের দৃষ্টি নব-দীক্ষিত মুছলমানদিগের উপর পতিত হইল! তাহারা সমবেতভাবে স্থির করিল, যে গোত্রের নর-নারী এই নবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, সেই গোত্রের লোকেরা তাহাকে বা তাহাদিগকে শাসন করিবে।** এই সিদ্ধান্তের পর নব-দীক্ষিত মুছলমানদিগের উপর যে অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ভক্তগণ ঐ সকল অগ্নি-পরীক্ষায় যে অসাধারণ ধৈর্য ও মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছিলেন—যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা হইবে।

## ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

قالوا ربنا الله ثم استقموا

### কঠোর পরীক্ষা

যে সকল মহাজনকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার প্রিয় হবিব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার মহীয়সী সাধনার সহায়রূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, নর-নারী-নির্বিশেষে তাহাদিগের প্রত্যেকের জীবনী এবং প্রত্যেকের জীবনের মহান্ আদর্শ, মানবজাতির পক্ষে চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয় এবং চির-অনুকরণীয়। ধৈর্যে-বীর্যে, প্রেমে-পুণ্যে তাহা চির-উদ্ভাসিত, স্বর্গের মঙ্গল আশীর্বাদে তাহা চির-অভিষিক্ত। এই সকল মহা-মানবের জীবনী স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইলে, পাঠকগণ ইতিহাসের অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শের সহিত সেগুলির তুলনায় সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন। হযরতের জীবনীতে তাহা সম্ভবপর নহে।

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, আবু-তালেবের চেষ্টা এবং মোত্তালেব ও হাশেম বংশের সহায়তার ফলে, হযরতের প্রাণহানি করা বর্তমানে নিরাপদ হইবে না বলিয়া অন্যান্য গোত্রের কোরেশগণ সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই অগত্যা নব-দীক্ষিত মোছলেম নর-নারিগণের প্রতি তাহাদিগের হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া চলিল। তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, নব-দীক্ষিত বিশ্বাসীদিগকে নানা অত্যাচারে জর্জরিত করিয়া এছলাম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। বলা বাহুল্য যে, এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। এই সময় মোছলেম নর-নারিগণ যে কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া আপনাদিগের কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর হইবে না। আমরা নিম্নে তাহার একটু নমুনা মাত্র প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

### বেলালের পরীক্ষা

(ক) ভক্তকুল-চূড়ামণি হযরত বেলালের নাম অবগত নহেন, মুছলমান সমাজে এরূপ লোক বোধ হয় খুব কমই আছেন। এই বেলালের পিতামাতা কোন গতিকে ধৃত হইয়া মক্কাবাসীদিগের নিকট দাসরূপে বিক্রীত হন। দাস, বংশানুক্রমে দাস—সুতরাং বেলালও এই দাসজীবন অতিবাহন করিতেছিলেন। বেলাল* আবিসিনিয়ার অধিবাসী, কুরূপ, ঘোর-কৃষ্ণবর্ণ

---

* তাবকাত ২—১৩৫। ** তাবকাত ১—১৩৫।

ক্রীতদাস। সমাজে এ হেন ক্রীতদাসের স্থান নাই। বেলালের বাহিরের রং কাল ছিল বটে, কিন্তু সত্যের জ্যোতিঃ আর স্বর্গের মহিমা তাঁহার ভিতরের জগতটাকে মধুরে-উজ্জ্বলে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বলা বাহুল্য যে, ইহা মোস্তফাচরিতামৃত সিন্ধুর একবিন্দু রসাস্বাদনের ফল 'চর্মরোগ' আরোগ্য করা অপেক্ষা একটি করুণ কটাক্ষপাতে মর্ম-রোগের প্রতিষেধ করিয়া দেওয়া অধিকতর মহিমময় 'অভিজ্ঞান'। বেলালের প্রভু নরাধম উমাইয়া শুনিল—তাহারই গৃহে তাহার একটি ঘৃণিত দাসীপুত্র, মোহাম্মদের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, 'অহ্‌দাহু লা-শারিকা লাহু' বা একমেবাদ্বিতীয়মের জয়গান করিতেছে:—কি স্পর্ধার কথা! উমাইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া বেলালের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল।

নিয়ম হইল, বেলাল আর মানুষের মত চলাফেরা করিতে পারিবেন না। নিকৃষ্ট পশুর ন্যায় তাঁহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে মক্কার বালকগণের হস্তে সমর্পণ করা হইল। নিষ্ঠুর বালকেরা বেলালের গলরজ্জু ধরিয়া টানিতে টানিতে মক্কার পথে পথে হৈ-হৈ শব্দে তামাশা করিয়া বেড়াইত এবং টানিয়া-হেঁচড়াইয়া, মারিয়া-পিটিয়া অর্ধমৃত অবস্থায় আবার তাঁহাকে উমাইয়ার বাটীতে রাখিয়া যাইত। উমাইয়া তখন বেলালের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিত—"এখনও মোহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর।" বেলাল তখন ধীর-স্থির কণ্ঠে বলিতেন—"আহাদ! আহাদ! একম্, একম্!!"

এত বড় স্পর্ধা! বেলাল ইহাতেও নিবৃত্ত হইলেন না দেখিয়া তাহারা অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড যখন প্রখর কিরণ বর্ষণ করিয়া উত্তপ্ত মরু-প্রান্তরকে অনল-হ্রদে পরিণত করিয়া তুলে, সেই সময় বেলালকে সেখানে চিৎভাবে শয়ান করান হইত। এবং কোন রকমে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে তাঁহার বুকের উপর গুরুভার প্রস্তরখণ্ড চাপাইয়া দেওয়া হইত। নরাধম উমাইয়া তখন সেখানে আসিয়া বলিত—বেলাল! এখনও মোহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর, নচেৎ ইহাপেক্ষাও গুরুতর দণ্ড তোর জন্য স্থির করিয়া রাখা হইয়াছে। বেলাল সেই অর্ধ-অচেতন অবস্থায় যথাশক্তি চীৎকার করিয়া বলিতেন—"আহাদ-আহাদ! একম্ একম্!" এই সময় উমাইয়া ও কোরেশগণের কর্কশ চীৎকারের মধ্য হইতে, বেলালের এই সত্যের জয়ঘোষণায় মরু-প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিত। ইহাতেও যখন বেলাল সত্যভ্রষ্ট হইলেন না, তখন তাঁহার আহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তিনি যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির, সেই সময় তাঁহাকে পিঠমোড়া দিয়া বাঁধিয়া বেদম চাবুক মারা হইত। বেলাল তখন নামামৃত পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। যখন নিদারুণ বেত্রাঘাতের ফলে বেলালের গাত্র-চর্ম জর্জরিত হইয়া শোণিতধারা গড়াইয়া পড়িত, বেলাল তখন তাহা দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিতেন। তখনও তাঁহার মুখে সেই আহাদ আহাদ! সেই একম্ একম্!!

দিবাভাগের ন্যায় রাত্রিকালেও এক সঙ্কীর্ণ নির্জন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এই প্রকার লোমহর্ষণ অত্যাচার করা হইত, তখনও বেলাল চীৎকার করিয়া সেই একমের নামের জয়ঘোষণা করিতেন। কিছুকাল পরে, একদা হযরত আবুবাকর শেষরাত্রে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বাহির হইতে অত্যাচার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারা গেল, তাহাতেই করুণ-হৃদয় আবুবাকরের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। প্রাতে উঠিয়াই তিনি উমাইয়ার নিকট গমন করিলেন এবং বহু অর্থ-বিনিময়ে বেলালকে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করতঃ মুক্ত করিয়া দিলেন। হযরত বেলাল চিরজীবন উচ্চকণ্ঠে তকবির ও আজান ধ্বনি দ্বারা সেই 'আহাদ'-র নামের জয়ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল লোমহর্ষণ ভীষণ অত্যাচারে এই আদর্শ ভক্তকে জর্জরিত করা হইল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা নরাধম উমাইয়া বা তাহার স্বপক্ষ লোকদিগের কোন উদ্দেশ্যই সফল হইল না। বরং বেলালের ধৈর্য, দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের প্রভাবে তাহাদিগের সুপ্ত বিবেককে—অবশ্য তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে—বেলালের পদতলে লুটাইয়া পড়িতে হইয়াছিল।

এই সময় হযরত আবুবাকর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আমের, মাহদিয়া প্রভৃতি আরও কয়জন নব-দীক্ষিত 'দাসদাসী'কে তাহাদিগের প্রভুগণের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।*

হযরত ওমর এই কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রী ক্রীতদাস সম্বন্ধে বলিতেন—আমাদিগের 'প্রভু' আবুবাকর আমাদিগের প্রভু ছৈয়দ। বেলালকে খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়াছিলেন।** এছলামে বেলালেও এই অগ্নি-পরীক্ষার যে কিরূপ সম্মান করা হইয়াছে, এছলাম সাম্যের যে কি অভিনব পুণ্য আদর্শ স্থাপন করিয়াছে—হযরত ওমরের এই উক্তি দ্বারা তাহার একটুকু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

## ভক্ত পরিবারের পরীক্ষা

(খ) আম্মার ও তাঁহার পিতা ইয়াছের ও মাতা ছুমাইয়া এছলাম গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের উপরও এইরূপ নানা প্রকার অত্যাচার হইতে লাগিল। আম্মার প্রহারের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক সময় অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি এক মুহূর্তের জন্য কর্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না, সত্যের প্রচারে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হইলেন না। আবুবাকর ব্যতীত আর যে চারিজন মহাত্মা সর্বপ্রথমে*** নিজেদের এছলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, আম্মার তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। একদিন এই ভক্ত পরিবারের অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া হযরত আবেগপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছিলেন—"হে ইয়াছের পরিবার। ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক, স্বর্গ তোমাদিগের পুরস্কার।"

(গ) আম্মারের বৃদ্ধ পিতা ইয়াছের দুর্ধর্ষ কোরেশদিগের অত্যাচারে প্রাণ হারাইলেন। স্বামীর মৃতদেহ ও পুত্রের প্রহার-জর্জরিত রক্তাক্ত কলেবর দর্শনেও বৃদ্ধা ছুমাইয়ার ঈমানের বল একবিন্দুও কমিল না। তিনি পূর্ববৎ দৃঢ়তার সহিত এছলামের সত্যতা ঘোষণা করিতে থাকিলেন।

(ঘ) অবশেষে নরাধম আবুজেহল একদিন ক্রোধে অধীর হইয়া বিবি ছুমাইয়ার স্ত্রী-অঙ্গে বর্শাঘাত করতঃ তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলে। মোছলেম মহিলাগণের মধ্যে বিবি ছুমাইয়াই প্রথমে সত্যের সেবায় স্বীয় শোণিত তর্পণের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। আম্মার অত্যাচারীর হস্তে নিজের পিতামাতাকে বিসর্জন দিলেন, নিজে অশেষ অত্যাচার সহ্য করিলেন। কিন্তু আমাদিগের ন্যায় 'দূরদর্শিতা বা বুদ্ধিমত্তা' প্রদর্শনপূর্বক একদিনের জন্যও নিজের বিশ্বাসকে গোপন করিয়া রাখিতে প্রস্তুত হইলেন না।****

## খাব্বাবের অনল পরীক্ষা

(ঙ) খাব্বাবের পরীক্ষার বিবরণও অতিশয় লোমহর্ষণ। এই মহাত্মা প্রাথমিক অবস্থাতেই স্বীয় এছলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর কোরেশদিগের অকথ্য অত্যাচারের অবধি ছিল না। একদিনের অত্যাচারের বিবরণ জ্ঞাত হইলে পাঠকগণ তাঁহার পরীক্ষার কঠোরতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

খাব্বাব কোনমতেই বিচলিত হইতেছেন না দেখিয়া একদিন কোরেশ দলপতিগণ মাটিতে প্রজ্বলিত অঙ্গার বিছাইয়া তাঁহাকে তাহার উপর চিৎভাবে শায়িত করাইল এবং কয়েকজন পাষণ্ড তাঁহার বুকে পা দিয়া চাপিয়া রাখিল। অঙ্গারগুলি তাঁহার পৃষ্ঠতলে পুড়িয়া নিবিয়া গেল, তবুও নরাধমেরা তাঁহাকে ছাড়িল না। খাব্বাবের পিঠের চামড়া এমনভাবে পুড়িয়া গিয়াছিল যে, শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁহার পিঠে ধবল কুষ্ঠের ন্যায় ঐ দাগের চিহ্ন

---

* কামেল ২—২৪, হেশাম ১—২০৬, এছাবা ৭৩৬ নং জাদুল-মাআদ, এস্তিআব প্রভৃতি।

** বোখারী। *** বেলাল, খাব্বাব, ছোহায়ব, ছুমাইয়া, এছাবা ২১২ নং।

**** হেশাম ১—১১০, এছাবা কামেল, এস্তিআব প্রভৃতি

বিদ্যমান ছিল; মহাত্মা খাব্বাব কর্মকারের কাজ করিতেন, তরবারী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকার্জন করিতেন। এছলাম গ্রহণের পর লোকের নিকট খাব্বাবের যে সকল প্রাপ্য ছিল, কোরেশগণের নির্দ্ধারণ মতে তাহা আর কেহই দিল না।*

কি ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা! কি অসাধারণ মনের বল! ঈমানের কি পবিত্র প্রভাব!

## ওছমানের দৃঢ়তা

(চ) এছলামের তৃতীয় স্তম্ভ হযরত ওছমান একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী লোক ছিলেন। তিনি এছলাম গ্রহণ করিলে কোরেশগণ তাঁহার উপর একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহাদিগের সহযোগিতায় স্বয়ং তাঁহার পিতৃব্য দৃঢ় রজ্জুর দ্বারা তাহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিত। ওছমান আল্লাহর নামে শক্তি সঞ্চয় করিয়া নীরবে এই সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকিতেন।

(ছ) জোবের এবনে আওয়ামকে ধর্মচ্যুত করার জন্য তাঁহাকে মাদুরে জড়াইয়া বাঁধিয়া নাকে ধোঁয়া দেওয়া হইত।

(জ) মহাত্মা ছোহায়েব অনেক সময় কোরেশদিগের প্রহার ও অত্যাচারের ফলে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। মদীনার হিজরতের সময় কোরেশগণ ইহাকে বলিয়াছিলেন, বিষয়-সম্পত্তি ও ধন সম্পদ যাহা কিছু আছে, সমস্তই যদি ফেলিয়া যাইতে প্রস্তুত থাক, তাহা হইলে যাইতে পার। ছোহায়েব বলিলেন, মোস্তফা-চরণের একটা ধূলিকণার মূল্যও উহার নহে। তিনি প্রফুল্ল বদনে নিজের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন।

(ঝ) আফলাহ নামক জনৈক মহাপুরুষ এছলাম গ্রহণ করিলে, তাঁহার দুই পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া মাঠে লইয়া যাওয়া হইল। উমাইয়া ও তাহার ভ্রাতা ওবাই উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার এই দুর্দশা করিতেছিল। এই সময় সেখানে একটা 'গোবরে পোকা' দেখিতে পাইয়া উমাইয়া তাঁহাকে বলিল—এই দেখ তোর খোদা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আফলাহ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—'আমার, তোমার, ঐ কীটের এবং সকলের খোদা সেই এক আল্লাহ।' এই উত্তরে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া নরাধম তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল। তাহার ভ্রাতা ওবাই তাহাকে উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিল, 'আরও—এখনও হয় নাই। আসুক তাহার মোহাম্মদ, সে যাদু করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া যাউক।' এই অবস্থায় আফলাহ অচেতন ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ দেখিয়া যখন নরাধমদিগের বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার চৈতন্যলাভ করিলেন। মহাত্মা আবুবাকর এই ঘটনা জানিতে পারিয়া বহু অর্থ-বিনিময়ে তাঁহাকে নরাধমদিগের কবল হইতে রক্ষা করেন।

(ঞ) লাবিনা নাম্নী ওমরের এক দাসী এছলাম গ্রহণ করিলেন। ওমর তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন ভর্ৎসনা দিয়া বলিতেন, হতভাগিনি! আমি দয়া পরবশ হইয়া তোকে পরিত্যাগ করি নাই, একটু শ্রান্তি দূর করিয়া লই, তাহার পর আবার তোকে প্রহার করিব। লাবিনা করুণ কণ্ঠে বলিতেন, ওমর! আপনি এছলাম গ্রহণ না করিলে আল্লাহ আপনাকে এই অত্যাচারের দণ্ড প্রদান করিবেন।

(ট) জেন্নিরা নাম্নী এক অন্ধ দাসীরূপ নারীর উপর এমন নির্দয়ভাবে অত্যাচার করা হয় যে, তাহার ফলে তাঁহার চোখ নষ্ট হইয়া যায়। কোরেশগণ তখন বলিতে লাগিল—দেবী লাৎ ও ওজ্জার অভিসম্পাতে তোমার চোখ দুইটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জেন্নিরা

---

* বোখারী, পারা ১২৩৬ নং—তাবকাত ১—৩ খাব্বাব।

কোরেশদিগের এই প্রলাপোক্তি শুনিয়া বলিলেন, 'লাৎ ও ওজ্জার কোন অধিকার নাই। উপরের হুকুমে আমার চোখ গিয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিলে আমি আবার তাহা পাইতে পারি।' নরাধমদিগের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের পর, ক্রমে ক্রমে আবার তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তখন কোরেশগণ বলিতে লাগিল—"মোহাম্মদ কি ভয়ঙ্কর যাদুকর দেখ দেখি, দুই চক্ষের অন্ধ আবার দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল।"*

বিশুদ্ধ ইতিহাসে ও হাদীছ গ্রন্থে প্রাথমিক মুছলমানদিগের এই প্রকার বহু অগ্নি-পরীক্ষার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক কথায় মহাত্মা আবুবাকর ও আলী ব্যতীত, প্রাথমিক যুগের প্রায় সকল মুছলমানকে, এই প্রকার লোমহর্ষণ অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্য দিয়া নিজেদের কর্তব্য পালন করিতে হইয়াছিল। মহাত্মা আবুবাকর নিজের ধনভাণ্ডার মুছলমানদিগের সেবায় জন্য মুক্ত হস্তে বিলাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় নর-নারীকে পাষণ্ডদিগের কঠোর অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

## পরীক্ষার ফল

কয়েক বৎসর ধরিয়া এই অত্যাচার অপ্রতিহত বেগে চালান হয়। মক্কার উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুপ্রান্তর এই পরীক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। উল্লিখিত উপায়গুলি ব্যতীত, নরাধমেরা কাহাকে পানিতে ডুবাইয়া, কাহাকে অগ্নি ও তপ্ত প্রস্তরের 'ছেঁকা' দিয়া, কাহাকে গুরুভার লৌহবর্ম বিজড়িত করতঃ জ্বলন্ত বালুকার উপর ফেলিয়া রাখিয়া নিজেদের পাশবিকতা প্রকাশ করিত। বলা বাহুল্য যে, কেবল নিঃস্ব ও দরিদ্র বিশ্বাসীগণই এই প্রকারে উৎপীড়িত হইতেন না, বরং পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও বাদ যাইতেন না। তবে শেষোক্ত শ্রেণীর বিশ্বাসীদিগের শাসন-ভার প্রায়ই তাঁহাদিগের আত্মীয়-স্বজনগণের উপর অর্পিত হইত। ফলে তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলিয়া মনে হয়।

ধৈর্য ও প্রেমের সমরে শত্রু যে কেবল পরাজিত হয়, তাহা নহে—বরং তাহাদিগের মধ্যে একদল লোকের মন ইহার পুণ্য-প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু অনেক সময় ভিতরের মানুষটি তাহাদের অজ্ঞাতসারেই উৎপীড়িতদিগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া পড়ে। হযরতের ও এছলামের অনুরক্ত ভক্তগণের এই সহিষ্ণুতা, এই অসাধারণ আত্মত্যাগ, এই অতুলনীয় সত্যনিষ্ঠা এবং সত্যের মহিমা প্রচারে তাঁহাদের এই সাত্ত্বিক সাধনা ব্যর্থ যায় নাই, যাইতে পারে না। পরীক্ষার কঠোরতা ও বিশ্বাসীগণের অসাধারণ দৃঢ়তার বহু বিবরণ আমরা ভবিষ্যতে দেখিতে পাইব। এ সকল যাঁহার শিক্ষার ফল, যাঁহার জ্যোতিঃকণা প্রাপ্ত হইয়া এছলাম-গগনের এই গ্রহ-নক্ষত্রগুলি এমন স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত—কত মহান তিনি, কত মহীয়সী তাঁহার শিক্ষা ?**

---

* তাবকাত ১ম ভাগ ৩য় খণ্ড, এছাবা—ঐ সকল নামের বিবরণ ; কামেল ২—২৪, ২৫। এবনে-হেশাম ১—১০৯, ১০ ; বোখারী, হলবী ১—২৯৭ হইতে ৩০১ পৃষ্ঠা প্রভৃতি।

** পরিতাপ! এই স্থলে বাইবেলে বর্ণিত যীশুর শিষ্যদিগের দুর্বলতা এমন কি বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাবাদিতার কথা মিলাইয়া দেখুন। 'আপনার জন্য প্রাণ দিব' (যোহন ১৩—৩৭)। বলিয়া কঠোর প্রতিজ্ঞা করিলেও তাঁহার প্রধান শিষ্য পিতর সামান্য কারণে, যীশুর কঠোর পরীক্ষার সময় তাঁহাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন। (ঐ ১৮—১৭)। পক্ষান্তরে তাঁহার প্রধানতম শিষ্য যিহুদা, শত্রু পক্ষের সহিত নীচ ষড়যন্ত্র করিয়া নগণ্য ত্রিশটি মাত্র রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে ধরাইয়া দিতেছেন (মথি ২৬—২৪)। তাঁহার প্রাণহানির সহায়তা করিতেছেন। অথচ এই সকল মহাত্মাকে সামান্য একটুকুও পরীক্ষায় পড়িতে হয় নাই। ইহারাই আবার যীশুখৃষ্টের শিক্ষা ও খৃষ্টান ধর্মের প্রধান বাহক।

'বৃক্ষগুলি তাহার ফলের দ্বারা পরীক্ষিত হয়'—যীশুর এই উক্তি স্মরণ রাখিয়া ফলের দ্বারা এই দুই বৃক্ষের তারতম্য আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

# সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

## দেশত্যাগের সঙ্কল্প

অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা যখন এইরূপে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তখন ভক্তগণের রক্ষার জন্য হযরতের মন অস্থির হইয়া উঠিল। দৈহিক অত্যাচার অপেক্ষা তাহাদিগের অত্যাচারের উদ্দেশ্য অতিশয় ভয়ঙ্কর। পক্ষান্তরে কোরেশগণ তাঁহাদিগকে কোথায়ও প্রকাশ্যভাবে উপাসনা করিতে দেওয়া দূরে থাকুক, কোরআনের একটি আয়তও উচ্চারণ করিতে দিত না। একদিন কা'বাগৃহে কোরআন পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রহার জর্জরিত হইতে হইয়াছিল।* ফলতঃ ভক্তগণের নিকট দৈহিক অত্যাচার অপেক্ষা এইগুলি অধিকতর কষ্টকর হইয়া উঠে।

## আবিসিনিয়ায় প্রস্থান

যাহা হউক, মক্কা হইতে স্থানান্তরে যাইবার পরামর্শ স্থির হইলে, গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী সুবিচারক ও ন্যায়দর্শী বলিয়া আরবদিগের মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মক্কাবাসিগণ মধ্যে মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায় উপলক্ষে আবিসিনিয়ায় গমন করিত, সুতরাং সেখানকার অবস্থা তাহাদিগের অবিদিত ছিল না।** যাহা হউক, এই আবিসিনিয়ায় (হাবশা) গমন করার কথাই স্থির হইল, এই পরামর্শ অনুসারে নব-দীক্ষিত মুছলমানদিগের মধ্যে কতিপয় নর-নারী গোপনে স্বদেশ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং যথাসম্ভব সত্বর আবশ্যকীয় আয়োজন সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা জাহাজ ধরিবার জন্য, 'শোওয়ায়বা' বন্দর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মন্ত্রগুপ্তি সমস্ত কৃতকার্যতার প্রথম শর্ত, মোছলেম সমাজ ইহাতেও খুব পরিপক্ক ছিলেন। কাজেই তাঁহাদিগের এই সঙ্কল্প ও আয়োজনের কথা শত্রুপক্ষ প্রথমে কিছুই জানিতে পারিল না। কিন্তু এতগুলি লোক যখন নিজেদের তৈজসপত্র লইয়া একসঙ্গে নগর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন ক্রমে ক্রমে ব্যাপারখানা আর কাহারও জানিতে বাকী রহিল না। তাহারা ডাকহাঁক করিয়া লোকজন সংগ্রহ করিল এবং পলাতক নর-নারীদিগকে ধরিয়া আনার জন্য বন্দর অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু তাঁহারা পৌঁছিবার পূর্বেই জাহাজ নঙ্গর তুলিয়া রওয়ানা হইয়া যায়। কাজেই পাষণ্ডগণ অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিল।

নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের (জন্ম বৎসর ৪৫) রজব মাসে সর্বপ্রথমে দ্বাদশজন পুরুষ ও চারিজন নারী, আল্লাহর নাম করার অপরাধে কাফেরদিগের কঠোর অত্যাচারের ফলে, স্বধর্ম রক্ষার জন্য জননী জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হইলেন।*** আমরা নিম্নে তাঁহাদিগের নামের তালিকা প্রদান করিতেছি।

(১) ওছমান বেন-আফফান ...কোরেশগণের মধ্যে বংশে, পদমর্যাদায় ও ধন-সম্পদে বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি।

(২) বিবি রোকাইয়া ...হযরতের কন্যা ও ওছমানের স্ত্রী

(৩) আবু হোজায়ফা ...কোরেশের প্রধান সর্দার ওৎবার পুত্র

(৪) বিবি ছাহলা ...আবু হোজায়ফার স্ত্রী।

(৫) জোবের-বেন-আওয়াম ...বানি আছাদ বংশের কোরেশ, ইনি হযরতের আত্মীয় ও বিখ্যাত ছাহাবী।

---

* তাবরী ও বোখারী। ** তাবরী ২—২২১, খাল্‌দুন ১—২৬ পৃষ্ঠা। এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

*** তাবরী ২—২২১, ২২ ; এবনে-হেশাম ১—১১০, ১১ ; তাবকাত ২—১৩৬, খাল্‌দুন ১—২৬ ; এছাবা প্রভৃতি।

(৬) মোত্তাব-বেন-ওমের ...গোষ্ঠীপতি হাশেমের পৌত্র।

(৭) আবদুর রহমান-বেন-আওফ ...কোরেশ বংশোদ্ভব অনেক প্রধান ব্যক্তি।

(৮) আবু ছালামা .. ঐ ঐ

(৯) বিবি ওম্মে ছালামা ...আবু ছালামার স্ত্রী। পরে হযরতের সহিত বিবাহিতা হন। আবিসিনিয়া যাত্রার অনেক বিবরণ ইঁহার মুখে জানা গিয়াছে

(১০) ওছমান-বেন-মাজ্‌উন

(১১) আমের-বেন-রাবিয়া

(১২) তাঁহার স্ত্রী লায়লা

(১৩) আবু ছাবরা

(১৪) হাতেব বেন আমর

(১৫) ছোহেল বেন বায়জা

(১৬) আবদুল্লাহ্ এবন মছউদ...বিখ্যাত পণ্ডিত

ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে একাদশ জন পুরুষ ও চারিজন নারী বলিয়া প্রথম হিজরত-কারীদের সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের হিসাবমতে মোট সংখ্যা ১৫ জন হওয়া চাই। কিন্তু তাবরী নামের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহার মোট সংখ্যা ১৬ জন হয়। এবনে-ছাআদ সংখ্যা না দিয়া ঐ ষোল জনের নাম লিখিয়া দিয়াছেন। এবনে-খালেদুন ওছমান এবনে মাজ্‌উনের নাম বাদ দিয়াছেন। এবনে-এছহাক আবদুল্লাহ্ এবনে মছউদের নাম বাদ দিয়াছেন। হাতেবের নামও তিনি মতান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, গণনার মধ্যে আনেন নাই। অথচ আবিসিনিয়া যাত্রার প্রথম দলে ওছমান এবনে মাজ্‌উন ও আবদুল্লাহ্ এবনে মাছউদও যে সঙ্গে ছিলেন, তাহা চরিত-অভিধান সমূহে* এবং এবনে-ছাআদ ও তাবরী প্রভৃতির বর্ণনায় সম্যকরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবনে-এছহাকের বর্ণনার পর এবনে-হেশাম বলিতেছেন যে, 'ওছমান-এবনে-মাজ্‌উন এই যাত্রীদিগের দলপতিরূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন।' সম্ভবতঃ এই কারণে বর্ণনাকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নাম করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। আমরা সাধারণ ঐতিহাসিকগণের সংখ্যা গ্রহন করিতে পারি নাই বলিয়া এই অনাবশ্যকীয় বিষয়টি লইয়া এত কথা বলিতে হইল।

প্রথম দল নিরাপদে আবিসিনিয়ায় পৌঁছিয়া সেখানে নিঃসঙ্কোচে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে আবু-তালেবের পুত্র জাফর ও ন্যূনাধিক ৮৩ জন মুছলমান (অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে বাদ দিয়া ধরিলে) সুযোগ ও সুবিধা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় প্রবাসী মুছলমানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

## প্রত্যাবর্তন

মুছলমানগণ রজব মাসে প্রথম যাত্রা করিয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহারা শাবান ও রমজান মাসে সেখানে নিরুপদ্রবে অতিবাহিত করিলেন। শাওয়াল মাসে আবিসিনিয়ায় প্রচারিত হইল যে, মক্কার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এছলাম গ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া আবদুল্লাহ্ বেন মাছউদ প্রভৃতি কতিপয় মুছলমান মক্কায় চলিয়া আসিলেন। কিন্তু নগরে প্রবেশ করার পূর্বেই তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অধিকাংশ লোক তখন প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য গোপনে গোপনে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কতিপয় মুছলমান

---

* এছাবা, এছিয়াব, তাজরিদ।

পথ হইতে ফিরিয়া আবার আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমাগত প্রবাসীদিগের উপর কোরেশদিগের অত্যাচারের অবধি রহিল না। পলাতক শিকার আবার তাহাদিগের ফাঁদে পড়িয়াছে, কাজেই তাহারা অত্যাচারের মাত্রা অনেক বাড়াইয়া দিল। কিছুদিন এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, হযরতের আদেশ অনুসারে পুনরায় ন্যূনাধিক একশত মোছলেম নর-নারী সুবিধা মতে আবিসিনিয়ায় প্রস্থান করিলেন।

'মক্কাবাসিগণ, এছলাম গ্রহণ করিয়াছে'—আমাদিগের ইতিহাস সমূহে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার যে অদ্ভুত কারণ প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব।

## অন্যায় দোষারোপ

স্যার উইলিয়ম মুর ও ডাঃ মার্গোলিয়থ প্রভৃতি এই ব্যাপার লইয়া এমন কতকগুলি অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক কথা বলিয়াছেন, যাহার উল্লেখ করাও আমরা লজ্জাজনক বলিয়া মনে করি। শেষোক্ত লেখক প্রথম লেখকের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন যে, 'মুছলমানেরা আবিসিনিয়া রাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতলব ছিল, নাজ্জাশীর দ্বারা মক্কা আক্রমণ করাইবেন।' (১৫৭ পৃষ্ঠা)। সমস্ত ঐতিহাসিক সত্যের বিরুদ্ধে কেবল 'সম্ভবতঃ' 'বোধ হয়' ইত্যাদি দ্বারা এত বড় একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা গড়িয়া তোলার যে কি উদ্দেশ্য, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

আমরা উপরে আবিসিনিয়া যাত্রীদিগের যে তালিকা প্রদান করিয়াছি, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরাও সমানভাবে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহাদিগকেও যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হইতে হইয়াছিল।

এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, প্রাথমিক মুছলমানদিগের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর নিরাশ্রয় ও নিঃস্ব ছিলেন, যাঁহাদিগের উপর পামরেরা অধিকতর অত্যাচার করিতেছিল—সেই প্রাতঃস্মরণীয় হযরত বেলাল, আম্মার, খাব্বাব প্রভৃতির নাম এই তালিকায় নাই। তাঁহারা মোস্তফা-চরণ ছাড়িয়া দেশান্তরে যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা সব সহিতে পারিতেন, কিন্তু মোস্তফার বিচ্ছেদ-যাতনা তাঁহাদিগের পক্ষে অসহ্য ছিল।

মুছলমান! ইহাই হইতেছে তোমার জাতীয় ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা। তুমি আজ ইহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া বসিয়াছ, তাই জগতের সমস্ত দীনতা-হীনতা, সমস্ত হেয়তা ও ভীরুতা, তোমার মধ্যে পুঞ্জীকৃত হইয়া তোমাকে একটা কাপুরুষের জাতি ও কর্মজগতের দুর্বহ জঞ্জালে পরিণত করিয়াছে। মুছলমান! আল্লাহ্‌র শিক্ষাকে ভুলিয়া, তাঁহার প্রেরিত পুণ্যতম ও পূর্ণতম মহিমময় আদর্শকে ভুলিয়া—তাঁহার শিক্ষার মূলনীতিগুলির প্রতি নির্মমভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, আজ তুমি নিজের কর্মফলে—অদৃষ্টদোষে নহে—নিজের ইচ্ছায়, এই ঘৃণিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছ। দোহাই তোমার, অদৃষ্টের দোষ দিয়া নিজের বিবেককে আর প্রবঞ্চিত করিও না!

মুছলমান! হতাশ হইও না। তোমার ইতিহাস আছে, তোমার অতীতের এই স্বর্গীয় আদর্শ আছে। বর্তমানকে অতীতের সহিত মিলাইয়া দাও, তোমার ভবিষ্যৎ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিও যে, ইহা ব্যতীত তোমার উত্থানের, উদ্ধারের ও মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। তোমার ধর্মের, তোমার ভক্তিভাজন হযরতের, তোমার জাতীয় ইতিহাসের গ্লানি রটনার নীচ উদ্দেশ্যে যাহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তোমার জাতীয় আদর্শের মহিমায় তাঁহারাও অনিচ্ছাসত্ত্বে কিরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—নিম্নে তাহা পাঠ করিয়া নিজেদের পরিণতি সম্বন্ধে বিলাপ কর।

"—The part they acted was of deep importance in the history of Islam. It convinced the Coreish of the sincerity and resolution of the converts, and proved their readiness to undergo any loss and hardship rather than abjure the faith of Mahomet. A bright example of self-denial was exhibited to the whole body of believers who were led to regard peril and exile in 'the cause of God', as a privilege and distinction,' ( Muir 75 ).

"তাঁহারা (নবদীক্ষিত মোছলেমগণ) যে সকল কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, এছলামের ইতিহাসে তাহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল কাজের দ্বারা কোরেশগণ নবদীক্ষিত বিশ্বাসীদিগের আন্তরিকতা ও তাহাদিগের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা সকল প্রকার ক্ষতি ও ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মোহাম্মদের ধর্মে আস্থাহীন হইতে পারে না। ইহা দ্বারা 'আল্লাহর কাজে' আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল আদর্শ মোছলেম সংঘের সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছিল—তাহারা ইহা বিশ্বাস করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল যে, 'আল্লাহ্‌র কাজে' সকল প্রকার ধ্বংস ও বিপদকে বরণ করিয়া লওয়া একটা বিশেষত্ব ও গৌরবের বিষয়।" (মুর ৭৫ পৃষ্ঠা)।

## অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

### কোরেশের নূতন ষড়যন্ত্র

### আবিসিনিয়ায় কোরেশ দূত

বহু নবদীক্ষিত মুছলমান কোরেশদিগের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিল, তাহারা এখন আবিসিনিয়ায় নিরাপদে অবস্থান করিতেছে—এই সকল চিন্তায় কোরেশ-প্রধানগণের মন অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে তাহারা সকলে মিলিয়া যুক্তি-পরামর্শ দ্বারা স্থির করিল—আবিসিনিয়া রাজের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া পলাতক ও ফেরারী আসামী বলিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে হইবে। এই কার্যে সফলতা লাভের জন্য তাহারা আয়োজন ও অর্থব্যয়ের ত্রুটী করিল না। আবিসিনিয়ায় আরবের চামড়ার খুব সমাদর ছিল, সেই জন্য নানা প্রকার উৎকৃষ্ট চামড়া এবং উপঢৌকন দিবার যোগ্য অন্যান্য জিনিসপত্র যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইল। রাজা নাজ্জাশী ও তাঁহার পারিষদবর্গের সকলকেই যাহাতে উপঢৌকন দিয়া পরিতুষ্ট করা যায়, এজন্য তাহারা ঐ সকল জিনিসপত্র বহু পরিমাণে সংগ্রহ করিল। তাহারা শেষে আবদুল্লাহ্‌-বেন-আবুরাবিয়া ও আমর-বেন-আছ নামক দুইজন উপযুক্ত লোককে প্রতিনিধি নির্বাচিত করিল। যথাসময়ে প্রতিনিধিদ্বয় ঐ সকল উপঢৌকন লইয়া আবিসিনিয়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।

### দূতগণের ষড়যন্ত্র

প্রতিনিধিগণ প্রথমে রাজ-পারিষদবর্গকে বশীভূত করার চেষ্টা করিল। এজন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন ত' তাহাদিগের সঙ্গে ছিলই, ইহা ব্যতীত তাহারা আর একটা মন্ত্র ছাড়িয়া দিল। তাহারা পারিষদবর্গের নিকট গিয়া বলিল—দেখুন, আমাদের কতকগুলা নির্বোধ বালক ও যুবক নিজেদের পিতৃপিতামহাদি পূর্বপুরুষগণের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের ধর্মে প্রবেশ না করিয়া একটা অভিনব ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে। উহা আমাদিগের ধর্মের সহিত মিলে না, আপনাদিগের ধর্মের সহিতও তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সেটা বুদ্ধির বাহির। প্রতিনিধিদ্বয় এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া

পারিষদবর্গকে পূর্ব হইতেই 'ঠিক' করিয়া রাখিল। প্রতিনিধি ও পারিষদগণের ষড়যন্ত্রের ফলে সিদ্ধান্ত হইল যে, রাজদরবারে এই কথা উঠিলে, পারিষদবর্গ একবাক্যে প্রতিনিধিগণের কথার সমর্থন করিবেন এবং রাজা যাহাতে মুসলমানদিগের কোন প্রকার কথা না শুনিয়া তাহাদিগকে প্রতিনিধিদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করেন, পারিষদবর্গ দরবারে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

এই ষড়যন্ত্র করার পর একদিন আবদুল্লাহ্ ও আমর-বেন-আছ রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া উপঢৌকনাদি নজর দিল। নাজ্জাশী এই উপঢৌকন গ্রহণান্তে তাহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল ঃ "মহারাজ ! মক্কার সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রসমাজ আমাদিগকে আপনার নিকট প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজ ! আমাদিগের দেশের কতিপয় উন্মার্গগামী নির্বোধ যুবক, নিজেদের বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের ধর্মে প্রবেশ না করিয়া এক অভিনব ধর্ম গড়িয়া লইয়াছে। উহা আমাদের ধর্মও নহে—আপনাদের ধর্মও নহে, বরং দুয়েরই বাহির। মহারাজ ! উহাদিগের পিতা-পিতৃব্য ও আত্মীয়বর্গ—মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ—উহাদিগকে ফিরাইয়া পাইবার প্রার্থনা করার জন্য, আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। অবশ্য উহাদিগের কার্যকলাপের বিচার তাঁহারাই উত্তমরূপে করিতে পারিবেন, কারণ তাঁহারা সমস্ত অবস্থা সম্যকরূপে অবগত আছেন।"

প্রতিনিধিদিগের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ষড়যন্ত্র অনুসারে, সভাসদবর্গ একবাক্যে 'ঠিক ঠিক' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা সকলে রাজাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, আরব প্রতিনিধিগণ অতি সঙ্গত প্রার্থনাই করিয়াছেন। মক্কার অধিবাসিগণ, প্রবাসীদিগের আত্মীয়-স্বজন বই ত নয়। অতএব তাহাদিগের ভাল-মন্দের বিচার তাঁহাদিগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত।

## নাজ্জাশীর ন্যায়নিষ্ঠা

নাজ্জাশী ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"সে কি কথা ! পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের মধ্যে আমাকে অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া কতকগুলি বিপন্ন লোক আমার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদিগের মুখে কোন কথা না শুনিয়াই আমি তাহাদিগকে ইহাদের হাতে সমর্পণ করিব—ইহা হইতে পারে না। বেশ, সেই প্রবাসীদিগকে দরবারে উপস্থিত করা হউক।"

কিছুক্ষণ পর মুসলমানগণ দরবারের চাপরাশীর মুখে রাজার আদেশ শ্রবণ করিলেন, এবং অবিলম্বে কিংকর্তব্য স্থির করার জন্য সকলে একত্র সমবেত হইলেন। নাজ্জাশীর কথার কিরূপ উত্তর দেওয়া সঙ্গত, পরামর্শ সভায় এই প্রশ্ন উঠিলে সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'যাহা জানি, যাহা বিশ্বাস করি, এবং হযরত আমাদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার এক বর্ণও গোপন করা হইবে না, ইহাতে অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।' মহাপুরুষের শিষ্যগণের উপযুক্ত প্রতিজ্ঞা !

## জা'ফরের অভিভাষণ

মুসলমানগণ রাজসভায় সমবেত হইলে নাজ্জাশী তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— "যে ধর্মের জন্য তোমরা নিজেদের পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিয়াছ, অথচ আমাদিগের বা জগতের প্রচলিত অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন না করিয়া তোমরা যে অভিনব ধর্মের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছ, তাহার বিবরণ আমি জানিতে চাই।" হযরত আলীর ভ্রাতা মহাত্মা জা'ফর সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে ও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় উত্তর করিলেন—

"রাজন ! পূর্বে আমাদিগের জাতি অতিশয় অজ্ঞ ও বর্বর ছিল। এই অজ্ঞতার ফলে আমরা পুতুল-প্রতিমা, চাঁদ-সূর্য, বৃক্ষ-প্রস্তর, ভূত-প্রেত ও অন্যান্য বহু জড় পদার্থের পূজা-উপাসনা করিতাম। মৃত জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতাম, সমস্ত অশ্লীল কাজই আমাদিগের অঙ্গের আভরণে পরিণত হইয়াছিল। স্বজনগণের প্রতি দুর্ব্যবহার* এবং প্রতিবেশীদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে আমরা একটুও কুণ্ঠিত হইতাম না। আমাদিগের প্রবলেরা দরিদ্রদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।—আমরা এইরূপ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় আল্লাহ্ আমাদিগের নিকট আমাদিগের একজনকে 'রছূল' করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বংশ, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার বিশ্বস্ততা ও তাঁহার নির্মল চরিত্র আমরা পূর্ব হইতে যথেষ্টরূপে অবগত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করিলেন, আমাদিগকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র উপাসনা করিতে আদেশ করিলেন এবং আমরা ও আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়া যে সকল ঠাকুর-দেবতা ও প্রস্তর প্রভৃতির পূজা করিয়া আসিতেছিলাম, তিনি আমাদিগকে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি আমাদিগকে সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত হইতে, স্বজনবর্গের হিত সাধন করিতে, প্রতিবাসীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন,—মিথ্যা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, পিতৃহীনের সম্পত্তি গ্রাস, এবং সতীসাধ্বী নারীদিগের চরিত্রে অপবাদ প্রদান করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে, আমরা নরহত্যা ও ঐ প্রকার নানারূপ জঘন্য পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছি। অন্য কাহাকেও কোনরূপে অংশী না করিয়া আল্লাহর দাস হইয়া থাকিতে, নামায পড়িতে, রোযা রাখিতে এবং যাকাত** দিতে তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। (এইরূপে এছলামের অনুষ্ঠানাদির বর্ণনার পর, জা'ফর বলিলেন) আমরা তাঁহার প্রতি 'ঈমান' আনিয়াছি, এবং তিনি আল্লাহ্র নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। তাঁহারই শিক্ষামতে আমরা সেই একমেবাদ্বিতীয়মের মহিমা বুঝিতে পারিয়া একমাত্র তাঁহারই পূজা-উপাসনা করিয়া থাকি। তিনি আমাদিগকে যে সকল কর্তব্য পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন, আমরা তাহা পালন করিয়া থাকি এবং যে সকল পাপ কার্যে লিপ্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে দূরে পলায়ন করিয়া থাকি।

"রাজন ! এই অপরাধে আমাদিগের স্বজাতীয়েরা আমাদিগের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে। তাহারা সেই আল্লাহ্ হইতে বিমুখ হইয়া জড়পূজায়—এবং ঐ সকল ঘৃণিত পাপাচারে আবার আমাদিগকে বলপূর্বক লিপ্ত করিতে চায়। এজন্য তাহারা আমাদিগের উপর অতি নির্মম, অতি কঠোর, অতি ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে। তাহাদিগের সেই পৈশাচিক ক্রোধ, ঘৃণিত বিদ্বেষ ও অমানুষিক উৎপীড়নে জর্জরিত ও নিরুপায় হইয়া, আমরা স্বদেশের মায়া ত্যাগ করতঃ আপনার রাজ্যে আগমন করিয়াছি—আপনার ন্যায়নিষ্ঠার সুখ্যাতি শুনিয়া, অন্য কোন রাজ্যে গমন না করিয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আশা করি, রাজন ! আপনার সিংহাসন-ছায়ায় আমাদিগের প্রতি কোন প্রকার অবিচার হইতে পারিবে না।"

জা'ফরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইল। মুগ্ধ-স্তম্ভিত-অভিভূত নাজ্জাশী, ক্ষণেক পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ তুমি বলিয়াছ তোমাদিগের 'নবী' আল্লাহর নিকট হইতে 'বাণী' প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার কোন অংশ তোমার স্মরণ আছে কি ? জা'ফরের উত্তর শুনিয়া, নাজ্জাশী তাহার কতকাংশ পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

---

* কন্যাহত্যা, পুত্রবলি ইত্যাদি।

** প্রতিপালনা পরিজনগণের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহান্তে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহার ৪০ অংশের একাংশ বা শতকরা ২.৫০ টাকা জনহিতকর কার্যে দান করিতে মুছলমানগণ শাস্ত্রানুসারে বাধ্য ; ইহাকে যাকাত বলা হয়।

## নাজ্জাশীর মীমাংসা

মহাত্মা জা'ফর স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া, ছুরা মরিয়মের প্রথম হইতে কতকগুলি আয়ত পাঠ করিলেন। কোরআনের সুমধুর, সুগম্ভীর ভাষা, হযরত ঈছা ও হযরত এহ্য়ার জন্মবৃত্তান্ত ও মহত্ত্ব বর্ণনা, সরল-সুবোধগম্য যুক্তি-তর্কের দ্বারা ইহুদী ও খ্রীষ্টান চরমপন্থীদিগের বিশ্বাসের প্রতিবাদ, এছলামের উদার সত্যপ্রিয়তা, এ সমস্ত একসঙ্গে সভাস্থলে একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ বহাইয়া দিল। নাজ্জাশী আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। মুগ্ধ-হৃদয় নাজ্জাশী তখন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন : 'নিশ্চয়ই ইহা এবং যীশু যাহা আনিয়াছিলেন, উভয়ই একই জ্যোতিঃ-কেন্দ্র হইতে আবির্ভূত।' অতঃপর তিনি প্রতিনিধিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : 'যাও তোমাদিগের দরখাস্ত না-মঞ্জুর। আমি ইহাদিগকে কখনই তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিব না।'

## দূতগণের নূতন অভিসন্ধি

কোরেশ দূতগণ এইরূপ অকৃতকার্য হইয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। আমর-বেন-আছ তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া আর এক 'অভিসন্ধি' বাহির করিল। সে তাহার সঙ্গিগণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—দেখ, মুছলমানেরা যীশুকে মানব-তনয় ও আল্লাহ্র দাস বলিয়া থাকে। খ্রীষ্টানেরা কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বর-পুত্র ও ঈশ্বর বলিয়াই বিশ্বাস করে। কাল সকালে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এই মন্ত্র খাটাইতে হইবে। ধর্মবিদ্বেষ ও গোঁড়ামির নিকট সমস্ত ন্যায়নিষ্ঠা পরাজিত হইয়া যায়। খুব সম্ভব এই মন্ত্র খাটাইয়া আমরা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিব।

## নূতন পরীক্ষা ও মুছলমানগণের দৃঢ়তা

এই পরামর্শ অনুসারে প্রাতে উঠিয়াই তাহারা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া নিজেদের বক্তব্য রাজার কানে তুলিয়া দিল। রাজা পূর্ববৎ মুছলমানদিগকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য সংবাদ দিলেন। গতকল্যকার সভায় সত্যের জয় দর্শনে মুছলমানগণ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন এবং বিপদ কাটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সকলে স্বচ্ছন্দ চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় রাজদূতের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া একটা নূতন বিপদের আশঙ্কায় তাঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ধন্য তাঁহাদের মনের বল, ধন্য তাঁহাদের ঈমানের তেজ ! তাঁহারা পূর্বের ন্যায় স্থির করিলেন—'যীশু সম্বন্ধে যাহা সত্য বলিয়া জানি, আমাদের হযরত আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, নিরাবিলভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়া দিতে হইবে। সত্য গোপন করা সম্ভবপর নহে, ইহাতে যে কোন বিপদ ঘটে, আমরা আনন্দের সহিত তাহা বহন করিব।

হাদীছের কাঁনাকারিণী বিবি ওম্মে-ছালামা বলিতেছেন—'এমন বিপদে আমরা আর কখনই পড়ি নাই।' বিপদের গুরুত্ব সহজেই বোঝা যাইতে পারে। ষষ্ঠ শতাব্দীর সেই খ্রীষ্টান রাজা, যে নিজের ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসের—তাহাও আবার স্বয়ং যীশু সম্বন্ধে—প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না, এ বিশ্বাস মুছলমানদিগের মনে বদ্ধমূল হওয়া স্বাভাবিক। ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহাও তাঁহারা সহজে অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ধন্য দৃঢ়তা ! কোরআনের শিক্ষা এবং মোস্তফার সাহচর্যের ফলে, তাঁহারা সত্যের তেজে এমনই দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, এক্ষেত্রেও তাঁহাদিগের বীর হৃদয় একটুও নমিত একটুও দমিত হইল না। আমাদিগের ন্যায় 'দূরদর্শিতা' তাঁহাদিগের ছিল না। তাঁহারা সত্যকে নিরাবিলভাবে ব্যক্ত করিতেন, 'মাছলেহাৎ' নামক দেবতার পূজা তাঁহারা কখনই করেন নাই। আমাদিগের এই দূরদর্শিতা তাঁহাদিগের অভিধানে কাপট্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইত। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, এই শ্রেণীর দূরদর্শী না কপট চিরকালই হেয় ও পদদলিত হইয়া থাকে, কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

## যীশু সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর

মুছলমানগণ দরবারে সমবেত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ 'মরিয়ম-তনয় যীশু সম্বন্ধে তোমরা কি বলিয়া থাক ?'

জা'ফর দৃঢ়কণ্ঠে অথচ মৃদুভাবে উত্তর করিলেন—'রাজন ! আমাদিগের নবীর শিক্ষানুসারে আমরা তাঁহাকে আল্লাহর দাস, মানুষ, সতী-সাধ্বী মরিয়মের পুত্র, আল্লাহর সংবাদ-বাহক, সাধু-সজ্জন ও মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি।' জা'ফরের কথা শেষ হইতেই নাজ্জাশী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—'ঠিক কথা, অতি সমীচীন কথা। যীশুও ইহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই।' তখন কোরেশ প্রতিনিধিদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি উচ্চস্বরে বলিলেন—'তোমরা চলিয়া যাও, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, তোমরা আমার রাজ্যের অকল্যাণ।' সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের সমস্ত উপঢৌকন ফিরাইয়া দেওয়া হইল।*

## নাজ্জাশীর এছলাম গ্রহণ

নাজ্জাশী Negus শব্দের আরবী রূপান্তর, উহার অর্থ রাজা। নাজ্জাশীর নাম ছিল আছমাহা। প্রবাসী মুছলমানগণ স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়ার সময় তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে হযরতের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে, নাজ্জাশী এছলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাজ্জাশীর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলে, হযরত সমস্ত বিশ্বাসীদিগকে লইয়া তাঁহার গায়েবী জানাজার নামায পড়িয়া তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।**

সত্য কিরূপে নিজে নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লয়, শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়া কিরূপে তাহার জয় আরম্ভ হয়, এই ঘটনায় তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মুষ্টিমেয় উৎপীড়িত মুছলমান, কোরেশদিগের অত্যাচারে অস্থির হইয়া আবিসিনিয়ায় পলায়ন করিলেন, ঘটনার ইহাই বাহ্য দৃশ্য। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে, প্রকৃতপক্ষে ইহাই এছলামের বিদেশে প্রেরিত প্রথম "মিশন।" আর কোরেশদিগের প্রতিনিধি প্রেরণই নাজ্জাশীর এছলাম গ্রহণের প্রধান কারণ বস্তুতঃ শত্রুরাই সত্যের জয়লাভের প্রধান সহায়। সেই জন্য পরীক্ষার কোন অবস্থায় এবং সাধনার কোন স্তরে, সত্যের সাধকের পক্ষে বিচলিত হওয়া উচিত নহে।

## মার্গোলিয়থের চাঞ্চল্য

আমাদিগের পরম বন্ধু মার্গোলিয়থ ছাহেব এখানে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অনেক সময় স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করার জন্য ইমাম আহমদ-বেন-হাম্বলের মোছনাদের দোহাই দিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিবরণ উপলক্ষে মোছনাদের নাম করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই তিনি ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করিতে না পারিয়া, নলদিকির দোহাই দিয়া এই সংশয় উপস্থিত করিতেছেন যে, আরব ও আবিসিনিয়াবাসিগণ যে পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিত, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। (১৫৮ পৃষ্ঠা) কিন্তু ইহার পূর্ব পৃষ্ঠায় তিনি বলিয়া আসিয়াছেন যে, এই রাজ্যের সহিত মক্কাবাসীদিগের বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আবিসিনিয়া রাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাদ্বারা মক্কা আক্রমণ করাইবার জন্য এই প্রবাসীগণ তথায় প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার এই সংশয়ের মূল্য যে কতটুকু, তাহা সহজেই বোধগম্য। আবিসিনিয়ার ভাষা ও আরবীর মধ্যে পার্থক্যও খুব সামান্য। পাঠক এখানে ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, এই শ্রেণীর লেখকেরা কিন্তু দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক কোরেশ বালকের পক্ষে গ্রিক সিরিয়াক ও হিব্রু ভাষার সাহায্যে সমস্ত ধর্মতত্ত্ব আয়ত্ত করা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন !

---

* মোছনদে আহমদ ১ম খণ্ড ২০১—৩ পৃষ্ঠা। এবনে-হেশাম ১—১১৫-১৭। কামেল ২—৭৯-৮০। ** বোখারী, মোছলেম।

# ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## ঐতিহাসিক প্রমাদ

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - تنزيل من حكيم حميد

### মিথ্যা জনরব ও তৎপ্রচারের কারণ

আবিসিনিয়া-প্রবাসী মুছলমানগণ, যে কোন উপায়ে হউক, শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, কোরেশগণ এছলাম গ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন (সংখ্যা বা নামের নির্ণয় নাই) মক্কায় চলিয়া আসিলেন। কিন্তু হঠাৎ নগরে প্রবেশ না করিয়া, তাঁহারা বাহিরে বাহিরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সংবাদটা ভিত্তিহীন।' পূর্ব অধ্যায়ে এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রকার ভিত্তিহীন সংবাদ রটনার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তাবরী ও এবনে-ছাআদ যে সকল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেও আমরা লজ্জা বোধ করিতেছি।

### মোস্তফা-চরিত্রে ভীষণ দোষারোপ

আমাদিগের ঐতিহাসিক ও কথকগণ বলিতেছেন যে, কোরেশদিগের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা দর্শনে হযরতের মনে হইতে লাগিল যে, এখন যদি এমন কোন 'অহি' না আসে, যাহাতে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে কঠোর কথা আছে, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। এই সময় 'আন্নাজ্‌ম' ছুরা অবতীর্ণ হইল। হযরত এই ছুরা পাঠ করিতে করিতে—

افرأيتم اللات والعزى - ومناة الثالثة الاخرى (ক)

এই আয়ত পর্যন্ত পৌঁছিলেন—যেহেতু তিনি কোরেশদিগকে শান্ত ও তুষ্ট করার জন্য মনে মনে কল্পনা-জল্পনা করিতেন—শয়তান তাঁহার মুখে—

تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى

এই দুইটি পদ পুরিয়া দিল। কোরেশগণ যখন এই সংবাদ শুনিতে পাইল, তখন তাহাদিগের আনন্দের আর অবধি রহিল না। মুছলমানদিগের বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না, নবীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করাই তাহাদিগের ধর্ম। তাহার পর, যখন ছুরার শেষে হযরত ছেজদার স্থানে আসিলেন, তখন তিনি ছেজদা করিলেন। মুছলমানেরা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস মতে তাঁহার সঙ্গে ছেজদায় যোগদান করিল। কোরেশ ও অন্যান্য বংশের যে সকল পৌত্তলিক সেখানে উপস্থিত ছিল, হযরত তাহাদিগের দেব-দেবীর প্রশংসা করিয়াছেন দেখিয়া, তাহারাও ছেজদা করিল। এই ছেজদার সংবাদ আবিসিনিয়া প্রবাসী মুছলমানদিগের কর্ণগোচর হইল, তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, কোরেশগণ এছলাম গ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া কয়েকজন প্রবাসী মক্কায় চলিয়া আসিলেন এবং অবশিষ্ট সকলে সেখানেই থাকিলেন।

অতঃপর জিব্রাইল হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া (তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া) বলিতে লাগিলেন—মোহাম্মদ! তুমি কি করিয়া বসিলে? আমি যাহা খোদার নিকট হইতে আনি নাই, এমন সমস্ত আয়ত তুমি লোকদিগের সম্মুখে কেন পাঠ করিলে? খোদা যাহা তোমাকে বলেন নাই, তুমি তাহা কেন বলিলে? ইহাতে হযরত যৎপরোনাস্তি মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহার আল্লাহর ভয় অত্যন্ত অধিক হইল। আল্লাহ তাঁহার উপর অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, তাই এই সময় কোরআনে এই মর্মের আয়ত নাজেল হইল যে, প্রত্যেক নবীর মুখেই শয়তান এইরূপ পাপ কথা ঢুকাইয়া দিয়া থাকে, ইহাতে তুমি একাই লিপ্ত হও নাই। তাহার পর আল্লাহ শয়তানের অংশ (রচনাংশ)

বাতিল করিয়া দিয়া তাঁহার যে আসল কালাম, তাহাই বলবৎ রাখেন। তখন ছুরা হজ্জের এই আয়ত অবতীর্ণ হইল ঃ

(খ) وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم

অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার চিন্তা ও দুঃখ দূর করিলেন, শয়তান তাঁহার মুখে যে দুইটি পদ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল, তাহা—

(গ) الكم الذكر وله الانثى - تلك اذا قسمة ضيزى .... لمن يشاء ويرضى

এই আয়তগুলি অবতীর্ণ করিয়া বাতিল করিয়া দিলেন।

আর একটি বর্ণনায় কথিত হইয়াছে যে, জিব্রাইল ফেরেশতার ভর্ৎসনার পর হযরত বলিতেছেন— افتريت على الله الخ 'আমি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যার সৃষ্টি করিয়াছি, তিনি যাহা বলেন নাই আমি তাহা বলিয়াছি।' এই বর্ণনায় ترتضى স্থলে لترجى শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বর্ণনায় আরও কথিত হইয়াছে যে, জিব্রাইল সন্ধ্যাকালে আসিয়া যখন ঐ ছুরাটি শুনিতে চাহিলেন, হযরত তখনও শয়তান-রচিত ঐ পদ দুইটি অন্যান্য পদের সঙ্গে তাঁহার নিকট আবৃত্তি করিয়াছিলেন। এই সময়েই জিব্রাইল প্রতিবাদ করেন। এই বর্ণনার মধ্যে আর একটি আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে।*

খৃষ্টান লেখকগণ এই বিবরণটি পাইয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের লেখা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। হইবারই কথা, যাঁহারা হযরতের চরিত্রে কোন প্রকার দোষারোপ করিবার মত একটা সত্য-মিথ্যা সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, যাহারা সেজন্য অর্থ, সময় ও শ্রমের অপচয় করিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হন নাই—সেই জীবনব্যাপী পণ্ডশ্রমের পর এহেন বিবরণ হস্তগত হইলে তাঁহারা যে আনন্দে আত্মহারা হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে ?

বিষয়টির গুরুত্ব চিন্তা করিয়া, আমরা এ সম্বন্ধে কয়েক দিক দিয়া একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। কাজেই উহা যে দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

## আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য

এই ঘটনা সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকগণ, বিভিন্ন ভাষায় যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলি প্রায় সমস্তই এখন আমাদিগের সম্মুখে আছে। এই লেখকগণ বিভিন্ন দিক দিয়া এই বিবরণটি সত্য বা মিথ্যা হওয়ার বিচার করিয়াছেন—সত্য, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আভ্যন্তরিক সাক্ষী-প্রমাণগুলি লইয়া সূক্ষ্মভাবে কেহই তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। আমাদিগের মতে ঐ বিবরণের সহিত 'নাজ্‌ম' ছুরাটি মিলাইয়া পড়িলেই সহজে ও অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইবে যে, উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

## এই বিবরণে কথিত হইয়াছে যে—

প্রথম দফা ঃ

(ক) আলোচ্য সময়ে হযরত ছুরা 'নাজ্‌ম' পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া উহা এক সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ঐ ছুরার শেষে ছেজদার আয়ত থাকায়, ছুরা পাঠ শেষ হইয়া যাওয়ার পর, হযরত ছেজদা করিলেন।

* তাবরী ২—২২৬, ২৭ ; তাবকাত ২—১৩৭, ৩৮

(খ) হযরতের ছেজদা দেখিয়া মুছলমান ও কোরেশ-পৌত্তলিকগণ সকলে ছেজদা করিয়াছিলেন।

(গ) "কোরেশগণ মুছলমান হইয়াছে" এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার মূল কারণ হইতেছে, কোরেশদিগের এই ছেজদা।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, হযরত একই সময়ে একই বৈঠকে এবং একই সঙ্গে ছুরা 'নাজমের' প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন. আলোচ্য বিবরণে ইহা খুব স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে

দ্বিতীয় দফা ঃ

(ক) লাৎ, ওজ্জা ও মানাতের নাম সম্পর্কিত আয়ত দুইটি পাঠকালে, হযরত শয়তান কর্তৃক (মাআজাল্লাহ) বা নিজের মনের ভুলে প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন।

(খ) হযরত লাৎ, ওজ্জা ও মানাৎ নাম্নী দেবিগণের স্তুতি করাতে কোরেশগণ খুব আনন্দিত হইল এবং বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মোহাম্মদের সহিত একরকম মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

(গ) তাহার পর সেই সভা ভঙ্গের বহুক্ষণ পরে, জিব্রাইল আসিলে এবং তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইলে হযরত বিলাপ ও সন্তাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর—

وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى - الاية

এই আয়তটি অবতীর্ণ হইল।

(ঘ) হযরতের ভাবনার অবধি রহিল না। তাই তছল্লি দিবার জন্য এই মর্মের আয়ৎ অবতীর্ণ হইল যে, সকল নবী ও রছুলের মুখেই শয়তান ঐরূপ নিজের কথা পুরিয়া দেয়, তখন আল্লাহ্ শয়তানের অংশটি বাতিল করিয়া নিজের টুকু পাকা করিয়া লন।*

(ঙ) ছুরা 'হজের' খ-চিহ্নিত আয়তটি অবতীর্ণ হওয়ার পর, উহার মর্মানুসারে আল্লাহ্ শয়তানের বচনাংশ বাতিল করিবার জন্য, ঐ লাৎ, ওজ্জা ও মানাতের অক্ষমতা ও শক্তিহীনতা সংক্রান্ত আয়ত কয়টি অবতীর্ণ করেন। পৌত্তলিকগণ ইহাতে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল।

## তর্কীভূত আয়ৎ

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে তর্কীভূত ক-চিহ্নিত আয়তটি ও তাহার অনুবাদ প্রদান করিতেছি। ছুরা 'নাজমে' আয়তটি এইভাবে আছে—

افرايتم اللات والعزى ' ومنات الثالثة الاخرى ؟ الكم الذكر وله الانثى ؟ تلك اذا قسمة ضيزى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان - ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ' ولقد جاءهم من ربهم الهدى ( الى قوله تعالى ) لمن يشاء و يرضى —

(ক) "হে মক্কাবাসিগণ ! মোহাম্মদ স্বর্গে-মর্তে সেই অসীম ও পরম শক্তিশালী প্রভুর যে সকল মহিমা দর্শন করেন, তোমরা কি নগণ্য লাৎ ও ওজ্জাতে বা তৃতীয়া মানাতে তাহা (সেই মহিমা ও শক্তির নিদর্শন) দেখিতেছ ? (তোমরা নিজেদের জন্য কন্যা পছন্দ কর না)। (খ) তবে কি পুরুষগুলি তোমাদের ও নারীগুলি তাঁহার ? অতএব ইহা অতি অসঙ্গত বিভাগ। এই (লাৎ, ওজ্জা ও মানাৎ প্রভৃতি বোৎ)-গুলি (প্রকৃতপক্ষে)

* এই অনুবাদ বা ব্যাখ্যা ঐ বর্ণনাকারীদিগের মতানুসারেই লিখিত হইতেছে

নাম মাত্র, তোমরা ও তোমাদিগের পূর্বপুরুষগণ ঐ গুলিকে গড়িয়া লইয়াছ মাত্র, আল্লাহ্ উহার জন্য কোন প্রমাণ ও নিদর্শন প্রদান করেন নাই। (অর্থাৎ ঐগুলি অবাস্তব ও প্রমাণহীন নামসমষ্টি মাত্র)। তাহারা কেবল কল্পনা ও অনুমানেরই অনুসরণ করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের মন যাহা চায় তাহাই করিয়া থাকে। অথচ তাহাদিগের কাছে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে পথপ্রদর্শক আসিয়াছে .....''। (ছুরা 'নাজম')।

আলোচ্য উপকথার রচয়িতা ও কথকগণ বলেন যে, ''তবে কি'' হইতে পরবর্তী আয়তগুলি জিব্রাইলের সহিত হযরতের দেখা-সাক্ষাৎ, কথোপকথন, অনুশোচনা এবং অপর ছুরার দুইটি আয়ৎ অবতীর্ণ হইবার পর, শয়তানী অংশকে বাতিল করিবার জন্য অবতীর্ণ করা হইয়াছিল; অধিকন্তু হযরত ঐ অংশটি পাঠ ও প্রচার করিলে, 'আবার মোহাম্মদ আমাদিগের দেব-দেবীর নিন্দা করিতেছে' বলিয়া, কোরেশগণ একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে এবং মুছলমানদিগের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার করিয়া থাকে।

## স্পষ্ট মিথ্যা

আমরা এখন স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি যে, এই বিবরণ সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য ও একেবারে অগ্রাহ্য। কারণ, উহাতে মূল ঘটনা সম্বন্ধে এমন দুইটি পরস্পর বিপরীত কথা বলা হইয়াছে, যাহার সমীকরণ অসম্ভব। তাঁহারা বলিতেছেন যে—

(ক) হযরত একই সময়ে একই বৈঠকে একবারে ছুরাটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া ছেজদা করিলেন।

(খ) অতএব এই পাঠের অন্ততঃ পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ ছুরাটি সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা আবার সেই নিশ্বাসে বলিতেছেন :

লাৎ, ওজ্জা প্রভৃতির অকিঞ্চিৎকরতা সংক্রান্ত আয়তগুলি দীর্ঘ সময় পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হযরতের একবারেই সম্পূর্ণ ছুরা 'নাজম' পাঠ ও তৎপর ছেজদা করার ঘটনাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া যাইবে। আর যদি বলা হয় যে, বস্তুতঃ হযরত সে সময় একসঙ্গে সম্পূর্ণ ছুরাটির আবৃত্তি শেষ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, লাৎ-ওজ্জার নিন্দাসূচক আয়তগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পঠিত হইয়াছিল। তাহা হইলে, কোরেশের প্রথমকার সন্তোষ ও ছেজদা এবং পরবর্তী সময়ের অসন্তোষ ইত্যাদির গল্পটি মিথ্যা হইয়া যায়। কারণ হযরত যখন ঐ ছুরা পাঠ করিয়াছিলেন, তখন কোরেশদিগের আপত্তিজনক আয়তগুলিও ত' সেই সঙ্গে সঙ্গেই পঠিত হইয়াছিল।

সব ছাড়িয়া দিয়া কোর্‌আনের ঐ আয়তটির প্রতি একটুকু মনোযোগ প্রদান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই বিবরণটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা কল্পনা মাত্র।

## দ্বিতীয় প্রমাণ

সমস্ত তর্কের মূল এই কথার উপর নির্ভর করিতেছে যে, 'খ' চিহ্ন হইতে পরবর্তী আয়তগুলি (যাহাতে লাৎ, ওজ্জা প্রভৃতির অকিঞ্চিৎকারিতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে) 'ক' চিহ্নিত আয়তটির পরেই অবতীর্ণ বা পঠিত হয় নাই। বরং প্রথমাংশ পঠিত হইলে, শয়তান হযরতের মুখে—''উহারা (লাৎ, ওজ্জা ও মানাৎ) অতীব সম্ভ্রান্ত ও মহিমান্বিত, নিশ্চয় উহাদিগের অনুরোধ গ্রাহ্য হইয়া থাকে''—এই কথাগুলি ঢুকাইয়া দিয়াছিল। তাহার পর 'খ' চিহ্ন হইতে শেষের আয়তগুলি অবতীর্ণ হইলে তাহারা দেখিল, হযরত আবার তাহাদিগের দেবীগণের নিন্দাবাদ করিতেছেন। ইহাতেই তাহারা চটিয়া যায়। ফলতঃ 'ক' চিহ্নিত আয়তটি যে তখন সেই মজলিসে পঠিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত

নাই। এখন ঐ 'ক' চিহ্নিত আয়তেই যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহাতে শেষোক্ত আয়তের ন্যায় ঐ দেবিগণের হেয়তা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে এই উপকথাগুলির মূলই কাটিয়া যায়।

এই আয়তে লাৎ, ওজ্জা ও মানাৎ নামের সঙ্গে أخرى 'ওখরা' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার অর্থ হেয়, নগণ্য বা নীচ। ইহার প্রমাণার্থে আমরা ভাষা সম্বন্ধে সর্বপ্রধান তফছিরগুলির মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

و (الاخرى) ذم وهى المتاخرة الوضيعة المقدار كقوله تعالى و قالت اخراهم لاولهم اى وضعائهم لرؤسائهم و اشرافهم (كشاف ج ٣ ص ١٣٥)

'ওখরা' নিন্দার্থ বিশেষণ, উহার অর্থ—অপদার্থ, নগণ্য, নীচ এবং সম্মান ও মূল্যহীন।' কোরআনের আয়তের দ্বারা লেখক ইহার প্রমাণ দিয়াছেন।* মাদারেক খাজেন প্রভৃতি তফছিরেও এই অর্থ করা হইয়াছে **

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, 'ক' চিহ্নিত আয়তেই ঐ দেবীগুলিকে নগণ্য, অপদার্থ ও অকিঞ্চিৎকর বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সুতরাং এই উপকথাটির সমস্ত মূল এখানেই কাটিয়া যাইতেছে। কারণ, তাহাদের দেবিগণের নিন্দার জন্য অসন্তোষের যে কারণ 'খ' চিহ্নিত আয়তে ছিল, তাহার প্রথমাংশেও অর্থাৎ 'ক' চিহ্নিত আয়তেও তাহা সমানভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বরং একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজে জানা যাইবে যে, আয়তের শেষাংশে পৌত্তলিকদিগের কার্যকলাপের—পৌত্তলিকতার—অসারতা বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র, তাহাদিগের দেব-দেবীদিগের বিষয়ে কোন প্রকার মতামত সেখানে প্রকাশ করা হয় নাই কিন্তু তাহাদের ক্রোধের মূল কারণ যে লাৎ-মানাতাদির নিন্দা—তাহা ত' আয়তের প্রথমাংশেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং মধ্যস্থলে এই শয়তানী কাণ্ডকারখানা'র কল্পনা একটা শয়তানি প্ররোচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

## তৃতীয় প্রমাণ

এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সে সময় মক্কায়, এমন কি কথিত সভাস্থলে, বহু মুছলমানও উপস্থিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত বহু কোরেশ তথায় উপস্থিত ছিল। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে (যেমন হামজা, ওমর, আমর-বেন আছ প্রমুখ) ক্রমে ক্রমে, এবং মক্কা বিজয়ের পর অন্য সকলেই এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শতাধিক মোছলেম নর-নারী তখন আবিসিনিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে কতিপয় 'ছাহাবা' ঐ ভিত্তিহীন সংবাদ শুনিয়া মক্কায় আগমন করিয়া কাফেরদিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই প্রত্যক্ষদর্শী শত শত ছাহাবীগণের— এমন কি যাঁহারা ঐ ঘটনার সহিত প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত তাঁহাদের মধ্যেকার একটি প্রাণীও এই ঘটনার বিষয় জানিতে—শুনিতে পারিলেন না, একজনও কোন সূত্রে কোন অবস্থায় এই শয়তানী কাণ্ডের একটু আভাস ঘুণাক্ষরেও দিলেন না। ইহা হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে, হযরতের ও তাঁহার সহচরবর্গের সময়ের পর এই বিবরণটি—যে-কোন কারণে হউক—কল্পিত, রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে।***

---

* কাশশাফ ৩—১৪০ পৃষ্ঠা।

** দেখুন—খাজেন ৪—২০০; মাদারেক ৪—২০০, গারায়েব, বায়যাভী প্রভৃতি।

*** কারণের আলোচনা আমরা পরে করিব।

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## وانا له لحافظون

### ভীষণ উক্তি

এই গল্পটি যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, এই ভীষণ উক্তি প্রথমে যাঁহাদিগের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাঁহারা হযরতের চরিত্রের উপর যে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা গুরুতর ও সাংঘাতিক আক্রমণ আর কিছুই হইতে পারে না। পাঠক, একবার অবস্থাটা বিবেচনা করিয়া দেখুন—''অকৃতকার্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে অবসন্দগ্রস্ত হইয়া, হযরত মক্কাবাসীদিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন। কোরেশদিগের অপ্রীতিকর কোন আয়ত অবতীর্ণ না হয় এবং তাহাদের সন্তোষজনক আয়ত যাহাতে অবতীর্ণ হয়, এজন্য তাঁহার হৃদয় একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর, তিনি কোরেশদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কোরআনের আয়তের সঙ্গে, আল্লাহর প্রতি অপবাদ দিয়া লাৎ, ওজ্জা প্রভৃতির পূজা-উপাসনার সমর্থনমূলক কতকগুলি 'জাল' আয়ত মিশাইয়া দিতেছেন। কোরেশগণ তাঁহার এই কার্যে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিয়া বলিতে লাগিল—মোহাম্মদের ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদির কর্তৃত্ব করুন, আমাদিগের তাহাতে আপত্তি নাই। আমরা ত' বলিয়া থাকি যে, এই ঠাকুর-দেবতাদিগের পূজা-অর্চনা করিলে তাঁহারা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া খোদার নিকট প্রার্থনা ও অনুরোধ করেন, খোদা সেই অনুরোধ মঞ্জুর করিয়া থাকেন। এখন মোহাম্মদ আমাদিগের এই কথাগুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। হযরতের চরিত্রের উপর, এছলামের মূলনীতির উপর এবং কোরআনের শিক্ষার উপর ইহাপেক্ষা ভীষণতর ও জঘন্যতর আক্রমণ আর কি হইতে পারে! তাবরী ও এবনে-ছাআদ ব্যতীত আরও কয়েকজন গ্রন্থকার এই বিবরণটিকে নিজ নিজ পুস্তকে স্থান দান করিয়াছেন। বোখারীর বিখ্যাত টীকাকার হাফেজ-এবনে-হাজর আস্কালনী এই বিবরণের 'ভিত্তি' বাহির করিবার জন্য 'আদাজল খাইয়া' লাগিয়া গিয়াছেন। 'রেওয়ায়েৎ' নামে কিছু দেখিতে পাইলে, তিনি অনেক সময় অন্য সমস্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রমাণের দিক হইতে একেবারে চোখ বন্ধ করিয়া লইয়া, কেবল রাবী ও রেওয়ায়েৎ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যাহা হউক, ব্যক্তি-বিশেষের মত ও সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে এছলাম আমাদিগকে বাধ্য করে নাই, বরং প্রত্যেক বিবরণের সত্য-মিথ্যা উত্তমরূপে বিচার করিয়া তৎসম্বন্ধে মতামত নির্ধারণ করার জন্য আমরা এছলাম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।*

### বিবরণের ঐতিহাসিক ভিত্তি

১। এই বিবরণগুলির বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সর্বপ্রথমে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, যাঁহারা এই গল্প প্রচার করিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ ঘটনা জ্ঞানগত হওয়া সম্ভবপর কি-না? তাহার পর দেখিতে হইবে যে, বর্ণনাকারিগণ সকলে পরিচিত ও বিশ্বস্ত কি-না?

### অবিশ্বাস্য সাক্ষ্য

এই বিবরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সমস্ত বিবরণের মূল বর্ণনাকারী বলিয়া যাহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনও হযরতকে দর্শন করেন নাই। এবনে-ছাআদ, আবুবাকর নামক জনৈক ব্যক্তির প্রমুখাৎ এই ঘটনার বিবৃতি

---

* কোরআন। اذا جاءكم فاسق بنباء — الاية

করিতেছেন। কিন্তু চরিতশাস্ত্রে দেখা যায় যে, এই আবুবাকর ত দূরের কথা, তাঁহার পিতা আব্দুর রহমান হযরতের মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে যদি ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ ঐ গল্পটি বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, তাঁহারা তাঁহাদিগের এমন কি তাঁহাদিগের পিতৃগণের জন্মেরও বহু পূর্বেকার ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, অথচ তাঁহারা যে কি সূত্রে তাহা অবগত হইয়াছেন, সে কথা কেহই ব্যক্ত করিতেছেন না। হযরতের কোন সমসাময়িক ছাহাবীর মুখে শুনিয়া থাকিলে, তাঁহাদিগের পক্ষে তাহা প্রকাশ না করার কোনই কারণ ছিল না

তাঁহারা কেহই রেওয়ায়তের সাধারণ নিয়মানুসারে চলেন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও কোন প্রত্যক্ষদর্শী বা সমসাময়িক ছাহাবীর নাম নিজের 'সূত্র'রূপে প্রদান করেন নাই। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, এই বিবরণটি পরবর্তী যুগের কল্পনা মাত্র।

### এবনে–আব্বাছের বর্ণনা

এই আলোচনাটি পূর্ণভাবে সমাপ্ত করিবার জন্য এখানে বাজ্জার ও এবনে–মর্দুওয়ায়হের বর্ণিত একটি হাদীছের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। ঐ হাদীছে ছৈয়দ–বেন–জোবের হইতে, এবং তিনি এবনে–আব্বাছ হইতে, এই বিবরণ অবগত হইয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক যুক্তি–তর্কের আবশ্যকতা হইবে না। এই গ্রন্থকারদ্বয়ের মূল রাবী 'শো'বা' এই সূত্র বর্ণনাকালে বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহা তাঁহার অনুমান মাত্র। 'মোরছাল মুনকাতা' (সূত্রহীন বা ভগ্নসূত্র) হাদীছের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাকালে এইরূপ অনুমানের বহুল পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই বর্ণনায় এবনে–হাম্মাদের একজন রাবী মোত্তালেব এবনে–আবদুল্লাহ্। ইহার সম্বন্ধে স্বয়ং এবনে–ছাআদ বলিয়াছেন যে—

كثير الحديث وليس يحتج بحديثه

'ইনি অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় হাদীছ বর্ণনা করেন, কিন্তু ইঁহার হাদীছ প্রমাণস্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে না।'* পক্ষান্তরে তাঁহারই সম্বন্ধে আবুজরআ বলিতেছেন, 'আমার অনুমান যে, সম্ভবতঃ এবনে–আব্বাছ বিবি আয়েশার মুখে শুনিয়া থাকিবেন।' ফলতঃ মূল রাবী শো'বাই সন্দেহ করিতেছেন। এবনে–আব্বাছের নাম তিনি যে কেবল অনুমান করিয়াই বলিয়াছেন, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর, এই অনুমানের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এবনে–আব্বাছ তখন কোথায় ছিলেন ? তিনি হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে** অর্থাৎ এই ঘটনার পুরা পাঁচ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এমন কি সমসাময়িক সাক্ষীরূপে বিবেচিত হইতে পারেন না।

এবনে–ছাআদের উক্তিতে আমরা দেখিতেছি যে, তিনি মোত্তালেবের হাদীছ বর্ণনার অতিরিক্ততা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহার হাদীছ যে 'প্রমাণস্থলে' ব্যবহৃত হইতে পারে না, এ-কথাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অথচ সেই মোত্তালেবের বর্ণনা মতেই তিনি নিজের ইতিহাসে—তাবকাতে—আলোচ্য বিবরণটিকে স্থান দান করিয়াছেন। আমরা উপক্রমণিকায় ইহার কারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ধর্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা বা 'মছলা' যে স্থলে সপ্রমাণ করিতে হয়, সেইখানেই তাঁহারা এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইতিহাসের কোন ঘটনাই—যেহেতু তদ্দ্বারা কোন মছলা প্রমাণিত হয় না—তাঁহাদিগের নিকট প্রমাণস্থল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বাজ্জারের এই হাদীছের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা এবনে–ছাআদের বর্ণনার মূল্যও উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম।

---

* মীজান ২—৪৮২।

** একমাল, আবদুল্লাহ্ বেন–আব্বাছ।

## বোখারী ও মোছলেমের হাদীছ

২। ছুরা 'নাজম' পাঠান্তে হযরতের ছেজদা করার কথা বোখারী ও মোছলেমে আবদুল্লাহ-এবন-মাছউদ ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।* ঐ হদীছের মর্ম এই যে, হযরত ছুরা 'নাজম' পাঠ শেষ করিয়া ছেজদা করিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সকলেই ছেজদা করিলেন। তবে একজন বৃদ্ধ কোরেশ একমুষ্টি কঙ্কর বা মৃত্তিকা তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। সেই বৃদ্ধকে আমি পরে (বদর যুদ্ধে) কাফের অবস্থায় নিহত হইতে দেখিয়াছি। বোখারীর অপর এক রেওয়ায়তে জানা যায় যে, 'সেই বৃদ্ধটি শাহজাদা ইছলাম-বৈরী খলফের পুত্র উমাইয়া'।** আবদুল্লাহ-এবন-মছউদ কেবল সমসাময়িক বা ছাহাবী নহেন। আমরা পূর্বে প্রথম আবিসিনিয়া-যাত্রীদিগের নামের তালিকা দিয়াছি, তাহাতে এই আবদুল্লাহ-এবনে-মাছউদের নামও সন্নিবেশিত আছে। তিনি প্রথম প্রবাস যাত্রীদিগের দলভুক্ত ছিলেন—'মক্কাবাসিগণ মুছলমান হইয়াছে'—এই সংবাদ শুনিয়া যে কয়জন ছাহাবী মক্কায় চলিয়া আসিয়াছিলেন, এবনে-মাছউদও তাঁহাদের একজন।*** সেই এবনে মছউদ ছুরা 'নাজমের' ছিজদার বিবরণ দিতেছেন, অথচ এই ঘটনা সম্বন্ধে একটুকু সামান্য আভাসও তাঁহার কথায় পাওয়া যাইতেছে না। বর্ণিত 'শয়তানী কাণ্ডের' মূলে যদি সামান্য একবিন্দু সত্যও নিহিত থাকিত, তাহা হইলে এই ঘটনার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংসৃষ্ট আবদুল্লাহ-এবনে মছউদ ছেজদা করার বিবরণ বর্ণনা করার সময়, তাহার কারণ ব্যক্ত করিতে কখনই বিস্মৃত হইতেন না। ফলতঃ ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ ঘটনার সহিত সত্যের কোনই সম্বন্ধ নাই।

### প্রত্যক্ষদর্শীর বিরুদ্ধ-সাক্ষ্য

৩। ইমাম বোখারী ছুরা 'নাজমের' তফছিরে এই আবদুল্লাহ বেন মাছউদ কর্তৃক কথিত যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, তিনি স্বয়ং এই ছেজদার সময় সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ-বেন-মাছউদ বলিতেছেন, "কোরআনে, পাঠকালে ছেজদা করিবার আদেশ সর্বপ্রথমে ছুরা 'নাজমে' প্রদত্ত হয়। তিনি বলেন, (এই ছুরা পাঠান্তে) হযরত ছেজদা করিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন, তাঁহারাও করিলেন। কিন্তু আমি একজন লোক (উমাইয়া-বেন-খলফ)-কে দেখিলাম ..........."**** আবদুল্লাহ বেন মাছউদ যে কেবল সমসাময়িক ছাহাবী ও ঘটনার সহিত সংসৃষ্ট, তাহা নহে, বরং তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। একজন ঘটনার সহিত সংস্রব-সম্পন্ন ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে সেই ঘটনা বোখারী ও মোছলেমের ন্যায় হাদীছের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে কিন্তু শয়তানের ও তাহার উদ্ভাবিত কাণ্ডকারখানার সামান্য একটু আভাসও নাই। অতএব আলোচ্য বিবরণটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা বোখারী ও মোছলেমের যে দুইটি হাদীছের উল্লেখ করিলাম, তাহার প্রথমটিতে فسجد من كان معه (যাঁহারা হযরতের সঙ্গে ছিলেন তাঁহারাও ছেজদা করিলেন) এবং দ্বিতীয়টিতে وسجد من كان خلفه (এবং তাঁহার পশ্চাতে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও ছেজদা করিলেন) এরূপ বর্ণিত আছে।

এই দুইটি হদীছে 'পৌত্তলিক কোরেশগণও ছেজদা করিল' এ কথার একেবারেই উল্লেখ নাই।

৪। ইমাম বোখারী ছুরা 'নাজমের' তফছির প্রসঙ্গে আর একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হাদীছটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :

---

* নাছাই ও আবুদাউদেও এই রেওয়ায়ত আছে।

** মেশকাত—ছেজদা তেলাওত

*** তাবরী, এবনহেশাম প্রভৃতি। **** ৯০—১৫০

'একরামা বলেন, এবন-আব্বাছ বলিয়াছেন—ছুরা 'নাজ্‌ম' পাঠান্তে হযরত ছেজদা করিলেন, এবং মুছলমানগণ, মোশরেকগণ এবং সমস্ত দানব (জেন্) ও মানব তাঁহার সঙ্গে ছেজদা করিল।'

এই রেওয়ায়ৎ সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে। এস্থলে পাঠকগণ এইটুকু দেখিয়া রাখুন যে, অবিশ্বাস্য বিবরণসমূহ এই এবনে-আব্বাছের প্রমুখাৎ লাৎ-ওজ্জার গল্পটি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বোখারীতে সেই এবন-আব্বাছের বর্ণনায় ঐ উপকথাটির নামগন্ধও নাই। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, গল্পটি অতি জঘন্য মিথ্যা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই বর্ণনায় এবনে-আব্বাছ বলিতেছেন যে, হযরতের সঙ্গে 'মুছলমানগণ, পৌত্তলিকগণ এবং দানব ও মানব সকলেই' ছেজদা করিল। কিন্তু সূত্রের অন্য রাবীগণ এবন-আব্বাছের নাম করেন নাই। এই দোষ খণ্ডনার্থে আগ্রহান্বিত হইয়া হাফেজ এবনে-হাজর নিজেই এছমাইলের যে রেওয়ায়ৎ দিয়াছেন, তাহাতে পৌত্তলিকদের ছেজদা করার কথা নাই। ইহা ব্যতীত এই বিবরণের ভাষাও লক্ষ্য করার বিষয়। হযরতের ছেজদা করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার উপস্থিত সমস্ত মুছলমান ও মোশরেক ছেজদা করিল, ইহা বুঝিলাম। জেনদিগকে জিজ্ঞাসা করার কোন উপায় নাই, কাজেই তাহাও না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু পুনরায় 'সমস্ত মানব ছেজদা করিল' এ-কথার তাৎপর্য একেবারেই অবোধগম্য।

## মূল রাবী একরামা

ইহা ব্যতীত এই বিবরণটির সত্য-মিথ্যা একরামার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। ইমাম বোখারী মধ্যে মধ্যে এই একরামার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা 'রেজাল' শাস্ত্রে তাঁহার সম্বন্ধে অতি কঠোর সমালোচনা দেখিতে পাইতেছি। ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ-বেন-হাম্বল এবং হাদীছ ও রেজালের অন্যান্য বহু ইমাম তাঁহাকে অতিরঞ্জনকারী, মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাস্য, বিপরীত ধর্মবিশ্বাসবিশিষ্ট, লোভী, অসাধু প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। ইনি এবনে-আব্বাছের নামে মিথ্যা করিয়া হাদীছ বর্ণনা করেন বলিয়া, তাঁহার (এবনে-আব্বাছের) পুত্র আলী তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ-বেন-হারেছ বলিতেছেন, আমি একদা তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া প্রতিবাদ করিলে, আলী উত্তর করিলেন যে, এই 'খবিছ'টা আমার পিতার নাম করিয়া মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকে * সুতরাং 'মোশরেকগণের এবং দানব ও মানবের' ছেজদা করার পর যে কতদূর বিশ্বাস্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশ্বাস্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও উহা এবন-আব্বাছের সূত্রহীন বর্ণনা বা প্রমাণহীন বিশ্বাস মাত্র। এ সমস্ত ছাড়িয়া দিলেও, কোরআন শরীফ পাঠকালে হযরতের মুখ হইতে লাৎ, ওজ্জা ও মানাতের স্তুতিবাচক পদগুলি বাহির হইবার কোন প্রসঙ্গই এই বিবরণে নাই।

## আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য

৫। ইমাম 'নাছাই' তাঁহার বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থে মোত্তালেব নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমুখাৎ এই হাদীছটি রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন ঃ

'মোত্তালেব বলেন, হযরত মক্কায় ছুরা 'নাজম' পাঠ করিয়া ছেজদা করিলেন এবং তাঁহার নিকটে যাহারা ছিল—তাহারাও ছেজদা করিল। তবে আমি ছেজদা করি নাই। —মোত্তালেব তখনও মুছলমান হন নাই।'**

স্বয়ং এবনে-হাজর এই হাদীছের (এছনাদ) পরম্পরাকে বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।***

---

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য মীজান ২—১৮৭, ৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

** নাছায়ীর ছেজদা—১৬১।

*** ফৎহুলবারী ২০—৩৩০।

ছেহা ছেত্তার অন্তর্ভুক্ত নাছাই কর্তৃক বর্ণিত, সমসাময়িক ও প্রত্যক্ষদর্শী বিরুদ্ধ ছাহাবীর বর্ণনায় মোশরেকদিগের ছেজদা করা বা 'শয়তানী কাণ্ডের' কোন আভাস নাই। ইহাতে এক বিন্দু সত্য নিহিত থাকিলে, রাবী মোত্তালেব তাহা বর্ণনা করিতেন। এই বিবরণে আরও জানা যাইতেছে যে, সমস্ত মোশরেকগণের ছেজদা করার বিবরণও ঠিক নহে। কারণ এই রাবী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ছেজদা করেন নাই. তিনি ব্যতীত আরও অনেকে যে ছেজদা করেন নাই, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

## স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা

৬। যে সকল ঐতিহাসিক আলোচ্য বিবরণটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্-এবন-মাছউদ প্রথমদলের সঙ্গে আবিসিনিয়ায় গমন করিয়াছিলেন এবং "কোরেশদিগের মুছলমান হওয়ার সংবাদ শুনিয়া" তিনি ও অন্য কয়েকজন মুছলমান মক্কায় চলিয়া আসেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য এবং তাঁহাদিগের স্বীকৃত।

এখন বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ ও নাছাই কর্তৃক বর্ণিত ঐ আবদুল্লাহ্-এবন-মাছউদের হাদীছটির সঙ্গে এই বর্ণনাটি একত্র করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে, প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে,—তাবরী ও এবনে-ছাআদ প্রভৃতি কর্তৃক বর্ণিত—

(ক) কাফেরদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য হযরতের ব্যগ্রতা—

(খ) তজ্জন্য কোরআনের ছুরা 'নাজ্‌ম' পাঠকালে, কোরেশদিগের দেব-দেবিগণের প্রশংসা ও স্তুতিমূলক দুইটি জাল আয়ৎ তাহাতে পুরিয়া দেওয়া, বা শয়তান কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া পুরিয়া দিতে বাধ্য হওয়া,—

(গ) তজ্জন্য হযরতের ছেজদাকালে মোশরেক কোরেশগণের সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছেজদা করা,—

(ঘ) এই ছেজদা করার জন্য 'কোরেশগণ মুছলমান হইয়াছে' বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়া,—

(ঙ) এবং সেই সংবাদ শুনিয়া কতিপয় মুছলমানের আবিসিনিয়া হইতে মক্কায় আগমন করা ;—

এই পাঁচটি দফাই স্বয়ং-সিদ্ধরূপে ভিত্তিহীন। কারণ আমরা দেখিতেছি যে, আবদুল্লাহ্-বেন-মাছউদ ও তাঁহার সহযাত্রিগণের আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এই ছিজদার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। নচেৎ আবদুল্লাহ্-বেন-মাছউদ সেস্থানে কিরূপে উপস্থিত থাকিতে পারেন ? অতএব, তাঁহাদের আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে ছেজদার ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং তজ্জনিত কোরেশদিগের মুছলমান হওয়ার সংবাদ রটিয়া যাওয়া, আর সেই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের আবিসিনিয়া হইতে মক্কায় প্রত্যাগমন করার গল্পটা একেবারে মাঠে মারা যাইতেছে ! তর্কের খাতিরে বড় জোর এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আবিসিনিয়া যাত্রার পূর্বে এই ছেজদার ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু উপরের বর্ণিত ঐতিহাসিকগণ নিজেদের স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে এ-কথা বলিতে পারেন না। পক্ষান্তরে ইহা দ্বারাও আলোচ্য বিবরণটির ভিত্তিহীনতাই প্রতিপন্ন হইবে। কারণ আবিসিনিয়া যাত্রার পূর্বেই যদি এই ছেজদার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে 'হযরতের সহিত কোরেশদিগের ছেজদা করা ও তজ্জন্য তাহাদিগের মুছলমান হওয়ার সংবাদ প্রবাসী মুছলমানদিগের গোচরীভূত হওয়া এবং এই সংবাদ অবগত হওয়ার পর তাঁহাদিগের প্রত্যাবর্তন করার' গল্প নিশ্চয়ই মিথ্যা।

৭। বোখারী কর্তৃক উল্লিখিত একরামার বর্ণনায় এবং এবন-ছাআদ ও তাবরী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, ছেজদার ঘটনাস্থলে উপস্থিত সমস্ত পৌত্তলিক হযরতের ও মুছলমানদিগের ছেজদার সময় ছেজদা করিয়াছিল। একরামার বর্ণনা যে কতটা বিশ্বাস্য, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। রাবী-পরম্পরার বা ছনদের বিচার-নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল বৃত্তান্ত (facts) দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে, এ কথাটা ঠিক নহে। কারণ, মোত্তালেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ছেজদা করেন নাই, নাছাই এক ছহী হাদীছে তাঁহার প্রমুখাৎ এ-কথা বর্ণনা করিয়াছেন। উমাইয়া-বেন-খালফও ছেজদা করে নাই, তাহাও আমরা এবনে-মাছউদের হাদীছে দেখিয়াছি। ইহা ব্যতীত অলীদ-বেন-মুগিরা, ছইদ-বেন-আছ, আবু-লাহব প্রভৃতিও ছেজদা করেন নাই বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।* সুতরাং কোরেশগণ সকলেই ছেজদা করিয়াছিল, এ-কথা নির্ভুল বা অনতিরঞ্জিত নহে।

উমাইয়া না-কি অতি বৃদ্ধ হওয়ায় ছেজদা করার শক্তি তাহার ছিল না, তাই সে ছেজদা করে নাই! অথচ এই শক্তিহীন বৃদ্ধটি বদর সমরে উপস্থিত হইয়া মুছলমানদিগের সহিত পুরাদস্তুর যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিল। এই উমাইয়া আফলাহ্ নামক বলিষ্ঠ যুবকের উপর স্বহস্তে অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে মৃতবৎ অবস্থায় পরিণত করিয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের কথকগণ অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া এইরূপ এক-একটা মন্তব্য প্রকাশ করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন না।

৮। উল্লিখিত ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি বিবরণে জানা যায় যে, একদিন হযরত কা'বায় নামায পড়িতেছিলেন। নামাযে ছুরা 'নাজম' পাঠ করার সময়ই শয়তান তাঁহার মুখে ঐ পদ দুইটি ঢুকাইয়া দেয়! কিন্তু ইতিহাস একবাক্যে ও অকাট্যরূপে সাক্ষ্য দিতেছে যে, হযরত ওমর মুছলমান না হওয়া পর্যন্ত হযরত বা মুছলমানগণ কা'বা ত দূরের কথা, কোন প্রকাশ্যস্থলে নামায পড়িতে পারিতেন না। হযরত ওমর মুছলমান হওয়ার পর, তাঁহার অনুরোধ ও উৎসাহ মতে, হযরত আরকামের বাটী হইতে বাহির হইয়া সর্বপ্রথম কা'বাগৃহে আগমন ও নামায সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আবিসিনিয়া হইতে প্রথম যাত্রীদলের প্রত্যাবর্তন নবুয়তের ৫ম বর্ষের শাওয়াল মাসে ঘটিয়াছিল। আর হযরত ওমর সর্ববাদী-সম্মত মতে উহার ৬ষ্ঠ সনে এছলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং আমরা এই হিসাবে দেখিতেছি যে, ঐ বর্ণনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। পক্ষান্তরে, তর্কস্থলে ঐ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, উহা নামাযের ঘটনা বলিয়া স্বীকার করার সঙ্গে ঐ বিবরণটির ভিত্তিহীনতা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতিপন্ন হয়। কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত ঐ নামাযের মধ্যেই 'ছুরা নাজমের' তেলাঅৎ শেষ করিয়াছিলেন। অতএব লাৎ, ওজ্জা প্রভৃতির অক্ষমতা ও অকিঞ্চিৎকরতামূলক (প্রথম আয়তের অব্যবহিত পরবর্তী) আয়তগুলিও একই সঙ্গে ও একই সময়ে পঠিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রথমে কোরেশদিগের সন্তুষ্ট হওয়া এবং পরে (অন্ততঃ একদিন অন্তে) হযরত কর্তৃক পরবর্তী আয়তগুলি প্রচারিত হওয়ায় পুনরায় তাহাদিগের ক্রোধান্বিত হওয়ার কোন তাৎপর্যই থাকে না। কারণ নিন্দামূলক অংশটি ত, তাহারা ছেজদার পূর্বেই শুনিয়াছিল। সুতরাং এই আজগুবী অনৈতিহাসিক ও অনৈছলামিক গল্প-গুজবগুলি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

---

* দেখুন—ফৎহুলবারী ২৩—৩৫১ ; তবরী, এবনে-ছাআদ প্রভৃতি

# একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## মুছলমান লেখকগণের অবহেলা
## মিঃ আমীর আলীর মন্তব্য

এই আলোচনা দীর্ঘসূত্র হইবে, ইহা আমরা পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। পাঠককে আনন্দ দান করার জন্য লেখনী ধারণ ঔপন্যাসিকের কর্তব্য হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকের কাজ সত্যের উদ্ধার করা। বিশেষতঃ যখন একজন মুছলমান, হযরতের জীবনী রচনা করার জন্য লেখনী ধারণ করিবেন, তখন তাঁহার পক্ষে বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গটির গুরুত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধ হওয়া উচিত। আমাদিগের কতিপয় লেখক ও কথকের অসতর্কতা ও অজ্ঞতার ফলে, খ্রীষ্টান জগৎ এই ব্যাপার লইয়া আকাশ-পাতাল আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। উহার মূলে যে একবিন্দু সত্যও নিহিত নাই, উহা যে একেবারে মিথ্যা উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং মূলে উহা যে এছলামের কোন গুপ্তশত্রু কর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল, তাহা আজকালকার যুক্তি-তর্কের হিসাবে সপ্রমাণ করা হযরতের জীবন-চরিত লেখকের প্রধানতম কর্তব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের আধুনিক লেখকগণও এদিকে যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করেন নাই। সর্বপ্রথমে স্যার ছৈয়দ আহমদ মরহুম তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-একটা কথা বলিয়া এই আলোচনার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আর কেহ সে দিকে সম্যক মনোযোগ প্রদান করেন নাই। শিক্ষিত মুছলমান সমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ জনৈক প্রতিভাশালী ও অভিজ্ঞ লেখক,* ষ্টানলি লেন-পুলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই নিজের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। তিনি কোরেশদিগের দুর্ধর্ষতা ও অত্যাচারাদির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ইহার ফলে "What wonder that a momentary thought crossed his mind to end the conflict by making a slight concession to the bigotry of his enemies." অর্থাৎ, শত্রুপক্ষের সহিত সংঘর্ষের নিবৃত্তি করার উদ্দেশ্যে তাহাদের গোঁড়ামীর একটু 'রেয়াত' করার চিন্তা যদি সাময়িকভাবে তাঁহার মনে আসিয়া গিয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্যের কথা কি আছে?

আমরা শ্রদ্ধাস্পদ লেখকের এই উক্তির কঠোর প্রতিবাদ করিতেছি। বর্ণনাকারিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বড় সহজ কথা নহে। প্রকৃতপক্ষে উহা হযরতের চরিত্রের প্রতি অতি কঠোর, অতি জঘন্য এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষারোপ। হযরত নিজের চিত্তের দুর্বলতা-হেতু সত্য প্রচারে কুণ্ঠিত হইয়া, স্বেচ্ছায় হউক আর শয়তানের প্ররোচনায় হউক, খোদার বাণীতে প্রতিমা পূজার সমর্থন ও কোরেশদিগের দেব-দেবিগণের মহিমা-মূলক দুইটি আয়ৎ ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন—ইহাই হইতেছে এই উপকথাগুলির স্পষ্ট ও অনাবিল অর্থ। তাই পাশ্চাত্য লেখকেরা "have rejoiced greatly over Mohammod's fall—"** "মোহাম্মদের 'পতনে' অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।"

লেখক স্বয়ং কিছু না বলিয়া পাশ্চাত্য লেখকগণ কর্তৃক আরোপিত অপবাদ খণ্ডনের জন্য মিঃ লেন-পুলের যে উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সমস্ত বিবরণের—এমন কি মিথ্যা তাহি বর্ণনা পর্যন্ত—সমস্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তবে তিনি বলিতেছেন, ইহা সদুদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ইহা মোহাম্মদের জীবনের একমাত্র পদস্খলন। (তিনি বলেন,) হযরত যদি জীবনে একবার মাত্র insincere (কপট) হইয়া থাকেন—কেই-বা হন না ?—তাহার পর তিনি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুতাপ করিতেছিলেন—ইত্যাদি। মিঃ আমীর আলী নিজের সমর্থনের জন্য এই কথাগুলি যে কিরূপে উদ্ধৃত করিলেন,

---

* আমীর আলী Spirit of Islam P. E. ৩২ পৃষ্ঠা।

** মিঃ আমীর আলী কর্তৃক উদ্ধৃত লেন-পুলের উক্তি।

তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ঐ উক্তিটি উদ্ধৃত করায়, অধিক ক্ষতিই হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

## শিবলীর আলোচনা

মাওলানা শিবলী মরহুম,* তাঁহার ছিরাতের মাত্র ১০/১২টি ছত্রে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার কয়েকটা উক্তি উদ্ধৃত করতঃ আলোচ্য বিবরণ সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান মোহাদ্দেছের নাম উল্লেখ করিয়াই এই বিষয়টির আলোচনা শেষ করিয়াছেন। তাহার পর (حقیقت یہ ہے) 'প্রকৃত কথা এই যে' বলিয়া কতকগুলি "হইয়া থাকিবে" "করিয়া থাকিবে" ইত্যাকার কথার দ্বারা সংক্ষেপে আলোচনাটির পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাতেও নানা প্রকার গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে। যেমন, 'নামাজের সময় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল,' ইহাকেই সকল ইতিহাসের বিভিন্ন বিবরণের একমাত্র সত্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, অথচ ইহা অতি অল্পসংখ্যক রেওয়ায়তের বর্ণনা। ইমাম নবরী, কাজী আয়াজের যে মত মোছলেমের টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ইমাম নববীর মত বলিয়া উক্ত হইয়াছে—ইত্যাদি। তবে অন্য কোন খণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে কিনা, অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রকাশিত না হইলে তাহা বলা যাইতে পারে না।

এই সকল অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ লইয়া বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। এই আলোচনায় কতটুকু কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছি, অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

## ধর্মের দিক দিয়া আলোচনা

এ সম্বন্ধে যুক্তির হিসাবে আমাদের বক্তব্য এখানে শেষ করিয়া, এখন আমরা ধর্মের দিক দিয়া এই বিবরণটির বিচার করিব। অমুছলমান পাঠকের নিকট এই আলোচনার বিশেষ কোন মূল্য হইবে না বটে, কিন্তু মুছলমানের পক্ষে তাহা জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ইহা দ্বারা যে কেবল আলোচ্য প্রসঙ্গটির মীমাংসা হইবে তাহাই নহে, বরং ইহা দ্বারা Principle নীতির হিসাবে একটা আবশ্যকীয় তথ্য, সকলের গোচরীভূত হইয়া যাইবে। এখানে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতেছি যে, পূর্ববর্তী বহু মুছলমান আলেম ধর্মের দিক দিয়া এই বিবরণটির অসত্যতা বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ইমাম ফাখরুদ্দিন রাজী, মহাত্মা কাজী আয়াজ, ইমাম বায়হাকী, ইমাম গাজালী প্রভৃতি আলেমগণের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম ফাখরুদ্দিন রাজী তাঁহার তফছিরে বলিতেছেন ঃ

هذه رواية عامة المفسرين الظاهريين — اما اهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول

## রাজীর মত

"ইহা বাহ্যদর্শী" সাধারণ তফছিরকারদিগের বর্ণনা। কিন্তু যাঁহারা সত্যমিথ্যা পরীক্ষা (তাহকিক) করিয়া থাকেন, এইরূপ আলেমগণ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, এই বিবরণটি কল্পিত মিথ্যা কথা মাত্র। তাঁহারা কোরআন, হাদীছ ও যুক্তির দ্বারা নিজেদের কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন।**

---

* ছিরত ১—১৭৬, ৭৭ পৃষ্ঠা।

** কবীর, ১৭ পারা, ছুরা হজ্ব ২৪৪—৫১ পৃষ্ঠা

আল্লামা আলাউদ্দিন (খাজেন) তাঁহার তফছিরে বলিতেছেন ঃ

انه لم يروها احد من اهل الصحة ولا اسندها ثقة بسند صحيح او سليم متصل وانما رواها المفسرون والمورخون المولعون بكل غريب، الملتقطون من الصحف كل صحيح وسقيم

## খাজেনের মত

"কোন বিশ্বস্ত রাবী কর্তৃক বা বিশ্বাস্য কিংবা অভগ্ন পরম্পরার দ্বারা এই বিবরণটি বর্ণিত হয় নাই। কেবল সেই সকল ইতিবৃত্তলেখক ও তফছিরকার—যাঁহারা প্রত্যেক আজগুবী কথা সন্নিবেশিত করার জন্য সদাই লালায়িত, যাঁহারা অন্যের পুস্তক হইতে প্রকৃত-অপ্রকৃত সমস্তই গ্রহণ করিয়া থাকেন—তাঁহারাই এই গল্পটির উল্লেখ করিয়াছেন।"

## এবনে খোজায়মার মত

মোহাদ্দেছ এবন-খোজায়মাকে এই বিবরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন যে—هذا من وضع الزنادقة ইহা জিন্দিক-(ছদ্মবেশী অগ্নিউপাসক)-দিগের রচনা মাত্র। উক্ত মোহাদ্দেছ একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়া এই বিবরণের ভিত্তিহীনতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

## বায়হাকীর অভিমত

ইমাম বায়হাক্বী বলিয়াছেন যে, রেওয়ায়াতের হিসাবে এই বিবরণটির কোন ভিত্তি নাই; তিনি এই গল্পের রাবীদিগের সমালোচনা করিয়া তাহাদিগের দোষ দেখাইয়াছেন।

## কাজী আয়াজের অভিমত

মহাত্মা কাজী আয়াজ বলিতেছেন ঃ

اما ما يرويه الاخباريون والمفسرون ان سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على الهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شئ لا من جهة النقل ولا من جهة العقل

ছুরা 'নাজম' পাঠকালে মোশরেকগণের দেব-দেবীর প্রশংসা হযরতের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া, গল্পলেখক, তফছিরকারেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনই ভিত্তি নাই। ইতিহাসের হিসাবেও নহে, যুক্তির হিসাবেও নহে।

## ইমাম এবনে হাজমের অভিমত

সুনামখ্যাত ইমাম এবনে হাজম বলিতেছেন ঃ

واما الحديث الذى فيه وانهن الغرانيق العلى ......

فكذب بحت موضوع لانه لم يصح قط من طريق النقل -

অর্থাৎ আলোচ্য হাদীছটি নিছক মিথ্যা ও জাল। রেওয়ায়াতের হিসাবে ইহা কোন মতেই ছহী বলিয়া প্রমাণিত হয় না। (দেখুন, মেলাল, ৪—২৩ পৃষ্ঠা)।

## ইমাম গাজালীর অভিমত

ইমাম গাজালী বলিতেছেন ঃ

فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الاجمال ان هذه القصة موضوعة - وقد قيل ان هذه القصة من وضع الزنادقة لا اصل لها

এই সকল কারণে সংক্ষেপে আমরা জানিতে পারিলাম যে, এই গল্পটি কল্পিত মিথ্যা কথা। ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'জিন্দিক'দিগের রচনা, ইহার কোন ভিত্তি নাই। (মাওয়াহেব)

যাঁহারা যুক্তির মর্যাদা না করিয়া 'উক্তির' পূজা করেন, তাঁহাদিগের ব্যাকুলতা নিবারণ করার জন্য, এই উক্তিগুলি উদ্ধৃত হইল * ধর্মের হিসাবেও যে মুছলমান এই বিবরণের সত্যতা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারে না, উল্লিখিত আলেমগণ তৎপ্রতিপাদনার্থে নানা প্রকার প্রমাণ দিয়াছেন। আমরা নিম্নে মোটের উপর তাহার কতকটা সার সংগ্রহ দিবার চেষ্টা করিব।

## শাস্ত্রীয় প্রমাণ

১। ইহা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা, কারণ ইহা কোরআনের বিপরীত। কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়তে বলা হইয়াছে যে—

(ক) 'আল্লাহ্ কোরআন নাজেল করিয়াছেন এবং তিনিই তাহার 'হেফাজত' করেন।' পরিবর্জনের ন্যায় পরিবর্ধনও দোষ। এই গল্প সত্য হইলে আল্লাহর হেফাজত আর থাকে না।

(খ) (মোহাম্মদ) নিজের ইচ্ছামত বলেন না, বরং উহা প্রেরিত বাণী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(গ) 'হে মোহাম্মদ ! তুমি যদি নিজের পক্ষ হইতে (কোরআনের) কিছু (মিশ্রিত করিয়া) বলিতে, তাহা হইলে ভীষণ দণ্ড সহ আমি তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিতাম।'

(ঘ) 'সম্মুখ ও পশ্চাৎ কোন দিক হইতে (কোরআনে) মিথ্যা স্পর্শিতে পারে না ; উহা মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রেরিত।'

(ঙ) 'আমার (আল্লাহর) বান্দাদিগের উপর শয়তানের কোন হাত নাই', 'মোমেনদিগের উপর শয়তানের কোন অধিকার নাই।'

(চ) ঐ ছুরা 'নাজমে'র প্রথমেই বলা হইয়াছে—'তোমাদিগের বন্ধু (মোহাম্মদ) ভ্রষ্টও হন নাই, ভ্রমও করেন নাই, এবং তিনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে কথা কহেন না, উহা তাঁহার প্রতি প্রেরিত বাণী বই নহে ; পরম-শক্তিশালী উহা তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।'

এইরূপ বহু আয়তের উল্লেখ করিয়া আমাদিগের আলেমগণ বলিতেছেন যে, হযরতের পক্ষে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বা শয়তানের প্ররোচনায় কোরআনের কোন অংশের পরিবর্জন, পরিবর্ধন এবং পরিবর্তন অসম্ভব।

২। কোন বোতের প্রশংসা বা তাহাতে কোন শক্তির আরোপ করা শের্ক ও কোফর। ইহার প্রতিবাদের জন্যই হযরত আসিয়াছিলেন। হযরত পৌত্তলিকতার সহায়তা করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলেও পাপ হয়।

৩। যদি হযরতের উপর শয়তানের এতদূর অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কোরআনের ও এছলামের সমস্ত কার্যে শয়তানের প্রভাব বিদ্যমান থাকার সম্ভবপরতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে ধর্মকর্ম সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে।

আমাদিগের এক শ্রেণীর লেখক ইতিহাস, তফছির ও হযরতের জীবনী লিখিবার সময় কিরূপ অসতর্কতা ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই লেখার ফলে বিধর্মী লেখকগণ কোরআন, এছলাম ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার চরিত্রের উপর কিরূপ মারাত্মক ও জঘন্য দোষারোপ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, এই আলোচনার দ্বারা তাহারও সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অথচ এই শ্রেণীর লেখকগণের বর্ণিত উপকথা মাত্রই, আজকালকার মুছলমানের নিকট সাধারণভাবে এছলাম ও এছলামের ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, আজ পর্যন্ত এছলাম বা হযরতের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ দিয়া যত প্রকার সংশয় উপস্থিত করা হইয়াছে, ইহারাই তাহার জন্য একমাত্র দায়ী।

* শেফা, বায়জাভী, হাল্বী প্রভৃতি দেখুন

এখন আমরা বিবরণটির মূল ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 'মক্কার কোরেশগণ এছলাম গ্রহণ করিয়াছে' এই সংবাদ শুনিয়া আবিসিনিয়া প্রবাসী কতিপয় মুছলমান মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন—কোন সমসাময়িক সাক্ষী বা ঘটনার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোন লোকই এ কথা বলেন নাই। বরং এবনে-মাছউদ ও মোত্তালেব প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে ইহার বিপরীত কথাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমরা যদি তর্কের খাতিরে এই হেতুবাদটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলেও আলোচ্য মূল বিবরণটির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ-সংস্রব থাকা প্রমাণিত হয় না। কোরেশ-প্রধানগণ, প্রবাসী মুছলমানদিগকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনার জন্য কিরূপ ষড়যন্ত্র ও কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। আবিসিনিয়ার রাজদরবার হইতে কোরেশ প্রতিনিধিগণের অকৃতকার্য ও অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসার পর, তাহাদিগের ক্রোধ ও ক্ষোভ যে অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, সমস্ত ইতিহাসেই তাহার প্রমাণ আছে, ঐরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তাহারা ইহার পর অত্যাচার ও শত্রুতা সাধনের সমস্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সুবোধ গোপাল হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না, মুছলমানদিগকে কোন গতিকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ তাহাদের মনে নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রবল ছিল। এ অবস্থায় তাহাদিগের পক্ষে ঐ সঙ্কল্প সিদ্ধ করার কি উপায় সম্ভবপর হইতে পারে ? প্রবাসিগণ তাহাদিগের কথায় ফিরিয়া আসিবে না, নাজ্জাশীর নিকট দরবার করাও বিফল হইয়া গিয়াছে, বলপূর্বক তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার শক্তিও কোরেশদিগের ছিল না, অথচ প্রবাসীদিগকে ফিরাইয়া পাওয়ার এবং নিজেদের ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান ও অপমানের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য তাহারা ব্যাকুল। এ অবস্থায় ছল ও প্রবঞ্চনার সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত তাহাদের পক্ষে উপায়ান্তর ছিল না। তাহারা তাহাই করিল এবং আবিসিনিয়ায় সংবাদ রটাইয়া দিল যে, 'মোহাম্মদের সহিত কোরেশের সমস্ত বিসংবাদ মিটিয়া গিয়াছে, কোরেশগণ মুছলমান হইয়াছে।' এই সংবাদ শুনিয়া তাহার সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই কয়েকজন প্রবাসী মক্কায় আসেন। ইহা এক সময়ের একটি স্বতন্ত্র ঘটনা।

অন্য এক সময়ে, আবিসিনিয়ায় প্রথম যাত্রার পূর্বে, প্রবাসিগণের প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পর,—হযরত ছুরা 'নাজম' পাঠ করিয়াছিলেন। হযরতের মুখে افرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى 'তোমরা কি লগণা লাৎ, ওজ্জা এবং তাহাদের তৃতীয় মানাতে মনোবহিত পূর্বে বর্ণিত আল্লাহর মহিমার কোন অংশ) দেখিতে পাইয়াছ ?' এই তুলনামূলক যুক্তিপূর্ণ ও তাহাদিগের দেবিগণের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদক আয়তগুলি শ্রবণ করিয়া উপস্থিত পৌত্তলিকগণ বিচলিত হইয়া পড়িল। কোরআন পাঠকালে গণ্ডগোল করা এবং আল্লাহর নাম উচ্চারিত হওয়ার সময় নিজেদের দেব দেবীদিগের নাম করিয়া হৈ-চৈ করা তাহাদের অভ্যাস ছিল * তাহারা তখন মনে করিল, না জানি মোহাম্মদ আমাদিগের দেব-দেবীদিগের বিরুদ্ধে আরও কত কি বলিবেন। এই আশঙ্কায় চিরাচরিত অভ্যাস মত তাহারা পূর্ববর্তী আয়তের সঙ্গে সঙ্গে تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى। তাহারা মহিমান্বিত দেব-দেবী……) এই বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহার পর হযরত যখন ছুরার শেষ অংশ—যাহাতে আল্লাহর নামে প্রণিপাত করার আদেশ আছে পাঠ করিয়া ছেজদা করিলেন, তখন প্রতিবাদস্বরূপ কোরেশগণও নিজেদের দেব-দেবীর নাম করিয়া ছেজদা করিল, ইহাও অন্য এক সময়ের একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। বিভিন্ন সময়ের এই দুইটি বিভিন্ন ঘটনাকে এক সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া এই অনর্থের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

---

* কোরআনে ইহার অনেক প্রমাণ আছে ৫—১৭ : ১৪—১৮ প্রভৃতি।

তাবরী প্রভৃতি ইতিবৃত্তকার ও তফছির লেখকগণ যে সকল বিবরণ দিয়াছেন, তাহার কতকগুলি দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, হযরত কা'বার মছজিদে নামায পড়িয়াছিলেন এবং এই নামাযেই ছুরা 'নাজ্‌ম' পাঠ করার পর তিনি ছেজদা করেন। এই ঐতিহাসিকগণ নিজ মুখে বলিতেছেন এবং হাদীছ দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে,* কোরেশ প্রতিনিধিগণের প্রত্যাবর্তনের পরে হযরত ওমর এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবুয়তের পঞ্চম সনের শাওয়াল মাসে তাঁহারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।** ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমরের এছলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত হযরত বা মুছলমানগণ কা'বা ও তাহার নিকটে নামায পড়িতে পারিতেন না।*** এই স্বীকৃত বিষয়গুলি একত্রে আলোচনা করিয়া দেখিলে, আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব যে, আবিসিনিয়া-প্রবাসী মুছলমানদিগের প্রত্যাবর্তনের বহুদিন (অন্ততঃ ৪/৫ মাস) পরে হযরত একদিন ছুরা 'নাজ্‌ম' পাঠ ও তদন্তে ছেজদা করিয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনার মধ্যে পরস্পর যে কোনই সম্বন্ধ-সংস্রব নাই, সময়ের হিসাব ও তথায় এবনে-মাছউদের উপস্থিতি দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে।

## মূলের ভুল

এই গল্পটির মূলে একটা খুব বড় রকমের ভ্রান্ত ধারণা লুকাইয়া আছে। সংক্ষেপে তাহারও একটু আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ছুরা হজ্জে একটি আয়ৎ আছে ঃ

وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته ج فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته ـ والله عليم حكيم

অর্থাৎ—"তোমার পূর্বে (হে মোহাম্মদ!) যে কোন রছুল বা নবীকে আমি প্রেরণ করিয়াছি (তাহাদের সকলের অবস্থা এই যে) যখন তাহাদের কেহ (নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের) সঙ্কল্প করিয়াছে, অমনি শয়তান তাহার (সেই) ইচ্ছায় (বা কল্পনায়, দুষ্ট লোকদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া) বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। অপিচ আল্লাহ্ শয়তানের প্ররোচনাকে বাতিল করেন এবং নিজের আয়ৎ (প্রমাণ বা চিহ্ন)-গুলিকে বলবৎ করেন, আল্লাহ্ জ্ঞান-বিজ্ঞানময়।" অন্য পক্ষ ইহার এইরূপ অর্থ করিবেন—"(হে মোহাম্মদ!) তোমার পূর্বে যে কোন রছুল বা নবী আসিয়াছেন, তিনি যখন (আল্লাহ্‌র কেতাব) পাঠ করিয়াছেন, তখন শয়তান তাঁহার আবৃত্তিতে (নিজেদের কথা) ঢুকাইয়া দিয়াছে।"

আয়তের উল্লিখিত তামান্না تمنى শব্দের অর্থ লইয়াই যত গোল বাধিয়াছে। ঐ গল্প রচয়িতা তফছিরকারগণ উহার অর্থ করিয়াছেন, "পাঠ করিত।" এই তামান্না শব্দের অর্থ পাঠ করা হইতে পারে কি-না, তাহা লইয়া আমরা দীর্ঘ তর্কে প্রবৃত্ত হইব না। কোন কোন গ্রন্থকার কবিবর হাচ্ছানের কবিতা হইতে একটি পদ**** উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'তামান্না' শব্দের পাঠ করা অর্থ হইতে পারে। সে যাহা হউক, আমরা হাচ্ছানের ঐ কবিতার জওয়াবে আল্লাহ্‌র কোর্‌আনকে পেশ করিতেছি। কোর্‌আনে 'তামান্না' বা তাহার ধাতু হইতে সম্পন্ন ক্রিয়া বা বিশেষ্য পদ—আমরা যতটা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি—বারটি বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি স্থান ব্যতীত অন্য কুত্রাপি উহার 'পাঠ করা' অর্থ গ্রহণ সম্ভবপরই নহে। যেমন ঃ—

---

* তাবরী ২—২২৫ ; আহমদ, তিরমিজী ।

** তাবকাৎ ২—১৩৮।

*** কামেল ২—৩১।

**** এই শ্রেণীর অনেক কবিতাই পরবর্তী লোকদিগের রচিত। ঐতিহাসিক ও বাদশাহ্‌গণের ফরমাইশ মতে, পরবর্তী কবিগণ, প্রথম যুগের ঘটনাগুলিকে পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এবনে-এছহাক প্রভৃতি উদ্ধৃত বহু কবিতাই এই জন্য অবিশ্বাস্য। ভূমিকা দেখুন।

(١) ام للانسان ما تمنى ؟ (نجم ٥ - ٢٧)

(٢) ولقد كنتم تمنون الموت - (ال عمران - ٤ - ٥)

(٣) فتمنوا الموت ان كنتم صادقين - (الى قوله)

(٤) ولن يتمنوه ابدا - (بقرة - ١٠ - ١١)

(٥ و ٦) ليس باما نيكم ولا امانى اهل الكتاب - (نساء - ٥ - ١٥)

(٧) تلك امانيهم - قل هاتوا برهانكم - الاية - (بقرة - ١ - ١٣)

(٨) وارتبتم وغرتكم الاماني - (حديد ١٨ - ٢٧)

(٩ و ١٠) فتمنوا الموت - ولا يتمنونه ابدا - (جمعه ١١ - ٢٨)

(١١) يعدهم ويمنيهم - (نساء - ٥ - ١٥) -

(১) মানুষ যাহার আকাঙ্ক্ষা করে (কাজ না করিলে) সে কি তাহা পায় ? অর্থাৎ পায় না। ('নজম' ৫—২৭)

(২) ইহার পূর্বে ত' তোমরা মৃত্যুর 'কামনা' করিতে ! ('এমরান' ৪—৫)

(৩) যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে মৃত্যু কামনা কর.—

(৪) তাহারা কখনই তাহার কামনা করিতে পারিবে না। ('বাকারা' ১—১১ )

(৫—৬) (মুক্তি ও পারলৌকিক মঙ্গল) তোমাদিগের কামনা অথবা গ্রন্থধারীদিগের কল্পনার বা ইচ্ছার (উপর নির্ভর) করিতেছে না। (বরং উহা উভয়ের কাজের উপর নির্ভর করিতেছে)। ('নেছা' ৫—১৫ ))

(৭) এগুলি ত' তাহাদিগের (ভিত্তিহীন) অনুমান মাত্র। বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের (কথার) প্রমাণ প্রদান কর। (বাকারা ১—১৩)

(৮) তোমরা সন্দিগ্ধ হইয়াছিলে এবং 'মিছা আশার ছলনা' তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিল। ('হাদিদ' ১৮—২৭)

(৯—১০) ৩ ও ৪ নম্বরবৎ। ('জুমা' ১১—২৮)

(১১) শয়তান তাহাদিগকে ওয়াদা ও 'মিথ্যা আশা' দিয়া (প্রবঞ্চিত করিয়া) থাকে।

## আয়তের অর্থ বিকৃতি

কোরআন শরীফের উদ্ধৃত দশটি স্থানে تمنى তামান্না শব্দের অর্থ পঠন বা অধ্যয়ন কোনমতে হইতেই পারে না। কেবল নিম্নের আয়তটির অর্থে, আধুনিক তফছিরকারগণ, সাধারণতঃ পাঠ করার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আয়তটি এই ঃ

ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانى وان هم الا يظنون - (بقره - ٩٠)

"তাহাদিগের (ইহুদীদিগের) মধ্যে আর একদল নিরক্ষর লোক আছে, কতকগুলি আনুমানিক কল্পনা ব্যতীত যাহারা কেতাবের (তওরাতের) কিছুই জ্ঞাত নহে, অপিচ তাহারা কেবল অনুমানই করিয়া থাকে।" ('বাকারা' ৯—৯)

কতিপয় তফছিরকার ও আধুনিক অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন ঃ এবং তাহাদিগের মধ্যে এমন সব 'উম্মী' লোক আছে, যাহারা কেতাব জ্ঞাত নহে (অর্থাৎ দেখিয়া পড়িতে পারে না), তবে (না দেখিয়া পরের মুখে শুনিয়া) পড়িয়া থাকে, তাহারা অনুমান করে বই নহে।

'আমানীয়া', 'উমনিয়ার' বহু বচন। উহার অর্থ অনুমান, কল্পনা, যাহা তাহা একটা কিছু সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া, ইত্যাদি। পাঠ করিবার অর্থ উহার ধাতু হইতে বোধগম্য হয় না। প্রাগৈস্লামিক আরবী সাহিত্যে উহা কখনই এই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই—হইলে এবনে-জারীর,

প্রভৃতি তাহার উল্লেখ করিতেন। এই আয়তে 'অনুমান করা'কে 'পাঠ করায়' পরিণত করার সপক্ষে দুইটি প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম এই যে, তাঁহারা ছুরা হজের আয়তে ঐ তামান্না ও উমনিয়া শব্দদ্বয়ের ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন—এবং তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হযরতের কোর্‌আন পাঠকালেই শয়তান লাৎ-ওজ্জাদির প্রশংসা তাঁহার মুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু কোন তফছিরকার একটি আয়তের কোন অর্থ করিতে ভুল করিয়া থাকিলে অন্য আয়তেও যে সেই ভুল করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। তাহার পর তাঁহাদের ২য় প্রমাণ, কোন একটি আরবী কবিতায় নিম্নলিখিত পদটি সন্নিবেশিত হইয়াছে ঃ

تمنى كتاب الله اول ليلة    تمنى داؤد الزبور على الرسل

কথিত হইয়াছে যে, হযরত ওছমানের শাহাদত উপলক্ষে কবিবর হাচ্ছান যে শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত পদটি তাহা হইতে গৃহীত।* কিন্তু এবনে কাছির বলিতেছেন, উহা কা'ব-বেন মালেক কর্তৃক রচিত কবিতার অংশ।** রচনা যে কাহার তাহারই স্থির নাই। তাহার পর বিভিন্ন তফছিরে উহার বিভিন্ন পাঠ দেখিয়া উহার ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ হয়। পাঠক একটু নমুনা দেখুন ঃ

تمنى كتاب الله اول ليلة    وتمنى داؤد الزبور على الرسل
"    "    "    و آخر ها لاقى حمام المقادر
تمنى كتاب الله آخر ليلة    تمنى داؤد الكتاب على الرسل

যাহা হউক, যদি আমরা স্বীকারও করিয়া লই যে, ঐ ধাতু হইতে সম্পন্ন শব্দের অর্থ 'পাঠকরা' হইতে পারে, তাহা হইলেও উপক্রম ও উপসংহার দেখিয়া ত অর্থ করিতে হইবে। আলোচ্য আয়তের ঐরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে শয়তানের গল্পটা মাটি হইয়া যায় বটে, কিন্তু অন্য কোন দোষ ঘটে না। এবনে-জারীর তাঁহার তফছিরে*** এই আয়তে উল্লিখিত 'আমানীয়া' শব্দ সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণের যতগুলি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের সমর্থন করিতেছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই 'পঠন' বলিয়া উহার অর্থ করেন নাই।

আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, কোর্‌আন শরীফে সর্বত্রই (অন্ততঃ ১১টির মধ্যে ১০টি স্থানে) ঐ ধাতু হইতে উৎপন্ন শব্দগুলি অনুমান, কল্পনা বা তত্তুল্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, পঠনের অর্থে কুত্রাপি উহার ব্যবহার হয় নাই। প্রাগৈস্লামিক আরবী সাহিত্যেও এই অর্থে উহার ব্যবহার নাই। সুতরাং কেবল একটা ভিত্তিহীন গল্পের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ছুরা হজের আলোচ্য আয়তটিতে তামান্না ও উমনীয়া শব্দের অর্থ 'পাঠ করিতেন এবং পাঠ কালে' বলিয়া নির্ধারণ করা অসঙ্গত হইবে।

## অর্থ বিকৃতির কারণ

যেহেতু আমাদের এই শ্রেণীর লেখকগণ স্থির করিয়া লইয়াছেন যে, ছুরা 'নাজম' পাঠকালে শয়তান হযরতের মুখ দিয়া ঐ আবৃত্তির মধ্যে প্রতিমা-পূজা ও পৌত্তলিকতার সমর্থনমূলক দুইটি পদ যোগ করিয়া দিয়াছিল, অতএব ইহাতে যে হযরতের কোন দোষ নাই, ইহা প্রমাণ করা তাঁহারা আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা ছুরা 'হজ্জে'র এই আয়তটির ঐরূপ অর্থ করিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল নবী ও

---

* হযরত ওছমান ঐ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ন্যূনাধিক ৪০ বৎসর পরে শহীদ হন (এছাবা)। প্রমাণ স্থলে সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী কবির রচনাই প্রশস্ত।

** তফছির ১—১২৬

*** ১—২৯৭। (খায়রিয়া প্রেস)।

সকল রছুলেরই ঐ দশা ঘটিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারাও যখন আল্লাহর বাণী (কালাম) পাঠ করিয়াছেন, শয়তান তাহাতেও নিজের কথা যোগ করিয়া দিয়াছে। সকল নবীরই যখন এই দশা, তখন হযরতের আর কোন দোষ থাকিল না ! কিন্তু ইহা এক ভ্রমের উপর অন্য ভ্রমের ভিত্তিস্থাপন ব্যতীত আর কিছুই নহে—بناء الفاسد على الفاسد

## কংক্রিট ভ্রম

ইহার মূলে আর একটা 'কংক্রিট' ভ্রম বিদ্যমান আছে। এই শ্রেণীর আজগুবী ঘটনপটিয়সী প্রতিভাশালী লেখকগণ, চোখ বন্ধ করিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে, ছুরা 'হজ্জে'র সমস্ত আয়ৎ মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু একবার ঐ ছুরাটি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলে প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, ঐ ছুরার মধ্যে এমন কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ আছে, যাহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঐ ছুরাটি—অন্ততঃপক্ষে তাহার অনেকগুলি আয়ৎ—মদীনায়, হিজরতের (এমন কি বদর যুদ্ধের) পরবর্তী সময়ে অবতীর্ণ। এই ছুরাতেই উৎপীড়িত মুছলমানগণকে তরবারী ধারণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। বদর সমরে হযরত হামজা ও হযরত আলীর যুদ্ধের বর্ণনা এই ছুরায় আছে। যাঁহারা মদীনায় হিজরত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রশংসাসূচক আয়তও এই ছুরায় বর্তমান রহিয়াছে। সুতরাং এই ছুরাকে মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়া ধরিয়া লওয়ার কোনই কারণ নাই। প্রাথমিক যুগের বহু গণ্যমান্য পণ্ডিত* এমন কি, এবনে-আব্বাছও এই মত পোষণ করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ ছুরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। যাঁহারা উহাকে মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের পরবর্তী লেখকগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ছুরাটির কতকাংশ নিশ্চয়ই মদীনায় অবতীর্ণ। কিন্তু কতকাংশ যে মক্কায় অবতীর্ণ, তাহার কোন প্রমাণ তাঁহারা দিয়াছেন বলিয়া বহু অনুসন্ধানেও আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

ছুরা 'হজ' বা তাহার কতকাংশ যে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতামতকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিলে, তাহাতেও যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে ছুরার বর্ণিত বিষয়গুলির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, উহা নিশ্চয়ই মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। এ অবস্থায় ঐ ছুরাকে—কেবল লাৎ-ওজ্জা সংক্রান্ত গল্প ও শয়তানের বাহাদুরী সম্বন্ধীয় উপকথার সহিত (তাহাও আবার নানা প্রকার ভ্রান্ত অনুবাদ দ্বারা) খাপ খাওয়াইবার জন্য মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া, কোন মতেই সঙ্গত হইবে না।

## বিবরণগুলির অসমঞ্জস

এস্থলে আর একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। ছুরা 'নাজমে' লাৎ-ওজ্জা সংক্রান্ত আয়তগুলির সম্বন্ধে যাঁহারা শয়তানের প্ররোচনার গল্প রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, হযরত যে দিন কোরআন পাঠকালে (শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া) পৌত্তলিকতার সমর্থনমূলক আয়তগুলি পাঠ করেন, সেই দিন সন্ধ্যার পর জিব্রাইল আসিয়া ইহার জন্য কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন। ইহাতে হযরত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হইয়া পড়ায়, তাঁহার দুঃখ দূর করার জন্য ছুরা 'হজ্জে'র আলোচনাধীন আয়তটি অবতীর্ণ হয়। তাহার পরেই আবার লাৎ-ওজ্জাদি দেবীগণের নিন্দামূলক (ছুরা নাজমে'র) পরবর্তী আয়তগুলি অবতীর্ণ হয়। প্রথম আয়ৎ পাঠকালে হযরত ছেজদা করিয়াছিলেন এবং মক্কার পৌত্তলিকগণও—তাহাদিগের দেব-দেবীর প্রশংসা শুনিয়া—হযরতের সঙ্গে ছেজদা করিয়াছিল। ইহাতেই সংবাদ রটিয়া যায় যে কোরেশগণ মুছলমান হইয়াছে, তাই কয়েকজন প্রবাসী আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসেন। এই সঙ্গে তাঁহারা একবাক্যে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, নবুয়তের পঞ্চম সনের রজব মাসে মুছলমানগণ আবিসিনিয়ায় প্রথম যাত্রা করেন। রমজান মাসে ছেজদার ঘটনা ঘটে এবং শাওয়াল মাসে তাঁহারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখেন যে, সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা—কোরেশগণ মুছলমান হয় নাই।

---

* এৎকান ১—৯ হইতে ১৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

এখন আমরা চরম হিসাবে ধরিয়া লইতেছি যে, হেজরতের ঘটনা রমজান মাসের প্রথম দিবসে ঘটিয়াছিল, এবং প্রবাসিগণ শাওয়াল মাসের শেষ তারিখে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ছুরা 'নাজম' নাজেল হওয়ার পর অনধিক দুই মাসের মধ্যেই ছুরা 'হজ' নাজেল হইয়াছিল। কিন্তু ছুরা 'নাজমের' পরে ও ছুরা 'হজের' পূর্বে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া কোরআনের ইতিহাস লেখকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ঐ মধ্যবর্তী ছুরাগুলি পাঠ করিলে, তাহার আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইবে যে, ঐ দুই ছুরা কয়েক বৎসর ব্যবধানে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এই সকল যুক্তি-তর্কের দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদিগের 'ইতিবৃত্ত লেখক—তফছিরকারগণ' ছুরা 'নাজমের' তফছিরে যে সকল জঘন্য উপকথা রচনা করিয়াছেন এবং খৃষ্টান লেখকগণ যাহা লইয়া স্বর্গ-মর্ত্য আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মূলে কোন 'জিন্দিক' কর্তৃক রচিত, যাবতীয় যুক্তি-প্রমাণের বিপরীত জঘন্য মিথ্যা ও কল্পিত উপকথা মাত্র। মহিমময় মোস্তফা চরিতে এহেন দুর্বলতা কখনই স্পর্শিতে পারে না।*

## দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

چمن در چمن ز جنبش هر خس نفس زنند
دریا دلان چو موج گهر آرمیده اند

### কোরেশদিগের ক্ষোভ ও ক্রোধ

কোরেশ প্রতিনিধিগণ বৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের এই অকৃতকার্যতা ও অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া মক্কার সমস্ত কোরেশ ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় ও ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি? মুছলমান অত্যাচারে দমিত হয় না, ধর্মের জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হইতে কুণ্ঠিত হয় না, নীচ হইতে নীচতম এবং ভীষণ হইতে ভীষণতম কোন ষড়যন্ত্রই তাহাদিগের সত্যসাধনে বাধা দিতে পারে না। তাই কোরেশ দলপতিগণ সকলে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল—এখন প্রতিকারের উপায় কি? ভক্তবৃন্দও প্রতিমুহূর্তে নূতন পরীক্ষার আশঙ্কায় প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। এই আশঙ্কা, উদ্বেগ ও কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া আল্লাহর মঙ্গল হস্ত যে লোক-লোচনের অন্তরালে কিরূপে নিজের কার্য সমাধা করিয়া যাইতেছিল, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

### আবুজেহেলের অত্যাচার

একদা, হযরত লোকালয় হইতে দূরে—ছাফা পর্বতের নিভৃত অধিত্যকায় বসিয়া নির্জনে আপন ভাবে মগ্ন আছেন, এমন সময় আবুজেহেল তাঁহার সন্ধান পাইয়া সেখানে

---

* যাহারা মন্দ সৎ কার্যাদির সৃষ্টির জন্য দুইটি স্বতন্ত্র খোদার—ইজদ ও আহরমনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে এবং অগ্নি ও নক্ষত্র পূজা করে, তাহাদিগকে 'জিন্দিক' বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, ইহা দ্বারা পারস্য ধর্মাবলম্বীদিগকেই বুঝাইতেছে। মুছলমানদিগের পারস্য বিজয়ের পর এই জিন্দিকগণ সকলেই এছলাম গ্রহণ করে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কপট মুছলমানের সংখ্যা কম ছিল না। তাহারা নিজেদের জিন্দিকী মতগুলিকে মুছলমানী পোশাকে সাজাইয়া চালাইয়া দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। ইহা ব্যতীত বংশ-পরম্পরাগত সংস্কার, বিশ্বাস ও অদ্বৈতবাদ দর্শনাদির প্রভাব তাহারা সকলে হঠাৎ ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। এই সকল প্রভাব অচিরাৎ এত প্রকট হইয়া উঠে যে, আব্বাসিদের খলিফাগণকে তখন ইহার বিরুদ্ধে দস্তুরমত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইয়াছিল, খলিফাগণের আদেশে বহু জিন্দিক রাজদ্রোহী দণ্ডিত হইয়াছিল। জিন্দিকদিগের এই প্রভাব এখনও অত্যন্ত প্রবল হইয়া আছে।

উপস্থিত হইল। নরাধম প্রথমে নানা প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া ও কটুকথা কহিয়া হযরতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু হযরত ইহাতে উত্তেজিত কোন লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া, সে তীব্র ভাষায় তাঁহার ধর্মের গ্লানি করিতে লাগিল। তাহাতেও যখন হযরতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল না, তখন নরাধম তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কথিত আছে যে, এই পর্যায়ে ক্রোধান্ধ হইয়া আবুজেহেল একখণ্ড প্রস্তর ছুঁড়িয়া হযরতের মস্তকে আঘাত করিল। প্রস্তরের আঘাতে দরবিগলিত শোণিতধারায় তাঁহার শরীর রঞ্জিত হইয়া গেল। ইহাতেও মোস্তফা-হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ক্রোধের সঞ্চার হইল না। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসী ও স্বজাতীয় আবুজেহেলের এই মূর্খতা দর্শনে তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই ব্যথিত হইয়াছিল। হায়! ইহারা এতদূর অজ্ঞ যে, নিজেদের মঙ্গলামঙ্গলও বুঝিতে পারে না।

যাহা হউক, হযরত এই অবস্থায় বাটী চলিয়া আসিলেন। তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনদিগকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না। মক্কার একজন ক্রীতদাসী দূর হইতে এই ঘটনাটি আদ্যপান্ত দর্শন করিয়াছিল। হযরতের পিতৃব্য, আরবের বীরকেশরী হামজা, মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র সে তাঁহাকে আবুজেহেলের অন্যায়-অত্যাচার ও হযরতের ধৈর্যধারণ করার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল।

## হামজার প্রতিশোধ গ্রহণ

হামজা মহাবলশালী প্রথিতনামা বীর। এই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বীরহৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। মোহাম্মদ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র—সৎ, মহৎ ও সাধু মোহাম্মদকে লোকে যততত্র এমন অন্যায় করিয়া, এমন নির্মমভাবে উৎপীড়ন করিতেছে—কেন? তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এমন কি অপরাধই বা করিয়াছেন? তাঁহার ধর্মমত? তাহাতে এমন অন্যায় কথাই—বা কি আছে? ইট-পাথর, গাছপালা ঈশ্বর হইতে পারে না, এক আল্লাহর পূজা-উপাসনা করিতে হইবে, ইহা বলা কি এতই অপরাধের কথা যে, নরাধম আবুজেহেল তজ্জন্য আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর যখন তখন এইরূপ অত্যাচার করিতে থাকিবে! আর আবদুল্লাহর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমি—নীরবে ইহা সহ্য করিব?

## চিন্তা ও জ্ঞানের বিকাশ

এই সকল চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে হামজার বীর হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি সেই অবস্থায় আবুজেহেলের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। পথে হামজার মনে ঐ চিন্তা। আজ তাঁহার মোহ-যবনিকা একটু একটু করিয়া অপসারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি স্বপক্ষ-বিপক্ষ নানা প্রকার কথার আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনের মানুষটি যেন ভিতর হইতে তাঁহাকে করুণস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিল,—'হামজা! সত্য তোমার সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান হইয়া আছে,—গ্রহণ কর!' আজ হামজা সত্যকে তাহার প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইলেন। হামজা সিদ্ধান্ত করিলেন—মোহাম্মদ নিরপরাধ, তিনি সত্যের সেবক, তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তিকামী। আবুজেহেল—পাষণ্ড। আবুজেহেল কেবল বিদ্বেষ, নীচস্বার্থ ও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আমার প্রিয়, অতিশ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে কষ্ট দিয়াছে। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা যে একজন, কোন বুদ্ধিমান লোকে ইহা অস্বীকার করিবে? আমিও তো ইহা স্বীকার করি, ইহারই জন্য এত অত্যাচার! হামজার ভ্রাতুষ্পুত্র কি নিঃসহায়? মোহাম্মদ সহ্য করেন করুন, তাঁহার প্রকৃতি অন্য ধাতু দিয়া গঠিত, তিনি সব সহিতে পারেন। কিন্তু আবদুল মোত্তালেবের পুত্র, আবদুল্লাহর সহোদর হামজা ইহা সহ্য করিবে না।

আবুজেহেল তখন মক্কার মসজিদে বসিয়া কোরেশ দলপতিগণের সহিত পরামর্শ আঁটিতেছিল, এমন সময় হামজা তথায় উপস্থিত হইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—'পাষণ্ড! তুই

মোহাম্মদের উপর আর অত্যাচার করিবি ?' কথার সঙ্গে সঙ্গে হামজা স্বীয় স্কন্ধবিলম্বিত ধনুক দ্বারা আবুজেহেলের মস্তকে আঘাত করিলেন, এবং এই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—'ধর্মের জন্য ? আচ্ছা, আমিও মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, তোর যাহা ক্ষমতা থাকে কর !' আমীর হামজার আঘাত বড় সহজ ব্যাপার নহে—নরাধমের মস্তক বিকৃত হইয়া পড়িল।

এদিকে, আবুজেহেলের এই দুর্দশা দেখিয়া তাহার গোত্রের কয়েকজন লোক মারমার করিয়া ঠেলিয়া উঠিল, হামজাও তজ্জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ধূর্ত আবুজেহেল তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বলিল—হামজাকে কিছুই বলিও না, বাস্তবিক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর আমি অন্যায়ভাবে অত্যাচার করিয়াছিলাম। পাষণ্ড আবুজেহেল, এরূপ সাংঘাতিকভাবে অবমানিত হইয়াও অত্র এমন সাধু সাজিয়া বসিল কেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমীর হামজার ভাবগতিক ও কথাবার্তা শুনিয়া নরাধম বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সর্বনাশ উপস্থিত। এখন সদ্ব্যবহার ও সাধুতার দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিলে, আরবের একজন প্রধানতম বীর তাহাদের দলছাড়া হইয়া যাইবেন। তাহারই কর্মফলে আজ যদি সত্যসত্যই এই সর্বনাশ ঘটিয়া বসে, তাহা হইলে কোরেশগণ ইহার জন্য তাহাকেই দায়ী করিবে। ইহাতে আবুজেহেলের তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্বর্গের মঙ্গল ইঙ্গিতকে কে নিবারণ করিবে ?

## হামজার এছলাম গ্রহণ

হামজা সেখান হইতে সোজা হযরতের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহ সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন—'প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ! আনন্দিত হও, আমি এইমাত্র আবুজেহেলকে উপযুক্ত প্রতিশোধ দিয়া আসিতেছি।' কিন্তু হযরত এ জন্য কোনপ্রকার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার প্রতি অত্যাচার করার জন্য আবুজেহেল প্রহৃত হইয়াছে, এরূপ সংবাদ তাঁহার মনে কোন প্রকার আনন্দের সঞ্চার করিতে পারে না। তিনি চাহেন, আবুজেহেলকে জীবন দিতে, মুক্ত করিতে, আল্লাহর একনিষ্ঠ দাস বানাইতে। এরূপ সংবাদ পাইলে হযরত আনন্দিত হইতেন। হামজার কথা শুনিয়া, তিনি সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, 'তাতঃ ! ইহাতে আনন্দের কিছুই নাই। যদি শুনিতাম যে আপনি সত্যকে গ্রহণ করিয়াছেন, আল্লাহর নামে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তাহা হইলেই আমার পক্ষে আনন্দের কথা হইত।' হামজার মনে পূর্ব হইতেই সত্যের উন্মেষ আরম্ভ হইয়াছিল, কা'বা গৃহে সকলেরই সম্মুখে তিনি প্রকাশ্যভাবে নিজের মুছলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন, এখন হযরতের খেদমতে প্রকাশ্যভাবে এছলামের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন—'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ !'

হামজার ইছলাম গ্রহণে কোরেশদিগের মধ্যে ঘোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, কয়েকদিন পর্যন্ত তাহারা হযরতের উপর অত্যাচারের মাত্রা একটু হ্রাস করিয়া দিল, এবং কৃতকার্যতা লাভের নূতন উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

## নূতন ষড়যন্ত্র—প্রলোভন

একদিন হযরত একাকী কা'বা গৃহে বসিয়া আছেন, কোরেশগণ বাহিরে তাহাদিগের মজলিসে বসিয়া জল্পনা করিতেছে। এমন সময়, মক্কার বিখ্যাত ধনস্বামী ও সর্দার ওৎবা তাহাদিগকে বলিল—হামজা ত' মুছলমান হইয়া গেল, দেখিতেছি মুছলমানদিগের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে—এ অবস্থায় মোহাম্মদকে কিছু দিয়া নিরস্ত করাই ভাল। সকলের যদি মত হয়, তাহা হইলে আমি তাহার নিকট গিয়া কতকগুলি প্রস্তাব করিতে পারি। সে যদি তাহার মধ্যে কতকগুলি মঞ্জুর করিয়া নিরস্ত হয় এবং আমাদিগের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু না বলে, তাহা হইলে হাঙ্গামাটা মিটিয়া যায়। সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে, ওৎবা আসিয়া হযরতের নিকট উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল : 'বৎস মোহাম্মদ ! তুমি আমাদিগের পর নহ। তুমি সমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছ, তাহা তুমি অবগত আছ !

তুমি তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, পূর্বপুরুষগণের ধর্মত্যাগ করিয়া এক অভিনব ধর্মের সৃষ্টি করিলে……ইত্যাদি। আমাকে আজ সব কথা ভাঙ্গিয়া বল, এইরূপ করার তোমার মূল উদ্দেশ্য কি ? যদি ইহা দ্বারা তোমার ধন সঞ্চয় করার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে আমাকে বল—আমরা তোমার পদপ্রান্তে স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্তূপ লাগাইয়া দিব। যদি তুমি সম্মানের প্রার্থী হও, তাহাও বল, আমরা সকলে একবাক্যে তোমাকে নিজেদের প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব। যদি তোমার রাজত্ব করার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, তবে আমার কথা শোন, সমগ্র আরব দেশের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া আমরা তোমাকে অভিষিক্ত করিতে প্রস্তুত। তুমি আমাদের শাসন-পালনের ভার গ্রহণ কর, আরবের সকল জাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হও, আমরা তোমার সিংহাসন-সম্মুখে নতজানু হইতে সম্মত আছি। আমাদের শুধু এইটুকু প্রার্থনা যে, তুমি এই অভিনব ধর্মের কথা একেবারে ভুলিয়া যাও ! আর দেখ, যদি কোন কারণে তোমার মস্তিষ্কের কোন প্রকার পীড়া ঘটিয়া থাকে, তাহাও বল, আমরা তোমার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।'

'আপনার বক্তব্য শেষ হইয়াছে ?'—হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন। ওৎবা উত্তর করিল, "হাঁ, এখন তোমার অভিমত জানিতে চাই।" হযরত তখন আল্লাহ্‌র নাম করিয়া কোরআনের 'হা-মীম ছাজদা' ছুরা পাঠ করিতে লাগিলেন ঃ

## সত্যের মহিমা

"হা-মীম দয়ালু করুণাময়ের পক্ষ হইতে—এই গ্রন্থ, যাহার বাণীগুলি বিজ্ঞ লোকদিগের জন্য স্পষ্ট আরবী ভাষায় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে এবং যাহা (পুণ্যের পুরস্কারের) সুসংবাদ দান করে, ও পাপের (দণ্ড সম্বন্ধে) সতর্ক করিয়া থাকে। অনন্তর তাহাদের অধিকাংশই মুখ ফিরাইয়া লইল, তাহারা (উপদেশ) শ্রবণ (গ্রহণ) করে না। তাহারা বলে, যে (তাওহীদের) দিকে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ, আমরা তাহার ধারণা করিতে পারি না, তোমার কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশও করে না। আর আমাদিগের ও তোমার মধ্যে একটা যবনিকা পড়িয়া আছে। অতএব তুমি চেষ্টা করিতে থাক, আমরা চেষ্টায় রহিলাম। (দেখি পরিণামে কে জয়যুক্ত হয় !)। (হে মোহাম্মদ তুমি উহাদিগকে) বল যে, (জয়-পরাজয়ের কর্তা আমি নহি—আমার হস্তে কোন ঐশী শক্তি নাই,) আমি ত' তোমাদিগেরই ন্যায় একজন মানুষ মাত্র, (তবে) আমার নিকট এই বাণী প্রেরিত হয় যে,—তোমাদিগের উপাস্য মাত্র একক আল্লাহ্, অতএব দৃঢ়তা সহকারে ও সোজা পথে তাঁহার দিকে ফিরিয়া আইস এবং (বিগত ত্রুটির জন্য) তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর !—আর সেই সকল অংশীবাদীদিগের জন্য পরিতাপ, যাহারা 'যাকাত' প্রদান করে না এবং পরকালকে অস্বীকার করে।"

## ওৎবা স্তম্ভিত

হযরত পর পর ৫টা রুকু পড়িয়া চলিলেন, ওৎবা শুনিয়া যাইতে লাগিল। ওৎবা পশ্চাৎ দিকে দুই হাতের ঠেস দিয়া হযরতের স্বর্গীয় ভাবদীপ্ত সরল ও প্রশান্ত বদনমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া রহিল ! এত সম্পদ, এত সম্মান, এত মূল্যবান রাজসিংহাসন, এমন সহজে, এমন নির্বিকারভাবে ছাড়িয়া দেওয়া কি সামান্য কাজ ! ওৎবা স্তম্ভিত হইল। তাহার উপর মোস্তফা মুখ-নিঃসৃত, ভাব ও সুরের সৌন্দর্যে প্রভাবদীপ্ত কোরআনের আয়াতগুলির সুললিত ছন্দোবন্ধের মধুর স্বরতরঙ্গের উত্থান-পতনে স্বর্গীয় সুধাসিন্ধুর অমৃত-মদিরা-ক্ষরণ,—মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া ওৎবা শুনিয়া যাইতে লাগিল। তেলাওৎ করিতে করিতে হযরত যখন—'এবং তাহার আর একটি নিদর্শন রজনী ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে প্রণিপাত করিও না—চন্দ্রকেও নহে, পরন্তু সেই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রণিপাত (ছেজদা) কর, যিনি সেগুলিকে সৃজন করিয়াছেন—'এই আয়াতটি পাঠ করিয়া দিবারজনী ও চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টিকর্তার নামে ছেজদা করিলেন, তখন ওৎবার চৈতন্য হইল। তখন সে কতকটা বিমর্ষ ও কতকটা মুগ্ধ অবস্থায়

সেখান হইতে উঠিয়া কোরেশদিগের মজলিসে উপস্থিত হইল। ওৎবার মুখভাব দর্শনে সকলে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'সংবাদ কি ?'

## ওৎবার অভিমত

'সংবাদ আর কি' ? ওৎবা উত্তর করিল, 'যাহা শুনিলাম, আল্লাহর দিব্য সেরূপ কথা আর কখনও শুনি নাই। আল্লাহর দিব্য,—উহা তোমার হিসাবে কখনই কবির রচনা নহে, তোমার হিসাবে উহা কখনই যাদুমন্ত্র নহে। হে কোরেশ সমাজ ! আমার উপদেশ গ্রহণ কর, এই ব্যক্তি যাহা করে করুক, তাহা লইয়া তোমরা কেহ আর গণ্ডগোল করিও না। তাহার মুখে আমি যাহা শুনিলাম, তাহাতে যেন ভবিষ্যতের একটা আভাস প্রতিফলিত হইয়া উঠিতেছে। আরবের অন্যান্য জাতিরা যদি তাহাকে বিধ্বস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে সহজে তোমাদিগের মনস্কাম সিদ্ধ হইয়া যাইবে ; আর যদি সে আরবের উপর জয়যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতেও তোমাদের গৌরব। ওৎবার কথা শুনিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। তাহারা সমস্বরে বলিতে লাগিল—'দেখিতেছি, তোমার উপরও উহার যাদু খাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।' ওৎবা তখন অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—'আমার মত বলিলাম, এখন তোমাদের যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিতে পার !'

দাউ দাউ প্রজ্বলিত আহব-কুণ্ডে যতই কাষ্ঠপাত করিবে, তাহার স্ফুলিঙ্গ ততই বিস্তৃত ততই ব্যাপক হইয়া পড়িবে। সাধক যখন সত্যকে সত্যভাবে গ্রহণ করিয়া সত্যকার সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাহাতে বিঘ্ন প্রদান করিতে গিয়া বৈরিগণই তাহার সিদ্ধিলাভের সহায় হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল এবং কোরেশদিগের অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এছলাম ধীরে ধীরে নিজের স্থান প্রস্তুত করিয়া লইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, কোরেশ দলপতিগণ ইহার প্রতিকারের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা স্থির করিল, এরূপ স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা কোন সুফল ফলিবে না। একবার সকলে সমবেতভাবে উহার সহিত শেষ বোঝা-পড়া করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহার পর যাহা হয়—দেখা যাইবে।

## কোরেশের সমবেত চেষ্টা

এই পরামর্শ অনুসারে, নির্ধারিত সময়ে কা'বার সন্নিকটে কোরেশদিগের সভা বসিল। ওৎবা, শায়বা, আবু-ছুফিয়ান, অলিদ, আবুজেহেল, উমাইয়া প্রভৃতি বিশিষ্ট কোরেশ প্রধানগণ সেই সভায় সমবেত হইল। তখন স্থির হইল যে, মোহাম্মদকে এই সভায় ডাকিয়া আনিয়া তাহার সঙ্গে বোঝা-পড়া করিয়া লইতে হইবে। তখন সভার পক্ষ হইতে হযরতের নিকট এক দূত প্রেরণ করা হইল। এই দূত হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'তোমার স্বজাতীয় ভদ্রলোকেরা সকলে একত্র হইয়া আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারা তোমার সহিত দুই-একটা কথা বলিতে চাহেন।'

## কোরেশ মজলিসে মোস্তফা

ভয় নাই ভীতি নাই, কাহাকেও সংবাদ দিবার বা সঙ্গে লইবার আবশ্যক নাই, দূত-মুখে সংবাদ শুনিবামাত্র তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য, তাহাদিগের মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখাইবার জন্য হযরত সর্বদাই ব্যাকুল থাকিতেন। তাই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি কোরেশদিগের সভাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন।*

## আবার প্রলোভন

তখন তাহারা পূর্বের ন্যায় তাঁহাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। 'সম্পদ সম্পদ, সিংহাসন, যাহা চাও প্রস্তুত আছি, তুমি আমাদিগের উপদেশ গ্রহণ কর ; একবার

---

* এবনে-হেশাম ৭১—২০০ পৃষ্ঠা

ভাবিয়া দেখ, তুমি নিজের স্বজাতির উপর যে বিপদ আনয়ন করিয়াছ, আরবে তাহার নজির নাই। তুমি আমাদিগের চিরাচরিত ধর্মে এক বিপ্লব উপস্থিত করিয়া দিয়াছ, পূর্বপুরুষগণের মত ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মান হানি করিয়াছ, আমাদিগের 'জমাত' ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। এক কথায় এমন কোন অকল্যাণ ও অমঙ্গল নাই, তুমি যাহা করিতে ছাড়িয়াছ। তোমার এই সব বিপ্লব উপস্থিত করার উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা জানিতে চাই। তোমার যদি ধন সঞ্চয়ের বাসনা থাকে, এখনই আমরা তোমাকে আরবের সর্বপ্রধান ধনকুবের করিয়া দিতেছি, যদি সম্মান লাভের ইচ্ছা থাকে, তাহাও খুলিয়া বল, আমরা তোমাকে নিজেদের প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি। রাজত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকিলে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া বল, আমরা তোমাকে সমগ্র আরব-দ্বীপের একচ্ছত্র রাজা বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছি।—আর, তুমি যাহা দেখিয়া শুনিয়া থাক, তাহা যদি কোন ভূত-প্রেত বা উপসর্গের উপদ্রব হয়, তাহা জানিতে পারিলে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া আমরা শ্রেষ্ঠ 'গুণীন' ডাকিয়া তোমার 'ঝাড়ান কাড়ান' করিয়া লইতে পারি !—''

হযরত বহুক্ষণ ধরিয়া ধীরস্থিরভাবে এই সকল প্রলাপোক্তি শুনিয়া গেলেন, এবং তাহাদিগের কথা শেষ হইলে বলিতে লাগিলেন—''আপনারা আমার সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটিও প্রকৃত নহে। আমি আপনাদিগের নিকট সম্পদের ভিখারী নহি, বা আপনাদিগের রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম, সিংহাসন ও রাজমুকুট, এই সকল তুচ্ছ পদার্থের কোন আবশ্যকতা আমার নাই। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ সত্য ও জ্ঞানের আলোক দিয়া, ইহ-পরকালের মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য, আমাকে আপনাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার বাণী আমার নিকট আসিয়াছে, মানব স্বকৃত কর্মফলে পরজীবনে দণ্ড বা পুরস্কারের ভাগী হইবে, এই শিক্ষা দিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। আমি নিজের কর্তব্য পালন করিতেছি—স্বর্গের সেই মহীয়সী বাণী আপনাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতেছি। এখন আপনারা যদি সেই বাণীকে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আপনারাই ইহ-পরকালে সুফল লাভ করিবেন। আর যদি আপনারা উহাকে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিব—প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।''

## ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

প্রলোভনে কোনই সুফল ফলিল না। তখন কোরেশ দলপতিগণ রুক্ষস্বরে বলিতে লাগিল—'আমরা তোমারই হিতের জন্য এতগুলি মূল্যবান প্রস্তাব করিলাম, দেখিতেছি তাহার একটাও তোমার পছন্দ হইল না। আচ্ছা, বেশ কথা ! তুমি যদি সেই স্বর্গের রাজার সন্ধান পাইয়া থাক, তাহা হইলে তাহাকে বল, আমাদের দেশে সিরিয়া ও এরাকের ন্যায় নদনদী প্রবাহিত করিয়া দি'ক। এই উত্তপ্ত মরুভূমিতে বাস করা যে কতদূর কষ্টকর, তাহা তুমি জানিতেছ। তোমার আল্লাহ্‌কে বল, আমাদের দেশকে সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা করিয়া দি'ক। এই পর্বতগুলিকে অপসারিত করিয়া আমাদিগের জন্য সমতল কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দি'ক। আর তাহাকে বলিয়া আমাদিগের পূর্বপুরুষগণকে, বিশেষতঃ কোরেশের আদি পিতা 'কোছাই'কে তোমার কথিত 'পরকাল' হইতে ফিরাইয়া আন। আমরা তাহাদের নিকট পরকালের এবং তোমার অন্যান্য কথার সত্য-মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। তোমার সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই কাজগুলি করিয়া দি'ক, তাহা হইলে বুঝিব যে, বাস্তবিক তোমার কথাগুলি সত্য !'

হযরত উত্তর করিলেন—'এই সকল কাজের জন্য আমি প্রেরিত হই নাই। আমাকে যে শিক্ষা দিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহা আমি আপনাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি। আমার কর্তব্য এই মাত্র। এখন যদি আপনারা সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেন, তাহাতে আপনাদিগের ইহ-

পরকালের মঙ্গল হইবে। আর যদি আপনারা তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি আর কি করিব—আল্লাহ্‌র যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।'

## কোরেশের প্রলাপোক্তি

হযরতের উত্তর শ্রবণে তাহারা আবার বলিতে লাগিল—'আচ্ছা, আমাদিগের জন্য না কর, না-ই করিলে, নিজের জন্য কিছু করিয়া দেখাও। তোমার সেই 'প্রভু'কে বল, সে একজন ফেরেশতাকে তোমার সহচর করিয়া দিক। সে ফেরেশতা তোমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিতে থাকিবে এবং আমাদিগকে তোমার বিরুদ্ধাচরণে নিষেধ করিবে। তুমি আপন প্রভুকে বল, সে তোমার জন্য ফল-পুষ্প-পরিশোভিত একটা সুন্দর উদ্যান, একটা বৃহৎ প্রাসাদ এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের কতকগুলি ভাণ্ডার প্রস্তুত করিয়া দিক, তাহা হইলে তোমার অভাব পূরণ হইয়া যাইবে। দেখিতেছি, এই অভাবে পড়িয়া তোমাকেও আমাদিগের ন্যায় বাজার-হাটে যাইতে হইতেছে, উপজীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে হইতেছে; এখন আমাদিগের সহিত তোমার কোন পার্থক্য নাই। তোমার আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ঐ সব চাহিয়া লও, তাহা হইলে সমাজে তোমার একটা গুরুত্ব হইতে পারিবে।'

হযরত নীরবে এই সব প্রলাপ শুনিয়া যাইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের কথা শেষ হইলে দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিলেন—'এই পার্থিব ধন-সম্পদের জন্য আমি প্রার্থনা করিতে পারি না, উহা আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্তও নহে। আমি জগদ্বাসীর নিকট এক মহাসত্যের প্রচারকরূপে প্রেরিত হইয়াছি। আপনারা স্বীকার করেন আপনাদের ভাল, অন্যথায় প্রভুর যাহা ইচ্ছা থাকে তাহাই হইবে।'

তাহাদিগের স্বর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হইতে ক্রমে ক্রোধের গ্রামে উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন তাহারা কঠোর ভাষায় বলিতে লাগিল—'আচ্ছা! তোমার আল্লাহ্ না-কি সর্বশক্তিমান, সে না-কি সবই করিতে পারে? যদি ইহা সত্য হয়, তবে তাহাকে বল, আমাদিগের উপর এক টুকরা আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিক। অন্যথায় আমরা কখনই তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিব না।' হযরত ইহার উত্তরে বলিলেন—'ইহা আমার ইচ্ছার উপর নহে—বরং তাঁহার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, তিনি ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন।' কেহ কেহ বলিতে লাগিল—'মোহাম্মদ! আচ্ছা বল দেখি, আমরা যে আজ তোমাকে ডাকিয়া ডাকিল, এই সকল প্রশ্ন করিল, এই সমস্ত নিদর্শন দেখিতে চাহিল, তোমার 'প্রভু' কি ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই? সে ইহার কোন উপযুক্ত উত্তর তোমাকে শিখাইয়া দিতে পারিল না? আমরা তোমার কথা মান্য না করিলে যে আমাদিগের সহিত কি ব্যবহার করিবে, তাহাও তোমাকে জ্ঞাপন করিল না।'

'মোহাম্মদ! আমাদিগের সমস্ত বক্তব্য আজ তোমাকে বলিয়া দিয়াছি, অতঃপর সাবধান! নিশ্চিতরূপে স্মরণ রাখিও যে, আমরা আর তোমাকে এই অধর্মের কথাগুলি প্রচার করিতে দিব না— দেহে প্রাণ থাকিতে না। ইহাতে হয় আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব, না হয় তুমি! এই শেষ!!'

## তক্‌দির ও তদ্‌বির

হযরতের মনোমণ্ডলে এখনও কোন অবসাদ বা নিরুৎসাহ ছায়াপাত হয় নাই। তাহা এখনও পূর্ববৎ প্রসন্ন, গম্ভীর ও প্রশান্ত। এই সময় সভাক্ষেত্রে—সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে—একটা হট্টগোল আরম্ভ হইয়া গেল। নানা লোকে হযরতকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ভর্ৎসনা ও তীব্র বাক্য-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। হযরত আপন কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া আনন্দিতচিত্তে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হযরত এই সভাক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, কর্তব্য সম্পাদন করাই আমার কাজ, ফলাফল আমার প্রভুর হাতে। ইহাই সাধকের কর্মজীবনের আদর্শ হওয়া চাই। কর্তব্য কর্তব্যের জন্যই পালন করিতে হইবে। তাহার ফলাফল

কি হইতেছে, ইহা আদৌ বিবেচ্য নহে। সাধনা যদি মূলে সিদ্ধির মুখাপেক্ষী হইতে অভ্যস্ত হয়, কর্ম যদি প্রথম হইতে আপনাকে ফলাফলের প্রভাবাধিষ্ট করিয়া বসে, তাহা হইলে সাধনাও হইতে পারে না, সিদ্ধিও আসিতে পারে না। কারণ ইহাতে সাধকের আত্মসত্যে প্রতীতির অভাবই সূচিত হয়। অনেকে সত্যের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াও যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না, ইহাই হইতেছে তাহার একমাত্র কারণ। 'আল্লাহ্ সত্যের সহায়' এই বাণীতে তখন সন্দেহের সঞ্চার হয়, এবং বড় বড় মহাপুরুষও অবসাদ-বিমর্ষ চিত্তে বলিয়া বসেন যে, 'আমার ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন।' কিন্তু মোহাম্মদ মোস্তফার চিত্তে কখনও এ-ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। কারণ তিনি কর্তব্যের খাতিরেই কর্তব্য পালন করিতেন, ফলাফলের জন্য তিনি কখনও ব্যগ্র হন নাই, আত্মসত্যে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তাহাতে কপটতা, দুর্বলতা ও স্বার্থের লেশমাত্র থাকিলে ইহা সম্ভবপর হইত না। মানব জাতিকে এই কথা পূর্ণভাবে শিক্ষা দিবার জন্যই মোহাম্মদ মোস্তফা ধর্মজগতের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম আলেখ্য এবং সাধকের কর্মজীবনের পুণ্যতম ও পূর্ণতম আদর্শরূপে প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু পাঠক এখানে একটা ভুল করিয়া বসিয়াছি। ধর্ম ও কর্মের এই পার্থক্য মোস্তফা-প্রচারিত জ্ঞানের প্রতিকূল। তিনি বলিয়াছেন, কর্মমাত্রই ধর্ম, কৃষক নিজ পরিবার-প্রতিপালনের জন্য ভূমিকর্ষণ করেন, স্বামী আপন স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপ করেন— ইহাও ধর্ম। মুছলমানগণ আজকাল যেমন কেবল কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্রকে ধর্মরূপে নির্ধারিত করিয়া সেগুলিকে কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত কারাগারে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, যাঁহার নাম করিয়া মুছলমান—তাঁহার শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমরা এই বিবরণগুলি বিস্তৃতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, কারণ ইহাতে আমাদিগের শিক্ষার কথা অনেক আছে। প্রায় সকল চরিত পুস্তকে ও ইতিহাসে এই সকল বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এবনে-হেশাম ও হালবী হইতে এই বিবরণটি গ্রহণ করিলাম।*

## ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### "بہ کین رفتی و با نیاز آمدی"

### ওমরের নবজীবন লাভ

হযরত ওমারের এছলাম গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে যতগুলি বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পরস্পর এত অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহা হইতে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজসাধ্য নহে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে কোন বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ উল্লিখিত হয় নাই বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। তবে সমস্ত বিবরণ একত্রে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একদিন হঠাৎ "dramatically" তিনি মুছলমান হন নাই। একই সময় বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা তাঁহার মনের উপর ক্রমে ক্রমে সত্যের প্রভাব বিস্তারিত হইতে থাকে। আমেরের স্ত্রীর বর্ণনায় জানা যাইতেছে যে, যখন কোরেশদিগের অত্যাচারে অস্থির হইয়া অন্যান্য মুছলমানদিগের ন্যায় তাঁহারাও দেশান্তরিত হইবার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় একবার এই দুস্থ পরিবারের বিপদ দর্শনে ওমারের মন বিচলিত হইয়াছিল।** তাহার পর হাদীছ গ্রন্থে স্বয়ং হযরত ওমারের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, (একদা গভীর রজনীযোগে হযরতের অনিষ্ট সাধনের জন্য) ওমর তাঁহার অনুসরণ করেন। হযরত সেই নিভৃত নিস্তব্ধ নিবিড় নিশীথে কা'বা গৃহে প্রবেশ করিয়া নামায পড়িতেছিলেন। ওমর বলিতেছেন, আমি কা'বার পর্দার আড়ালে একেবারে তাঁহার

---

* ১—১০০ পৃষ্ঠা। ১—২৯৬, ৯৭ পৃষ্ঠা। ** এবনে-হেশাম ১—১১৯ প্রভৃতি।

নিকটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। হযরত নামাযে দাঁড়াইয়া ভক্তি-গদ-গদ কণ্ঠে 'আলহাক্কা' ছুরা পাঠ করিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এই সময় প্রথমে আমার মনে হইল, কোরেশগণ যাহা বলিয়া থাকে তাহাই ঠিক, ইনি একজন বড়দরের কবি। কিন্তু পর মুহূর্তে হযরত পাঠ করিলেন—

فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، انه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ـ

"তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ এবং যাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না—সে সকলের দিব্য, উহা আমার প্রেরিত রছুল কর্তৃক প্রচারিত বাণী—পরন্তু উহা কবির কল্পনা নহে, কিন্তু তোমরা ইহাতে কমই বিশ্বাস করিয়া থাক।" এ ত' আমারই মনের কথা, ইনি ইহা কিরূপে জানিলেন। তখন আমার মনে হইল, মোহাম্মদ নিশ্চয় একজন মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ গণৎকার ! আমার মনে এই ভাবের উদয় এবং হযরতের পরবর্তী আয়ৎ وما بقول كاهن قليلا ما تذكرون এবং উহা মন্ত্রজ্ঞ গণৎকারের উক্তিও নহে, তোমরা অল্পই চিন্তা করিয়া বুঝিয়া থাক—" পাঠ করিলেন।

فوقع الاسلام فى قلبى كل موقع (مسند احمد - شريح بن عبيد عن عمر رض)

'অতঃপর এছলাম আমার অন্তঃকরণে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসিল।'* ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যাঁহারা এই ঘটনার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা ঘটনাসূত্রকে একটু অতিরিক্ত প্রলম্বিত করিয়া বলিয়া বসিয়াছেন যে, সেই রাত্রেই হযরত ওমর এছলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু মোছনাদের উপরোক্ত হাদীছে ঐ বিবরণের প্রকৃত অংশটুকু আমরা জানিতে পারিতেছি।

নাঈম-বেন-আবদুল্লাহ্ নামক হযরত ওমরের একজন আত্মীয় গোপনে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত ওমর কোন গতিকে এই সংবাদ জানিতে পারেন। একদিন পথে হযরত ওমরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন—

'খবর কি ? বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করিয়া তুমি না-কি মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ ?'

'আমার ঘাড়ে লাগিতে আসিয়াছ কেন ? তোমার যাহাদের উপর আমাপেক্ষা অধিক অধিকার, তাহারাও ত' ইছলাম গ্রহণ করিয়াছে।'

'সে কি কথা ! কাহারা ?'

'এই তোমার ভগ্নী ফাতেমা, ভগ্নীপতি ও আত্মীয় ছঈদ !'

নাঈমের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া, ওমর ভগ্নীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। তখন দরওয়াজা বন্ধ ছিল এবং বাহির হইতে একটা গুন গুন শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। দরওয়াজা খোলা হইলে ওমর ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভগ্নীকে বলিলেন, 'বাহির হইতে কিসের শব্দ শুনিতেছিলাম ?' 'কি শুনিবে, ও কিছুই নয়'—ফাতেমা উত্তর করিলেন। ইহার পর ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল। ইহাতে ওমরের মনে ক্রোধের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি উঠিয়া ভগ্নীর কেশগুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। তখন ফাতেমা (তিনিও ত' ওমরের ভগ্নী)। উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলেন, হাঁ বেশ, যা তুমি বলিতেছ—তাই, আমরা মুছলমান হইয়াছি। এই সময়ে ভগ্নীর অঙ্গে সম্ভবতঃ পড়িয়া যাওয়াতে। রক্ত দেখিতে পাইয়া ওমর অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তখন তিনি বিনয় করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা যাহা পড়িতেছিলে, তাহা আমাকে একবার দেখিতে দাও। ফাতেমার নির্বন্ধানুসারে ওমর প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি তাহার কোন অসম্মান করিবেন না।

---

* মোছনাদ হাম্বল।

ভ্রাতার এই ভাবান্তর দর্শনে ফাতেমার চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি নম্রস্বরে বলিলেন—ভ্রাতঃ ! আপনারা অংশীবাদী পৌত্তলিক—শৌচাশৌচ মানেন না। অশুচিসম্পন্ন ব্যক্তির উহা স্পর্শ করিতে নাই।

ওমর বলিলেন : 'বেশ ত, সে ত ভাল কথা।' এই বলিয়া তিনি স্নান সম্পন্ন করিয়া ভগ্নীর নিকট হইতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে পূর্ববর্ণিত খাতাখানা লইয়া নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ খাতায় 'তা-হা' ও 'হাদিদ' নামক কোরআনের দুইটি ছুরা লিখিত ছিল, হযরত ওমর নিবিষ্ট মনে 'তা-হা' ছুরা পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে অলক্ষিতভাবে তাঁহার মুখ হইতে 'আহা, কেমন সুললিত ভাষা, কি মনোহর ভাব' এইরূপ মন্তব্য বাহির হইতে লাগিল। 'তা-হা' সমাপ্ত করিয়া ওমর 'হাদিদ' আরম্ভ করিলেন :

"স্বর্গ-মর্তের সকল পদার্থ-ই আল্লাহর মহিমা গান করে, তিনি প্রবল ও বিজ্ঞানময়। স্বর্গ ও মর্তের রাজ্য তাঁহারই—তিনিই জীবনদান করেন, তিনিই মৃত্যু আনয়ন করেন এবং তিনিই সর্বশক্তিমান। তিনিই অন্ত, (আপন নিদর্শন সমূহের দ্বারা) তিনি স্বতঃ প্রকাশমান, অথচ (তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ) অজ্ঞেয়—অপরিচ্ছন্ন এবং তিনি সর্বজ্ঞ—যিনি স্বর্গ মর্তকে ছয় ঋতুতে (সুবিভক্ত করতঃ) সৃষ্টি করিয়া, স্বীয় সিংহাসনে বিরাজমান হইয়াছেন। ধরিত্রীগর্ভে যাহা কিছু প্রবেশ করে ও তাহা হইতে যাহা কিছু বহির্গত হয়, এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামিয়া আসে ও যাহা কিছু তথা হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়—সমস্তই তিনি জানিতেছেন। তোমরা যত্র অবস্থান কর না কেন—তিনি (সর্বত্রই) তোমাদিগের সঙ্গে আছেন এবং (সেই) আল্লাহ্ তোমাদিগের সকল কার্যকলাপ দর্শন করিতেছেন। স্বর্গ-মর্তের সাম্রাজ্য তাঁহারই এবং সমস্ত বিষয়ই প্রত্যাবর্তিত হয় তাঁহারই দিকে। তিনি দিবসের (আলোকের) মধ্যে রজনীকে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন ও রজনীর (তিমির পুঞ্জের) মধ্যে দিবসকে প্রবিষ্ট করিয়াছেন এবং তিনি (সকলের) মানসকুক্ষিগত সঙ্কল্পসমূহ সম্যকরূপে জ্ঞাত আছেন, (অতএব হে মানবগণ !) সেই আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ কর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষে বিশ্বাস স্থাপন কর—।" ওমর কোন গভীর ভাবের রাজ্যে উধাও হইয়া গিয়াছিলেন, এই পর্যন্ত পাঠ করিয়াই তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে স্বর্গের দ্যোতনা জাগিয়া উঠিল। তখন তিনি বিশ্ব-চরাচরের রেণুতে রেণুতে সেই অজ্ঞেয়-স্বরূপ স্বর্গ-মর্তাদিস্বামীর স্পষ্ট নিদর্শন বিরাজমান দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভিতরে বাহিরে সেই আদ্যন্তের অনন্ত মহিমা-ঝঙ্কার শুনিতে লাগিলেন। 'অতএব সেই মহিমময় আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ কর'—তাঁহার ভিতরের মানুষটি এই স্বর্গীয় আহ্বানের প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল—আত্মসমর্পণ কর, ওমর ! সেই মহিমময় করুণাময় প্রেমাধার সচ্চিদানন্দে আত্মসমর্পণ কর !

ওমর অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণ করিলেন। ব্যাকুল হৃদয় ওমর—মুগ্ধ-মোহিত মানস ওমর—চকিত-চিত্ত ওমর আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন :

'আশহাদো আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু,—অ-আশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অ-রাছুলুহু।' আমি ঘোষণা করিতেছি, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনি একক তাঁহার কোন অংশী নাই।—এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও প্রেরিত

খাব্বাব নামক জনৈক ছাহাবী বিবি ফাতেমাকে কোরআন পড়াইতে আসিতেন ; তিনিও এতক্ষণ আত্মপ্রকাশ করেন নাই। ওমরের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া তিনি অন্য প্রকোষ্ঠে চলিয়া গিয়াছিলেন। এখন তিনি ওমরের নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন "মোবারকবাদ—ওমর ! আল্লাহ্ তোমাকেই নির্বাচন করিয়াছেন। গত রাত্রিতেই হযরতকে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছিলাম—আল্লাহ্ ! ওমর দুগলের (খাত্তাবের পুত্র ওমর ও হেশামের পুত্র ওমর বা আবুজেহেল) মধ্যে একজনের দ্বারা এছলামের শক্তি বর্ধন কর।"*

---

* আহমদ, তিরমিজী, মেশকাত ৫৫৩ ও এছাবা, একমাল প্রভৃতি।

আর বিলম্ব সহিল না। স্নাত-শুদ্ধ-বুদ্ধ ওমর, খাব্বাবকে সঙ্গে লইয়া মোস্তফা চরণে শরণ গ্রহণের জন্য তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

সে নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরের কথা। তখন হযরত এছলামের অনুরক্ত ভক্তগণকে লইয়া, দূর ছাফা পর্বত প্রান্তরে আরকাম নামক ভক্তের বাটীতে বসিয়া তাঁহাদিগকে ধর্মশিক্ষা দিতেন। কোরেশদিগের উপদ্রবে নগরের কোন স্থানে তাঁহাদিগের দু-দণ্ড স্থির হইয়া বসিবার সুবিধা ছিল না।

ওমর কোরেশবংশজাত প্রথিতনামা বীর। তাঁহার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, তেজদৃপ্ত নয়ন-যুগল, উজ্জ্বল লোহিতাভ দেহকান্তি, সুগম্ভীর বদনমণ্ডল ; তাঁহার সর্বজনবিদিত শৌর্যবীর্যের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার নামে বিশেষ গুরুত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। ওমর পূর্বে ইছলামের যে ঘোর শত্রুতা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এক্ষেত্রে ওমর বামদেশে দীর্ঘ তরবারী বিলম্বিত করতঃ আরকামের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। হযরত আবুবাকর, হামজা, আলী প্রভৃতি সকলেই তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন ছাহাবী ছিদ্র পথ হইতে দেখিলেন, ওমর উলঙ্গ তরবারী হস্তে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ওমরকে এই অবস্থায় দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া হযরতকে বলিলেন,—'খাত্তাবের পুত্র ওমর উলঙ্গ তরবারী হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ! বীরবর আমীর হামজা উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলেন, তাহাতে কি-আসিতে দাও !

گر از راه صدق آمده، مرحبا !      و گر باشد او را بخاطر دغا

به تیغے که دارد حمایل عمر      تنش را سبکسار سازم ز سر ! *

'যদি সদুদ্দেশ্যে আসিয়া থাকেন, মারহাবা, আসুন ! অন্যথায় তাঁহারই তরবারী দ্বারা তাঁহার মুণ্ডপাত করিব !' কিন্তু হযরত ইহাতে একটুও বিচলিত হইলেন না, ওমর কি করিতে পারে ? তাঁহার রক্ষক তাঁহার সর্বশক্তিমান প্রভু যে তাঁহার সঙ্গে আছেন ! তিনি ধীরভাবে বলিলেন—'আসিতে দাও।'

ওমর গৃহে প্রবেশ করিল, হযরত তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সবলে ঝটকা দিয়া বলিলেন—আর কতদিন, ওমর ! আর কতদিন সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে ? লজ্জিত অনুতপ্ত ওমর, ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—মহাত্মন ! আমি সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্যই মহাশয় সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। মোস্তফা চরণের দাসানুদাস ওমর আজ প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতেছে যে, সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য হইতে পারে না, এবং মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও রছুল।

## এছলামের প্রথম তকবির নিনাদ

অনুতাপ, ভক্তি ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক স্বরে ওমর তখন 'কলেমা' পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখে আল্লাহর নামের জয়গান শ্রবণ করিয়া হযরত উৎফুল্ল হইয়া জয়ধ্বনি করিলেন—"আল্লাহু আকবর।"—ভক্ত অনুচরগণও সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি করিলেন—"আল্লাহু আকবর।"—উন্মুক্ত প্রান্তর পার হইয়া কা'বার প্রস্তর প্রাচীরকে কাঁপাইয়া সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল—"আল্লাহু আকবর।"** বলা বাহুল্য যে, ইহাই এছলামের সর্বপ্রথম জয়ধ্বনি।

---

* বোখারী, ২৫—৫৪১, ৪২ পৃষ্ঠা

** বোখারী, ফৎহুলবারী ও এছাবার বর্ণিত বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের রেওয়ায়ৎ, এবনে-হেশাম, খাল্‌দুন, হালবী প্রভৃতি ইতিহাসের বর্ণনা সমূহ একত্র আলোচনা পূর্বক আমরা এই বিবরণটি সঙ্কলন করিলাম।

## ওমরের পরীক্ষা

হযরত ওমর এছলাম গ্রহণ করিলে কয়েকদিনের মধ্যে পর পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, সাধারণ ঐতিহাসিকগণ সেগুলিকে এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা দেখিলে বোধ হয় যেন এগুলি কাণ্ড কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাদীছ গ্রন্থসমূহের অনুশীলন করিলে জানা যায় যে, এছলাম গ্রহণের পর ওমরকেও কঠোর পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার স্বজাতীয়েরা তাঁহার গৃহ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করারও চেষ্টা করিয়াছিল।* কোরেশগণ একদিন কা'বার নিকটে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, অনেক সময় পর্যন্ত হযরত ওমর আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অধিক ছিল বলিয়া অবশেষে তাহাদিগের প্রহারে ওমরকে জর্জরিত হইতে হইয়াছিল। এই সময় ওমরের মুখে একমাত্র কথা ছিল 'যাহাই কর না কেন, সত্য কখনও পরিত্যাজ্য নহে।'** হযরত ওমর এছলাম গ্রহণ করার পর দিবস প্রাতে উঠিয়া কোরেশদিগের মধ্যে যাহারা এছলামের প্রধান বৈরী ছিল, তাহাদিগের বাটীতে গিয়া বলিয়া আসিলেন—'আমি মুছলমান হইয়াছি।' তিনি জীবনে কখনও নিজের মত গোপন করেন নাই।

## মক্কা নগরে মোছলেম মিছিল

এই সকল হাঙ্গামায় কয়েকদিন কাটিয়া যাওয়ার পর, একদিন ওমর আরকাম-গৃহে উপস্থিত হইয়া হযরতের খেদমতে আরজ করিলেন—কোরেশ মিথ্যা ধর্ম লইয়া, মিথ্যা ঈশ্বরকে লইয়া কা'বায় প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগের উপাসনা করিবে, আর সত্যধর্মের সেবক আমরা—নিত্য সত্য আল্লাহর নামে আত্মোৎসর্গকারী আমরা— চিরকালই কি এইভাবে সত্যকে গোপন করিয়া রাখিব ! সেখানে আল্লাহর নাম করার অধিকারও কি আমাদিগের নাই ? বলা বাহুল্য যে, হযরত আনন্দের সহিত ওমরের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন, ছাহাবাগণের হর্ষের আর অবধি রহিল না। তখন আকার অবিতাক হইতে এছলামের প্রথম 'জয়যাত্রা' মুছলমানদিগের প্রথম demonstration, প্রথম শোভাযাত্রা নগরের দিকে অগ্রসর হইল। ভক্তগণ দুই ছত্রে বিভক্ত হইলেন। আমীর হামজা ও ওমর ফারুক দুই ছত্রের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন—হযরত ইহার মধ্যস্থলে। এমনই ভাবে সত্যের সেবকগণের প্রথম অভিযান, আল্লাহর নামের জয়ধ্বনি করিতে করিতে, মিথ্যার শক্তিকেন্দ্রের উপর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাত্রা করিল। চাঞ্চল্য নাই, উৎকণ্ঠা নাই, ক্রোধ বা বিদ্বেষের নামগন্ধও নাই। ভক্তগণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া নীরবে কা'বায় প্রবেশ করিলেন এবং হযরত এব্রাহিম ও এছমাইলের প্রতিষ্ঠিত জগতের প্রাচীনতম মছজিদে আল্লাহর নাম লইয়া দুই রাকআৎ নামায সমাধা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।***

শত্রুগণ নির্নিমেষনেত্রে রুদ্ধশ্বাসে ইহা অবলোকন করিল। কিন্তু একদিকে ন্যায়ের আত্ম-প্রতিষ্ঠা, ভক্তগণের অসাধারণ চরিত্রবলের প্রভাব, অন্যদিকে হামজা ও ওমরের বিক্রমে তাহারা যেন আত্মহারা হইয়া পড়িল।

নবুয়াতের ষষ্ঠ বৎসরের প্রারম্ভে হযরত ওমর এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।****

---

* বোখারী, ২৫—৫৪২, ৪২, পৃষ্ঠা

** এজমাল—ওমর, এবনে-হেশাম ১—১১৯ প্রভৃতি

*** আহমদ, তিরমিজী, এবনে অসাকর হইতে। এবনে-হেশাম ৪—১১৯ ; এছাবা, এস্তিয়াব, এজমাল—'ওমর'। এবনে খালদুন ২—৩১, ৩২ ; কামেল, হলবি প্রভৃতি।

**** এজমাল, ফৎহুলবারী ২৫—৪৪১, ৪২ পৃষ্ঠা দেখুন।

# চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

فلسنا ورب البيت نسلم احمدا

لعزاء من عض الزمان ولا كرب

## কঠোরতর পরীক্ষা

মুছলমানগণ আবিসিনিয়ায় গমন করিয়া নির্বিঘ্নে আপনাদের ধর্মকর্ম সমাধা করিতেছেন, নাজ্জাশীর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াও কোন সুফল ফলিল না। কোরেশগণ নিজেদের মুছলমান হওয়ার মিথ্যা সংবাদ রটাইয়া যে মতলব আঁটিয়াছিল, তাহাও বিফল হইয়া গেল। বরং আবিসিনিয়া-রাজের সহানুভূতির কথা শুনিয়া দ্বিতীয় দলে বহু সংখ্যক মুছলমান তথায় প্রস্থান করিয়া উৎপীড়ন হইতে বাঁচিয়া গেল। তাহাদিগের সমস্ত চেষ্টাই এইরূপে ব্যর্থ হইয়া যাওয়াতে বরং বিপরীত ফল প্রসব করিতে লাগিল, ইহাতে কোরেশ দলপতিগণের ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহার পর তাহারা যখন দেখিল, আমীর হামজা ও ওমর ফারুকের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ বীর ও মান্যগণ্য ব্যক্তি কয়েক দিনের ব্যবধানে এছলাম গ্রহণ করিলেন, মুছলমানগণ দলবদ্ধ হইয়া কা'বা গৃহে প্রকাশ্যভাবে নামায পড়িয়া গেলেন, তখন তাহাদিগের ক্রোধ, ক্ষোভ ও অভিমান প্রচণ্ড আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। কয়েক দিনের ভীষণ আন্দোলন ও হুজ্জত-হাঙ্গামার পর একদিন তাহারা সমস্ত কোরেশকে এক পরামর্শ সভায় সমবেত করিল, সকলে একত্র হইয়া নানা প্রকার তর্কবিতর্কের পর এক প্রতিজ্ঞা-পত্র নিপিবদ্ধ করিল

## কোরেশের নূতন সঙ্কল্প

কোরেশ দলপতিগণ বহুদিন হইতে হযরতের প্রাণবধ করার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু হাশেম ও মোত্তালেব বংশের প্রতিবাদে তাহা কার্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারে নাই। আবু-তালেবের নিকটও তাহারা দাবী করিয়াছিল যে, 'বিনিময়ে অন্য একজন যুবককে লইয়া মোহাম্মদকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ কর, আমরা তাহার প্রাণবধ করিয়া বিপ্লব নিবারণ করি।' এই সময় হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের কোরেশগণ—বিশেষতঃ তাহাদের নব্য যুবকগণ—শাণিত খড়্গ হস্তে তাহার যেরূপ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং এই গোত্রদ্বয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কেন তাহারা সাহস করিতেছিল না, যথাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি।

## সামাজিক শাসন

বর্তমান সভায় সেইজন্য সামাজিক শাসনের প্রস্তাবই গৃহীত হইল। প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখিত হইল যে, হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের সহায়তার ফলেই মোহাম্মদের স্পর্ধা এতদূর বাড়িয়া যাইতেছে। অতএব তাহাদিগকে—এবং মোহাম্মদ ও তাহার দলস্থ ছাবী-নাস্তিক বা না-মজহাবী-দিগকে একদম বয়কট করিতে হইবে। তাহাদিগের সহিত ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক আদান-প্রদান, আলাপ-কুশল সব বন্ধ থাকিবে। কেহ তাহাদিগের কন্যা গ্রহণ করিতে বা তাহাদিগকে কন্যা দান করিতে পারিবে না, তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ একেবারে রহিত হইয়া যাইবে। কেহ তাহাদিগকে কোন অবস্থায় কোন প্রকার সাহায্য করিলে, তিনি কঠোর দণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।—যাবৎ তাহারা হত্যা করিবার জন্য স্বেচ্ছায় মোহাম্মদকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ না করিবে, তাবৎ এই প্রতিজ্ঞাপত্র বলবৎ থাকিবে।

ঠাকুর-দেবতা সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইল এবং ঠাকুর-দেবতাদিগের তত্ত্বাবধানে কা'বায় তাহা লটকাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু ধন্য হাশেমী-মোত্তালেবী বীরগণ, তাঁহারা ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। জগতে আল্লাহ্‌র মহিমা পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার জন্য

যে মহামানবকে নির্বাচিত করা হইয়াছিল, তিনি যে গোত্র-গোষ্ঠী হইতে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাহাতে নিশ্চয় একটা কিছু বিশেষত্ব ছিল। যাহা হউক, এক নরাধম আবুলাহাব ব্যতীত আর সকলেই কোরেশের এই অন্যায় দণ্ড বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হযরতকে শত্রুদিগের হস্তে সমর্পণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

## অন্তরীণে তিন বৎসর

কোরেশগণ যেরূপভাবে দলবদ্ধ হইয়াছে, যেরূপভাবে তাহারা ক্রমশঃ ভীষণতর মূর্তি ধারণ করিতেছে, যেরূপভাবে পুরাদস্তুর নিজেদের এই 'বয়কট' সফল করার জন্য কঠোরতর ব্যবস্থা করিতেছে তাহাতে নগরে অবস্থান করিলে অল্প দিনের মধ্যে তাহাদিগকে অন্নাভাবে মারা পড়িতে হইবে। বাহিরে কোথাও গমন করিতে পারিলে মধ্যে মধ্যে সঙ্গোপনে সন্তর্পণে হয় ত' বাহির হইতে খাদ্যসম্ভারাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা দূরে হাশেম বংশের বহুকালের অধিকৃত এক (মৌরুশী) গিরিসঙ্কটে গিয়া অস্থায়ীরূপে নিজেদের আবাস রচনা করিলেন। যাঁহারা গিরিসঙ্কটে পর্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সাময়িক কারণও সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইহা নবুয়তের সপ্তম সনের প্রারম্ভিক সময়ের ঘটনা। এই সময়ে মহাত্মা আবু-তালেব, সমস্ত কোরেশগণকে সম্বোধন করিয়া যে কবিতা পাঠ* করিয়াছিলেন, তাহার একটি পদ এই অধ্যায়ের শীর্ষদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে। আবু-তালেব বলিতেছেন—'(এই) মছজিদ-স্বামীর দিব্য, আমরা আহমদকে কখনই তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিব না। কাল তাহার সমস্ত বিপদ ও সমস্ত দুঃখ লইয়া দংশন করিলেও নহে।'

## পরীক্ষা ও ঈমান

মোছলেম-কুল-জননী বিবি আয়েশাকে হযরতের চরিত্রের কথা বলিতে অনুরোধ করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—خلقه القرآن কোরআনই তাঁহার চরিত্রের অভিব্যক্তি। অতএব এরূপ বিপদের সময় হযরত ও তাঁহার ভক্তগণ কি করিয়াছিলেন, আমরা কোরআনের সাহায্যে তাহা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারি। কোরআন বলিতেছে ঃ

"নিশ্চয়ই তোমাদিগকে ভীতি দ্বারা, ক্ষুধার দ্বারা, ধন-প্রাণ ও শস্যাদির ক্ষতি দ্বারা একটু 'পরীক্ষা' করিব। অপিচ (হে রছুল) তুমি, সেই ধৈর্যশীল (কর্মী)-গণকে সুসংবাদ দাও, যাহারা—যখন তাহাদিগের উপর বিপদ আপতিত হয়—তখন বলিয়া থাকে যে, আমরা ত আল্লাহ্‌রই সম্পত্তি এবং আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিব। ইহারাই তাহারা, যাহাদিগের উপর আল্লাহর অশেষ আশীর্বাদ (বর্ষিত হয়) এবং ইহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।" (বাকারা, ২—৩)

"তোমরা কি মনে করিয়াছ যে (এমনই কেবল মুখের কথায়) স্বর্গে গমন করিবে ? অথচ এখনও তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীগণের (নবী ও তাহার সহচরবর্গের) অবস্থায় উপনীত হও নাই। বিপদের উপর বিপদ এবং আঘাতের উপর আঘাত তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল, (এমন কি তাহাদিগের অস্তিত্ব পর্যন্ত সমূলে) প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল—"(ঐ ২—১০)

"আলেফ-লাম-মীম। লোকে কি ইহা মনে করিয়া লইয়াছে যে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' ইহা বলিলেই বিনা পরীক্ষায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ? (না—কখনই নহে)। তাহাদিগের পূর্ববর্তী (মোছলেম)-গণকেও আমি পরীক্ষা করিয়াছি, অপিচ আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জানিয়া লইবেন যে, (মুছলমান হইয়াছি—এই উক্তিতে) কাহারা সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদী কাহারা ।" (আনকাবুৎ)

* কবিতা পাঠ বলিলে আমরা যাহা বুঝি, আরবী কবিতা সেরূপ নহে। সুখ-দুঃখ, আপদ-বিপদ বা অন্য যে কোন কারণে আরব-হৃদয়ে আলোড়ন উপস্থিত হইলে সে তখনই তাহা ব্যক্ত করিত। এই নিরক্ষর কবিগণের কবিতাই আরবী সাহিত্যের প্রধান গৌরবের বস্তু।

সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ও এছলামের সেবকগণ এই পরীক্ষার জন্য সততই প্রস্তুত ছিলেন এবং দৃঢ়চেতা বীরের ও একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় বুক পাতিয়া অম্লানবদনে সেগুলিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

## চরম ক্লেশ ভোগ

হঠাৎ যে এইরূপ ঘটিবে, তাহা কাহারও জানা ছিল না। কাজেই খাদ্যশস্যাদিও তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করার সময় পাইলেন না। যাঁহার নিকট যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহাই লইয়া তাঁহারা এই গিরিসঙ্কটে প্রস্থান করিলেন। কাজেই অল্প দিনের মধ্যে খাদ্যের অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। এদিকে মক্কাবাসিগণ তাঁহাদিগের আটঘাট বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। ফলে বাহির হইতে কোন খাদ্য সংগ্রহ করাও এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কাজেই যত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া চলিল, তাঁহাদিগের খাদ্যাভাবও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস এইভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল। 'আবদ্ধ পরিবারবর্গের ননীর পুতুল শিশু-সন্তানগুলি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া যখন মর্ম-বিদারক স্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন গিরিসঙ্কটের বাহির হইতেও সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত।' শিশুর ক্রন্দনে পাহাড়ও বুঝি কাঁপিয়া উঠিত, কিন্তু মক্কাবাসীর পাষাণ হৃদয় তাহাতে একটুও বিচলিত হইত না। একদিন নয়, দুই দিন নয়, দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ দুইটি বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল। ছাহাবাগণ বলিয়াছেন, এই সময় আমরা গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিতাম। পানীয় জলের অভাবে ও বৃক্ষপত্র ভক্ষণের ফলে আমাদিগের মল ছাগ-মেষাদির মলের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল।* সময় সময় কেহ কেহ শুষ্ক চর্ম অগ্নিদগ্ধ করিয়া তাহা দ্বারা জঠর-জ্বালা নিবৃত্তি করার চেষ্টা করিয়াছেন।** কিন্তু ধন্য ধৈর্য, ধন্য মোস্তফা চরিত্রের পুণ্য প্রভাব! এত বিপদে একটি হৃদয়ও বিচলিত হইল না। পাঠক, একবার অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন: অসহ্য উদর জ্বালা, আকণ্ঠ তৃষ্ণা, ক্ষুধার্ত শিশু-সন্তানদিগের কাতর ক্রন্দন, স্বজনগণের বিমর্ষ-মলিন মুখমণ্ডল, এবং সর্বোপরি সম্মুখে আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ বিভীষিকা। এ পরীক্ষার তুলনা নাই, এ ধৈর্যের তুলনা নাই, এ মহিমার তুলনা নাই—তাই এ সাফল্যেরও তুলনা নাই। মুষ্টিমেয় আরব দুই দিনের মধ্যে 'পশ্চিমে হিস্পানী শেষ পূর্বে সিন্ধু হিন্দু দেশ' পর্যন্ত কোন শক্তিবলে নিজেদের পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এই সকল ঘটনা হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

আরবের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, হজের সময় কিছুদিন তাহারা নরহত্যা ইত্যাদি দুষ্কার্য হইতে বিরত থাকিত। হযরত এই অবসর সময়ে গিরিসঙ্কট হইতে বহির্গত হইয়া সকলকে আল্লাহর পাকে আহ্বান করিতেন। তাঁহার উপদেশ যাহাতে নিষ্ফল হইয়া যায়, সেই জন্য কোরেশগণ কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। 'আবু-তালেবের গিরিসঙ্কটে' এইরূপ কঠোর সঙ্কটময় অবস্থায় দীর্ঘ দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

## অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া

অত্যাচারের চরম ভীষণতা সন্দর্শন করিয়া, এই সময় কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির মন বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা এই 'বয়কট' ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য যুক্তি-পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সর্বপ্রথমে হেশাম নামক এক ব্যক্তি ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া জোহায়েরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া মোছলমানদিগের দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করিলেন। জোহায়ের আবদুল মোত্তালেবের দৌহিত্র, আবু-তালেবের ভাগিনেয়, মাতুলকুলের এই দুর্দশায় তাঁহার মন পূর্ব হইতে বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু একা বলিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। হেশামের কথা শুনিয়া তিনি ব্যথিতস্বরে উত্তর করিলেন—'কথা ত' সমস্তই

---

* সমস্ত ইতিহাস ও বিভিন্ন হাদিছ পুস্তকে ইহার বিবরণ আছে। ** রহমতুল্লিল আলামীন—শিবলী

ঠিক, কিন্তু একা আমি কি করিতে পারি ?' অবশেষে ইঁহারা দুইজনে যুক্তি করিয়া আবুল বাখতারী, মোৎএম, জামআ, কায়েস ও জোহেরকে নিজেদের মতে আনয়ন করিলেন। কয়েকদিন যুক্তি-পরামর্শ করার পর একদা গভীর রাত্রে কা'বা গৃহে বসিয়া তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে হউক, এ অনাচারের প্রতিকার করিতেই হইবে। পাকাপাকি প্রতিজ্ঞার পর স্থির হইল, আগামীকল্য প্রাতে, যখন কোরেশ দলপতিগণ ও অন্যান্য সকলে কা'বার নিকট সমবেত হইবে, সেই সময় কথা তুলিতে হইবে। স্থির হইল, জোহের প্রথমে কথা পাড়িবেন, তাহার পর সভার বিভিন্ন স্থান হইতে আর সকলে তাঁহার সমর্থন করিবেন।

পূর্ব কথিত মতে পরদিন প্রাতে সকলে মজলিসে উপস্থিত হইলেন এবং উপযুক্ত সুযোগ দেখিয়া জোহের বলিতে লাগিলেন ঃ 'হে মক্কাবাসিগণ ! আমরা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিব, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিব, আর বানি-হাশেম ধ্বংস হইয়া যাইবে ? তাহাদিগের সহিত সমস্ত আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এ কেমন বিচার ? এখনও কি তোমাদিগের নৃশংসতা চরিতার্থ হয় নাই ? তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার, আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে নহি, এ অমানুষিক অত্যাচারের সমর্থন আমি করিব না। আল্লাহর দিব্য, এই বর্বর প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।'

পাষণ্ড আবুজেহেল সভার এক প্রান্তে বসিয়া ছিল, জোহেরের কথা শুনিয়া ক্রোধে তাহার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—"কখনই নয়, ইহা কখনই হইতে পারিবে না। মিথ্যাবাদী, এ প্রতিজ্ঞা পত্র কখনই নষ্ট করা হইবে না।" জোহেরের দলে যে আরও মানুষ আছে, আবুজেহেল তাহা জানিত না। তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে জাম্‌আ বলিয়া উঠিলেন—'আসল মিথ্যাবাদী তুমি ! জোহের ত' ন্যায্য কথাই বলিয়াছেন। কিসের প্রতিজ্ঞা-পত্র, উহা লেখার সময়ও আমাদের মত ছিল না।' সভার অন্য প্রান্ত হইতে আবুল বাখতারী বলিয়া উঠিলেন—"ইঁহারা খুব সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন, আমরা ঐ প্রতিজ্ঞায় রাজী ছিলাম না, এখনও উহা মান্য করিতে বাধ্য নহি।" হেশাম আত্মীয়, কাজেই তিনি সর্বশেষে পূর্ববর্তী বক্তাগণের কথার সমর্থন করিলেন। আবুজেহেল তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল—"আজ এটা অন্যায় প্রতিজ্ঞা-পত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে ! যে রাত্রে কা'বায় বসিয়া ইহা লেখা হয়, আবু-তালেবও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন—"

আবুজেহেলের কথা শেষ হইবার পূর্বেই মোৎএম লম্ফ দিয়া প্রতিজ্ঞা-পত্রখানা ছিঁড়িয়া আনিলেন, তখন উহা কীটদষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, ইঁহারা তখনই ঐ প্রতিজ্ঞা-পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এবং এই কয়জন প্রধান ব্যক্তি উলঙ্গ তরবারী লইয়া গিরিসঙ্কটে গমনপূর্বক দুই বৎসর কয়েক মাস পরে আবদ্ধ নর-নারী ও বালক-বালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় গমন করিলেন।*

## বিপদ আল্লাহর দান

বিপদ আল্লাহর দান, আঘাত ও বেদনা স্বর্গের আশীর্বাদ। মাটি ততক্ষণ পর্যন্ত ইট হইতে পারে না, যতক্ষণ না দলিত-মথিত হইতে—অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতে—স্বীকৃত হয়। পরীক্ষার অর্থ ইহা নহে যে, খোদা তাআলা জানেন না বলিয়া যাচাই-বাছাই করিয়া লোক নির্বাচন করিয়া লন। দৈব ও পাশব প্রবৃত্তিদ্বয়ের মধ্যেই জ্ঞান ও বিবেকের স্থান। নিয়ত সুখ-সম্পদ ও ভোগবিলাসে পাশবপ্রবৃত্তিটা প্রবল হইয়া জ্ঞানের গলা চাপিয়া ধরিতে চায়। তাই মানুষের শিরায় শিরায় অবস্থিত ঐ শয়তানটাকে দমন করার জন্য স্বর্গ হইতে বিপদের দান আসিয়া আঘাতে আঘাতে মানবকে ঐশীভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকে। এই জন্য মহাপুরুষগণই অধিকতর পরীক্ষার অধীন হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে মোস্তফার পরীক্ষা আবার সর্বাপেক্ষা কঠিন,

---

* তাবকাত ১—১৩৯ হইতে ৪১ ; এবনে-হেশাম ২—৩২, ৩৩ ; তাবরী ২—২২৫ প্রভৃতি।

সর্বাপেক্ষা কঠোর। কারণ প্রেমে-পুণ্যে, ধৈর্যে-বীর্যে, তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠতম মানবরূপে গঠন করিয়া, তাঁহাকে—তাঁহার উপদেশকে মাত্র নহে—(কারণ উপদেশ দেওয়া সহজ) মানবজাতির পূর্ণতম আদর্শরূপে গঠন করাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। তাই মাতৃগর্ভ হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহার এই অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী কঠোর অনল পরীক্ষা।

এই দীর্ঘ তিন বৎসরকাল মোস্তফা-সন্নিধানে অবস্থান করার ফলে, মোছলেম নর-নারিগণের জ্ঞান ও চরিত্রের যে কতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে হাশেম বংশের সমস্ত লোক, এতদিন পরে বাহিরের কোন্দল-কোলাহল ও হিংসা-বিদ্বেষ বিরহিত হইয়া, শান্তভাবে মোস্তফার প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের সুযোগ পাইল তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, চরিত্রের মধুরতা ও শিক্ষার সৌন্দর্য, তখন তাহাদিগের মনের উপর কি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই ?

হযরতের অতি নিকট আত্মীয়গণ তাঁহার আশৈশবের সকল অবস্থা জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার ভিতর-বাহিরের সকল দিক যাঁহারা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন, তাঁহারা কখনই হযরতকে ভণ্ড বা কপট বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই, বরং সকলেই তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহারা তখনও মোস্তফার ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, আপনাদিগের পুরুষানুক্রমিক ধর্মের মোহ কাটাইতে পারেন নাই। তখনও সেই পরম্পরাগত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি তাহাদিগের মনের উপর পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিয়া ছিল। ভীষণ দর্শন হোবল ঠাকুরের ক্রোধভয়ে তখনও তাহাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। অথচ হযরত তাহারই প্রতিবাদ করিতেন—এই সংস্কারগুলির অলীকতা প্রতিপাদন করিয়া যুক্তি প্রদর্শন ও বক্তৃতা প্রদান করিতেন। এহেন "মোহাম্মদের" জন্য তাঁহারা সকলেই সমগ্র কোরেশ জাতির বিরাগভাজন হইতে গেলেন কেন ? নিঃস্ব-নিঃসম্বল মোস্তফার জন্য এই তিন বৎসরব্যাপী কঠোর কারাক্লেশ সহ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন কেন ? এখানে এই কথাগুলিও একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

## পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك
ان ذلك من عزم الأمور

### নূতন বিপদ ও কঠোরতর পরীক্ষা

নবুয়তের দশম সালে—সম্ভবতঃ মোহররম মাসে—হযরত শি'বিসঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বজনগণসহ পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর কয়েকটা মাস অপেক্ষাকৃত শান্তভাবেই কাটিয়া গেল। তখন নিজেদের সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া কোরেশ দলপতিগণ যেন সাময়িকভাবে কতকটা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কোন প্রকার অত্যাচারই হযরতের সাধনপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। তজ্জন্য তাঁহাকে হত্যা করিয়াই তাহারা একদিনে সব আপদ চুকাইয়া বসার সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও বিফল হইয়া যাইতেছে। কোন প্রকার অর্থলোভে বা উৎপীড়ন-ভয়ে হাশেম বংশীয়গণ যে হযরতকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবে না, একথাও এখন তাহারা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছে। এখন প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ফলে এই সকল চিন্তায় তাহাদিগের মন ও মস্তিষ্ক সর্বদাই উত্তেজিত ও আলোড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল—আবু-তালেব সহায়তা না করিলে এতদিন কবে তাঁহারা মোহাম্মদকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া তাঁহার ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিত। মোস্তফা-চরিতের

বাহ্যদর্শী পাঠকবর্গের মনেও এই প্রকার একটা ভ্রান্ত ধারণা স্থানলাভ করিতে পারে। কিন্তু যে সর্বশক্তিমান, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে নিজের বাণী দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি কাহাকেও এই প্রকার ধারণা পোষণের সুযোগ দিলেন না। আল্লাহর রছুল, সত্যের সেবক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার সাধনা কোন পার্থিব কারণ-উপকরণের দ্বারা জয়যুক্ত হয় নাই। বরং তিনি একমাত্র সেই সর্বশক্তিমানের সাহায্যে, সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই জীবনের এই ঘোর সঙ্কট সময়ে তাঁহার জীবনসঙ্গিনী সহধর্মিণী, এছলামের সর্বপ্রথম সহায় ও সর্বপ্রথম মুছলমান, মোছলেম কুল-জননী, বিবি খদিজা—এবং পার্থিব হিসাবে হযরতের সর্বপ্রধান বা একমাত্র সহায় মহাত্মা আবু-তালেব, মাত্র একমাস পাঁচ দিনের ব্যবধানে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন।

## বিবি খদিজার মৃত্যু

গিরিসঙ্কট হইতে বাহির হইবার কয়েক মাস পরেই বিবি খদিজা পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৫ বৎসর। বলা বাহুল্য যে, বিবি খদিজার ন্যায় পুণ্যবতী ও ভাগ্যবতী নারী জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী লইয়া বিস্তৃতরূপে আলোচনা করার সুযোগ আমাদিগের নাই। তবে এই পুস্তকে আমরা তাঁহার চরিত্র-মহিমার যতটুকু আভাস প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, বাস্তবিকই আল্লাহ্ তাঁহাকে আদর্শ মহিলারূপেই পয়দা করিয়াছিলেন। জগতের সকলেই যখন হযরতের উপদেশকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, তখন এই মহীয়সী মহিলাই সর্বপ্রথমে তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। হেরা গিরি গুহায় নামুছে-আকবরের প্রথম পরিচয়ের পর, যখন স্বয়ং হযরতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও এই পুণ্যবতী মহিলাই প্রকৃত সহধর্মিণীর ন্যায় হযরতকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—"হে সৎ! হে মহৎ! আপনার ন্যায় মহাজনকে আল্লাহ কখনই বিধ্বস্ত হইতে দিবেন না।" আজ এই ঘোর সঙ্কটকালে, কর্মজীবনের সর্বপ্রথম সঙ্গিনী এবং ধর্ম-জগতের সর্বপ্রথম শিষ্যা, সুখে-দুঃখে বিপদে সম্পদে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত স্বীয় সহধর্মিণীধর্ম যথাযথভাবে পালন করিয়া, হযরতকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।* এহেন সহধর্মিণীর বিয়োগে হযরত যে নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিবি খদিজার পুণ্য স্মৃতি, আজীবন হযরতের হৃদয়ে কিরূপ করুণভাবে জাগরূক হইয়াছিল, বহু ছহী হাদীছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাটীতে কোন প্রকার উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইলে হযরত প্রথমে বিবি খদিজার আত্মীয়বর্গের বাটীতে হাদিয়া পাঠাইবার আদেশ করিতেন। হযরত সদাসর্বদাই বিবি খদিজার গুণগরিমার আলোচনা করিতেন বলিয়া বিবি আয়েশা একদা তাঁহাকে বলিলেন—হযরত সেই বৃদ্ধার কথা আপনি কি বিস্মৃত হইতে পারেন না! স্বয়ং বিবি আয়েশার রেওয়ায়ৎ, হযরত ইহার উত্তরে বলিলেন : "না, কখনই নহে। খদিজার প্রেম আমার অস্থিমজ্জাগত হইয়া আছে। সকল লোক যখন আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল—খদিজাই তখন আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন। সকলে যখন আমার কথাকে মিথ্যা বলিয়াছিল, খদিজাই তখন তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। যখন সকল লোক আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল—খদিজা তখন আমার প্রথম সহচরী হইয়াছিলেন। যখন অন্য সকলে আমাকে বর্জন করিয়াছিল—তখন খদিজাই ধর্মকার্যে ব্যয় করার নিমিত্ত তাঁহার ধনভাণ্ডার লুটাইয়া দিয়াছিলেন।"**

---

* এছাবা, এস্তিআব ও তহজিব—খদিজা। তাবকাত ১—১৪০, ৪১। আসেবা ২—৩৪। তাবরী ১—২২৯, হেশাম ১—১৪৫, জাহবী ও আবুল-ফেদা প্রভৃতি

** মোছলেম, মোছনাদ ও কান্জুল-ওম্মাল, ফাজায়েল—খদিজা।

## আবু-তালেবের মৃত্যু

তখনও শোকের সময় অতিবাহিত হয় নাই, সদ্য-বিয়োগ-বিধুরা কন্যাগণের নয়ন-নীর তখনও শুষ্ক হয় নাই। ইতিমধ্যেই—বিবি খদিজার মৃত্যুর মাত্র একমাস পাঁচ দিন পরে—আবু-তালেবও সংসারধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন। পার্থিব হিসাবে এই পরম্পরাগত বিপদের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ মাত্রেরই বিমর্ষ হইয়া পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু মোস্তফা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে—একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, একদিকে তিনি সম্পূর্ণ সংসারী এবং সংসারের সকল কাজকামে লিপ্ত, পক্ষান্তরে যুগপৎভাবে তিনি সংসারের সকল প্রকার মায়ামোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, একেবারে নির্লিপ্ত। সুতরাং এই সকল আঘাতে তাঁহার প্রেম-প্রবণ পবিত্র হৃদয় যথেষ্ট ব্যথিত হইল বটে, কিন্তু জীবনের কর্তব্য সাধনে কোন প্রকার নিরুৎসাহ ভাব বা অবসাদের ছায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। হযরত যথাপূর্ব পূর্ণ উদ্যমের সহিত সত্যের প্রচার করিতে থাকিলেন।

আবু-তালেবের শেষ সময় ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতেছে দেখিয়া, আবুজেহেল ও আবদুল্লাহ বেন উমাইয়া প্রভৃতি কোরেশ প্রধানগণ তথায় সমবেত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল: আপনাকে আমরা সকলে যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকি, তাহা আপনার অবিদিত নহে। আপনার সময় ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, তাহাও আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। পক্ষান্তরে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আমাদিগের বাদ-বিসংবাদের বিষয়ও আপনি সম্যকরূপে অবগত আছেন। এক্ষণে আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, আপনি বাঁচিয়া থাকিতে তাহার সহিত আমাদিগের একটা রফা-নিষ্পত্তি করিয়া দিন। সে প্রতিজ্ঞা করুক, আমাদিগের ধর্মের নিন্দা করিবে না—আমরা যাহা করি, তাহার কোন প্রতিবাদ করিবে না ; আমরাও প্রতিজ্ঞা করিব যে, ভবিষ্যতে আমরাও তাহার কোন কাজ-কথার বাদ-প্রতিবাদ করিব না। কোরেশ দলপতিগণের কথা শুনিয়া আবু-তালেব হযরতকে ডাকিতে পাঠাইলেন। পিতৃব্যের আহ্বান শ্রবণমাত্রই হযরত তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। এই সময় আবু-তালেবের নিকটে একজন লোকের বসিবার স্থান শূন্য ছিল। হযরতকে আগমন করিতে দেখিয়া দুরাত্মা আবুজেহেল লম্ফ দিয়া সে স্থানটি অধিকার করিয়া বসিল। যাহা হউক, আবু-তালেব হযরতকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট কোরেশ দলপতিগণের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু হযরত পূর্ববৎ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিলেন—যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহার প্রচার করিতে—আমি কোন অবস্থাতেই বিরত থাকিতে পারিব না। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে—শের্ক ও তাওহীদের সহিত রফা-নিষ্পত্তি হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। তাঁহারা এক আল্লাহকে স্বীকার করিয়া নিন, তাহা হইলে আমার আর কোন কথা থাকিবে না। কোরেশ দলপতিগণ রোষকষায়িত নয়নের ভীষণতাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে হযরতের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। রফা নিষ্পত্তির কথা এইখানে শেষ হইয়া গেল।

পিতৃব্যের আসন্নকাল নিকটবর্তী হইতেছে দেখিয়া হযরতের করুণ হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি আবু তালেবকে সম্বোধন করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন ঃ 'তাতঃ! এখনও সময় আছে, এখনও একবার বল—লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ।' আবুজেহেল প্রভৃতি দেখিল, হিতে-বিপরীত ঘটিবার উপক্রম হইতেছে। তাই তাহারা আবু-তালেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল ঃ 'আপনি কি শেষকালে আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন!' হযরত যতই তাঁহাকে তাওহীদ স্বীকার করিতে উপদেশ দান করেন, আবুজেহেল প্রভৃতি ততই ঐ প্রকার 'বাপ-দাদার' ধর্মের ও তাঁহাদের নামের দোহাই দিয়া তাঁহাকে তাহা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে আবু-তালেব তাওহীদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন—'আমি পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্মে আছি'।* বোখারী ও মোছলেম কর্তৃক অবুহুরায়রা ও আব্বাছের প্রমুখাৎ আরও দুইটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ হাদীছগুলির দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে যে,

---

* বোখারী, মোছলেম ও নাছাই মুছাইয়ের হইতে এবং মোছলেম ও তিরমিজী, কেতাব তফছির, আবু-হোরায়রা হইতে। হালবী, যাদুলমায়াদ, তাবরী প্রভৃতি।

আবু-তালেব পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, এবং কাফের অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। প্রথমে মোছাইয়ব কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীছের আংশিক উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও ইহা স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ হইতেছে। এমন কি কোরআনের দুইটি আয়ৎ হইতেও নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আবু-তালেব এছলাম গ্রহণ করেন নাই।*

## আবার অত্যাচার

বিবি খদিজা ও আবু-তালেবের মৃত্যুর পর কোরেশদিগের অত্যাচারের পথ একেবারে নিষ্কণ্টক হইয়া গেল। এখন তাহারা মনের ক্ষোভ মিটাইয়া হযরতকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। ইমাম বোখারী একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই সকল অত্যাচারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিহাস ও চরিত পুস্তকগুলিতে এবং তফছির গ্রন্থসমূহে মক্কায় অবতীর্ণ বিভিন্ন আয়তের আলোচনা প্রসঙ্গে, এই অত্যাচার-সংক্রান্ত বহু ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলি পাঠ করিতে করিতে, একদিকে কোরেশদিগের নৃশংস ও পাশবভাব এবং অন্যদিকে হযরতের অসাধারণ ধৈর্য ও অটুট সঙ্কল্প দর্শনে শরীর ও মন যুগপৎভাবে রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইয়া উঠে। হযরত যাহাতে বাটীর বাহির হইতে না পারেন—হইলেও যাহাতে কাঁটাখোঁচায় বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সেজন্য নরাধমগণ তাঁহার গৃহদ্বারে কাঁটা বিছাইয়া রাখিত। হযরত সেগুলিকে অপসারিত করিতেন এবং স্বজনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—হে আবদে মানাফ বংশীয়গণ ! এই কি প্রতিবেশ ধর্ম ?** হযরত কা'বায় নামাযে প্রবৃত্ত—ভূলুণ্ঠিত শিরে স্বীয় প্রাণ-প্রতীমের মহিমাধ্যানে তন্ময়-তদগত। ইহা কোরেশদিগের অসহ্য। তাই তাহারা কখনও উষ্ট্রের ভুঁড়ী আবার কখনও বা সদ্যপ্রসূতা ছাগীর 'ফুল' আনিয়া এই অবস্থাতেই তাঁহার মাথার উপর চাপাইয়া দিত। এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে।*** একদিন বিবি ফাতেমা পিতার এই অবস্থার সংবাদ পাইয়া স্বয়ং কা'বায় উপস্থিত হন এবং রুদ্ধ কণ্ঠে পিতার পৃষ্ঠদেশ হইতে ঐ ন্যক্কারজনক বস্তুগুলি ফেলিয়া দেন। আবদুল্লাহ্ বেন-মাছউদ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।**** আর একদিন হযরত নামাযে মগ্ন হইয়া আছেন দেখিয়া, ওকবা প্রভৃতি কয়েকজন কোরেশ তথায় উপস্থিত হইল এবং ওকবা নিজের চাদর দড়ির মত করিয়া পাকাইয়া তাহা হযরতের গলায় দিয়া অনবরত মোড়া দিতে লাগিল। ইহার ফলে হযরতের ঘাড় বেঁকিয়া গেল এবং তাঁহার শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হইল। সে সময় ভক্তপ্রবর মহাত্মা আবুবাকর ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হন। আবুবাকর সবলে ওকবাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন এবং নরাধমগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله -

'তোমরা একটা মানুষকে কি এই অপরাধে খুন করিয়া ফেলিবে যে, তিনি আল্লাহকে নিজের মালেক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন !' আমর-বেন-আছ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।$ একদা হযরত নিজের ভাবে বিভোর হইয়া পথ বহিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় জনৈক দুর্বৃত্ত আসিয়া কতকগুলি ধুলা-মাটি ও আবর্জনা তাঁহার মাথার উপর ফেলিয়া দিল। হযরত সেই অবস্থায় বাটীতে গমন করিলেন। হযরতের কন্যা আসিয়া তাঁহার মাথা ধুইয়া দিতে লাগিলেন, আর তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া

---

* দেখুন : কাছাছ ৬ ও তাওবা ১৪ রুকু। এ সম্বন্ধে এবনে-এছহাক আব্বাছের যে রেওয়ায়ৎ দিয়াছেন তাহা মুর্ছাল। বায়হকীর কাছে বর্ণনাকে স্বয়ং বায়হাকী 'মনকাতা' বলিয়াছেন। অধিকন্তু ইহার কয়েকজন রাবী অজ্ঞাত। কোরআন ও ছহী হাদীছগুলির মোকাবেলায় উহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

** তাবরী, কামেল প্রভৃতি।

*** ফৎহুল বারী ২৫—৪৩৭। **** বোখারী ২৫—৪৩৫ পৃষ্ঠা হইতে।

$ বোখারী, তাবরী, এবনে-হেশাম, জাদুল-মাআদ, হালবী প্রভৃতি।

পড়িতে লাগিল। পিতাগতপ্রাণ মাতৃহীন কন্যার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হযরত তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—মা ! কাঁদিও না, বিচলিত হইও না। আল্লাহ্ স্বয়ং তোমার পিতাকে রক্ষা করিবেন।* নরাধমেরা তাঁহার খাদ্যে পর্যন্ত নানা প্রকার আবর্জনা ও ঘৃণিত বস্তু মিশাইয়া দিত।** পথে-ঘাটে নীচ ভাষায় গালাগালি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ত' কথাই ছিল না। হযরত পথে-ঘাটে বাহির হইলে মক্কার দুষ্ট লোকগুলি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হৈ চৈ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। পিতৃব্যের বিয়োগ, সহধর্মিণীর বিচ্ছেদ, মাতৃহারা কন্যাগণের বিষাদমাখা ম্লানমুখ, এবং সর্বোপরি নরাধমগণের এই সকল অকথ্য অত্যাচার ! এতগুলি বিপদের একত্র সমাবেশ—একদিকে, কর্তব্যের অলঙ্ঘ্য আদেশ—অন্যদিকে এই চরম সঙ্কট সময়ে হযরতকে ধন, মান ও রাজপদের প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করার চেষ্টা সমানভাবে চলিতে লাগিল। কিন্তু মহিমময় মোস্তফার মহান হৃদয় ইহাতেও একবিন্দু দমিত বা বিচলিত হইল না। তবে মক্কায় প্রচার করা বর্তমানে একাধারে অসম্ভব ও নিষ্ফল হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তাই হযরত আবু-তালেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে সত্য ধর্মের প্রচার মানসে তায়েফ যাত্রা করিলেন। হযরতের প্রিয় ভক্ত ও অনুরক্ত সেবক জায়েদও এই যাত্রায় হযরতের সঙ্গে তায়েফে গমন করিয়াছিলেন।

## তায়েফ

মক্কা হইতে পূর্বদিকে ঈষৎ উত্তরে ন্যূনাধিক ৬০।৭০ মাইল ব্যবধানে তায়েফ নামক একটি উর্বর ভূখণ্ড অবস্থিত। তায়েফের আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি সুস্বাদু মেওয়া জগতে চিরপ্রসিদ্ধ। আরব ইহাকে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত ভূখণ্ড বলিয়া মনে করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এমন সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা দেশ পৃথিবীর অন্যত্র অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আলোচ্য সময়ে তায়েফ অঞ্চলে যে সকল গোত্রের লোক বাস করিত, বানি-ছকীফই তাহার মধ্যে প্রধান। হাওয়াজেন গোত্র তায়েফের অন্য পার্শ্বে বাস করিত। তায়েফবাসীদিগের সহিত কোরেশগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য-ব্যবসায় উপলক্ষে তাহারা পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিল, পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানও প্রচলিত ছিল। কোরেশ প্রধানগণের মধ্যে অনেকেই তায়েফে নিজেদের বাগ-বাগিচাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আরবের অন্যান্য 'জাতির' ন্যায় কা'বাই তায়েফবাসীদিগের প্রধানতম 'দেবমন্দির' এবং মক্কাই তাহাদিগের শ্রেষ্ঠতম তীর্থস্থানরূপে নির্ধারিত ছিল। এমন কি, স্যার উইলিয়ম মূরের ন্যায় ব্যক্তিও 'অনুমান' করিয়াছেন যে, সাংবাৎসরিক তীর্থ বা হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় সমবেত হওয়ার সময় তাহারা হযরতের ধর্মোপদেশও শ্রবণ করিয়াছিল। যে সময় ও যে অবস্থায় হযরত তায়েফ যাত্রা করিয়াছিলেন, পূর্বে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইতিহাসের বর্ণনাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে জানা যায় যে, আবু-তালেবের পরলোক গমনের পর মক্কাবাসিগণ কেবল অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং তাহারা হযরতকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। এমন কি, অন্যথায় তাহারা যে হযরতকে হত্যা করার সঙ্কল্পও করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠকগণ একটু পরেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। সে যাহা হউক, এই অবস্থায় হযরত তায়েফে উপনীত হইলেন। আবদে ইলিল, মাছউদ ও হবিব নামক ভ্রাতাত্রয় তখন ছকীফ বংশের প্রধান ও সমাজপতি, হযরত সর্বপ্রথমে ইহাদিগের নিকট গমন করিলেন। কোরেশদিগের একটি কন্যা এই বাটীতে বিবাহিত হইয়াছিল।***

---

* তাবরী ২—২২৯, এবনে-হেশাম প্রভৃতি। ** আবুল-ফেদা ১—১২০ পৃষ্ঠা।
*** তাবকাত ১—১৪২, তাবরী ২—২৩০, জাদুল-মাআদ, এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

## তায়েফে প্রচার

ছকীফ-প্রধানগণের নিকট উপস্থিত হইয়া হযরত তাহাদিগকে আল্লাহর পানে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার স্বজাতীয়গণ সত্যের প্রচারে অন্যায়পূর্বক যে প্রকার বাধা প্রদান করিতেছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া তাহাদিগকে সত্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মক্কা ও তায়েফবাসীদিগের ধর্ম বিশ্বাসে কোন পার্থক্য ছিল না। মক্কার ন্যায় তায়েফ নগরেও লাৎ ঠাকুরানীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের দিক দিয়াও তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য ছিল না। ইহার উপর উর্বর ও শস্য-শ্যামল ভূভাগে অবস্থান করায় মক্কাবাসীদিগের কুলগৌরব ও পৌরোহিত্যের অহঙ্কারের ন্যায়, তায়েফবাসীরাও সম্পদ-গর্বে অন্ধ হইয়াছিল। হযরতের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া ছকীফ প্রধানদিগের মধ্যে একজন বলিল—'তুমি বেশ রছুল বটে, তুমি ত' কা'বার গেলাফ ছিন্ন করিতে বসিয়াছ!' দ্বিতীয় ভ্রাতা বলিয়া উঠিল—'খোদা ত' আর মানুষ খুঁজিয়া পাইল না, তাই তোমার মত একটা লোককে নিজের রছুল বানাইয়া পাঠাইয়াছে!' তৃতীয়টি ব্যঙ্গস্বরে বলিতে লাগিল—'আমি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে প্রস্তুত নহি। কারণ, তুমি সত্যই যদি আল্লাহর রছুল হও, তাহা হইলে তোমার সহিত কথা বলা বে-আদবী হইবে; পক্ষান্তরে তুমি যদি ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী হও, তাহা হইলেও ভণ্ড লোকের সহিত কথা বলা অসঙ্গত। অতএব কোন অবস্থাতেই তোমার সহিত বাক্যালাপ করা উচিত হইবে না।'

## তায়েফবাসীর অত্যাচার

ছকীফ প্রধানগণ আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যাত করিতেছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দ্বারা সত্যের অমর্যাদা করিতেছে দেখিয়া হযরত উপস্থিত ইহাদিগের আশা ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করিলেন—ইহারাই বংশের প্রধান। ইহারা যদি নিজেদের এই সকল অভিমত অন্য লোকের নিকট ব্যক্ত করে, অথবা তাহাদিগকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলে, তাহা হইলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। তাই তিনি ছকীফ প্রধানগণকে নিরপেক্ষ থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা হযরতের এই অনুরোধটিও রক্ষা করিল না। বরং অজ্ঞ ও দুষ্ট লোকদিগকে এবং নিজেদের দাসগুলিকে হযরতের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দিল। হযরত পথে বাহির হইলেই তাহারা সকলে হৈ হৈ করিয়া তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইতে থাকে। পথ চলিতে লাগিলে ইট-পাথর মারিতে মারিতে তাঁহার পিছু লইতে থাকে। অনেক সময় তাহারা পথের দুই ধারে সারি দিয়া বসিয়া যাইত এবং প্রত্যেক পদ-নিক্ষেপে হযরতের চরণযুগলের উপর দুইদিক দিয়াই প্রস্তর বর্ষণ করিতে থাকিত। ফলে হযরতের চরণযুগল রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া যাইত। হযরত যখন প্রস্তর আঘাতে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িতেন, দুর্বৃত্তেরা তখন দুই বাহু ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া দিত এবং তিনি চলিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিত। এই সময় নরাধমদিগের নিকট হাস্যরোল ও উৎকট কোলাহলে তায়েফের পর্বত-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।* এহেন নৃশংস অত্যাচারেও হযরতের হৃদয় একটুও দমিত হইল না। তিনি পূর্ণ উৎসাহের সহিত নিজের কর্তব্য পালন করিয়া চলিলেন, দীর্ঘ দশদিন পর্যন্ত তায়েফের নগরে প্রান্তরে আল্লাহর নামের জয়ঢাক বাজাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

## হযরতের জীবন-সংশয় অবস্থা

এইরূপে ক্রমে ক্রমে হযরতের জীবনসংশয় অবস্থা উপস্থিত হইল। তখন তিনি ভক্তকুল তিলক জায়েদকে লইয়া মক্কায় ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময় পাষণ্ডগণের অত্যাচার ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিল। তাহারা প্রস্তর আঘাতে হযরতকে জর্জরিত করিয়া ফেলিল। অবশেষে তিনি আঘাতের ফলে অবসন্ন ও অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন,

---

* মাওয়াহেব ১—৫৬, হালবী ১—৩৭৪, এবনে-হেশাম ১—১৪৬, তাবরী ২—২৩০, জাদোল মায়াদ প্রভৃতি সমস্ত ইতিহাসেই এই সকল বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে সকলের সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।

তাঁহার সমস্ত শরীর দিয়া রুধিরধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, জায়েদ হযরতকে রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে একটা মাত্র মানুষের চেষ্টায় কতটুকু ফল হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ফলে সঙ্গে সঙ্গে জায়েদও সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। এই সময়কার কঠোর অনল পরীক্ষার কথা ছহী হাদীছে স্বয়ং হযরতের শ্রীমুখাৎ ব্যক্ত হইয়াছে। বিবি আয়েশা বলিতেছেন—আমি একদা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহোদ যুদ্ধ অপেক্ষা কঠিনতর সময় আপনার জীবনে আর কখনও উপস্থিত হইয়াছিল কি ? আমার প্রশ্নের উত্তরে হযরত তায়েফবাসীদিগের অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া বলেন—ইহাই আমার জীবনের ভীষণতর বিপদ।*

হযরতকে অচেতন অবস্থায় দর্শন করিয়া জায়েদের আশঙ্কা ও ত্রাসের অবধি রহিল না তিনি তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া দ্রুতপদে নগরের বাহিরে গমন করিলেন। পথিপার্শ্বে ওৎবা ও শাইবা নামক মক্কাবাসী দুই সহোদরের প্রাচীর বেষ্টিত দ্রাক্ষাকানন, জায়েদ হযরতকে লইয়া তাহারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জায়েদের সেবাশুশ্রূষায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিলে, সর্বপ্রথমে হযরতের মনে পড়িল নামাজের কথা। তাই তিনি 'অযু' করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার কদম মোবারক রক্তরাগে রঞ্জিত, অধিকন্তু দর-বিগলিত রুধিরধারা বিনামার মধ্যে শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। তাই অযুর সময় হযরত বহু কষ্টে বিনামা উন্মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে চরণ শরণ লওয়াতে বিশ্ব-মানবের মুক্তি ও মঙ্গলের একমাত্র উপায়, সেই রাজীব চরণ উদ্ধতের প্রস্তরাঘাতেই আজ রক্ত-কোকনদে পরিণত হইয়াছে !! ভক্তসেবক, কল্পনার চক্ষে একবার তাহা দেখিয়া লও, আর প্রাণ ভরিয়া তাঁহার নামে দরূদ পাঠ কর। এ অতুল, অপূর্ব, অনুপম, অপ্রতিম দৃশ্য আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না !!

## সত্যের তেজ ও ভাবের আবেগ

অযু শেষ করিয়া হযরত নামাজে প্রবৃত্ত হইলেন, সকল দুঃখ সকল বেদনা ভুলিয়া গিয়া রাউফুর-রহিম রহমতুল-লিল-আলামীন মোহাম্মদ মোস্তফা তাঁহার সেই 'চরম ও পরম আপনজনে'—সেই একমেবাদ্বিতীয়ম সচ্চিদানন্দে তন্ময় হইয়া গেলেন। নামাজ অন্তে হযরত নিজের সেই 'একমাত্র আপনজন'কে সম্বোধন করিয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক পদ সত্যের তেজে চিরউজ্জ্বল, তাহার প্রত্যেক বর্ণ ভাবের আবেগে চিরমধুর। বস্তুতঃ এই প্রার্থনাটি ঈমান ও এছলামের—আন্তরিকতা ও আল্লাহতে আত্ম-নির্ভরশীলতার—পূর্ণতম ও পুণ্যতম আদর্শ। সত্যের অনেক নিকৃষ্টতম শত্রুর দুরভিসন্ধি-কলুষিত হৃদয়ও এই প্রার্থনার ভাবাবেগে মুগ্ধ হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে : "It sheds a strong light on the intensity of his belief in the divine origin of his calling"**
আমরা নিম্নে প্রার্থনাটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া বাংলায় তাহার ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিব:

اللهم اليك اشكو ضعف قوتي و قلة حيلتي و هواني على الناس ـ
اللهم يا ارحم الراحمين ! انت رب المستضعفين ، و انت ربي ـ
الى من تكلني ؟ الى بعيد يتجهمني او الى عدو ملكته امري ؟
و ان لم يكن بك على غضب فلا ابالي ، و لكن عافيتك هي
اوسع لي ـ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات و صلح عليه
امر الدنيا و الآخرة ، من ان ينزل بي غضبك او يحل على سخطك !
لك العتبى حتى ترضى ـ لا حول و لا قوة الا بك !

---

* বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি। ** মুর ১১৭ পৃষ্ঠা।

## হযরতের করুণ প্রার্থনা

"আল্লাহ ! হে আমার আল্লাহ ! তোমাকে ডাকিতেছি। নিজের এই দুর্বলতা, এই নিরুপায় অবস্থা এবং লোকলোচনে নিজের এই অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে তোমারই নিকট অভিযোগ করিতেছি। হে আল্লাহ্, হে পরম দয়াময় ! তুমিই যে পতিতপাবন, তুমিই যে দুর্বলের বল, প্রভু। তোমা ব্যতীত আমার ত' আর কেহ নাই। তুমি আমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিবা ? হে আমার প্রভু ! তুমি কি আমায় এমন পরের হস্তে সমর্পণ করিবা—রুক্ষ মুখের কর্কশ ভাষায় যে আমাকে জর্জরিত করিবে ? অথবা এমন শত্রুর হাতে আমাকে তুলিয়া দিবা—যে আমার সাধনাকে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত করিয়া দিবে ? (অর্থাৎ তুমি কখনই এরূপ করিবা না।) কিন্তু প্রভু হে ! আমার একমাত্র কাম্য তোমার সন্তোষ, তাহা পাইলে এ সকল বিপদ-আপদের কোন পরওয়াই আমি করি না। তোমার মঙ্গলাশীর্বাদই আমার প্রশস্ততম সম্বল। হে আমার আল্লাহ্ ! তোমার যে পুণ্যজ্যোতির প্রভাবে সকল তিমিরই তিরোহিত হইয়া যায়, যাহার কল্যাণে ইহ-পরকালের সকল বিষয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে—সেই পুণ্যজ্যোতির শরণ লইয়া প্রার্থনা করিতেছি, যেন তোমার অসন্তোষ হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারি; যেন তোমার গজব আমাতে আপতিত না হয়। তোমার নিকট আর্তনাদ করিতেছি—যেন সর্বদাই তোমার সন্তোষলাভ করিতে পারি। প্রভু হে, তুমিই আমার একমাত্র শক্তি, তুমিই আমার একমাত্র সম্বল।"*

## মক্কায় প্রত্যাবর্তন

কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভের পর হযরত পূর্ববৎ পদব্রজে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে অত্যাচারীদিগের ধ্বংস কামনা করিতে বলায় হযরত প্রশান্ত বদনে উত্তর করিয়াছিলেন—না, না, উহারা বাঁচিয়া থাকুক। উহারা অন্যায় করিয়াছে বটে, কিন্তু উহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে অনেক সৎ ও মহৎ মানুষ জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তাহারা সত্য গ্রহণ করিতে পারে।** ৬০ মাইল দীর্ঘ মরুপথ পদব্রজে অতিক্রম করতঃ হযরত মক্কার নিকটবর্তী 'নাখলা' নামক স্থানে আগমন করিয়া কিছুদিনের জন্য সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বলা আবশ্যক যে, এখানে অপেক্ষা করা ব্যতীত আর গত্যন্তরও ছিল না। মক্কাবাসিগণ ভীষণ অত্যাচারপূর্বক হযরতকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, অন্যথায় তাঁহার প্রাণবধ করিতেও তাহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। নাখলায় উপনীত হইলে জায়েদ তাঁহাকে সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া দিয়া বলিলেন—ইহার একটা প্রতিবিধান না করিয়া নগরে প্রবেশ করা আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। হযরতও জায়েদের কথা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন এবং ইহার একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া লওয়ার নিমিত্ত কয়েক দিনের জন্য নাখলায় থাকিয়া গেলেন। নাখলায় অবস্থানকালে জায়েদের বিমর্ষভাব দর্শন করিয়া হযরত তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন : বৎস! বিচলিত হইও না। বিপদের যে ঘনঘটা দর্শনে তুমি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ, তাহা কখনই চিরস্থায়ী হইবে না। ইহার প্রতিবিধান স্বয়ং আল্লাহ্ই করিয়া দিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সত্যের সহায়তা করিবেন, এছলাম নিশ্চয় জয়যুক্ত হইবে।

## মোৎএমের অভয়দান

মক্কার কোন প্রধান ব্যক্তি হযরতকে 'পানাহ্' (অভয়-শরণ) দিতে প্রস্তুত আছে কি-না, তাহা জানিবার জন্য তিনি তথায় লোক পাঠাইলেন। পর পর দুইজন অস্বীকার করার পর

---

* তাবরী ২—২৩০, এবনে-হেশাম ১৪৬, জাদুল-মাআদ ১—২৯৯, তবরানী—দোওয়া—আবদুল্লাহ্-বেন জা'ফর হইতে, মাওয়াহেব ১—৫৭, হলবী ১—৩৫৪, কামেল, খালেদুন প্রভৃতি।

** বোখারী ও মোছলেমের একটি হাদীছেও ইহার উল্লেখ আছে। ঐ হাদীছ অনুসারে প্রশ্নকর্তা একজন ফেরেশতা

মোৎএম-বেন-আদীর নিকট দূত পাঠান হইল। মোৎএমের সততা ও মহত্ত্বের পরিচয় আমরা পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছি। মহামনা মোৎএম হযরতের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পরদিন প্রাতে একদিকে তিনি হযরতের নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন, অন্যদিকে স্বগোত্রের সমস্ত সমর্থ পুরুষকে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা সুসজ্জিত হইয়া আসিলে মোৎএম অশ্বারোহণে তাহাদিগের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করিলেন। দেখিতে দেখিতে এই ক্ষুদ্র সৈনিকদল কা'বা সন্নিধানে উপনীত হইল। তখন কোরেশগণ যথারীতি সেখানে উপস্থিত ছিল, এই অস্বাভাবিক সৈনিক অভিযান দর্শনে অনেকে আবার কৌতূহল পরবশ হইয়া সেখানে সমবেত হইয়াছিল। মোৎএম দীর্ঘ বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন ঃ "মোহাম্মদকে আমি অভয়দান করিয়াছি—সাবধান !"* সঙ্গে সঙ্গে হযরতও সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্তব্ধ-স্তম্ভিত কোরেশ রুদ্ধশ্বাসে এ দৃশ্য দর্শন করিল এবং বুকের আগুন বুকে চাপিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল। বদর সমরের পূর্বে কাফের ও মোশরেক থাকার অবস্থায় মোৎএমের মৃত্যু হয়। মহানুভব মোৎএমের মৃত্যু সংবাদে মোস্তফা দরবারের শ্রেষ্ঠতম কবি মহাত্মা হাস্সান যে মর্ছিয়া বা শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন—স্পষ্ট ভাষায় ও অনাবিল কণ্ঠে এই বিধর্মী পৌত্তলিকের যেভাবে মহিমা গান করিয়াছিলেন, মুছলমানের ইতিহাস ও চরিত পুস্তকসমূহে তাহা চিরকালের তরে সন্নিবেশিত হইয়া আছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবন-এছহাক ও মোহাদ্দেছ জর্কানী প্রভৃতি এই মর্ছিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন।** মোৎএমের এই সকল উপকারের কথা হযরত চিরকালই কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেন। বদর যুদ্ধের পর হযরত বলিয়াছিলেন—আজ মোৎএম যদি বাঁচিয়া থাকিতেন আর সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম।***

# ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## খ্রীষ্টান লেখকগণের চাঞ্চল্য

গত অধ্যায়ের বর্ণিত ঘটনাগুলি পাঠ করিয়া খ্রীষ্টান লেখকগণের যে কতদূর চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের পুস্তকগুলি হইতে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সঙ্কল্পের এমন অতুলনীয় দৃঢ়তা, আত্মমতে এমন অনুপম বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন অপ্রতিম ঈমান, ধৈর্য ও মহিমার এমন অপূর্ব সমাবেশ—এ দৃশ্য তাঁহাদিগের পক্ষে একেবারে অসহনীয়। অথচ সমস্ত ইতিহাস ও বহুসংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীছে এই সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, সুতরাং তাহা উড়াইয়া দিবারও উপায় নাই। তাই তাঁহারা তায়েফ-সংক্রান্ত বিবরণগুলি বর্ণনাকালে নানা প্রকার শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রধান কথা এই যে, 'মোহাম্মদ তায়েফবাসীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে এবং তাহাদিগকে মক্কা আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করার জন্যই তায়েফ যাত্রা

---

* তাবকাত, মাওয়াহেব প্রভৃতি, পূর্ব বর্ণিত অধ্যায় ও পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

** এবনে-হেশাম, ১—২৩২, প্রথমাংশ বদর সমর।

*** এই সময় নাখলায় অবস্থানকালে কয়েকজন, কয়েক শত বা কয়েক হাজার জেন হযরতের কোরআন পাঠ শুনিয়া গিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছে। জেনদিগের কোরআন শ্রবণ করার কথা কয়েকটা হাদীছেও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা এই যাত্রার ঘটনা বলিয়া মনে হয় না। এবনে সাআদ, কা'ব আহবার, এবনে-আব্বাছ প্রভৃতির বর্ণিত হাদীছগুলিও বিশেষরূপে আলোচনা সাপেক্ষ। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান আছে। দেখুন—মাওয়াহেব ও হলবী প্রভৃতি।

করিয়াছিলেন।' ছকীফ প্রধানদিগের সহিত হযরতের যে কথোপকথন হইয়াছিল, স্যার উইলিয়াম তাহাকে সংক্ষেপে explained his mission বলিয়া সারিয়া দিয়াছেন। কারণ ঐ কথাগুলি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইলেই ধরা পড়িবে যে, ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা ব্যতীত ছকীফ প্রধানদিগের সহিত হযরতের অন্য কোনই কথা হয় নাই। তাহা হইলে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কল্পনাটা একেবারে মাঠে মারা যায়। মূর সাহেব এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, যদিও এই বংশ দুইটি পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিল, তবুও তায়েফবাসীরা কোরেশদিগের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিত। কারণ তাহাদিগেরও নিজস্ব লাৎ বা প্রধান বিগ্রহ ছিল। অতএব, এই বিজ্ঞ লেখকের মতে তাহাদিগের মধ্যেও হিংসা-বিদ্বেষের ভাব বিদ্যমান থাকাই স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে আমাদিগের নিবেদন এই যে, লাৎকে আরবের প্রধান বিগ্রহ বলিয়া বর্ণনা করা, লেখক মহাশয়ের সততার পরিচায়ক আদৌ নহে! পক্ষান্তরে ইহা দ্বারা ছকীফও কোরেশগণের সহধর্মী, সুতরাং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। আমাদিগের দেশে শত শত গ্রামে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাতে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত হইবে যে, কলিকাতার হিন্দুদিগের সহিত ঐ সকল স্থানের হিন্দুদিগের বিরোধ বিদ্যমান আছে? খ্রীষ্টানদিগের বিশেষতঃ রোমান কাথলিকগণের সম্বন্ধেও এই উদাহরণ সমভাবে প্রযোজ্য। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই সব নিদর্শন হইতে বরং বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু বা খ্রীষ্টানদিগের সহধর্মিতা এবং ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সহানুভূতিরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ডাঃ মার্গোলিয়থ আধুনিক লেখক। তিনি দেখিলেন যে, আজকালকার দিনে এই প্রকার 'পুকুরচুরির' ব্যাপার হজম করিয়া যাওয়া সহজ হইবে না। তাই তিনি মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন—এই ব্যাপারে মোহাম্মদের সদাসতর্ক ও সঙ্কটভাবের এবং তাঁহার ভীরু স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কারণ তিনি অন্য কোথায়ও না গিয়া তায়েফে গমন করিয়াছিলেন।*

## পুণ্য আদর্শ

হযরতের তায়েফ যাত্রার বিবরণ ও তৎপ্রসঙ্গে বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পঠিত হওয়া উচিত। নিরাশার অন্ধকার যখন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠে, বিঘ্ন-বিপত্তির বিভীষিকা যখন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইতে থাকে, এবং বাহ্যতঃ সফলতার কোন লক্ষণই যখন সাধকের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই সময় অটল সঙ্কল্প ও অটুট বিশ্বাস লইয়া যিনি কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন, সত্যের সাধনা তাঁহারই মাত্র সার্থক হইয়া থাকে, এবং তিনিই কেবল আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া বরিত হওয়ার যোগ্য পাত্র। সাধনপথের বিঘ্ন-বিপত্তিগুলি যখন চরম ভীষণতা সহকারে হযরতের কর্তব্যজ্ঞানের সহিত কঠোরতর সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—সে সময় তিনি যে ধৈর্য, যে দৃঢ়তা, যে একনিষ্ঠা, যে আকুল আগ্রহ, যে প্রাণ-ব্যাকুলতা, যে আত্ম-প্রত্যয়, যে বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রেম ও তিতিক্ষার যে পুণ্যময় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু মুখে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলে অথবা কেবল দুইটা আহা উহু করিয়া মৌখিক ভক্তির অভিব্যক্তি করিলেই আমাদিগের কর্তব্য শেষ হইয়া যাইবে না। মহিমময় মোহাম্মদ মোস্তফা ধর্মক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে যে পবিত্র পদ-রেখাগুলি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করার নামই এছলাম। আজ যদি মোস্তফার জ্ঞান-সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নায়েবে নবী আলেম সমাজ ইহার শতাংশের একাংশ ত্যাগ স্বীকারে ও দৃঢ়তা অবলম্বনে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে মোছলেম জগতের অবস্থা কি আর এইরূপ থাকিয়া যাইত? তাওহীদের মধুর অমৃতধারা পান করিবার জন্য আল্লাহর আলম পিপাসিত হইয়া আছে—জগতের কোটি কোটি নর-নারী আজও

---

* মার্গোলিয়থ ১৭৮, মূর ১১২ হইতে

আল্লাহর সেই বাণী শ্রবণে বঞ্চিত রহিয়াছে—তাহাদিগের নিকট সেই মুক্তিসন্দেশ লইয়া যাওয়ার লোক নাই। একটি লোষ্ট্রাঘাত, একটু রুধিরধারা, এমন কি একবিন্দু শোণিতপাতের অথবা সামান্য একটু অপমানের আশঙ্কাও যেখানে নাই,—সেখানেও আমরা মোস্তফা-চরিত্রের এই পবিত্র আদর্শের বা রছুলুল্লাহর এই ছুন্নতগুলির অনুসরণ করিতে পারি না! স্বয়ং মুছলমান সমাজই নানা অনাচারে জর্জরিত এবং নানা কুসংস্কারে আমূল কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আজ সামান্য একটুকু সৎসাহসের অভাবে আমাদিগের আলেমগণ তাহার কোনই প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। নিজেদের হাদী-জীবনের কর্তব্য এবং নায়েবে নবীর পদমর্যাদা কি এইরূপে প্রতিপালিত ও সম্মানিত হওয়া উচিত?

তায়েফের উৎপীড়িত হওয়ার পর হযরত রক্তরঞ্জিত দেহে বলিয়াছিলেন—উহারা মানিল না, কিন্তু উহাদের সন্তান-সন্ততিরা ত মানিতে পারে! ক্রোধ, ঘৃণা বা বিরক্তির একটি শব্দও তখন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতেছে না। বরং তিনি এ সকল ক্ষেত্রে "হে আমার প্রভু! আমার স্বজাতিকে সুমতি দান কর, উহাদিগের উপর রোষ করিও না। কারণ তাহারা অজ্ঞ"—বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই ছুন্নতটি আমাদিগের আলেম সমাজ হইতে সম্পূর্ণ[illegible] বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ওয়াজ্‌-নছিহতে, ধর্ম-সংক্রান্ত কোন বিষয়ের আলোচনায় কেহ কোন প্রকার কোন কথার প্রতিবাদ করিলে, ইঁহাদিগের যে অবস্থা হয় এবং ইঁহাদিগের মুখ হইতে যে সকল মধুর ও মোলায়েম শব্দ অনবরত উচ্চারিত হইতে থাকে, তাহা শুনিলে এবং তাঁহাদের তখনকার ক্রোধকম্পিত দেহের হাবভাব দেখিলে শরমে মরিয়া যাইতে হয়। মজহাব, তকলিদ এবং অন্যান্য মছলা-মছায়েলের বাদ-প্রতিবাদ-ক্ষেত্রে উর্দু ও বাংলা ভাষায় যে শ্রেণীর 'সৎসাহিত্য' দিন দিন পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সন্ধান লইলে সমাজহিতৈষী মুছলমান পাঠকমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদিগের আলেম সমাজ সাধারণতঃ মোস্তফার আদর্শ হইতে কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন।

উপসংহারে আমরা কবিবর হাচ্ছান রচিত মোৎএমের শোকগাথার প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। মোৎএম বিধর্মী—কাফের ও মোশরেক। কাফের ও মোশরেক থাকার অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মোৎএম মহানুভব ও মহাশয় ব্যক্তি। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ মদীনায় পৌঁছিলে মোস্তফা দরবারের প্রধান কবি হাচ্ছান মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার গুণগরিমা গান করিতেছেন—প্রশংসা ও মহত্ত্বব্যঞ্জক শ্রেষ্ঠতম বিশেষণগুলির প্রয়োগ সহকারে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন, এবং আমাদিগের মোহাদ্দেছ ও ঐতিহাসিকগণ হযরতের জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। হযরতের এবং তাঁহার পরবর্তী সময় ইহা মুছলমানের কর্তব্য বলিয়াই নির্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার সহিত বর্তমান যুগের সঙ্কীর্ণতার তুলনা করিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হইবে। সৎ ও মহৎ স্বভাবের জন্য অথবা মুছলমান সমাজের সহিত সহানুভূতির নিমিত্ত, আজ যদি তুমি কোন অ-মুছলমানকে "মহাত্মা" বলিয়া সম্বোধন কর, তাহা হইলে তোমাকে ধর্মদ্রোহী ও বে-দীন বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

## মে'রাজের বিবরণ

নবুয়তের দশম সনে এবং তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, মে'রাজের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্যান্য বিবরণের ন্যায় এই ঘটনার দিন-তারিখ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। একদা নিশীথকালে হযরত মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া বয়তুল মোকাদ্দাছ বা বেয়তুল মোকাদ্দাছ মছজিদে উপনীত হন এবং সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে আল্লাহর সন্নিধানে উপস্থিত হন। এই ঘটনার প্রথম অংশ এছরা এবং শেষ অংশ মে'রাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আজকাল এই পার্থক্যটি এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উভয় ঘটনা সমানভাবে মে'রাজ বলিয়াই কথিত হইতেছে।

মে'রাজের ঘটনা যে সত্য, তাহাতে একবিন্দুও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শাস্ত্র ও ইতিহাসের দিক দিয়াও নহে, যুক্তি ও বিজ্ঞানের হিসাবেও নহে; কিন্তু এই মে'রাজ কোন্ সময় কোন স্থানে এবং কি অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা লইয়া প্রথম হইতেই অসাধারণ মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। মে'রাজ-সংক্রান্ত হাদীছগুলির স্থানকালাদি বৃত্তান্ত এবং তাহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এত অধিক অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, হঠাৎ দুই-চারি কথায় তাহার আলোচনা বা সমাধান করা—বিশেষতঃ আমার ন্যায় নিঃসম্বল লেখকের পক্ষে—কখনই সম্ভব নহে। ছাহাবাগণের সময় হইতে আজ পর্যন্ত এই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। কেবল সেই সকল মতভেদের বিষয়গুলি একত্র সঙ্কলন করিয়া দিতে হইলে, এই পুস্তকের চারি পাঁচ পৃষ্ঠায় তাহার স্থান সঙ্কুলান হওয়াও কষ্টকর হইবে। ফলে বিষয়টি এমনই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কথিত অসামঞ্জস্যগুলির সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকেই একাধিকবার মে'রাজ হওয়ার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি, কেহ কেহ ৩৩ ও ৩৪ বার মে'রাজ হওয়ার কথাও বলিয়াছেন।* মূল মে'রাজ সম্বন্ধে একদল বলিতেছেন যে, উহা স্বপ্নের ব্যাপার। অহির প্রারম্ভে হযরত যেরূপ স্বপ্নযোগে সত্যের স্বরূপ সন্দর্শন করিতেন, সেইরূপ মে'রাজের সময়ও আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে স্বপ্নযোগে অনেক তথ্য ও বহু সত্য অবগত করাইয়া দেন। ইঁহারাও কোরআন, হাদীছ ও ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা নিজেদের মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। অন্য একদল বলিতেছেন—মে'রাজ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, দেহের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। ইঁহারাও প্রমাণ প্রয়োগে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের মত এই যে, মে'রাজের সমস্ত ব্যাপারই সশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল। ইঁহারাও স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য কোরআন-হাদীছ হইতে দলিল-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। স্বনামখ্যাত মুজতাহেদ শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব, মে'রাজ-সংক্রান্ত সকল ঘটনার বিশদ আলোচনার পর বলিতেছেন:

وكل ذلك لجسده صلعم في اليقظة ولكن ذلك في موطن
هو برزخ بين المثال والشهادة. الخ

অর্থাৎ—মে'রাজের সমস্ত ঘটনাই হযরতের জাগ্রত অবস্থায় এবং সশরীরে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা রূপক ও বাস্তব জগতের সন্ধিস্থলে অবস্থিত অন্য এক জগতের কথা।

এই সকল মতভেদ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অথবা তাহার সমাধানের চেষ্টা করা উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, একথা পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা শক্তি ও সুযোগ দিলে কোরআনের তফছিরে এ সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তবে এখানে প্রিয় পাঠকবর্গকে বলিয়া রাখিতেছি যে, আমরা শেষোক্ত মতের সমর্থন করি না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণই আমাদিগের এই অসমর্থনের প্রধান কারণ। নচেৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিসাবে আমরা শেষোক্ত মতের মূল বিবরণগুলিকেও অসম্ভব বলিয়া মনে করি না। একদল খৃষ্টান লেখক মে'রাজের ব্যাপার লইয়া নানা প্রকার বিরুদ্ধ আলোচনা করিয়াছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের কথা তুলিয়া উহাকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া যথেষ্ট আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। এ সকল কথার আলোচনাও যথাস্থানে করা হইবে। এখন খৃষ্টান ভ্রাতাদিগকে নিজেদের চোখের কড়িকাঠগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে বিনীত অনুরোধ জানাইয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। তাঁহারা যাকোবের মে'রাজের ঘটনা ভাবুন। এলিজা প্রাফেটের অগ্নিরথে আরোহণপূর্বক [illegible] এবং ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য দিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণের ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে

* জারকানী ২—১৬৬ মওয়াহেব ২—৫ ইত্যাদি

থাকুন এবং মেঘমণ্ডলের উপর ভাসিতে ভাসিতে যীশুর স্বর্গারোহণের ব্যাপারখানা একবার ভাবিয়া দেখুন, তাঁহাদিগের খেদমতে ইহাই আমাদিগের বিনীত নিবেদন।

### ছওদার সহিত বিবাহ

বিবি খদিজার পরলোকগমনের কিছুদিন পরে, ছওদা নাম্নী এক প্রৌঢ় বয়স্কা বিধবার সহিত হযরতের বিবাহ হয়। ছওদার স্বামী ছকরান এছলাম গ্রহণ করার পর সস্ত্রীক আবিসিনিয়া যাত্রা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে মক্কায় ফিরিয়া আসার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। কোন কোন চরিত পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবিসিনিয়ায় খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আলোচ্য সময় এই নিরাশ্রয় নিঃসহায় মহিলাটির অবস্থা যে চরম শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই হযরত এই নিঃস্ব বৃদ্ধাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মক্কার নরশার্দুলদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। এ সময় তাঁহার বিবাহের বয়স অতীত হইয়া গিয়াছিল। তিনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"হযরত! বিবাহ করার সাধ আমার নাই। তবে আমি কিয়ামতে আপনার সহধর্মিণীরূপে উত্থিত হইবার বাসনা করি।" প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই, তিনি নিজের 'দাম্পত্যাধিকার' বিবি আয়েশাকে দান করিয়াছিলেন। ছওদা কেবল হযরতের সেবা করিয়া এবং কথাবার্তার দ্বারা হযরতকে আনন্দদান করিয়া সুখী হইতেন।*

# সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## তীর্থ মেলায় এছলাম প্রচার

তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত যথাপূর্ব পূর্ণ উদ্যম ও অদম্য উৎসাহের সহিত নিজের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বাৎসরিক তীর্থ বা হজ উপলক্ষে যাত্রীদল আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে মক্কায় সমবেত হইত। এই উপলক্ষে মক্কায় একটা বড় রকমের মেলাও বসিয়া যাইত। তীর্থযাত্রী ও বণিকগণ সেখানে সমবেত হইয়া নানা প্রকার বাণিজ্য সম্ভার ও খাদ্য-দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় করিত। মক্কার এই সম্মেলন ব্যতীত, ওকাজ, মজন্না প্রভৃতি স্থানেও বৎসরের নির্দিষ্ট সময় ঐ প্রকার মেলা বসিয়া যাইত। এই সকল সম্মেলন উপলক্ষে আরবদেশের বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা যখন মক্কায় সমবেত হইত, হযরত তখন তাহাদিগের নিকট গমন করিতেন, তাহাদিগকে এক, অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে আহ্বান করিতেন, তাহাদিগকে কোরআন পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিতেন। এই প্রকারে হযরতের প্রচারকার্য অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে "মোহাম্মদের প্রচারিত বিষ" ছড়াইয়া পড়িতেছে—দেখিয়া, কোরেশ দলপতিগণ বিচলিত হইয়া উঠিল, এবং কিরূপে তাঁহার এই সাধনাকে ব্যর্থ ও ব্যাহত করা যাইতে পারে, তাহারা সে সম্বন্ধে যুক্তি আঁটিতে আরম্ভ করিল।

### কোরেশের নূতন ষড়যন্ত্র

অনেক যুক্তি-পরামর্শ ও আন্দোলন-আলোচনার পর এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মক্কার সর্বসাধারণকে লইয়া তাহারা এক সমিতি গঠন করিল। ২৫ জন প্রধান ব্যক্তি তাহার কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইল। হজের মৌসুম নিকটবর্তী হইতেছে, এই সময় বিভিন্ন স্থান হইতে কত লোকের মক্কায় সমাগম হইবে। হযরত তাহাদিগের

---

* এছাবা ৮—১১৭ পৃষ্ঠা।

মধ্যে নিজের 'নাস্তিকতা' প্রচার করিবেন, ইহাতে অনেক লোক 'গোমরাহ' হইয়া যাইতে পারে। তাই একদিন তাহারা সকলে সভাস্থলে সমবেত হইল এবং লোকদিগকে 'মোহাম্মদের মোহমন্ত্র হইতে কি প্রকারে রক্ষা করা যাইতে পারে'—সভায় এই প্রশ্নের আলোচনা আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ অলিদ ধনে, মানে ও বয়সের হিসাবে কোরেশদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। সে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল ঃ মৌসুম নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। আমাদিগের তখনকার কর্তব্য সম্বন্ধেও সকলের সমবেতভাবে একটা মত স্থির করিয়া লওয়া উচিত। যাত্রীদল সমবেত হইলে মোহাম্মদ সম্বন্ধে যেন সকলে এক কথাই বলা হয়। অন্যথায় তখন যদি বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবের কথা বলিতে থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কুফল ফলিবার আশঙ্কাই অধিক। কারণ তাহা হইলে বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়াই প্রতিপন্ন হইব।

অলিদের কথা শেষ হইলে কয়েকজন লোক বলিয়া উঠিল—আমরা উহাকে জ্যোতিষী ও গণৎকার বলিয়া পরিচিত করিব। কিন্তু অলিদের ইহা পছন্দ হইল না। সে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—একটা যা' তা' বলিলেই ত হইবে না। লোকে বিশ্বাস করিবে কেন, গণৎকারের কি লক্ষণ তাহাতে আছে? একজন বলিল—আমরা বলিব, মোহাম্মদ পাগল, তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। অলিদ রুক্ষ স্বরে উত্তর করিল—মোহাম্মদকে পাগল বলিলে লোকে তোমাকেই পাগল বলিবে। তাহার কথা শুনিলে কে তাহাকে পাগল বলিয়া বিশ্বাস করিবে? আর একজন বলিল—মোহাম্মদকে কবি বলিয়া পরিচিত করা হইবে, তাহা হইলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বৃদ্ধ ও বহুদর্শী অলিদ এ প্রস্তাবেরও সমর্থন করিল না। সে বলিতে লাগিল—কাব্য ও কবিত্ব যে কি, আরবের সকলেই তাহা জানে। মোহাম্মদ যাহা বলিয়া থাকে, তাহাকে কবিতা বলিলে সকল গোত্রের বিজ্ঞ লোকেরা আমাদিগকে একেবারে অজ্ঞ ও অপদার্থ বলিয়া নির্ধারিত করিবে। যাহা হউক, এইরূপ নানা প্রস্তাবের আলোচনা ও স্বাভাবিক বাদ-প্রতিবাদের পর স্থির হইল যে, মোহাম্মদকে মায়াবী ও যাদুকর বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। 'মোহাম্মদ ভয়ানক যাদুকর। তাহার সংস্পর্শে আসামাত্র সে মানুষকে তাহার অজ্ঞাতসারে এমনভাবে মায়াবিষ্ট করিয়া ফেলে যে, তাহার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে এই যাদুর বলে পিতা পুত্রে এবং স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিতেছে। মোহাম্মদ অতি ভয়ঙ্কর লোক, সাবধান! কেহ তাহার কথা শুনিও না, তাহার সংস্পর্শে যাইও না, তাহাকে নিজেদের কাছে আসিতে দিও না!' বাৎসরিক সম্মিলন-ক্ষেত্রে সকলে এই প্রকারের কথা প্রচার করিবে—এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।*

## হযরতের প্রচার ও কোরেশদিগের বাধাদান

নির্ধারিত সময় মক্কা নগরে জনসমাগম হইতে আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য যে, কোরেশগণও যাত্রীদিগের ঘাটিতে ঘাটিতে এবং আড্ডায় আড্ডায় গমন করিয়া, পূর্ব নির্ধারণ অনুসারে হযরতকে যাদুকর ও ভয়ঙ্কর লোক বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। হযরতের শত্রুগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল, বাহ্যদর্শী লোকেরা সহজেই সে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে লাগিল। কাজেই হযরতের পক্ষে প্রচারকার্য অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একমুহূর্তের জন্যও নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনিও এই সময় বিভিন্ন গোত্রের যাত্রীদিগের আড্ডায় আড্ডায় গমন করিয়া তাহাদিগের নিকট সত্য ধর্মের প্রচার করিতে থাকিলেন। এই প্রচারের সময় দুরাত্মা আবুলাহাব সতত্তই হযরতের পিছু লাগিয়া থাকিত। সে হযরত সম্বন্ধে নানাবিধ জঘন্য কথা প্রচার করিয়া বেড়াইত এবং তাহা শুনিয়া

* এবনে-হেশাম ১—৯০, ৯১। শেফা প্রভৃতি।

লোকের মনে তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ অন্যায় ও অসঙ্গত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাইত * একজন প্রত্যক্ষদর্শী রাবী বর্ণনা করিতেছেন ঃ "আমার তখন যুবাবয়স। পিতার সঙ্গে তীর্থ করিয়া আমরা মেলায় অবস্থান করিতেছি, এমন সময় হযরত সেখানে আগমন করিলেন এবং প্রত্যেক গোত্রের নাম ধরিয়া সকলকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করতঃ বলিতে লাগিলেন—"সকলে শ্রবণ কর, আল্লাহ আমাকে তোমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহর আদেশ, সকলে একমাত্র তাঁহার পূজা করিও। তাঁহার পূজা উপাসনায় অথবা তাঁহার ঐশিক গুণের কোন অংশে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করিও না। এই সকল ঠাকুর-দেবতা ও পুতুল-প্রতিমার পূজা ছাড়িয়া দাও।" আবু-লাহাব তখন হযরতের পশ্চাতে পশ্চাতে চীৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছিল—সাবধান, সাবধান ! কেহ ইহার কথা শুনিও না, এ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দুরভিসন্ধি লইয়াই তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এ তোমাদিগকে 'এবং মালেক বেন আকয়াশ বংশের জেন গোত্রের মিত্রগণকে' লাৎ ও ওজ্জা দেবীর আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিয়া কতকগুলি অভিনব পাপাচারে লিপ্ত করিতে চায়। সাবধান, এই মিথ্যাবাদী নাস্তিকের কথা শুনিও না। এই সময় আবু-লাহাব হযরতের প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল।**

## বিভিন্ন গোত্রের নিকট প্রচার

এই প্রকার প্রচার করিতে করিতে হযরত বানি-কেন্দা গোত্রের লোকদিগের নিকট গমন করিলেন, তাহারা তাঁহার আহ্বানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিল না। বানি হানিফাদিগের নিকট গমন করিলে তাহারা অতিশয় কঠোর ভাষায় নিতান্ত অভদ্রভাবে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহাদিগের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি বানি আমের বংশের লোকদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময় বায়হারা নামক এক ধূর্ত যুবক হযরতের ভাষার তেজ ও উপদেশের প্রভাব দর্শনে মুগ্ধ হইল। সে মনে করিল, এই লোকটাকে হাত করিতে পারিলে সমস্ত আরবের উপর প্রভাব স্থাপন করা সম্ভবপর হইতে পারে। সে হযরতের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, আমরা সকলে তোমার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত আছি। তবে আমাদিগের কথা এই যে, তুমি জয়যুক্ত হইলে আরবের রাজত্বটা কিন্তু আমাদিগের হইবে। তুমি এই শর্তে সম্মত আছ কি? তাহার কথা শুনিয়া হযরত গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—'রাজ্য রাজত্বাদি প্রদান বা তাহার পরিবর্তন আল্লাহর কাজ। আমি তৎসম্বন্ধে কি বলিতে পারি ?' একদিন তত্ত্বপ্রবর আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া হযরত বানি-জহল গোত্রের নিকট গমন করিলেন। আবুবাকর হযরতের পরিচয় প্রদান করিলে গোত্রপতি মাফরুক হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি লোকদিগকে কি কথা শিক্ষা দিয়া থাকেন ? হযরত উত্তর করিলেন, আমি লোকদিগকে বলিয়া থাকি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি একক অদ্বিতীয় ও অংশীবিহীন। আমি সেই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরণাপ্রাপ্ত তাঁহার রছুল। সকলকে এই কথা স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়া থাকি। অধিকন্তু কোরেশগণ অন্যায়পূর্বক দলবদ্ধ হইয়া সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, তাহারা আল্লাহর কাজে ও তাঁহার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে বলিয়া সকলকে সত্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়া থাকি—যেন আমি নির্বিঘ্নে আল্লাহর মহিমাগান করিয়া বেড়াইতে পারি। মাফরুক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—আর কি কথা আপনি প্রচার করিয়া থাকেন ? তখন হযরত কোরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতটি পাঠ করিলেন ঃ 'তোমাদিগের প্রভু তোমাদিগের প্রতি যাহা নিষিদ্ধ (হারাম) করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে তাহা পড়িয়া শুনাইতেছি। তাহা এই যে, তোমরা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কোন প্রকারেই প্রভুর কোন গুণ বা কোন শক্তির অংশভাগী করিও না, পিতামাতার প্রতি সতত্ই সদ্ব্যবহার করিতে থাকিও, এবং অভাবহেতু নিজেদের -

---

* তাবকাত ১—১৪৭ হইতে।

** এবনে-হেশাম ১—১৪৮ পৃষ্ঠা। হাকিম ২য় খণ্ডের ধারিত। আব্দুল-এশ্বান প্রভৃতি

সন্তান-সন্ততিবর্গকে হত্যা করিও না, তোমাদিগকে এবং তাহাদিগকে আমিই রুজী দিয়া থাকি তোমরা প্রকাশ্য বা গুপ্ত কোন প্রকার অশ্লীলতার নিকটেও যাইও না, এবং যে প্রাণহানি করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন—কদাচ তাহাতে লিপ্ত হইও না, তবে বিচারের দ্বারা যে প্রাণহানি করা হয়, তাহার কথা স্বতন্ত্র। তোমরা এইগুলি গ্রহণ কর, তোমাদের প্রভু, তোমাদিগকে ইহারই উপদেশ দিয়াছেন—যেন তোমরা জ্ঞানবান হইতে পার।* মাফরুক মুগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—এ মানুষের রচিত কথা নহে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম। যাহা হউক, ইহাতেও মাফরুকের তৃপ্তি হইল না। তিনি হযরতকে মধুর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, আপনি আর কি উপদেশ দিয়া থাকেন ? হযরত আবার কোরআন হইতে পাঠ করিলেন : আল্লাহ্ ন্যায়নিষ্ঠ হইতে, সকলের উপকার করিতে এবং স্বজনগণকে দান করিতে আদেশ দিতেছেন ; এবং সকল প্রকার অশ্লীলতা, সকল প্রকার ঘৃণিত কাজ এবং সকল প্রকার বিপ্লব হইতে নিষেধ করিতেছেন, তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন—যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।** মাফরুক ব্যতীত হানি ও মোছান্না নামক জহল-গোত্রের আর দুইজন প্রধানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরতের বক্তব্য শেষ হইলে তাঁহারা হযরতকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সার এই যে,—আপনি যে সকল কথা বলিলেন সমস্তই সত্য। তবে পুরুষ-পুরুষানুক্রমিক ধর্ম হঠাৎ ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। এতদ্ব্যতীত পারস্য সম্রাটের সহিত আমাদিগের যে সন্ধি আছে, তাহাতে তাঁহাকে না জানাইয়া হঠাৎ এই প্রকার একটা নূতন ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়া আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপরও নহে। অবশ্য আপনার স্বজাতীয়গণ যে আপনাকে অকারণে ও অন্যায়ভাবে উৎপীড়ন করিতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আপনি নিজের কাজ করিয়া যাইতে থাকুন, আমরাও ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখি, তাহার পর যাহা ভাল হয় করা যাইবে।***

এইরূপে হযরত সকল গোত্রের যাত্রীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন, সকল সম্মেলনক্ষেত্রে গমন করিয়া লোকদিগকে আল্লাহর কালাম এবং তাঁহার নাম-মহিমা শুনাইতে লাগিলেন। একদিকে কোরেশ দলপতিগণ মিথ্যাবাদী, নাস্তিক, যাদুকর প্রভৃতি জঘন্য ভাষায় তাঁহাকে সকলের সম্মুখে অপদস্থ করার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহার ধর্মকে بدعت وضلالت অভিনব নাস্তিকতা ও গোমরাহী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। অধিক কি তাঁহারই পিতৃব্য আবু-লাহাবের প্রস্তরাঘাতে তাঁহার সর্বশরীর জর্জরিত হইয়া যাইতেছে। অন্যদিকে হযরত ঘোষণা করিতেছেন :

لا اكره احدا على شئ من رضى الذى ادعوه اليه قبله
ومن كره لم اكرهه انما اريد منعى من القتل حتى ابلغ رسالات ربى

"জোর নাই, জবরদস্তি নাই। আমার কথাগুলি যদি কাহারও ভাল লাগে, তাহা গ্রহণ করুক, আর তাহা যদি কাহারও অপছন্দ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমি জবরদস্তি করিয়া আমার মত মান্য করিতে বলি না। আমি কেবল ইহাই চাই যে, আমার প্রভুর বাণীগুলি পৌঁছাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত কেহ যেন আমাকে হত্যা না করিতে পারে।"**** তাহা হইলে আমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। বাদ নাই বিতণ্ডা নাই, বাহাছ নাই বিতর্ক নাই, অপবাদ ও মিথ্যা দোষারোপের প্রতিবাদ নাই, ইটকেলের পরিবর্তে পাটকেলের ব্যবস্থা নাই। তাঁহার কথাগুলি এবং তাঁহার মুখ-নিঃসৃত কোরআনের আয়তগুলি ধীরে গম্ভীরে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। অযুত কণ্ঠের হট্টগোলের মধ্যে তাহা সাময়িকভাবে আকাশে মিশাইয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি জনগণের ভিতরের মানুষগুলি দেখিতেছে—মিথ্যাবাদী, নাস্তিক, ভণ্ড ও যাদুকর বলিয়া বর্ণিত মোস্তফার চরিত্র মাহাত্ম্য ; এবং বাহিরের অজ্ঞাতসারেই তাহারা

---

* আনআম ১৯ রুকু। ** নাহল ৯ রুকু।
*** হালবী ২—৪ পৃষ্ঠা **** হালবী ২—৫ ; ছামহুদী ১—১৫৬।

তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া অস্ফুটকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে—আশহাদো আন্নাকা রসুলুল্লাহ! গালির পরিবর্তে গালি দিলে এবং লোষ্ট্রের পরিবর্তে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে এই বিরাট সফলতা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত।

### বিফলতা ও ধৈর্য

মানুষ যখন প্রত্যেক পদবিক্ষেপে সফলতা অর্জন করিতে থাকে, যখন অযুত কণ্ঠের প্রশংসাধ্বনিতে তাহার কর্মক্ষেত্র সমূহ মুখরিত হইয়া ওঠে, তখন উদ্যম ও উৎসাহ প্রদর্শনে বিশেষ কোন বাহাদুরী নাই। আর প্রকৃত কথা এই যে, কোন বৃহৎ ও মহৎ সাধনাই প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ সাধারণ সমর্থন লাভ করিতে পারেও না। পক্ষান্তরে সাধনার প্রথম অবস্থায় যাহা সাধারণতঃ বিফলতা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই আবার ভাবী সাফল্যের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। মক্কার হজ্ব সম্মেলনে এবং আরবের অন্যান্য মেলায় হযরত যে এতদিন অবিশ্রান্তভাবে প্রচার করিয়া বেড়াইলেন, বাহ্যতঃ মনে হয় যে, তাহা একেবারে বিফল হইয়া গেল। কিন্তু ইহা কি ঠিক? এই যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সমাগত শত শত আরব, আজ হযরতের মুখ হইতে আল্লাহর মহিমা-গান শ্রবণ করিল—তাঁহার সত্তা ও স্বরূপ সম্বন্ধে অভিনব তথ্যসমূহ অবগত হইল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁহার সৃষ্টির প্রতি নিজেদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে অশ্রুতপূর্ব উপদেশ প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগের স্বহস্তে নির্মিত ও স্বকপোল কল্পিত ঠাকুর-দেবতা ও পুতুল-প্রতিমার অপদার্থতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধে একটা যুক্তিপ্রমাণ তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল এবং মদ্যপান, ব্যভিচার, সন্তান হত্যাদি মহাপাতকের অনিষ্টকারিতার বিষয় তাহারা অবগত হইল—এ সকলের কি কোন ফলই ফলিবে না? ইহার একটা বঙ্কারও কি তাহাদিগের কর্ণ হইতে মর্মে নামিয়া আসিবে না! ইহাই সাফল্য এবং এই প্রচারই হযরতের প্রথম কৃতকার্যতা। আর পূর্বেই বলিয়াছি যে, ফলের জন্য প্রথম হইতে ব্যস্তত্রস্ত হইয়া পড়াও মোস্তফা-জীবনের আদর্শ নহে। তিনি বলিতেন—ফলাফল মানুষের হাতে নাই, অতএব সেজন্য তাহার চঞ্চল হইয়া পড়াও উচিত নহে। কর্তব্য পালন না করিলে মানুষ আল্লাহর সন্নিধানে অপরাধী হইয়া যায়, সুতরাং কর্তব্য পালন করাই তাহার পক্ষে বৃহত্তম সফলতা বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। তবে সঙ্গে সঙ্গে হযরতের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি এক মহাসত্যের সেবায় ও সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মিথ্যা ও কপটতার লেশমাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। তাঁহার আপনার জন তিনি—সর্বদাই তাঁহার সঙ্গেই আছেন হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুমণ্ডল অপেক্ষাও তিনি তাহার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। সেই সত্যময় আল্লাহ সহায় হইলেই নিজে সত্য ধর্মের নিশ্চয়ই সহায়তা করিবেন এবং তাঁহার সাধনা একদিন সেই সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদলাভে নিশ্চয়ই সফল ও সার্থক হইবে। আল্লাহর প্রতি তাঁহার এই অপূর্ব আত্মনির্ভর এবং আত্মসত্যে তাঁহার এই অবিচল প্রত্যয়, পরীক্ষার এহেন ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও পর্বতের ন্যায় অটল অবস্থায় সর্বদাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

## অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

### সফলতার প্রথম সূচনা

স্বর্গের পুণ্যালোক প্রগাঢ় তিমির-পটল ভেদ করিয়া কিরূপে নিজের স্থান প্রস্তুত করিয়া লয়, এখানে তাহারও একটু পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক

### তোফেলের এছলাম গ্রহণ

তোফেল বেন-আমর দাওছ গোত্রের প্রধান। একজন অবস্থাপন্ন লোক ও কবি বলিয়া আরবে তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল। তিনি নিজ মুখে বর্ণনা করিতেছেন—"আমি মক্কায় আগমন

করিলে কোরেশের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিশেষ সম্মানের সহিত আমার অভ্যর্থনা করিল। তাহারা অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে হযরতের উল্লেখ করিয়া বলিল—"মোহাম্মদ অতি ভয়ঙ্কর লোক, এমন জবরদস্ত যাদুকর আর দেখা যায় না। ইহার কথা শুনিবামাত্রই যাদুর প্রভাবে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই যাদুর জোরে লোকটা আমাদিগের জমাআত ভাঙ্গিয়া দিতেছে, লোকদিগকে গোমরাহ করিয়া পিতৃপিতামহাদির চিরাচরিত ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিতেছে, লোকদিগকে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে—খুব সতর্ক থাকিবেন। আপনি অভ্যাগত অতিথি, তাই আপনাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম।" তাহারা বহুক্ষণ ধরিয়া হযরত সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিল, যাহাতে আমার মনে সেগুলি একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গেল। আমি তখন খুব সাবধান হইয়া চলাফেরা করিতে লাগিলাম; যাহাতে কোন মতেই হযরতের কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাই আমার প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। একদা প্রাতঃকালে কা'বায় গমন করিয়া দেখি, হযরত দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। এত সাবধানতা ও এমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার মুখ-নিঃসৃত কোরআনের কয়েকটি আয়ৎ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। কথাগুলি খুবই মনোরম। তখন আমার মনে নিজের প্রতি যেন একটা ধিক্কারের ভাব উপস্থিত হইল। আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা আমার আছে। তবে পূর্ব হইতে এত ভয় করিবার আবশ্যক কি ? ইহার কথায় গ্রহণীয় কিছু থাকিলে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে, আর যদি তাহাতে কুভাব থাকে, তবে আমি ত' সহজেই তাহা অস্বীকার করিতে পারি। (ফলতঃ তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে হযরতের তেলাঅৎ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।) এই মনে করিয়া, আমি আরও নিকটবর্তী হইলাম, এবং হযরতের নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। নামায শেষ হইলে হযরত উঠিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি কোরেশদিগের সমস্ত কথা ও অদ্যকার ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিয়া বলিলাম—আপনার বক্তব্য কি, তাহা জানিতে চাই। হযরত তখন আমাকে এছলামের শিক্ষা ও কর্তব্য বুঝাইয়া দিলেন এবং কোরআনের কতকগুলি আয়ৎ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। আমি তখনই এছলাম গ্রহণ করিলাম।"

## দাওছ গোত্রে এছলাম প্রচার

"আমি অতঃপর হযরতকে বলিলাম, সমাজে আমার বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। আপনি অনুমতি দিলে, আমি স্বদেশে গিয়া আর সকলকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করিতে পারি।" হযরত আশীর্বাদ সহকারে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। তোফেল স্বদেশে উপস্থিত হইয়া প্রথমে নিজ পিতা ও সহধর্মিণীকে সত্য ধর্মের মহিমা বুঝাইতে লাগিলেন। পিতাকে এছলামে দীক্ষিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। তাঁহার স্ত্রীও এছলাম গ্রহণে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইল—তাঁহাদের পল্লীবিগ্রহ জুশেরা ঠাকুরের। তিনি স্বামীকে বলিলেন: এই কোলের কাঁচা মেয়েটির উপর ঠাকুর ত কোন উৎপাত করিতে পারিবে না ? তোফেল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ও-গুলার কোনই ক্ষমতা নাই। অতঃপর তাঁহার পরিবারের আর সকলেই এছলাম গ্রহণ করিলেন। তোফেল দাওছ বংশের মধ্যেই হযরতের কর্তব্য সমাধা করিতে লাগিলেন। হযরতের মদীনা গমনের কিছুকাল পরে তোফেল স্বসমাজের ৬০টি মুছলমান পরিবার সঙ্গে লইয়া মদীনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।* বিখ্যাত ছাহাবী আবু-হোরায়রাও এই দাওছ বংশীয় এবং তিনিও সকলের সহিত খাইবার সমরের পর মদীনায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, বহুদিন পর্যন্ত দাওছ বংশের লোকেরা তোফেলের উপদেশ গ্রহণ না করায়

* এছাবা-হেশাম ১—১৩২ হইতে ; এছাবা ৩—২৮৭; জাদুল-মাআদ ১—৪৬৩, তাবকাত প্রভৃতি

তিনি ও দাওছের আর কয়েকজন নবদীক্ষিত ব্যক্তি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দাওছ সত্য গ্রহণ করিল না, তাহারা এছলামের শত্রুতা করিতেছে। আপনি তাহাদিগের প্রতি অভিসম্পাত করুন। হযরত দুই হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন—'আল্লাহ্! তুমি দাওছের মঙ্গল কর, তাহাদিগকে সুমতি দাও, সৎপথ দেখাইয়া দাও !*

## আবু-জর গেফারীর নবজীবন লাভ

মহাত্মা আবু-জর গেফারীর নাম মুছলমান সমাজে সুবিদিত। ইনি অতি সাধু প্রকৃতির ধর্মভীরু লোক ছিলেন প্রথম হইতে তাঁহার মনে সত্য ধর্ম অনুসন্ধান করার জন্য একটা তীব্র আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই সময় কোরেশগণের বিরুদ্ধাচরণের ফলে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার চর্চা আরবের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আবু-জর স্বীয় সহোদর ওনায়ছকে হযরতের প্রকৃত অবস্থা ও তাঁহার শিক্ষাদি সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। ওনায়ছ কয়েকদিন মক্কায় অবস্থান করিয়া হযরত সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান লইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন, এবং ভ্রাতাকে বলিলেন—মোহাম্মদ ত সকলকে সৎকর্মশীল ও সচ্চরিত্র হইতেই উপদেশ দিয়া থাকেন, আর তাঁহার কথা ত কবির রচনা বলিয়া বোধ হইল না। ওনায়ছের প্রদত্ত এইটুকু তথ্যে আবু-জরের তৃপ্তি হইল না, অবিলম্বে তিনি স্বয়ংই মক্কা যাত্রা করিলেন।

আবু-জর মক্কায় আসিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ান, কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না। হযরতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাও যে কতদূর বিপদসঙ্কুল, ওনায়ছের মুখে তিনি তাহা পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন এইরূপে অতিবাহিত হওয়ার পর, একদা রাত্রে তিনি জমজম কূপের ধারে পড়িয়া আছেন, এমন সময় ঘটনাক্রমে হযরত আলী সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই লোকটিকে এমনভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, আলীর মনে তাঁহার অবস্থা জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল। তিনি আবু-জরের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বোধ হইতেছে, আপনি বিদেশী ?

আবু-জর—হাঁ, বিদেশী।

আলী—আচ্ছা, তাহা হইলে আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। আবু-জর একটা উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন, তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া আলীর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন, এবং তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া সেখানেই রাত্রি যাপন করিলেন। কিন্তু কেহ কাহাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। প্রাতে উঠিয়াই আবু-জর—কা'বায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মোস্তফা-চরণ-দর্শন লালসায় উদভ্রান্তের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পর পর দুই রাত্রে আলী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন; তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরও আবু-জরকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার ঔৎসুক্য বাড়িয়া গেল। তিনি আবু-জরের নিকটবর্তী হইয়া সহানুভূতি-সূচক স্বরে বলিলেন—বোধ হয় আপনি নিজের গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিতেছেন না?

আবু-জর—ঠিক কথা।

আলী—বলুন দেখি, আপনি কে, কেনই-বা মক্কায় আসিয়াছেন, কাহার অনুসন্ধানে এমন উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ?

আবু—আপনার ব্যবহারে বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি একজন হৃদয়বান লোক। বস্তুতঃ আমার একটি অতি গোপনীয় কাজ আছে। আপনি কাহাকেও তাহা বলিবেন না—প্রতিজ্ঞা করুন, তাহা হইলে সব কথা আপনাকে ভাঙ্গিয়া বলিতে পারি।

আলী—প্রতিজ্ঞা না করিলেও আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করি না। আচ্ছা আপনার বিশ্বাসের জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

---

* বোখারী ১১—৯৫।

আবু—লোক পরম্পরায় শুনিয়াছি, এই শহরের একজন লোক বলিতেছেন যে, তিনি আল্লাহর নবী। ইহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়ার জন্য পূর্বে নিজের সহোদরকে এখানে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ভালরূপে সমস্ত বিবরণ দিতে না পারায়, আমি নিজেই আসিয়াছি।

আলী—সাধু সাধু! আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে, ভালই কথা। আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন, সত্যই তিনি আল্লাহর নবী। আজ রাত্রি এখানে অবস্থান করুন। সকালে উঠিয়া আমি আপনাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিব। আবু যরকে প্রকাশ্যভাবে লইয়া যাইতে না পারায়, এজন্য পথে বিপদের আশঙ্কা ও সতর্কতার আবশ্যক হইল। আলী নিজের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন, ইহাও স্থির হইল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া উভয়ে মোহাম্মদ ও মোস্তফা হযরত সমীপে উপস্থিত হইলেন। আবু-জর কিছুক্ষণ মহাপুরুষের মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিলেন এবং সেই স্থানেই সত্য ধর্ম গ্রহণ করিলেন। হযরত তখন আবু-জরকে বলিলেন, তুমি এখন লোকে এ-সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিও না। স্বদেশে ফিরিয়া যাও। তাহার পর আল্লাহ্ আমাকে জয়যুক্ত করিলে, আমার কাছে চলিয়া আসিও। আবু-জর সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন—প্রভু হে, সত্য গোপন করিব কি করিয়া? যাহার নামে, ডাহার বাঁধ, সবই যে ভাঙিয়া ছুটিয়া গিয়াছে। এ বান কি আর ঠেকান যাইবে সম্ভব? আমি তাহা পারিব না। মক্কার পথে পথে আল্লাহর নামের জয়ধ্বনি না তুলিয়া আবু-জর ক্ষান্ত হইবেন না।

## আবু-জরের তাওহীদ ঘোষণা

আবু-জর এখন আর সে আবু-জর নাই। সেই রাত্রিতেই আবু-জর এখন নিজ হৃৎপিণ্ডের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে স্পষ্টরূপে এক নূতন শক্তির স্পন্দন অনুভব করিতেছেন। সেই সর্বশক্তিমান মহা শক্তিকেন্দ্রের সহিত আজ তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাই আজ তিনি ভয়-ভাবনার অতীত। আবু-জর সেখান হইতে বাহির হইয়া সোজা কা'বায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোরেশ দুর্বৃত্তেরা সেখানে বসিয়া নানা প্রকার ষড়যন্ত্র পাকাইতেছে, মতলব আঁটিতেছে। আবু-জর সেখানে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে কলেমায় শাহাদাৎ ঘোষণা করিলেন। আর যায় কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে মার-মার করিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার উপর বেদম প্রহার আরম্ভ হইয়া গেল। কিন্তু আবু-জর এ অবস্থায় নিজের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে চড়াইয়া বলিতেছেন, "আশহাদো আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ।" দুর্বৃত্তেরা প্রহার করিতে করিতে তাঁহাকে একেবারে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিল, তবুও আবু-জরের মুখে ঐ কলেমা ধ্বনি। এই সময় হযরতের পিতৃব্য আব্বাস সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার বুঝিয়া বলিলেন,—তোমরা কি সর্বনাশ করিতেছ! এ যে গেফার বংশের লোক। সিরিয়ায় বাণিজ্য করিতে যাইবার পথেই যে উহাদিগের পল্লী! তোমরা করিতেছ কি? আব্বাসের কথা শুনিয়া তাহারা আবু-জরকে ছাড়িয়া দিল। তিনি কয়েকদিন মক্কাধামে সত্য প্রচার করার পর হযরতের আদেশক্রমে, স্বজাতির মধ্যে ধর্ম প্রচার করার জন্য দেশে গমন করিলেন। আবু-জরের নিঃস্বার্থ প্রচার ও আন্তরিক চেষ্টার ফলে, অল্পদিন কালের মধ্যে গেফার বংশের অধিকাংশ লোক এছলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করিয়া ধন্য হইলেন।*

## প্রবাসীদিগের চরিত্রের প্রভাব

যে সকল মোছলেম নর নারী আবিসিনিয়ায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেখানে নিয়মিতভাবে ধর্ম প্রচার করার কোন সুবিধা বা সুযোগ পান নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আদর্শে এমনভাবে গঠিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে দেখিয়াই লোকের মনে তাঁহাদিগের ধর্ম সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব জাগিয়া উঠিত।** তাঁহাদিগের

---

* বোখারী, মোছলেম, মছনদ ইত্যাদি প্রভৃতি।

** ঠিক যেমন আজকাল মুসলিমদের দেখিয়া লোকের মনে এছলাম সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়া থাকে।

দেখিয়া এবং আবিসিনিয়ার খৃষ্টানদিগের আগ্রহ হইল, 'সেই নবীকে একবার দেখিয়া আসিতে হইবে।' এই আগ্রহের ফলে, আবিসিনিয়ার কুড়িজন খৃষ্টান মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হযরতের মুখে সত্য ধর্মের সমস্ত তথ্য অবগত হইলেন, কোরআন শ্রবণ করিলেন, এবং অবশেষে তাঁহারা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত 'সেই ভাববাদী' সেই মুক্তিকর্তা ও শান্তিকর্তাই এই মোহাম্মদ মোস্তফা, তখন তাঁহারা সকলেই এছলাম গ্রহণ করিলেন। প্রত্যাগমনের সময় আবুজেহেল ইহাদিগকে নানা প্রকারে উত্যক্ত করিয়াছিল, কিন্তু এ প্রলোভনে তাঁহারা একবিন্দুও বিচলিত হইলেন না।*

## গুণীন জেমাদ গুণমুগ্ধ হইলেন

জেমাদ বেন-ছা'লাবা আজদ বংশের একজন বিখ্যাত লোক। ভূত প্রেত ঝাড়া ও মন্ত্রতন্ত্রে গুণীন বলিয়া আরবময় তাঁহার খ্যাতি। জেমাদ এই সময় মক্কায় আসিয়া শুনিলেন—মোহাম্মদের ঘাড়ে একটা ভয়ঙ্কর রকমের ভূত লাগিয়াছে। কোরেশদিগের সহিত কথাবার্তা কহিয়া গুণীন মহাশয় ভূত ছাড়াইবার জন্য হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মোহাম্মদ! আমি তোমার ভূত ছাড়াইয়া দিব, সেই জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি। এখন স্থির হইয়া উপবেশন কর, আমি মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিতেছি।" জেমাদের প্রগল্‌ভোক্তি শ্রবণ করিয়া হযরত মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন—'বেশ তা' হবে এখন, আগে আমার কথা কিছু শুনিয়া লও।' এই বলিয়া হযরত তাঁহার চির-অভ্যাস মত الحمد لله نحمده ونستعينه الخ বা হামদ-নাআৎ পাঠ করিলেন। এই ভূমিকা শেষ না হইতেই জেমাদের সকল যাদুগিরি কোথায় চলিয়া গেল এবং তিনি সাগ্রহ সহকারে বলিলেন—মোহাম্মদ! এইটুকু আবার পড় দেখি। হযরত আবার 'আলহামদো লিল্লাহে, নাহমদুহু অ-নাস্তাঈনুহু' বলিয়া খোৎবার প্রথম হইতে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। জেমাদের অনুরোধ মতে হযরত কয়েকবার ইহার আবৃত্তি করিলেন। তখন জেমাদ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন—গুণীন যাদুকর অনেক দেখিয়াছি, আরবের প্রধান কবিদিগের বহু রচনা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এমনটি ত আর কখনও শুনি নাই। এ যে সমুদ্রের ন্যায়—বিশাল, গভীর ও অসংখ্য মণিমুক্তার আকর! মোহাম্মদ! হস্ত প্রসারণ কর, আমি তোমার হস্তধারণ করিয়া এছলামের সত্য গ্রহণ করিতেছি, আমি মুছলমান।**

## খাজরাজীয় দূতগণের নিকট সত্য প্রচার

এই সময় মদীনার খাজরাজ বংশের জনৈক প্রধান আনাছ বেন-রাফে'—কতিপয় লোককে সঙ্গে লইয়া মক্কায় উপস্থিত হইলেন। আওছ ও খাজরাজ বংশের মধ্যে চিরশত্রুতা, অদূর-ভবিষ্যতে এক ভীষণ সংগ্রামের সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ইঁহারা খাজরাজীয়দিগের পক্ষ হইতে মক্কাবাসীদিগের সহিত সন্ধি করিতে আসিয়াছেন। হযরত যথারীতি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আপনারা যে জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন, আমার নিকট তদপেক্ষা অনেক উত্তম কথা আছে, আপনারা শুনিবেন কি? অর্থাৎ, আপনারা স্বদেশবাসীর সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে জয়লাভ করিবার জন্য তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন, কিন্তু আপনাদিগকে এমন জ্ঞান ও প্রেমের শিক্ষা দিতে পারি, যাহাতে যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনাই থাকিবে না।' তাঁহারা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—সে কি কথা? হযরত উত্তর করিলেন, কথা অধিক কিছুই না। সকল মানব, তাহাদের সকলেরই সৃষ্টিকর্তা ও পরম পিতা আল্লাহর দিকে মন পরিবর্তন করুক। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ও তাঁহার সৃষ্টির প্রতি তাহার যে কর্তব্য ও আনুগত্য আছে, তাহা সকলে হৃদয়ঙ্গম করুক। মানুষ সমস্তই এক 'রাজার' প্রজা এবং একই পিতার সন্তান। সকলে তাঁহাকে চিনিয়া লউক, তাহাদের সকল চিন্তা সকল ভাব, সকল পূজা সকল উপাসনা,

---

* এবনে-হেশাম ১—১৩৬। ** মোসলেম ও নাছাই—এবনে-আব্বাছ হইতে।

একমাত্র তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হউক, এবং বিশ্ব-মানব সেই একই কেন্দ্রের সহিত সম্পর্ক-সম্পন্ন হইয়া ভেদ ও অনাত্মীয়তাকে দূর করিয়া দিউক—তাহা হইলেই আর যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হইবে না। এই প্রকার উপদেশ দিয়া হযরত কোরআনের কতকগুলি আয়াৎ পাঠ করিলেন এবং তাহাদিগকে এছলামের দিক আহ্বান করিলেন। এই দলের আয়াছ-বেন-মআজ নামক একটি যুবক হযরতের উপদেশ শ্রবণে মোহিত হইয়া বলিলেন—ইনি উত্তম কথাই বলিয়াছেন। যুদ্ধ জয় করা অপেক্ষা যুদ্ধ-বিগ্রহ রহিত করাতেই অধিক গৌরবের কথা। ইঁহার কথা শুনিলে আমাদিগের সমস্ত আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ মিটিয়া যাইবে। স্বদেশবাসীর শোণিতপাত করার আর কোন আবশ্যক হইবে না। দলস্থ আর একটি যুবকও ইহার সমর্থন করিলেন। কিন্তু দলপতি আনাছ বেন-রাফের ইহা ভাল লাগিল না। তিনি আয়াছের মুখে এক মুঠা কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, অজ্ঞ যুবক! চুপ করিয়া থাক, আমরা ইহার জন্য আসি নাই, আমাদের অন্য কাজ আছে।

হযরত সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন, এবং এই খাজরাজীয় ব্যক্তিগণও নিজেদের কাজ সারিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই যুবকদ্বয় যে শিক্ষা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত একমুহূর্তের জন্য তাহা বিস্মৃত হন নাই।

হাদীছ ও চরিত-অভিধান সমূহে এই প্রকার বহু ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নমুনাস্বরূপ এই কয়টির উল্লেখ করিলাম মাত্র। আরবের বিভিন্ন কেন্দ্রে এছলাম ধীরে ধীরে কিরূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই ঘটনাবলী হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এ স্থলে আমরা বোখারী ও মোছলেমের বর্ণিত একটি হাদীছের উল্লেখ করিয়া, দশম বৎসরের ইতিহাস ভাগ শেষ করিব।

## উজ্জ্বল আদর্শ

খাব্বাব বলিতেছেন—কোরেশের অত্যাচার যখন কঠোরতর হইয়া উঠিল, তখন আমি হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম—আপনি ইহাদিগকে অভিসম্পাৎ করুন। হযরত তখন একটা বড় চাদরে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া কা'বার ছায়ায় বসিয়াছিলেন। (এই বদ-দোওয়া করা বা অভিশাপ দেওয়ার নামে) তাঁহার কমলবদন লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল ;—তিনি বলিলেন—তোমাদিগের পূর্ববর্তী যাঁহারা ছিলেন, লৌহের চিরুণী দিয়া তাঁহাদিগের শরীরের সমস্ত মাংস আঁচড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, তবুও তাঁহারা কর্তব্যচ্যুত হন নাই। মাথায় করাত দিয়া তাঁহাদিগকে চিরিয়া দুই খণ্ড করিয়া ফেলা হইয়াছে, তবুও তাঁহারা সত্যের কথা ত্যাগ করেন নাই। নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ যে, সে শান্তির দিন আসিতেছে, যখন একাকী একজন আরোহী ছনআ হইতে হাজরামৌত পর্যন্ত পর্যটন করিবে, কিন্তু এক আল্লাহ ব্যতীত তাহার আর কাহারও ভয় থাকিবে না।*

## কর্মহীন দোওয়া

আজকাল মুছলমান সমাজে যত্রতত্র দোওয়ার খুব আধিক্য দেখা যায়। সভাসমিতিতে এছলামের জয়ের জন্য খুব জোরশোরে দোওয়া করা হয়। আমীনের গুরুগম্ভীর স্বরে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে। জাতির ঘোরতর বিপদে, কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে আহ্বান করিলে, আমাদিগকে আলেম ও বোজর্গ লোকেরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন,—'বাবা! তোমরা যাহা করিতেছ—কর, আমরা দোওয়া করিতেছি।' কিন্তু এই সমস্ত দোওয়াই একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—কেন? এই হাদীছে তাহার স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাইতেছে। দোওয়ার প্রার্থনা করাতেই হযরত ক্রোধান্বিত হইয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। ইহার সারমর্ম এই যে

"কর্মহীন প্রার্থনা ও ধৈর্যহীন কর্মের কোনই সফলতা নাই।"

---

* হযরতের এই ভবিষ্যদ্বাণী যেরূপ বর্ণে বর্ণে সার্থক হইয়াছিল পরে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে

# উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

## মদীনার মহামুক্তি

নবুয়তের দশম বৎসরের হজ-মৌসুমে মক্কা হইতে একটু দূরে আকাবা নামক স্থানে ছয়জন বিদেশী বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছে। হযরত তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে, তাহারা মদীনাবাসী খাজরাজ বংশীয় লোক। হযরত তাহাদিগকে একটু স্থির হইয়া তাঁহার বক্তব্যগুলি শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদেশিগণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তিনি খুব সরল প্রাঞ্জল ভাষায়, এছলাম ধর্মের শিক্ষা ও সত্যতার কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে তিনি যথারীতি কোরআনের কতকগুলি আয়ৎ পাঠ করিয়া তাহাদিগকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করিলেন।

### আটজন দীক্ষিত

মদীনার এই সকল লোক, নিজেরা পৌত্তলিক ও অংশীবাদী ছিল বটে, কিন্তু সেখানকার শাস্ত্রজ্ঞ ও শিক্ষিত ইহুদী সম্প্রদায়ের সাহচর্য ও প্রভাবের ফলে, তাওহীদ বা একেশ্বরবাদ তাহাদিগের অবিদিত ছিল না। বিশেষতঃ ফারান হইতে একজন নবী উদ্ভূত হইবেন এবং ছল্লা' صلعم তাঁহার নামের জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইবে—এ কথা তাহারা প্রায়ই ইহুদীদিগের নিকট শুনিতে পাইত। 'বানি ইছরাইলের দায়াদগণের অর্থাৎ বানি ইছমাইলের মধ্য হইতে, আল্লাহ্ মুছার ন্যায় আর একজন নবী উত্থাপিত করিবেন, তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়া ইহুদিগণ যুদ্ধ করিবে, পৌত্তলিকদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া বর্তমান অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, নানা উপলক্ষে ইহুদীদিগের মুখে তাহারা এইরূপ কথা শুনিতে পাইতেন। হযরতের প্রমুখাৎ সমস্ত কথা অবগত হইয়া তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—'এই ত সেই নবী।' ইঁহাকে অস্বীকার করিলে আমাদিগের ইহ-পরকালের সর্বনাশ হইবে। ফলতঃ তাঁহারা সকলেই হযরতের নিকট এছলাম গ্রহণ করিলেন।

### প্রত্যেক মুছলমানই প্রচারক

এছলাম গ্রহণ করিলে মানুষের সাধনার সূত্রপাত হয়—শেষ হয় না। কাজেই এই ছয়জন নবদীক্ষিত মুছলমান, কেবল মুছলমান হইয়াই নহে, বরং এছলামের সেবক ও সত্য ধর্মের প্রচারক হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহাদিগের এক বৎসরব্যাপী অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে, মদীনা ও তাহার পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার এছলাম ধর্মের চর্চা আরম্ভ হইয়া গেল। ইতিমধ্যেই কতকগুলি লোককে তাহারা সত্য ধর্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইলেন। এই মহাজনগণের নাম এছলামের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবে। এই মহাকর্মিগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১। আছআদ বেন-জোরারা

খাজরাজ বংশের বানি-নাজ্জার গোত্রের তরুণ যুবক। ইনিই মদীনায় সর্বপ্রথমে জেমআর নামাজের অনুষ্ঠান করেন। হিজরতের কয়েক মাস পরেই ইনি পরলোক গমন করেন। মদীনার আনছারগণের বর্ণনা মতে ইনিই সর্বপ্রথম 'জান্নাতুল-বাকী' নামক গোরস্থানে সমাধিস্থ হন

২। রাফে' বেন-মালেক

বিগত দশ বৎসর যতটা কোরআন নাজেল হইয়াছিল, হযরত তাহার এক প্রস্থ নকল ইঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। রাফে' মদীনায় অপমান করিয়া খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসারে মদীনাবাসীদিগের মধ্যে কোরআন প্রচার করিতেন। হযরত তাঁহার মনের দৃঢ়তা দর্শনে আনন্দিত হইয়াছিলেন। ওহোদ প্রান্তরে আত্মদান করিয়া ইনি অমর হইয়াছেন

৩। আবুল হাইছাম বেন-তাইয়েহান

আওছ বংশোদ্ভূত। প্রত্যেক জেহাদে উপস্থিত ছিলেন। ২০শ বা ২১শ হিজরীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৪। জোহরা বেন-আমের

৫। আওফ বেন-হারেছ

৬। জাবের বেন- আবদুল্লাহ

৭। ওকবা বেন- আমের

৮। আমের বেন- আব্দে হারেছা

এই তালিকার মধ্যে আছআদ ও আবুল হাইছাম পূর্ব হইতে মক্কায় উপস্থিত ছিলেন। সেই জন্য কোন কোন ঐতিহাসিক নবাগত ছয়জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত সকলের নাম বর্ণনা করিয়াছেন। আছআদ ও আবুল হাইছাম যে পূর্বেই এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

## প্রথম আকাবার বায়আৎ

পর বৎসর দ্বাদশ জন মদীনাবাসী পূর্ব কথিত আকাবা নামক স্থানে হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। ইহাই প্রথম আকাবার বায়আৎ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দীক্ষাকালে তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিরূপে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হইত, তাহা আমরা দ্বিতীয় আকাবার বিবরণে একত্র বর্ণনা করিব। কয়েকদিন যাবৎ হযরতের খেদমতে অবস্থান করার পর, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সময়, তাঁহারা হযরতকে বলিলেন—'আমাদিগকে কোরআন পড়াইতে পারেন, এমন একজন লোক আমাদিগের সঙ্গে দিলে ভাল হইত।' হযরত তখন ভক্তপ্রবর মোছআব বেন-ওমায়েরকে তাঁহাদিগের সঙ্গে দিলেন।

## মোছআবের আদর্শ

মোছআব অবস্থাপন্ন ঘরের দুলাল, তাঁহার পিতার অগাধ ধন-সম্পত্তি ছিল। শত শত টাকা মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিয়া মোছআব যখন মক্কার পথে বাহির হইতেন, তখন তাঁহার অগ্র-পশ্চাতে আর্দালী চলিত। এছলামে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি এখন কপর্দকহীন কাঙ্গাল। যখন তিনি কোরআনের শিক্ষকরূপে মদীনায় প্রস্থান করিতেছেন, তখন সেই মোছআবের অঙ্গভূষণ মাত্র এক টুকরা ছেঁড়া কম্বল, একবার মোছআবকে এই অবস্থায় দেখিয়া হযরত তাঁহার পূর্বাপর অবস্থা ও ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। "দুই শত টাকার কম মূল্যের 'জোড়া' তিনি কখনই পরিতেন না"—সেই মোছআব ওহোদ সমরে একখানি মাত্র বস্ত্র রাখিয়া শহীদ হইয়াছিলেন। এই বস্ত্রই তাঁহার কাফনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ছহী হাদীছে বর্ণিত আছে, সে বস্ত্রখানা এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানিয়া দিতে পা বাহির হইয়া পড়িত। হযরত বলিলেন—পায়ের দিকে কতকগুলি আজখার ঘাস রাখিয়া মোছআবকে সমাহিত কর *

## মদীনায় প্রচার

মহাত্মা মোছআব এই দ্বাদশ জন ভক্তকে লইয়া মদীনায় প্রস্থান করিলেন। একে ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের সহিত নিত্য সংঘর্ষ এবং তাহাদিগের প্রতিবেশ প্রভাবের ফলে মদীনার পৌত্তলিকদিগের মধ্যে স্বাধীনভাবে ধর্মকথা আলোচনা করার একটা অপরিস্ফুট শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর মোছআব ও আবদুল্লাহ বেন-উম্মে মাকতুমের ন্যায় সর্বত্যাগী আদর্শ ভক্ত তাহাদিগের নিত্য সাহচর্য অবলম্বন করিলেন। পক্ষান্তরে মদীনাবাসিগণ স্বাভাবিক জলবায়ুর গুণেও স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত ধীর ও নম্র প্রকৃতি বিশিষ্ট। মোছআব সেখানে গিয়া পূর্বকথিত আছআদ বেন-জোরারার বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন—মদীনায় তিনি সাধারণতঃ 'মোকরী' বা অধ্যাপক নামে খ্যাত হইলেন।

---

* তিরমিজী ও নাসায়ী, মেশকাত, এছাবা

অতঃপর আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণভাবেই প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু কোরআনের পবিত্র শিক্ষার মাহাত্ম্যে, তাঁহাদিগের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন জীবনের সূত্রপাত হইল। সেই 'সত্যম্ সুন্দরম্ ও শিবম্'-এর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদিগের সমস্তই সত্যে, সৌন্দর্যে ও কল্যাণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই আবদুল্লাহ—ছালামুল মোমেনুল-মোহায়মেনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া, তাঁহাদিগের জীবন পবিত্রতা, শান্তি ও মহত্ত্বে শত্রুমিত্র সকলের নয়নমন তৃপ্তিকর হইয়া উঠিল। মুষ্টিমেয় নবদীক্ষিত মোছলেম নর-নারীর সেই চরিত্র প্রভাব, লোকচক্ষের অগোচরে ক্রমে মদীনাবাসীর হৃদয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে লাগিল।

## আদর্শের প্রভাব

বস্তুতঃ উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ চাই। এমন কি, উপদেষ্টা নিজে আদর্শস্থল হইলে অধিক উপদেশের আবশ্যকও হয় না। তাঁহার সেই চরিত্রই শ্রেষ্ঠতম প্রচারক। সূর্য কিরণ বিতরণ করে, একথা বলিলে ভুল হয়। কিরণময় সূর্য আপনার সমস্ত জ্যোতি ও সকল আভা লইয়া আত্মপ্রকাশ করে মাত্র, আর বিশ্বচরাচরের সকল পদার্থ আপনা আপনিই সেই কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বহুসংখ্যক গণিত পুস্তক কণ্ঠস্থ করাইয়া দিলেও, ছাত্র কখনই গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবে না। বরং খড়ি পাতিয়া, কাগজ-কলমে অঙ্ক করিয়া, কেমন করিয়া অঙ্কসমূহের যোগ-বিয়োগ দ্বারা সত্য আবিষ্কার করিতে হয়, শিক্ষককে প্রথমে তাহা দেখাইয়া দিতে হয়। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। ধর্মের শিক্ষাগুলিকে নিজের জীবনের পরতে পরতে সত্য করিয়া সমাজের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিতে হয়। এই জন্য ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ এক-একজন আদর্শ মহাপুরুষ বা মহাশিক্ষকের আবশ্যক হইয়া থাকে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা পূর্ণ জগতের জন্য ইহার পূর্ণতম আদর্শ। তাঁহার দুই দিনের সংস্পর্শে, আরব প্রান্তরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই উপলখণ্ডগুলি একেবারে 'পরশ-পাথরে' পরিণত হইয়াছিল। 'মৃতদিগের মধ্য হইতে জীবিত হইয়া'* তিনি অভিজ্ঞান প্রদর্শন করেন নাই—সত্য, কিন্তু তাঁহার এক ফুৎকারে সহস্র সহস্র মৃত অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছিল। এ অভিজ্ঞান কত সত্য, কেমন জ্বলন্ত ও কত বেশী বিশ্বাসের যোগ্য।

তখনও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মদীনায় এছলাম প্রচারের কোন ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। তাই অধ্যাপক মোছআব আর কতিপয় মুছলমানকে সঙ্গে লইয়া একটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত স্থানে বসিয়া আবদুল আশহাল ও জাফর গোত্রের মধ্যে এছলাম প্রচারের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। এদিকে এইরূপ পরামর্শ চলিতেছে, অন্যদিকে অতঃপরের সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য সর্বসিদ্ধিদাতা কি আয়োজন করিতেছেন, একটু পরেই আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

## প্রধানগণের বিপক্ষতাচরণ

আনছারগণের মধ্যে মহাত্মা ছা'আদ বেন মা'আজের নাম সর্বজনবিদিত। এই ছা'আদ ও ওছায়েদ নামক আর এক ব্যক্তি, তখন আবদুল আশহাল গোত্রের প্রধান সমাজপতি। ক্রমাগত মদীনায় এছলামের প্রভাব বৃদ্ধি দর্শন করিয়া ইঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যে সময় মোছআব অন্য মুছলমানদিগের সহিত আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিক সেই সময় দুইজন গোষ্ঠীপতি একত্র হইয়া এছলামের মূলোচ্ছেদ করার পরামর্শে লিপ্ত হইলেন। শেষে ছা'আদ সহকারী ওছায়েদকে বলিলেন—আরে সর্বনাশ, এই লোক দুইটা এখানে আসিয়া আমাদের কাঁচা লোকগুলাকে একেবারে গোমরাহ করিয়া ফেলিল, আমাদিগের মাথায়ও ইহারা হাত বুলাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। তুমি গিয়া ইহাদিগকে ভাল করিয়া ধমকাইয়া আইস, যেন আমাদিগের এদিকে তাহারা আর কখনও ভুলিয়াও না আসে। নচেৎ ইহার পরিণাম তাহাদিগের পক্ষে কখনই প্রীতিকর হইবে না। আমি নিজেই ইহার উচিত ব্যবস্থা করিয়া আসিতাম, কিন্তু কি করিব, দুর্ভাগ্য আছআদও আমার খালাতো ভাই। উপস্থিত আমি যাইব না, তুমি যাও।

---

* কোরআন

ওছায়েদ পূর্ব হইতেই ক্ষেপিয়া ছিলেন, প্রধান দলপতির কথায় তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সন্ধান করিতে করিতে সেই কূপধারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আছআদ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পূর্ব হইতে মোছআবকে তাঁহার পরিচয় জানাইয়া রাখিয়াছিলেন।

ওছায়েদ আসিয়াই একেবারে উগ্র মূর্তি ধারণ করিলেন, তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গালাগালি দিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ দুরাত্মাগণ ! আমাদের দেশে আসিয়াছিস কেন ? আমাদের বোকাগুলিকে প্রবঞ্চিত করিতে ? শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর। প্রাণের কোন আবশ্যক যদি তোদের থাকে, তবে এখনই এখান হইতে দূর হ' !

## প্রচারকের আদর্শ ধৈর্য

বিকারগ্রস্ত রোগীর গালাগালিতে, ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ চিকিৎসকের মনে, তাহার প্রতি সমধিক দয়ারই উদ্রেক হইয়া থাকে। মোছআব এই গালাগালির উত্তরে ধীর, নম্র অথচ অবিচলিত স্বরে বলিলেন—মহাশয়! একটু স্থির হইয়া বসুন। আমাদিগের বলিবার কি আছে, তাহাও শ্রবণ করুন। আমরা যাহা বলি, যদি আপনি নিজের জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে তাহা সত্য ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন, তবে তাহা গ্রহণ করিবেন। আর যদি আমাদিগের কথাগুলি আপনার জ্ঞান ও বিবেকানুসারে মন্দ প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আপনি সেই 'মন্দের' যতদূর পারেন, বিপক্ষতাচরণ করিবেন।

## ওছায়েদের সত্য গ্রহণ

এমন তীব্র ও উগ্র ব্যবহারের এরূপ নম্র ও যুক্তিযুক্ত উত্তর পাইয়া ওছায়েদ মনে মনে একটু লজ্জিত হইলেন। তিনি সংক্ষেপে এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। মহাত্মা মোছআব তখন স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও ধীরগম্ভীর ভাষায় এছলামের স্বরূপ এবং তাহার সত্যতা ও শিক্ষা ওছায়েদকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন, এবং উপসংহারে মধুর স্বরে কোরআনের কতকগুলি আয়তও পাঠ করিলেন। কোরআন শ্রবণ করিতে করিতে ওছায়েদ একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন, এবং অধৈর্যের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"আহা, কি সুন্দর!" অতঃপর তিনি স্নানাদি করতঃ শুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সেইখানেই এছলামের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, এবং অল্পক্ষণ সেখানে অবস্থান করিয়া ছা'আদের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন—আমাদিগের প্রধান দলপতি ছা'আদকে আমি কোন গতিকে আপনাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিতেছি। তাঁহাকে যদি আপনারা এছলামের সত্যতা বুঝাইয়া দিতে পারেন, আর আল্লাহ যদি তাঁহার হৃদয়কে অন্ধকার হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে একটা কাজের মত কাজ হইবে; আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে আশহাল গোত্রের মধ্যে আর কেহই এছলামের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইবে না।

ওছায়েদ এখান হইতে সোজা ছা'আদের নিকটে গমন করিলেন। ছা'আদ তখন অন্যান্য লোকজন লইয়া নিজেদের সভাগৃহে বসিয়াছিলেন। ওছায়েদের মুখভাব লক্ষ্যে তাঁহাদিগের মনে খটকা লাগিল—"গতিক বড় ভাল নয়।"

ছা'আদ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করিয়া আসিলে ?

ওছায়েদ বলিলেন ঃ হাঁ, আমি উহাদের উভয়ের সঙ্গে কথাবার্তা কহিলাম। হাঁ, বিচলিত হইবার ত কোন কারণ দেখি না। আমি উহাদিগকে নিষেধও করিয়াছিলাম, তাহারা বলিল—আপনি যাহা বলেন আমরা তাহাই করিব। এ ছাড়া আর এক বিপদ উপস্থিত। পথে শুনিলাম, হারেছা বংশের লোকেরা আছআদকে হত্যা করার জন্য বাহির হইয়াছে। আপনার খালাতো ভাই কি-না, তাই তাহাকে হত্যা করিয়া আপনাকে অপদস্থ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

ছা'আদ, ওছায়দের এই অস্পষ্ট উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—হাই ভগ্ন! তুমি দেখিতেছি, কিছুই করিয়া আসিতে পার নাই। এদিকে আছআদের বিপদের সংবাদ পাইয়াও তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কাজেই অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মোছআবের নিকটে গমন করিলেন।

## ছা'আদের শত্রুতা ও সত্য গ্রহণ

ছা'আদ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা, তাঁহার হস্তে উলঙ্গ তরবারী, মুখে কঠোর গালাগালি। তিনি আছআদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ সব কি হইতেছে ? কি বলিব ! যদি তোর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ তোর মুণ্ড এই ভুমির উপর গড়াগড়ি দিত। জুয়াচুরি ফাঁদ পাতিয়া আমাদিগের লোকা লোকগুলাকে মজাইতে বসিয়াছ তোমরা !

কিন্তু মোছআব ছা'আদকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় নম্র ও যুক্তিযুক্ত কথায় তাঁহাকে 'নরম' করিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণের আলোচনা এবং উপদেশ ও কোরআন শ্রবণের পর, ছা'আদও ভক্তি আগ্রহ সহকারে এছলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করিলেন।

## আশ্‌হাল গোত্রের এছলাম গ্রহণ

"নূতন ধর্ম্ম" সংক্রান্ত আলোচনায় তখন ইয়াছরব নগরী একেবারে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে, ঘরে ঘরে ঐ চর্চা। কাজেই ছা'আদ কি করিয়া আসেন, তাহা জানিবার জন্য মজলিস গৃহে অনেক লোক সমাগম হইল। ছা'আদ সেখানে উপস্থিত হইয়া অন্যের প্রশ্ন করার পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে আশ্‌হাল বংশীয়গণ ! সত্য করিয়া বল, তোমরা আমাকে কিরূপ লোক বলিয়া মনে করিয়া থাক ?'

চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল—'তুমি আমাদের প্রধান, আমাদের ভক্তিভাজন দলপতি; তোমার জ্ঞানের গভীরতা, তোমার সিদ্ধান্তের সমীচীনতা এবং তোমার ন্যায়নিষ্ঠা সর্ব্বজনবিদিত।'

ছা'আদ : 'তবে শ্রবণ কর ! তোমাদিগের এই পৌত্তলিকতার, এই অনাচার ও অবিচারের এবং এই অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ধর্ম্মের সহিত—সুতরাং তোমাদিগের সহিত—আমার আর কোন সম্বন্ধ নাই। যাবৎ তোমরা এই এক, অনাদি, অনন্ত ও বিশ্বচরাচরের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন না করিবে, তাবৎ তোমাদিগের সহিত আমার আর কোন কথাবার্ত্তা নাই।'

বিশ্বাসের এই তেজ, সত্যের প্রতি এই অনুরাগ, আল্লাহর জন্য এক মুহূর্ত্তে সর্ব্বস্ব ত্যাগের এমন কঠোর প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইবার জিনিস নহে।

দ্বিতীয় সর্দ্দার ওছায়দ পূর্ব্বেই মুছলমান হইয়াছেন। আছআদ বেন-জোরারা প্রভৃতি মহাজনগণও সেখানে উপস্থিত। কাজেই উভয় পক্ষ হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বোঝা যাইতে পারে। যাহা হউক, অবশেষে সকলে এছলামের সত্যতা ও মাহাত্ম্য স্বীকার করিলেন, এবং সেই একদিনে—আবদুল আশ্‌হাল গোত্রের সমস্ত নর-নারী, প্রধানদ্বয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়া এছলামে দীক্ষিত হইলেন।* পাঠক, এখানে স্মরণ করুন, তোফায়েলের সেই ভবিষ্যদ্বাণী :

"আল্লাহ্ আপন সত্য ধর্ম্মকে নিজেই জয়যুক্ত করিবেন।"

## প্রচারের ফল

মোছআব প্রমুখ প্রচারকগণ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত প্রচার আরম্ভ করিলেন, এবং কয়েক মাসের মধ্যে মদীনার প্রায় প্রত্যেক গোত্রেই এছলাম বিস্তারের স্থান প্রস্তুত হইয়া রহিল।

---

* এবনে হেশাম ১—২৫২, ৫৩ ; তবরী ২—১২৬৬, তাবকাত, নওয়াদের প্রভৃতি।

# চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

## মদীনা প্রয়াণের শুভ সূচনা

পর বৎসর, অর্থাৎ নবুয়তের ত্রয়োদশ সনের হজ-মৌসুমে, মদীনা হইতে একদল যাত্রী তীর্থ ও বাণিজ্যাদি উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইল। এই দলে মোটামুটিভাবে পাঁচশত লোক ছিল। সময় নিকটবর্তী হইতেছে দেখিয়া মুছলমানগণ পরস্পর যুক্তি-পরামর্শ করিতে লাগিলেন, গোপনে তাঁহাদিগের মধ্যে মক্কা যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। এবার তাঁহারা হযরতকে মদীনায় আগমন করার জন্য অনুরোধ করিবেন, সুতরাং প্রধান প্রধান মুছলমানগণও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।*

তীর্থযাত্রী কাফেলা যখন মদীনা হইতে রওয়ানা হইল, তখন ৭৩ জন মুছলমান পুরুষ ও ২ জন মোছলেম মহিলা এই দলের সহিত মিলিয়া মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই মহিলাদ্বয়ের মধ্যে নেছাইবা বা উম্মে-আম্মারা শৌর্যবীর্যের জন্য এছলামের ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ওহোদের কালসমরে এই মহীয়সী মহিলা কিরূপ সাহসের সহিত হযরতের দেহ-রক্ষীর কাজ করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

### কা'ব বেন-মালেক

কা'ব বেন-মালেক এই যাত্রীদলের সঙ্গে ছিলেন।** তিনি বলিতেছেন, আমরা মক্কায় পৌঁছিয়া হযরতকে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। বারা বেন-মা'রুর মদীনার একজন প্রধান গোষ্ঠীপতি এবং অতি সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি ও আমি একদিন হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমরা কেহই তাঁহাকে চিনিতাম না। সুতরাং সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার পিতৃব্য আব্বাছ ও তিনি কা'বায় বসিয়া আছেন। আমরা ত্বরিত পদে সেখানে উপস্থিত হইলাম এবং ছালাম করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলাম। হযরত তখন আব্বাছকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইঁহাদিগকে জানেন কি? আব্বাছের সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায়াদি উপলক্ষে আমাদিগের পরিচয় ছিল। তিনি বলিলেন—হাঁ জানি। ইনি বারা বেন মা'রুর, মদীনার একজন অতি সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীপতি। আর আমাকে দেখাইয়া বলিলেন,—ইনি মালেকের পুত্র—কা'ব। কা'ব বলিতেছেন,—সে কথা আমি ইহজীবনে বিস্মৃত হইব না—যখন হযরত আমার নাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'কা'ব, যিনি কবি?' আব্বাছ বলিলেন—হাঁ, তিনিই বটে।***

মদীনাবাসী মুছলমানগণ খুব সতর্ক হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কবে, কোথায় এবং কি উপায়ে তাঁহারা হযরতের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিতে পারেন, খুব গোপনে তৎসম্বন্ধে যুক্তি-পরামর্শ হইতে লাগিল, এবং অবশেষে হযরত ঠিক করিয়া দিলেন যে, জেলহজ্জ মাসের ১২ই তারিখে তাঁহারা আকাবার প্রান্তদেশে সমবেত হইবেন। নির্দিষ্ট সময় হযরতও সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। তিনি সকলকে খুব সাবধান হইয়া কাজ করিতে উপদেশ দিলেন, কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবে না, ডাকাডাকি করিবে না, কেহ ঘুমাইয়া পড়িলে তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিবে না।****

### গুপ্ত সম্মেলন

নির্দিষ্ট তারিখে ও নির্দিষ্ট সময়ে মুছলমানগণ একজন দুইজন করিয়া বাহির হইয়া আকাবায় সমবেত হইলেন। যথাসময়ে হযরতও সেখানে আগমন করিলেন, তাঁহার পিতৃব্য

---

* তাবকাত ১—১৪৯, মোস্তাদরক ৩—৩২২

** হেশাম ২৪—৪৫৩, জরকানী ১—৩৪২।

*** হেশাম ১—১৫৪।

**** তাবকাত ১—১৪৬ ; তাবরী, জাদুল-মাআদ প্রভৃতি।

আব্বাছ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আব্বাছ তখনও এছলাম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র কোন প্রকারে কোরেশদিগের অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পান, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সকলে উপবেশন করিলে, আব্বাছই আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। তিনি আওছ ও খাজরাজ বংশের নাম করিয়া বলিলেন ঃ 'এ সম্বন্ধে সকল দিক উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত। মোহাম্মদ—তাঁহার হউক—আমাদেরই। শত্রু হউক, মিত্র হউক, তাঁহার মহত্ত্ব ও মহত্ত্ব সকলেই স্বীকার করে। তাঁহার আপনার লোকও এখানে দুই-চারিজন আছে। আপনারা তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু ইহা সহজ ব্যাপার নহে। খুব সম্ভব, সমস্ত আরব এই জন্য আপনাদিগের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিবে। তখন যদি আপনারা বিপদ দেখিয়া পিছাইয়া পড়েন ? পূর্বে এই কথাগুলি আপনারা খুব ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন।'

আব্বাছের কথা শুনিয়া (সম্ভবতঃ) লোকের তৃপ্তি হইল না। তাঁহারা বলিলেন ঃ 'আপনার কথা ত শুনিলাম, এখন হযরত কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি।' হযরত প্রথমে কোরআন পাঠ করিলেন, সকলকে আল্লাহর দিকে মন পরিবর্তন করিতে আহ্বান করিলেন, এবং এছলাম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহার পর বলিলেন—আপনাদিগের নিকট আমার বক্তব্য কথা অধিক কিছু নাই। আমি সকল আপনাদেরই হইয়া যাইতেছি, তখন আপনারা নিজেদের পরিজনবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমার সম্বন্ধেও তাহাই করিবেন। আপনাদের স্বজনগণকে কেহ যদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে আপনারা যেমন তাহাদিগকে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়া থাকেন, যে সকল মুছলমান আপনাদের দেশে গমন করিবেন, কেহ অন্যায় পূর্বক আক্রমণ করিলে, আপনারা তাহাদিগকেও রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন—সত্যের সহায়তা করিবেন।

হযরতের মুখ হইতে এই কথাগুলি ব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণের মধ্যে উৎসাহ ও উত্তেজনার তরঙ্গ বহিয়া গেল। পূর্বকথিত বারা বলিয়া উঠিলেন—'আমরা প্রস্তুত। আপনি আমাদিগের নিকট হইতে 'বায়আৎ' (প্রতিজ্ঞা) গ্রহণ করুন। আমরা কোরেশের রক্তচক্ষুর ভয় করি না, আরবের আক্রমণ ভয়েও আমরা বিচলিত নহি। যুদ্ধ-বিগ্রহ আমাদিগের অজ্ঞাত বিষয় নহে, পুরুষ পুরুষানুক্রমে আমরা তাহাতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত আছি।'

আব্বাছ হযরতের হাত ধরিয়া বলিলেন—'সাবধান, আস্তে, খুব আস্তে। জানিতেছ না, আমাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য লোক লাগিয়া রহিয়াছে। প্রাচীনেরা অগ্রসর হইয়া কথা বলুন। তাহার পর সকলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া যান। অধিক বিলম্ব হইলে আপনাদিগের অন্য সহযাত্রীদিগের মনে সন্দেহ হইতে পারে। খুব সাবধানে সন্তর্পণে, সঙ্গোপনে, নিজেদের কাজ সারিয়া সকলে স্বস্থানে চলিয়া যান।'

## বায়আৎ

তখন প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য ভক্তগণের আগ্রহের সীমা রহিল না। তাঁহারা নিকটে আসিয়া হযরতের হস্তধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'মহাত্মন! প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন, আমরা মানসম্ভ্রম, ধনজন, জীবনযৌবন সমস্তই আল্লাহর নামে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত।'

যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মদীনাবাসিগণ এছলামের সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

(১) আমরা এক আল্লাহর উপাসনা করিব, তাঁহা ব্যতীত আর কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে ঈশ্বরত্বের আরোপ করিব না, কাহাকেও আল্লাহর শরীক করিব না।

(২) আমরা চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোন প্রকারে পরস্ব অপহরণ করিব না।

(৩) আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হইব না।

(৪) আমরা কোন অবস্থায় সন্তান হত্যা—বধ বা বলিদান—করিব না।

(৫) আমরা কাহারও প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিব না বা কাহারও চরিত্রের প্রতি অপবাদ দিব না।

(৬) আমরা ঠকামী, 'চোগলখোরী' করিব না।

(৭) আমরা প্রত্যেক সৎকর্মে হযরতের অনুগত থাকিব—কোন ন্যায্য কাজে তাঁহার অবাধ্য হইব না।*

এই প্রতিজ্ঞার শর্তগুলি মুছলমান পাঠকের পক্ষে বিশেষরূপে অনুধাবনযোগ্য। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াই মদীনাবাসী মুছলমান হইয়াছিলেন। মুছলমান হইতে বা থাকিতে হইলে এই শর্তগুলি অবশ্য পালনীয়। আজ আমরা মুছলমানের বেটা মুছলমান, কিন্তু এই অবশ্য পালনীয় শর্তগুলি আমাদের কয়জনে পালন করিয়া থাকেন? শের্ক বা গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি ঐশিক শক্তির আরোপ, মুছলমান সমাজে এখন কেবল প্রচলিত নহে, বরং ধর্মের অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অথচ তাহার প্রতিকার ও প্রতিবাদের প্রতি আমাদিগের আলেম সমাজে কোনই আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। ব্যভিচার, মিথ্যা, অপবাদ প্রদান, অন্যায় দোষারোপ, ঠকামী প্রভৃতি সমস্ত অশান্তি ও অকল্যাণের মূলীভূত দোষগুলি, এখন আর বড় একটা দোষ বলিয়া গণিত হয় না।

## জ্ঞানের মুক্তি

এই বায়আৎ বা প্রতিজ্ঞার শেষোক্ত শর্তটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। হযরত প্রতিজ্ঞা করাইতেছেন, আর দীক্ষার্থী ভক্তগণ ঐ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াই মুছলমান হইতেছেন। তাঁহার চরম শর্ত এই যে, "আমি যে সকল সৎ ও সঙ্গত কার্য معروف সম্পাদন করার জন্য তোমাদিগকে আদেশ করিব, তাহাতে তোমরা আমার অবাধ্য হইবে না।" ভক্তগণ নিশ্চিতরূপে অবগত ছিলেন এবং হযরতও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি কখনও কাহাকে অসৎ বা অসঙ্গত কাজ করিবার আদেশ দিবেন না। তবুও প্রতিজ্ঞায় আদেশের সহিত 'সৎ ও সঙ্গত' বিশেষণ লাগাইয়া দেওয়ার আবশ্যকতা কি ছিল, ইহা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখার কথা।

## জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব

মানুষ আল্লাহর প্রধান সৃষ্টি এবং জ্ঞান মানুষের প্রধান সম্বল। তাহার মনুষ্যত্বের যত বিশেষত্ব সে সমস্তই একমাত্র ইহারই উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ এই জ্ঞান, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা অনেক সময় হারাইয়া বসে, তখন কোরআনের বর্ণনানুসারে** সে পাশবাধম নিকৃষ্টতর জীবনে উপস্থিত হয়। কেন হয়?—একটু চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমরা নিজেরাই তাহার কারণ বুঝিতে পারিব। সচরাচর এইরূপ দেখা যায় যে, মানুষ প্রথম কোন একটা বস্তু বা ব্যক্তিকে 'বড়' বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লয়, আর সেই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আপনার জ্ঞান, বিবেক বা স্বাধীন চিন্তার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে ঐ 'বড়'র অন্ধভক্তির যূপকাষ্ঠে পুরিয়া দিয়া নির্মমভাবে হত্যা করিয়া বসে। তখন সেই 'বড়' যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন, এমন কি সেই 'বড়'র নাম করিয়া সত্য-মিথ্যা যত কথা রটনা করা হয়, তাহার ন্যায়ান্যায্য বিচার করিবার শক্তি আর তাহার থাকে না। জ্ঞান যখন স্বাধীনতা হারাইয়া বসে, তখন স্বাভাবিকভাবে মনও দুর্বল হইয়া পড়ে। কাজেই দুনিয়ার যত অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার, তখন তাহার মন ও মস্তিষ্ককে জুড়িয়া একাধিপত্য করিতে থাকে। তাই হযরত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছেন—মোছলেম জীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বায়আৎ লইতেছেন যে, আমি যাহা

* বোখারী ১৪—৮৩৪; এবনে-হেশাম, তবারী প্রভৃতি।

** কোরআন—أولئك كالأنعام الآية

বলিব, অন্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিবে না। তাহা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কথা কি-না, প্রথমে তাহা 'তাহকিক' করিয়া লইবে। যদি তোমরা তাহাকে ন্যায়সঙ্গত কাজ বলিয়া মনে কর, তবে তাহার অনুসরণ করিও।

## স্বাধীন চিন্তা এছলামের দীক্ষামন্ত্র

অতএব আমরা দেখিতেছি, স্বাধীন চিন্তা মুছলমানের দীক্ষামন্ত্র, তাহার বায়আতের প্রধানতম শর্ত। হযরত আল্লাহর নিকট হইতে অহি প্রাপ্ত হইতেন, তথাচ তিনি নিজের সম্বন্ধে যখন এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন অন্যে পরে কা কথা? ইহার মধ্যে আর একটা সূক্ষ্ম কথা আছে। নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া যে সত্যকে পাওয়া যায়, তাহা একেবারে নিজস্ব ও অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়, কোন অবস্থায় কোন প্রকারের সন্দেহ বা সংশয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং তৎসংক্রান্ত কর্তব্যগুলিও মানুষ দৃঢ়তার সহিত পালন করিতে সমর্থ হয়। ইহা এছলামের একটা বিশেষ সৌন্দর্য। এছলামের অন্যতম প্রবর্তক হযরত এব্রাহিম চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রাদির উদয়াস্ত দর্শনে চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন—অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল এগুলি, কখনই উপাস্য হইতে পারে না। তিনি তখন উহাদিগের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালকের সন্ধান পাইলেন। নমরুদের অনলকুণ্ড তাঁহার সেই বিশ্বাসকে বিচলিত করিতে পারিল না। ছাহাবাগণের জীবনী পাঠ করিয়াও আমরা এইরূপ দৃঢ়তার বহু আদর্শ দেখিতে পাই। ইহার সঙ্গে বর্তমান যুগের মুছলমানগণের বিশ্বাসের বল ও ঈমানের দৃঢ়তার তুলনা করিয়া দেখিলে আকাশ পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিশ্বাস হয় না—'আমরা বিশ্বাস করি!' অর্থাৎ আমরা বলি যে, আমরা বিশ্বাস করিতেছি। কারণ এই কথা না বলিলে মুছলমান হওয়া যা পুরোহিতগণের কাফেরী ফৎওয়া হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। এই অন্ধ ভক্তিই সকল সর্বনাশের মূল, ইহাতে মানুষের জ্ঞান ও বিবেক একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়ে, এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের প্রধানতম সম্বল ও শ্রেষ্ঠতম সম্পদকে হারাইয়া আপনাকে মনুষ্য নামের অযোগ্য করিয়া তুলে। তাই কোরআন নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকারে শতাধিক স্থানে, এই অন্ধ ভক্তি, গতানুগতি, পূর্বপুরুষের অন্ধানুকরণ, পীর-পুরোহিতগণের পদপ্রান্তে জ্ঞানের এই নির্মম আত্মহত্যা প্রভৃতির কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছে। কোরআন বলিতেছে—আল্লাহর অস্তিত্বে, একত্বে ও পূর্ণত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে। কেন—'না করিলে নরকে যাইবে', ইহা যুক্তি নহে—পরিণাম ফল। তাই কোরআন কার্যকারণ-পরম্পরাদি সহ বহু সরল ও স্বাভাবিক যুক্তি দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব ও পূর্ণত্ব অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে, অবিশ্বাসের পরিণতি মাত্র ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই।

## দ্বিতীয় আকাবায় বিশেষ শর্ত

উপরে বায়আতের যে শর্তগুলি দেওয়া হইয়াছে, উহা সাধারণ। পেশবার বা দ্বিতীয় আকাবায় ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি বিষয়ে মদীনাবাসী মুছলমানগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। উহার সার এই যে, তাঁহারা মদীনায় এছলাম প্রচারে রত থাকিবেন, প্রবাসী ভ্রাতাভগ্নীদিগকে নিজেদের সাক্ষাৎ ভ্রাতাভগ্নীগণের ন্যায় জ্ঞান করিবেন, এবং কেহ মদীনা আক্রমণ করিলে, সকলে মিলিয়া সেই আক্রমণে বাধা দিবেন। এই 'বায়আত' গ্রহণের সময়, একজন মদীনাবাসী বলিলেন—এদেশে ইহুদী ও অন্য জাতির সহিত আমাদিগের বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহারা এখন আমাদিগের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা সেজন্যও প্রস্তুত; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহার বিনিময়ে আমরা কি পাইব?

হযরত :—'মুক্তি, অনন্ত স্বর্গ, আল্লাহর সন্তোষ।'

মদীনাবাসী নিজের প্রশ্নটা আরও স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হযরত! এছলাম জয়যুক্ত হওয়ার পর আপনি কি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন?'

হযরত : (সহাস্য হাস্য করিয়া) 'না, কখনই নহে। তোমাদের সহিত আমার জীবন-মরণের সম্বন্ধ। সুখে দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, সমরে-শান্তিতে, জয়ে-পরাজয়ে সর্বাবস্থায়ই আমি তোমাদেরই সঙ্গে থাকিব।'

মিত্রদের অভিজ্ঞিত কথাটি হযরতের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া, মদীনাবাসীদিগের আনন্দের আর অবধি রহিল না। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন আব্বাস বেন-ওবাদা নামক জনৈক দূরদর্শী লোক গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন—ক্ষান্ত হও, একটু স্থির হইয়া ইহার ভালরূপ চিন্তা করিয়া দেখ। জানিয়া রাখিও, তোমাদিগের এই প্রতিজ্ঞার ফলে আরব-আজমের শ্বেত-কৃষ্ণ সকল জাতিই তোমাদিগের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে, তোমাদের ও তোমাদের বড় বড় গণ্যমান্য লোকের প্রাণের বিনিময়ে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইবে। এখনও সময় আছে, ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। যদি বিপদের ভীষণতা পরিণামে তোমাদিগকে বিচলিত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ইহ-পরকালে তোমাদিগের স্থান থাকিবে না। সেই ঘৃণিত কাপুরুষতা অপেক্ষা এখনই তফাত হইয়া যাওয়া ভাল। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের মনে এতটা শক্তি এবং এতটা সৎসাহস থাকে যে, তোমরা এই সকলের জন্য প্রস্তুত হইতে পার, তবে বিছমিল্লাহ! অগ্রসর হও, ইহ-পরকালে ইহা অপেক্ষা কল্যাণের কথা আর কিছুই নাই।

## দ্বাদশ প্রচারক

সকলে, স্থির-গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমরা খুব বুঝিয়া দেখিয়াছি, এ সকলের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।" এই প্রকার কথোপকথনের পর সকলেই হযরতের হাত ধরিয়া বায়আৎ গ্রহণ করিলেন। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ শেষ হইয়া গেলে, হযরতের আদেশমতে, মদীনাবাসিগণ আপনাদিগের মধ্য হইতে দ্বাদশ জন 'নকিব' বা প্রচারক মনোনীত করিলেন।* তখন হযরত তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনারা এই দ্বাদশ জন, মরিয়ম তনয় ঈসার শিষ্যগণের ন্যায়, আপনাদিগের দেশে আমার প্রতিনিধিরূপে আল্লাহর নামের জয়—ঘোষণা করিতে থাকিবেন, এই আপনাদের বিশেষ কর্তব্য হইবে। এজন্য আপনারা প্রস্তুত আছেন?

পবিত্র ভক্তি-বিজড়িত দ্বাদশ কণ্ঠ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল—"হাঁ, প্রস্তুত!"

এই মহাভাগ দ্বাদশ প্রচারক, মদীনার আওছ ও খাজরাজ বংশের বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও প্রধান ব্যক্তি। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সত্যের সহায়তা ব্যপদেশে সম্মুখ সমরে শাহাদত প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আমরা ইঁহাদিগের নামের তালিকা এবনে-হেশাম হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

(১) আবু-এমামা-আছআদ বেন-জোরারা
(২) ছাআদ বেন-রবি'
(৩) আবদুল্লাহ বেন রওয়াহা
(৪) রাফে' বেন মালেক
(৫) বারা বেন মা'রুর
(৬) আবদুল্লাহ বেন-আমর
(৭) ওবাদা বেন ছামেত
(৮) ছাআদ বেন ওবাদা
(৯) মোনজের বেন-আমর

ইঁহারা সকলেই খাজরাজীয়।

(১০) ওছায়েদ বেন-হোজায়র
(১১) ছা'আদ বেন-খয়ছামা
(১২) আবুল-হায়ছাম বেন তাইয়াহান

ইঁহারা আওছ বংশীয়।

---

* হযরত নির্বাচন করেন নাই, মদীনাবাসিগণ নিজেরাই ইহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন। দেখুন—এবনে-হেশাম ১—১৫৭।

## শয়তানের চীৎকার

হযরতের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য—বিশেষতঃ এই হজ্জ মৌসুমে মক্কাবাসীদিগের চর বিশেষভাবে লাগিয়াই ছিল। ইহাদিগের মধ্যকার একটা 'শয়তান' ঘুরিতে ঘুরিতে এইদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হযরতের নিকট এত লোক সমাগম দর্শনে ভীত হইয়া দূর হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মক্কাবাসিগণ! তোমরা ঘুমাইতেছ, আর এদিকে হতভাগাটা তাহার নাস্তিক দলকে লইয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র পাকাইতেছে।" এই চীৎকার শুনিয়া হযরত ভক্তগণকে বলিলেন—এ শয়তানটাকে চীৎকার করিতে দাও, উহারা আমাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না। এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান কর।

মদীনাবাসিগণ সকলেই নিরস্ত্র অবস্থায় আকাবায় সমবেত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র আব্বাছ-বেন-ওবাদার সঙ্গে একখানা তরবারি ছিল।* তিনি সম্ভবতঃ এই চীৎকার শুনিয়া—একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—মহাত্মন! অনুমতি দিন, আমরা কালই মিনাতে উহাদের তরবারি হস্তে ইহাদিগকে আক্রমণ করি। হযরত বলিলেন—না, আল্লাহ্ আমাদিগকে ইহার আদেশ প্রদান করেন নাই। এখন স্বস্থানে প্রস্থান কর।**

রজনীর শেষ যাম অতিবাহিত প্রায়, এই সময় মদীনাবাসিগণ নিজেদের কাফেলায় গমন করিলেন। হযরতও নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

## কোরেশের চৈতন্য

প্রত্যুষে উঠিয়াই মদীনার কাফেলা স্বদেশ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়াছে, কাফেলা রওয়ানা হয় হয়, এমন সময় কোরেশের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি কতকগুলি লোকজন সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল—এ-কি কথা শুনিতেছি! তোমাদের সহিত আমাদের কোন বিবাদ নাই বিসম্বাদ নাই, অথচ শুনিলাম, তোমরা আমাদের এই লোকটিকে স্বদেশে লইয়া গিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করার সঙ্কল্প করিয়াছ?

মুছলমানগণ নিজেদের কাজে ব্যস্ত হইয়া রহিলেন, ইহাদের কথার কোন উত্তর দিলেন না। অন্য লোকেরা রাত্রির কথাবার্ত্তা কিছুই জানিত না। তাহারা সমস্বরে এ সকল কথা অস্বীকার করিল। এই কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল এবং কোরেশ দলপতিগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তথা হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু এদিকে—মক্কায় তখন উহা লইয়া খুব জল্পনা চলিতেছিল। তাহারা ফিরিয়া আসিবার পর পরামর্শ হইল, কাফেলাস্থ মুছলমানদিগকে গ্রেফতার করিতে হইবে। পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটিল। কিন্তু তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাহির হইতে হইতে মদীনার কাফেলা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিল।

---

* তাবকাত ১—১৫০ সংস্করণে ইহার নাম আব্বাছ-বেন-ওবাদা।

** ইতিহাসের কোন কোন গ্রন্থে এই গল্পটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা একই শ্রেণীর ইতিহাসে উহাও দেখিতে পাইতেছি যে, شبه صوت الشيطان بصوت منبه بن حجاج الخ শয়তানের কণ্ঠস্বর মোনাব্বেহ-বেন-হাজ্জাজের কণ্ঠস্বরের অনুরূপ হইয়া গিয়াছিল। (হেলবী—হালবী ২—১৮)। এই মোনাব্বেহ ছিরৎ-রচকদের ভাষায় অন্যদের সহিত মিলিয়া হযরতকে হত্যা করার জন্য সমস্ত রাত্রি হযরতের গৃহ অবরোধ করিয়াছিল। (জাদুল-মাআদ প্রভৃতি দেখুন)। মক্কাবাসীদের রাত্রে লোকটি মক্কায় ছিল, অতএব স্বাভাবিকভাবে এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, লোকটা মোনাব্বেহই এমন চীৎকার করিয়াছিল। কিন্তু মোনাব্বেহের ন্যায় অবিকল তাহার কণ্ঠস্বর হইলেও প্রকৃতপক্ষে সে মোনাব্বেহ নহে—শয়তান, এ কথা বলার কোন শাস্ত্রীয় বা দার্শনিক প্রমাণ তাহার অপর হইতে পাওয়া যায় না। ইহাতে যে সকল আজগুবী ও অসংলগ্ন কথা আছে, উহা পাঠ করিলে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এমন কি স্বয়ং হলবীও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

কেবল ছা'আদ বেন-ওবাদা ও মোনজের-বেন-আমর নামক দুই ব্যক্তি কোন কার্যোপলক্ষে পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহারা এই দুইজনকে গেরেফতার করিল। মোনজের কোন গতিকে ইহাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ছা'আদকে তাহারা গেরেফতার করিয়া মক্কায় আনয়ন করিল।

### ছা'আদের প্রতি অত্যাচার

মক্কাবাসীদিগের সমস্ত ক্রোধ তখন ছা'আদের উপর পতিত হইল। তাহারা তাঁহাকে পিঠমোড়া দিয়া বাঁধিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল, যে আসে সে-ই প্রহার করে। জোবের ও হারেছ নামক দুইজন মক্কাবাসীর সহিত ছা'আদের ব্যক্তিগত সন্ধি ছিল। ইহারা যখন বাণিজ্য উপলক্ষে মদীনায় গমন করিত, তখন ছা'আদ তাহাদিগকে অত্যাচার-উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতেন। তাহারা ছা'আদের দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইল, এবং দুর্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে স্বদেশে প্রস্থান করিতে বলিল। ছা'আদ অবিলম্বে মক্কা ত্যাগ করিলেন।

এদিকে ছা'আদের বিলম্ব দেখিয়া মদীনাবাসিগণ তাঁহার বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হইলেন। অল্পক্ষণ পরে—সম্ভবতঃ মোনজেরের মুখে সংবাদ শুনিয়া—তাঁহারা ছা'আদকে উদ্ধার করিবার জন্য সদলবলে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময় দেখা গেল, ছা'আদ আসিতেছেন। কাফেলা মদীনায় চলিয়া গেল।*

## একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

### মদীনায় কৃতকার্যতা,—কারণ কি ?

### মদীনার অধিবাসী

মদীনার অধিবাসীদিগের মধ্যে ইহুদিগণ শিক্ষার হিসাবে স্থানীয় পৌত্তলিক জাতিদিগের অপেক্ষা বহুলাংশে উন্নত ছিল। ইহুদী জাতি স্বভাবিকভাবে শঠ ও কুসীদজীবী। এই শঠ 'মহাজন'-দিগের অত্যাচারে মদীনাবাসী বহু দিন হইতে জর্জরিত হইয়া আসিতেছিল।

মদীনায় আওছ ও খাজরাজ নামক দুইটি পৌত্তলিক জাতির বাস ছিল। আওছ ও খাজরাজ দুই সহোদর ভ্রাতা, হারেছের পুত্র। এই দুই ভ্রাতার সন্তানগণ কালক্রমে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং জ্ঞাতির কলহ-বিবাদ তাহাদের মধ্যে বেশ পাকাইয়া উঠে। আরবের কলহ অধিক দিন পর্যন্ত কেবল কথায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না, কাজেই উভয় দিক হইতে নরহত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হইল। বহু পুরুষ ধরিয়া তাহারা এই গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ইহুদিগণ, আজকালকার দূরদর্শী-ধূর্ত রাজনীতিকদিগের ন্যায় এই আগুনে সর্বদাই ইন্ধন যোগাইত, তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলার চেষ্টা করিত। হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ হজরতের ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, আওছ ও খাজরাজের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে প্রথমে খাজরাজীয়গণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আওছের প্রধান সেনাপতি হোজেরের চেষ্টায় তাহাদিগকে পরাজিত হইতে হয়। ইতিহাসে ইহা 'বোআছ' সমর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।**

---

* এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত সমস্ত বিবরণ, এবনে-হেশাম, তাবকাত, তাবরী, জাদুল-মাআদ, খামিছ, মোস্তাদরাক, হালবী ও জরকানী প্রভৃতি হইতে গৃহীত। বিভিন্ন ইতিহাসে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে আমরা এখানে একত্র সঙ্কলন করিয়া দিয়াছি।

** বোখারী ও ফৎহুলবারী ১৫—৪০৫ ; এছাবা, উছদ-গাবা, জরকানী, হলবী।

## সফলতার কারণ কি ?

মক্কায় এছলাম প্রচারে এত বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইল, অথচ মদীনার সমধর্মী পৌত্তলিকগণের মধ্যে এছলাম 'এত সহজে' প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিল—ইহার কারণ কি ? ইউরোপীয় লেখকগণের পক্ষে ইহা খুব কষ্টদায়ক ব্যাপার। তীর নাই তরবারি নাই, বর্শা নাই বল্লম নাই, হযরত নিজেও মদীনায় গমন করিলেন না, অথচ মাত্র দুই বৎসরের চেষ্টায় সেখানে শত শত নর-নারী এছলামে দীক্ষিত হইয়া যাইতেছেন, এ দৃশ্য তাঁহাদিগের পক্ষে একেবারেই অসহ্য, বিষম যন্ত্রণাদায়ক। তাই তাঁহারা নিজেদের অতুল-সংঘটন-পরিয়াসী প্রতিভার উপর নানা প্রকার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক চাপ দিয়া, ইহাতে কোন রকমের একটু 'কু' বাহির করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

## খৃষ্টান লেখকগণের অভিমত

তাঁহারা বলিতেছেন ঃ

(১) মক্কার সমাজ একটা Healthy community (সুস্থ সমাজ) ছিল বলিয়া সেখানে এছলাম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু মদীনাবাসীরা আত্মকলহে ও গৃহযুদ্ধে একেবারে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সেখানে এছলাম সহজে প্রসারলাভ করিতে পারিয়াছিল।

(২) বোআছ যুদ্ধে ইহুদিগণ আওছের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। আওছের জয় হইলে মদীনার পৌত্তলিকগণ বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, ইহুদীদিগের ঈশ্বর বা দেবতা আল্লাহ—তাহাদের দেব-দেবীগণের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। তাই একেশ্বরবাদ বা আল্লাহর নামে প্রচারিত এছলাম ধর্ম, মদীনায় সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল।

(৩) আওছ কর্তৃক পরাজিত হওয়ার পর খাজরাজীগণ নিজেদের অপমানের প্রতিকারের জন্য, স্বাভাবিকভাবে নূতন সহায় অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই জন্য মুছলমানদিগকে নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লওয়ার অভিপ্রায়ে, তাহারা এছলাম গ্রহণ করে।

(৪) ভবিষ্যতে একজন নবী আসিবেন এবং তিনি আল্লাহর সাহায্যে সর্বত্র জয়যুক্ত হইবেন, মদীনাবাসিগণ ইহুদীদিগের মুখে সর্বদাই একথা শুনিতে পাইত। মোহাম্মদ সেইরূপ দাবী করায় তাহারা সহজে বিশ্বাস করিয়া লইল যে, ইনিই সেই নবী, ইঁহার সঙ্গে যোগ দিলে আমরাও জয়যুক্ত হইতে পারিব।

## প্রথম দফার প্রতিবাদ

এই সিদ্ধান্তগুলি একেবারে অসমীচীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, মক্কাবাসীদিগের সামাজিক জীবনের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে, কখনই তাহাকে মদীনাবাসীদিগের সামাজিক জীবন অপেক্ষা উন্নত বলিয়া নির্ধারণ করা যায় না। মার্গোলিয়াস সাহেব অন্যত্র* অবশ্য অন্য মতলবে ইহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক হিসাবে মক্কাবাসীরা বরং মদীনীয় সমাজের অপেক্ষা অধিকতর পতিত হইয়াছিল। আত্মকলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহারা অধিকতর জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। ফেজারের সমরের পর তাহাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক শক্তিও একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত লেখকগণ নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মদীনাবাসীদিগের তুলনায় তাহাদিগকে 'সুস্থ সমাজ' বলিয়া নির্ধারণ করাই ভুল। পক্ষান্তরে, যে সমাজ যত অধঃপতিত, সংস্কার গ্রহণ করিবার শক্তিও তাহার তত কম, অথবা এই শক্তির অভাবের নামই পতন। বিবেকের জড়তা হেতু নূতন মাত্রই তাহাদিগের নিকট ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—প্রকৃতপক্ষে তাহা যতই ভাল হউক না কেন ?

---

* ২০৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

## দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের অসমীচীনতা

বোআছ যুদ্ধে ইহুদিগণ আওছ বংশীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল এবং তাহারা জয়যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া, ইহুদীদিগের উপাস্য আল্লাহর প্রতি মদীনাবাসীর খুব ভক্তি হইয়া দাড়াইয়াছিল, এবং সেইজন্য তাহারা আল্লাহর নামে প্রচারিত এছলাম ধর্মের প্রতি সহজেই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—এরূপ কথা বলা বাতুলতা মাত্র। আমরা দেখিয়াছি, হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে মদীনার কোন সমাজের কোন একজন লোকও ইহুদীধর্ম গ্রহণ করে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারা ইহুদীদিগের যেহোবার শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াও একজনও তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিল না, কিন্তু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে ইহুদী ধর্মের সহিত এছলামের সমতা আছে দেখিয়াই, তিন বৎসর অপেক্ষার পর, দলে দলে এছলাম গ্রহণ করিতে লাগিল! অথচ এছলাম যে, প্রচলিত ইহুদী ধর্মের বহু সংস্কার ও বিশ্বাসের কঠোর প্রতিবাদ করে, তাহাও তাহারা সম্যকভাবে অবগত ছিল। কোরআনের যে অংশ মোছআবের মারফতে মদীনায় প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারও বহু স্থানে তাহারা ইহুদী জাতির বহু দুষ্কৃতির ও নানা প্রকার অন্ধ বিশ্বাসের কঠোরতর প্রতিবাদ দেখিতে পাইত। বোআছ যুদ্ধের ফলাফলের দ্বারা মদীনাবাসীর ধর্মমতের কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই, হইলে তাহারা দলেবলে ইহুদী ধর্মই গ্রহণ করিত। পক্ষান্তরে যেহোবা উপাসকগণের মত খণ্ডনকারী এছলামের বিরুদ্ধাচরণ করাই তাহারা কর্তব্য বলিয়া মনে করিত।

## তৃতীয় যুক্তির খণ্ডন

সামরিক হিসাবে, তখন মুষ্টিমেয় মুছলমানদিগের দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য পাওয়ার আশা কোনরূপেই কাহারও মনে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। যে মুষ্টিমেয় মুছলমান স্বদেশে আপনাদিগের সম্মান-সম্পত্তি ও স্বাধীনতা—এমন কি জীবন পর্যন্ত—রক্ষা করিতে না পারিয়া, লোহিত সাগর অতিক্রম করতঃ দূর আবিসিনিয়া দেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল—দীর্ঘকাল পর্যন্ত যাহাদিগকে কঠোর 'অন্তরীণে' অবস্থান করিতে হইয়াছিল—আপনাদিগের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম মোহাম্মদ মোস্তফার উপর দৈহিক অত্যাচার হইতে দেখিয়াও যাহারা তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইত না,—মক্কায় যাহাদিগের সংখ্যা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিলাইয়া এক শত হইবে কি না সন্দেহ, বর্তমান অবস্থায় সামরিক হিসাবে, তাহাদিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার কোন আশাই মদীনাবাসীর ছিল না—থাকিতে পারে না। বরং বায়আৎ কালীন আলোচনাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজেই জানা যায় যে, মদীনাবাসিগণ নিজেরা মুছলমান হওয়ায় এবং মুছলমানদিগকে মদীনায় আশ্রয় দেওয়ার সঙ্কল্প করায়, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকেও যে ঘোর বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা তাহারা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, মুছলমানদিগকে স্বদেশে আশ্রয় দিলে, আরবের সমস্ত জাতি তাহাদিগের প্রতি আপতিত হইবে, শ্বেত-কৃষ্ণ-পীত-লোহিত সকল জাতির সহিত তাহাদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া যাইবে। বায়আৎকালে বিভিন্ন বক্তা—স্পষ্টাক্ষরে এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় দফার উত্তরে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জেতা ও বিজিত উভয় গোত্রই একই সময়ে সমান আগ্রহের সহিত এছলাম গ্রহণ করিতেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবার বায়আতে আওছ ও খাজরাজ উভয় গোত্রের লোকেরা মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। এখানে হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে,—সম্ভবতঃ উভয় গোত্রের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এক নূতন একতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ইহুদীদিগের বিপক্ষে উত্থান করার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাই যদি সত্য হয়, তবে ইহুদীদিগের ঈশ্বরের মহিমা দর্শনে মদীনাবাসিগণ তাঁহার অনুগত হইয়া

পড়িয়াছিল, এই কথাটা একেবারে মাঠে মারা যায়। পক্ষান্তরে ইহা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক ও যুক্তিহীন কল্পনা মাত্র। হিজরতের অব্যবহিত পরে, হযরত সর্বপ্রথমে মদীনায় যে আন্তর্জাতিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহুদিগণের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল তাহাদিগের কোন প্রকার স্বত্বাধিকারের বিন্দুমাত্রও খর্ব করা হয় নাই।

## চতুর্থ দফার আলোচনা

চতুর্থ দফার বর্ণনা আংশিকভাবে সত্য হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু লেখকগণ ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। অধিকন্তু মদীনাবাসিগণ ইহুদীদিগের মুখে যে ভাবী নবীর আগমন সংবাদ শ্রুত হইয়াছিল, তাঁহার আগমনবার্তা অবগত হইয়া, তাহারা সেই ইহুদীদিগের নিকট হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার তদন্ত না করিয়াই, কেবল সেই সম্পূর্ণ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া—নিজেদের পৈতৃক ধর্ম হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া বসিল, ইহা একেবারে অস্বাভাবিক কথা। ইহুদীদিগের অন্য কোন কথা তাহারা বিশ্বাস করিত না। বহুকাল পর্যন্ত ইহুদীদিগের অধীনতায় থাকিয়াও, তাহারা আপনাদিগের ধর্ম ত্যাগ করিল না—অথবা তাহারা আগন্তুক নবী-সংক্রান্ত ইহুদীদিগের কথাটা হঠাৎ একেবারে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইল, এবং সেই নবীর সঙ্গে যোগদান করিলে তাহারা যে অন্য সকল জাতির উপর বিজয়লাভ করিতে পারিবে, মুহূর্তের মধ্যে এ বিশ্বাসও তাহাদিগের সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া পড়িল, পাগলেও এ কথা বিশ্বাস করিতে পারে না।

## খ্রীষ্টানের ক্ষোভ

বলা বাহুল্য যে, মদীনায় এছলামের এই 'আশাতীত' সফলতা দর্শনে আমাদিগের পরম বন্ধু খ্রীষ্টান লেখকগণ যৎপরোনাস্তি মর্মাহত হইয়াছেন। মুর সাহেব একস্থানে বিলাপ করিয়া বলিতেছেন, "আর তিনটা বৎসর যদি মোহাম্মদ এইরূপ অকৃতকার্য হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলেই সঙ্গে সঙ্গে এছলামের প্রদীপ নিবিয়া যাইত।"

## এ প্রদীপ নিবিবে না

এ-সম্বন্ধে কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে ঃ মরিয়ম তনয় ঈছা যখন বলিলেন—"হে ইছরাইল বংশীয়গণ, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছি,—আমার সম্মুখে তৌরাতের যাহা আছে—আমি তাহার সত্যতা ঘোষণা করিতেছি এবং আমার পরে 'আহমদ' নামে যে রছুল আসিবেন, আমি তাঁহার আগমনের সুসংবাদ দান করিতেছি। কিন্তু যখন (সেই আহমদ) স্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণসহ তাহাদিগের নিকট আগমন করিলেন, তখন তাহারা বলিল—এগুলি ত স্পষ্ট যাদু। অপিচ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অত্যাচারী কে ?—যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া থাকে অথচ তাহাকে এছলামের দিকে আহ্বান করা হইতেছে ! আর আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে হেদায়াত করেন না। তাহারা (সেই অত্যাচারিগণ) সঙ্কল্প করে যে, আল্লাহর জ্যোতিকে মুখের ফুৎকার দিয়া নিবাইয়া দিবে, কিন্তু আল্লাহ্ নিজের জ্যোতিকে পূর্ণ পরিণত করিবেনই—যদিও ঈশ্বরদ্রোহীদিগের নিকট ইহা প্রীতিকর না হয়। তিনি সেই (আল্লাহ্), যিনি আপন রছুল (আহমদ)-কে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যেহেতু তাহাকে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিবেন, যদিও অংশীবাদীদিগের নিকট ইহা অপ্রীতিকর হয়।*

## সংশয় ভঞ্জন

ফলতঃ খ্রীষ্টান লেখকগণের পক্ষে অপ্রীতিকর হইলেও, সত্য নিজেই নিজের স্থান খুঁজিয়া লইল, এবং কয়েকজন মুছলমানের কোরআন প্রচারের ফলে, এছলামের আত্মাপ্রত্যয় শিক্ষা ও

---

* ছুরা ছফ।

সদগুণরাশির মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া মদীনাবাসিগণ দলে দলে মোস্তফা চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মক্কাবাসিগণ এছলাম গ্রহণ না করিয়া তাঁহার শিক্ষা মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট না হইয়া, বরং তাহারা সত্যের প্রসার পথকে কণ্টকিত করিয়াছিল, অথচ সেই শিক্ষাই আবার মদীনায় বেশ সুফলপ্রসূ হইয়া দাঁড়াইল; এই প্রকার সংশয় উপস্থিত করা অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। স্থান, কাল ও পাত্রের প্রভেদে, দ্রব্য-গুণের বাহ্য ফলাফলেরও পার্থক্য হইয়া থাকে, অথচ দ্রব্য ও তাহার গুণ অভিন্ন। আমাদিগের কোন কোন লেখক এক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র মতে ইহা প্রশ্নেরই জটিল বিশ্লেষণ মাত্র—উত্তর নহে। কারণ এখানে প্রশ্ন হইতেছে—সে পার্থক্যের স্বরূপ নির্ণয় লইয়া। অতএব এই যুক্তি সংশয়ের পেঁচাল শব্দান্তর মাত্র।

### প্রথম কারণ

### মক্কা ও মদীনার প্রাকৃতিক তারতম্য

এই প্রশ্নের উত্তর খুব সরল ও সহজ। উভয় স্থানের প্রাকৃতিক পার্থক্যের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন; একদিকে ধূ ধূ প্রজ্বলিত উত্তপ্ত বালুকাস্তূপ, প্রস্তরকঙ্কর পরিপূর্ণ বন্ধুর উপত্যকা-অধিত্যকা, জলহীন-ছায়াহীন-তরুহীন মরুভূমি, অনল-প্রবাহবৎ জ্বালাময় মারুত-হিল্লোল;—অন্যদিকে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা কানন-কুন্তলা, বসন্ত-মলয়-পুলকিতা বিহগ-কূজন-মুখরিতা ইয়াছরাব। এই প্রাকৃতিক বৈপরীত্য উভয় স্থানের জড় ও জীবকে পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যে ও পৃথক পৃথক উপাদানে গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহারই ফলে এক জাতির হৃদয় অতি কঠোর, তাহার প্রকৃতি অতি উগ্র এবং তাহার বিবেক অতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আবার অন্য দেশবাসীরা স্বাভাবিকভাবে হৃদয়বান, দূরদর্শী, চিন্তাশীল, ধীর প্রকৃতি ও ধীমান হইয়া থাকে। এই হিসাবে মক্কা ও মদীনার প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য মনে রাখিয়া উভয় স্থানে এছলামের সফলতার 'তারতম্য' আলোচনা করিলে, আমরা সহজেই তাহার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

### দ্বিতীয় কারণ

### স্বদেশবাসীর অভিমান

'কোন ভাববাদীই তাঁহার স্বদেশে পূজিত হন নাই'—কথাটি খুব সত্য। মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, যাহাদিগের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া শৈশব হইতে কৈশোরে ও কৈশোর হইতে যৌবনে উপনীত হয়, সে দেশের লোকেরা হঠাৎ তাহাকে কোন বড় কথা বা মহৎ ভাব প্রকাশ করিতে শুনিলে—মানবীয় প্রকৃতির সাধারণ দুর্বলতাহেতু, অভিমান, অহঙ্কার, হিংসা ও ঘৃণার ভাব তাহাদের মনে জাগিয়া উঠে, এবং পক্ষান্তরে হইতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সামান্য একটু চেষ্টা হইলেই তাহাদের এই ক্ষুব্ধ অভিমান ভীষণ ক্রোধে পরিণত হয়। হিংসা ও ক্রোধ মানুষের মন ও মস্তিষ্ক—জ্ঞান ও বিবেককে কঠোর লৌহমুষ্টিতে এমনই ভাবে চাপিয়া ধরে যে, সে অবস্থায় সত্যাসত্য ও ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার শক্তিই তাহার থাকে না। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সমাজে, প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক পল্লীতে, এইরূপ হিংসা-বিদ্বেষের, এই অহঙ্কার ও অভিমানের বহু উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতএব মক্কাবাসীদিগের মধ্যে 'অকৃতকার্যতার' ইহাও একটা প্রধান কারণ। মদীনায় এই বাধা ছিল না, সেই জন্য সেখানকার লোকেরা স্থির হইয়া হযরতের কথাগুলি শুনিবার ও ধীরভাবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাই এছলামের সার্বজনিক সৌন্দর্য দর্শনে তাহারা শীঘ্রই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু মক্কাবাসিগণ তাহা শুনে নাই, শুনিতেও দেয় নাই। তখন তাহারা ক্রোধে আত্মহারা, ঈর্ষায় জর্জরিত। কাজেই এছলামের সৌন্দর্য্য চিন্তা করিয়া দেখিবার সুযোগ তাহারা পায় নাই।

তাহাদিগের জ্ঞান-বিবেক ও মনুষ্যত্ব তখন 'ক্রোধ চণ্ডালে'র পদতলে নির্মমভাবে দলিত ও মথিত হইতেছিল। যাঁহাদিগের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় নাই, যাঁহারা হযরতের বক্তব্যগুলি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এছলামের সত্যতা ও মাহাত্ম্য সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৃঢ়তার সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

## তৃতীয় কারণ

### সত্যের প্রধান বৈরী পুরোহিত সমাজ

সত্য ও জ্ঞানের কোন সেবকই নির্বিঘ্নে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। সত্যের সেবা ও জ্ঞানের প্রচার করিয়া মহাপুরুষগণ যখনই মানবজাতির কল্যাণ সাধনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখনই বিশ্বসংসার তাঁহাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই জনসাধারণকে ক্ষেপাইয়া মাতাইয়া তুলে কাহারা ? সকল যুগের সকল দেশের সকল জাতির সমগ্র ইতিহাস সমস্বরে উত্তর দিতেছে—"পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায়।" মানুষের জ্ঞান-বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ মানব জাতিকে নিজেদের দাস করিয়া রাখিবার জন্য ইহারা সদাই আগ্রহান্বিত। তাই কোরআন ইহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে—"ইহারা আল্লাহ্কে ত্যাগ করিয়া নিজেদের পীর-ফকির এবং যাজক-পুরোহিতদিগকে খোদা বানাইয়া লইয়াছে—।" ফলতঃ এছলাম সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছিল। কোরেশ সমস্ত আরবের প্রধানতম পুরোহিত জাতি। আরবের সর্বপ্রধান দেবমন্দিরের যাজক তাহারাই, শ্রেষ্ঠতম তীর্থক্ষেত্রের সেবায়েত তাহারাই। ইহারই ফলে আরবময় তাহাদের প্রসার-প্রতিপত্তি, সকলের নিকট তাহাদের সম্ভ্রম-সম্মান। তাহারা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল যে, এছলাম জয়যুক্ত হইলে তাহাদিগের কৌলিন্যের সমস্ত অহঙ্কার ও পৌরোহিত্যের সকল অধিকার চিরকালের মত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাদিগের সমস্ত বিশেষত্ব ও সকল প্রভুত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং এই 'কুলীন' যাজক এবং সেবায়েত-পুরোহিত কোরেশ যে এছলামের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, যথাসাধ্য তাহাতে বিঘ্নোৎপাদনের চেষ্টা করিবে, ইহা একান্ত স্বাভাবিক কথা। আবহমানকাল হইতে যাহা হইয়া আসিয়াছে, এছলাম সম্বন্ধেও তাহাই হইল ;—কোরেশগণ এই জন্যই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিল। মদীনায় এইরূপ কোন পুরোহিত বা যাজক জাতি ছিল না, কোন বড় দেবমন্দির ছিল না, কোন তীর্থস্থান ছিল না। কাজেই মদীনার পৌত্তলিকগণ কোরেশদিগের ন্যায় এছলামের নাম শুনিয়াই অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে নাই।

এই বিরুদ্ধাচরণে, সংস্কার ও ধর্মভাবের অন্তরালে, কোরেশ প্রধানদিগের নীচ স্বার্থও অতি প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত ছিল। তাহাদিগের সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সম্মান এবং সমস্ত প্রাধান্যের মূলই ছিল এই ঠাকুর-দেবতাগণ। ইহাদের অভিশাপ ও আশীর্বাদের ব্যবসায় চালাইয়াই কোরেশ আরবের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল। এছলাম বলিতেছে—'ঐগুলিকে দূর করিয়া দাও, উহা প্রস্তরখণ্ড মাত্র।' কোরেশ দলপতিগণ মনে করিল—এছলাম আমাদিগের সর্বনাশ করার চেষ্টা করিতেছে। তাই তাহারা প্রাণপণ করিয়া তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিল—মক্কায় প্রকাশ্যভাবে এছলাম প্রচার, এমন কি—কোরআন পাঠ পর্যন্ত অসম্ভব করিয়া তুলিল। নানা প্রকার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া, মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া সত্যকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিল। নিজেদের নীচ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যাহারা—বিশেষতঃ যে সকল পীর ফকির ও যাজক-পুরোহিত—সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দণ্ডায়মান হয়, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করা অসম্ভব। তাই মক্কায় এছলামের তত দ্রুত সাফল্য হইতে পারে নাই।

# দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

## বায়আৎ—প্রকৃত তথ্য

## অর্থ ও ব্যাখ্যা

'বায়আৎ' শব্দের অর্থে অনেক স্থানে আমরা 'প্রতিজ্ঞা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু ইহা বায়আতের ভাবের ব্যাপক অর্থ নহে, প্রতিজ্ঞা বায়আতের একটা উপকরণ মাত্র। আরবী 'বায়ওন' শব্দের অর্থ বিক্রয় বা ক্রয় বিক্রয় করা। কোরআনে 'বায়আৎ' স্থলে মোবায়েআৎ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, ইহার অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা। কোন একটি পদার্থের বিনিময়ে নিজের কোন একটি পদার্থকে ক্রেতার হস্তে সমর্পণের—সম্পূর্ণ আদান-প্রদানের—নাম বায় বা মোবায়েআৎ। এছলামে যে বায়আতের প্রথা প্রচলিত আছে, তাহারও অর্থ এইরূপ। মুছলমান যখন বায়আৎ করে, তখন একজন ক্রেতার অস্তিত্ব তাহার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। সে সেই ক্রেতার নিকট হইতে নিজের দরকারী কোন একটা পদার্থ গ্রহণ করিয়া তৎবিনিময়ে নিজের কোন একটা পদার্থ ক্রেতার হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ক্রয়-বিক্রয়ের কথা পাকা হইয়া যাওয়ার পর, ক্রেতার নিকট হইতে প্রাপ্ত পদার্থটির প্রতি যেমন বিক্রেতার দাবী ও অধিকার জন্মে, ঠিক সেইরূপ তাহার হস্তে সমর্পিত পদার্থটির প্রতি বিক্রেতার কোন স্বত্ব, অধিকার বা দাবী-দাওয়া থাকে না, থাকিতে পারে না। নচেৎ আদান-প্রদান না হওয়ায় বা একপক্ষ গ্রহণের পরিবর্তে সমর্পণে অস্বীকৃত হওয়ায়, এই বায় সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। আমি বায়আৎ করি কাহার সহিত? ছাহাবাগণ হযরতের হাত ধরিয়া বায়আৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের এই বায়আৎ বা ক্রয়-বিক্রয় হযরতের সঙ্গে হয় নাই। আল্লাহ্ বলিতেছেন—

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث

فانما ينكث على نفسه - ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما - (فتح)

"যাহারা তোমার সহিত বায়আৎ করিতেছে, তাহারা (তোমার সহিত নহে, বরং) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সহিত বায়আৎ করিতেছে (প্রকৃতপক্ষে) তাহাদের হাতের উপর আল্লাহরই হাত আছে। অতঃপর যে ব্যক্তি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে, তাহার কুফল সে-ই ভোগ করিবে। এবং আল্লাহর সহিত তাহার যে (আদান-প্রদানের) প্রতিজ্ঞা হইল—যে ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে শীঘ্রই তাহার মহান পুরস্কার দান করিবেন।" (ফাৎহ, ২৬—৯)

এই আয়তে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, যাহার হাত ধরিয়া বায়আৎ কর না কেন—প্রকৃতপক্ষে সে বায়আৎ হয় আল্লাহর সহিত। এখন আমরা বুঝিলাম, মুছলমানের বায়আৎ বা আধ্যাত্মিক ক্রয়-বিক্রয়ের একপক্ষ হইতেছেন—স্বয়ং আল্লাহ, আর অন্য পক্ষ তাঁহার মুছলমান বান্দাহ। ইহা জানিবার পর, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এই বায়আতে—ক্রয়-বিক্রয়ে—উভয়পক্ষ কোন কোন পদার্থের আদান-প্রদান করিবেন? এই বাণিজ্য-ব্যাপারের কথা কোরআনে কয়েক স্থানে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ বলিতেছেন :

"হে মোমেনগণ, আমি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলিয়া দিব?—যাহা তোমাদিগকে ক্লেশজনক আজাব হইতে মুক্তি প্রদান করিবে? (বলিতেছি, অনুধাবন কর।—'তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাঁহার রছুলের প্রতিও (ঈমান আনিবে) এবং তাঁহার সন্তোষ লাভের জন্য নিজেদের ধন-প্রাণ লুটাইয়া দিয়া জেহাদ করিতে থাকিবে, ইহাই তোমাদিগের পক্ষে কল্যাণপ্রদ—যদি তোমরা জ্ঞানী হও (তবে এই শিক্ষার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে)।"

এই প্রশস্তিক্ হইতেছে বিক্রেতা মুছলমান বান্দাহর বিক্রেয় পণ্য। সে আপনার ধন-প্রাণ সমস্তই আল্লাহর হাতে সমর্পণ করিবে। বিনিময়ে তাহার প্রাপ্য কি হইবে, কোরআন নিজেই তাহার উত্তর দিতেছে—

"আল্লাহ তোমাদিগের পাপপুঞ্জ ক্ষমা করিবেন, এবং তোমাদিগকে এমন কাননে প্রবিষ্ট করাইবেন, যাহার তলদেশ দিয়া বহু নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছে, এবং আদন কাননে পবিত্র সৌধসমূহ (তোমরা পাইবে)। ইহা অতীব সাফল্য।"

"হাঁ, আর একটি (জিনিস আছে), যাহাকে তোমরা অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাক—আল্লাহর নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তি ও ত্বরিত বিজয়লাভ (ইহাও তোমরা পাইবে)। সমস্ত বিশ্বাসীকে এই সুসংবাদ পৌছাইয়া দাও।" (ছফ, ১০—১৩)

এই বয়আৎ বা ক্রয় বিক্রয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হইয়াছে:

"আল্লাহ মোমেনদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের প্রাণ ও ধন সমস্তই (এই প্রতিদানের বিনিময়ে) ক্রয় করিয়া লইলেন যে—পরিবর্তে তাহারা বেহেশত পাইবে। তাহারা এই (বয়আতের) জন্য আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিবে এবং (উহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ) তাহারা অন্যকে মারিবে ও নিজেরাও নিহত হইবে, ইহা তাহার (আল্লাহর) ন্যায়সঙ্গত ওয়াদা। এই ওয়াদা তৌরাৎ, ইঞ্জিল ও কোরআন (সমস্ত গ্রন্থেই) বিদ্যমান রহিয়াছে। (আর ভাবিয়া দেখ) আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিক স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারে ? অতএব (হে বয়আৎকারী মুছলমানগণ !) তোমরা আল্লাহর সহিত যে ক্রয়-বিক্রয় করিলে, তজ্জন্য আনন্দিত হও, এবং জানিয়া রাখ যে, ইহাই (তোমার মোছলেম জীবনের) চরম সফলতা।" (তাওবা, ১১১)

## বর্তমান যুগের অনর্থক বায়আৎ

কোরআনের এই কয়টি আয়ৎ দ্বারা বায়আতের প্রকৃত স্বরূপ, তাহার যথার্থ সাধনা ও চরম লক্ষ্যের বিষয় আমরা সম্যকরূপে অবগত হইলাম। এখন বিজ্ঞ পাঠকগণ হযরতের ও তাঁহার ছাহাবাগণের বায়আতের সহিত আমাদিগের আজিকালিকার বায়আতের তুলনা করিয়া দেখুন, তাহা মোস্তফার মহান আদর্শ হইতে কতদূর নামিয়া পড়িয়াছে ! মুছলমান সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত আধুনিক বায়আতের ধারা—এখন বহুস্থলে সম্পূর্ণ অনৈছলামিক পথে পরিচালিত হইয়াছে। এখনকার বায়আৎ, অনেক স্থলে গুরু-সাধনা ও পুরোহিত-পূজায় পরিণত হইয়াছে। সাধারণ সমাজের বিশ্বাস, একজন পুরোহিত বা পীরের খাতায় নাম না লেখাইলে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। অধিকন্তু পীরের হাতে হাত দিয়া কতকগুলি অজ্ঞাত-অর্থ শব্দসমষ্টির আবৃত্তি করিলেই 'বায়আৎ' হইয়া গেল এবং বায়আতকারী নিজের সমস্ত পাপ ও অপকর্ম ধুইয়া-পুছিয়া শুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেইজন্য, হিন্দুদিগের শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদির ন্যায়, আজন্ম ধর্মসংস্রবহীন ব্যক্তির মৃত্যুশয্যার পার্শে আমরা অনেক সময় পুরোহিত-বংশোদ্ভব খোন্দকার ছাহেব বা মোল্লাজীকে দেখিতে পাই। কেহ কেহ আবার—অবশ্য বেশী দক্ষিণা পাইলে—আসন্ন-মৃত্যু মুরীদকে বেহেশতের 'পাসপোর্ট' বা ছাড়পত্রও লিখিয়া দিয়া থাকেন। এই দুই বায়আতের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, আলোক ও অন্ধকারের পার্থক্য এবং জীবন ও মরণের প্রভেদ।

## এছলাম ও তরবারি

মদীনা প্রয়াণের পূর্বে যে উপায়ে ও যে উপকরণের সহায়তায় এছলাম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাও এখানে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এই দীর্ঘ এক যুগ ধরিয়া হযরত স্বয়ং এছলাম প্রচার করিয়াছেন, এই যুগের শেষভাগে গণিত কয়েকজন মাত্র ছাহাবী নির্দিষ্টরূপে প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের প্রচারের ধারা ছিল, সর্বাগ্রে আত্মশুদ্ধি, পরে স্বসমাজের শুদ্ধিসাধন এবং অবশেষে বাহিরের লোকদিগের

সংশোধন চেষ্টা। ইহার ফলে, প্রত্যেক মুছলমান নিজেকে এছলামের উজ্জ্বল আদর্শরূপে জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিয়াছিল। আর আজকাল আমরা যেভাবে এছলাম-প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাতে সর্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি পড়ে, অন্য সমাজের প্রতি। যে সমিতি তাহার বার্ষিক কার্যতালিকায় যত অধিক নবদীক্ষিত মুছলমানের নাম সন্নিবেশিত করিতে পারে, সে সমিতি তত অধিক কৃতকার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বাহিরের লোকদিগের পর প্রচারকগণের আত্মশুদ্ধির পালা। আর প্রচার সমিতির অনুষ্ঠাতা ও অধিনায়ক যাঁহারা, আত্মশুদ্ধির কোন আবশ্যকতাই তাঁহাদিগের নাই। ফলতঃ ছাহাবারা দেখিতেন প্রথমে নিজেকে, পরে নিজদিগকে এবং তাহার পর বাহিরের লোকদিগকে। আর আমরা দেখি প্রথমে বাহিরে, পরে স্বজাতিকে এবং অবশেষে আপনাকে। দুইটি ধারার অবস্থান ও পর্যায়ের-ন্যায় তাহার স্থিতি ও পরিণতির মধ্যেও আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

## প্রচারকের স্বরূপ ও তাহাদের কর্তব্য

এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। হযরতের জীবনী পাঠ করিয়া আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হই যে, তাঁহার জীবনের অন্যতম সাধনা ছিল এছলাম প্রচার বা লোকদিগকে এছলাম ধর্মে দীক্ষিত করা। কেন ? তিনি অন্য লোকদিগকে এছলামে দীক্ষিত করিবার জন্য এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন কেন ? সত্য প্রকাশ করিয়া দিয়াই বা তিনি ক্ষান্ত হইলেন না কেন ? এজন্য এত নিগ্রহ-নির্যাতন তিনি ভোগ করিয়াছিলেন কিসের জন্য ? লোক এছলামে দীক্ষিত না হইলে, তাহাতে তাঁহার ক্ষুব্ধ বা মর্মাহত হইবারই-বা কি কারণ ছিল ? মোস্তফা-চরিতের অনুশীলনপ্রয়াসী পাঠকের পক্ষে এই প্রশ্নগুলি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

আমরাও এছলাম প্রচারে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি, এবং সেজন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে সমর্থ না হইলেও, এছলাম প্রচারের সফলতা দর্শনে আমরাও মনে মনে আনন্দলাভ করিয়া থাকি। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমাদিগের সেই আনন্দের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্বন্ধ নাই। একজন লোক মুছলমান হইল, ইহাতে আমাদের মনে যে আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহার কারণ এই যে, আমরা মনে করি, আমাদিগের প্রতিপক্ষের সমষ্টি হইতে একটি সংখ্যা কমিয়া আমাদিগের সংখ্যা বাড়াইয়া দিল। নিজেদের পার্থিব ও অনাধ্যাত্মিক স্বার্থ ও প্রতিপক্ষের ক্ষতিজনিত যে রাজসিক আনন্দ—তাহা আত্মার আনন্দ নহে, তাহাতে সাত্ত্বিকতার লেশমাত্র নাই। তাহা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের চরিতার্থ হেতু জ্ঞানের একটা অস্পষ্ট বিকার মাত্র। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা বা তাঁহার সহচরগণ অন্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া এছলাম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রচারের মূলে এই সকল পার্থিব ভাব একবিন্দুও স্থানলাভ করিতে পারে নাই। তাঁহারা দেখিতেন, মানুষ অনাচারে অবিচারে নিজের জ্ঞানকে কলুষিত করিয়া নিজ হস্তেই নিজের জন্য অনন্ত নরককুণ্ডের সৃষ্টি করিতেছে, পাপে তাপে দগ্ধ হইয়া সে এমন মূল্যবান মানবজীবনকে নিজেই পদদলিত করিতেছে, আল্লাহর অনন্ত প্রেমামৃত-সাগর হইতে নিজকে বঞ্চিত করিয়া সে দুনিয়ার যত কদর্য বিষপাত্রের জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে এবং অমৃত ভ্রমে সেই কালকূট পান করিয়া জ্বলিয়া মরিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়াই তাঁহারা ছুটিয়া যাইতেন—ঐ হতভাগা মানবকে অগ্নিকুণ্ডের ধার হইতে টানিয়া আনিয়া, তাহার হাত হইতে বিষপাত্র কাড়িয়া লইয়া, এক গণ্ডুষ অমৃত-মদিরা-পাত্র তাহার মুখে তুলিয়া দিতে। কারণ, সে জীবন পাইবে, তৃপ্তি পাইবে, সন্তোষলাভ করিবে, শান্তিলাভ করিবে —এক কথায় পতিতের কল্যাণ-সাধনই তাঁহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা এছলাম প্রচার করিতেন, এই উদ্দেশ্যে যে, মুছলমান হইলে লোকের ইহ-পরকালের মঙ্গল হইবে। ফলতঃ সে প্রচারের মূলে ছিল, নিঃস্বার্থ ও সাত্ত্বিক প্রেম। আপনাদিগের ব্যক্তিগত বা

জাতিগত কোন প্রকার লাভালাভের বিবেচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা ধর্মপ্রচার করেন নাই। সত্য গ্রহণ করিয়া মানুষের জীবন জ্ঞানের মহিমা ও প্রেমের প্রভাবে স্বর্গের মঙ্গল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক, পাপী তরিয়া যাউক, তাপীর তপ্ত হৃদয় জুড়াইয়া যাউক, বিশ্বমানব সুখ ও শান্তিলাভ করুক—প্রেমাকুল হৃদয়ের এই ব্যাকুল বাসনা লইয়াই মোহাম্মদ মোস্তফা এছলাম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যগণের পূর্ণ এক যুগের প্রচারবিবরণ, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা—কল্পনায় নহে কিংবদন্তিতে নহে, অনুমানে নহে অন্ধবিশ্বাসে নহে—ইতিহাসের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। একবার তাহার আলোচনা করিয়া দেখ, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দোষ বাহির করিবার চেষ্টা কর,—হাঁ, আরও বলিতেছি, খৃষ্টান লেখকগণের দ্বারা ইউরোপ হইতে 'আধুনিক' 'উচ্চ' ও 'দার্শনিক' সমালোচনার রজনদীপিকা জ্বালাইয়া লও ; এবং পুনরায় সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান কর ;— দেখিবে অধৈর্য-উৎকণ্ঠা, সফলতার আস্ফালন, বিফলতার অবসাদ সে মহান হৃদয়কে এক মুহূর্তের তরেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। দেখিবে—মানব-সেবার স্বর্গীয় স্পৃহা ব্যতীত কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের নামগন্ধও সেখানে নাই। সেখানে কেবলই ছিল সত্য—সত্যের সহিত যুক্তি এবং যুক্তির সহিত প্রেম। বর্তমানে আমাদিগের প্রচারে সত্য, নিশ্চয়ই আছে—তবে তাহা আমাদিগের অকর্ষার্জিত এবং বহু স্থলে আমাদিগেরই অজ্ঞাত। কিন্তু যুক্তি সেখানে নাই, প্রেম সেখানে নাই, আন্তরিকতা সেখানে নাই, কচিৎ কোথায় থাকিলেও তাহা রাজসিক।' একমাত্র এই কারণে, আমাদিগের প্রচার-সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

মোস্তফা-চরিতের বহু মূল্যবান আদর্শ—'ইতিহাস-ভাগে' প্রদান করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। মোস্তফাকে চিনিতে হইলে, কোরআন বুঝিতে হইবে। আলোচ্য যুগে কোরআন শরীফের যে ছুরাগুলি অবতীর্ণ হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে তাহার কতকটা আভাস দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু নিজের সময় ও সুযোগের সঙ্কীর্ণতার কথা ভাবিয়া, এখন সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না। আল্লাহর অনুগ্রহে 'ইতিহাস-ভাগ' শেষ হইয়া গেলে 'শিক্ষা ও জ্ঞান-ভাগে' আমরা এ সকল বিষয়ে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

## প্রচারের ধারা

হযরতের বা তাঁহার ছাহাবীগণের প্রচার সম্বন্ধে যতগুলি বিবরণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে—মূলতঃ সেগুলির ধারা অভিন্ন। কাফেরদিগের তীব্র গালাগালি, অতি কঠোর ও জঘন্য ভাষায় আক্রমণ ; মোছলেম প্রচারকের অসাধারণ ধৈর্য—ক্রোধহীন উত্তেজনাহীন শান্ত ও প্রফুল্লভাব, নম্রমধুর ভাষায় কাজের কথার অতি সঙ্গত আলোচনা,—এবং সঙ্গে সঙ্গে কোরআন পাঠ। অর্থাৎ কোরআনের শিক্ষা প্রচারকের চরিত্র-মাহাত্ম্যে পরিস্ফুট হইয়া প্রতিপক্ষকে মোহিত করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু আমাদিগের এছলাম প্রচারে কোরআনের বড় একটা আবশ্যকতা নাই। আলেম প্রচারকগণের মধ্যে, প্রথার হিসাবে, ওয়াজের প্রারম্ভে কোরআনের দুই-চারিটা নির্দিষ্ট আয়াৎ আবৃত্তি করার নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ওয়াজে পঠিত-আয়তের মর্ম খুব কমই বিবৃত করা হয়। আয়াৎ পাঠ করার পর— অনেক স্থানে দেখিয়াছি—নানা প্রকার শারীরিক সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ ও উৎকট সুর-তান-লয় সহকারে 'মাওলানা ফারমাতেহে' আরম্ভ হইয়া যায়। বহুস্থলে নানা প্রকার কল্পিত গল্প-গুজব ও আজগুবী কেচ্ছা-কাহিনী বলিয়াই 'ধর্মপ্রচার' শেষ করা হইয়া থাকে। আলেম প্রচারকগণের সাধারণ অবস্থা যখন এই, তখন—অন্য পরে কা-কথা !

## প্রচারের বর্তমান অবস্থা

যাহা হউক, ইতিহাস আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, এছলাম প্রচারের প্রধান সম্বল ছিল—কোরআন প্রচার। আজকাল কিন্তু আমরা কার্যতঃ যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছি,

কোরআন শিখিব না, শিখাইব না, বুঝিব না এবং কাহাকে বুঝিতেও দিব না! সাধারণ সমাজের কথা দূরে থাকুক, সমাজের যে সকল ত্যাগী যুবক পার্থিব সম্মানে সম্পদাদির মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া 'ধর্মবিদ্যা' বা 'দিনী-এলেম' শিখিবার জন্য আমাদের মাদ্রাছাসমূহে প্রবেশ করে—তাহারাও কোরআন পড়িতে পায় না। আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, সরকারী মাদ্রাছাসমূহের উলা পাস করিবার পর শতকরা (অন্ততঃ) ৯৫টি ছাত্র কোরআনের ভাব গ্রহণ ত দূরে থাকুক, তাহার সরল অর্থ করিতেই সমর্থ হয় না। ফলতঃ এই মাদ্রাছাগুলিতে কোরআনের একটি ছত্র বা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার একটি হাদীছ, এমন কি তাঁহার জীবনীর সামান্য অংশ মাত্রও না পড়াইয়া, এই স্বার্থত্যাগী শত শত যুবককে ধর্মবিদ্যা বা 'দিনী-এলেমে' পারদর্শিতার সনদ দিয়া, যুগপৎভাবে তাহাদিগের ও মুছলমান সমাজের মস্তক চর্বণ করা হইয়া থাকে। বাংলার মুছলমান সমাজের জাতীয় জীবন যে একেবারে এমন শোচনীয়রূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কালের কঠোর কশাঘাতেও যে একেবারে তাহাতে কোনপ্রকার আন্দোলন ও চৈতন্যের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহার প্রধানতম কারণ—স্থানীয় আলেমগণের মধ্যে কোরআন শিক্ষার অভাব। অন্যান্য প্রদেশের মাদ্রাছাগুলিতে, কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া তাহার কোন একটা তফছির পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। কোরআন অধ্যাপন এবং কোরআনের তফছির বিশেষ—(তাহাও আবার আংশিকভাবে)—অধ্যাপনে যে কত প্রভেদ, অভিজ্ঞ পাঠককে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

হায়! কবে সেদিন আসিবে, যেদিন মুছলমান আল্লাহ্‌র মহীয়সী বাণী কোরআনকে আপনাদিগের ইহ-পরকালের প্রধান সম্বল ও প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিবে! যেদিন 'দিনী-এলেম'-শিক্ষার্থী বুঝিতে পারিবে যে, কোরআন শিক্ষাই তাহার ছাত্রজীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং কোরআন প্রচারই তাহার আলেম-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য!

দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন পচা গ্রীক-দর্শন শিক্ষাদানে ছাত্রের প্রতিভা ও সময়কে একসঙ্গে হত্যা করা অপেক্ষা, কোরআন শিক্ষা করা যে একজন আলেমের পক্ষে অধিকতর আবশ্যক, বে-সরকারী মাদ্রাছার পরিচালকগণ কবে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন?

## ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

### দেশত্যাগের সঙ্কল্প

ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها-

'মক্কা! আমার প্রিয় জন্মভূমি!—আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকিতে দিল না!!'' —হযরত।

স্বদেশ পরিত্যাগের সঙ্কল্প হযরত পূর্বেই করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশ ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন, তাহা এতদিন স্থিরীকৃত হয় নাই। দাওছ বংশের এছলাম গ্রহণের বিবরণ আমরা পূর্বেই অবগত হইয়াছি। এই দাওছ বংশের প্রধান গোত্রপতি তোফেল-এবন-আমর হযরতকে মক্কাত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তোফেল আরও বলিয়াছিলেন যে, 'সেখানে আপনাকে ও মুছলমানদিগকে শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার অনেক লোক আছে, আপনি সেখানে চলুন। কিন্তু এ সৌভাগ্য আল্লাহ্ আনছারদিগের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, কাজেই হযরত তোফেলের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না।''* ছহীহ মোছলেমের এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, কেবল কোরেশদিগের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার

* মোছলেম-জাবের ১—৭৪।

জন্যই হযরত যদি স্থানান্তরে গমন করিতে ব্যস্ত হইতেন, সমস্ত দেশের সমবেত শত্রুতাচরণ দর্শনে যদি তাঁহার মন এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলেই দাওছদিগের শত শত তরবারির ছায়ায় তিনি বহু পূর্বেই নিরাপদ হইয়া বসিতে পারিতেন।

হযরত কোথায় হিজরত করিবেন, ইহা পূর্বে তিনিও স্থির করিতে পারেন নাই। হিজরতের জন্য কখনও ইমামা, কখনও বাহরায়ন প্রদেশের হজর এবং কখনও ইয়াছরাবের কথা তাঁহার মনে উদিত।* 'তিরমিজী' নামক হাদীছ গ্রন্থে দেখা যায় যে, সিরিয়ার 'কিনসিরিন' নামক স্থানে গমন করিবার প্রস্তাবও এক সময় হইয়াছিল, ফলতঃ এই প্রকার আলোচনায় সময়, যেমন বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু হযরত এ যাবৎ কোন স্থির সঙ্কল্পে উপনীত হইতে পারেন নাই। মদীনায় এছলামের ভিত্তি দৃঢ় হইয়া যাওয়ার পর, হযরত মক্কার মুছলমানদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমরা সকলে আপন আপন ব্যবস্থা করিয়া, যাহার যেরূপে সুযোগ হয় মদীনায় চলিয়া যাও।

## ভক্তগণের দেশ ত্যাগ

মক্কায় মোছলেম নর-নারিগণ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং স্বদেশ, স্বজাতি, আত্মীয়-স্বজন বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতির মায়া কাটাইয়া তাঁহারা "কেবল ধর্মরক্ষার জন্য"** মদীনায় প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পলায়নের সময় সতর্কতা যথেষ্টই অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের অনেকেই কোরেশ-কাফেরদিগের হস্তে ধৃত হইয়া নানা প্রকার লোমহর্ষণ ও অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াছিলেন, চরিত-অভিধানসমূহে অনুসন্ধান করিলে এ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। নমুনা স্বরূপ তাহার মধ্য হইতে দুই-একটি বিবরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

## ছোহেবের প্রতি কোরেশের চরম অত্যাচার

ছোহেব রুমী মক্কায় অবস্থানকালে নানা প্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। ছোহেব মদীনা যাত্রার ব্যবস্থা করিতেছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া মক্কার দলপতিগণ তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। ছোহেবকে দেখিয়া তাহারা কঠোর স্বরে বলিল—আমাদের দেশে ব্যবসায় করিয়া আমাদেরই অর্থে বড় মানুষ হইলে, এখন সেই অর্থ লইয়াই তুমি মদীনায় পলায়ন করিবে ? ইহা কোনমতেই হইতে পারিবে না। মহাত্মা ছোহেব উত্তর করিলেন—তোমাদিগের কথা দ্বারা বুঝিতেছি, এই ধন-সম্পদ সম্বন্ধেই তোমাদের আপত্তি। আচ্ছা, যদি আমি উহার দাবী পরিত্যাগ করি ? তাহারা মনে করিল, আজীবন পরিশ্রমের ফল—এত কষ্টে অর্জিত ধনরাশি, ইহাও কি কেহ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে ? সুতরাং তাহারা বলিল, বেশ, সেই কথা। তুমি নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ ও তৈজসপত্র এখানে পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে ইচ্ছা দূর হইয়া যাইতে পার। কোরেশগণ নিজেদের মন দ্বারা ছোহেবের মনের অনুমান করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহারা দেখিল—রুমী বণিক তখনই নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরিধেয় বস্ত্রমাত্র সম্বল করতঃ পরম পুলকিত চিত্তে মদীনায় চলিয়া গেল।*** পাঠক ! কর্তব্যজ্ঞান ও ত্যাগের এই মহিমময় দৃশ্যটি একবার কল্পনার চক্ষে উত্তমরূপে অবলোকন করিয়া লউন। কর্তব্যের জন্য, ধর্মের জন্য, নিজের প্রচুর ধন-সম্পত্তি নিমেষে লুটাইয়া দিয়া ছোহেব কপর্দকহীন কাঙ্গাল সাজিতেছেন—আল্লাহ্‌র নামে নিজের যথাসর্বস্ব কোরবান করিয়া কেমন করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় পথের ফকির হইতেছেন, হযরতের

---

* বোখারী ও ফৎহুল বারী—হিজরত।

** বোখারী ২০—৪৬৮। *** এবন হেশাম ১—১৬৪। হলবী ২—২৩, ২৪ যাদোল মাআদ, এছাবা প্রভৃতি। ছোহেব হযরতের পর হিজরত করেন।

শিক্ষামাহাত্ম্য ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের কি মহান ভাব মোছলেম-জীবনকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, মুহূর্তের জন্য তাহা চিন্তা করুন এবং বর্তমান যুগের মুছলমান আমরা—সেই আদর্শের কতটুকু অনুসরণ করিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও একবার ভাবিয়া দেখুন।

## হেশাম ও আইয়াশের প্রতি অত্যাচার

হযরত ওমর মদীনায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে, হেশাম ও আইয়াশ এবং আরও কয়েকজন মুছলমান* তাঁহার সঙ্গে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। স্থির হইল, রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সকলে একটি নির্ধারিত স্থানে সমবেত হইবেন এবং সেখান হইতে এক সঙ্গে মদীনার পথে উঠিবেন। আইয়াশ কোন গতিকে আত্মগোপন করিয়া নির্ধারিত স্থানে সময়মত উপস্থিত হইলেন, কিন্তু হেশামকে কোরেশগণ ধরিয়া ফেলিল। অবস্থাগতিকে তাঁহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, নির্দিষ্ট সময় ওমর ও আইয়াশ প্রভৃতি মদীনায় চলিয়া গেলেন। আইয়াশ আবু-জেহেলের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা, কাজেই এই ব্যাপারে তাহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। সে ও তাহার ভ্রাতা 'হারছ' মতলব আঁটিয়া মদীনায় গমন করিল, এবং আইয়াশকে নানা প্রকার ছল-চাতুরী দ্বারা বুঝাইল যে, বৃদ্ধা মাতা তাঁহার বিচ্ছেদশোকে একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আইয়াশের জন্য আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা আইয়াশকে আরও বুঝাইল যে, মাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তোমার মুখ না দেখিয়া চুল বাঁধিবেন না, ছায়ায় যাইবেন না,—ইত্যাদি। সেইজন্য মাতার ক্লেশ দর্শনে বিচলিত হইয়া তাহারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। আইয়াশ একবার মাতাকে দর্শন দিয়া আসিলে তাঁহার সান্ত্বনা হইতে পারিবে। আইয়াশ এই সকল কথা হযরত ওমরকে বলিলে, তিনি তাঁহাকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া বলিলেন—আমার ভয় হইতেছে, ইহারা তোমাকে বন্দী ও বিপন্ন করিবার জন্যই কুমতলব আঁটিয়াছে। তুমি ইহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিও না। কিন্তু আইয়াশের তখন 'বিপরীত বুদ্ধি' উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, মাতার দুর্দশার কথা শ্রবণে মন বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। একবার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া আসা আবশ্যক। পক্ষান্তরে মক্কায় আমার অনেক টাকা-কড়ি রহিয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়িতে তাহা সঙ্গে আনিতে পারি নাই, সেগুলিও আনা হইবে। ওমর তখন বলিলেন, নিতান্তই যদি যাও, তাহা হইলে আমার এই বলিষ্ঠ ও দ্রুতগামী উটটি লইয়া যাও। তুমি এই উটে চড়িয়া যাইও, যদি পথে কোন প্রকার বিপদের লক্ষণ দেখিতে পাও, তবে এই উট ছুটাইয়া মদীনার দিকে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আমি আবার বলিতেছি, তোমার যাওয়া আমার নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আইয়াশ! তুমি বিশেষরূপে অবগত আছ যে, কোরেশদিগের মধ্যে আমার অর্থ, বিত্ত অন্যের তুলনায় নিতান্ত কম নহে। আমি তাহার অর্ধেক তোমাকে দান করিয়া দিতেছি, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। কিন্তু আইয়াশ এই উপদেশ শ্রবণ না করিয়া ওমর প্রদত্ত উষ্ট্রে আরোহণ পূর্বক ভ্রাতৃদ্বয়ের সমভিব্যাহারে মক্কায় যাত্রা করিলেন। মক্কার নিকটবর্তী হইলে, আবু-জেহেল আইয়াশকে ডাকিয়া বলিল—আমাদিগের উটটি একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তোমার উটটি একটু থামাইয়া আমাদিগের একজনকে উহাতে উঠাইয়া লও। আইয়াশ হযরত ওমরের উপদেশ ভুলিয়া গেলেন এবং আবু-জেহেলের কথামত নিজের উটটি বসাইয়া দিলেন। আবু-জেহেল ভ্রাতৃদ্বয় তখন তাঁহার নিকটবর্তী হইয়াই উভয়ে এক সঙ্গে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সতর্ক হইবার সুযোগ না দিয়া তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল। এই অবস্থায় তাহারা উটের পিঠে তুলিয়া আইয়াশকে লইয়া মক্কায় প্রবেশ করিল। এই সময় আবু জেহেল মক্কাবাসীদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া আইয়াশের দুরবস্থা ও নিজের কৃতকার্যতা দেখাইয়া বলিতেছিল—এই লোকগুলিকে এইভাবে জব্দ করিতে হয়।

---

* খামীছ ১—৪৩। হলবী ২—২১। মওয়াহেব ১—৬৫

আইয়াশ ও হেশাম মক্কার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং বলা বাহুল্য যে স্বধর্ম ত্যাগের জন্য তাঁহাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার হইতে লাগিল। হযরত মদীনায় গমন করার পর সে অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। অবশেষে একদিন তিনি মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'এই উৎপীড়িত মোছলেম যুগলকে উদ্ধার করিতে হইবে, এজন্য কেহ আত্মদান করিতে প্রস্তুত আছ কি?' মুখের কথা শেষ না হইতেই অলিদ বলিয়া উঠিলেন—'আমি প্রস্তুত আছি।'

অলিদ দীর্ঘ পথ অতিবাহন করিয়া মক্কায় আগমন করিলেন এবং গুপ্তভাবে থাকিয়া বন্দীদিগের অনুসন্ধানের চেষ্টায় রহিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের জনৈক আত্মীয়া স্ত্রীলোক দ্বারা তিনি জানিতে পারিলেন, বন্দীদ্বয় নগর প্রান্তে একটি প্রাচীর বেষ্টিত ছাদশূন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা—অবশ্য দলপতিগণের অনুমতিক্রমে—মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে কিছু কিছু খাদ্য দিয়া আসিত, হেশাম ও আইয়াশ সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সারাদিন সেই কারাগারে থাকিয়া ছটফট্ করিতেন। অলিদ সন্ধ্যার পর সেই কারাগারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহু কষ্টে তাহার প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্বক কারা-প্রাঙ্গণে লাফাইয়া পড়িলেন। কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু বন্দীদ্বয়ের পায়ে কঠিন লৌহের বেড়ি পড়িয়া আছে। এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে লইয়া পলায়ন করা অসম্ভব। তখন অলিদ খুঁজিয়া খুঁজিয়া একখণ্ড শ্বেত প্রস্তর আনিয়া তাহা বেড়ীর নীচে স্থাপন করিলেন এবং দুই হাতে তরবারি তুলিয়া তাহার উপর এমন জোরে আঘাত করিলেন যে, তাহা কাটিয়া গেল। তখন তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া মদীনাভিমুখে পলায়ন করিলেন। অলিদের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই ঘটনার পর হইতে অলিদের তরবারিরও একটা বিশেষ নাম পড়িয়া যায়।

## অলিদ প্রমুখের ধর্মত্যাগ—মিথ্যা কথা

এই বিবরণটি আমরা এবন-হেশাম হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা দ্বারা যেন জানা যায় যে, হযরতের মদীনা গমনের অল্পকাল পরেই বন্দীদ্বয়ের উদ্ধার সাধন হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ঠিক নহে; কারণ তাঁহাদিগের উদ্ধারকর্তা অলিদ বদর সমরের পরে মুছলমান হইয়াছিলেন। বোখারী ও মোছলেম গ্রন্থে (দোওয়া-কনুৎ সম্বন্ধে) আবু-হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে জানা যায় যে, অলিদও কোরেশদিগের হস্তে বন্দী ও বিপন্ন হইয়াছিলেন। ছালমা এবন-হেশাম নামক অন্য একজন ছাহাবী এইরূপে কোরেশগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া বহুদিন পর্যন্ত অশেষ যন্ত্রণা ও কারাক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ইহাদিগের মধ্যে একজনও এক মুহূর্তের জন্য স্বধর্ম ত্যাগ করেন নাই। এমন কি, অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে দীর্ঘ কাল অতিবাহন করিয়াও এক মুহূর্তের জন্য তাঁহাদিগের ঈমানে সামান্য দুর্বলতাও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

## আইয়াশ প্রমুখের ধর্মত্যাগ—মিথ্যা কথা

এই প্রসঙ্গে ইতিহাসে নাফে কর্তৃক যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া স্যার উইলিয়ম মুর* প্রমুখ লেখকেরা বলিয়াছেন যে, আইয়াশ ও হেশাম পুনরায় পৌত্তলিক ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই শ্রেণীর মন্তব্যগুলিকে সহজেই ভ্রান্ত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারিবেন। প্রকৃত কথা এই যে, মক্কা হইতে হিজরত করা তখন ধর্মের হিসাবে মুছলমানদিগের পক্ষে ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য ছিল।** আইয়াশ ও হেশাম নিজেদের ত্রুটি ও অদূরদর্শিতার জন্য, তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেলেন। এই হিজরত না করা এবং হিজরতের আদেশের পরও কোফরের কেন্দ্রস্থলে গমন বা অবস্থান করার জন্য, এই মহাজনদ্বয়

---

* ১৩৯ পৃষ্ঠা ১ম টিপপনী।　　　　** বোখারী ১৫—২৮৭

নিজেরা বিশেষরূপে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এবং অন্যান্য সকল মুছলমানই তাঁহাদিগের এই কার্যকে গুরুতর অপরাধ ও ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন। মূর সাহেব যে বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই কথিত হইয়াছে যে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা মনস্তাপ ভোগ করিতেছিলেন। বর্ণনায় এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে যে, فتناه فافتتن অর্থাৎ আবু-জেহেল ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা তিনি (আইয়াশ) কঠোর পরীক্ষায় পতিত হইলেন বা বিপদগ্রস্ত হইলেন। "বিপদগ্রস্ত হইয়া ধর্মত্যাগ করিলেন" ঐ পদের এরূপ অর্থ হইতে পারে না। মূর সাহেব হযরত ওমর কর্তৃক কথিত বলিয়া যে বিবরণটি তাঁহার পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে হযরত ওমরের বর্ণনা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও—অভ্রান্ত নহে। কারণ ছিহাহ্‌ছেত্তার নাছাই নামক গ্রন্থে কথিত আয়ৎ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, আইয়াশ প্রমুখের সঙ্গে এই আয়তের কোনই সংস্রব নাই।* একমাত্র নাফে' কর্তৃক বর্ণিত বিবরণ ব্যতীত, তফছিরে উল্লিখিত অন্য কোন বিবরণ ইহার সহিত খাপ খায় না।** ইহা ব্যতীত নাফে'র এই বিবরণে জানা যায় যে, অলিদও আইয়াশ প্রমুখের সঙ্গে একই সময় এছলাম বর্জন করিয়াছিলেন। ইহা সর্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত কথা। এই সকল যুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিম্নলিখিত দুইটি প্রমাণ দ্বারা আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিব যে, আইয়াশ ও অলিদ প্রমুখ কখনই এছলাম পরিত্যাগ বা পৌত্তলিক ধর্ম অবলম্বন করেন নাই ঃ

(১) ঐতিহাসিক বিবরণে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আইয়াশ ও হেশামকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন তাঁহারা মক্কাবাসীদিগের দ্বারা কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে তখনও কঠিন হাতকড়া ও বেড়ী পরাইয়া রাখা হইয়াছিল। কারাগারে তাঁহাদের জন্য সামান্য একটু ছায়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াও কোরেশগণ অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছিল। ইহারা এছলাম ত্যাগপূর্বক পুনরায় পৌত্তলিকতা অবলম্বন করিয়া থাকিলে, কোরেশদিগের পক্ষে তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া এরূপ কষ্ট দিবার কোনই কারণ ছিল না। স্বয়ং নাফে'র বিবরণের এই অংশটি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে যে, এই মহাজনগণ বাহ্যিকভাবেও এছলাম ত্যাগের অনুকূল কোন কাজ করেন নাই। বরং তাঁহাদিগের দৃঢ়তার জন্যই তাঁহাদিগকে মুছলমানদিগের দ্বারা উদ্ধারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত—এই প্রকার নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত করা হইয়াছিল।

(২) হযরত যে ইহাদিগের উদ্ধারের জন্য উদগ্রীব হইয়াছিলেন, তাহা আমরা নাফে'র বর্ণনা হইতেই দেখিয়াছি। তিনিই অলিদকে তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন।*** ইহা ব্যতীত বোখারী ও মোছলেমের ন্যায় বিশুদ্ধতম হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত নামাযে আইয়াশ প্রমুখের নাম করিয়া কাফেরদিগের হস্ত হইতে তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা এছলাম ত্যাগ করিয়া থাকিলে তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য লোক প্রেরণ বা নামাযে তাঁহাদিগের মুক্তির প্রার্থনা করা যথাক্রমে অস্বাভাবিক এবং অনৈছলামিক। অতএব হযরত কখনই তাহা করিতেন না।

এই সকল অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আমরা নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিতেছি যে, আইয়াশ ও হেশামের এছলাম ত্যাগ ও পৌত্তলিক ধর্ম অবলম্বনের গল্পটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন, যুক্তিবিরুদ্ধ ও অস্বাভাবিক কল্পনা মাত্র। মূর সাহেব বা তাঁহার সমরুচি লেখকগণ বিশেষ কষ্ট করিয়া এছলামের ইতিহাসেও 'পিতর' ও 'ইহুদা' আবির্ভাব করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বহু পরিশ্রমের এই আবিষ্কারের মূল্য যে কতটুকু পাঠকগণ তাহা সম্যকরূপে অবগত হইলেন।

---

* নাছাই—এবন-আব্বাছ হইতে।

** দেখুন—এবন-জরির—জোমাদ ২৯—১০। *** হেশামী ১—১৬৮

বিবি উম্মে ছালেমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার স্বামী আবু-ছালেমা মদীনা গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিবি উম্মে ছালেমার ক্রোড়ে একটি দুগ্ধপোষ্য পুত্রসন্তান, মাতা শিশু সন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া উষ্ট্রে আরোহণ করিয়াছেন, স্বামী তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন। এমন সময়, তাঁহার শ্বশুরকুলের লোকেরা আসিয়া তাঁহাদের গমনে বাধা দিয়া বলিল—'নরাধম, তুই যেখানে যাইবি—যা, কিন্তু আমাদের কন্যাকে তোর সঙ্গে যাইতে দিব না।' এদিকে আবু-ছালেমার স্বগোত্রের লোকেরা ইতিমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল—'তুই হতভাগা, তোর কপাল পুড়িয়াছে বলিয়া আমাদের বংশের একটা নিরপরাধ শিশুকে তোর সঙ্গে যাইতে দিব কেন ? আমাদের ছেলে দিয়ে তুই যেখানে পারিস—দূর হয়ে যা।' এই বলিয়া আবু-ছালেমার হাত হইতে 'নাকেল' লইয়া তাহারা উট বসাইয়া দিল।

তখনকার দৃশ্য অতি মর্মবিদারক। স্বামীগত-প্রাণ বিবি উম্মে ছালেমা, এক হস্তে স্বামীর অঞ্চল ধরিয়াছেন, অন্য হস্তে দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে বুকে চাপিয়া রাখিয়াছেন। আবু ছালেমা উভয়কে রক্ষা করার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছেন। পক্ষান্তরে নরাধমগণ স্বামীর হাত হইতে তাঁহার সহধর্মিণী স্ত্রীকে ও মাতার বক্ষ হইতে তাহার হৃৎপিণ্ড স্বরূপ শিশু-সন্তানটিকে ছিনাইয়া লইতেছে। ইহা অপেক্ষা মর্মবিদারক দৃশ্য আর কি হইতে পারে ?

সতীর আর্তনাদ, শিশুর কাতর ক্রন্দন, কোরেশ নর-পশুদিগের নিকট এ সমস্তই তুচ্ছ কথা। তাহারা ইহাতে একটুও বিচলিত হইল না এবং পূর্ব সঙ্কল্প অনুসারে স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে ও মাতার ক্রোড় হইতে শিশু-সন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া বীভৎস আনন্দরোল তুলিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। মুহূর্তের মধ্যে এই নির্মম অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গেল। আবু-ছালেমা সত্যের তেজে উদ্ভাসিত, ত্যাগের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত। তিনি কর্তব্যের আহ্বানে—আল্লাহর নামে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি মোছলেম। এই পরীক্ষার নিষ্পেষণে তাঁহার সেই এছলাম বা আত্মসমর্পণ আরও উজ্জ্বল, আরও দৃঢ় এবং আরও দৃপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সেখানে কালবিলম্ব না করিয়া আল্লাহর নাম করিতে করিতে উটের পিঠে আরোহণ করিলেন, আবু-ছালেমার উট মদীনার দিকে ছুটিয়া চলিল।

বিবি উম্মে ছালেমা বলিতেছেন—আমার সে সময়কার অবস্থা বর্ণনার অতীত। যেস্থানে আমাকে স্বামী-পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম এবং কিছুক্ষণ তাহাদের কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইতাম। এইভাবে প্রায় এক বৎসরকাল কাটিয়া গেল। এই সময় আমাকে প্রত্যহ এই অবস্থায় কাঁদা কাটা করিতে দেখিয়া আমার এক খুল্লতাত ভ্রাতার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি আমার স্বজনগণকে বিশেষরূপে বলিয়া-কহিয়া আমাকে স্বামীসকাশে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আবু-ছালেমার আত্মীয়গণও শিশুটিকে মায়ের সঙ্গে দিতে সম্মত হইল। তখন ঐ শিশুটিকে লইয়া আমি আল্লাহর নাম করিয়া উটে আরোহণ করিলাম। পথ চিনি না, পথের কোন সম্বল সঙ্গে নাই, তবুও চলিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যাঁহার অনুগ্রহে আমি এই নরাধমদিগের বন্দীখানা হইতে মুক্তি পাইয়া—আজ নিজের ধর্ম, সতীত্ব ও সন্তানসহ স্বামী সদনে গমন করার সুযোগ পাইয়াছি, তিনি এই অনাথিনীর একটা উপায় নিশ্চয়ই করিয়া দিবেন।

হইলও তাহাই। পথে ওছমান এবন-তালহা নামক জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ওছমান আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার সঙ্গে কে যাইতেছে ?

"সঙ্গে এই শিশু—আর আল্লাহ।"

এই উত্তর শুনিয়া ওছমানের বুক কাঁপিয়া উঠিল, তিনি বিবি উম্মে ছালেমাকে সঙ্গে করিয়া মদীনায় পৌঁছাইয়া দিলেন।*

---

* এবন-হেশাম ১—১৬৪, হালবী ২—২১ প্রভৃতি।

আর কত বলিব, এই নির্মমতার চিত্র আর কত আঁকিব। ইতিহাস, চরিত-অভিধান ও হাদীছ গ্রন্থের অনুসন্ধান করিলে এরূপ বহু ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাইবে। ধন্য তাঁহাদের মনের বল, কঠোর হইতে কঠোরতর পরীক্ষাও এক মুহূর্তের জন্য তাঁহাদিগকে কর্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় আকাবার বায়আতের পর হইতে ছফর মাসের শেষ পর্যন্ত, সমস্ত ছাহাবাই একে একে মদীনায় প্রস্থান করিলেন। অবশেষে মহাত্মা আবু-বাকর ও আলী ব্যতীত হযরতের নিকট আর কেহই রহিলেন না। অবশ্য যে সকল মুছলমান নর-নারী কোরেশদিগের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ও বন্দী হইয়া মক্কায় অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই হিসাবের বাহিরে। বলা বাহুল্য যে, এ সময় হযরত নিজের চিন্তা একটুও করেন নাই। তাঁহার প্রথম চিন্তার বিষয় ছিল— অনুরক্ত ও বিশ্বাসী ভক্তগণ। অগ্রে তাঁহাদিগকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়াই তিনি নিজের সর্বপ্রথম কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কাজেই শুভ-বৎসল মোস্তফা-হৃদয় ছাহাবাগণের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল, এবং সকলে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছিয়া গেলে তিনি আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় মক্কায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

## মারগোলিয়থের অসাধু মন্তব্য

হযরতের এই ত্যাগ ও প্রেম মারগোলিয়থ প্রমুখ খ্রীষ্টান লেখকগণের চক্ষে বিষবৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন,—মদীনার লোক তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে কি-না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক হইয়াছিল। তাই মোহাম্মদ প্রথমে মুছলমানদিগকে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। মদীনার নূতন মুছলমানেরা ইহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা দেখিয়া তিনি নিজের কর্তব্য স্থির করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পক্ষান্তরে মদীনায় তাঁহার এমন একদল লোক পূর্ব হইতে পাঠাইয়া দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছিল, যাহারা সর্বস্বহারা হইবার পর, দূর প্রবাসে তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইবে। খ্রীষ্টান লেখকগণের এই অনুমানটি কেবল প্রমাণহীন ও যুক্তিহীন কল্পনাই নহে, বরং উহা যুক্তি-প্রমাণের বিপরীত সত্যের স্বেচ্ছাকৃত অপলাপ মাত্র।

বিশ্বস্ত হাদীছ গ্রন্থসমূহে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ছাহাবাগণ নিজেরাই স্বদেশ ত্যাগ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোরেশদিগের অত্যাচার তাঁহাদিগের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা স্বাধীনভাবে দূরে থাকুক—অনেক সময় নিজের বাটীতেও মুখ ফুটিয়া আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। হযরত আবু-বাকরের ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিরও এই অবস্থা হইয়াছিল। তাই তিনিও কিয়দ্দিবস পূর্বে আবিসিনিয়ায় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।* বলা বাহুল্য যে, এই সকল অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন ও নির্বিঘ্নভাবে নিজেদের ধর্মকর্ম সমাধা করিবার জন্য ছাহাবাগণ স্বাভাবিকরূপে উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহারাই হিজরতের অনুমতি দিবার জন্য হযরতকে অনুরোধ করেন।** হযরত যদি পূর্বে মদীনায় চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আব্দুল মোত্তালেব বংশের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কোরেশদিগের যে একটু দ্বিধা ছিল, তাহাও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, এবং হযরতের মদীনা যাত্রার পর তাঁহারা অবাধে মুছলমানদিগের উপর বদস্তুর অত্যাচার করিতে পারিত। তাহা হইলে

---

* বোখারী ১৫—৪৫৬ প্রভৃতি।

** বোখারী ১৫—৪৫৮, এবনে হেশাম ১—১৭২, তাবারী ২—২৪৪ প্রভৃতি দেখুন। মূর সাহেব নিজেই বলিতেছেন—"This severity forced the Moslems to petition Mohamet for leave to emigrate."

হয়ত খৃষ্টান লেখকগণের মনস্কামনা* কতকাংশে সিদ্ধ হইতে পারিত কিন্তু আল্লাহর মঙ্গল উদ্দেশ্য যে অন্যরূপ ছিল, সুতরাং তাঁহারা দুঃখ করিয়া কি করিবেন !

যুক্তির হিসাবে এখানে আর একটি কথা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। মক্কা মোছলেম-বৈরিগণের প্রধান শক্তিকেন্দ্র। হযরতকে ও মুছলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া এছলামের মূলোৎপাটনের জন্য সেখানে কোরেশগণ সর্বদাই আগ্রহান্বিত। যদি হযরত আল্লাহর উপর নির্ভর করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইতেন, যদি মোছলেম অনুচরগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তাঁহার আত্মরক্ষা করার আগ্রহ বা আবশ্যক হইত, তাহা হইলে তিনি নিজের অনুরক্ত ভক্তদিগকে দূর প্রবাসে না পাঠাইয়া, কোন গতিকে হিজরত পর্যন্ত তাঁহাদিগকে মক্কায় রাখিয়া লইবার চেষ্টাই করিতেন।

## চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

### আনছারগণের সৌজন্য

যে কয়জন নর-নারী কোরেশদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্য সমস্ত মুছলমান মদীনায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে তাঁহারা অতি সমাদরে গৃহীত হইতেছেন। মদীনার আনছারগণ, এই নবাগত প্রবাসী ভ্রাতাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজেদের ঘর-দুয়ার ও বিষয়-সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতেছেন। পক্ষান্তরে মদীনায় এছলামের প্রসার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া কোরেশ প্রধানগণ ক্রোধে, ক্ষোভে ও অভিমানে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিল। কি উপায়ে মুছলমানদিগের সর্বনাশ করিবে, কোন পন্থা অবলম্বন করিলে এছলামকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিবে, এই সকল চিন্তায় তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল। এদিকে মুছলমানগণ তাহাদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে—স্বয়ং হযরতও শীঘ্র মদীনায় চলিয়া যাইবেন, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিল। এখন উপায় কি ?

### কোরেশের ষড়যন্ত্র

পূর্বেই বলিয়াছি, মক্কাবাসিগণ মুছলমানদিগের প্রতি অত্যাচার-অবিচার করিয়া তাঁহাদিগকে স্বধর্মচ্যুত করিবার এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে ক্লেশ ও বাধা দিবার জন্য নিয়মিতভাবে একটি সমিতি গঠন করিয়াছিল। যে গৃহে এই সমিতির অধিবেশন হইত, তাহা দারুন্-নাদওয়া বা পরামর্শ গৃহ নামে খ্যাত ছিল। এই সময় একদিন বর্তমান সমস্যার সমাধান করিবার জন্য কোরেশের সকল গোত্রের লোককে সেখানে সমবেত করা হইতে লাগিল। কোরেশ ব্যতীত মক্কার অন্যান্য গোত্রের লোকদিগকেও এই সভায় যোগদান করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল, এবং কোরেশদিগের এই আহ্বান মতে তাহারাও এছলামের ও হযরতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য এই সভায় যোগদান করিয়াছিল।** একমাত্র কোরেশের আব্দেমনাফ বংশকে (হযরতের বংশ)

---

* মূর সাহেব বিবি খদিজা ও আবু-তালেবের মৃত্যু বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পর বড় আক্ষেপ করিয়াই বলিতেছেন—A Few more years of similar discouragement, and his chance of success was gone, অর্থাৎ আর কতককাল এরূপ হইলে এই রূপে উৎসাহ ভঙ্গ হইলেই মোহাম্মদের কৃতকার্যতার সম্ভাবনা থাকিত না (১২২ পৃষ্ঠা)। মুছলমানগণ ও হযরত স্বয়ং নিরাপদে মদীনায় পৌঁছিয়া যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া মহাত্মা মারগোলিয়থ সাহেব আর একটু আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন : Arabia would have remained pagan, had there be a man in Meccah who could strike a blow ; who would act and be ready to accept the responsibility for acting. অর্থাৎ মক্কায় যদি এমন একটা লোক থাকিত, যে মুছলমানদিগকে একটা আঘাত করিতে পারিত, এবং যে দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক কাজ করিতে পারিত ; তাহা হইলে আরবদেশ পৌত্তলিক থাকিয়া যাইত। (২০৭ পৃষ্ঠা)

** ইবনে খালেদুন ২—৪৮।

এই সভায় আহ্বান করা হয় নাই বা তাহাদিগকে ইহাতে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। কোরেশ কর্তৃক আহূত হইয়াই হউক, অথবা নিজের কোন কার্যোপলক্ষে হউক, নজ্‌দ দেশের একজন বর্ষিয়ান ব্যক্তিও এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। কোন কোন রাবী এই বৃদ্ধের প্রখর কূটবুদ্ধি ও এছলামের বিরুদ্ধে ইহার অত্যুগ্রভাবাপন্ন দর্শন করিয়া, তাহাকে ইবলিছ বা শয়তান বলিয়া নির্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইবলিছ ঐ বৃদ্ধের রূপ ধরিয়া সভায় যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা এই কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা ঐ বৃদ্ধের মুখেও একথা শুনেন নাই, অথবা হযরতের মুখেও এ-তথ্য অবগত হন নাই। কাজেই বৃদ্ধটি যে ছদ্মধারী শয়তান, ইহা তাহাদিগের অনুমান মাত্র।

## সম্মিলিত সভায় পরামর্শ

সকলে সভাগৃহে সমবেত হইলে, উপস্থিত সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল, এবং যাহার যেমন বিবেচনা, সে সেইরূপভাবে মতামত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। একজন বলিল—নাবেগা, জুহির প্রভৃতি কবিদিগকে যেরূপ কঠোর দণ্ড দিয়া নিহত করা হইয়াছিল, ইহার জন্যও সেইরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। আমার মতে হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়া এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ইহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হউক। তাহার পর কারাকক্ষের দ্বার স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। সেখানে সে নিজের পাপের দণ্ডভোগ করিতে করিতে মরিয়া যাইবে। কিন্তু পূর্বকথিত নজদবাসী বৃদ্ধ এই প্রস্তাবের কঠোর প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিলে মোহাম্মদের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনদিগের এ সংবাদ জানিতে বাকী থাকিবে না। তাহারা যে-কোন পন্থায় হউক, তাহাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করিবে। ইহাতে একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়া একটা হিতে-বিপরীত কাণ্ড ঘটিতে পারে—এই প্রস্তাবটি একেবারে অসমীচীন। আর একজন বলিল, উহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হউক ; দেশান্তরিত হইয়া যাওয়ার পর, সে যেখানে থাক বা যাহা করুক, তাহা আমাদিগের দেখার কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা নিরাপদে নিজেদের কাজকর্মে মনোযোগ দিতে পারিব। এ প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ হইল। প্রতিবাদকারীরা বলিল, তাহার কথা যেরূপ মিষ্ট এবং সে মানুষের মনকে যেমন সুন্দররূপে বশীভূত করিয়া লইতে পারে—তাহাতে সে যে-দেশে গমন করিবে, সেইখানেই তাহার বহু ভক্ত জুটিয়া যাইবে। তাহা হইলে, আমাদের কণ্টক যেমনকার তেমনি রহিয়া গেল, পক্ষান্তরে অন্যত্র যাইতে পারিলেই সে লোকবলে পুষ্ট হইবে। তখন আমাদিগের উপর আপতিত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়িবে।

## শেষ সিদ্ধান্ত—মোহাম্মদকে হত্যা করিতে হইবে

তখন আবু-জেহেল নিজেই প্রস্তাব করিল—আমার মতে উহাকে অবিলম্বে হত্যা করিয়া ফেলাই আবশ্যক। তবে একা একজন হত্যা করিলে মোত্তালেব ও হাশেম (আব্দেমনাফ) বংশের লোকেরা তাহার বা তাহার গোত্রের উপর চড়াও হইয়া শোণিতের বিনিময়ে বা প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ হত্যা করার জেদ ধরিতে পারে। সেজন্য আমার মত এই যে, আমাদিগের প্রত্যেক গোত্র হইতে এক-একজন তুখড় সাহসী ও বলবান যুবককে বাছিয়া লওয়া হউক। ইহারা সকলেই তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া মোহাম্মদের অনুসরণ করুক এবং সুযোগ পাইলেই সকলে একই সঙ্গে আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলুক। এ অবস্থায়, আমাদিগের মধ্যে কোন গোত্রই দলছাড়া হইয়া যাইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে মোহাম্মদের স্বগোত্রগণ আমাদিগের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তাহার পর শোণিতপণ যদি দিতে হয়, তবে আমরা সকলে তাহা ভাগ বাটরা করিয়া দিব। এই প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল—কোরেশ ও মক্কার অন্যান্য বংশের লোকেরা স্থির করিল,—'মোহাম্মদকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।'

সমস্ত মক্কাবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ অবিলম্বে তাঁহাকে নিহত করিয়া ফেলিবে।* কোরেশদিগের এই ষড়যন্ত্রের কথা কোরআনে উল্লিখিত হইয়াছে। আয়তটির অর্থ এইরূপ ঃ "—এবং (হে মোহাম্মদ !) সেই ঘোর বিপদের কথা স্মরণ কর, যখন কাফেরগণ, তোমার সম্বন্ধে—তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিবে কি তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে, কিংবা তোমাকে (দেশ হইতে) বাহির করিয়া দিবে—ইহা লইয়া ষড়যন্ত্র করিতেছিল—"(আনফাল, ৯—১৮) বলা বাহুল্য যে, এই আয়তে সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন সঙ্কল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে—শেষ সিদ্ধান্তের নহে। স্যার উইলিয়ম মূর এই আয়ৎ হইতে সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, "মোহাম্মদকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই হয় নাই।" অন্যথায় এই আয়তে উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে এমন "Alternative term" ব্যবহার করা হইত না।** যে কারণে হউক, মূর সাহেব মস্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, আয়তে ষড়যন্ত্রের অবস্থা ব্যক্ত করা হইয়াছে, কোরেশগণ হযরতকে বিপন্ন ও ধ্বংস করিবার জন্য যে কি প্রকার ভীষণ প্রস্তাবসমূহ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করা হইতেছে। কোরেশদিগের পরামর্শ সভার শেষ সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা আয়তের উদ্দেশ্য নহে। আরবী ভাষায় যাঁহার সামান্য ব্যুৎপত্তি আছে, তিনি সহজেই ইহা বুঝিতে পারিবেন।

## হিজরতের আয়োজন

যাহা হউক, আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয়তম হাবীবকে যথাসময়ে এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত করিয়া দিলেন, এবং তিনি আলীকে মক্কায় রাখিয়া, আবু-বাকরকে সঙ্গে লইয়া মদীনা প্রস্থানের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন মক্কার জনসাধারণ, কোরেশ-দলপতিগণের প্ররোচনায় ও নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ হযরতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু সেই পরম শত্রু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে, তাহারা তখনও এতদূর বিশ্বাসী ও মহাত্মা বলিয়া মনে করিত যে, মক্কায় যাহার যে-কোন মূল্যবান অলঙ্কার ও টাকাকড়ি 'আমানত' বা গচ্ছিত রাখার আবশ্যক হইত, সে তাহা নিঃসংশয়ে হযরতের নিকট রাখিয়া যাইত। এমন কি, হযরত যখন ভক্তকুল-শিরোমণি আবু-বাকরকে লইয়া মদীনা যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখনও তাঁহার নিকট কোরেশদিগের বহু মূল্যবান জিনিসপত্র গচ্ছিত ছিল, তখনও তিনি আমীন ও ছাদেক নামে খ্যাত। হযরতকে সেই রাত্রেই চলিয়া যাইতে হইবে, অথচ আমানতের জিনিসপত্রগুলি ফিরাইয়া দিতে গেলে লোকের মনে তখনই সন্দেহের উদ্রেক হইবে। এই সকল কারণেই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা হযরত আলীকে মক্কায় রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমস্ত ইতিহাসেই এই ঘটনার উল্লেখ আছে। এই ঘটনার দ্বারা হযরতের চরিত্র-মহাত্ম্য সম্যকরূপে প্রকাশিত ও প্রতিপাদিত হইতেছে। সেইজন্য মূর প্রমুখ "ন্যায়নিষ্ঠ" ও 'সূক্ষ্মদর্শী' খৃষ্টান লেখকগণ বিশেষ যত্নসহকারে এই বিবরণটির উল্লেখ করিতে একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

## আবু-বাকরের গৃহে পরামর্শ

দুই প্রহরের প্রখর রৌদ্রে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা হযরত আবু-বাকরের দ্বার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথারীতি গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, আবু-বাকর তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ সহকারে গৃহে লইয়া গেলেন মহাত্মা আবু-বাকর হিজরতের জন্য বহুদিন হইতে প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। তিনি চারি মাস পূর্ব হইতে দুইটি দ্রুতগামী উষ্ট্রকে 'খানে' বাঁধিয়া খাওয়াইতেছিলেন, আবশ্যক হইলেই যেন তিনি হযরতকে লইয়া মক্কা ত্যাগ করিতে পারেন। পূর্বে যখন হযরত মক্কার সমস্ত মুছলমানকে মদীনায় চলিয়া যাইবার আদেশ

---

* এবন-হেশাম ১—১৬৯, ৭০ ; তবকাত ১—১৫৩ ; এবন-খালদুন ২—৪৮, তাবারী ২—২৪১ ; হালবী, মাওয়াহেব, জাদুল-মাআদ প্রভৃতি। ** ১৪১ পৃষ্ঠা।

দিয়াছিলেন, মহাত্মা-আবু-বাকর এই আদেশ পালন মানসে তখনই হিজরত করিবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু হযরত তাঁহাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলেন। কারণ, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি আবু বাকরের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিতে পারিবেন। যাহা হউক, হযরতকে এমন অসময়ে আগমন করিতে দেখিয়া আবু-বাকরের মনে খটকা লাগিল যে, বোধ হয় গুরুতর কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাই তিনি বলিলেন—'ব্যাপার কি?—আমার জনক-জননী আপনার প্রতি উৎসর্গীত হউন!' হযরত বলিলেন, 'ব্যাপার কিছুই নহে। আমি হিজরত করিবার অনুমতি পাইয়াছি।' আবু-বাকর তখনও সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমি সঙ্গে যাইতে পারিব কি?' হযরত সম্মতিসূচক উত্তর দিলে, আবু-বাকর পুনরায় বলিলেন, 'তাহা হইলে আপনি আমার একটি উষ্ট্র গ্রহণ করুন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হউন।' হযরত উত্তর করিলেন—'বেশ কথা। তবে বিনামূল্যে নহে।' বিবি আছমা ও বিবি আয়েশা দুই ভগ্নী মিলিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদিগের পথের জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন।*

## হিজরতের অব্যবহিত পূর্ব অবস্থা

## বোখারীর হাদীছ

ইমাম বোখারী হযরত আবু-বাকর, বিবি আয়েশা ও ছোরাকা কর্তৃক তাঁহার পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে হিজরতের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা সকলেই ঘটনার সহিত সংসৃষ্ট প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। ইমাম বোখারীর বর্ণিত বিভিন্ন হাদীছকে একত্র করিয়া, ছওর গিরি-গুহায় তাঁহাদিগের অবস্থান ও তথা হইতে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছা সম্বন্ধে যতটা সংবাদ সংগ্রহ করা যায়, তাহা আমরা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। কিন্তু এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বর্ণিত যুক্তি-পরামর্শের পর হইতে ছওর গিরি-গুহায় পৌঁছা পর্যন্ত এই সময়টা কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, কোরেশদিগের দ্বারা নির্বাচিত ঘাতকগণ কখন কি অবস্থায় হযরতের গৃহ অবরোধ করিয়াছিল, এবং হযরত কি অবস্থায় এবং কোন্ সময় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গুহায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, বোখারী ও মোছলেমের কোন বর্ণনায়, এবং—আমরা যতদূর সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—প্রচলিত কোন হাদীছ গ্রন্থে, তাহার কোন সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভবিষ্যৎ-আলোচনার জন্য আবশ্যক হইয়া পড়ায়, আমাদিগকে নিতান্ত বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, পরম ভক্তিভাজন মাওলানা শিবলী মরহুম কর্তৃক সম্পাদিত উর্দু জীবনীতে, চরিতকার ও ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার এক অংশ, হাদীছের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মাওলানা মরহুম উপরে বর্ণিত হাদীছের সহিত মহাত্মা আবু-বাকরের যুক্তি-পরামর্শ এবং বিবি আয়েশা ও আছমার খাদ্যাদি প্রস্তুত করার বর্ণনার পরই, কোরেশগণ কর্তৃক হযরতের গৃহাবরোধ এবং তথা হইতে হযরতের বহির্গমন এবং তথা হইতে উভয়ের ছওর গুহায় আগমন, একসঙ্গে বর্ণনা করিয়া প্রমাণ স্বরূপ বোখারীর হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন।** কিন্তু বড় অক্ষরে লিখিত অংশটি চরিতকারগণের বর্ণনা মাত্র, বোখারীতে উহার কোন উল্লেখ নাই

## প্রচলিত গল্প

চরিতকার ও ঐতিহাসিকগণ বলেন—হযরত আলীকে তাঁহার হাজরা-মওত অঞ্চলে প্রস্তুত চাদর গায়ে দিয়া তাঁহার শয্যায় শয়ন করিতে বলিলেন, আলী সেইভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন। অবরোধকারিগণ মধ্যে মধ্যে দ্বারের ফাটল দিয়া আলীকে শয়ন অবস্থায় দর্শন করিতেছিল। তাহারা মনে করিতেছিল যে, হযরতই শুইয়া আছেন। এই সময় আবু-জেহেল দ্বারে বসিয়া হযরত কর্তৃক প্রচারিত পরকাল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদির উল্লেখ করতঃ নানা প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছিল। হযরত ঠিক এই সময় আবু-জেহেলের কথার তীব্র প্রতিবাদ করিতে

---

* বোখারী ২০—৪৭০,৭১ প্রভৃতি।

** শিবলী ১—১৯৮।

করিতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, 'হাঁ আমি এইরূপ বলিয়া থাকি। নরক সত্য এবং তুমি সেই নরকগামীদিগের মধ্যে একজন।' এই সময় হযরত এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া সূরা ইয়াসিনের প্রাথমিক কয়েকটি আয়ৎ পাঠ করতঃ হস্তস্থিত মৃত্তিকা তাহাদের মাথার উপর ছড়াইয়া দিলেন এবং ইহার ফলে কোরেশগণ আর কিছুই দেখিতে পাইল না। হযরত এই সুযোগে বাটী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর একজন লোক সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছ ? সকলে উত্তর করিল—'মোহাম্মদের অপেক্ষায়।' আগন্তুক তখন ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, মোহাম্মদ ত তোমাদিগের সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে। মাথায় হাত দিয়া দেখ, সে তোমাদিগের সকলের মাথায় মাটি দিয়া গিয়াছে। সকলে মাথায় হাত দিয়া দেখে, সত্যই তাহাদিগের মাথায় মাটি। কিন্তু তাহারা ফাটল দিয়া যখন দেখিল, হযরতের চাদর গায়ে দিয়া আলী শুইয়া আছেন, তখন তাহারা মনে করিল—এ সব কিছুই নহে, হযরতই শুইয়া আছেন। এই মনে করিয়া তাহারা সকাল পর্যন্ত সেখানে বসিয়া রহিল। তাহার পর, হযরত আলী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাহারা আসল ব্যাপার বুঝিতে পারিল।

## গল্পের মূল রাবী তাবরী

তাবরী ও এবন-হেশাম এবন-এছহাক হইতে, এবং তিনি মোহাম্মদ এবন-কা'ব কারজীর প্রমুখাৎ এই বিবরণ অবগত হইয়াছেন। সুতরাং এই মোহাম্মদ এবন-কা'বই তাঁহাদিগের উল্লিখিত বিবরণের মূল রাবী। এই রাবী হযরতকে দর্শন করেন নাই, রেজাল শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে 'তাবেয়ী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* ৪০ হিজরীতে অর্থাৎ আলোচ্য ঘটনার ৪০ বৎসর পরে তাঁহার জন্ম হয়।

বোখারী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থের বিবরণের সহিত এই বিবরণটি মিশাইয়া ফেলায় এবং রাবীদিগের অবস্থার আলোচনা না করায় এই বিবরণের 'মাটি পড়া' এবং কাফেরদিগের অন্ধ হইয়া যাওয়ার ঘটনা লইয়া আধুনিক লেখকগণ কতই সমন্যায় পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাই এই ঘটনা উপলক্ষে কেহ বলিতেছেন ; قدرت نے آنکھوں پہ خبر کردیا ** কেহ বলিতেছেন ان دلکے اندھوں کی آنکھوں میں خاک ڈالتا ہوا --- نکلا *** কেহ বলিতেছেন اندھوں کی آنکھوں میں خاک ڈالکر صاف نکل گئے **** আবার কেহ সূরা ইয়াছিনের আয়ৎ পাঠের উল্লেখ করিয়াই সারিয়া দিয়াছেন, মাটি ফেলার কোন উল্লেখ করেন নাই।§

## গল্পটি ভিত্তিহীন

আমরা দেখিতেছি যে, এই বিবরণের সত্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য এছলাম আমাদিগকে বাধ্য করে নাই। কারণ কোরআনে বা হযরতের মুখে এই ঘটনার কোন উল্লেখ আমরা অবগত হই নাই। পরন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীগণ হিজরত সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে যে সকল বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন এবং বোখারী প্রমুখ হাদীছ গ্রন্থসমূহে যে সকল বিবরণের উল্লেখ আছে, তাহাতে এই 'মাটিপড়া' বা কাফেরদিগের অন্ধ হওয়ার কোন উল্লেখ নাই। যিনি এই ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন, তিনি ঘটনার ৪০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে এই বর্ণনার যে কোনই মূল্য নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে এই বিবরণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হযরত বাটী হইতে বাহির হইয়া আবু-জেহেলকে

---

* তাক্‌রিব ৬২৩ নং ; এছাবা ৭৮৩০ নং দেখ। ** শিবলী ১—১৯৮
*** রাহমাতুল-লিল-আলামীন ৮২।
**** তাজকেরাতুল-মোস্তফা ১০২। § ওরিজ নাবলী ৮০।

সম্বোধন করিয়া তাহার কথার প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাহারা হযরতকে দেখিতেও পাইল না এবং তাঁহার কথা শুনিতেও পাইল না ; তাঁহারা বলিবেন—'আল্লাহর কুদরতে সবই হইতে পারে।" কিন্তু হইতে পারে বলিয়া একটা "হইয়াছে" কল্পনা করিয়া লওয়া সঙ্গত নাহে। সে যাহা হউক, এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, হযরত আত্মগোপন করিবার জন্য আলীকে নিজের বিশেষ চাদরে আচ্ছাদিত করতঃ নিজের শয্যায় শয়ন করাইলেন, কোন প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অথচ আবু-জেহেলের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুনিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার কথার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন, তাহাকে নারকী বলিয়া উল্লেখ করিলেন, এই দুইটি বিবরণের মধ্যে একেবারে সামঞ্জস্য নাই। তাহার পর কোরেশগণ অন্ধ এবং বধির হইয়া সেখানে বসিয়া থাকার পর, যখন আগন্তুক আসিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত ঘটনার কথা বলিয়া দিল এবং নিজেদের মাথায় হাত দিয়া তাহাদের প্রত্যেকেই যখন আগন্তুকের কথার সত্যতার প্রমাণও পাইল—তখনও তাহাদিগের মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইল না, অথবা তাহারা হযরতের একমাত্র গন্তব্য আশ্রয়স্থল আবু-বাকারের বাটীতেও একবার সন্ধান লইল না, ইহা কেমন কথা ?

## আসল কথা

ঘাতকগণ হযরতের বাটীর দ্বারদেশে বসিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছিল এবং দ্বারের ফাটল দিয়া শয্যার উপর শায়িত আলীকে দেখিয়া তাহারা মনে করিতেছিল যে, হযরত শুইয়া আছেন। এই সময় সদর দিয়া বাহির হওয়া সম্ভব হইবে না দেখিয়া হযরত বাটীর অন্যদিকের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতঃ বহির্গত হইয়া পড়েন। হযরতের পরিচারিকা মারিয়া বলিতেছেন : "হিজরতের রাত্রে আমি অবনমিত হইলে হযরত আমার পিঠের উপর পা দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়াছিলেন।" হাফেজ এবন-হাজর এছাবায়, ঐতিহাসিক এবরাহিম-এবন মোহাম্মদ তাঁহার 'নুরুন্নবরাছ' পুস্তকে এবং হাফেজ এবন-আবদুল বার, তাঁহার 'এস্তিআব' পুস্তকে মারিয়ার বর্ণিত এই হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন।* হযরত যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাটীর বাহির হইয়াছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী মারিয়ার এই হাদীছ হইতে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পক্ষান্তরে কোন কোন হাদীছ হইতে এরূপ প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে যে, হযরতের চাদর গায়ে দিয়া আলী শুইয়া আছেন এবং মোশরেকগণ হযরতের উপর নজর রাখিয়াছে—এমন সময় আবু-বাকর তথায় আসিয়া বলিলেন—"হযরত !" তখন আলী চাদর হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিলেন—"আমি হযরত নহি। হযরত বাহির হইয়া গিয়াছেন। তিনি বিরমাউনায় অপেক্ষা করিতেছেন—সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হউন।" মোহাদ্দেছ আবু-নাইম এই হাদীছটি রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন।** এই হাদীছ হইতেও মোটের উপর সপ্রমাণ হইতেছে যে, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে হযরত বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। সেই রাত্রে যে কোরেশগণ হযরতের গৃহ অবরোধ করিবে, ইহা সম্ভবতঃ হযরতের জানা ছিল না। তাই প্রথমে স্থির হয়, আবু-বাকর হযরতের বাটী আসিলে উভয়ে সেখান হইতে যাত্রা করিবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে হযরতের দর্শন না পাইয়া আবু-বাকর তাঁহার বাটীতে আসিয়া দেখেন, হযরত বিরমাউনার দিকে চলিয়া গিয়াছেন। সেখান হইতে দুইজনে আবু-বাকারের বাটীতে এবং তথা হইতে গিরিগুহার দিক প্রস্থান করেন। এখানে বিজ্ঞ পাঠকগণ বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন যে, এই ঘাতকদল নিশ্চয় অতি সঙ্গোপনে ও অতি সন্তর্পণে হযরতের প্রতি নজর রাখিয়াছিল। তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রত্যুষে হযরত শয্যাত্যাগ করিয়া বাটীর বাহির হইলেই সকলে তাঁহার হত্যা সাধন করিবে। প্রকাশ্যভাবে গৃহ বেষ্টন এবং উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন তাহারা নিশ্চয়ই করিতে পারে নাই। কারণ আব্দেমনাফ গোত্রের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হত্যাকার্য সমাধা করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাহারা ঘুণাক্ষরে এসব বিষয় জানিতে পারিলে সেই রাত্রেই যুদ্ধ বাধিয়া যাইত এবং আবু-জেহেল প্রভৃতির আশঙ্কাগুলি কার্যে পরিণত হইত।

---

* হল্‌বী ২—২৮। এছবা ও এস্তিআব—মারিয়া।   ** কানজুল ওম্মাল ৮—৩৩৩।

### আর একটি প্রশ্ন

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। ঘাতকগণ সমস্ত রাত্রি হযরতের গৃহ অবরোধ করিয়া রাখিল, কিন্তু তাহারা দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশপূর্বক আলীকে আক্রমণ করিল না কেন? মারগোলিয়থ বলিতেছেন, আরবগণ খুব সভ্য ছিল বলিয়া তাহারা এইরূপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করে নাই। মাওলানা শিবলীও প্রকারান্তরে এই মতেই মত দিয়াছেন। কিন্তু আমরা কোরেশদিগের সভ্যতা ও ভদ্রতার যে সকল বিবরণ পাঠ করিয়াছি, তাহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইতে পারিতেছি না অন্তঃপুরে প্রবেশ না করার কারণ সহজে বোধগম্য! কোরেশদিগের পরামর্শ সভার বিবরণে জানা গিয়াছে যে, আব্দেমনাফ বংশের অস্ত্রের ভয়ে তাহারা সর্বদাই শঙ্কিত ছিল। পূর্বে যখন তাহারা হযরতকে হত্যা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তখন আবু-তালেব, হাশেম ও আবদুল-মোত্তালেব বংশের সশস্ত্র যুবকগণকে লইয়া কোরেশ দলপতিদিগকে যে ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে, তাহারা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। পাছে হত্যাকার্য সমাধা হওয়ার পর অন্য গোত্রের লোকেরা হত্যাকারীর পক্ষ অবলম্বন করিতে অসম্মত হয়। সেই হেতু ঐ কার্যের জন্য প্রত্যেক গোত্র হইতে এক-একজন যুবককে বাছিয়া লইতে হইয়াছিল। এই সব শঙ্কা ও সন্দেহের জন্যই তাহারা গৃহে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই; তাহা হইলে ও তখনই হযরতের স্বগোত্রীয়দিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্তঃপুরে হযরতের শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্বক হযরতকে হত্যা করার প্রস্তাবও তাহাদের মধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু কক্ষে কে প্রবেশ করিবে, কে অগ্রে তাঁহার উপর আপতিত হইবে, ইত্যাদি বিষয় লইয়া তাহাদের মধ্যে ঘোর মত-বিরোধ উপস্থিত হয়।* অন্তঃপুরে প্রবেশ না করার ইহাই কারণ।

যাহা হউক, বীরবর আলী হযরতের শয্যায় শুইয়া রহিলেন, এবং কাফেরগণ তাঁহার কক্ষ বেষ্টন করিয়া সমস্ত রাত্রি পাহারা দিতে লাগিল। এদিকে হযরত, আবু-বাকরকে সঙ্গে লইয়া, খিড়কীর পথ দিয়া—হযরত দাউদের ন্যায়—** বাহির হইয়া গেলেন, এবং পূর্বকথিত মতে দ্রুতগামী উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মক্কা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী ছওর পর্বত সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্বতগুহায় অবস্থান ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনাসমূহ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বোখারী ও মোছলেমের বর্ণিত হাদীছ হইতে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

## পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

### لا تحزن ! - ان الله معنا

### পূর্ণচন্দ্র গুহায় লুকাইলেন

নবুয়তের ত্রয়োদশ বৎসর, ছফর মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষ রজনী, অমানিশার গাঢ় তিমিরপটলে ধরাধাম সমাচ্ছন্ন। এই অবস্থায়, ত্যাগের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি, এছলামের উজ্জ্বলতম আদর্শ, ছৈয়দকুল-পিতা আলীকে স্বীয় শয্যায় শয়ন করার উপদেশ দিয়া, হযরত মহাত্মা আবু-বাকরের

---

* যুহা-এবন-এরওয়া—ফৎহুল্বারী ২৫—৪৭২; তাবকাত ১—১৫৪; মোছনাদ—এবন আব্বাছ।

** 'মীখল তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, তুমি যদি এই রাত্রিতে আপন প্রাণ রক্ষা না কর, তবে কাল মারা পড়িবে। আর মীখল বাতায়ন দিয়া দাউদকে নামাইয়া দিলেন……ঠাকুর প্রতিমা লইয়া শয্যাতে শয়ন করাইলেন এবং ছাগ-লোমের একটা লেপ তাহার মস্তকে দিয়া বস্ত্র দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখিলেন।' ১ শমুয়েল ১৯—১২, ১৩, ১৪।

বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভক্তকুল-শিরোমণি, এছলামের প্রথম খলিফা, আয়েশা-জনক আবু-বাকর হযরতের জন্য ব্যগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। হযরত সেখানে উপস্থিত হইলে, উভয়ে বাটীর পশ্চাৎ দিকস্থ খিড়কীদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া অনতিবিলম্বে 'ছওর' পর্বত সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

## আবদুল্লাহ্—গুপ্তচর

মহাত্মা আবু-বাকরের পুত্র আবদুল্লাহ্, স্ফূর্তি, সাহস ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দূরদর্শী আবু-বাকর, যাত্রা করিবার পূর্বে, তাঁহার উপর ভার দিয়া যান যে, তিনি মক্কার অবস্থাদি সম্যকরূপে অবগত হইয়া, রাত্রিকালে ছওর পর্বতে গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে তাহা জানাইয়া আসিবেন। আবদুল্লাহ্ যোগ্যতম পিতার যোগ্যতম পুত্র। তিনি সমস্ত দিবস মক্কায় অবস্থান করিয়া বিভিন্ন উপায়ে কোরেশদিগের যুক্তি-পরামর্শের কথা অবগত হইতেন, বিশেষ চতুরতা সহকারে তাহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতেন, এবং রাত্রিকালে ছওর পর্বতে গমনপূর্বক হযরতকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া আসিতেন।' আমের-এবন-ফোহায়রা হযরত আবু-বাকরের ক্রীতদাস ছিলেন, এছলাম গ্রহণের পর আবু-বাকর তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। মুক্তির পরও আমের দয়াশীল প্রভু আবু-বাকরকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ছাগ ও মেষপাল চরাইবার ভার লইয়া আমের আবু-বাকরের নিকটই অবস্থান করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি আবু-বাকরের যথেষ্ট স্নেহ ও বিশ্বাসভাজনও ছিলেন। আমের ঐ অঞ্চলে নিজের ছাগ ও মেষপাল চরাইয়া বেড়াইতেন এবং এক প্রহর রাত্রির সময় ঐ পাল লইয়া ছওর পর্বতের নিকট উপস্থিত হইতেন। ছাগ ও মেষ দোহন করিয়া যে দুগ্ধ সঞ্চিত হইত, গুহায় অবস্থানকালে তাহাই তাঁহাদের প্রধান খাদ্য ও পানীয় ছিল। এই দুগ্ধের কতকাংশ কাঁচাই পান করা হইত, আর প্রস্তরখণ্ড অগ্নি বা সূর্যকিরণে উত্তপ্ত করিয়া অবশিষ্ট দুগ্ধের পাত্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত, ইহাতে দুধের কাঁচা গন্ধ বহু পরিমাণে কমিয়া যাইত। বাটী হইতে যাত্রা করিবার সময়, বিবি আছমা যে তাঁহাদের জন্য পাথেয় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই বর্ণনার প্রথমাংশে অবগত হইয়াছি। এই অবস্থায় ছওর গুহায় তিনটি দীর্ঘ রজনী কাটিয়া গেল।*

## কোরেশের ক্রোধ

এদিকে কোরেশগণ যখন দেখিল যে শিকার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা প্রথমে হযরত আলীকে গ্রেফতার করিয়া কা'বায় লইয়া যায় এবং তাঁহাকে নানা প্রকার 'পুছিদ' করিয়া জিজ্ঞাসা করে—'বল, মোহাম্মদ কোথায়?' আলী কঠোরস্বরে উত্তর করিলেন, 'তাঁহার গতিবিধির উপর নজর রাখিবার জন্য তোমরা আমাকে চাকর রাখিয়াছিলে না-কি যে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ !' যাহা হউক, কতকক্ষণ উৎপীড়ন ভোগ করার পর, তাহারা সকল দিক চিন্তা করিয়া আলীকে ছাড়িয়া দিল। আলীকে ছাড়িয়া দিয়া আবু-জেহেল সদলবলে আবু-বাকরের দ্বারদেশে আসিয়া দ্বারে সক্রোধ আঘাত করিতে লাগিল। বিবি আছমা ও তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরা বিবি আয়েশা তখন বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে আছমার আর বাকী রহিল না। কিন্তু বীর মোছলেম বালা ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি আপনার বস্ত্রাদি সুবিন্যস্ত করিয়া ধীরভাবে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। নরাকারে সাক্ষাৎ শয়তান আবু-জেহেল সম্মুখে দণ্ডায়মান, সে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোর পিতা কোথায় আছে ?' আছমা ধীরভাবে উত্তর দিলেন—'বলিতে পারিতেছি না।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নরাধম বিবি আছমার গণ্ডদেশে এমন প্রচণ্ড বেগে চপেটাঘাত করিল যে, সে আঘাতে তাঁহার কানের 'বালি' ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল।**

---

* বোখারী।  ** এবন-হেশাম, তাবরী প্রভৃতি।

'মোহাম্মদ মদীনায় চলিয়া গিয়াছেন' এই "দুঃসংবাদ অবিলম্বে মক্কায় প্রচারিত হইয়া পড়িল। তখন তাহাদের ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ ও অভিমান একেবারে চরমে উঠিয়াছে। উদ্‌ভ্রান্ত কোরেশ দলপতিগণ তখন ঘোষণা করিল ঃ

একশত উষ্ট্র পুরস্কার। মোহাম্মদ বা আবু–বাকরের জীবন্ত দেহ অথবা তাহাদের মুণ্ড যে আনিতে পারিবে, তাহাকে একশত উষ্ট্র পুরস্কার দেওয়া হইবে।*

আরব একে স্বভাবিকরূপে দুর্ধর্ষ প্রকৃতি, তাহাতে আবার হযরতের প্রতি তাহাদিগের ভয়ঙ্কর ক্রোধ, তাহার উপর এই পুরস্কার ঘোষণা। মোহাম্মদ ও আবু-বাকরের মুণ্ড আনিবার জন্য অশ্বে, উষ্ট্রে পদব্রজে ও অসংখ্য লোক ছুটিল।

## বিশ্বাসের চরম আদর্শ

এই যাত্রীযুগলের গুহায় অবস্থানকালে, ঘাতকদল অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আবু-বাকর বলিতেছেন,—'আমি মাথা উঁচু করিয়া দেখি, ঘাতকদল একেবারে আমাদিগের নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। তখনই আমি হযরতকে এই ব্যাপার নিবেদন করিলে, তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আবু-বাকর ! দুইজনের কথা কি বলিতেছ? আমরা দুইজন, আল্লাহ্ আমাদের তৃতীয়।** কোরআন শরীফে এই ঘটনার উল্লেখ আছে ঃ

"—যখন কাফেরগণ তাহাকে দেশান্তরিত করিয়া দিয়াছিল, দুইজন মাত্র, দুইজনের একজন তিনি (মোহাম্মদ)। যখন তাহারা গুহায় অবস্থান করিতেছিল, (এবং কাফেরগণের উলঙ্গ তরবারির নিম্নে আপনাদের নিঃসহায় অবস্থা ও আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়া সঙ্গের ধ্বংসাশঙ্কায়—যখন তাহার সঙ্গী বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল) তিনি আপন সহচর (আবু-বাকর)-কে বলিলেন—চিন্তিত হইও না, বিষণ্ণ হইও না, আমরা দুইজন মাত্র নহি। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।—" (তাওবা, ৪০)

## মূরের কুমতলব

স্যার উইলিয়ম মূর, নিজের মতলবের জন্য সর্ববাদীসম্মতরূপে অবিশ্বাস্য ও মিথ্যাবাদী ওয়াকেদীর বর্ণনা বিশেষ আগ্রহের সহিত উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীছগুলিকে তিনি আবশ্যকমত একেবারে হজম করিয়া ফেলেন। কোরেশগণ পলায়নের পরও হযরতকে হত্যা করার জন্য সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, ইহা স্বীকার করিলে তাঁহার পুস্তক রচনার এত পরিশ্রম স্বীকার একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই তিনি বলিতেছেন—মোহাম্মদ কোন দিকে গমন করিতেছেন, তাঁহার গম্য ও লক্ষ্যস্থান কোথায়, তাহাই জানিবার জন্য কোরেশগণ কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়াছিল মাত্র। তাহাদের এই 'অনুসন্ধান' যে সম্পূর্ণ নির্দোষ, পাঠকগণকে তাহা বুঝাইয়া দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।*** কু-অভিসন্ধি ও নীচ পক্ষপাত মানুষকে কিরূপ অন্ধ করিয়া ফেলে, মূর সাহেবের এই সকল কথায় তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। হযরত যে মদীনায় যাইবেন, মদীনাই যে তাঁহার একমাত্র গন্তব্যস্থান হইতে পারে, ইহা জানিতে কোরেশদিগের বাকী ছিল না। তবু তাহারা তাঁহার গম্যস্থানের সন্ধানমাত্র লইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিবে, পাগলেও ইহা প্রত্যয় করিতে

---

* বোখারী ও ফৎহুল্‌বারী ২৭—৪৭৩, মোছনাদ ৪—১৭৬ ; ঐ ৩—৩২২ প্রভৃতি।

** বোখারী—ঐ ; এবং মোছলেম ও তিরমিজী প্রভৃতি। মৃত্যুর বিভীষিকা দর্শনে ভীত হইয়া যীশু চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'প্রভু! তুমি আমাকে কেন ত্যাগ করিলে ?'

*** ১৪৪ পৃষ্ঠা।

পারে না। পক্ষান্তরে হাদীছের বিশুদ্ধতম গ্রন্থসমূহে, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদিগের দ্বারা বর্ণিত বিভিন্ন হাদীছে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরতকে বন্দী করিয়া আনার বা তাঁহার মুণ্ড আনয়ন করার জন্য কোরেশগণ একশত উষ্ট্রের বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল এবং এই ঘোষণায় প্রলুব্ধ হইয়া বহু ঘাতক চারিদিকে হযরতকে সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছিল। কোরআনেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

## মূরের উক্তি পরস্পর বিরোধী

পাঠক, একবার ব্যাপারটা দেখুন। মূর সাহেব ১৪৩ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন ঃ

—"and took refuge in a cave near its summit. Here they rested in security, for the attention of their adversaries would first be fixed upon the country *North of Mecca and the route to Madina, which they knew was Mahomet's destination.*"

এখানে লেখক স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহারা ছওর পর্বতচূড়ার নিকটবর্তী একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখানে তাঁহারা নিরাপদে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহাদের শত্রুগণের দৃষ্টি প্রথমে মক্কার উত্তর দিকস্থ দেশে এবং মদীনার পথের উপরই নিবিষ্ট হইত মদীনাই যে মোহাম্মদের লক্ষ্যস্থল, তাহারা (কোরেশগণ) তাহা অবগত ছিল।

লেখক পর পৃষ্ঠায় বলিতেছেন ঃ Failing to elicit from her (Asma) any information, they despatched scout in all directions, with the view of *gaining a clue to the track and destination of the prophet*, if not with less innocent instructions. অর্থাৎ আছমার নিকট হইতে কোন সন্ধান না পাওয়ায়, তাহারা সকল দিকে কতকগুলি চর পাঠাইয়া দিল, মোহাম্মদ কোন্ পথ ধরিয়া কোথায় যাইতেছেন, এই জটিল বিষয়ের একটি সূত্র আবিষ্কার করিবার জন্য—অপেক্ষাকৃত নির্দোষ উদ্দেশ্যে না হইলেও—তাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

এই অসামঞ্জস্যের কারণ কি, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। লেখক এই বিবরণে পদে পদে ন্যায়নিষ্ঠার যে অপচয় করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। গুহায় অবস্থানকালে ঘাতকদলের উলঙ্গ তরবারির নিম্নে অবস্থান করিয়াও হযরত যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও অসাধারণ মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছিলেন, মূর সাহেব তাহার উল্লেখ করিয়াই পাদটিপ্পনীতে ওয়াকেদী হইতে কতকগুলি আশ্চর্যজনক ও অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। এই দুইটি বিবরণ এরূপ পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হইয়াছে যে, অনভিজ্ঞ পাঠক তাহা পাঠ করিয়া সহজেই মনে করিয়া লইবেন যে, গুহায় অবস্থানকালে হযরতের দৃঢ়তার বর্ণনা ও ওয়াকেদী কর্তৃক বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি অভিন্ন। কিন্তু বোখারী ও ওয়াকেদীর মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, অভিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

## গুহা সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প

ওয়াকেদী ও এবন ছা'আদ প্রমুখ কোন কোন ঐতিহাসিক গুহার ঘটনা প্রসঙ্গে আবু-মোছআব নামক জনৈক রাবীর বর্ণিত নিম্নলিখিত গল্পটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাবী বলেন— হযরত গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলে, আল্লাহর আদেশক্রমে বর্বর বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলি গুহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, একজোড়া বন্য পারাবত সেখানে বাসা বানাইয়া ডিম পাড়িয়া তাহাতে 'তা' দিতে লাগিল, এবং মাকড়সা আসিয়া গুহার মুখে জাল বুনিয়া দিল। কোরেশ চরগণ গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখিয়া ও বন্য

পারাবতগুলিকে বাসা হইতে উড়িয়া যাইতে দর্শন করিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল, সেখানে আজও কোন জনমানবের সমাগম হয় নাই।

## গল্পটি অপ্রামাণিক

গুহায় যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নিত্য সেখানে গমন করিতেন, তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে হিজরতের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনায় এই আশ্চর্য ব্যাপারের কোন আভাসই পাওয়া যায় না। বর্ণিত ইতিহাস সমূহে যে বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরম্পরা এইরূপ ঃ "মোহাম্মদ-এবন-এবরাহিম, বলিতেছেন, আমি আওন-এবন-আমর কয়সীর মুখে শুনিয়াছি এবং তিনি বলিতেছেন, আমি জায়দ-এবন-আরকম, আনাছ-এবন মালেক ও মুগিরা-এবন-শো'বার সাহচর্য লাভ করিয়াছিলাম, আমি তাঁহাদিগকে বলিতে শুনিয়াছি—"

এই বর্ণনার মূল রাবী আবু-মোছআব মাক্কী যে কে, রেজাল শাস্ত্রকারগণও তাহার কোন সন্ধান পান নাই। তাঁহার পরবর্তী রাবী আওন। ইয়াহ্‌ইয়া এবন-মুঈন ও ইমাম বোখারী প্রমুখ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার হাদীছকে 'নগণ্য, বিশ্বাসের অযোগ্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বোখারী আরও বলিয়াছেন যে, আওন অজ্ঞাত অবস্থার লোক। ইমাম জাহবী আওনের বর্ণিত হাদীছগুলির অবিশ্বস্ততা প্রতিপাদন প্রসঙ্গে তৎবর্ণিত ছওর-গুহা সংক্রান্ত এই বিবরণটির উল্লেখ করিয়াছেন।* সুতরাং এই শ্রেণীর রাবীগণের প্রমুখাৎ যে গল্প বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মূল্য যে কতটুকু, সকলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এহেন অবিশ্বাস্য বর্ণনাটিকে, বোখারীর হাদীছের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া উভয় বর্ণনাকে একই পর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা, লেখকের পক্ষে যে কতটা সঙ্গত হইয়াছে, নিরপেক্ষ পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

## মাকড়সার জাল

এই প্রসঙ্গে, সত্যের অনুরোধে, আমাদিগের ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, কোন কোন হাদীছ গ্রন্থেও এই বিবরণের আংশিক উল্লেখ আছে। ইমাম আহমদ-এবন-হাম্বল তাঁহার মোছনাদে এবন-আব্বাছ হইতে ও আবু-বাকর মরওয়াযী (ইনি ইমাম নাছাইর গুরু) হছান হইতে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মাকড়সার জালের বিবরণ আছে। ইহাতে জানা যায় যে, 'কোরেশগণ গুহাদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহার মুখে মাকড়সা জাল পাতিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা মনে করিল, পলাতকগণ এই গুহায় প্রবেশ করেন নাই।'** হাদীছ-পরীক্ষার প্রচলিত নিয়মগুলির প্রয়োগ এবং তদনুসারে আলোচ্য হাদীছগুলির মূল্য পরীক্ষা না করিয়াই, আমরা এই হাদীছগুলিকে, বিশ্বাস্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি! কিন্তু ইহাতে যে অলৌকিকতা বা অসম্ভাব্য কথা কিছু আছে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! যাঁহারা জীবনে কখনও মাকড়সার জাল বয়নের অবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলে স্বীকার করিবেন যে এইরূপ স্থানে প্রত্যহ রাত্রিকালে মাকড়সারা জাল বয়ন করিয়া থাকে। বাতাসে বা অন্য কোন কারণে তাহা ছিঁড়িয়া গেলে, মাকড়সা আবার অবিলম্বে নূতন করিয়া জাল বুনিতে বা ছিন্ন জালের মেরামত করিতে আরম্ভ করে। এই বিবরণের সারমর্ম এই যে, হযরত ও তাঁহার সহচর আবু-বাকর গুহায় প্রবেশ করার পর মাকড়সা ঐ গুহার মুখে জাল বুনিয়াছিল। মাকড়সা দুনিয়াময় জাল বুনিয়া বেড়াইতে পারে, এখানে পারিবে না কেন?

আল্লাহর সত্য নবী, সত্যের অকৃত্রিম সেবক, বিশ্বাসের স্বর্গীয় আদর্শ, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহকে আপন হৃদয়ে এমনভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিজের ভিতরে-বাহিরে সত্যের তেজ ও সত্যের আশীর্বাদ এমনভাবে অনুভব করিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার কোন বিভীষিকা এক মুহূর্তের জন্য তাঁহার সেই বিরাট ও মহান হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাই এই

---

* মীজান ২—২৭২। ** ফাৎহুলবারী ৭—৪৫২

প্রসঙ্গে মারগোলিয়থের ন্যায় লেখকের মুখ হইতেও বাহির হইয়া পড়িয়াছে যে, "*Nor need we doubt* that Mohammed, whose mental powers were at their best in time of extreme danger, compforted himself with coolness and courage" ইহার মর্মানুবাদ এই যে, মোহাম্মদ—চরম বিপদের সময় যাঁহার মানসিক বল সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইত, তিনি যে বিশেষ ধীরতা ও সাহসের সহিত কাজ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।* কিন্তু এই অদম্য মানসিক বল, এমন অসাধারণ সাহস, এমন অনুপম ধৈর্য এবং বিপদের চরম ভীষণতার সময় তাহার পরম বিকাশ ইহার মূল কোথায় ?—ধর্ম বিদ্বেষে যাঁহারা একেবারে অন্ধ সাজিয়াই লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

## যীশু ও মোহাম্মদ

কোন কোন খ্রীষ্টান লেখক, হিজরতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পরে 'খ্রীষ্ট ও মোহাম্মদ' শীর্ষক একটি দীর্ঘ অধ্যায় লিখিয়া উভয়ের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। মুছলমানগণ জগতের সকল মহাজনকেই—তাহা তিনি যে যুগের ও যে দেশের হউন না কেন—ভক্তি করিয়া থাকে, ধর্মতঃ তাহারা ঐরূপ করিতে বাধ্য। এই প্রকার বিশ্বাস তাহার ঈমানের অংশ—এছলামের বীজমন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, অন্যথায় কেহ মুছলমান হইতে ও থাকিতে পারে না। জগতের সাধারণ প্রথানুসারে, এছলামের এই উদার ও অতুলনীয় মহীয়সী শিক্ষা দ্বারা, আমাদিগের খ্রীষ্টান লেখকগণ অন্যায়রূপে উপকৃত হইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য এই সকল কারণে মুছলমানদিগকে যীশু সম্বন্ধে মুখ খুলিতে হইয়াছে তাঁহারা বলিতেছেন—খ্রীষ্টান পাদরিগণ আপনাদের বাজার গরম করিবার জন্য বাইবেল নামে যে কিংবদন্তী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুছলমানের স্বীকৃত ইঞ্জিল নহে। পক্ষান্তরে বহুদিন কাটি ছাঁটি, অদল-বদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনাদির পর, কয়েক শত বাইবেলের মধ্যে যে কয়েকখানাকে তাঁহারা পাদরীদের ভোটের আধিক্যে বাছিয়া লইয়াছেন, ঐ বাইবেলের বর্ণিত যীশু—যিনি বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বরের পুত্র এবং স্বয়ং পূর্ণ ঈশ্বর ; যিনি তিনটি পূর্ণ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন—একটি কল্পিত গল্প মাত্র। অন্ততঃ কোরআনের বর্ণিত হযরত ঈছার সহিত তাহার কোন সামঞ্জস্য নাই। সম্ভবতঃ হযরত ঈছার পরলোকগমনের পর কোন লোক মিথ্যাভাবে যীশু নাম গ্রহণ করিয়া, তৌরাতের বর্ণনা অনুসারে, ক্রুশে আবদ্ধ হইয়া নিহত ও অভিশপ্ত হইয়াছিল এছলামের প্রাথমিক যুগে মোছায়লামা নামক এইরূপ একজন ভণ্ড আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলিয়া নিহত হইয়াছিল।**

## খ্রীষ্টানের আক্রমণ

তুলনায় সমালোচনা করিবার সময় খ্রীষ্টান লেখক বড় গলা করিয়া বলিতেছেন, মোহাম্মদ শত্রু ভয়ে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন কিন্তু যীশু অবলীলাক্রমে ঘাতকদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন : এইটিই তাঁহাদের প্রধান কথা। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদিগের বক্তব্য এই যে—

(ক) মৃত্যুর ভয় মানুষের হইয়া থাকে। কিন্তু আপনাদের যীশু যে ঈশ্বর ! তাঁহার মরণই বা কি, আত্মসমর্পণই বা কি, এবং তাহাতে তাঁহার পৌরুষই বা কি আছে ?

(খ) যীশু সহজে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি বিপদের আভাস পাইয়া পূর্বে অনেকবার*** ঐরূপ সরিয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এবারও ঠিক সেইরূপ কিদ্রোণ নদী পার হইয়া কোন বৃক্ষ উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারই দ্বাদশ শিষ্যের একজন—

---

* ২০৯ পৃষ্ঠা।       ** ইনি ব্যতীত আরও যীশু ছিলেন। লূক ৩—২৯।

*** মিলম্যান কর্তৃক History of Christianity ১—২৫৩

যাঁহার উপরেও যথানিয়মে পবিত্র-আত্মার আশ্রয় হইয়াছিল—গণিত কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর সাজিয়া যীশুর গুপ্ত অবস্থান স্থানের সন্ধান বলিয়া দিল। তখন একদলে ছয়শত সৈন্য এবং তদ্ব্যতীত বহু পদাতিক আলো-মশাল ও অস্ত্রশস্ত্রসহ তাঁহার বাসস্থান ঘেরাও করিয়া তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া লইয়া গিয়াছিল। যীশুর শিষ্যগণ সময়-অসময়ের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা খ্রীষ্টানগণও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অবরোধের সময় যীশুর প্রধান শিষ্য শিমোন পিতর খড়গাঘাতে করিয়া প্রধান যাজকের মল্ক নামধেয় ভৃত্যের কান কাটিয়া দিয়াছিলেন।*

(গ) যীশুর তথাকথিত ক্রুশারূঢ় হওয়ার সময়, তাঁহার শিষ্যসংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল। কিন্তু অন্যদিকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলাতে এবং তৌরাতের বর্ণিত তাওহীদের বিপরীত শেরেকের শিক্ষা প্রচলিত করাতে, সমস্ত ইহুদী জাতি তাঁহার শত্রু হইয়া পড়িয়াছিল। ন্যূনাধিক এক হাজার সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া প্রধান যাজক তাঁহাকে গ্রেফতার করিতে আসিয়াছিল, সঙ্গে আরও বহু লোকজন ছিল। এ অবস্থায় যীশুর পক্ষে কয়েকজন মাত্র শিষ্য লইয়া,—তাঁহাদের মানসিক বলের অবস্থাও যীশুর অবিদিত ছিল না—কৈসরের সৈন্যদল ও সমগ্র ইহুদী জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব তখন যীশুর "ভৃত্যগণের" (!) পক্ষে অস্ত্রধারণ না করার মূল্য যে কতটুকু, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যীশু বস্তুতঃ ইচ্ছাপূর্বক আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিলে, নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছেন।

(ঘ) যীশুর বন্দী হওয়ার ও তাহার পরবর্তী ঘটনাগুলি যে একতরফা ও আসলখাস্তা বর্ণনা প্রচলিত বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাও অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হয়, যীশুর শিষ্যগণ পীলাত ও অন্যান্য লোকজনের সহিত একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া, নানা প্রকার চাতুরী সহকারে তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। যিহুদা যে কয়েকটা টাকা মাত্র লইয়া প্রধান যাজকগণ ও ফরিশীয়দিগের হাতে যীশুকে ধরাইয়া দিল, ইহার মধ্যেও এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। ফলতঃ গ্রেফতার হইয়া পীলাতের নিকট উপস্থিত হওয়াই তখন যীশুর রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল। যীশু যে ক্রুশে নিহত হন নাই, বাইবেলের বর্ণিত একতরফা বর্ণনা দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

(ঙ) যীশুসংক্রান্ত বিবরণগুলির কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। পূর্বে প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক সমাজে এই প্রকার উপকথা ও কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। কালক্রমে ঐ উপকথাগুলি পরবর্তী লেখকগণের দ্বারা—তাঁহাদের রুচি ও সংস্কার অনুসারে—লিখিত হইয়া স্থায়ীভাবে পুস্তকের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিয়া থাকে; বাইবেলের গল্পগুলি ঐ শ্রেণীর কল্পিত কিংবদন্তী ও রচিত উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উপন্যাসে ও ইতিহাসে যে পার্থক্য, কল্পনায় ও বস্তুতে যে প্রভেদ, সমালোচনার সময় তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

## মদীনা যাত্রা

আবদুল্লাহ্ এবন-ওরায়কাহ্ নামক একজন লোককে পথপ্রদর্শকের কাজ করার জন্য পূর্ব হইতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে কথা ছিল, তৃতীয় রজনীর প্রভাত হইলে, সে নির্দিষ্ট উট দুইটি লইয়া ছওর পর্বতের নিকট উপস্থিত হইবে। আবদুল্লাহ তখনও পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী, কিন্তু আবু বাকর অর্থ দিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। সাধারণভাবে মক্কা ও মদীনার কাফেলা যে সকল পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে, সে সকল পথ দিয়া গমন করা কোনমতেই নিরাপদ নহে, এইজন্য অপরিচিত পথ দিয়া তাঁহাদিগকে গমন করিতে হইবে। আবদুল্লাহ্ এ সম্বন্ধে খুব পাকা লোক, তাই তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইল। যাহা হউক, নির্ধারিত সময়ে আবদুল্লাহ্ উট দুইটি লইয়া ছওর পর্বতে উপস্থিত হইলে, হযরত ও আবু-বাকর গুহা

* যোহন ১৮শ অধ্যায়।

হইতে বাহির হইয়া উষ্ট্রারোহণপূর্বক মদীনা যাত্রা করিলেন। পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ্ এবং পূর্বকথিত আমেরও তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা গুহা হইতে বাহির হইয়া লোহিত সাগরের উপকূলের পথ ধরিয়া মদীনা যাত্রা করিলেন।*

তিন দিন অনুসন্ধান করিয়াও যখন কোরেশগণ হযরতের কোন খোঁজ-খবর সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন তাহারা বহু পরিমাণে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কিন্তু কোন কোন দুর্ধর্ষ আরব তখনও 'মোহাম্মদের মুণ্ড' আনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। ছোরাকা সংক্রান্ত বিবরণ আমরা পরে জানিতে পারিব।

এই অধ্যায়ে যে সকল ঘটনা বিবৃত হইল, শিক্ষার্থী পাঠকের পক্ষে তাহার প্রত্যেকটিই বিশেষরূপে অনুধাবনযোগ্য। জগতে কোন মহৎ কার্য সমাধা করিবার ভার যাঁহার উপরে ন্যস্ত করা হয়, তাঁহার সহচর ও সহকর্মিগণও আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। মহাত্মা আবু-বাকর ও আলী, হিজরতের ব্যাপারে যে অসাধারণ ধৈর্য, সাহস ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবে। আলী ঘাতকদিগের নিষ্কোষিত কৃপাণের নিম্নে কেমন অবিচল চিত্তে সমস্ত রাত্রি শুইয়া রহিলেন, কাফেরগণ কর্তৃক বন্দী ও উৎপীড়িত হইয়াও কিরূপ ধৈর্যের সহিত সত্য রক্ষা করিলেন, আর ভক্তরাজ আবু-বাকর আপন স্বজনগণকে কোরেশদিগের মধ্যে রাখিয়া, কর্তব্যের খাতিরে কেমন করিয়া এই বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, আপনাকে আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কেমন আনন্দ ও আগ্রহসহকারে নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মহিমায়, ধৈর্য ও বীরত্বের গরিমায় এই চিত্রগুলি কত উজ্জ্বল, কত মনোহর! আর কত মধুর, কত মনোহর, কত সুন্দর, কেমন অতুলনীয় মহিমময় সেই মোস্তফা—আরব মরু-প্রান্তরের এই তপ্তদগ্ধ রেণুগুলি যাঁহার রাজীব চরণ-সংস্পর্শ লাভ করিয়া স্বর্গের শত শশধর-সুষমায়, উজ্জ্বলে মধুরে এমন মহীয়ান এমন গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্গে পাঠক ভাবিয়া দেখুন—আবু-বাকর তনয়া ভগ্নীযুগল আছমা ও আয়েশার কথা। আছমা যুবতী, আয়েশা কিশোরী। পিতা তাঁহাদিগকে ঘোর বিপদে ফেলিয়া নিজে মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, এই সংবাদে তাঁহাদের হৃদয়ে কি চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। কিন্তু ইঁহারা আদর্শ মোছলেম রমণীরূপে নির্বাচিত হইয়াই সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা একবিন্দুও অধীর হইলেন না। বরং সেই ঘোর বিপদের মধ্যে অবস্থান করিয়াও, তাঁহারা পিতার পাথেয়াদি প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হাবভাবেও পাড়া-প্রতিবেশীরা বুঝিতে পারিল না যে, তাঁহারা কিসের আয়োজন করিতেছেন। তাহার পর সত্য রক্ষা ও মন্ত্রগুপ্তি—জাতীয় মুক্তির সাধনক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুতর যাহা—আয়েশা ও আছমা কিরূপ অসাধারণ যোগ্যতা ও কর্তব্যজ্ঞানের সহিত এই পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন। এমনই কন্যা, এমনই ভগ্নী, এমনই স্ত্রী এবং এমনই জননী লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই ত প্রাথমিক যুগের মুছলমান মনুষ্যত্বের সকল প্রকার সদগুণে জগতের উচ্চতম আসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। আছমার পিতা আবু-বাকর, আবদুল্লাহ্ এবন-জোবেরের মাতা আছমা; খাওলার ভ্রাতা জেরার এবং যোবায়েরের মাতা ওফাইয়া।**

হযরত আবু-বাকরের ন্যায় অনুরক্ত ভক্তসুহৃদ জগতে দুর্লভ। তিনি ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য—হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জন্য, কিরূপে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। এহেন আবু বাকর, চারি মাস পূর্ব হইতে হিজরতের সময় কাজে লাগিবে বলিয়া দুইটি উষ্ট্র ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন এবং যাত্রার প্রাক্কালে হযরতকে তাহার একটি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু এমন বিপদের সময় এহেন ভক্তের দানও হযরত গ্রহণ

---

* বোখারী  ** ইনি সাধারণতঃ জনিছ নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন—ইহা ভুল।

হযরতের মক্কা হইতে বহির্গমন, গুহায় অবস্থান, গুহা হইতে যাত্রা ও মদীনায় শুভাগমন এবং সেই সময়কার যাবতীয় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আবু-বাকর, ছোরাকা প্রভৃতি এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে যে-সব বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, ইমাম বোখারী সেগুলিকে স্বীয় গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ রেওয়ায়তগুলিকে একত্র করিয়া আলোচনা করিলে, হিজরতের একটা বিশ্বস্ত, বিস্তৃত ও ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসকারগণ সাধারণতঃ যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, হাদীছগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লেখনী ধারণ করিলে, তাহার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা প্রথমে বোখারী হইতে হিজরত-পথের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন যে, ইহা বিশ্বস্ততম বোখারীর হাদীছ, এবং এই হাদীছগুলির প্রত্যেক রাবীই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

হযরত ও তাঁহার সঙ্গিগণ দ্রুতবেগে পথ-পর্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্যের কিরণ ক্রমশঃ প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের তীক্ষ্ণ রৌদ্র, স্থানীয় পর্বত-প্রস্তরের উপর দিয়া অসহ্য অনল-তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে লাগিল। তখন আবু-বাকর ছায়ার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অধিক বিলম্ব করিতে হইল না! সম্মুখে একটি পাহাড়ের চাতাল বাহির হইল। চাতালটি বারান্দার ন্যায় তাহার তলস্থ ভূমির উপর ছায়াপাত করিয়া, মহাঋষির বিশ্রামস্থল রচনা করতঃ কোন স্মরণাতীত যুগ হইতে নিজের সৌভাগ্য মুহূর্তের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আবু-বাকর তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে যথাসাধ্য স্থানটি পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন করিয়া লইলেন, তাহার পর নিজের চাদর বিছাইয়া হযরতকে তথায় বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। আবু-বাকরের নিবেদন মতে হযরত সেখানে অবতরণ করিয়া তাঁহার চাদরের উপর শয়ন করিলেন।

হযরত বিশ্রাম করিতেছেন দেখিয়া আবু-বাকর তথা হইতে একটু দূরে গিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কোরেশ কর্তৃক নিয়োজিত ঘাতকদল কোনদিক দিয়া এখনও তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে কি-না, দূরদর্শী আবু-বাকর বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহার সন্ধান লইতেছিলেন। এই সময় তিনি দেখিলেন—অদূরে একজন রাখাল কতকগুলি ছাগল চরাইতেছে। আবু-বাকর তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে জনৈক কোরেশের ভৃত্য। যাহা হউক, আবু-বাকরের অনুরোধমতে, রাখাল একটি দুগ্ধবতী ছাগী লইয়া প্রথমতঃ তাহার স্তনটি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া এবং নিজের হাত দুইখানি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া তাহাকে দোহন করিল। আবু-বাকর—আরবের নিয়মানুসারে—সেই দুগ্ধে কতকটা পানি মিশ্রিত করিয়া, পাত্রটি লইয়া হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হযরত তখন জাগরিত অবস্থায় ছিলেন ; আবু-বাকর বলিতেছেন—আমি দুগ্ধপাত্র হযরতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া পান করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহা পান করিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করিলেন। দুগ্ধ পান করার পর হযরতের প্রশ্নের উত্তরে আমি নিবেদন করিলাম,—যাত্রার সময় হইয়াছে : অতঃপর আমরা সকলে সেখান হইতে যাত্রা করিলাম।

কোরেশের অনুসন্ধান তখনও শেষ হয় নাই। তাহারা মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী জনপদসমূহের অধিবাসীদিগকে 'মোহাম্মদ ও আবু-বাকরের মুণ্ড বা তাহাদের জীবন্ত দেহ' আনিবার জন্য তখনও উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছে! মহাত্মা আবু-বাকর বলিতেছেন,—প্রথম 'মনজিল' হইতে যাত্রার সময় ইহাদের মধ্যে মালেকের পুত্র ছোরাকা আমাদিগের সন্ধান পাইয়া, অশ্বারোহণে আমাদিগের নিকটবর্তী হইল। ছোরাকাকে দেখিয়া আমি বলিলাম—হযরত দেখুন, এইবার আততায়ী আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। হযরত উত্তর করিলেন—'ভীত হইও না, আল্লাহ আমাদিগের সঙ্গে আছেন।'*

---

* বোখারী ২৪—৩৫৫, মনাকেবুল-মোহাজেরিন।

করিলেন না, এমন কি দানের উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মদীনা পর্য্যন্ত যাওয়াও তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। অবশেষে আবু-বাকর একটি উট হযরতের নিকট বিক্রয় করিলে তবে তিনি তাহাতে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন।

যিনি নেতা, যিনি হাদী, যিনি জাতির পরিচালক, তিনি রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার আর্থিক-প্রভাব ও সংস্রব হইতে নিজেকে অতি সাবধানে মুক্ত রাখিবেন—ইহাই হইতেছে এই অংশের শিক্ষা। আজ মুছলমান সমাজ, বিশেষতঃ তাহার পরিচালক আলেম মণ্ডলী মনুষ্যত্বের এই উচ্চতম আদর্শ ও মোস্তফা-জীবনের এই মহত্তম ছুন্নতের যে কতটুকু মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ছওর পর্ব্বতের সেই ঐতিহাসিক গুহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। জরকানী বলেন,—ছওর পর্ব্বত মক্কা হইতে তিন 'মিল' দূরে অবস্থিত। পর্ব্বতচূড়া প্রায় এক মিল উচ্চ—এখান হইতে সমুদ্র দেখা যায়। আলী বে ও বার্ক হার্ডির (Burk Hardi) পর্যটনের বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা হইতে হোছায়নি গ্রামে যে পথ গিয়াছে, ঐ পথের বাম দিকে—আন্দাজ দেড় ঘণ্টার পথ অতিবাহন করিয়া গেলে এই পর্ব্বত পাওয়া যায়। পর্ব্বতের চূড়াদেশে এই গুহাটি অবস্থিত। কিন্তু ইহাদের কেহ নিজ চক্ষে ঐ গুহা দর্শন করেন নাই। মাওলানা শেখ আ'বদুল হক (মোহাদ্দেছ দেহলবী) স্বচক্ষে এই গুহা দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—গুহাটির একটি মাত্র মুখ ছিল। পরে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য অন্যদিক হইতে একটা প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গুহার প্রাচীন মুখ দিয়া একটি মোটা লোক কষ্টে প্রবেশ করিতে পারে। (মাদারেজ ২—৭৬) ভুপালের ভূতপূর্ব বেগম ছাহেবা ১৮৭০ সালে হজ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, মক্কা হইতে ছওর পর্য্যন্ত পথটি অতিশয় বন্ধুর ও প্রস্তর-কঙ্কর সঙ্কুল। পাথরের বড় বড় চাটানের উপর অনেক সময় যাত্রীকে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হয়। গুহার মুখটি অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। তবে অন্যদিকে আর একটি 'মুখ' খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন মুখটির প্রস্থ ১৩·৫০ (সাড়ে তের) ইঞ্চি মাত্র।

## ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق
واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا

### মদীনার পথে

তৃতীয় দিবসের প্রত্যুষে, পূর্ব্বনির্দ্ধারণ অনুসারে, আবদুল্লাহ্ উট দুইটি লইয়া গুহাসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। আমেরও যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই নির্বাসিত যাত্রীদলে মাত্র চারিটি মানুষ আর তিনটি উষ্ট্র। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা, আবু-বাকরের নিকট হইতে ক্রীত 'কছওয়া' নামক উষ্ট্রে আরোহণ করিলেন, আবু-বাকর ও আমের অপর উষ্ট্রটিতে এবং আবদুল্লাহ্ তাঁহার নিজস্ব উষ্ট্রে আরোহণ করিলে—আল্লাহর নাম করিয়া তাঁহারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মক্কার কারওয়ান (কাফেলা) সাধারণতঃ যে পথ দিয়া মদীনায় যাতায়াত করে, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, এই ক্ষুদ্র যাত্রীদল লোহিত সাগরের উপকূল ধরিয়া, বহু উপত্যকা-অধিত্যকা অতিক্রম করিতে করিতে গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐতিহাসিক ইবন-ছা'আদ ও ইবন-হেশাম প্রভৃতি এই পথের 'মনজিল'গুলির নাম করিয়াছেন—ইহার মধ্যে একমাত্র "রাবেগ" নামক স্থানটি আজও পূর্ব নাম বহন করিয়া সেই মহান যাত্রাপথের কথঞ্চিৎ সন্ধান প্রদান করিতেছে।

## ছোরাকার আক্রমণ

ছওর গুহা হইতে যাত্রা করার পর, ছোরাকা কিরূপে তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াছিল, কিরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল, এবং আল্লাহর অনুগ্রহে হযরত কিরূপে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, ইমাম বোখারী অন্যত্র স্বয়ং ছোরাকার প্রমুখাৎ তাহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আমরা পর পৃষ্ঠায় ঐ বর্ণনার সার সঙ্কলন করিয়াছি।

কোরেশ দূতগণ অন্যান্য আরব গোত্রের ন্যায় ছোরাকা ও তাহার স্বগোত্রীয়দিগের নিকট আগমন করিয়া তাহাদিগকে জানাইয়াছিল যে, মোহাম্মদ ও আবু-বাকরকে বন্দী বা নিহত করিতে পারিলে, কোরেশ দলপতিগণ তাহার বিনিময়ে শত উষ্ট্র পুরস্কার প্রদান করিবেন। একে ধর্মবিদ্বেষ, তাহার উপর এই প্রলোভন, কাজেই পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের আরবগণও 'মোহাম্মদ ও আবু-বাকরের মুণ্ড' প্রাপ্তির জন্য যে কিরূপ আগ্রহান্বিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। হযরত গুহা হইতে বহির্গত হইয়া যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় জনৈক আরব দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া ত্বরিতপদে নিজ পল্লীতে আসিল। পল্লীর প্রধানগণ তখন এক মজলিসে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিল। আগন্তুক ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে সংবাদ দিল, একটি ক্ষুদ্র যাত্রীদল সমুদ্র উপকূলের দিকে গমন করিতেছে, আমার বিশ্বাস—মোহাম্মদ ও তাঁহার সহচরগণই ঐ পথ দিয়া পলায়ন করিতেছে। ছোরাকা সেখানে বসিয়া ছিল, সে উত্তমরূপে বুঝিতে পারিল যে, সংবাদদাতা ঠিকই অনুমান করিয়াছে। কিন্তু শত উষ্ট্রের মূল্যবান পুরস্কার আর মোহাম্মদ হত্যার অক্ষয় যশ সে একাই লাভ করিবে, ইহাই ছোরাকার দৃঢ় সংকল্প। কাজেই সে চাতুরী করিয়া বলিল—না না, মোহাম্মদ বা তাহার সহচরবৃন্দ নহে, আমি বিশেষরূপে জানি। অমুক অমুক লোক তাহাদের পলায়িত পশুর সন্ধানে বহির্গত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে দেখিয়াছি। ছোরাকা এমনভাবে এই কথাগুলি বলিল যে, তাহার কথার সত্যতায় আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। কাজেই কেহ সেই যাত্রীদলের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল না। শত্রু-সঙ্কল্পের ভীষণতা দর্শনে আমরা অনেক সময় বিচলিত হইয়া পড়ি, কিন্তু ন্যায় ও সত্যের সাধক যিনি, তাঁহার জন্য ঐ সকল ভীষণতার বিভীষিকাই যে স্বর্গের মঙ্গল আশীর্বাদরূপে পরিণত হয়, ছোরাকার সঙ্কল্প তাহার প্রমাণ। ছোরাকার দৃঢ় পণ—ভীষণ সঙ্কল্প, সে স্বয়ং ও একাকী 'মোহাম্মদের মুণ্ডপাত' করিবে, একাই যশ ও পুরস্কার লাভ করিবে, তাই আজ সে স্বগোত্রীয়দিগের নিকট সত্য গোপন করিল। নচেৎ আজ ছোরাকার সঙ্গে সঙ্গে আরও কত দুর্ধর্ষ আরব শাণিত কৃপাণ, বিষাক্ত খড়্গ ও অসংখ্য ধনুর্বাণ লইয়া, এই নিরস্ত্র, নিঃসম্বল যাত্রীদের উপর আপতিত হইত। ইহা কম মো'জেজা নহে।

ছোরাকা অল্পক্ষণ সেই সভাক্ষেত্রে উপবেশন করিয়া, ধীর পদবিক্ষেপে তথা হইতে বাটী আসিল, নানাবিধ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গৃহের পশ্চাৎদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, এবং দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাকে সমুদ্র উপকূলের দিকে তীরবেগে ছুটাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে এই আততায়ী আরব ছওয়ার, তাহার সমস্ত মারণ-অস্ত্র, তাহার সমস্ত ভীষণ সঙ্কল্প বহন করিয়া মদীনা যাত্রীদিগের নিকটবর্তী হইল। মরুভূমির পর্বত-প্রান্তর, বালুকাস্তূপ ও বৃহৎ শিলাখণ্ডে পরিপূর্ণ এই সকল অধিত্যকা পথে অতি সাবধানে অশ্ব চালনা না করিতে পারিলেই বিপদ। কিন্তু ছোরাকার আর বিলম্ব সহিতেছে না। সে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিতেছে, উপযুক্ত স্থানে উপনীত হইয়া একটি শর নিক্ষেপ করিতে পারিলেই তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধি হইতে পারিবে। এই উত্তেজনা ও একাগ্রতার মধ্যে ছোরাকার অশ্ব তীরবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। অসতর্কতার ফলে, ঠিক এই সময়, ছোরাকার অশ্ব একটি প্রস্তর খণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূপতিত হইতে হইতে বাঁচিয়া গেল। কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে জর্জরিত ছোরাকার মনে

একটা খটকা জাগিয়া উঠিল। সে তখন, আরবের প্রচলিত প্রথানুসারে, তীর বাহির করিয়া বর্তমান যাত্রার ফলাফল দেখিতে লাগিল। সে তাহাকে সঙ্কল্পে কৃতকার্য হইতে পারিবে কি-না, ইহাই তাহার গণনার বিষয় ছিল। গণনা ফলে 'না' বাহির হইল। ছোরাকা দুর্ধর্ষ আরব—মহাশক্তিশালী বীর—নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক শক্তিশূন্য, তাহার হৃদয় দুর্বল, কারণ, অন্ধ-বিশ্বাসের মারাত্মক জীবাণুগুলি তাহার প্রকৃত শক্তিকে খাইয়া ফেলিয়াছে। কাজেই গণনা ফলে 'না' দেখিয়া ছোরাকা কতকটা বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কিন্তু অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে গণনা ফলকে অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইল। ছোরাকা হয়ত মনে করিল, সম্ভবতঃ গণনারই ভুল হইয়াছে।

ছোরাকা বলিতেছেঃ 'আমি আবার অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলাম, অশ্ব ধাবিত করিয়া তাঁহাদের নিকটবর্তী হইলাম। আবু-বাকর তখন সতর্কতার সহিত চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। কিন্তু হযরত ধীর স্থিরভাবে কোরআনের পবিত্র আয়তগুলি তেলাওৎ করিতেছেন। তিনি একবারও মাথা তুলিয়া কোন দিকে দেখিতেছেন না। যাহা হউক, ছোরাকা তখন দিক-বিদিক না দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

লম্ফন, কুর্দনপূর্বক অধিত্যকা পথের বাধাবিঘ্নগুলি উল্লঙ্ঘন করিতে করিতে ছোরাকার অশ্ব আবার তীরবেগে ছুটিল। কিন্তু এই উত্তেজনা ও অসতর্কতার ফলে অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে, অশ্বের সম্মুখের পদদ্বয় ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল। ছোরাকার অশ্ব তখন উদ্ধারের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার পদাঘাতে ধূলিপুঞ্জ উত্থিত হইয়া, ধোঁয়ার ন্যায় স্থানটিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। ছোরাকা বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়া গেল। তখন প্রথম গণনা ফলের কথা তাহার মনে জাগরিত হইয়া উঠিল। সে আবার খুব সতর্কতার সহিত গণনার তীর বাহির করিয়া নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসারে ফলাফল দেখিবার চেষ্টা করিল। এবারও গণনা ফল 'না' বাহির হইল। অশ্বের দুরবস্থার পর দ্বিতীয় গণনার এই অপ্রীতিকর ফল দর্শনে ছোরাকার অন্ধ বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় একেবারে দমিত হইয়া গেল। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র উপর আত্মনির্ভর ও অটুট বিশ্বাস, এবং মোস্তফা-চিত্তের অপূর্ব দৃঢ়তা ও অবিচলিত ভাব দর্শনে ছোরাকা যুগপৎভাবে ভয়ে ও আশ্চর্যে বিহ্বল হইয়া পড়িল। ছোরাকা নিজেই বলিতেছেন—'তখনকার অবস্থা দর্শনে আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, মোহাম্মদ নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবেন।' যাহা হউক, ছোরাকা তখন ভীতচকিত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—'হে মক্কার ছওয়ারগণ! একটু দাঁড়াও, আমি ছোরাকা, আমার কিছু কথা আছে, কোন অনিষ্টের ভয় নাই।'* তখন ছোরাকা হযরতের নিকটবর্তী হইয়া কোরেশের ঘোষণা ও স্বীয় সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করিল, এবং নিজের উষ্ট্র, খাদ্যসম্ভার ও অস্ত্রশস্ত্রাদি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। হযরত বলিলেন, এই সকলের কোন আবশ্যক আমাদিগের নাই, তুমি আমাদের সন্ধান কাহাকেও না বলিয়া দিলেই আমরা উপকৃত হইব। তখন ছোরাকা প্রার্থনা করিল, আমার জন্য একটা পরওয়ানা লিখিয়া দিন, আবশ্যক হইলে আমি তাহা প্রদর্শন করিয়া উপকৃত হইতে পারিব। তখন হযরতের আদেশ মতে আমের একখণ্ড চামড়ার উপর ঐরূপ পরওয়ানা লিখিয়া দিলেন। অতঃপর ছোরাকা ফিরিয়া আসিল, এবং যাত্রীদল মদীনার পথে প্রস্থান করিলেন।

জোবের এবন-আওয়াম এবং আরও কতিপয় ছাহাবা বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিরিয়া প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, পথে হযরতের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ ঘটিল। জোবের এই সময় হযরত ও আবু-বাকরের ব্যবহারের জন্য কয়েক খণ্ড শ্বেত বস্ত্র নজর উপস্থিত করিলে, তাঁহারা উভয়ে তাহা পরিধান করেন।**

* এইটুকু হাদীছের অংশ নহে, ইতিহাস হইতে গৃহীত।

** বোখারী ১৫—৪৭৩, ৭৪ পৃষ্ঠা, এবং মেস্তফ্লোব প্রভৃতি।

হিজরত সংক্রান্ত ঘটনার এই অংশের বর্ণনায় আমাদের ইতিহাসকারগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভ্রম-প্রমাদের বশবর্তী হইয়া পড়িয়াছেন, এবং তাহার মধ্যকার কয়েকটা ভ্রমের দ্বারা পরম ন্যায়নিষ্ঠ খৃষ্টান লেখকগণ নিজের মহৎ অভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই আমাদিগকেও এ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিতে হইল।

হিজরত সংক্রান্ত বিবরণগুলি, ইতিহাস ও হাদীছ গ্রন্থসমূহে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদিগের প্রমুখাৎ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছের বিশুদ্ধতম গ্রন্থ বোখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বয়ং আবু-বাকর ও ছোরাকা প্রভৃতি কর্তৃক ইহার ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ঘটনার রেওয়ায়ৎ করা হইয়াছে। কাজেই রেওয়ায়তের হিসাবে এই সকল বিবরণ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে মতলব সিদ্ধি হইবে না দেখিয়া, কতিপয় চতুর খৃষ্টান লেখক ইতিহাস-দর্শনের দোহাই দিয়া এবং বিবরণগুলির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোচনা করিয়া, সেগুলিকে অবিশ্বাস্য—অন্ততঃ সন্দেহজনক—বলিয়া সপ্রমাণ করার নিমিত্ত প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছোরাকার অশ্বের পদাঘাতে ভূগর্ভ হইতে ধূম্রপুঞ্জ নির্গত হইয়াছিল। ইহা অস্বাভাবিক, সুতরাং মিথ্যা কথা; এই প্রকার মিথ্যার সংস্রবে বিবরণটিই সন্দেহস্থলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পাঠকগণ বোখারীর হাদীছে স্বয়ং ছোরাকার মুখে অবগত হইয়াছেন যে, তাহার অশ্বের পদাঘাতে ধূলিপুঞ্জ উত্থিত হইয়া 'ধূম্রবৎ' প্রতীয়মান হইতেছিল। সুতরাং সমালোচকগণ বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি গ্রন্থের বিশুদ্ধ হাদীছগুলিকে কোনমতেই দুর্বল করিতে পারিতেছেন না। পরবর্তী অসতর্ক ও অস্বাভাবিকতাপ্রিয় লেখকগণের পক্ষে 'ধূম্রবৎ ধূলিপুঞ্জ'কে ধূম্রপুঞ্জে পরিণত করিয়া ফেলা কিছুই বিচিত্র নহে, কিন্তু ইহাদের এই অতিরঞ্জনে মূল বিবরণের সত্যতার কোনই বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে না।

কোন কোন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, গুহায় অবস্থানকালে আবু-বাকরের পুত্র আবদুর রহমান মক্কার সমস্ত সংবাদ দিয়া যাইতেন। ইহাতেও সংশয় উপস্থিত করা হইয়াছে। কারণ আবদুর রহমান দীর্ঘকাল যাবৎ এছলাম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া জানা যাইতেছে।* এমন কি তিনি বদর যুদ্ধে কাফেরগণের সহিত যোগদান করেন, এবং আবু-বাকর শাণিত তরবারী লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের উল্লিখিত বোখারীর হাদীছে আবদুর রহমান স্থলে আবদুল্লাহর উল্লেখ আছে। ইমাম এবনে হাজর বলিতেছেন—আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করা রাবীর ভ্রম মাত্র।** সুতরাং সহজেই ঐ সংশয়ের অপনোদন হইয়া যাইতেছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক, এমন কি আধুনিক লেখকগণ*** গুহায় অবস্থানকাল এবং তথা হইতে যাত্রার সময় নির্ণয় প্রসঙ্গে নানাবিধ ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু হাদীছে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ও আবু-বাকর তিন রাত্রি গুহায় অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং দুই দিবস ও তিন রজনী গুহায় অবস্থান করার পর তৃতীয় দিবসের প্রত্যুষে যে তাঁহারা মদীনাভিমুখে যাত্রা করেন, ইহা স্পষ্টতঃই জানা যাইতেছে।

নানাবিধ গুরুগম্ভীর শব্দে ইতিহাস-দর্শনের দোহাই দিয়া আর একটা সংশয় উপস্থিত করা হইয়াছে, গুহা হইতে যাত্রার প্রথম দিবসে, আবু-বাকর যে রাখালের ছাগী দোহন করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আবু-বাকরের প্রশ্নের উত্তরে সে যেরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহাতে সে একবার নিজেকে মক্কার অধিবাসী এবং পুনরায় মদীনার অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। অতএব এইরূপ অসংলগ্ন কথা যে-হাদীছে আছে, তাহাতে কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা

---

* এছাবা। ** ফৎহুলবারী ১৫—৪৭২।

*** মাওলানা শিবলী, মিঃ আমীর আলী, কাজী ছোলায়মান প্রভৃতি।

যায় ? এই সংশয়ের উত্তরে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এখানে মক্কা ও মদীনা একই অর্থ-বাচক। মদীনা অর্থে নগর আর মক্কা নগরের নাম। এখন মদীনা বলিলে যে নগর-বিশেষকে বুঝায়, হিজরতের প্রাক্কাল পর্যন্ত তাহার নাম ছিল—ইয়াছরাব। হযরত ইয়াছরাবে শুভাগমন করার পর, স্থানীয় লোকেরা উহাকে মদীনাতুর-রছুল বা রছুল নগর বলিয়া উল্লেখ করিতে থাকেন। শেষে তাহার কেবল মদীনা নামটি থাকিয়া যায়। ফলতঃ রাখালের উক্তির সময় বর্তমান মদীনার মদীনা নামই হয় নাই। মক্কার নিকটবর্তী চারণক্ষেত্রের রাখাল যখন বলিতেছে, আমি মদীনার লোক, তখন তাহার স্পষ্ট এবং একমাত্র অর্থ যে, আমি নগরের অর্থাৎ মক্কার অধিবাসী। আমাদের এক শ্রেণীর লোক, অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য কি প্রকার যুক্তি-প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, বর্ণিত উদাহরণ কয়টির দ্বারা তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

## উম্মে-মা'বদের আশ্রম

হযরত ও তাঁহার সঙ্গিগণ যে পথ ধরিয়া মদীনায় যাইতেছিলেন, সেই পথে উম্মে-মা'বদ ও তাঁহার স্বামী আবু-মা'বদের আশ্রম কুটির অবস্থিত ছিল। এই পুণ্যাত্মা দম্পতিযুগল শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিকদিগকে আশ্রয় দিতেন—খাদ্য ও পানীয় যোগাইয়া বুভুক্ষু ও তৃষ্ণাতুর অতিথিগণের সেবা করিতেন। হযরত যখন তাঁহাদের আশ্রমে উপনীত হইলেন, তখন স্বামী আবু-মা'বদ মেষপাল চরাইবার জন্য আশ্রম হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছেন। যাত্রিদল আশ্রমের নিকট অবতরণ করিয়া উম্মে-মা'বদের নিকট সন্ধান লইলেন—সেখানে কোন প্রকার খাদ্য বা পানীয় ক্রয় করিবার সুযোগ হইতে পারে কি-না ? পথিকদিগের কথা শুনিয়া উম্মে-মা'বদ বিনম্রভাবে উত্তর করিলেন—না মহাশয় ! থাকিলে মূল্য দিতে হইত না, আমি নিজেই তাহা উপস্থিত করিতাম। আশ্রমের এক প্রান্তে একটি ছাগী শুইয়াছিল, হযরত উম্মে-মা'বদকে বলিলেন উহাকে দোহন করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করা যাইতে পারে কি ? উম্মে মা'বদ উত্তর করিলেন, ছাগটি কৃশ বলিয়া পালের সহিত চরিতে যায় নাই। যদি উহার স্তনে দুগ্ধ থাকে, তবে তাহা আপনি দোহন করিয়া লইতে পারেন। হযরত 'বিছমিল্লাহ্' বলিয়া, তাহাকে দোহন করিলেন। সম্ভবতঃ কৃশ মনে করিয়া অনেক দিন তাহাকে দোহন করা হয় নাই, তাহার স্তনে কয়েক দিনের যে দুগ্ধ সঞ্চিত ছিল, তাহা পথিকগণের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর হইল না। দুগ্ধের সহিত পানি মিশ্রিত করিয়া পান করার নিয়ম আরবে প্রচলিত ছিল। সুতরাং হযরত ও তাঁহার সঙ্গীরা কতকটা দুগ্ধ পান করিয়া তাহার একাংশ আশ্রম স্বামিনীর জন্য রাখিয়া দিয়া সকলে আবার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হযরতের যাত্রার অল্পক্ষণ পরে আবু মা'বদ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং পাত্রে দুগ্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—দুগ্ধ কোথা হইতে আসিল ? উম্মে-মা'বদ তখন পথিকগণের আগমনবার্তা ও ছাগ দোহনের কথা স্বামীকে জানাইলেন। আবু-মা'বদের আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি স্ত্রীর নিকট হযরতের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহিলে, উম্মে-মা'বদ পার্বত্য আরবের স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় যে সকল শব্দের দ্বারা হযরতের রূপগুণের বর্ণনা করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষায় তাহার যথাযথ অনুবাদ করা সম্ভবপর না হইলেও, নিম্নে পাঠকগণকে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

## হযরতের রূপগুণ বর্ণনা

উম্মে-মা'বদ বলিতেছেন : তাঁহার উজ্জ্বল বদনকান্তি, প্রফুল্ল মুখশ্রী, প্রকৃতি ভদ্র ও নম্র ব্যবহার। তাঁহার উদরে স্ফীতি নাই, মস্তকে খালিত্য নাই। সুন্দর সুদর্শন ; বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ। নয়নযুগল কৃষ্ণ, কেশকলাপ দীর্ঘ ঘনসন্নিবেশিত। তাঁহার স্বর গম্ভীর, গ্রীবা উচ্চ, নয়নদ্বয়ে যেন প্রকৃতি নিজেই কাজল দিয়া রাখিয়াছে, চক্ষুর শুভ্রাংশ দুইটি খুব উজ্জ্বল, ঢল-ঢল। ভ্রুযুগল অতিসূক্ষ্ম, পরস্পর সংযোজিত, সুকুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ কেশদাম। মৌনাবলম্বন করিলে, তাঁহার

বদনমণ্ডল হইতে গুরুগম্ভীর ভাবের অভিব্যক্তি হইতে থাকে, আবার কথা বলিলে মনপ্রাণ মোহিত হইয়া যায়। দূর হইতে দেখিলে কেমন মোহন কেমন মনোমুগ্ধকর সে রূপরাশি, নিকটে আসিলে কত মধুর কত সুন্দর তাঁহার প্রকৃতি, ভাষা অতি মিষ্ট ও প্রাঞ্জল, তাহাতে ত্রুটি নাই অতিরিক্ততা নাই, বাক্যগুলি যেন মুক্তার হার। তাঁহার দেহ এত খর্ব নহে—যাহা দর্শনে ক্ষুদ্রত্বের ভাব মনে আসে, বা এমন দীর্ঘ নহে—নয়ন যাহা দেখিতে বিরক্তি বোধ করে, তাহা নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব। পুষ্টি ও পুলকে সে দেহ যেন পুষ্পকুসুমিত নবপল্লবিত নবীন প্রশাখা। সে মুখশ্রী বড় সুন্দর, বড় সুদর্শন ও সুমহান। তাঁহার সঙ্গীরা সর্বদাই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। তাহারা তাঁহার কথা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে, এবং তাঁহার আদেশ উৎফুল্ল চিত্তে পালন করে।" স্ত্রীর মুখে এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আবু-মা'বদ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—আল্লাহর কিরা, ইনি কোরেশের সেই ব্যক্তি, ইঁহারই সম্বন্ধে আমরা কত সত্য মিথ্যা সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। আমার দুরদৃষ্ট, এমন সময় আমি অনুপস্থিত ছিলাম, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই তাঁহার শরণ লইতাম, সুযোগ পাইলে এখনও তাহার চেষ্টা করিব।*

## দস্যুদলের আক্রমণ

হযরত মদীনায় হিজরত করিলেন, ইহা কোরেশদিগের বিশেষরূপে জানা ছিল। তাই তাহারা মদীনা গমনের পক্ষে পথের উভয়পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রগুলির মধ্যে নিজেদের সংকল্প ও মূল্যবান পুরস্কারের কথা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল—উপরে সোরাকার স্বীকারোক্তিতে আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। এই ঘোষণামতে আস্‌লাম বংশের বারিদা নামক জনৈক প্রধান, ৭০ জন দুর্ধর্ষ আরবকে লইয়া হযরতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মদীনার উপকণ্ঠ আর অধিক দূর নাই, এমন সময় এই ক্ষুদ্র যাত্রীদলের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। পাঠক, একবার অবস্থাটা চিন্তা করিয়া দেখুন। ৭০ জন দুর্ধর্ষ আরব দস্যু, সকলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। লুণ্ঠন ব্যবসায়ী পশুপ্রকৃতির এই দুর্ধর্ষ দস্যুদল যুগপৎভাবে বিদ্বেষ ও প্রলোভনে উত্তেজিত, উৎসাহিত। কা'বার অবমাননাকারী, লাৎ-ওজ্জা হোবল প্রভৃতি দেব—দেবীগণের শত্রু মোহাম্মদের মুণ্ডপাত করার ন্যায় পুণ্যকর্ম আর কি হইতে পারে! তাহার উপর মোহাম্মদ ও তাঁহার সহচরের প্রত্যেকের মুণ্ডের বিনিময়ে শত উষ্ট্রের মহামূল্য পুরস্কার। এ অবস্থায়, হযরতের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাহাদের দেহের প্রত্যেক তন্ত্রে শত শয়তানের বীভৎস তাণ্ডব জাগিয়া উঠিল—হিংসায় চক্ষে ঝলকে ঝলকে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল।

এদিকে নিরস্ত্র এবং অর্ধনগ্নপ্রায় অবস্থায় হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা এবং তাঁহার নিরীহ সহচর আবু-বকর সিদ্দিক। একাকী—অসহায়। মানুষের কল্পনায় এবার হযরতের রক্ষাপ্রাপ্তির কোন উপায়ই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এহেন ঘোরতর বিপদের সময়ও মোস্তফা-বদনে সেই সদানন্দ, সদা-প্রশান্ত সদা-উৎফুল্ল অথচ সদা-গম্ভীর স্বর্গীয় ভাবের কোনই বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে না। এই আসন্ন মৃত্যুর ভয়াবহ বীভৎসতাও একটু চাঞ্চল্য বা অধৈর্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। হযরত জানিতেন বুঝিতেন এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি সত্যের সেবায় আল্লাহর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। নীরব-নিস্তব্ধ আত্মনিবেদন, কেবল কর্তব্যের কল্যাণময় কর্মক্ষেত্র—সেবার স্বর্গীয় সাধনাশ্রম তিনি আল্লাহ বিনা ভাবনায় নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করাই তাঁহার জীবনব্রতের একমাত্র কর্তব্য। তাহাকে রক্ষা করার ভার তাঁহার, সমস্ত ভাবনা একমাত্র তাঁহার রহিয়াছে। বিশ্বাসের এই যে তেজ, ঈমানের এই যে শক্তি, আত্মনির্ভরের এই যে স্বর্গীয় ভাব—ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর অভিজ্ঞান ও মহত্ত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে?

---

* হেশাম ২, ৩—১০২, ০৩ পৃষ্ঠা; জাদুল-মাআদ ১—৩০৫ পৃষ্ঠা; মাওয়াহেব, এসাবা ৪র্থ প্রভৃতি।

হযরত তখন নিবিষ্ট মনে, তন্ময়-তদগতভাবে কোরআন পাঠ করিতেছিলেন। সে পবিত্র স্বরলহরী মধুরে গম্ভীরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া পার্শ্ববর্তী পর্বতমালার রোমাঞ্চ জাগাইয়া তুলিতেছিল। এই সময় দস্যুদলপতি বারিদা ও তাহার সঙ্গিগণ হুঙ্কার দিয়া অগ্রসর হইল। তাহারা দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, ক্রমশঃই কোরআনের মনোমোহন বাণী এবং হযরতের সুমধুর কণ্ঠস্বর তাহাদের কর্ণকুহরে স্পষ্টতর স্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে সুর মর্ম হইতে উঠিয়াছিল, কাজেই তাহা শ্রোতাদিগের মর্মে স্থান গ্রহণ করিল। দস্যুদলপতি বারিদার চরণদ্বয় যেন ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, তাহার বাহুযুগল শিথিল হইয়া পড়িল। এই সময় হযরত তাঁহার সেই স্বাভাবিক মধুর-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আগন্তুক ! তুমি কে ? কি চাও ?'

'আমি বারিদা, আছলাম গোত্রপতি।'

'আছলাম—শান্তি, শুভ কথা।'

—'আর আপনি কে ?'

'আমি মক্কার অধিবাসী, আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ—সত্যের সেবক, আল্লাহর রছুল।'

## দস্যুদলের এছলাম গ্রহণ

হযরত বারিদার মুখের দিকে তাকাইলেন, প্রেম-পুণ্যে উদ্ভাসিত, স্বর্গীয় তেজপুঞ্জে দীপ্তদৃপ্ত সে মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া বারিদা আত্মহারা হইল—সে অবিলম্বে বসিয়া পড়িল, তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে বর্শাদণ্ড খসিয়া পড়িল। সঙ্গীদিগেরও এইরূপ আত্মহারা মাতওয়ারা অবস্থা। কোরআনের মহীয়সী বাণী, হযরতের মোহন কণ্ঠস্বর এবং সর্বোপরি মোস্তফা চিত্তের দৃঢ় অবিচঞ্চল ভাব, তাঁহার প্রাণের বল ও বিশ্বাসের তেজ এবং সত্যের পুণ্যপুলক উদ্ভাসিত বদনমণ্ডলের সেই স্বর্গীয় দীপ্তিপ্রভাবে, বারিদা দমিয়া নমিয়া, সেই ভক্তভয় নিসূদন, পতিতগণ তারণ, হাশর ভয়বারণ মোস্তফা চরণে লুটাইয়া পড়িল, সহচরগণও তাহার অনুসরণ করিল।

হযরত উপদেশ দিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছেন—তখন বারিদার চেতনা হইল। তখন তিনি ভক্তিগদগদ কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—'প্রভু হে ! নিজ গুণে একবার যে চরণে শরণ দিয়াছ, তাহা হইতে আর বঞ্চিত করিও না।' এই বলিয়া সঙ্গীদিগকে লইয়া বারিদা মহা উৎসাহে হযরতের অগ্রবর্তী হইলেন। বারিদার মূল্যবান আমামা তখন তাঁহার বর্শাফলকে এছলামের জয়পতাকারূপে উড্ডীন হইতেছে। ৭০ খানা খরসান উলঙ্গ কৃপাণ—৭০ খানা দীর্ঘ বর্শাফলক, সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। আর নিজের সেই শ্বেত পতাকাকে বার বার আন্দোলিত করিয়া, বারিদা ঘোষণা করিতে করিতে চলিলেন ঃ

শান্তির রাজা আসিতেছেন—
মুক্তির কর্তা আসিতেছেন—
সন্ধির স্থাপয়িতা আসিতেছেন—
ন্যায় ও বিচারে পৃথিবীতে
স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আসিতেছেন—
জগদ্বাসীর নিকট এই আনন্দ সংবাদ *

---

* যাদোল মায়াদ ২—২১, ৫০ এছাবা, মাদারেজ ২, হেশাম—আজ্জা-উল-আজম ১—১৭৩ বারিদা পথ হইতে ফিরিয়া যান; বদর সমরের পর তিনি মদিনায় উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য যে, এই সময় পর্যন্ত তিনি স্বগোত্রে এছলাম প্রচারে রত ছিলেন।

# সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

## মদীনা প্রবেশ

## اشرق البدر علينا من ثنيات الوداع

## কোবা পল্লীতে শুভাগমন

হযরত মক্কা হইতে মদীনা যাত্রা করিয়াছেন, মদীনাবাসী মুছলমানগণ যথাসময়ে এ সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং শহর ও শহরতলীর জনসাধারণের বিশেষতঃ মুছলমানদিগের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। মদীনার মুছলমানগণ প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া নগর-প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং সূর্য কিরণ প্রখর না হওয়া পর্যন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেলিত চিত্তে সেখানে হযরতের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। যে দিন হযরত মদীনায় শুভাগমন করিবেন, সে দিনও তাঁহারা যথানিয়মে অপেক্ষা করার পর, দ্বিপ্রহরের সময় নগরে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের অল্পক্ষণ পরেই, হযরত ও তাঁহার সহচরবৃন্দ মদীনার উপরিভাগের (Upper Madina) কোবা নামক পল্লীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনৈক ইহুদী দুর্গ-প্রাচীর হইতে দেখিতে পাইল—উজ্জ্বল, শুভ্রবসন পরিহিত একদল পথিক শহরতলীর নিকটবর্তী হইতেছেন। আগন্তুক কাহারা, তাহা আর তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। সে সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—হে আরবীগণ! অগ্রসর হও, ঐ দেখ তোমাদের সেই "ধনী" আসিতেছেন।*

ইহুদীর চীৎকার শতকণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া নগরময় আনন্দ ও উৎসাহের মহা কোলাহল জাগাইয়া তুলিল। মুছলমানগণ হযরতের অভ্যর্থনার জন্য ছুটাছুটি করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিতে লাগিলেন। বানি আমের-এবন-আওফ গোত্র নগর প্রবেশের পথপার্শে অবস্থান করিতেন, বহু প্রবাসী মুছলমান তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া হযরতের অপেক্ষা করিতেছিলেন। বহু প্রত্যক্ষদর্শী রাবী বলিতেছেন—হযরতের শুভাগমন বার্তা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বানি-আমের গোত্রের পল্লী হইতে ঘন ঘন আনন্দরোল উত্থিত হইতে লাগিল, মুহুর্মুহু আল্লাহু আকবর নিনাদে পল্লীপ্রান্তর কাঁপিয়া উঠিল

প্রথম রবী মাসের ৮ই তারিখ** ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় হযরত কোবা প্রান্তরে উপনীত হইলেন। অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভক্তগণ দলে দলে হযরতের সন্নিধানে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণ ও আগন্তুকগণের সহিত স্থিরভাবে কুশলবাদ করার জন্য, হযরত সেখান হইতে একটু দক্ষিণে সরিয়া গিয়া একটি খেজুর গাছের ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। হযরত মৌনভাবে বসিয়া আছেন, আর আবু-বাকর তাঁহার পার্শদেশে দাঁড়াইয়া। হযরতের পোশাক-পরিচ্ছদে কোন জাঁকজমক নাই, ভক্ত আবু-বাকর এবং প্রভু মোহাম্মদ মোস্তফা—উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদে এতটুকু পার্থক্যও ছিল না, যাহা দেখিয়া সাধারণ লোকে সহজে হযরতকে চিনিতে পারিত। এমন কি মদীনার অনেক মুছলমান—যাহারা পূর্বে হযরতকে দেখেন নাই—আবু-বাকরকে হযরত মনে করিয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এই সময় ছায়া সরিয়া যাওয়ায় হযরতের মুখে রৌদ্র লাগিতে লাগিল। আবু বাকর এই সুযোগে আপনার বস্ত্রাঞ্চল দিয়া হযরতের মাথার উপর ছায়া করিয়া দাঁড়াইলেন। ছায়া করাও হইল, আর কে দাস কে প্রভু, এই সুযোগে তাহারও পরিচয় দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম এবং পরস্পর কুশলবাদ ও সাদর-সম্ভাষণের পর, হযরত ও আবু-বাকর, ভক্তগণের সহিত মদীনার কোবা নামক পল্লীতে, বানি-আমের বংশের কুলছুম এবনে-হেদমের বাটীতে উপনীত হইলেন।

---

* মোখারী ** বার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। দেখুন—তাবরী, মুছা খাওয়ারজমী প্রভৃতি

## আলীর আগমন ও মছজিদ নির্মাণ

হযরত কোবা পল্লীতে ১৪ দিন অবস্থান করেন* এবং এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় মুছলমানদিগের সাহচর্যে সেখানে একটি মছজিদ নির্মাণ করিয়া লেন। কোরআন শরীফে এই মছজিদের ও কোবাবাসী মুছলমানগণের প্রশংসামূলক আয়ৎ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মছজিদই এছলামের প্রথম এবাদতগাহ।** হযরতের মদীনা যাত্রার পর মহাত্মা হযরত আলী কোরেশগণ কর্তৃক কিরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাস্থানে দেখিয়াছি। আলী অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করার পর, হযরতের নিকট গচ্ছিত টাকা-কড়ি ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি মালিকগণকে ফেরত দিয়া অবিলম্বে মক্কা হইতে পলায়ন করিলেন। আলী ধৃত বা নিহত হওয়ার ভয়ে, দিবাভাগে কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকিতেন, রাত্রিকালে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে পথ পর্যটন করিতেন। এইরূপে কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি কোবা পল্লীতে হযরতের সহিত মিলিত হইলেন। রজনীযোগে পদব্রজে দ্রুত পথ পর্যটনের ফলে, আলীর পদদ্বয় এমন জর্জ্জরিত ও ক্লেশাক্রান্ত হইয়া পড়ে যে, প্রথমে কিছু সময় তিনি একেবারে উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়েন।

কোবায় মছজিদ নির্মাণ আরম্ভ হইলে, হযরত অন্যান্য মুছলমানদিগের সহিত যোগ দিয়া সমানভাবে মজুরের কাজ করিয়াছিলেন। গুরুভার প্রস্তর উত্তোলন করিতে এক-একবার তাঁহার শরীর নমিয়া পড়িতেছিল। কোন ভক্তের নজর পড়িলে, তিনি ছুটিয়া আসিয়া বলিতেছিলেন— প্রভু হে ! আপনি ক্ষান্ত হউন, আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হউন, আমরা লইয়া যাইতেছি। হযরত সহাস্য বদনে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা পাথর তুলিয়া মছজিদের ভিত্তিমূলে উপস্থিত করিতেন। এই রূপে ইহ-পরকালের প্রভু আমার নিজের মাথায় পাথর বহিয়া, কোবা মছজিদের—না, না, এছলামের অতুলনীয় সাম্য ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

## নবীর ছুন্নত

'মোস্তফা-চরিতের' অনুশীলন-প্রয়াসী পাঠক-পাঠিকাগণ ! এখানে মুহূর্তেকের জন্য অপেক্ষা করুন। হযরতের মদীনা যাত্রা হইতে মছজিদ নির্মাণের সময় পর্যন্ত, যে সকল ঘটনার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলিকে একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করুন। 'আল্লাহর উপর ভরসা, তিনি যাহা করিবেন তাহা হইবে। তাঁহার মর্জি হইলে সকলেই হেদায়ত পাইবে। হেদায়ত দেনেওয়ালা আর গোমরাহ্ করনেওয়ালা একমাত্র 'তিনি'—এহেন অনৈছলামিক ও নিকৃষ্ট অদৃষ্টবাদ বা তকদিরের নামে আত্মবঞ্চনা হযরত কখনই করেন নাই। কোরেশ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে এছলামের ও মোছলেম জাতীয়তার মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ-সময় 'তাওয়াক্কুলের' নামে আত্মপ্রবঞ্চনা, কাপুরুষের ন্যায় কর্মবিমুখতার এহেন নীচ কৈফিয়ত—হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা কখনই প্রদান করেন নাই। 'বিশ্বাস ও কর্ম' এই দু'য়ের যৌগপত্তিক সমবায়ের নামই ঈমান, ইহাই তাঁহার শিক্ষা। তাই তিনি এছলাম ও মোছলেম জাতীয়তার রক্ষা ও উন্নতি সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। পক্ষান্তরে নিজের যথাসাধ্য কর্তব্য পালনের পর কৃতকার্যতা ও সাফল্যের জন্য আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। ان الله لا يضيع اجر المحسنين। আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগের কর্মফলকে ব্যর্থ করেন না।*** একদিকে দৃঢ়তার সহিত এই বিশ্বাস, অন্যদিকে কর্মফল সম্বন্ধে চাঞ্চল্যহীন ধীরতা। একদিকে গোপনে বক্রপথে মদীনা যাত্রা, কত সতর্কতা, কত সাবধানতা,—অন্যদিকে আততায়ীগণের শত শাণিত কৃপাণ ছায়ায় 'ভয় নাই, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন'***

---

* বোখারী ঐ, ৫৮৩। ** আবু-দাউদ, ফৎহুলবারী। *** কোরআন—তাওবা, হুদ।

বলিয়া চাঞ্চল্যহীন বিশ্রাম। জগতের কোন দর্শনে, কোন বিজ্ঞানে তুমি এ পুণ্য আদর্শ দেখিতে পাইবে না। এছলামের 'তকদির' নাস্তিকের জড়বাদ নহে, কর্মবিমুখ কাপুরুষের অদৃষ্টবাদও নহে—উহা বিশ্বাস ও কর্মের এবং নির্ভর ও সাধনার অতি সরল অতি স্বাভাবিক এবং অতি দার্শনিক সমষ্টি। মোছলেম জাতীয় জীবনের একমাত্র উন্মেষ—হযরতের এই পবিত্র ছুন্নত বা তাঁহার এই মহান আদর্শ হইতে। আবার এই ছুন্নতের অনুসরণ করিলে মুছলমানের ভবিষ্যৎ তাহার অতীতের সহিত সমঞ্জস হইয়া যাইবে। নচেৎ এ পতনের পরিণাম—নিশ্চিত মৃত্যু।

## নেতৃত্বের আদর্শ

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আড়ম্বরহীন জীবনের পুণ্য আদর্শটিও আজ আমাদের পক্ষে বিশেষরূপে অনুকরণীয়। হযরতের পোশাক-পরিচ্ছদে এতটুকু আড়ম্বর ও বিশেষত্ব ছিল না, যাহা দেখিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারিত। সেই নবীর নায়েব বলিয়া স্পর্ধাকারী আলেম সমাজ, সেই নবীর চরণসেবক বলিয়া অভিমানী মোছলেম জাতি ! একবার নিজেদের আত্মম্ভরিতা ও আড়ম্বর-প্রিয়তার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ ! আজকাল সাধারণতঃ এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মুছলমান সমাজের সাধারণ স্তরও ক্রমে ক্রমে পোশাক-পরিচ্ছদাদি বাহ্যাড়ম্বরে আসক্ত ও বিলাসী হইয়া পড়িতেছে। এই অভিযোগটি ভিত্তিহীন নহে এবং উহা যে দুঃখজনক তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আলেম সমাজ ও ইংরেজী শিক্ষিতদিগের আড়ম্বরের আদর্শই তাহাদের এই অনিষ্টের, একমাত্র না হইলেও, প্রধানতম কারণ। ভাবিয়া দেখ, পোশাক-পরিচ্ছদের এই আড়ম্বরের অন্তরালে, তোমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে আত্মম্ভরিতা ও বৈশিষ্ট্যলাভের একটা অতি বীভৎসভাব ওতপ্রোতভাবে লুক্কায়িত হইয়া আছে। ঐ ভাবটি অহঙ্কারের আকর। একবার তোমার মনে ঐ ভাবটি আংশিকভাবে স্থানলাভ করিতে পারিলে, তুমি অন্যকে ক্ষুদ্র, হেয় ও ঘৃণিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে। 'মোছলেম মাত্রই পরস্পর পরস্পারের ভাই'—কোরআন-কথিত ঐছলামিক সাম্যবাদের এই মূল নীতিই তাহা হইলে ধ্বংস হইয়া যায়। তাই এত সাবধানতা। এছলাম আসিয়াছে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিতে—উপেক্ষিতকে সম্মানিত করিতে। সুতরাং এছলামের সেবক ও প্রচারক যিনি, তাঁহার সতত এই চেষ্টা হইবে যে, যে ছোট হইয়া আছে—জগৎ যাহাকে ছোট হইয়া থাকিতে শিখাইয়াছে, কোরআন কর্তৃক প্রচারিত সাম্যবাদ ও মানবতার অধিকারের মহামন্ত্র তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া, তিনি তাহাকে বড় করিয়া তুলিবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এহেন মোহাম্মদ মোস্তফার উম্মতই আজ অনর্থক আড়ম্বর ও বাহ্য ভড়কের মোহে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। পাঠকগণ নিজেদের পরিচিত দুইজন সম অবস্থাপন্ন হিন্দু ও মুছলমানের তুলনা করিয়া দেখিলে, উভয়ের প্রভেদটা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিবেন। কলিকাতার রাস্তায় একখানা ধুতি, একটা শার্ট ও একজোড়া চটিজুতা পায় দিয়া বহু ধনীসন্তান ও শিক্ষিত হিন্দু যুবককে প্রফুল্ল চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা অনেক হীন অবস্থাপন্ন—এমন কি পরের সাহায্যে যাহাদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে, সেই সকল—মুছলমান ছাত্রদিগের পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সাধারণতঃ ইংরাজী জুতা, মোজা, গেঞ্জী, শার্ট বা কোর্তা, আচকান ও টুপী তাহার চাই-ই। ইহার প্রকার সম্বন্ধেও ক্রমশঃ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। মুছলমান ছাত্রের একটা ভাল তুর্কী টুপী ক্রয় করিতে যাহা ব্যয় হয়, হিন্দু ছাত্রের ৩ দফা পোশাক খরিদ করিতে তাহাও লাগে না। ইহার উপর যাঁহারা আপ-টু-ডেট মৌলবী বা ফার্স্ট ক্লাস জেন্টেলম্যান—ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের অনেকের অবস্থা অবগত আছি—পোশাক-পরিচ্ছদের স্টাইল দোরস্ত রাখিতে যাইয়া অনেক সময় নাশতার জন্য দুই-চারিটা পয়সা ব্যয় করাও তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহাদিগকে লোকে বড় ও ভদ্র বলিয়া মনে করে, তাঁহারা আদর্শ স্থাপন করিয়া এই রোগের প্রতিকার চেষ্টা করুন।

কোবার মছজিদ নির্মাণকালে হযরত মাথায় করিয়া পাথর বহিতেছেন* যথাস্থানে আমরা ইহা অবগত হইয়াছি। ভবিষ্যতেও আমরা এইরূপ আরও বহু আদর্শ দেখিতে পাইব। মুছলমান সমাজের বর্তমান হাদী ও নেতৃবৃন্দ, একবার বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখুন : 'আমি বলিতেছি—তোমরা কর'—এরূপ নেতার উপদেশ, ওয়াজের মজলিস বা বক্তৃতামঞ্চের বাহিরে কোনই প্রেরণা জাগাইতে পারে না। তাই আজ আমাদের সমস্ত ওয়াজ-নছিহৎ, সমস্ত লেকচার-বক্তৃতা অরণ্যরোদন মাত্রে পরিণত হইতেছে। সমাজের পক্ষে যাহা কর্তব্য, হযরত তাহা বলিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, তিনি নিজে সর্বপ্রথমে সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। খলীফা চতুষ্টয়ের স্বর্ণযুগের অবস্থাও এইরূপ ছিল। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার এই আদর্শকে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন না করিলে, আমাদের নেতৃসমাজের কোন চেষ্টাই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

## এছলামের প্রথম জুমআ

চতুর্দশ দিবস শহরতলী কোবা পল্লীতে অবস্থান করার পর, হযরত তাঁহার মাতৃকুলের আত্মীয়—নাজ্জার বংশের লোকদিগকে সেইদিন তাঁহার মদীনা যাত্রার সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাত করিলেন। এই দুই সপ্তাহ আগ্রহ ও আশঙ্কায় কাটিয়া গিয়াছে, এখন হযরতের আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের আনন্দ ও উৎসাহের আর অবধি রহিল না। বীর জাতির প্রথানুসারে সকলে তরবারি ঝুলাইয়া হযরতের অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইলেন।** নগরের অন্যান্য মুছলমান ও জনসাধারণের মধ্যেও অচিরাৎ এই শুভ সংবাদটি প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল।

সেদিন শুক্রবার*** হযরত মদীনায় যাত্রা করিয়াছেন। অগ্রে-পশ্চাতে এবং দক্ষিণে-বামে ভক্তদল আনন্দে আত্মহারা হইয়া আল্লাহু আকবর নিনাদ করিতে করিতে সঙ্গে চলিয়াছেন। তাঁহারা অধিক দূর যাইতে না যাইতে, বানি-ছালেম গোত্রের পল্লীসন্নিধানে, জুমআর নামাযের সময় উপস্থিত হইল এবং ভক্তগণকে লইয়া হযরত সেখানে জুমআর নামায সম্পন্ন করিলেন। ইহাই এছলামের প্রথম জুমআ বলিয়া ইতিহাস সমূহে কথিত হইয়াছে। এই দিবস নামাযের পূর্বে হযরত যে অভিভাষণ বা খোৎবা দান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্মানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে ঃ

## প্রথম খোৎবা

সকল মহিমা—সমস্ত গরিমা একমাত্র আল্লাহ্‌র। তাঁহারই মহিমা কীর্তন করি, (কর্তব্য পালনের জন্য) তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করি, (কর্তব্য পালনের ত্রুটিহেতু) তাঁহারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি ; এবং সৎপথ চিনিবার শক্তি তাঁহারই নিকট যাচ্ঞা করি। তাঁহাতেই ঈমান আনয়ন করিব। এবং তাঁহার আদেশ অমান্য করিব না, যে তাঁহার প্রতি বিদ্রোহী, তাহাকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিব না।

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও প্রেরিত রছুল। যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত জগৎ রছুলের উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল—যখন জ্ঞান জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, যখন মানবজাতি ভ্রষ্টতা ও অনাচারে জর্জরিত হইতেছিল, তাহাদের মৃত্যু ও কঠোর কর্মফল ভোগের সময় যখন নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছিল—এহেন সময় আল্লাহ্ সেই রছুলকে সত্যের জ্যোতি ও জ্ঞানের আলোক দিয়া জগদ্বাসীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলের অনুগত

---

* হযরত মছজিদ নির্মাণের জন্য মাথায় করিয়া পাথর বহিতেন, আর আজ তাঁহার নায়েবগণের মধ্যে অনেকেই যেন মছজিদে ঝাড়ু দেওয়া (এমন কি আজান-তকবির দেওয়াকেও) নিজেদের গৌরবান্বিত মৌলবী জীবনের পক্ষে হেয়জনক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহা কল্পনা নহে—প্রত্যক্ষ সত্য।

** বোখারী। *** তাবরী।

হইয়া চলিলেই মানব-জীবনের চরম সফলতা লাভ হইবে। পক্ষান্তরে তাঁহাদের অবাধ্য হইলে ভ্রষ্ট, পতিত ও পথহারা হইয়া পড়িতে হইবে।

সকলে নিজ নিজকে এমনভাবে গঠিত ও সংশোধিত করিয়া লও, যেন পাপ ও ঘৃণিত কার্যের প্রবৃত্তিই তোমাদের হৃদয় হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়* ইহাই তোমাদিগের প্রতি আমার চরম উপদেশ। পরকাল চিন্তা ও তাকওয়া অবলম্বন করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপদেশ এক মোছলেম অন্য মোছলেমকে দিতে পারে না। যে সকল দুষ্কর্ম হইতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিরত থাকিতে আদেশ দিয়াছেন—সাবধান, তাহার নিকটেও যাইও না। ইহাই হইতেছে উৎকৃষ্টতম উপদেশ, ইহাই হইতেছে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান।

আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমার যে কর্তব্য আছে, তাঁহার সহিত তোমার যে সম্বন্ধ আছে, তুমি তাহা বিস্মৃত হইও না। সেই সম্বন্ধে যেখানে যে ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, তুমি প্রকাশ্যে ও গোপনে তাহার সংশোধন কর, সে সম্বন্ধকে দৃঢ় ও নিখুঁত করিয়া লও, ইহাই হইতেছে তোমার জীবিতকালের পরম জ্ঞান এবং পরজীবনের চরম সম্বল!

স্মরণ রাখিও, ইহার অন্যথা করিলে, তোমরা কর্মফলের সম্মুখীন হইতে ভীত হইলেও, তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। আল্লাহ্ প্রেমময় ও দয়াময়, তাই এই কর্মফলের অপরিহার্য পরিণামের কথা পূর্ব হইতেই তোমাদিগকে জ্ঞাত করতঃ সতর্ক করিয়া দিতেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের কথাকে সত্যে পরিণত করিবে, কার্যতঃ নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিবে, তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলিয়াছেন—'আমার বাক্যের রদবদল নাই এবং আমি মানবের প্রতি অত্যাচারীও নহি।' অতএব, তোমরা নিজেদের মুখ্য ও গৌণ, প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকল বিষয়েই তাকওয়া সাধনা কর, 'তাকওয়াই' পরম ধন, তাকওয়াতেই মানবতার চরম সাফল্য।

সঙ্গত ও সংযতভাবে পৃথিবীর সকল সুখ উপভোগ কর—কিন্তু ভোগের মোহে অনাচারে প্রবৃত্ত হইও না। আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার কেতাব দিয়াছেন, তাঁহার পথ দেখাইয়াছেন। এখন কে প্রকৃতপক্ষে সত্যের সেবক, আর কে কেবল মুখের দাবী-সর্বস্ব মিথ্যাবাদী, তাহা জানা যাইবে। অতএব আল্লাহ্ যেমন তোমাদের মঙ্গল করিয়াছেন, তোমরাও সেইরূপ জগতের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হও, আল্লাহর শত্রু—পাপাচারীদিগকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান কর, 'এবং আল্লাহর নামে যথাযথভাবে জেহাদে প্রবৃত্ত হও। এই কার্যের জন্য তিনি তোমাদিগকে নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগের নাম রাখিয়াছেন—মোছলেম।'** কারণ (নিজের কর্মফলে—প্রকৃতির অপরিহার্য বিধানে) যাহার ধ্বংসপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী—সে সত্য, ন্যায় ও যুক্তিমতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক! আর যে জীবনলাভ করিবে, সে সত্য, ন্যায় ও যুক্তির সহায়তায় জীবনলাভ করুক! নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারো কোন শক্তি নাই।

অতএব, সদাসর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর; আর পরজীবনের জন্য সম্বল সঞ্চয় করিয়া লও। আল্লাহর সহিত তোমার সম্বন্ধ কি, ইহা যদি তুমি বুঝিতে পার, বুঝিয়া তাঁহাকে দৃঢ় ও নিখুঁত করিয়া লইতে পার—তাঁহার প্রেম স্বরূপে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত আত্মনির্ভর করিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রতি মানুষের যে ব্যবহার, তাহার ভার তিনিই গ্রহণ করিবেন। কারণ মানুষের উপর আল্লাহরই আজ্ঞা প্রচলিত হয়, আল্লাহর উপর মানুষের হুকুম চলে না, মানব তাঁহার প্রভু নহে, কিন্তু তিনি তাহাদের সকলের প্রভু। আল্লাহ্ আকবর—সেই মহিমান্বিত আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও হস্তে কোন শক্তি নাই।***

---

* মূলে এখানে 'তাকওয়া' শব্দ আছে, মানবীয় বিবেক উৎকর্ষ লাভের পর, যখন এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, কুভাব ও কুচিন্তা স্বতঃই তাহার নিকট বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেই 'তাকওয়া' বলা হয়। দেখুন—মুহাম্মদ মুহীত ৫ ভূমিকা।

** এই অংশটুকু কোরআনের অংশ। এ সকল বিষয় যথাস্থানে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

*** তাবরী ১—২৫৫। বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে এই খোৎবার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই।

তিন মাস পূর্বে মক্কার আকাবা প্রান্তরে গভীর নিস্তব্ধ নিশীথকালের সেই গুপ্ত পরামর্শ, মদীনাবাসীর সেই উদ্দাম ভাববন্যা এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার মদীনা আগমনের সেই পুণ্য প্রতিশ্রুতি আজ সফল হইতে চলিয়াছে। মদীনার ভক্ত, আনছার ও প্রবাসী মোহাজেরগণ বহু দিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর নিজেদের এই আশাতীত সৌভাগ্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে-উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ মদীনার ইতিহাসে এমন সৌভাগ্যের দিন কখনও আসে নাই, আর কখনও আসিবেও না।

আজ ফারানের সেই কুদ্দুছ, কীদার সন্তানগণের নিষ্কোষিত খড়্গের ও আকর্ষিত ধনুর সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়া তীমায় আগমন করিতেছেন। আজ বিশ্ব-মানবের পরম শিক্ষক, পরম সংস্কারক ও পরম বন্ধু মোহাম্মদ মোস্তফা মদীনায় উপস্থিত হইতেছেন,—কাজেই মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছে। সশস্ত্র মোছলেমবৃন্দ হযরতের উষ্ট্রের অগ্রে-পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে দল বাঁধিয়া চলিয়াছেন। স্থানে স্থানে লাঠি খেলার ধুম চলিয়াছে। নগরের ছাদ ও বারান্দাগুলি আগ্রহী ও উৎসুক নরনারীতে পরিপূর্ণ। যে সকল পুরুষ পথে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ পাইলেন না, তাঁহারা ও স্ত্রীলোকেরা গৃহের ছাদে উঠিয়াছেন। পথে অল্পবয়স্ক বালকগণ মদীনার গলিতে গলিতে 'ইয়া মোহাম্মদ ! ইয়া রছুলুল্লাহ্ !' বলিয়া চীৎকার করিতেছে।* 'কাছওয়া' এই মহামানবকে বহন করিয়া যখন নগরে প্রবেশ করিল, তখন মদীনার পুরমহিলাগণ উন্মুক্ত ছাদের উপর আসিয়া গাহিতে লাগিলেন ঃ

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع

'চাঁদ উঠিয়াছে, ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদায়-পর্বতমালার পার্শ্ব দিয়া সেই পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে।'

'অতএব এই সৌভাগ্যের জন্য মদীনাবাসী আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ করুক। হাঁ ধন্যবাদ, অনন্তকালের জন্য অফুরন্ত ধন্যবাদ।'

'স্বাগত হে মহাত্মন ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের কাছে আসিয়াছ, অনুগত বশংবদ স্বজনগণের সন্নিধানে আসিয়াছ।'

আবদুল মোত্তালেবের মাতুল বংশ—নাজ্জার গোত্রের বালিকাগণ, দফ বাজাইয়া বাজাইয়া তাহাদের সেই বীণা-বিনিন্দিত শিশুকণ্ঠে গান করিতেছে ঃ

نحن جوار من بنى النجار يا حبذا محمدا من جار

"আমরা নাজ্জার বংশের কন্যা আমাদের কি সৌভাগ্য, মোহাম্মদ আমাদের প্রতিবেশী হইবেন।" আহা হা, এমন প্রতিবেশী আর কোথায় পাওয়া যাইবে ! এত তরবারি, এত খড়্গ, এত বর্শা ; বীরগণের এমন সগর্ব পদনিক্ষেপ, ভক্তগণের এমন আগ্রহ আনন্দময় অভ্যর্থনা—ইহার মধ্যে এই শিশুগণই সর্বাগ্রে হযরতের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। শিশুর সাহচর্যে মোস্তফা হৃদয়ের সরল বাল্যভাব আবার যেন ফিরিয়া আসিত। তিনি শিশু হইয়া শিশুদিগকে আনন্দ দান করিতেন, শিশু হইয়া শিশুদিগের নিকট হইতে আনন্দ সঞ্চয় করিতেন, ইহার বহু উদাহরণ তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুকণ্ঠের সঙ্গীত শুনিয়া হযরত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'তোমরা আমাকে ভালবাসিবে, আদর করিবে ?' বাল-সুলভ চপল ও সরল ভাষায় তাহারা উত্তর করিল—"করিব, করিব।" শিশুগুলির দৃষ্টি হযরতের মুখের দিকে।

---

* মোছলেম ২—৪১৯, অফা-উল-অফা, আবু দাউদ প্রভৃতি।

সেই আগ্রহপূর্ণ চাহনীর মধ্যে যে তাহাদের অজানা প্রশ্নটি লুকাইয়া ছিল, হযরতের আর তাহা জানিতে বাকী রহিল না। তিনি সহাস্য আস্যে তাহার উত্তর করিলেন—আচ্ছা বেশ, আমিও তোমাদিগকে ভালবাসিব, আদর করিব।*

হযরত নগর প্রবেশের পর, পথিপার্শ্বস্থ প্রত্যেক মহল্লার ভক্তগণ বিশেষ আগ্রহসহকারে নিবেদন করিতেছিলেন—হযরত ! এখানে অবতরণ করুন, গৃহ আপনার, আমরা আপনার। কিন্তু তিনি ভক্তগণকে সাদর উত্তরে আপ্যায়িত করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইতিহাস পুস্তকসমূহে সাধারণতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, ভক্তগণের উত্তরে হযরত বলিয়াছেন, উটকে ছাড়িয়া দাও, আমার ভাবী অবস্থান স্থানে সে নিজেই দাঁড়াইয়া যাইবে, কারণ আল্লাহ তাহাকে সেইরূপ আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ছহী মোছলেমে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যের উত্তরে হযরত বলিয়াছিলেন,—

انزل على بني النجار اخوال عبد المطلب اكرمهم بذلك

'বানুন্নাজ্জার বংশ আমার পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের মাতুল গোত্র—আমি তাঁহাদিগের নিকটে অবতরণ করিব। কারণ আমি এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে চাই।**

যে স্থানে মদীনার পবিত্র মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানে আসিয়া হযরতের উষ্ট্র বসিয়া পড়িল। হযরত তখন বলিলেন, খোদা চাহেন ত এই আমার আশ্রম।*** বলা বাহুল্য যে, ইহাই নাজ্জার বংশের পল্লী। মহাত্মা স্বনামধন্য আবু-আইউব আনছারীর বাটীও পার্শ্বে অবস্থিত। হযরত উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিলে, ভক্তপ্রবর আবু আইউব আসিয়া নিবেদন করিলেন—উটের পালানগুলি আমি লইয়া যাইব ? হযরত অনুমতি দান করিলেন।**** তাহার পর নাজ্জার বংশের অন্যান্য লোকেরা আসিয়া তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য হযরতকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হযরত হাসিয়া বলিলেন, পালান যেখানে ছওয়ারও সেখানে। মহাত্মা আবু-আইউবের দ্বিতল গৃহের নীচের তলাকেই হযরত নিজের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কাজেই তিনি উট হইতে নামিয়া আবু-আইউবের গৃহের নিম্নতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আবু-আইউব ধন্য হইলেন—অমর হইলেন, মদীনাও ধন্য হইল—অমর হইল !

مبارک منزلے کان خانه را ماہے چنین باشد
ہمایون کشورے کان عرصه را شاہے چنین باشد

# অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

## খ্রীষ্টান লেখকগণের সাধুতা

মুর, মারগোলিয়থ প্রভৃতি লেখকগণ এই প্রসঙ্গে যেরূপ অসাধুতা ও ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ন্যায়নিষ্ঠ অখ্রীষ্টান মাত্রকেই লজ্জিত হইতে হইবে। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে ছল, কৌশল ও ধূর্ততায় এই দুইজন মহানুভব লেখকের তুলনা নাই। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের বর্ণিত বিষয় সমূহের দ্বারা তাঁহারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, পাঠকগণকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করিব।

মুর সাহেব পর পর কয়েকটি পরিচ্ছেদে কোরেশপক্ষের ওকালতী করিয়াছেন। কোরেশদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক কারণ, তাঁহারা সকলেই এছলামের সাধারণ শত্রু। এই

---

* সফর-উস-সআদ ১—১৮৭, রাজিন ও এবন-জওজী হইতে। দফ এক মুখ খোলা ও অন্য মুখে চামড়া লাগান এক প্রকারের ঢোলক—আরবে এই প্রকার বাদ্যের প্রচলন ছিল। এছলামে নিষিদ্ধ হয় নাই।

** মোছলেম ২—৪১১

*** বোখারী ১৭—৪৭৭

**** বোখারী ঐ, ৪৫৭ ও মহুজুলবারী ১৭—৪৭৭

জন্য তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, কোরেশগণ কখনই হযরতকে হত্যা করার সঙ্কল্প করে নাই। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীগণের, এমন কি যাহারা হত্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল—তাহাদের সাক্ষ্য দ্বারা এই উক্তির অসারতা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি। মারগোলিয়থ বর্তমান যুগের লেখক। স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি কয়েকখানা সাহিত্য ও হাদীছ গ্রন্থের যে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার লেখা পড়িলে তাহা বেশ জানিতে পারা যায়। তিনি হযরতের মানসিক দুর্বলতা সপ্রমাণ করার জন্য সদাই উদগ্রীব। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন ঃ

The terrors of the attempted assassination and of the days and nights in the Cave were still on him. ( p 214 ) অর্থাৎ "সঙ্কল্পিত হত্যার এবং গুহার অবস্থানকালের আতঙ্ক তখনও তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল।" সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, মারগোলিয়থ মূরের প্রতিবাদ করিতেছেন, এবং কোরেশগণ যে হযরতকে হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়াছিল, যে কোন উদ্দেশ্যে হউক, তিনি তাহা স্বীকার করিতেছেন।

যাঁহারা হযরতের উষ্ট্রের সম্মুখীন হইয়া, তাঁহাকে নিজেদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, হযরত তাঁহাদের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, উট খোদার পক্ষ হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া আছে, সে উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনি দাঁড়াইয়া যাইবে,—ঐতিহাসিকগণের এই প্রমাণহীন উক্তির উল্লেখ করিয়া উভয় লেখকই এছলামের ও হযরতের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

মূর বলিতেছেন ঃ

It was a storke of policy. His residence would be hallowed in the eyes of the people as selected super naturally ; while the jealousy which otherwise might arise from the quarter of one tribe being preferred before the quarter of another, would thus receive decisive check, (p. 180)

ইহার মর্ম এই যে, মোহাম্মদ পলেসী খাটাইয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। কারণ ঈশ্বর তাঁহার বাসস্থান নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে তাঁহার গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে। পক্ষান্তরে এক গোত্রের অভিলাষ পূর্ণ হইলে অন্যান্য গোত্রের লোকদিগের মধ্যে তাহা লইয়া খুবই হিংসা-বিদ্বেষের প্রাদুর্ভাব ঘটার আশঙ্কা ছিল, এতদ্দ্বারা তাহাও সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইল। ফলতঃ মূরের কথামতে মিথ্যা করিয়া লোকচক্ষে আপনার গুরুত্ব প্রতিপাদন করার এবং চালাকী দ্বারা ভাবী গোলযোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, হযরত নিজের অবস্থান স্থানের নির্বাচন সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি করিয়াছিলেন। মারগোলিয়থ এখানে আসিয়া এমনভাবে কথা বলিয়াছেন, যাহাতে অজ্ঞ পাঠকগণ তাঁহার লেখা পাঠ করিয়া মূরের বর্ণিত-মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, অথচ বেশী ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে তিনি যান নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, দুই পৃষ্ঠা পূর্বে যে ছহীহ্ মোছলেমকে (অবশ্য বিকৃতভাবে) তিনি নিজের দলীলরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, সেই বিখ্যাত, বিশ্বস্ত এবং তাঁহার সম্পূর্ণ বিদিত ছহীহ্ মোছলেমে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত যে তাঁহার পিতৃব্যের মাতুল-কুলের নিকট অবস্থান করিবেন, ইহা তিনি প্রথম হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং মদীনা প্রবেশের সময়, তিনি সে-কথা সকলকে স্পষ্টতঃ বলিয়াও দিয়াছিলেন। সুতরাং রাবীগণের এই অপ্রামাণিক বর্ণনার যে কোনই মূল্য নাই, তাহা সর্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। বিখ্যাত খ্রীষ্টান লেখকগণও যে কিরূপ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া, কি প্রকার ধূর্ততা ও ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহা তাহার একটা সামান্য নমুনা মাত্র। হযরতের জীবনী লেখক ও মুছলমান ঐতিহাসিকবৃন্দ যে তাঁহাদের পুস্তকে সত্য-মিথ্যা সকল প্রকারের বর্ণনা ও কিংবদন্তী সঙ্কলন করিয়াছেন, ভূমিকায় আমরা সে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

## কোবা নগরে গমন

হযরত নগরাভ্যন্তরে গমন না করিয়া কয়েকদিন কোবায় কেন অবস্থান করিলেন, উল্লিখিত মহানুভব লেখকদ্বয় তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিয়াছেন। মূর বলিতেছেন, 'তাঁহাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করা হইবে, তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার জন্য একটা সাধারণ অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে সক্ষম হইবেন কি-না, এই চিন্তাতেই মোহাম্মদের মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাই তিনি অন্যত্র অবস্থানপূর্বক নগরবাসীদিগের বন্ধুত্বের মূল্যটা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য, পথ-প্রদর্শককে কোবায় গমন করিতে আদেশ করিলেন।* দীর্ঘ ১৩ শতাব্দী পূর্বে হযরতের মনে কি ভাব ও কোন্ ভাবনার উদয় হইয়াছিল, মূর সাহেব যে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি দুই পৃষ্ঠা পূর্বে নিজে যাহা বলিয়াছেন, এখানে তাহা ভুলিয়া যাওয়াই সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিতেছেন ঃ 'মদীনা যাইবার পথে তালহার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়, সাদরসম্ভাষণাদির আদান-প্রদানের পর তালহা তাঁহাদিগকে নববস্ত্র পরিধান করিতে দিলেন। পথে এই আত্মীয়ের সাক্ষাৎলাভে তাঁহাদের আনন্দের অবধি রহিল না।—yet more welcome was the assurance that Talha had left the Moslems of Medina in eagar expectation of their prophet Mahomet and Abu baker proceeded on their journey with light hearts and quickened pace. অর্থাৎ বন্ধু দর্শন ও নববস্ত্র পরিধানে এই পথশ্রান্ত পথিকবর্গের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। 'মদীনার মুছলমানগণ মোহাম্মদের জন্য অত্যন্ত আগ্রহসহকারে অপেক্ষা করিতেছে, তালহা তাহা দেখিয়া আসিতেছেন ; তাঁহার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মনে অধিকতর আনন্দের সঞ্চার হইল এবং তাঁহারা স্বস্তি সহকারে ও দ্রুত গতিতে মদীনার দিকে অগ্রসর হইলেন।** সুতরাং এখানে মূর সাহেব নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, মদীনার মুছলমানগণ যে হযরতের জন্য অত্যন্ত আগ্রহসহকারে অপেক্ষা করিতেছেন, তালহার মুখে হযরত পূর্বেই সে সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া হযরত আবু-বাকরের আনন্দের সীমা ছিল না এবং তাঁহারা দ্রুতপদে ও with light hearts নিরুদ্বেগচিত্তে মদীনার দিকে অগ্রসর হইলেন। অতএব "মদীনার লোক তাঁহাকে কিরূপে গ্রহণ করিবে" পুনরায় এই চিন্তায় অস্থির হওয়ার বা সেজন্য কোবায় অবস্থান করার কল্পনা করায়, লেখক নিজের কথার প্রতিবাদ নিজেই করিতেছেন। খ্রীষ্টান লেখকগণ অনুমানের উপর নির্ভর করতঃ অনেক সময় হযরত ও তাঁহার সহচরবৃন্দ সম্বন্ধে নিজেদের সুবিধামত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইউরোপ মহাদেশ উপন্যাসের জন্মভূমি, সে হিসাবে তাঁহাদের এই আনুমানিক কল্পনার একটা বাহাদুরী স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শুনিয়াছি, উপন্যাস রচনাতেও আগাগোড়া কল্পনারে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। দুঃখের বিষয়, ইউরোপীয় লেখকগণের এই সকল রচনায় তাহারও যথেষ্ট অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

## জুম্‌আর নামায সম্বন্ধে মারগোলিয়থের দাবী

কোবা হইতে যাত্রার পর পথিমধ্যে হযরত ভক্তবৃন্দকে লইয়া জুমআর নামায পড়িয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণ সকলেই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ডাঃ মারগোলিয়থ ইহাকে anachoronism বা কাল নির্ণয়ের ভ্রম বলিয়া উল্লেখ করতঃ লিখিয়াছেন যে ঃ The adoption of Friday as a sacred day come later, at the suggestion of a Medinese, and after the relations with the Jews had become satisfactory ; (214) অর্থাৎ হযরতের বহু দিন পরে ইহুদীদিগের সহিত শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার পর, জনৈক মদীনাবাসীর প্রস্তাব অনুসারে শুক্রবারকে পবিত্র দিবসরূপে নির্বাচিত করা হয়।*** এই কাল নির্ণয়ের ভুমিকায় লেখক

---

* ১৭৭ পৃষ্ঠা ** ১৭৫ পৃষ্ঠা। *** ২১৪ পৃষ্ঠা

দেখাইতে চাহেন যে, এস্লামের অনুষ্ঠানগুলির সহিত অহীর কোন সম্বন্ধ নাই। হযরত স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া এক-একটা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। মুছলমানের এবাদতের মধ্যে নামায এবং তাহার মধ্যে জুমআর নামায সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই লেখক বিশেষ চাতুরী খেলিয়া তাঁহার পাঠকগণকে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, প্রথমে ইহুদীদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য হযরত তাহাদের sabath বা শনিবারকে পবিত্র দিবস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মদীনা আগমনের পর, যখন তাহাদের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইল, তখন তিনি অন্য একজন মদীনাবাসীর প্রস্তাব মতে (আল্লাহ্র আদেশ নহে) শুক্রবারকেই সাপ্তাহিক উপাসনার দিন বলিয়া মনোনীত করিলেন।

## ঐ দাবীর অসারতা

কিন্তু মারগোলিয়থের এই উক্তিটি একেবারেই মিথ্যা ও হিংসামূলক হঠোক্তি মাত্র। তাহার প্রমাণ এই যে ঃ

(ক) মারগোলিয়থ যত্রতত্র সংলগ্ন-অসংলগ্ন এমন-কি নিতান্ত অসাধুতা সহকারে হাদীছ ও রেজাল গ্রন্থের বরাত দিয়া থাকেন, কিন্তু নিজের এই অভিনব মন্তব্যের সমর্থনের জন্য, তিনি এখানে ধর্মশাস্ত্র বা ইতিহাসের একটি বরাতও প্রদান করেন নাই। না করার কারণ এই যে, তিনি যে হাদীছের অর্থ বিকৃত করিয়া নিজের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন, সেই হাদীছই তাঁহার কথার মূলোচ্ছেদ হইয়া যাইতেছে। পাঠকগণ নিম্নে তাহার পরিচয় পাইবেন।

(খ) হাদীছে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, হিজরতের পূর্বেই জুমআর নামায ফরয হইয়াছিল। কিন্তু কোরেশদিগের অত্যাচারে, মক্কায় জুমআর জামাআত করা অসম্ভব হইয়াছিল বলিয়া অক্ষমতা হেতু উহা স্থগিত রাখা হয়। হিজরতের পর জুমআ পড়িবার প্রথম সুযোগ উপস্থিত হইলেই, হযরত ছাহাবাগণকে লইয়া তাহা সম্পন্ন করেন।*

(গ) মারগোলিয়থের প্রধান অবলম্বন—মোছনাদে আহমদ পুস্তকে এবং আবু দাউদ এবন-মাজা প্রভৃতি বহু হাদীছ গ্রন্থে বিশ্বস্তসূত্রে ছহীহ্ ছনদে প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী কা'ব-এবন-মালেক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরতের মদীনা আগমনের পূর্বেও, আছআদ-এবন-জোরারার নেতৃত্বাধীনে, তথায় জুমআর নামায সম্পাদিত হইত। এবন-খোজায়মা প্রমুখ মোহাদ্দেছগণ এই হাদীছকে 'ছহীহ্' বা প্রামাণিক ও বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।** সুতরাং মারগোলিয়থের সিদ্ধান্তটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও তাঁহার মনকপোলকল্পিত, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না।

(ঘ) মোহাদ্দেছ আবদুর রাজ্জাক এবন-ছিরীন হইতে একটি হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ হাদীছের কতকাংশ গোপন করিয়া এবং কতকাংশের বিকৃত মর্ম গ্রহণ করিয়া মারগোলিয়থ সাহেব আলোচ্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হযরতের মদীনা আগমনের পূর্বে, একদা আনছারগণ একত্র সমবেত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, 'ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় জাতিই সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে একত্র সমবেত হইয়া থাকে। আমাদিগের পক্ষেও এইরূপ একদিন নির্বাচিত করিয়া তথায় সমবেতভাবে উপাসনা করা উচিত। অতঃপর তাঁহারা শুক্রবারকে তজ্জন্য নির্বাচিত করিলেন, এবং আছআদ-এবন-জোরারা তাঁহাদিগকে জুমআর নামায পড়াইলেন।' এই হাদীছ সম্বন্ধে আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, উহার মূল বর্ণনাকারী মোহাম্মদ-এবন-ছিরীন হযরতের সহচর নহেন। '১১০ হিজরীতে ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়'*** সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ৩৩ হিজরীতে অর্থাৎ হযরতের মদীনা আগমনের ৩৩ বৎসর পরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। অতএব তাঁহার পক্ষে হিজরতের পূর্বকার ঘটনা অবগত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ

* দারকুৎনী—এবন-আব্বাচ, ফৎহুলবারী ৪—৪৭৬

** ফৎহুলবারী ঐ ঐ। ***একমাল ৩৬ পৃষ্ঠা

তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কোন ছাহাবীর নামও উল্লেখ করিতেছেন না। বিশেষতঃ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবাগণের বর্ণনায় মদীনাবাসীদিগের আলোচনা ও প্রস্তাবের কোনই উল্লেখ নাই।* সুতরাং এ অবস্থায় এই বর্ণনাটি কখনই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু এই অপ্রামাণ্য বর্ণনাটিকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, বড় জোর এইটুকুই সপ্রমাণ হইবে যে, মদীনাবাসিগণ (একজন মদীনাবাসী নহে) যুক্তি-পরামর্শ করিয়া শাস্ত্রীয় আদেশ প্রাপ্তির পূর্বেই জুমআর নামায পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা দ্বারা যুগপৎভাবে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা হযরতের মদীনা আগমনের পূর্বকার ঘটনা। সুতরাং 'হযরতের মদীনায় আসিবার এবং ইহুদীদিগের সহিত বৈরীভাব সংস্থাপিত হওয়ার পর' শুক্রবারকে বিশেষ উপাসনার দিনরূপে নির্ধারণ করা হইয়াছিল বলিয়া লেখক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এই বর্ণনার দ্বারাও তাহার অসারতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

## প্রকৃত কথা

প্রকৃত কথা এই যে, হযরতের প্রতি যে শুক্রবাসরিক উপাসনার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং কোরেশদিগের বাধা প্রদান হেতু হযরত তাহা সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না, এ সংবাদ মদীনার মুছলমানগণ যথাসময়ে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই অনুসারে তাঁহারা জুমআর নামায সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করেন। মদীনাবাসী মুছলমানগণ মক্কার ও হযরতের সমস্ত সংবাদই জানিতে পারিতেন, এমন কি এত সন্তর্পণে যে হিজরত সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহাদিগকে পূর্বাহ্ণে জানাইয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে ধর্মের বিধান ও আল্লাহর আদেশ মাত্রই যথাসময়ে মদীনাবাসী মুছলমানগণকে জানাইয়া দেওয়া হইত,—এজন্য কোরআনে হযরতের প্রতি পুনঃ পুনঃ বিশেষ তাকিদসহকারে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় জুমআ ফরয হওয়া সংক্রান্ত আল্লাহর এই আদেশটি হযরত মদীনাবাসীদিগকে জানান নাই বা জানাইতে দেন নাই, একপ অনুমান করা অন্যায়। সুতরাং, মদীনা প্রয়াণের পূর্বে হযরতের প্রতি জুম'আর নামায সম্পন্ন করার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, এই কথা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইব যে, মদীনাবাসীদিগকে অনতিবিলম্বে সেই আদেশের বিষয় জ্ঞাত করান হইয়াছিল। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আল্লাহর বা তাঁহার রছুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আদেশ ব্যতীত, পুণ্যার্থে কোন ধর্মানুষ্ঠানের সৃষ্টি করা, হযরতের কঠোর আদেশমতে মহাপাপ—বেদআত্ জালালৎ। মদীনায় মোহাজের ও আনছারগণ ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। এ অবস্থায় নিজেদের খোশ-খেয়ালের ঝোঁকে এইরূপ একটা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করা, ধর্মপ্রাণ ছাহাবাগণের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিল।

## অনুকরণের কুফল

দুঃখের বিষয়, মধ্যযুগের গতানুগতি ও অন্ধ-অনুকরণের ফলে, স্বাধীন চিন্তার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় সে সময়কার অনেক বিখ্যাত লেখকই আমতা আমতা করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, হযরতের আদেশের পূর্বে, মদীনার আনছারগণ, 'এজতেহাদ' করিয়া জুমআর নামাযের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমরা এই ভক্তিভাজন আলেমগণকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—জুমআর খোৎবা ও নামাযের রাকআত ইত্যাদির সংখ্যা নির্ণয়, ইহাও কি আনছারগণের সৃষ্টি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে—যেহেতু হযরত এই তথাকথিত এজতেহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই—স্বীকার করিতে হইবে যে, এছলাম এই প্রকার বিপ্লবাত্মক এজতেহাদেরও সমর্থন করিতেছে। এইরূপ এজতেহাদের ফলে মুছলমানগণ একটা নূতন এবাদতের সৃষ্টি করিতে পারেন! কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র মতে ইহা

* ৭ দফা দেখুন

এজতেহাদ নহে—বরং বিপ্লবজনক বেদআত, ধর্মের উপর মানবীয় অধিকার ! ছাহাবাগণ এইরূপ কার্যে কখনও লিপ্ত হন নাই, হইতে পারেন না। প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, মদীনার আনছারগণ এই সময়ে জুমআর নামায অন্তে আবার জোহরের নামাজ পড়িতেন কি-না ? আমরা যতটা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস এই যে, একটি দুর্বলতর হাদীছের দ্বারাও ইহা সপ্রমাণ করা সম্ভবপর হইবে না যে, আনছারগণ জুমআর নামাযের সঙ্গে আবার জোহরের নামায পড়িতেন। অতএব মদীনাবাসিগণ হযরতের নিকট হইতে কোন আদেশ বা সংবাদ পাইবার পূর্বেই শুক্রবারে জুমআর নামায পড়িতেন—সুতরাং জোহরের ফরয নামায ত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন, ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রকারন্তরে স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, মদীনার প্রাতঃস্মরণীয় আনছারগণ একটা খেয়াল-খেয়ালের বশে ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের অনুকরণ করিতে যাইয়া, হযরতের নিকট একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই, জোহরের ফরয নামাযকে অবলীলাক্রমে ও ধারাবাহিকরূপে ত্যাগ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকদের পক্ষে এই প্রকার অদার্শনিক কল্পনা করা অসম্ভব, এবং মুছলমানের পক্ষে এবংবিধ অসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অন্যায় ও অধর্ম।

আলোচিত যুক্তি-প্রমাণগুলি এক সঙ্গে বিচার করিয়া দেখিলে প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি বলিতে বাধ্য হইবেন যে, মক্কায় অবস্থানকালে হযরতের প্রতি জুমআর নামায ফরয হইলে মদীনাবাসী তাহা জানিতে পারিয়া সেখানে জুমআর ব্যবস্থা করেন। মোহাম্মদ-এবন ছিরীন প্রভৃতি পরবর্তী রাবীর এই বিষয়টি জানা ছিল না। তিনি যাঁহার মুখে এই ঘটনার কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ব্যক্ত না থাকাতে ঐ হাদীছের গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, তিনি কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর মুখে এই ঘটনার কথাগুলি শুনিয়াছিলেন, তাহা হইলেও হাদীছ বিচারের নিয়মানুসারে এইটুকু প্রমাণিত হইবে যে, মূল রাবী হযরতের প্রতি জুমআ ফরয হওয়ার সংবাদ অবগত ছিলেন না। আনছার প্রধানগণ, ঐ সভায় জুমআর গুরুত্ব ও আবশ্যকতা বর্ণনাকালে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, মূল কথা অবগত না থাকায়, তিনি তদ্দ্বারা এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন মাত্র।

## ঐতিহাসিক ভ্রম

ঐতিহাসিকগণ ও তাঁহাদের অন্ধ অনুকরণে বহু তফছিরকার আলেম বলিয়াছেন, হযরত কোবা পল্লীতে মাত্র তিন বা পাঁচ দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। এই ভ্রান্ত মন্তব্যই খৃষ্টান লেখকদিগকে, হযরতের কোবায় গমন সম্বন্ধে, উপরোক্ত অসাধু মন্তব্য প্রকাশ করার কতকটা সুযোগ করিয়া দিয়াছে। আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ অনেক সময়ই বিশ্বস্ত হাদীছসমূহে বর্ণিত বিষয়গুলির বিপরীত কথা বলিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের মতামত যে অবশ্য পরিত্যাজ্য, ভূমিকায় তাহা দেখান হইয়াছে। বোখারীর হাদীছে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত কোবায় সম্পূর্ণ ১৪ দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন।* ইমাম আহমদও ঠিক এই মর্মের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ।** সুতরাং ঐতিহাসিকগণের তিন বা পাঁচ দিনের কথা অবিশ্বাস্য

সমস্ত ইতিহাসে একবাক্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরতের আগমনের পূর্বে বহু প্রবাসী মুছলমান, বিশেষতঃ স্বজনগণ বিচ্যুত ও অবিবাহিত ব্যক্তিগণ, এই কোবা পল্লীতেই অবস্থান করিতেছিলেন।*** প্রেমময় মোহসেন তাঁহাদিগকে সোদরবৎ ভালবাসিতেন। কোবার মুষ্টিমেয় ভক্ত এই প্রবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। গুহায় অবস্থান ও অবিশ্রান্ত পথপর্যটনের ফলে হযরত যে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা

---

* বোখারী ১৫ খণ্ড ৪৭৬ ও ৪৮৬ পৃষ্ঠা।

** মোছনাদ ৩১২ পৃষ্ঠা। এবন-হেশামও ইহাই বলিয়াছেন, ১—২৫৯।

*** তাবরী ২—২৪৯ প্রভৃতি।

বলাই বাহুল্য। কিন্তু তবু তিনি এই সৌহৃদ-প্রতিম ধর্মপ্রাণ মোহাজের ও আনছারগণের অনন্যাদি দর্শন না করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাই নগরে প্রবেশপূর্বক স্থির হইয়া বিশ্রাম-সুখ ভোগ করার পরিবর্তে কোবার সঙ্কীর্ণ পল্লীতে গমন করিয়া, ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত, উৎসাহিত ও ধন্য করিলেন—বিশ্রামের পরিবর্তে সেখানে নিজের মাথায় পাথর বহিয়া মছজিদের এবং এছলামের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। পরোক্ষসর্বস্ব ইউরোপ দেশের যে সকল মহানুভব লেখক এহেন সৎ ও মহৎ কার্যেও 'পলেসীর' প্রাদুর্ভাব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের উত্তরে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে—

"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।" المرء يقيس على نفسه

## ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

### মদীনার প্রাথমিক অনুষ্ঠান সমূহ

### আবু-আইউবের আতিথ্য

হযরত উট হইতে অবতরণ করিয়া আবু-আইউবের গৃহে গমন করিলেন। গৃহস্বামী হযরতকে উপরিতল গ্রহণ করিতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অনেক লোকজন তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, ইত্যাদি কারণে মেজবানদিগের নানারূপ অসুবিধা হইতে পারে—এইজন্য হযরত প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাহার পর, একদিন ঘটনাক্রমে উপর তালায় একটি পানির পাত্র ভাঙ্গিয়া যায়, ভক্তদম্পতির আশঙ্কা হইল—সম্ভবতঃ এই পানি চোয়াইয়া নিম্নতলে পড়িতে পারে, তাহা হইলে হযরত কষ্ট পাইবেন। এই আশঙ্কার জন্য তাঁহারা নিজেদের একমাত্র 'লিহাফ'খানা দিয়া সেই কর্দমাক্ত পানি শুকাইয়া ফেলিলেন। ভক্তদম্পতির এই প্রকার সদা সশঙ্কতার ও অস্বস্তি লক্ষ্য করিয়া হযরত অবশেষে উপরের তলাতেই আশ্রয় গ্রহণ করেন।*

### পিয়াজ-রসুন অভক্ষ্য

ভক্তদম্পতি নিয়মিতভাবে হযরতের জন্য আহার্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। হযরত সেই পাত্র হইতে খাদ্য গ্রহণ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত, এই ভক্তদম্পতি তাবাররুক জ্ঞানে পরমানন্দে তাহা গ্রহণ করিতেন। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, পাত্রস্থ খাদ্যের যেখানে হযরতের অঙ্গুলি চিহ্ন দেখা যাইত, আশেকে-রছুল আবু-আইউব ঠিক সেখানে অঙ্গুলি দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। একদা হঠাৎ আবু-আইউব ও তাঁহার সহধর্মিণী দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, হযরত পাত্রের খাদ্য একটুও গ্রহণ করেন নাই। আবু-আইউব ব্যস্তত্রস্তভাবে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হযরত বলিলেন—খাদ্য হইতে পিয়াজের দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল, আমি ঐগুলি খাই না।** বোখারী ও মোছলেম প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে এরূপ বহু হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, পিয়াজ-রসুন খাইয়া মছজিদে গমন একেবারেই নিষিদ্ধ। একসঙ্গে ঐ সকল হাদীছের বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, পিয়াজ-রসুন ভক্ষণই হযরত কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে, কাঁচা খাওয়ার নিষেধ সম্বন্ধে ত কোন সন্দেহই থাকে না।

### মছজিদ নির্মাণের আয়োজন

মদীনায় শুভাগমন করার পরই সেখানে আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য একটা সাধারণ উপাসনা-মন্দির বা মছজিদ নির্মাণ করার নিমিত্ত হযরতের মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যে আঙ্গিনার নাম

---

* এছাবা ও অন্যান্য ইতিহাস। ** এবন-হেশাম।

করায়, যাঁহার তাওহীদের জয়সঙ্গীত গান করার অপরাধে, তিনি ও এছলামের অনুরক্ত ভক্তগণ আজ দীর্ঘ ১৩ বৎসর হইতে অশেষ উপদ্রব ও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছেন— এছলামের ভ্রাতৃমণ্ডলীকে সঙ্গে লইয়া, আজ মদীনার মুক্ত আকাশে, মুক্ত বাতাসে, মুক্তির মূর্ছনা জাগাইয়া, মুক্তপ্রাণে-মুক্তকণ্ঠে সেই প্রেমময়-মঙ্গলময়ের মহিমা কীর্তন করার জন্য, মোস্তফা-হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

যে উন্মুক্ত পতিত ভূখণ্ডে উপস্থিত হইয়া হযরত উট হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটিকেই তিনি মছজিদের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিয়া ভূস্বামীর সন্ধান লইতে লাগিলেন। ঐ ভূমিখণ্ডের অধিকারী—ছোহেল ও ছহল নামক দুইটি পিতৃহীন বালক, বিখ্যাত আনছার-প্রধান আছআদ-এবন-জোরারা ঐ বালকদ্বয়ের অভিভাবক। হযরত আছআদকে ডাকিয়া নিজের সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাত করিলেন। আছআদ প্রথমেও এইখানে নামায পড়িতেন, মছজিদ নির্মাণের প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন—হযরত এই সামান্য ভূখণ্ডের জন্য, বিশেষতঃ এহেন শুভ প্রস্তাবে, মূল্যের কোনই আবশ্যক করিবে না। আমি ঐ বালকদ্বয়ের নিকটাত্মীয় ও অভিভাবক, আমি মছজিদ নির্মাণার্থে উহা দান করিতেছি। আছআদের কথায় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করতঃ হযরত তাঁহাকে বলিলেন—'ভ্রাতঃ ! তুমি অভিভাবক সত্য। কিন্তু বালকগণের স্বার্থের বিপরীত কোন কাজ করিবার অধিকার তোমার নাই। সামান্য এক খণ্ড জমি, লোকে তাহার একপার্শ্বে উট বাঁধিত, এক দিকে খেজুর শুকাইত, আর এক দিকে প্রাচীন গোরস্থান। হযরত মছজিদ নির্মাণের জন্য মূল্য দিয়া খরিদ করিতে চাহিতেছেন,—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বালকদ্বয় তখনই হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—আমরা মূল্য লইব না, আমরা উহা ধর্মার্থে আল্লাহর নামে দান করিতেছি। ছহল ও ছোহেল প্রকৃতপক্ষে তখন বালক নহেন—তাঁহারা অপরিণত বয়স্ক তরুণ যুবক * কিন্তু তবুও হযরত তাঁহাদের দান গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে হযরতের আদেশে নাজ্জার বংশের প্রধান ব্যক্তিগণকে ডাকা হইল। তাঁহারা সমবেত হইলে, হযরত তাঁহাদিগকে মছজিদ নির্মাণের সঙ্কল্পের কথা বুঝাইয়া দিয়া ঐ ভূমিখণ্ডের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা নিবেদন করিলেন, হযরত ! আমরাই বালকদ্বয়ের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিব, আপনি ঐ ভূখণ্ড গ্রহণ করুন, ইহাতেই আমরা ধন্য হইব। মছজিদের জন্য যে জমি গৃহীত হইবে, তাহাতে স্বত্ব-স্বামিত্ব ও ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার ত্রুটী থাকা অনুচিত, এ জন্য এ প্রস্তাবে হযরত সম্মতি দান করিতে পারিলেন না। অবশেষে নাজ্জার গোত্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ জমির জন্য যে মূল্য নির্ধারণ করিলেন, হযরতের আদেশে মহাত্মা আবু-বাকর ভূস্বামীগণকে সেই মূল্য প্রদান করার পর, তাহার উপর মছজিদ নির্মাণের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইল।**

আমাদের দেশে মছজিদ নির্মাণের সময় জমির স্থায়ী স্বত্বাদি ও উপযুক্তরূপে তাহার ওয়াক্‌ফ করা সম্বন্ধে অতিশয় উপেক্ষা প্রকাশ করা হয়। তাহার পর জমিদার বা মহাজনের দেনায় অথবা অন্যপ্রকারে যখন সেই মছজিদের তলস্থ জমি বিক্রয় হইয়া যায়, তখন হায় মছজিদ! হায় মছজিদ!! করিয়া হা-হুতাশ করিয়া বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মামলা-মোকদ্দমা বাধাইয়া একটা ভয়ঙ্কর অশান্তি উৎপাদন করা হইয়া থাকে। কিন্তু মছজিদ নির্মাণ সম্বন্ধে প্রথমে যে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, হযরতের জীবনীর এই ঘটনা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। হাদিছ ও ফেকহ্‌ শাস্ত্রে যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত আলোচনা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

---

* এক বৎসর পরে ছোহেল বদর যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন—ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এছাবা ও তাবারিতে দ্রষ্টব্য।

** বোখারীর মাছাজেদ, হিজরত প্রভৃতি অধ্যায়ের হাদিছগুলির সারমর্ম এখানে সংগৃহীত হইয়াছে, জরো তাবরী, এবন-হেশাম ও তবকত প্রভৃতি ইতিহাস হইতেও দুই-একটা কথা গৃহীত হইয়াছে।

## মছজিদ নির্ম্মাণ

ভূমি গ্রহণের পর অবিলম্বে মছজিদ নির্মাণ আরম্ভ হইল। কর্তব্য সম্পাদনের জন্য লোকদিগকে গুরুগম্ভীর উপদেশ না দিয়া, হযরত সামান্য দিন-মজুরের মত স্বহস্তে 'যোগাড়' দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে দৃশ্য কি চমৎকার, মাথায়, মুখে ও দাড়িতে ধুলা-মাটি ভরিয়া যাইতেছে, অথচ হযরত পরমোৎসাহে ইটের বোঝা মাথায় করিয়া বলিতেছেন—"সুস্বাদু খেজুর ও সুরস আঙ্গুরের মোট বহন করা অপেক্ষা এ মোট অধিকতর প্রীতিকর, হে আমাদের প্রভু ! ইহাই তোমার নিকট পুণ্যতর ও পবিত্রতর।"* আনছার ও মোহাজেরগণের মধ্যে একদল হযরতের সঙ্গে সঙ্গেই এই মহামজুরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ তখনও সে সঙ্গে যোগদান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হযরত স্বয়ং মজুরের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া মদীনায় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জনৈক আরব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল ঃ

لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل

"কি সর্বনাশ ! হযরত পরিশ্রম করিবেন, আর আমরা বসিয়া থাকিব ! আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ধৃষ্টতার কাজ আর কি হইতে পারে !" বলা বাহুল্য যে, ভক্তগণ অবিলম্বে প্রভুর অনুসরণে মছজিদ নির্মাণার্থ রাজ ও মজুরের কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।**

তখন ভক্তগণের উৎসাহের অবধি নাই। আনন্দে উৎসাহে মাতোয়ারা এই মহামজুরগণের সমবেত কণ্ঠ হইতে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইতেছে এবং হযরত তাঁহাদের সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া গাহিতেছেন ঃ

اللهم لا اجر الا اجر الآخرة فارحم الانصار والمهاجرة

"পরকালের সুখই পরম সুখ, ইহা ব্যতীত প্রকৃত সুখ আর নাই। হে আল্লাহ্ ! আনছার ও মোহাজেরগণের প্রতি দয়া কর !"***

## মছজিদের বিশেষত্ব

পাঠক দেখিতেছেন, দুনিয়ার এই শ্রেষ্ঠতম মছজিদ নির্মাণের জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে বড় বড় মিস্ত্রী আনয়ন করা হয় নাই, জন-মজুরের অপেক্ষা করা হয় নাই। চারুশিল্পে শোভিত বিশাল মেহরাব, কারুকার্য খচিত সমুচ্চ প্রাচীর, দিগন্তচুম্বী মিনার ও গগনস্পর্শী গুম্বজরাজির দ্বারা এই মছজিদের শোভাবর্দ্ধনের চেষ্টাও করা হয় নাই। নবী-নির্মিত এই মহা-মছজিদে মেহরাব ছিল না, শ্বেত প্রস্তরের মেম্বর ছিল না ; মিনারা ছিল না, গুম্বজ ছিল না। কাঁচা ইটের প্রাচীর**** খেজুরের আড়া ও খেজুর পাতার ছপ্পর। এছলামের সেই বিরাট, বিশাল ও মহান শক্তিকেন্দ্র এই সকল উপকরণ দিয়াই নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরের সম্পূর্ণ অভাব থাকিলেও, মহিমময় মোস্তফার শিক্ষা-মাহাত্ম্যে ও চরিত্র-প্রভাবে এই মছজিদের গুরুত্ব ও মহিমা এতদূর বর্ধিত হইয়া গিয়াছিল যে, রোম ও পারস্যাদি দেশের বিশ্ববিজয়ী বীর সেনাপতি ও রাজদূতগণেরও সেখানে প্রবেশ করিতে বুক কাঁপিয়া উঠিত।

## সেকাল ও একাল

হিজরতের প্রথম সন হইতে, খলীফাগণের সুবর্ণ যুগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই মছজিদই এছলামের সর্বপ্রধান বরং একমাত্র কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সেখানে দৈনিক ও সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য মুছলমানদিগের যে সম্মেলন হইত, তাহা ব্যতীত সকল প্রকার শাসন-বিচার, সালিস-পঞ্চায়েৎ, সমর ও সন্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা ও পরামর্শ, বিদেশে দূত প্রেরণ বা বৈদেশিক রাজদূতগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ, ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বাদানুবাদ আলোচনা,

---

* বোখারী ১৫—৪৭৭।

** এবন-হেশাম ১—১৭৬।

*** বোখারী ১৫—৪৭৭, ৪৮৭

**** বোখারী ১৫—৪৭৭, ৪৮৭।

উপদেশ ও পরামর্শ, এক কথায় জাতিগত, ধর্মগত, দেশগত সকল প্রকার আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা ও পরামর্শই এই আড়ম্বরহীন মছজিদ প্রাঙ্গণ হইতে সুসম্পাদিত হইত। হযরতের বা মহামতি খলীফাগণের সময় মছজিদে আজকালকার মত বাহ্যাড়ম্বর ছিল না, এবং তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় মছজিদকে অগম্য অস্পর্শনীয় ঠাকুর-ঘরে পরিণত করতঃ মিছা ভয় ও ভক্তিভরে দূর হইতে ছালাম করিয়া বা 'খোদার ঘরে' ক্ষীর-বাতাসা ভোগ চড়াইয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। সেকালের ও একালের মছজিদে এবং উভয়ের অবস্থার কত পার্থক্য, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।

## ঐতিহাসিক প্রমাদ

মছজিদ নির্মাণের সময় মুছলমানগণ এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে হযরত উৎসাহ ও বলবর্দ্ধনের জন্য যে 'ছড়া'টির আবৃত্তি করিতেছিলেন, বোখারীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা জনৈক মুছলমানের রচনা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ্-এবন-রওয়াহা ঐ ছড়াটি রচনা করিয়াছিলেন। মুছলমানদিগের মুখে উহার আবৃত্তি শুনিয়া হযরতও পুনঃ পুনঃ যথাযথভাবে ঐ ছড়াটির আবৃত্তি করিতে থাকেন। এই আবৃত্তি যে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অবিকৃতভাবে হইয়াছিল, ইমাম বোখারীর বর্ণিত বিভিন্ন অধ্যায়ের হাদীছ হইতে তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে। কিন্তু আমাদের কোন কোন ঐতিহাসিক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, হযরত ঐ চরণটির আবৃত্তি করার সময় নানা প্রকার উলট-পালট করিয়া ফেলিয়াছিলেন।* ইতিহাস রচনার সময় হাদীসের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে, ইমাম বোখারী প্রভৃতির বর্ণিত বহু বিশুদ্ধ হাদীছের বিপরীত, তাঁহারা এইরূপ কথা বলিয়াছেন। মুর সাহেব এই সুযোগে মনের সাধ মিটাইয়া হযরতের চরিত্রের উপর আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার আক্রমণের সার এই যে, আবৃত্তির সময় বিকৃতি ঘটাইয়া মোহাম্মদ দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, কবিতা ও ছন্দ বন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার আদৌ কোন জ্ঞান নাই। ইহাতে লোকে বিশ্বাস করিবে যে, এহেন লোকের দ্বারা কোরআনের সুন্দর ছন্দগুলি কখনই রচিত হয় নাই, অতএব তাহা স্বর্গ হইতে আসিয়াছে।** কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, হাদীছের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবেই পুনঃ পুনঃ ঐ চরণটির আবৃত্তি করিয়াছিলেন।*** কাজেই ঐতিহাসিকগণের প্রমাদ ও মুর সাহেবের প্রগল্ভতার মূল্য-মর্যাদা বিন্দুমাত্রও নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর অসতর্ক ঐতিহাসিক ও তাঁহাদের রবিশদের বহু অপ্রামাণিক গল্প-গুজবকে মুছলমানেরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস বা আকিদায় পরিণত করিয়া লইয়া, গোটা জাতিটার মন ও মস্তিষ্ককে অসংখ্য কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে মারাত্মকরূপে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা মজার কথা এই যে, এই সকল অপ্রামাণিক ও সম্পূর্ণ অনৈছলামিক কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতে গেলেই আজ একেবারে 'কাফের' বানাইয়া দেওয়া হয়।

## আছহাবে ছুফ্‌ফা

হযরতের ও ভক্তবৃন্দের কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মদীনার মছজিদ নির্মিত হইয়া গেল। তাহার পরই হযরতের ও তাঁহার পরিজনবর্গের বাসস্থান নির্মিত হইবে, ইহাই সকলে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কার্যক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। মছজিদ নির্মাণের পর, আছহাবে ছুফ্‌ফার আশ্রম নির্মাণ করার চেষ্টা হইল, এবং এই চেষ্টার ফলে মছজিদ সংলগ্ন জমির উপর একটা চাতাল বা চবুতরা নির্মাণ করা হইল। এই চাতালের উপরে খেজুর পাতার চাল এবং চারিদিক উন্মুক্ত। গৃহ-পরিজনহীন শত শত ত্যাগী ও কর্মী

---

* এবন হেশাম ১—১৭৬ পৃষ্ঠা।

** ১৮৪ পৃষ্ঠা।

*** বোখারী ১৫—৪৭৭, ৪৮৭ ইত্যাদি

মুছলমানের ইহাই ছিল আশ্রম। এই আশ্রমবাসী মুছলিমগণই কালে আছহাবে ছুফ্‌ফা নামে পরিচিত হন।

হযরতের ছাহাবা বা সহচরগণ সাধারণতঃ নিজেদের ধর্মগত সাধনা পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যান্য সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতেন এই জন্য তাঁহারা সকলে সকল সময় হযরতের নিকট উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনগণের প্রতি তাঁহাদের যে কর্তব্য ছিল, তাহা পালন করিতে তাঁহাদের অনেক সময় কাটিয়া যাইত কিন্তু ছুফ্‌ফার সর্বত্যাগীদের পুত্র-পরিবার ছিল না, তাঁহারা বিবাহ করিতেন না। সে দলের মধ্যে কেহ বিবাহ করিলে তাঁহাকে দল ছাড়িয়া আসিতে হইত। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দল দিবাভাগে মছজিদেই পড়িয়া থাকিতেন, হযরতকে বেষ্টন করিয়া কথামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইতেন। রাত্রিকালে নিজেদের আশ্রমে উপাসনা-এবাদতে লিপ্ত হইতেন এবং সেইখানেই পড়িয়া থাকিতেন। ইঁহাদের পরিধানে প্রায় দুইখানি বস্ত্র জুটিত না। একখানা চাদর গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হইত এবং তাহাই জানু পর্যন্ত ঝুলিয়া থাকিয়া তাঁহাদের অঙ্গাচ্ছাদন ও লজ্জা নিবারণ করিত। তিরমিজী নামক হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে,* 'নামাযের জামাআত আরম্ভ হইলে ইহারাও তাহাতে যোগদান করিতেন কিন্তু অনাহারের ফলে অনেক সময় তাঁহাদের পক্ষে দাঁড়াইয়া নামায পড়াও সম্ভবপর হইত না। দুর্বলতার জন্য অনেক সময় নামায পড়িতে পড়িতে তাঁহারা পড়িয়া যাইতেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে উন্মত্ত, উদভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইত।' ইঁহাদের মধ্যে একদল দিবাভাগে জঙ্গলে ও পর্বতে গিয়া কাষ্ঠাহরণ করিয়া আনিতেন, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাওয়া যাইত, তদ্দ্বারা অন্যান্য অভাবগ্রস্ত মোছলেম ভ্রাতা-ভগ্নীদিগের জন্য খাদ্য ক্রয় করিতেন, অথচ এত পরিশ্রম করিয়াও নিজেরা অনেক সময় উপবাস করিয়া থাকিতেন। অনেক সময় হযরত মোহাজের ও আনছারদিগের দ্বারা ইঁহাদের সেবা করাইতেন। বিবি ফাতেমা একদা হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—বাবা ! যাঁতা পিষিতে পিষিতে আমার হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছে, আপনি আমাকে একটা বাঁদী আনিয়া দিন ! কন্যার এই আবেদনের উত্তরে হযরত বলিয়াছিলেন—"ফাতেমা ! আছহাবে ছুফ্‌ফার মোছলেমবৃন্দ অন্নাভাবে মারা যাইবে, আর আমি তোমাকে বাঁদী আনিয়া দিব, ইহা কি সঙ্গত ?" আহা-হা ! মোস্তফা ত একা ফাতেমার পিতা ছিলেন না। প্রত্যেক দুস্থ, অভাবগ্রস্ত মোছলেম নর-নারীর—না, না—প্রত্যেক আর্তের, প্রত্যেক ব্যথিত মানব-হৃদয়ের সকল দুঃখ ও সকল বেদনা দূর করাই যে সেই মহামানবের স্বভাব ধর্ম।

কোরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, বিপদসঙ্কুল স্থানসমূহে নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে এছলাম প্রচার এবং দুস্থ মোছলেম নর-নারীগণের সেবাই এই সন্ন্যাসীসঙ্ঘের প্রধান সাধনা ছিল। দুষ্ট-কপটীদিগের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া ইঁহাদের ৭০ জনকে নাজদে এছলাম প্রচারের জন্য পাঠান হইয়াছিল, এবং পথিমধ্যে তাঁহাদের প্রত্যেকেই কাফেরগণের খরধার কৃপাণ বক্ষে গ্রহণ করিয়া এছলামের সেবায় সানন্দে আত্মদান করিয়াছিলেন। স্মরণ করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, এই শহীদগণের লাশের গোরও হয় নাই, কাফনও হয় নাই ; মরিয়াও তাঁহারা নিজেদের দেহের মাংস দিয়া শত শত বুভুক্ষু শকুনি-গৃধিনীর উদরজ্বালা নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।**

## সন্ন্যাস ও এছলাম

এখানে এই সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে যে, এছলাম সন্ন্যাস বা 'রাহ্‌বানিয়াতের' অনুমোদন করে না হযরত বলিয়াছেন لا رهبانية في الإسلام অর্থাৎ এছলামে

---

* মাইশাতুন্নবী।

** মাওলানা শিবলী নোমানী, মোস্তদরেক, মোছনাদ, বোখারী, তবকাতে প্রভৃতি হইতে আছহাবে ছুফ্‌ফার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত সার এখানে সঙ্কলিত হইয়াছে

রাহবানিয়াত নাই' কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে এই রোহবান ও রাহবানিয়াতের প্রতিবাদসূচক মন্তব্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় আছহাবে ছুফ্‌ফার সাধনাসমূহের সহিত এই সকল শাস্ত্রীয় বচনের সামঞ্জস্য থাকিতেছে না। এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যক হইবে।

প্রথমে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আছহাবে ছুফ্‌ফার কর্মীমণ্ডলী হযরতের সময়ে এবং এছলামের প্রাথমিক অবস্থাতেই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ প্রণালীতে নিজেদের কর্মজীবন অতিবাহিত করিতেন, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিষয় হযরতের জানা ছিল এবং তাহা অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের কথা। অথচ হযরত তাঁহাদিগকে যে বিশেষ করিয়া সাধনার এই প্রণালী পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, তাহারও কোনই প্রমাণ নাই। বরং হাদীছ ও ইতিহাসে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, হযরত এই কর্মযোগী দলের ক্রিয়াকলাপের সমর্থন করিতেন, ধর্ম ও সমাজের সেবাকল্পে ইহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিতেন-ইহাদিগকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, হযরত কার্যতঃ এই প্রণালীর সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পর, কোরআন ও হাদীছের প্রবচনগুলির উল্লেখ করিয়া সামঞ্জস্য সম্বন্ধে যে সংশয় উপস্থিত করা হয়, তাহা আমাদের গবেষণা ও প্রণিধানের অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাহবানিয়াৎ সম্বন্ধে বর্ণিত আয়ৎ ও হাদীছ যথাযথভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে আমাদের এই ভ্রম সহজে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। প্রথমে কোরআনের আয়তগুলির আলোচনা করিতেছি।

কোরআনে সূরা তওবায়, ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির শোচনীয় পতন এবং পতনের মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله

অর্থাৎ "ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ যথাক্রমে নিজেদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদিগকে আল্লাহরূপে গ্রহণ করিয়াছে—এবং আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে।" ইহার ব্যাখ্যা হাদীছেই আছে। হযরত এই আয়ৎ পাঠ করিলে একজন ছাহাবা জিজ্ঞাসাচ্ছলে নিবেদন করিলেন, ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ নিজেদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদিগকে কখনই ত পূজা করিত না ? হযরত বলিলেন—কিন্তু সেই পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণ যে কোন কাজকে হালাল (বৈধ) বলিয়া প্রকাশ করিত, তাহারা (ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ) অন্ধের ন্যায় তাহাকে সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইত, পক্ষান্তরে তাহারা কোন কাজকে অসিদ্ধ বলিয়া দিলে, সকলে তাহাকে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইত ; ইহাই পূজা *

মানবের জ্ঞান ও বিবেককে অন্ধভক্তির অন্ধকারময় কুঠুরীতে আবদ্ধ করিয়া যাহারা এইভাবে নিজদিগকে বা অপর কাহাকে আল্লাহর আসনে বসাইয়া অজ্ঞ মানব সমাজের দ্বারা পূজিত হয়, তাহারাই মানব সমাজের প্রধান শত্রু, তাহারাই সত্য ধর্মের প্রধানতম বৈরী। ইহাই ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির অধঃপতনের প্রধানতম কারণ হইয়াছিল। আয়তে নর-পূজার এই ঘৃণিত নীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু ছুফ্‌ফার কর্মযোগী মহাত্মাগণের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য নাই। ফলতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদিগের যে স্বরূপকে এখানে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে, তাহা যুগে যুগে নিষিদ্ধ এবং মোছলেম নামধারী মৌলবী ও পীরদিগের সম্বন্ধেও তাহা সমানভাবে প্রযোজ্য। সে যাহা হউক, আলোচ্য আয়তে মূলতঃ রাহবানিয়াতের প্রতিবাদ করা হয় নাই, বরং লোকে রোহবানদিগের মর্যাদা নির্ণয়ে যে অতিরঞ্জন করিয়া থাকে, তাহারই প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে বলিতে হইবে যে, সন্ন্যাস অবলম্বনের ন্যায়, বিদ্যা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনও নিষিদ্ধ। কারণ, আয়তে রোহবানদিগের সহিত আহবারগণকেও একই পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

---

* তিরমিজী—তফছীর প্রভৃতি।

ছুরা হদীদের শেষভাগে, একটি আয়তে রাহবানিয়াতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আয়তটি এই ঃ

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ
اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ (حديد)

অর্থাৎ—"এবং তাহারা যে রাহবানিয়াতের সৃষ্টি করিয়াছে, আমরা তাহাদিগের উপর তাহা ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) করি নাই। (বরং তাহারাই) মাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাহার সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা যথাযথভাবে (নিজেদের আবিষ্কৃত এই) রাহবানিয়াতের মর্যাদা রক্ষা করিল না, অপিচ তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমানদার আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মজুরী দান করিলাম, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অনাচারী।" এই আয়তে এইটুকু জানা যাইতেছে যে, হযরত ঈছার পরলোকে গমনের পর খ্রীষ্টানেরা যে শ্রেণীর সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য অথবা মোটের উপর যে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা তাহাদেরই আবিষ্কার, আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি সেই বৈরাগ্য অবলম্বন করা 'ফরয' করেন নাই। কিন্তু সেই প্রাথমিক খ্রীষ্টানগণের সেই বৈরাগ্য যে মন্দ কাজ, আয়তে ইহা বলা হইতেছে না। বরং পরবর্তী আয়তগুলি পাঠে তাহার সমর্থনই জানা যাইতেছে। নচেৎ 'যথাযথভাবে তাহারা সেই বৈরাগ্যের মর্যাদা রক্ষা করিল না' বলিয়া কখনই আক্ষেপ করা হইত না। কিন্তু এখানে আবার এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রকারান্তরে যখন ঐ নবাবিষ্কৃত বৈরাগ্য ধর্মের সমর্থনই করা হইল, তখন 'আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি তাহা ফরয করেন নাই,' এই উক্তির সার্থকতা কি ? এখানে বিস্তৃতভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, কর্মযোগ ও বৈরাগ্যের যে মহাসম্মেলনে আহ্‌ছাবে ছুফ্‌ফার সর্বত্যাগী ও কর্মী সন্ন্যাসীদিগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও সত্তা দুই দিকের দুই দল অজ্ঞ চরম পন্থীর অতিরঞ্জন ও টানাটানির ফলে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পতিত ও দুর্বল জাতির উত্থান প্রসঙ্গে, মুক্তিমার্গের প্রথম পদনিক্ষেপের প্রাক্কালে—আহ্‌ছাবে ছুফ্‌ফার ন্যায় কর্মযোগী সন্ন্যাসীদলের একান্ত আবশ্যক। সুতরাং এই বৈরাগ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা যথাসম্ভব প্রত্যেক সমাজ হিতচিকীর্ষুর পক্ষে একান্ত কর্তব্য। কিন্তু সংক্ষেপে এই

گلچین بہار تو ز داماں گلہ دارد প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, এক কথায় বলা যাইতে পারে

যে, বর্ণিত আয়তে খ্রীষ্টানদিগের আবিষ্কৃত সন্ন্যাসকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই, কারণ স্থান কাল-পাত্রাদির হিসাবে দুর্বলচেতা লোকদিগের পক্ষে তাহাই মন্দের ভাল ছিল। কিন্তু ইহা বৈরাগ্যের অতি নিকৃষ্ট স্তর। সেই জন্য আল্লাহ্ ইহার আদেশ প্রদান করেন নাই। মোটের উপর কথা এই যে, কোন একটা বিষয় নিষিদ্ধ না হওয়া—আর তাহা আদর্শরূপে নির্ধারিত হওয়া, এই দুইটি ব্যাপারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কোরআন কর্মযোগীর কর্তব্যের কি আদর্শ নির্ধারিত করিয়াছে আলোচ্য আয়তের উপক্রমভাগে তাহা স্পষ্টতর ভাষায় ব্যক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ - إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔

"আমরা নিজ রছুলদিগকে প্রোজ্জ্বলমান নিদর্শনসমূহ দিয়া প্রেরণ করিয়াছি, এবং তাহাদিগের সঙ্গে কেতাব অবতীর্ণ করিয়াছি এবং (ন্যায়ের—তুলাদণ্ড (অবতীর্ণ করিয়াছি)—যেন মানব সমাজ ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ; এবং (নিদর্শন, শাস্ত্র ও ন্যায় দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে) লৌহকে অবতীর্ণ করিয়াছি,—উহা দ্বারা ভীষণ সমর (পরিচালিত হয়) এবং তাহাতে মানবের মহামঙ্গল নিহিত—আল্লাহ্ জানিতে চাহেন, কে অজ্ঞাতসারে তাহাকে এবং তাঁহার

রছুলদিগকে (ঐ লৌহের খরধার অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা ন্যায়ের ধর্ম-সমরে) সাহায্য করিবে !—অথচ তিনি মহাশক্তিশালী ও প্রবল।"

এই আয়তে রছুল, তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রপ্রভাব, তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত কেতাব এবং ন্যায়ের তুলাদণ্ডের কথা পর পর বলা হইয়াছে। কিন্তু জগতে ন্যায় ও বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ কাজ নহে। প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্বলকে রক্ষা করিতে হইলে, মানব সমাজকে ন্যায় ও বিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এবং বলদৃপ্ত অত্যাচারীর কবল হইতে মানব-সাধারণের স্বত্বাধিকারগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে, তোমার আবশ্যক হইবে লৌহের—লৌহ নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের। অন্যায় ও অধর্মকে দলিত-মথিত করিবার একমাত্র অবলম্বন—চরম উপকরণ ইহাই। এই অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে তোমাকে অন্যায়, অধর্ম ও অবিচারের বিরুদ্ধে ভীষণ সমর বাধাইয়া দিতে হইবে। অত্যাচারীর মুণ্ড—শরীর সংযুক্ত থাকিয়া হউক বা দেহচ্যুত হইয়া হউক—ন্যায়ের সিংহাসন তলে লুণ্ঠিত করিয়া, তাহাকে দমিত করিয়া, তাহার গর্বস্ফীত বক্ষপঞ্জরগুলিকে দলিত-মথিত করিয়া, ঐ লৌহের সাহায্যে জোর করিয়া দুনিয়ায় ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও জয়যুক্ত করিতে হইবে। তোমার ধার্মিকতার দাবী ভণ্ডামীর ভান, না সত্যিকার ঈমান !—তোমার ভগবৎ প্রেম, তোমার মহাপুরুষগণের ভক্তি, তোমার ন্যায়নিষ্ঠা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী, অগ্নি-পরীক্ষার টাকশালে কতটুকু টিকিতে পারে, আল্লাহ্ তাহাও জানিতে চাহেন।

সত্য সনাতন এছলামের* যে কর্মযোগ, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট আত্মত্যাগের যে আদর্শ, তাহা উপরের আয়তে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আছহাবে-ছুফ্‌ফা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই ন্যায় ও ধর্মের প্রতিষ্ঠায় নিজদিগকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। অত্যাচারীর খরধার তরবারি প্রথমে তাঁহাদের মস্তকে পতিত হইত ; ধর্মদ্রোহী পাষণ্ডের খরশাণ কৃপাণকে তাঁহারাই প্রথমে আলিঙ্গন দান করিতেন, আবার পাপ ও অত্যাচারের মস্তকে প্রথম কুঠারাঘাত তাঁহারাই করিতেন। তাঁহারা নিজদিগকে ত্যাগ করেন নাই—দান করিয়াছিলেন। যখন সত্যধর্মের গ্লানি হইতেছিল, যখন ন্যায় ও মানবতা ক্ষুব্ধ হইতেছিল, শয়তানের তাণ্ডব নৃত্যে যখন ধরাবক্ষ টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছিল, অথচ সত্যের সেবক মোস্তফাকে সাহায্য করিবার ও তাঁহার ইঙ্গিত ও উপদেশ মতে এছলামের সেবায় আত্মদান করার লোকের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল, তখন আছহাবে ছুফ্‌ফার মুক্ত মহামানবগণ একাধারে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ধর্মের প্রচারক, কোরআনের অধ্যাপক, দুস্থ নর-নারীর সেবক, দরিদ্র পরিবারের অন্ন সংগ্রাহক, বৃদ্ধ বিধবার কাষ্ঠাহরক প্রভৃতি কার্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। হযরতের মুখের একটা বাণী শুনিবার জন্য তাঁহারা চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, আর সর্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল কর্মে আত্মদান করিতেন। ইহাতে কোন স্থলে নির্বিঘ্নে বা অল্প বিঘ্নে জয়যুক্ত হইতেন, আর স্থানে স্থানে নিজেদের হৃৎপিণ্ডের তপ্ত শোণিত দিয়া অত্যাচারী শয়তানের পদলেখাগুলি ধুইয়া ফেলিতেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতেন তাঁহারা ক্রমে-ক্রমে, তিলে-তিলে, পলে-পলে মরণকে বরণ করিতেন। অহো-হো ! এ মরণ বুঝি আরও কঠিন, আরও মধুর !

রোহবান ও রাহবানিয়াৎ শব্দের ধাতু র-হ-ব, ইহার অর্থ ভীতি বা আতঙ্ক। সুতরাং ধাতুগত অর্থের হিসাবে রোহবান শব্দের অর্থ হইতেছে—ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তি। খৃষ্টান যাজকগণ রাজদণ্ড এবং অজ্ঞ জনসাধারণের অত্যাচারের ভয়ে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ঐ অন্যায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করা এবং সত্যকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা তাঁহাদের উচিত ছিল। কিন্তু মানসিক দুর্বলতা হেতু

---

* প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক সত্যধর্মই এছলাম—এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মহামানব ও নবী-রছুলই এছলামের আদর্শ ও সম্প্রদায়ই, ইঁহাদের কাহারও অসম্মান করিলে কাফের হইতে হয়, ইহা এছলামের বিধান।

তাঁহারা তাহা করিতে না পারিয়া সত্য সেবার তৃতীয় বা নিকৃষ্টতর স্তরে গিয়া উপনীত হইলেন, এবং পাহাড়ে-পর্বতে লুকাইয়া, লোকালয় হইতে দূরে পলায়ন করিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র দেহ, ক্ষুদ্র বক্ষ ও তাহার ক্ষুদ্র বিশ্বাসটুকুকে বাঁচাইয়া তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করিলেন। খৃষ্টানের এই আদর্শ আজ মুছলমান সমাজের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

দুই আদর্শে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, বোধ হয় পাঠকগণ এখন তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। হযরত বলিয়াছেন—'জেহাদকে কখনই ত্যাগ করিও না, উহাই আমার উম্মতের সন্ন্যাস (রাহ্‌বানিয়াৎ)।' সুতরাং আমরা দেখিতেছি, সন্ন্যাসের প্রকার ও স্বরূপ লইয়া মতভেদ, মূল সন্ন্যাসকে এছলাম সমর্থন করিয়াছে। এছলামের সন্ন্যাস ও আছহাবে ছুফ্‌ফার আদর্শ, এবং জগতের সাধারণ সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের আদর্শ, দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, এছলাম বলিতেছে—একদল লোক মানবের সেবা ও মুক্তির সাধনার জন্য কর্তব্যের আহ্বানে কর্মের কঠোর সমরে প্রাণপণে ঝাঁপাইয়া পড়িবে—নীরবে নিজের জীবন-যৌবন বিলাইয়া দিবে; ক্ষুদ্র আত্মীয়তা ও সঙ্কীর্ণ সংসারের মায়া-মোহ হইতে মুক্ত থাকিয়া, তাহারা বিরাট জাতি ও বিশাল বিশ্বকে আপনার আত্মীয় ও নিজের পরিজন বলিয়া মনে করিবে—তাহাদের সেবা ও মুক্তির জন্য আপনার যথাসর্বস্ব দান করিবে; স্বদেশ ও স্বজাতির চরম অধঃপতন এবং অন্যায় ও অধর্মের প্রবল প্রাধান্যের সময়, আছহাবে ছুফ্‌ফার ন্যায় এক দল সর্বত্যাগী কর্মযোগীর বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে।

آن کس است اہل بشارت کہ اشارت داند

نکتہ ہا ہست بسے محرم اسرار کجاست؟

## পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

### انما المؤمنون اخوة

### প্রথম হিজরীর অন্যান্য ঘটনা

### আবদুল্লাহ্‌র এছলাম গ্রহণ

আবদুল্লাহ্-এবন-ছালাম মদীনাবাসী ইহুদী সমাজের প্রধানতম পণ্ডিত। মদীনা ও পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের সমস্ত ইহুদী তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। যখন হযরতের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় মদীনায় আগ্রহ ও উৎসাহ-মিশ্রিত আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তখন এই ইহুদী পণ্ডিতও তাঁহার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় বিশেষ উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইহুদী যাজকগণ শাস্ত্রের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ও কূটাদপিকূট বিতণ্ডার বিশ্লেষণ করিতে করিতে স্বভাবতঃ ভক্তি ও বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা জগতকে সংশয় ও সন্দেহের চক্ষে দেখিত। আবদুল্লাহ্‌ও এই ভাব লইয়া বহু-বিশ্রুত আরবীয় নবীর ভাবগতিক পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি নিজেই সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, হযরতের মুখ দেখিয়াই যেন আমার আত্মা বলিয়া উঠিল—'ইহা ভণ্ড ও মিথ্যাবাদীর মুখ নহে।' আবদুল্লাহ্ এখানেই নিবৃত্ত হইলেন না। আবু-আইউব আনছারীর গৃহে হযরতের বিশ্রাম করার পর, আবদুল্লাহ্ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত কয়েকটা জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করতঃ হযরতকে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। হযরত সংক্ষেপে কয়েকটা কথায় তাহার এমন সুন্দর ও সন্তোষজনক উত্তর দিলেন যে, তাহা শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে, আবদুল্লাহ্‌র যুগ যুগান্তরের জটিল যুক্তিতর্ক ও কুটিল দার্শনিকতা-জর্জরিত হৃদয়ে একটা অভিনব তৃপ্তি, শান্তি ও ভক্তির উদ্রেক হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তৌরাতের বর্ণিত লক্ষণাদির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াও, তাঁহার বিশ্বাস ঈমানে পরিণত হইল, এবং তিনি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বীকার করিলেন যে, নিশ্চয় মোহাম্মদ সত্যের বাহক ও আল্লাহর সেই সত্য রছুল।

আবদুল্লাহ্-এবন-ছালাম এছলাম গ্রহণের পর হযরতের খেদমতে আরজ করিলেন—'ইহুদিগণ আমাকে তাহাদের প্রধান পণ্ডিত ও সমাজপতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, আমার পিতা সম্বন্ধেও তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এখন আমার এছলাম গ্রহণের সমাচার প্রকাশ না করিয়া আপনি তাহাদিগকে ডাকিয়া আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন।' হযরত ইহুদীদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে সত্যধর্ম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য যে, ইহুদিগণ তাহা স্বীকার করিল না। তখন হযরত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের আবদুল্লাহ্-এবন-ছালাম লোকটি কেমন ?

ইহুদীগণ ঃ তিনি মহাপুরুষের বংশধর, নিজেও একজন মহাপুরুষ। তিনি মহাপণ্ডিতের বংশধর ও নিজেও মহাপণ্ডিত। তিনি আমাদের ছরদারজাদা ছরদার।

হযরত ঃ আচ্ছা, আবদুল্লাহ যদি আমাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করেন, তিনি যদি এছলাম গ্রহণ করেন ?

ইহুদীগণ ঃ আরে সর্বনাশ ! তাহাও কি কখনও সম্ভব !

তখন হযরতের আহ্বানে আবদুল্লাহ অন্তরাল হইতে বহির্গত হইলেন এবং সমবেত ইহুদীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'তোমরা সকলেই জানিতেছ যে, ইনিই আল্লাহর সেই সত্য রছুল, তাঁহাতে বিশ্বাস কর, মুক্তি পাইবে।' ইহুদিগণ তখন বিপরীত সুর ধরিয়া বলিতে লাগিল, আমরা প্রথমে ঠিক কথা বলি নাই। আবদুল্লাহ্ একটা আস্ত পাজী, ভয়ানক পাষণ্ড, তার চৌদ্দপুরুষ পাষণ্ড—ইত্যাদি।

আবদুল্লাহ বলিতেছেন—আমি যখন প্রথমে হযরতের সাক্ষাৎলাভ করি, তখন হযরত সহচর ও উপস্থিত জনগণকে "প্রকৃত পুণ্য কি," তাহা বুঝাইয়া দিয়া বলিতেছিলেন ঃ

افشوا السلام، واطعموا الطعام، وصلوا في الليل والناس نيام

"হে লোক সকল ! সকলকে শান্তি ও প্রেমপূর্ণ অভিভাষণ কর, সকলকে অন্ন ভক্ষণ করাও, এবং নিস্তব্ধ নির্জন নিশীথে—যখন সমস্ত লোক ঘুমাইয়া থাকে—তখন নামাযে লিপ্ত হও।"*

## আনছারগণের মহত্ত্ব

মদীনার মুছলমানগণ এই সময় ত্যাগ ও মহত্ত্বের যে অভূতপূর্ব আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইমাম বোখারী প্রমুখ হাদীছ ও ইতিহাস সঙ্কলকেরা তাহা বিস্তৃতরূপে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রবাসী মোহাজেরগণ নিজেদের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া যখন দলে দলে মোস্তফা-নগরে আসিয়া সমাগত হইতে লাগিলেন, তখন সেই ক্ষুধিত পিপাসাতুর ভ্রাতা-ভগ্নীদিগের সেবার জন্য মদীনার মোছলেম সমাজে আগ্রহের সীমা রহিল না। কিন্তু সকলের ইচ্ছা আগন্তুক প্রবাসীকে তিনিই লইবেন, তিনিই আপনার ধন-সম্পত্তি দিয়া সেই দুস্থ ভ্রাতাকে সুস্থ করিবেন। কাজেই অনেক সময় ইহা লইয়া আনছারগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়া যাইত এবং অবশেষে 'কোরআ' বা গুটি দ্বারা ঠিক করা হইত যে, নবাগত মুছলমান কাহার অতিথি হইবেন। অতিথি বলিলে ভুল হয়, আনছারগণ মোহাজেরদিগকে সর্বতোভাবে নিজেদের সহোদর ভ্রাতারূপেই গ্রহণ করিতেছিলেন।

## ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

মদীনার মসজিদ নির্মাণ শেষ হওয়ার পর, হযরত انما المؤمنون اخوة 'নিশ্চয় মুছলমানবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা ব্যতীত আর কিছুই নহে'—কোরআনের এই পবিত্র উপদেশ অনুসারে ঘোষণা করিলেন—শ্রবণ কর হে প্রবাসি মোহাজের ! শ্রবণ কর হে মদীনাবাসী আনছার ! এ আল্লাহর আদেশ—"এক মুছলমান অন্য মুছলমানের ভাই।"

---

* বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি। আবদুল্লাহ্ [illegible] হিজরতের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের [illegible]। [illegible]

মদীনায় আনন্দ-উৎসবের বান ডাকিল, প্রেম-মদিরা পান করিয়া মোহাজেরগণ মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন—হযরত মদীনাবাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা ধর্ম সম্বন্ধে এক-একজন প্রবাসীকে ভ্রাতৃরূপে নির্ধারিত করিয়া লও।' পূর্বে সাধারণভাবে যে ভ্রাতৃভাবের উন্মেষ হইয়াছিল, আজ তাহারই বিশেষ প্রতিষ্ঠা। হযরতের উপদেশ শ্রবণ মাত্রই মোহাজের ও আনছারগণ মদীনার এক গৃহ-প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন, এবং হযরতের ইঙ্গিতমতে ভ্রাতৃনির্বাচন হইতে লাগিল। ইতিহাসে মোহাজের ও আনছার ভ্রাতৃযুগলগণের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।* স্থান-সঙ্কীর্ণতা হেতু আমরা তাঁহাদের নামের দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিতে পারিলাম না।

## নির্বাচনের বিশেষত্ব

এই নির্বাচন-ব্যাপারে একটি সূক্ষ্ম বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। একজন আনছার ও একজন মোহাজেরকে লইয়া এই 'যুগল' নির্বাচন হইয়াছিল বটে। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, হযরত এই নির্বাচনে উভয় দলের লোকদিগের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। সকলের মানসিক গতি, রুচি ও প্রকৃতি সম্যকরূপে অনুশীলন করিয়া, ঠিক যাহাকে যাহার সহিত যুক্ত করিয়া দিলে তাঁহাদের আত্মাগুলিও পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে, মানব-চরিত্রের মহাপণ্ডিত নিরক্ষর মোহাম্মদ মোস্তফা ঠিক তেমনটি করিয়াই এই যুগল নির্বাচন করিয়াছিলেন। ছহিদ এবন-জায়েদের সহিত কা'বের পুত্র ওবাই, ছা'আদ-এবন-মো'আজের সহিত আবু-ওবায়দা, কি আশ্চর্য সম্মিলন। আবার বেলালের সহিত আবু-রোওয়ায়হা এবং সালমানের সহিত আবুদারদা! ব্যবসায়-প্রিয় আবদুর রহমান এবন-আওফের সহিত মদীনার ধনস্বামী ছা'আদ-এবন-রবীর সম্মেলন। ইহা কি অসাধারণ প্রতিভা নহে।

প্রবাসী মুছলমানগণ এতদিন এক হিসাবে অতিথিরূপে কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু আজ আর তাঁহারা মেহমান নহেন, অতিথি নহেন—আজ তাঁহারা কার্যতঃ আনছারগণের সহোদর ভাই। কাজেই আনছারগণ বলিয়া উঠিলেন, হযরত! ভাইকে ভাইয়ের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিব না। আমাদের বিষয় সম্পত্তি—এই কৃষিক্ষেত্র, খেজুর বাগান ও ঘর-বাড়ী—যাহা কিছু আছে, ভাইকে অর্ধেক করিয়া ভাগ করিয়া দিন। কিন্তু কথা উঠিল, মোহাজের ভ্রাতারা বণিক জাতি, কৃষিকার্য তাঁহারা জানেন না ও করিতে পারিবেন না। তখন আনছারগণ নিজেরাই স্থির করিয়া দিলেন—দুই ভাই যখন, তখন সম্পত্তি অর্ধেক ত তাহার প্রাপ্যই। আমরা যদি এই অসমর্থ ভাইগুলির বিষয়কর্মগুলি একটু দেখিয়া শুনিয়া না দেই, তাহা হইলে আমাদের ভ্রাতৃত্বের দাবী মিথ্যা। কাজেই স্থির হইল যে, মোহাজের ভ্রাতার প্রাপ্য অর্ধেক কৃষিক্ষেত্র ও কাননাদি আনছারগণই আবাদ করিয়া দিবেন, সমস্ত শস্য মোহাজের ভ্রাতারই প্রাপ্য হইবে।**

এই সম্মিলনের কথা কোরআন শরীফে, আনফাল সূরার শেষ রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে :

'নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও হিজরত করিয়াছে এবং নিজেদের ধনপ্রাণ লুটাইয়া দিয়া আল্লাহর পথে জেহাদ করিয়াছে—তাহারা এবং মদীনার সেই সকল বিশ্বাসিগণ, যাহারা তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে, তাহারা একে অন্যের 'অলি'—নিকটাত্মীয়।'

এই আয়তের বচন অনুসারে, প্রথম প্রথম প্রবাসী মুছলমানদিগকে উত্তরাধিকারের স্বত্ব পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। কোন আনছার পরলোক গমন করিলে জাবিল-আরহাম বা দূরবর্তী আত্মীয়দিগকে বঞ্চিত করিয়া এই "ধর্মভাই" তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিতেন। কিছুদিন পরে—সম্ভবতঃ বদর সমর শেষ হইয়া গেলে—এই উত্তরাধিকার স্বত্ব রহিত হইয়া যায়। সূরা

---

* দেখুন—এবন-হেশাম ১—১৭৯ প্রভৃতি। ** বোখারী ১৫—৪১০ প্রভৃতি

দেখা, আনফাল ও আহজাবের বিভিন্ন আয়াতে ইহার উল্লেখ আছে। ইমাম বোখারী সুরা দেছার তফছির ও ফারায়েজ প্রভৃতি অধ্যায়ে এই হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন। আবু-দাউদ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থেও এই বিবরণটি উল্লিখিত হইয়াছে।

আনছারগণ সকলে অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন না। বরং তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই যে দরিদ্র ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিন জনৈক ক্ষুধিত ব্যক্তি হযরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, হযরত প্রথমে নিজের গৃহে সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পানি ব্যতীত বাটীতে আর কিছুই নাই। তখন তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন—অদ্য কে এই ক্ষুধার্তের সেবা করিবে? আবু-তালহা ছাহাবী নিবেদন করিলেন—"আমি"। আবু-তালহা বাটী গিয়া জানিতে পারিলেন, কেবল তাঁহার সন্তানগণের আবশ্যক মত কিছু খাদ্য আছে। আবু-তালহা ও তাঁহার স্ত্রী শিশুসন্তানগুলিকে ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিলেন, গৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া হইল, এবং (আরবীয় প্রথা অনুসারে) উভয় স্বামী-স্ত্রী সেই অতিথির সহিত দস্তরখানে বসিয়া এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন তাঁহারাও খাইতেছেন। এমনই ভাবে সকলে উপবাস করিয়া ক্ষুধিত অতিথির সেবা করিলেন।* কোরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়তে এই ঘটনার উল্লেখ আছে ঃ

ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة

'এবং তাহারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইয়াও, অন্যের অভাবকে নিজেদের অভাব অপেক্ষা অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে।' মহানুভব আনছারগণ কি অবস্থায় এবং কেমন করিয়া এছলামিক ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, এই সকল বিবরণ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

## মোহাজেরগণের আত্মনির্ভরশীলতা

আনছারগণের ত্যাগের এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মোহাজেরদিগের আত্মনির্ভরশীলতার বিষয়ও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনছারগণের মহানুভবতায় একান্ত কৃতজ্ঞ হইলেও প্রবাসী মোহাজেরগণ প্রথম দিবস হইতে নিজেদের কায়িক পরিশ্রম ও ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা নিজেদের উপজীবিকা সংগ্রহের জন্য তৎপর হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ আদৌ আনছারগণের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। মদীনার প্রধান ধনী ছা'আদ-এবন-রবী প্রবাসী আবদুর রহমানের ভ্রাতৃরূপে নির্বাচিত হইলে ছা'আদ ভাবের আবেশে মাতোয়ারা হইয়া যখন নিজের সমস্ত ধন-সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ (এমন কি তাঁহার দুই স্ত্রীর মধ্যে একটি) স্বীয় ধর্মভ্রাতাকে দান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন আবদুর রহমান শান্ত সংযত ভাষায় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতঃ ধন্যবাদসহকারে বলিলেন,—'ভাই, আমাকে তোমাদের বাজারের পথ দেখাইয়া দাও।' তখন লোকে তাঁহাকে 'বানি কাইনোকা' বাজারের পথ দেখাইয়া দিল। আবদুর রহমান প্রথমে মাথায় মোট করিয়া সেই বাজারে সামান্য ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, এবং কালে তদ্দ্বারা বহু ধনের অধিপতি হইয়া পড়িলেন।** এইরূপে হযরত আবু-বাকর, ওমর, ওছমান প্রভৃতি মহাজনগণ অবিলম্বে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া নিজেদের উপজীবিকা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।*** আনছারদিগের প্রদত্ত সম্পত্তি যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিছুদিন খোদার কৃপায় অভাবমুক্ত হওয়ার পর তাঁহারা তৎসমস্তই আবার তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।****

---

* বোখারী ১৬—৫৩৫ মোছলেম প্রভৃতি। ** বোখারী ১৭—৪১০ এছাবা

*** ইছাবা, এবন-হাম্বল ৩—১১৬০৭, মোছনাদ ২—৯২, ৪—৪০০, ৫—৩৪৭ প্রভৃতি

**** মোছলেম—জেহাদ, ২—২১

মদীনার মছজিদ নির্মিত হওয়ার পর কিছুদিন পর্যন্ত লোকে অনুমানের দ্বারা নামাজের সময় নিরূপণ করিয়া মছজিদে আগমন করিতেন। তখনও আজান দিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই।* ইহাতে যে অসুবিধা হইতে লাগিল, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শাম্য ও সম্মেলনের যে মহামূল্য নীতি এছলামের সকল এবাদতের—বিশেষতঃ নামাজের—একটা প্রধানতম লক্ষ্য, এই প্রকার বিক্ষিপ্তরূপে নামায সম্পাদিত হওয়ায় তাহা সম্যকরূপে সুসম্পন্ন হইতেছিল না। এই সময় হযরত একদা ছাহাবাগণকে লইয়া এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে বসিলেন।** আলোচনা প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিলেন, খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় ঘন্টা বাজাইয়া সকলকে নামাযের সময় জানাইয়া দেওয়া হউক। কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন, ইহুদীদিগের ন্যায় শিঙ্গা বাজাইয়া বা মজুছদিগের মত আগুন জ্বালাইয়া সকলকে নামাযের জন্য আহ্বান করা হউক।*** কিন্তু ইহার প্রত্যেক প্রস্তাবকেই হযরত 'নাপছন্দ' করিলেন।**** হযরত ওমরও তখন সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, একটা লোক পাঠাইয়া সকলকে ডাকিয়া আনিলে হয় না ? হযরত ইহার কোন উত্তর না দিয়া বেলালকে বলিলেন—উঠিয়া লোকদিগকে নামাযের জন্য আহ্বান কর।§

সেই শুভদিনের শুভ মুহূর্ত হইতে মদীনার পবিত্র মছজিদে আজানের প্রবর্তন হইল, এবং আজ সাড়ে তের শত বৎসর ধরিয়া জগতের প্রায় প্রত্যেক জনপদে সর্বশিল্প ও কলরবাদির কোলাহলকে জয় করিয়া দিনে পাঁচবার সেই করুণাময় মহিমময় আল্লাহর নামের জয়জয়কারে তাঁহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিতেছে। আজান শব্দের অর্থ আহ্বান নহে—ঘোষণা। নামাযের জন্য আহ্বান ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য হইলেও, নিখিল সকল দেহে রোমাঞ্চ তুলিয়া তওহীদের জয় ঘোষণা করাই ইহার গৌণ ও সূক্ষ্মতম লক্ষ্য।

## আজানের অর্থ

আজানের প্রথমে তওহীদের সেই বীজমন্ত্র—"আল্লাহু আকবর"—চারিবার ঘোষিত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ পূর্বে সংক্ষেপে নিবেদন করিয়াছি। আল্লাহু আকবর—মহত্তম আল্লাহ ; আল্লাহ আকবর—বৃহত্তম, বিরাটতম আল্লাহ ; আল্লাহ আকবর— প্রিয়তম আল্লাহ, আল্লাহু আকবর শ্রেষ্ঠতম প্রভু আল্লাহ ! একমাত্র তিনিই বড়—আর সমস্ত ছোট, ক্ষুদ্র, হেয়, নগণ্য। তোমার সুখ-সম্পদ, তোমার আরাম-আয়েশ, ধন-প্রাণ, তোমার সকল শান্তি-সোয়াস্তির আশা-আশঙ্কা ; সমস্তই ছোট, সমস্তই ক্ষুদ্র, সমস্তই হেয়, সমস্তই নগণ্য ; তাহার পর দুইবার করিয়া 'আশ্‌হাদো আল্লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'—আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়—তিনি ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই ; আমি এই সাক্ষ্য দিতেছি। 'আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদার রছুলুল্লাহ'—আমি সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত। 'হাইআ আলাছ্‌ছালাহ'—আইস সকলে নামাযের জন্য। 'হাইআ আলাল-ফালাহ'—আইস সকলে জীবনের সফলতা অর্জনের জন্য ; আবার দুইবার আল্লাহ আকবর, তাহার পর মোছলেম জীবনের চরম সাধনা, মানবীয় দেহ ও মনের চরম মুক্তিবাণী, শেষ ঘোষণা—"লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ",—আল্লাহ ব্যতীত মানবের প্রভু আর কেহই নাই।

## আজান সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা

আবু-দাউদ, এব্‌নে-মাজা, দারমী প্রভৃতি গ্রন্থে আব্দুল্লাহ-এব্‌নে-জায়েদ কর্তৃক একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ হাদীছে আব্দুল্লাহ নিজেই বলিতেছেন যে, আজানের শব্দগুলি তিনিই

---

* বোখারী, মোছলেম—ফৎহুল।

** ফৎহ-বারী।

*** বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।

**** এব্‌নে-মাজা প্রভৃতি।

§ বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।

প্রথমে স্বপ্নযোগে জানিতে পারেন। তিনি সেই স্বপ্নের কথা হযরতকে জ্ঞাপন করিলে হযরত তাহাই গ্রহণ করেন এবং বেলালকে ঐ শব্দগুলি বলিয়া দিতে আদেশ করেন। সেই অনুসারে আজান দেওয়া আরম্ভ হইলে—ওমর তাহা শুনিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে মছজিদে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হযরত ! আমিও ঠিক এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি।' যাহা হউক, এই স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত আজানই হযরত কর্তৃক অনুমোদিত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, নানা কারণে আমরা এই হাদীছটাকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। খ্রীষ্টান লেখকগণ এই ঘটনা-প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কারণ, এই হাদীছে ফেরেশ্‌তার গল্প এবং ইতিহাস ও ফেকাহ্ পুস্তকসমূহে বহু লোকের স্বপ্নদর্শনের অতিরঞ্জনে তাঁহাদের পক্ষে ইহার একটা সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই, আমাদিগকে এখানে আলোচ্য হাদীছ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিতে হইতেছে।

## আবদুল্লাহ্‌র হাদীছ অপ্রামাণ্য

আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ ঃ

(১) আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হযরত ঘণ্টা (নাকুছ) বাজাইয়া সকলকে নামাযের জন্য সমবেত করার পর' তিনি এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঘণ্টা বা শিঙ্গা বাজাইবার বা আগুন জ্বালাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। এমন কি হযরত ওমর লোক পাঠাইয়া সকলকে ডাকিয়া আনিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রহণ না করিয়া, হযরত বেলালকে আদেশ করিলেন, দাঁড়াইয়া লোকদিগকে নামাযের জন্য আহ্বান কর। টীকাকারগণ স্বপ্নের বিবরণটিকে সত্য প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্মুখে এই সমস্যা উপস্থিত হয় যে, বোখারী ও মোছলেমের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সভায় আজান সম্বন্ধে পরামর্শ হয়, সেখানে হযরত ওমর উপস্থিত ছিলেন এবং তখন তিনি নিজের স্বপ্ন-দর্শনের কথা বলেন নাই, বরং লোক পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ঐ সকল হাদীছে ইহাও স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সেই মজলিছেই বেলালকে আদেশ করিলেন—দাঁড়াইয়া লোকদিগকে নামাযের জন্য আহ্বান কর। তাহা হইলে আবদুল্লাহ্ ও ওমরের স্বপ্নের বিবরণ মাঠে মারা যায়। প্রথম সমস্যার সমাধান কল্পে, তাঁহারা অনুমান মাত্রের উপর নির্ভর করতঃ এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, দুই দিন করিয়া পরামর্শ সভা বসিয়াছিল। স্বপ্নের বিবরণ হযরতের গোচরীভূত করা হয়—দ্বিতীয় সভায়। তাঁহাদের এই অনুমানের একমাত্র 'প্রমাণ' এই যে, এ-কথা না বলিলে স্বপ্নের গল্পটা উড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সমস্যার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, প্রথম দিন হযরত বেলালকে নামাযের জন্য আহ্বান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে দিন বর্তমান আকারে আজান দেওয়া হয় নাই। সেদিন বেলাল কেবল الصلوة جامعة বলিয়া আজান দিয়াছিলেন। এই অনুমানের প্রমাণ তাঁহারা এবনে-ছা'আদ প্রমুখ ঐতিহাসিকের বিবরণ হইতে দিতে চাহেন। এই প্রমাণের মূল্য যাহাই হউক, এখানে পাঠক তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ রাখিবেন যে, প্রথম দিবস বর্তমান আকারের আজান দেওয়ান হয় নাই, সেদিন বেলাল কেবল 'আচ্ছালাতো-জামেআতুন' বা 'নামাযের জমা'তের জন্য সকলে সমবেত হও'—ইহাই ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই কথাটা স্মরণ রাখার পর আমরা পাঠকগণকে আবার আবদুল্লাহ-এবনে-জায়েদের স্বপ্নের বিবরণ ঘটিত হাদীছের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ঐ হাদীছে স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে যে, নামাযের নিমিত্ত লোকদিগকে আহ্বান করার জন্য হযরত খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় ঘণ্টা বাজাইবার আদেশ দেওয়ার কিছুকাল পরে, রাবী আবদুল্লাহ্ এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এখন পাঠক দেখিতেছেন, বোখারী ও মোছলেমের হাদীছগুলির সমস্যা কাটাইবার জন্য টীকাকারগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সহিত আবদুল্লাহর হাদীছের এই

অংশের সামঞ্জস্য নাই, বরং তাহা পরস্পর বিপরীত। টীকাকারগণের কথা অনুসারে প্রথম দিবসের পরামর্শ মতে, বেলাল 'আচ্ছালাতো-জামেআতুন' বলিয়া আজান দিয়া লোকদিগকে নামাজের জন্য আহ্বান করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে হাদীছকে বাঁচাইবার জন্য এত আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রারম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথম পরামর্শের পর, হযরত ঘণ্টা বাজাইয়া লোকদিগকে সমবেত করার ব্যবস্থা ও আদেশ দান করিয়াছিলেন।

(২) হযরত যে বিধর্মীদিগের অবলম্বিত কোন প্রথার অনুমোদন করেন নাই, বোখারী-মোছলেমের বর্ণিত হাদীছে তাহা জানিতে পারা যাইতেছে। অধিকন্তু বিজাতীয় ও বিধর্মীদিগের অনুকরণ সম্বন্ধে হযরতের যে-সকল কঠোর নিষেধাজ্ঞা হাদীছে বর্ণিত আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেও এক মুহূর্তের জন্যও অনুমান করা যায় না যে, হযরত মোশরেক খ্রীষ্টানদিগের ঘণ্টা ও কাঁসর বাজাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা কেবল অনুমানের কথাই নহে, এবন-মাজা নামক হাদীছ গ্রন্থে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে,—

فذكروا البوق فكرهه من اجل اليهود ثم ذكروا الناقوس فكرهه من اجل النصارى

অর্থাৎ হযরত পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে ছাহাবীগণ ঘণ্টা ও শিঙ্গার কথা বলিলেন, কিন্তু হযরত 'উহা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের অনুষ্ঠান বলিয়া' তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। রাওহ-এবন-আত্তার আর একটি রেওয়ায়াতেও এইরূপ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।* সুতরাং "খ্রীষ্টানদিগের অনুকরণে হযরত ঘণ্টা বাজাইয়া লোকদিগকে নামাযের জন্য আহ্বান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন," এই কথা যে হাদীছে আছে, তাহা আদৌ প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

(৩) এই ঘটনার সময়, অর্থাৎ হিজরীর প্রথম সনে আলোচ্য স্বপ্ন-দর্শন হাদীছের রাবী আবদুল্লাহর বয়স কত ছিল, এখানে তাহাও উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। চরিতকারগণ এ সম্বন্ধে নানা প্রকার পরস্পর বিপরীত কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আবদুল্লাহর পুত্রের এক বিবরণে জানা যায় যে, তাঁহার পিতা ৩২ হিজরীতে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছিলেন।** মেশকাত শরীফ সঙ্কলক আল্লামা খতিব তাব্রেজী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।*** কিন্তু মোহাদ্দেছ হাকেম দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, 'আবদুল্লাহ 'ওহোদ' যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন—ইহাই ঠিক।' অন্যান্য কতিপয় হাদীছ শাস্ত্রবিদেরও এই মত। ওহোদের যুদ্ধ হিজরীর তৃতীয় সনে সংঘটিত হইয়াছিল। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, যে ছাইদ-এবন-মুছাইয়েব আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ এই বিবরণ শ্রবণ করিয়াছেন আবদুল্লাহর মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স কত ছিল? চরিত-অভিধান লেখকগণ বলিতেছেন যে, ছাইদ হযরত ওমরের খেলাফতের দ্বিতীয় সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।**** তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই হিসাবে ছাইদের জন্মের অন্ততঃ দশ বৎসর পূর্বে আবদুল্লাহর মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং এবন-ছা'আদের ন্যায় ঐতিহাসিকের কথার উপর নির্ভর করিয়া, যে ছাইদ আবদুল্লাহর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আবদুল্লাহর মুখে আজান সংক্রান্ত সব ঘটনা অবগত হইয়াছেন—এরূপ বিবরণে বিশ্বাস করা, এবং এহেন সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া বেলালের প্রথম আজানের অন্য স্বরূপ নির্ণয় করা আমরা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। মোহাদ্দেছ এছমাইলীর সংস্করণে, বোখারীর হাদীছে 'নাদে' শব্দের পরিবর্তে 'আজ্জেন' শব্দের উল্লেখ আছে। ইমাম নাছাই 'আজানের প্রারম্ভ' বলিয়া যে অধ্যায়টি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেও এই হাদীছটি আনয়ন করিয়াছেন। দুর্বল হইলেও এমন বহু হাদীছ বিদ্যমান আছে, যাহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, 'আল্লাহ তাআলা মক্কায় অবস্থান কালেই হযরতকে আজান-সংক্রান্ত সমস্ত শিক্ষা

---

* ফৎহুলবারী ২—১৩৪। ** এছাবা।

*** একমাল। **** একমাল।

দিয়াছিলেন।* এখানে ইহা আরও করিয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি যে, শেষোক্ত হাদীছগুলি নির্দোষ না হইলেও ওয়াকেদী বা তাঁহার সেক্রেটারীর ইতিহাসের বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। বর্তমান প্রসঙ্গে সেগুলির সংখ্যাধিক্যের হিসাবেও তাহার গুরুত্ব এবন-ছা'আদের বর্ণনা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক।

আবদুল্লাহর নামকরণে বর্ণিত এই হাদীছটির রাবীদিগের আলোচনা বিস্তারিতরূপে করিব না। ইহার প্রধান রাবী মোহাম্মদ এবন-এছহাক। ভূমিকায় ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। ইমাম মালেক প্রমুখ মোহাদ্দেছগণ ইহার সম্বন্ধে যে সকল তীব্রতর ও কঠোরতম মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, মোহাদ্দেছগণের সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহার ধর্মসংক্রান্ত কোন রেওয়ায়ৎ গ্রহণ করা সঙ্গত নহে।

## অন্যান্য ঘটনা

মদীনার মছজিদ নির্মিত হওয়ার কিছুকাল পরে, হযরতের পরিবারবর্গের জন্য মছজিদ সংলগ্ন স্থানে কয়েকটা ক্ষুদ্র কুটির নির্মিত হইল। হযরত এই সময় স্বীয় পরিজনবর্গকে মদীনায় আনিবার জন্য জায়েদকে কিছু অর্থ দিয়া মক্কায় প্রেরণ করিলেন। হযরতের কন্যাগণের মধ্যে বিবি ফাতেমা তখনও অবিবাহিতা। তিনি ও বিবি ছওদা মদীনায় আনীত হইলেন। বিবি রুকাইয়া তখন তাঁহার স্বামী হযরত ওছমানের সহিত আবিসিনিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। বিবি জয়নাবকে তাঁহার স্বামী আসিতে দেন নাই—তিনি তখনও এছলাম গ্রহণ করেন নাই। বিবি আয়েশা তাঁহার ভ্রাতার সহিত মদীনায় আগমন করেন।**

পাঠকগণ বোধ হয় মহাত্মা আছআদ এবন-জোরারার কথা বিস্মৃত হন নাই। হযরতের মদীনা আগমনের অনতিকাল পরেই আছআদ পরলোকগমন করেন। এছলামের এই প্রধান ও প্রথম প্রচারকের মৃত্যু হইলে ইহুদিগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মোনাফেকগণ বলিতে লাগিল—দেখ, মোহাম্মদ যদি সত্য নবী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বন্ধু কি এমনই করিয়া মরিয়া যাইত? ইহাদের অনুচিত কথা শ্রবণ করিয়া হযরত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

لا املك لى ولا لاصحابى من الله شيئا

'আল্লাহর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে! আল্লাহর কাজের উপর, নিজের বা কোন বন্ধুর সম্বন্ধে কোনই শক্তি বা অধিকার আমার নাই।'*** আজকালকার দরগাহ, কবর ও পীরপূজক 'মুছলমানগণ' কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

হিজরতের পূর্বে নামায দুই রাকআৎ করিয়া ফরজ হইয়াছিল। মদীনা আগমনের পর জোহর ও আছরে চারি রাকআৎ পড়িবার আদেশ হয়। তবে প্রবাসে দুই রাকআৎ পড়ার ব্যবস্থাই বলবৎ থাকে।****

"হযরত মদীনা আগমন করিয়া দেখিলেন, ইহুদিগণ 'আশুরার' রোযা রাখিতেছে। তখন হযরতও সেদিন রোযা রাখিলেন এবং আর সকলকে ঐদিন রোযা রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন।" আজকাল যেরূপ মহরম মাসের দশম দিবসকে বর্ণিত আশুরা বলিয়া নির্ধারিত করা হইয়াছে, তাহার শাস্ত্রীয় ভিত্তি আমি অবগত হইতে পারি নাই।§ হাফেজ এবন-হাজর লিখিতেছেন, 'প্রত্যেক যুগের মুছলমানগণ মহরম মাসের দশম তারিখে আশুরার রোযা রাখিতেন, ইহাই সর্বজন বিদিত।' কিন্তু এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তেবরানী কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীছের

---

* [illegible]

** তবরী ১—২৫৬ প্রভৃতি।

*** তাবরী ১—২৫৭ প্রভৃতি।

**** বোখারী, মোছলেম, তাবরী প্রভৃতি।

§ বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।

উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে এ কথার প্রতিপাদন হইতেছে।* ইহুদীদিগের ব্যবস্থা শাস্ত্র হইতে তাহাদের রোজার নির্ধারিত সময় ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচ্য।

## মদীনায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

মদীনায় শুভাগমন করার পর, মসজিদ নির্মাণ, প্রবাসী বা মোহাজেরগণের অবস্থানাদি এবং অন্যান্য সাংসারিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা কথঞ্চিতভাবে সম্পন্ন হইয়া গেলে হযরত দেশের শান্তিরক্ষা ও মঙ্গল বিধানের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী পল্লীগুলি এখন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তিনটি স্বতন্ত্র 'জাতির' আবাসভূমি। পরস্পর-বিপরীত চিন্তা, রুচি ও ধর্মজ্ঞান সম্পন্ন ইহুদী, পৌত্তলিক ও মুছলমানদিগকে দেশের সাধারণ স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গলবিধানের জন্য, একই কর্মকেন্দ্রে সমবেত করিতে হইলে, তাহাদিগকে একটা রাজনৈতিক 'জাতি' বা 'কওমে' পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যে, এক দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়সমূহ, নিজেদের ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াও, দেশের সেবা-কার্যে একত্র সমবেত হইতে পারে এবং এইরূপ হওয়াই কর্তব্য।

জগতে সর্বপ্রথমে এই আদর্শ স্থাপন করিলেন—হেজাজের মরুপ্রান্তরবাসী নিরক্ষর মোহাম্মদ মোস্তফা। তিনি মদীনার ইহুদী, পৌত্তলিক ও মুছলমানদিগকে একত্র করিয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র বা আন্তর্জাতিক সনদ (International magnacharta) লিপিবদ্ধ করাইলেন, এবং মদীনার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ বিভিন্ন গোত্রের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মানব-সমষ্টিকে লইয়া এক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই আন্তর্জাতিক সনদে, প্রথমে মোহাজের, আনছার ও অন্যান্য মুছলমানদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ, স্বত্বাধিকার এবং তাঁহাদের সমাজগত নিয়মসমূহের শাসন ও বিচারের বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইল। তাহাতে এই কথাটি পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সকল বিষয়ের মীমাংসার ভার মুছলমান জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকিবে। পৌত্তলিকদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম করিয়া তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বীকৃত হইল। তবে ইহুদী ও মুছলমানদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও কতকগুলি সাধারণ শর্তে আবদ্ধ করা হইল। নিম্নে এই প্রতিজ্ঞাপত্র হইতে ইহুদীদিগের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে কয়েকটা ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, দীর্ঘ দস্তাবেজের কতকটা আভাস ইহা হইতে পাওয়া যাইবে।

## আন্তর্জাতিক সনদ

(১) ইহুদিগণ মুছলমানদিগের সহিত এক 'উম্মৎ'।**

(২) এই সনদের অন্তর্ভুক্ত কোন গোত্র বা সম্প্রদায় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, সকলকে সমবেত শক্তি দিয়া তাহা প্রতিহত করিতে হইবে।

(৩) কেহ কোরেশদিগের সহিত কোন প্রকার গুপ্ত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে না, কেহ তাহাদের কোন লোককে আশ্রয় দিবে না, তাহাদের সম্বন্ধে সহায়তা করিবে না।

(৪) মদীনা আক্রান্ত হইলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিবে, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের যুদ্ধ-ব্যয় নিজেরা বহন করিবে।

(৫) ইহুদী-মুছলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্মকর্ম পালন করিতে পারিবে, কেহ কাহারও ধর্মগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৬) অমুছলমানগণের মধ্যে কেহ কোন অপরাধ করিলে, তাহা তাহার ব্যক্তিগত অপরাধ মাত্র বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ তজ্জন্য তাহার বা তাহাদের জাতির স্বত্বাধিকারের কোন প্রকার খর্ব করা হইবে না।

---

* ফৎহুলবারী ১৫—৮১২

** এখানে উহার অর্থ Nation.

(৭) মুছলমানগণ সাধারণতন্ত্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি সদাই সস্নেহ ব্যবহার করিবেন এবং তাঁহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টায় রত থাকিবেন। কোন প্রকারে তাহাদের অনিষ্ট সাধনের সঙ্কল্প তাঁহারা পোষণ করিবেন না।

(৮) উৎপীড়িতকে রক্ষা করিতে হইবে।

(৯) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মিত্র জাতিসমূহের স্বত্বাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে।

(১০) মদীনায় নরহত্যা বা রক্তপাত করা, আজ হইতে 'হারাম' বলিয়া গণ্য হইবে।

(১১) শোণিত পণ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকিবে।

(১২) মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ এই সাধারণতন্ত্রের প্রধান নায়করূপে নির্বাচিত হইলেন। যে সকল বিবাদ-বিসংবাদ সাধারণভাবে মীমাংসিত হওয়া সম্ভবপর না হইবে, তাহার মীমাংসার ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত হইবে। আল্লাহর ন্যায়বিধান মতে তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

(১৩) আল্লাহর নামে—ইহা চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা। যে বা যাহারা ইহা ভঙ্গ করিবে, তাহাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।*

## স্থায়ী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা

যাহাতে ধর্ম ও বংশ লইয়া মদীনাবাসীদিগের মধ্যে আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি না হইতে পারে, যাহাতে পূর্বের ন্যায় দেশবাসীর শোণিতপাত করিয়া জন্মভূমির বক্ষ কলুষিত করা না হয়, কোরেশগণ যাহাতে মদীনা আক্রমণ করিবার সুযোগ না পায়, এই সন্ধিপত্রে তাহারই ব্যবস্থা করা হইল। পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের অধিবাসীদিগকে এবং মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জাতিগুলিকেও এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করা হয়। ফলতঃ যাহাতে ভাবী যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়া যায়, হযরত সেজন্য চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না। এই উদ্দেশে হযরত ওদ্দান, বোওয়াত, জুলআশীরা প্রভৃতি স্থানে স্বয়ং গমন করিয়া, সন্ধিপত্রে স্থানীয় অধিবাসিগণের স্বাক্ষর ও সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।**

কিন্তু মদীনার মোনাফেক বা কপটগণের কুটিলতা, ইহুদীদিগের নীচ ষড়যন্ত্র ও মক্কার কোরেশদিগের হিংসা বিদ্বেষ একত্র সম্মিলিত হইয়া, হযরতের এই সাধুসঙ্কল্পকে স্থায়ী হইতে দিল না। ইহার বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

# একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

## মক্কার ১৩ বৎসর

মক্কাবাসিগণ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা এবং তাঁহার ভক্ত মোছলেম নরনারীগণের প্রতি যে প্রকার নির্মম ও লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিল, যথাস্থানে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি ঃ

১। মোছলেম নরনারীর প্রতি ধারাবাহিকরূপে নানা প্রকার অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছিল, 'কারণ তাহারা বলিল—এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহই আমাদের প্রভু।'***

২। তাহারা মুছলমানদিগের জন্মগত স্বত্বাধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল—তিন বৎসর গিরিসঙ্কটে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

৩। কোরেশগণ মুছলমানদিগকে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদের সম্পত্তি এমন কি স্ত্রী পুত্রদিগকেও কাড়িয়া লইয়াছিল।

---

* এবনে হেশাম ১—১৭৮

** জাদুল-মায়াদ ১—৩৩৪

*** কোরআন

৪। উৎপীড়নে উত্যক্ত হইয়া মোছলেম নরনারীগণ আবিসিনিয়ায় পলায়ন করিলে, নরাধমগণ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল—এবং মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে কোরেশ জাতির বন্দীরূপে মক্কায় ফিরাইয়া আনিয়া দণ্ডিত করার জন্য চেষ্টা ও প্রচুর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

৫। মুছলমানদিগের ধর্মগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছিল—

(ক) তাঁহারা স্বাধীনভাবে আপনাদের ধর্মপ্রচার করিতে পারিতেন না।

(খ) তাঁহারা স্বাধীনভাবে ধর্মানুষ্ঠান পালন করিতে পারিতেন না, এমন কি নিজের গৃহকোণেও নামাযে উচ্চকণ্ঠে কোরআন পাঠ করিতে সমর্থ হইতেন না।*

(গ) সমস্ত আরবের সাধারণ অধিকারভুক্ত কাবাগৃহের হজ্জ, তওয়াফ ইত্যাদির অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল।

৬। দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিতেও মুছলমানদিগকে যথাসাধ্য বাধা দিবার ত্রুটি করা হয় নাই।

৭। মুছলমানদিগকে বলপূর্বক ধর্মত্যাগ করাইবার জন্য, কোরেশগণ পাশবিক অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল।

৮। এতদ্ব্যতীত ধর্ম, মোছলেম জাতি ও তাহাদের ধর্মগুরু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার ধ্বংসসাধনের জন্য তাহারা দলবদ্ধভাবে যথাসাধ্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

৯। মোছলেম মহিলাগণের প্রতি অকথ্য, লোমহর্ষণ অত্যাচার করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হয় নাই।

১০। হযরতকে হত্যা করার জন্য তাহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল, এবং এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করার জন্য তাহারা সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।

১১। হযরত মদীনায় গমনের পর যে কয়জন মুছলমান কোরেশদিগের হস্তগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও নানা অত্যাচারে জর্জরিত করা হইয়াছিল।

১২। মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য, কোরেশগণ বিভিন্ন আরব গোত্রের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল।

১৩। কোরেশগণ সম্মিলিতভাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে বর্ণিত সকল প্রকার অত্যাচার ও নরহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। কেবল এই উদ্দেশ্যেই তাহাদের একটি বিশেষ সমিতি গঠিত হইয়াছিল, এবং মক্কার সমস্ত কোরেশই আগ্রহসহকারে তাহাতে যোগদান করিয়াছিল।

১৪। কোরেশের অত্যাচারে মুছলমানদিগকে জননী জন্মভূমির ক্রোড় হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।

১৫। দস্যুতা, দরিদ্র-পীড়ন, নারী-নির্যাতন, দাস-দাসীগণের প্রতি পাশবিক অত্যাচার, সুরাপান, ব্যভিচার, কন্যা হত্যা, সন্তান হত্যা, নরহত্যা, জুয়াখেলা ইত্যাদি সকল প্রকার দুষ্কর্মে তাহারা অতি ঘৃণিতভাবে লিপ্ত ছিল।

১৬। সমস্ত আরবদেশকে নানা প্রকার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রাখিয়া তাহারা আপনাদের কৌলিন্য ও পৌরোহিত্য গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করিত। সেইজন্য জ্ঞান ও আলোকের উন্মেষ তাহারা দেখিতে পারিত না, সুতরাং যথাসাধ্য তাহার বিরুদ্ধাচরণও করিত।

## অপরাধের আলোচনা

কোরেশদিগের উপরোক্ত অপরাধগুলির মধ্যে যে কোন একটির জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা মুছলমানদিগের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইত। কিন্তু একসঙ্গে এতগুলি কারণের সৃষ্টি হইলেও, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। মদীনাবাসী মুছলমানদিগের নিকট হইতে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি কোরেশগণ মুছলমানদিগকে আক্রমণ করে, অথবা অপর কোন শত্রু কর্তৃক

---

* বোখারী, হিজরত, আবু বাকরের হিজরত দেখুন।

দেশ আক্রান্ত হয়, কেবল তখনই মদীনার মুছলমানগণ প্রবাসী মুছলমানদিগকে ও হযরতকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করিবেন। পক্ষান্তরে মদীনায় আন্তর্জাতিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় যে সকল শর্ত নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহাতেও কেবল এইটুকু বলা হইয়াছে যে, কোন বহিঃশক্তি কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হইলে সকল ধর্মাবলম্বী ও সকল গোত্রের লোক একসঙ্গে আততায়ীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্রধারণ করিবেন।

পাঠকগণ এখানে মুহূর্তেক অপেক্ষা করিয়া, ইউরোপের পুরাতন ও আধুনিক যুদ্ধ-বিগ্রহাদির কারণগুলি চিন্তা করিয়া দেখুন। প্রাচীন ইউরোপের Evengelizing Mission-এর কর্ণধারগণ এবং বর্তমানের সভ্যতর ইউরোপের বহু-বিশ্রুত Civilizing Mission-এর কর্মকর্তারা—ইউরোপ ও ইউরোপের বাহিরে যে সকল 'কারণে' সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরবলি দেওয়া সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তাঁহারা যে সকল 'অপরাধে' দুনিয়ার সমস্ত দেশ ও সকল জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে সর্বপ্রকার হীনতার চরম স্তরে উপনীত করিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাহারও আভাস গ্রহণ করুন এবং তাহার পর যে সকল খৃষ্টান লেখক হযরতের তাবী যুদ্ধ-বিগ্রহগুলির নিন্দা রটাইবার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছেন, তাহাদের ন্যায়নিষ্ঠার বিচার করুন।

## আন্তর্জাতিক আইন

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, মুছলমানরা কোরেশদিগের বহু মারাত্মক অপরাধের মধ্যে যে কোন একটির জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও ন্যায়ের চক্ষে তাহা কখনই নিন্দনীয় বিবেচিত হইতে পারিত না। এমন কি মদীনায় আগমন করার পর, মুছলমানগণ যদি শক্তি সঞ্চয় করিয়া মক্কা আক্রমণ করিতেন এবং মক্কাবাসীদিগকে বিধ্বস্ত করতঃ তথায় নিজেদের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেন—যদি মক্কাবাসীদিগকে তাহাদের অজস্র অপকর্মের জন্য দণ্ডিত করিতেন, তাহা হইলেও ন্যায়ের হিসাবে তাহা কখনই অ-বিহিত এমন কি Offensive war বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারিত না। M. Bluntchili আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক আইনের (International Law) একজন সর্বজনমান্য পণ্ডিত। তিনি বলিতেছেন ঃ

"A war undertaken for defensive motive is a defensive war notwithstanding that it may be militarily offensive."

অর্থাৎ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ চালান হয়, সামরিক পরিভাষায় তাহা আক্রমণমূলক (offensive) যুদ্ধ বলিয়া কথিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ।* আন্তর্জাতিক আইনের প্রধানতম ছনদ (authority) কেন্ট বলিতেছেন ঃ

The right of self-defence is part at the law of our nature, and it is the indispensable duty of Civil Society to protect its members in the enjoyment of their rights, both of person and property. This is the fundamental principle of the social compact. ...... The injury may consist, not only in the direct violation of personal or political rights, but in wrongfully withholding what is due, or in the refusal of a reasonable reparation for injuries committed, or of adequate explanation or security in respect to manifest and impending danger.**

---

* The International Law. by William Edward Hall, M. A., Oxford 1880, P320.

** Kents Commentary on International Law. Edited by. J. V. Abdy. LL.D., 2nd Edition. page 144.

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, ইউরোপের আন্তর্জাতিক আইনের ফৎওয়া অনুসারেও মুছলমানগণ কোরেশদিগকে আক্রমণ করিয়া আপনাদের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিতেন। কিন্তু ধৈর্য ও প্রেমের পূর্ণতম আদর্শ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা তাহাদিগের যাবতীয় অপরাধ ও অপকর্ম ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং শান্তির সহিত মদীনায় অবস্থান করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। দুর্দান্ত কোরেশদিগের পক্ষে ইহাও অসহ্য হইল। মদীনা আক্রমণ করিয়া, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মোছলেম জাতি ও এছলাম ধর্মকে বিধ্বস্ত ও সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য তাহারা পূর্ববৎ নীচ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। কারণ, আল্লাহর মঙ্গলবিধান অনেক সময় অমঙ্গলের মধ্য দিয়াই কল্যাণের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

## কোরেশের ক্রোধ

শিকার সম্পূর্ণরূপে হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। মুছলমান নরনারিগণ মদীনায় পৌঁছিয়া শান্তি ও স্বস্তি সহকারে আপনাদের ধর্মকর্ম পালন করিতেছেন। হযরত শিষ্যবর্গকে লইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আল্লাহর উপাসনা করিতেছেন। যে ধর্মের উচ্ছেদ সাধনের জন্য সমস্ত কোরেশ একযুগ ধরিয়া চেষ্টা, পরিশ্রম এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের চরম করিয়াছে, তাহা মদীনা ও পার্শ্ববর্তী পল্লী সমূহে শনৈঃ শনৈঃ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই সকল সংবাদে কোরেশদিগের শয়তানী ক্রোধ শতগুণে বর্ধিত হইয়া গেল। তাহার পর যখন তাহারা শুনিল যে, হযরত মদীনার মোছলেম, ইহুদী ও পৌত্তলিকদিগকে লইয়া এক আন্তর্জাতিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—যাহাতে সে দেশে আর কখনও গৃহযুদ্ধের অভিনয় না হয়, যাহাতে বহির্শত্রু দেশ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে না পারে, মদীনা ও পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী গোত্রগুলিকে এক সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সেজন্য হযরত আন্তর্জাতিক সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন, তখন তাহারা ক্ষোভে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

হযরত ও তাঁহার সহচরবর্গের প্রতি এই নরাধমরা যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, এখন তাহাও তাহাদের স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও ভাবিয়া দেখিল যে, হযরত আরও কিছু শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের পরিণাম কত শোচনীয় হইতে পারে ? তাহাদের আতঙ্কের আর একটি কারণ ছিল—মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী বাণিজ্যপথ। সিরিয়ার বাণিজ্যই মক্কাবাসীদিগের প্রধান অবলম্বন। খাদ্য দ্রব্যাদির প্রধানাংশ এই পথ দিয়াই মক্কায় আমদানী হইয়া থাকে। পথটি সিরিয়া হইতে দক্ষিণে আসিয়া মদীনার নিকট দিয়া দক্ষিণাভিমুখে মক্কার দিকে চলিয়া গিয়াছে। কাজেই এই সকল বাণিজ্যসম্ভার লুন্ঠন করা মদীনাবাসী মুছলমানদিগের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। অন্যায় আচরণাদি দ্বারা তাহারা নিজেরাই যে, মুছলমানদিগের সহিত একটা বৈর সম্বন্ধ state of war স্থাপন করিয়াছে, এবং মুছলমানদিগের পক্ষে তাহাদিগকে Common enemy বলিয়া নির্ধারণ করাও যে সঙ্গত ও স্বাভাবিক, এ-কথা তাহারাও উত্তমরূপে অবগত ছিল। এই সকল চিন্তা ও উদ্বেগ, কোরেশের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। তখন অবিলম্বে মদীনা আক্রমণ করতঃ 'মোহাম্মদ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে ধ্বংস করার' জন্য তাহারা যথারীতি উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

## মদীনার অবস্থা

মদীনা ও শহরতলীর ইহুদিগণ, দুইটি কারণে স্থানীয় পৌত্তলিকদের উপর প্রাধান্য করিয়া আসিতেছিল। প্রথমতঃ কুসীদজীবী ইহুদী জাতি মদীনার মহাজন, স্থানীয় অধিবাসিগণ সকলেই তাহাদের খাতক; দ্বিতীয়তঃ, দেশের মধ্যে একমাত্র তাহারাই শিক্ষিত। এই দুইটি উপকরণের দ্বারা তাহারা যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহা অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য তাহারা মদীনার আওছ ও খাজরাজ গোত্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত

ফলতঃ সর্বদাই তাহাদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া রাখিত। মদীনার এই দুইটি প্রধান গোত্রের মধ্যে যাহাতে কখনই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপিত হইতে না পারে। বর্তমান যুগের দূরদর্শী শাসনকর্তাদিগের ন্যায়। তাহারা সর্বদাই তাহার চেষ্টা করিত। কিন্তু চকিত-চমকিত চক্ষে তাহারা দেখিল যে, এছলামের কল্যাণে তাহাদের সেই কুমৎলব পূরণের আশা চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। পক্ষান্তরে, মোস্তফা চরিত্রের স্বর্গীয় মহিমায়, আওছ ও খাজরাজের সেই পুরুষানুক্রমিক কলহ-কোন্দল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কেবল আওছ ও খাজরাজ নহে, বরং মক্কার প্রবাসী মুছলমান—এমন কি আবিসিনিয়ার বেলাল, রূমের ছোহেব ও পারস্যের ছালমান আজ এছলামের সাম্যমন্ত্র ও প্রেমনীতির কল্যাণে সত্যিকার ভ্রাতৃসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। যে শত্রুর হৃৎপিণ্ডে খরধার কৃপাণ বিদ্ধ করিয়া দিতে পারিলে দুই দিন পূর্বে লোকে নিজের জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করিত, এছলামের কল্যাণে সেই শত্রুই আজ তাহার এমন আপনজনে পরিণত হইয়াছে যে, সেই শত্রুর বিরুদ্ধে উত্থিত খরধার তরবারিকে বুকে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেই আজ সে নিজের জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করে। ইহুদী জাতি স্বভাবতঃ ক্রুর ও কুটিল, মদীনার এই অভিনব দৃশ্য দর্শনে তাহারাও মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ, শঙ্কিত ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় বিচলিত হইয়া উঠিল। আরও একটি কারণে এছলাম ধর্ম ইহুদী জাতির বিরাগভাজন হইয়াছিল। তাহারা হযরত ঈছা* ও তাঁহার মাতা বিবি মরিয়মকে যথাক্রমে জারজ ও কুলটা বলিয়া বিশ্বাস ও বর্ণনা করিত। কিন্তু হযরত জগতের অন্যান্য সাধুসজ্জন ও নবী-রছুলের ন্যায়, হযরত ঈছারও গুণগান করেন, তাঁহাকে মহাসাধু, মহাসাধক ও মহামানব** বলিয়া ঘোষণা করেন। কেবল ঘোষণাই নহে বরং ইহাকে এছলামের অবশ্য কর্তব্য বিশ্বাস বলিয়া প্রচার করেন। ইহুদী ইহা শুনিতে পারে না, সহিতে পারে না। কাজেই ধর্মের দিক দিয়াই তাহারা হযরতের উপর হাড়ে-হাড়ে চটিয়া গেল

## মদীনার কপট ও পৌত্তলিকদল

হিজরতের পরবর্তী সময়েও মদীনা ও শহরতলীতে এবং পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহে অসংখ্য পৌত্তলিক অবস্থান করিত। তাহারা এছলামের বিরুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিকদিগের ন্যায় কঠোরতা অবলম্বন না করিলেও, এই নূতন ধর্মের প্রতি তাহাদের যথেষ্ট বিদ্বেষ ছিল। তাহার পর, প্রথম হইতে মদীনায় একদল কপট মুছলমানের সৃষ্টি হইয়াছিল, এছলামী পরিভাষায় ইহাদিগকে 'মোনাফেক' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। আব্দুল্লাহ্-এবন-ওবাই এই দলের পাণ্ডা হইয়া স্থানীয় ইহুদী ও পৌত্তলিকদিগকে সর্বদাই মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টায় থাকিত। এছলাম মদীনায় প্রবেশলাভ করিবার পূর্বে, তথাকার পৌত্তলিকদিগের উপর আবদুল্লাহর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার আশা ছিল, অনতিবিলম্বে সে মদীনার রাজারূপে অভিষিক্ত হইবে, এমন-কি তাহার জন্য রাজমুকুটও প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্তু, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার বা তাহাদের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া এছলামের নীতিবিরুদ্ধ। এছলাম বলিয়াছে, আল্লাহর আকাশতলে এবং আল্লাহর ধরিত্রীবক্ষে, মানুষ একমাত্র অধীনতা স্বীকার করিবে সেই আল্লাহর। ইহা ব্যতীত মানুষ আর কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিতে পারে না।*** সে সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন! এই স্বাধীনতা তাহার স্বর্গীয় অধিকার। অবশ্য দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশবাসিগণ

---

* খৃষ্টানেরা বলেন, ঈসাই আমাদের পূজিত ঈশ্বর। কিন্তু কোরআন ও এঞ্জিলের আদর্শে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

** মানব বলায় অন্যদিকের চরমপন্থী খৃষ্টানগণ চটিয়া যান।

*** বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ — আবু-হোরায়রা হইতে। ৩ ইঞ্জিল ৩—১২ দেখুন।

নিজেরাই আপনাদের অবস্থানুসারে তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিবে। সুতরাং এছলাম মদীনায় প্রবেশ করার পর আবদুল্লাহকে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল। একে তাহার ও অন্য কপটীগণের। হৃদয়ের কুক্ষিগত ধর্মবিদ্বেষ, তাহার উপর হতাশ হৃদয়ের কঠোর প্রতিহিংসা। কাজেই সেও নিজের দলবল লইয়া এছলামের মূলোচ্ছেদ করার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

## মুছলমানদিগের উৎকণ্ঠা ও সতর্কতা

মদীনায় আগমন করার পর, উল্লিখিত কারণসমূহের জন্য, মুছলমানদিগকে সদাই সতর্ক ও সন্ত্রস্তভাবে অবস্থান করিতে হইত। বোখারী, নাছাই, দারমী প্রভৃতি বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তরূপে এমন অনেক রেওয়ায়ৎ বিদ্যমান আছে, যাহা হইতে সেই উদ্বেগ ও সতর্কতার সন্ধান পাওয়া যায়। ভিতরে বাহিরে শত্রুদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্র, কাজেই তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। উল্লিখিত হাদীছ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, মদীনা আগমনের পর অনেক সময় হযরতকে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। সতর্কতার জন্য, সমস্ত রাত্রি মোছলেম পল্লীর চারিদিকে পাহারা দেওয়া হইত। মুছলমানগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নিদ্রা যাইতেন এবং প্রাতে সেই অবস্থায় গাত্রোত্থান করিতেন।

এই অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়গুলিকে আগামী অধ্যায়সমূহের ভূমিকা স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, কোরেশ ও ইহুদীদিগের সহিত, হযরতের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাহা হইলে ঐ যুদ্ধগুলির প্রকৃত অবস্থা ও কারণাদির বিচার করা পাঠকগণের পক্ষে সহজ হইবে। অবশ্য প্রত্যেক যুদ্ধের বর্ণনাকালেও আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখিতে পাইব।

# দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

## কোরেশদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্র

নিজেদের হিংসা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য কোরেশগণ যখন উপায়-অন্বেষণে ব্রতী হইল, স্বাভাবিকভাবে তাহাদের দৃষ্টি পতিত হইল স্বধর্মাবলম্বী মদীনাবাসী পৌত্তলিকদিগের উপর। কোরেশ দলপতিগণ মদীনায় আবদুল্লাহ-এবন-ওবাই ও তাহার দলস্থ পৌত্তলিকদিগের নিকট যে গুপ্তপত্র প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল, আবু-দাউদ নামক হাদীছগ্রন্থ হইতে নিম্নে তাহার মর্মানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে ঃ

"হে মদীনাবাসী! তোমরা আমাদের স্বধর্মাবলম্বী হইয়াও আমাদের সেই পরম শত্রু মোহাম্মদকে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়াছ! হয় তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, না হয় নিজেদের দেশ হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিবে। আমরা চরম দিব্য করিয়াছি যে, যদি এই দুইটি শর্তের কোন একটি তোমরা অবলম্বন না কর, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিব, তোমাদের যুবকদলকে নিহত করিব এবং তোমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী বানাইয়া লইব।"

আবদুল্লাহ-এবন-ওবাই ও তাহার দলস্থ পৌত্তলিকগণের নিকট এই পত্র পৌঁছিলে তাহারা সমবেতভাবে হযরতের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হযরত স্বয়ং তাহাদিগের নিকট গমন করিয়া বলিলেন—'দেখিতেছি, কোরেশদিগের 'চাল' তোমাদিগের উপর বেশ চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে যে সকল দিক দিয়া তোমাদেরই অধিকতর ক্ষতি হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? কোরেশগণ যদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে তোমাদের যুদ্ধ হইবে অত্যাচারী বিদেশীর বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন তোমরা

যাহা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, তাহার ফলে, তোমরা জয়যুক্ত হইলেও, তোমরা নিজ হস্তে নিজেদের পুত্র ও ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিয়া আপনারাই দেশের ক্ষাত্রশক্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবা। আবদুল্লাহ্ দেখিল, হযরতের এই যুক্তিপূর্ণ উক্তির প্রভাবে আওছ ও খাজরাজ গোত্রের পৌত্তলিকদিগের মধ্যে যেন মত পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কাজেই তখন সে আর কিছু বলিল না। এদিকে মুছলমানদিগকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যে সৈন্যদল সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।'*

এই সময় আনছার-প্রধান মহাত্মা ছা'আদ-এবন-মআজ ওমরা-ব্রত সম্পন্ন করার জন্য মক্কায় গমন করেন। মক্কার উমাইয়া-এবন-খালফের সহিত পূর্বে তাঁহার যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল, সেই হিসাবে তিনি সঙ্গোপনে উমাইয়ার গৃহে অতিথি হন। ছা'আদ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই কা'বা প্রদক্ষিণ না করিলে তাঁহার ব্রত সম্পূর্ণ হইবে না। এই জন্য তিনি উমাইয়ার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে মক্কাবাসী যখন আপন আপন গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সেই সময় বাহির হইয়া তিনি তওয়াফের কার্য সমাধা করিয়া লইবেন ! এই পরামর্শমত তাঁহারা কা'বাগৃহের নিকটে উপস্থিত হইলে, নরাধম আবু-জেহেল ছা'আদকে দেখিয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল—এ লোকটা কে ? উমাইয়া সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—ইনি ছা'আদ ! ছা'আদের নাম শুনিয়া আবু-জেহেল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া বলিতে লাগিল,—দেখিতেছি তুমি বেশ নির্ভয়ে মক্কায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ! অথচ তোমরা আমাদের 'নাস্তিক' ছাবীগুলাকে আপনাদের নগরে আশ্রয় দিয়াছ, তাহাদিগকে সাহায্য করিবে বলিয়াও তোমরা যথেষ্ট স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছ ! কি বলিব, তুমি উমাইয়ার সঙ্গে আছ, নচেৎ তোমাকে আর নিজ পরিজনবর্গের মুখ দেখিতে হইত না। ছা'আদ মদীনার প্রধান ব্যক্তি, আবু-জেহেলের কটূক্তি নীরবে সহ্য করা তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। উমাইয়ার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—আচ্ছা যদি তুমি আমাকে কা'বা হইতে বারিত কর, তাহা হইলে তাহার পরিবর্তে আমি তোমার সিরিয়া গমনের পথ বন্ধ করিয়া দিব, তখন মজা দেখিবে। তখন উমাইয়ার সহিত নানা প্রকার বিতণ্ডা হওয়ার পর ছা'আদ মদীনায় চলিয়া আসেন।**

কোরেশগণ মুছলমানদিগকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করার জন্য যে, যথারীতি উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, হযরতের তাহা জানিতে বাকী ছিল না। আমরা পরে দেখিতে পাইব, হিজরতের এক বৎসর পরবর্তী সময় পর্যন্ত কয়েকজন মুছলমান ছদ্মবেশে (অর্থাৎ নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া) কোরেশদলে মিশিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহারাই যে সেখানে গুপ্তচরের কর্তব্য সম্পাদন করিতেন, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। কোরেশ দলপতিগণের সঙ্কল্প ছিল—এবং এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে তাহারা অনেকাংশে সফলতাও লাভ করিয়াছিল—মদীনার ইহুদী ও পৌত্তলিক জাতিগুলি অন্তর্বিগ্রহ সৃষ্টি করিবে, পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের দুর্ধর্ষ গোত্রগুলি সেই বিদ্রোহে যোগদান করিবে, এবং মক্কাবাসিগণ সেই সুযোগে মদীনা আক্রমণ করিবে। মদীনা আক্রমণ করিতে হইলে পথিপার্শ্বস্থ জাতিগুলির সহায়তা গ্রহণ করা বিশেষ আবশ্যক, এজন্য তাহারা ঐসকল জাতির সহিত ষড়যন্ত্র করিতেও ত্রুটী করে নাই।***

এই সকল কারণে মুছলমানেরা সর্বদাই সতর্ক ও সন্ত্রস্তভাবে অবস্থান করিতেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা এই সময় কোরেশদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী

* আবু-দাউদ, খেরাজ ২—৬৮।

** বোখারী ১৬—৪।

*** এই সকল বিবরণের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাঠকগণ যথাযথ স্থানে প্রাপ্ত হইবেন।

বিভিন্ন জাতির সহিত "শান্তিরক্ষার সন্ধি" স্থাপন করার নিমিত্ত মোটের উপর তিনটি deputation বা প্রতিনিধিসংঘ প্রেরণ করেন। আমাদিগের অসতর্ক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদিগের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে, চোখ বন্ধ করিয়া এইগুলিকে 'অভিযান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিবরণেই এই সকল 'ডেপুটেশনে'র উদ্দেশ্য স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইলেও, তাঁহারা ওয়াকেদী বা এবন-এছহাকের অন্ধ অনুকরণে প্রত্যেক স্থানে বলিয়া যাইতেছেন যে, কোরেশদিগের বিরুদ্ধে এই অভিযান করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টান লেখকগণ, এই সমস্ত বিবরণকে তিলে তাল করিয়া দেখাইতেছেন যে, 'মোহাম্মদ মদীনায় আগমন করিবার পরই কোরেশদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া ও তাহাদের বাণিজ্য-সম্ভারাদি লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বৎসর কোরেশদিগের বিরুদ্ধে এই সকল 'অভিযান' না করিলে বদর যুদ্ধ কখনই সংঘটিত হইত না। সুতরাং প্রথম বৎসরের এই তথাকথিত অভিযানগুলির বিষয় একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

## আবওয়া 'অভিযান'

ইতিবৃত্ত লেখকগণ বলিতেছেন যে, হযরত মদীনা আগমনের এক বৎসর পরে, কোরেশদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া 'অদ্দান' নামক স্থানে পৌঁছিলেন। সেখানে বানু জোমরা গোত্রের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ফিরিয়া আসেন। এই অভিযানে কোরেশদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।* এবন-ছা'আদ পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, কোরেশদিগের কাফেলা লুণ্ঠন করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল।** কিন্তু, আমরা ঐ সকল লেখকের বিবরণেই দেখিতে পাইতেছি যে, হযরত এই যাত্রায় বানু জোমরা নামক প্রবল ও শক্তিশালী গোত্রের সহিত এই মর্মে সন্ধি করেন যে, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে না এবং কোন পক্ষ অপর পক্ষের শত্রুকে কোন প্রকারে সাহায্য করিবে না। আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, এই সন্ধিপত্র 'লেখাপড়া' হইয়া যাওয়ার পরই হযরত মদীনায় ফিরিয়া আসেন। অধিকন্তু সে যাত্রায় কোরেশদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎও হয় নাই। সুতরাং হযরত যে সে-বার একমাত্র মদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী এই প্রবল জাতির সহিত সন্ধি করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি। পরবর্তী যুগের লেখক ও রাবিগণ 'কাফেলা লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে' এই কথাগুলি নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভর করিয়া যোগ করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহারা যে এইরূপ করিতে সিদ্ধহস্ত, বদর যুদ্ধের আলোচনায় তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে।

## বোওয়াৎ ও ওশায়রা

ইহার পর 'বোওয়াৎ' ও 'ওশায়রা' নামক আর দুইটি 'অভিযানে'র উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত অভিযান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, কোরেশ দলপতি উমাইয়া-এবন-খালফের কাফেলা লুট করার জন্য এই যাত্রা করা হইয়াছিল। আমাদের লেখকগণ, বহু যুগ পরে এই কাফেলার মানুষ ও উটের সংখ্যাও সূক্ষ্মভাবে দিতে পারিয়াছেন।*** কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগকে লুট করার জন্য যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই কাফেলার কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। জুল-ওশায়রা অভিযান সম্বন্ধেও 'কাফেলা-লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য'—রূপ বাঁধা গতের আবৃত্তি করিতে এই শ্রেণীর লেখকগণ কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, এই যাত্রায় ইয়াম্বুর নিকটবর্তী জুল-ওশায়রা নামক স্থানের 'বানি-মুদলেজ' জাতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া হযরত মদীনায় ফিরিয়া আসেন। এ যাত্রায়ও কোরেশদিগের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

---

* তবরি ২—২৭১ প্রভৃতি

** তাবকাত ১, ২—৬ পৃষ্ঠা।

*** তাবরী, তাবকাত প্রভৃতি।

## প্রকৃত কথা

প্রকৃত কথা এই যে, প্রথম বদর যুদ্ধের সূত্রপাত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, প্রত্যেক মুহূর্তেই বিরাট কোরেশ বাহিনী কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় মুছলমানগণ বিচলিত হইয়া ছিলেন। গৃহ শত্রুদলের বিদ্রোহের বিভীষিকাও প্রত্যেক মুহূর্তে লাগিয়া ছিল। এইজন্য দূরদর্শী প্রাজ্ঞবর গুরু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা এই আসন্ন বিপদের প্রতিবিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, মধ্যবর্তী বড় বড় গোত্রগুলির সহিত সন্ধি স্থাপন করার জন্য নানাদিকে 'ডেপুটেশন' প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইতিহাসকারগণ পরবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানের যে অনাবশ্যক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও জানা যায় যে, কোরেশদিগের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য তাহাদিগের আগমন-পথে সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'চৌকী' বসান হইয়াছিল। পাঠকগণ একটু পরেই দেখিবেন যে, স্বদেশের শত্রুদিগের ও কপটদিগের দুরভিসন্ধি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হযরত সর্বদাই 'গুপ্তি' করিতেন। তিনি কোনদিকে কি উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছেন, সহযাত্রী ভক্তগণও কিছুকাল পর্যন্ত তাহা জানিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে রাবীর শব্দের মধ্যে তাহার অনুমান ও নিজস্ব মতামতগুলিও যে কিরূপে প্রবেশলাভ করিয়া থাকে, ভূমিকায় আমরা তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এখানে ঐ বিষয়টি উত্তমরূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত, আমাদিগের ইতিবৃত্তকারগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে, হযরত কোরেশদিগের কাফেলা লুণ্ঠন করিতে যাওয়াতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। আবার কোরআনের স্পষ্ট সাক্ষ্যের বিপরীত এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর পূর্ববর্তী অভিযানগুলির ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এই তিনটি কারণে, তাঁহারা যেন কোন একটা ডেপুটেশনের সংস্রবে خرج يعترض لعير قريش 'কোরেশ কাফেলা আক্রমণ করার জন্য বাহির হইলেন' বলিয়া অভিমত প্রকাশে কুণ্ঠিত হন নাই।

## শিবলীর সিদ্ধান্ত

শ্রদ্ধাস্পদ মাওলানা শিবলী মরহুম 'কাফেলা লুণ্ঠনে'র প্রতিবাদ করিয়াছেন। অথচ নিজেই বলিতেছেন যে, 'কোরেশদিগকে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করিবার জন্য, হযরত সিরিয়া ও মক্কার বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।* কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বা লুটতরাজ না করিয়া এই পথ রোধ যে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, 'কোরেশদিগকে সন্ধি করিতে বাধ্য করার জন্যই' যে তাহাদের বাণিজ্যপথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছিল, লেখক এই কথার পোষকে কোন প্রমাণেরই উল্লেখ করেন নাই। আমরাও ইহার অনুকূল কোন দলীল-প্রমাণের সন্ধান অবগত নহি। সুতরাং পথরোধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মাওলানা মরহুম যে সাধু সঙ্কল্পের কথা কহিয়াছেন, তাহাকে আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাহার পর 'পথরোধ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন'—ইহা ইতিহাসকারগণের 'কাফেলা লুণ্ঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন'—এই বিবরণের ভাবান্তরের একটা সংস্করণ মাত্র। যাবৎ শাস্ত্রীয় ও অন্য প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলীলের দ্বারা প্রতিপন্ন করা না হইলে যে, (ক) সন্ধি স্থাপনের সদুদ্দেশ্যে পথরোধের চেষ্টা হইয়াছিল, এবং (খ) লুণ্ঠন রক্তপাতাদি সামরিক শক্তির প্রয়োগ ব্যতীতও, কোরেশদিগের বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ করা সম্ভবপর ছিল,—তাবৎ এই আনুমানিক সিদ্ধান্তগুলির কোন মূল্যই হইতে পারে না। আমাদের মনে হয়, লেখক ইহা দ্বারা 'লুণ্ঠনে'র অভিযোগটি প্রকারান্তরে স্বীকারই করিয়া লইয়াছেন।

---

* ১—২২৮।

## প্রকৃত কথা

প্রকৃত কথা এই যে, প্রথম বদর যুদ্ধের সূত্রপাত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, প্রত্যেক মুহূর্তেই বিরাট কোরেশ বাহিনী কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় মুছলমানগণ বিচলিত হইয়া ছিলেন। গৃহ-শত্রুদলের বিদ্রোহের বিভীষিকাও প্রত্যেক মুহূর্তে লাগিয়া ছিল। এইজন্য দূরদর্শী রাজনৈতিক গুরু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা এই আসন্ন বিপদের প্রতিবিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, মধ্যবর্তী বড় বড় গোত্রগুলির সহিত সন্ধি স্থাপন করার জন্য নানাদিকে 'ডেপুটেশন' প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইতিহাসকারগণ পরবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানের যে অনাবশ্যক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও জানা যায় যে, কোরেশদিগের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য তাহাদিগের আগমন-পথে সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'চৌকী' বসান হইয়াছিল। পাঠকগণ একটু পরেই দেখিবেন যে, স্বদেশের শত্রুদিগের ও কপটদলের দুরভিসন্ধি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হযরত সর্বদাই 'গুপ্তগুপ্তি' করিতেন। তিনি কোনদিকে কি উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছেন, সহযাত্রী ভক্তগণও কিছুকাল পর্যন্ত তাহা জানিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে, রাবীর বাক্যের মধ্যে তাহার অনুমান ও নিজস্ব মতামতগুলিও যে কিরূপে প্রবেশলাভ করিয়া থাকে, ভূমিকায় আমরা তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এখানে ঐ বিষয়টি উত্তমরূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত, আমাদিগের ইতিবৃত্তকারগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে, হযরত কোরেশদিগের কাফেলা লুণ্ঠন করিতে যাওয়াতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। আবার কোরআনের স্পষ্ট বাক্যের বিপরীত এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর পূর্ববর্তী অভিযানগুলির ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এই তিনটি কারণে, তাঁহারা যেন কোন একটা ডেপুটেশনের সংস্রবে خرج يعترض لعير قريش 'কোরেশ কাফেলা আক্রমণ করার জন্য বাহির হইলেন' বলিয়া অভিমত প্রকাশে কুণ্ঠিত হন নাই।

## শিবলীর সিদ্ধান্ত

শ্রদ্ধাস্পদ মাওলানা শিবলী মরহুম, 'কাফেলা লুণ্ঠনে'র প্রতিবাদ করিয়াছেন, অথচ নিজেই বলিতেছেন যে, 'কোরেশদিগকে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করিবার জন্য, হযরত সিরিয়া ও মক্কার বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।'* কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বা লুটতরাজ না করিয়া এই পথ রোধ যে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, "কোরেশদিগকে সন্ধি করিতে বাধ্য করার জন্যই" যে তাহাদের বাণিজ্যপথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছিল, লেখক এই কথার পোষকে কোন প্রমাণেরই উল্লেখ করেন নাই। আমরাও ইহার অনুকূল কোন দলীল-প্রমাণের সন্ধান অবগত নহি। সুতরাং পথরোধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মাওলানা মরহুম যে সাধু সঙ্কল্পের কথা কহিয়াছেন, তাহাকে আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাহার পর 'পথরোধ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন'—ইহা ইতিহাসকারগণের 'কাফেলা লুণ্ঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন'—এই বিবরণের তব্যাকারের একটা সংস্করণ মাত্র। ফলতঃ শাস্ত্রীয় ও অন্য প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলীলের দ্বারা প্রতিপন্ন করা না হইলে যে, (ক) সন্ধি স্থাপনের সদুদ্দেশ্যে পথরোধের চেষ্টা হইয়াছিল, এবং (খ) লুণ্ঠন রক্তপাতাদি সামরিক শক্তির প্রয়োগ ব্যতীতও, কোরেশদিগের বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ করা সম্ভবপর ছিল,—তাবৎ এই আনুমানিক সিদ্ধান্তগুলির কোন মূল্যই হইতে পারে না। আমাদের মনে হয়, লেখক ইহা দ্বারা লুণ্ঠনের অভিযোগটি প্রকারান্তরে স্বীকারই করিয়া লইয়াছেন।

---

* ১—২২৬।

পাঠাইলেন, তাই সকলকে ! জোর নাই, জবরদস্তী নাই, মোস্তফার আদেশ ইহাই, এছলামের জন্য, সত্যের মঙ্গলের জন্য, ইহাই আমাদিগের কর্তব্য। অতএব আমি এই কর্তব্য পালনের জন্য যাত্রা করিলাম। যাহার ইচ্ছা হয় দেশে ফিরিয়া যাও, আর শহীদের গৌরবময় মৃত্যু যাহার অভিপ্রেত হয়, আমার সঙ্গে আইস। এই বলিয়া দলপতি আবদুল্লাহ আল্লাহর নাম করিয়া যাত্রা করিলেন। আবদুল্লাহর সহচরগণও সকলেই একই টাকশালের মোহর, সুতরাং তাঁহারাও আনন্দ উৎফুল্ল চিত্তে আবদুল্লাহর সঙ্গে যাত্রা করিলেন। মদীনা হইতে আন্দাজ ৬০ মাইল* দূরে হজযাত্রীদিগের পথ ধরিয়া দক্ষিণ দিকে আসিলে নাখলাহ নামক একটি স্থান পাওয়া যাইবে। ছা'আদ-এবন-আবি অক্কাছ ও ওৎবার উট এইখানে আসিয়া হারাইয়া যায়। তাঁহারা উটের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ অবশিষ্ট ছয়জন মাত্রকে লইয়া নাখলার দিকে অগ্রসর হইলেন

নাখলায় উপনীত হওয়ার পর হঠাৎ কোরেশদিগের একটি ক্ষুদ্র বণিকদলের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। আমর-এবন-হাজরামী, হাকাম-এবন-কাইছান, ওছমান-এবন-আবদুল্লাহ প্রভৃতি কোরেশগণ ঐ দলের সহযাত্রী ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই সময় ওয়াকেদ-এবন আবদুল্লাহ নামক জনৈক মুছলমান শর নিক্ষেপ করিয়া হাজরামীকে নিহত করেন এবং মুছলমানগণ অবশিষ্ট দুইজনকে বন্দী করিয়া কাফেলার সমস্ত বাণিজ্য সম্ভারসহ তাহাদিগকে মদীনায় আনয়ন করেন। দলপতি আবদুল্লাহ এই লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দীদিগকে লইয়া যখন মদীনায় উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের এই কার্যকলাপের বিষয় অবগত হইয়া, হযরত যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আবদুল্লাহকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—আমি ত তোমাদিগকে যুদ্ধ বা লুণ্ঠন করিতে প্রেরণ করি নাই, তবে তোমরা এই অন্যায় আচরণ কেন করিলে ? হযরতের ছাহাবীগণও তারস্বরে তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের অনুতাপের অবধি রহিল না। ইতিহাসকারগণ বলেন যে, ظنوا انهم قد هلكوا তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যে, এই পাপের জন্য তাঁহারা নিশ্চয় ধ্বংস হইয়া যাইবেন

যাহা হউক, এই ব্যাপারের পর, মক্কাবাসিগণ দূত পাঠাইয়া বন্দীদিগের মুক্তি প্রার্থনা করিল। কিন্তু দলের যে দুইজন ছাহাবী উটের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা তখনও মদীনায় পৌঁছেন নাই। কাজেই আশঙ্কা হইল, কোরেশগণ সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে বন্দী বা হত্যা করিয়া থাকিবে। হযরত কোরেশ-দূতগণকে তাঁহাদের এই আশঙ্কার কথা জ্ঞাপন করিয়া, ঐ সহচরদ্বয়ের প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা মদীনায় ফিরিয়া আসিলেই বন্দীদ্বয়কে মদীনা ত্যাগ করার অনুমতি প্রদান করিলেন। ওছমান মুক্তিলাভ করিয়া মক্কায় চলিয়া গেলেন, কিন্তু হাকাম ইতিমধ্যেই মোস্তফা-প্রেমপাশে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই কয়দিনের সংসর্গ-ফলে আমি মহামুক্তির সন্ধান পাইয়াছি। আমি মোস্তফা চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছি, স-সাগরা পৃথিবীর রাজমুকুটের বিনিময়েও আমি এ দাসত্ব-গৌরব বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহি,—আমি মোছলেম ! মহাত্মা হাকাম যথার্থ-ই মোছলেম হইয়াছিলেন, এবং কিছুদিনের পরে বিরমাউনার সমরে, এছলামের বিজয় নিশান নাড়াইতে নাড়াইতে তাঁহার সেই প্রেমপূর্ণ হৃৎপিণ্ডের শোণিত-তর্পণ, মোছলেম জীবনের চরম সাফল্য সংগ্রহপূর্বক সানন্দে আত্মদান করিয়াছিলেন।

এই বিবরণে এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য আছে, যাহা দেখিলে সহজেই মনে হয় যে, সম্ভবতঃ ইহাতে নানা প্রকার ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। সেই সকল বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, এখানে পাঠকগণকে এই ঘটনার কার্যকারণ-পরম্পরার কথা স্মরণ রাখিয়া, ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে

---

* ইংরাজী মাইল

প্রথম দৃষ্টান্ত—এই দূত-সংঘের লোকসংখ্যা। হযরত আট জন মাত্র লোককে মক্কাবাসীদিগের বাণিজ্য-সম্ভার লুণ্ঠন করার জন্য, মক্কার নিকটবর্তী নাখলা নামক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা কখনই বিশ্বাস করা যায় না। তাহার পর দলপতিকে হযরত যে অনুজ্ঞাপত্র* লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাও স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যাইতেছে যে, গোপনে মক্কাবাসীদিগের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখাই, এই 'অভিযানে'র একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং দলপতি বা তাঁহাদের আর কেহ বস্তুতঃ কোন অন্যায় করিয়া থাকিলেও, তজ্জন্য হযরতের উপর কোন প্রকার দোষারোপ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ ইতিহাসে এই বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে যখন ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, এই কার্যের জন্য তিনি যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তখন এই ঘটনা সম্বন্ধে হযরতের প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করার ন্যায় অন্যায় কার্য আর কি হইতে পারে ?

এই ঘটনা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণগুলি এক সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মুছলমান ও কোরেশগণ হঠাৎ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পড়ায় উভয় পক্ষই যেন বিচলিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই আতঙ্ক ও গোলযোগের মধ্যে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হইয়া যায়। অবশ্য মূল বিবরণের ঐতিহাসিক ভিত্তি যে অতিশয় দুর্বল, তাহা আমরা পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। পাঠক মানচিত্রে দেখিতে পাইবেন যে, তায়েফ মক্কার পূর্ব দক্ষিণ দিকে এবং উভয় নগরের মধ্যস্থিত নাখলা নামক স্থানটি মক্কার খুব নিকটেই অবস্থিত। নাখলা হইতে মদীনায় যাইতে হইলে, মক্কার পার্শ্ব দিয়া যাইতে হয়। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, কোরেশদলের নওফল ও তাহার সঙ্গিগণ মক্কায় পলাইয়া যায়।** সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুছলমান দলে এই সময় ছয়জন মাত্র লোক ছিলেন, এবং কোরেশদিগের দলে হত ও বন্দী ৩ জন, এবং নওফল*** ও তাহার "সঙ্গিগণ" ছিল। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে বহুবচনের ন্যূনতম সংখ্যা তিনের কম হইতে পারে না। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, অন্ততঃ চারিজন লোক মক্কায় পলাইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্ততঃপক্ষে কাফেরদিগের সংখ্যা তখন সাত জন ছিল। এই সাতজন সম্ভ্রান্ত ও যুদ্ধ ব্যবসায়ী কোরেশ, নিজেদের নগরপ্রান্তে ছয় জন মুছলমানের দ্বারা এমনভাবে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইল—অথচ তাহারা আত্মরক্ষার কোনই চেষ্টা করে নাই, একটি তীরও নিক্ষেপ করে নাই, এক জন মুছলমানকে সামান্য ভাবেও আহত করিতে পারে নাই, এ সকল কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। মুছলমানগণ যখন দুইজন কোরেশকে বন্দী করেন, তখন নওফল ও তাহার সঙ্গিগণ পলায়ন করিয়া মক্কায় গিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুছলমানেরা বন্দী ও বাণিজ্য-সম্ভারের সমস্ত মালপত্র লইয়া নাখলা হইতে মদীনায় রওয়ানা হইলেন, অথচ মক্কার কোরেশগণ নওফলের মুখে এই সকল সংবাদ শ্রবণ করিয়াও নগর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল না, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বাণিজ্য-সম্ভার ও বন্দীদিগকে ছাড়াইয়া লইল না, হাজরামীর ন্যায় প্রধান ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করিল না ! এই সকল ও অন্যান্য বহু কারণে এই বিবরণের ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের মনে সংশয় উপস্থিত হয়—এবং আমরা যখন দেখিতে পাই যে, বোখারী, মোসলেম প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থসমূহে এই ঘটনার কোন আভাসই দেওয়া হয় নাই, তখন আমাদের এই সংশয় যথেষ্ট দৃঢ় হইয়া যায়।

---

* তাবরী ১—১৪১ ; জাদুল-মায়াদ ১—১১ ; এবন-হেশাম ২—৭ ইত্যাদি।

** এবন-খালদুন, তাবরী প্রভৃতি।

*** মাওলানা শিবলী বন্দীদিগের তালিকায় হাকামের স্থলে নওফলের নাম দিয়াছেন ১—২২৮।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবন-জরির তাবরী এই প্রসঙ্গের উপসংহারে একটি রেওয়ায়তের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার মর্ম এই যে, নাখলা অভিযানে আমর-হাজরামী নিহত হওয়াতেই বদর সমরের এবং হযরতের ও কোরেশদিগের মধ্যে সংঘটিত অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল।* খ্রীষ্টান লেখকগণ এই রেওয়ায়তটিকে প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া কোরেশদিগের ভাবী আক্রমণ সম্বন্ধে হযরতকে দায়ী ও দোষী প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক মাওলানা শিবলী মরহুমও তাবরীর বর্ণিত এই রেওয়ায়তটিকে উদ্ধৃত করিয়া প্রকারতঃ ইহাই প্রতিপালন করিয়াছেন যে, আমরের হত্যা-ব্যাপারই ভাবী সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা আমরা একটু পরেই জানিতে পারিব।

# ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا - وان الله على نصرهم لقدير

## এছলামের প্রথম ধর্মসমর

বদর যুদ্ধের কার্যকারণ এবং তাহার দায়িত্ব ও পরিণাম ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে মোস্তফা জীবনের বিগত চতুর্দশ বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি একবার স্মরণ করিয়া লওয়া উচিত। হিজরতের পূর্বে মুছলমানদিগকে সাধারণভাবে এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে বিশেষরূপে, মক্কাবাসীদিগের হস্তে কি প্রকার অত্যাচার-উৎপীড়নে জর্জরিত হইতে হইয়াছিল, পাঠকগণ এখানে তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখুন। দেশত্যাগী হইবার পরও দেড় বৎসর ধরিয়া মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য কোরেশগণ কি প্রকার ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, কিরূপে তাহারা মদীনার শহরতলী পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া মুছলমানদিগের ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়াছিল এবং প্রত্যেক মুহূর্তেই বিরাট শত্রুসেনা-বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় মুছলমানগণ সর্বদাই কিরূপ সতর্ক ও সন্ত্রস্ত হইয়া কালযাপন করিতেছিলেন, পূর্ব অধ্যায় সমূহের বর্ণিত সেই বৃত্তান্তগুলিও এখানে স্মরণ রাখা উচিত।

এই উদ্বেগ ও আশঙ্কার সময় হযরত কোন প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে বিরত হন নাই। এজন্য কোরেশদিগের গতিবিধির সন্ধান লইবার নিমিত্ত বিভিন্ন সময় মক্কার পথে এক এক দল গুপ্তচর প্রেরণ করা হইত। পূর্ব অধ্যায়ের বর্ণিত নাখলা অভিযানও ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হযরত যে কেবল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কোরেশদিগের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন এবং সেই জন্যই যে এই সকল গুপ্তচরদল প্রেরিত হইত—দুইটি সর্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ সমস্বরে সাক্ষ্য দিতেছে যে, মদীনায় শুভাগমনের পর হযরত যতগুলি "অভিযান" প্রেরণ করিয়াছিলেন—প্রতিপক্ষের তুলনায় তাহার লোকসংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল। কোরেশদিগের কাফেলা লুট করাই এই সকল অভিযান প্রেরণের উদ্দেশ্য হইলে, এত অল্পসংখ্যক লোক কখনই প্রেরিত হইতেন না। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাসে সর্ববাদীসম্মতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ইতিপূর্বে এই প্রকার যতগুলি অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার একটিও কোরেশদিগের কাফেলার উপর আক্রমণ করে নাই বা তাহা লুটও করিতে পারে নাই। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, মদীনা নগর মোটামুটিভাবে মক্কার ঠিক উত্তরে এবং

---

* ২—১৬৭।

সিরিয়া বা শাম দেশও মদীনার বহু উত্তরে অবস্থিত। সুতরাং মক্কা হইতে শামদেশে যাইতে হইলে মদীনার নিকট দিয়া যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ দেড় বৎসর পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও মুছলমানগণ একটি কাফেলারও সাক্ষাৎ পাইলেন না, বস্তুতঃ ইহা বড়ই অপরূপ ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, মুছলমানগণ মদীনা হইতে বহির্গত হইয়া একবারও শামের দিকে গমন করেন নাই। বরং প্রত্যেকবারেই তাঁহারা মক্কার পথে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ মক্কাবাসীদিগের ও তাহাদিগের আত্মীয় ও বন্ধু গোত্রসমূহের মুষ্টির মধ্যে গিয়া উপনীত হইতেছেন। কোরেশদিগের কাফেলা লুণ্ঠন করা উদ্দেশ্য হইলে, মুছলমানেরা মদীনার উত্তর দিকে সিরিয়ার পথে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলেই খুব সহজে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ নাছোড়বান্দা, তাঁহারা হিজরত হইতে বদরের সমর যাত্রা পর্যন্ত প্রত্যেক গুপ্তচরদলকে "অভিযান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অভিযান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'তাঁহারা কোরেশদিগের কাফেলা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেন। বদর সমর সম্বন্ধে তাঁহারা এই প্রকার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, হযরত, আবু-সুফিয়ানের কাফেলা লুট করার জন্য মদীনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। আবু-সুফিয়ান এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া মক্কায় সংবাদ দেয় এবং নিজে পথ ভাঁড়াইয়া পলাইয়া যায়। মক্কাবাসিগণ এই বিপদের সংবাদ পাইয়া দলে বলে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। আবু-সুফিয়ান ত কাফেলা লইয়া পলাইয়া গেল, মধ্যে পড়িয়া বদর প্রান্তরে কোরেশ সৈন্যবাহিনীর সহিত মুছলমানদিগের সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষ ঘটিয়া যায়। এই বিবরণটি যে খৃষ্টান-লেখকগণের পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক হইবে, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। তাঁহারা ইহাকে উত্তমরূপে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া লইয়া, উপসংহারে গম্ভীরভাবে বলিতেছেন যে, "মোহাম্মদ কোরেশদিগের কাফেলা লুণ্ঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াই অন্যায়পূর্বক যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত করিলেন। আবু-সুফিয়ানের কাফেলা লুটিবার সঙ্কল্প না করিলে বদর যুদ্ধও ঘটিত না, ভবিষ্যতে মক্কাবাসীদিগের সহিত অন্যান্য যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাতও হইত না।" কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, এই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের সঙ্কলিত ভিত্তিহীন রেওয়ায়তগুলির উপর নির্ভর করিতে আমরা বাধ্য হইব না। কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়তে বদর সমরের এবং তাহার অবস্থা-ব্যবস্থাদির বিশদ বর্ণনা সন্নিবেশিত হইয়া আছে। বিশ্বস্ত হাদীছ গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন রেওয়ায়তেও বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত বহু আবশ্যকীয় বৃত্তান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ঐতিহাসিক সমালোচনার দিক দিয়াও অনেক অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সন্ধানও পাওয়া যায়। এই সকল আয়ৎ, হাদীছ ও যুক্তি-প্রমাণ সমস্বরে এবং উচ্চকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে যে, ঐতিহাসিকগণের সঙ্কলিত এই বিবরণটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অনৈতিহাসিক উপকথা মাত্র। আমরা নিম্নে যথাক্রমে এই সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

## আবু-সুফিয়ান ও তাহার কাফেলা

আবু-সুফিয়ান ও আবু-জেহেল কোরেশদিগের প্রধান দলপতি, এছলামের প্রধান বৈরী এবং মোছলেম-নির্যাতনের প্রধান নায়ক। তাহারা ও তাহাদিগের সহচরবর্গ উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মদীনায় গমন করিবার পর হইতে মুছলমানগণ ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। আর কিছুকাল অপেক্ষা করিলে তাহারা অজেয় হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং নিজেদের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার কোন সুযোগই তখন আর তাহাদিগের পক্ষে সহজলভ্য হইয়া উঠিবে না। পক্ষান্তরে, নিজেদের অনুষ্ঠিত অত্যাচার এবং তাহাদের অবলম্বিত নীচ ষড়যন্ত্রাদির কথাও সদাসর্বদা তাহাদিগের স্মরণপথে উদিত

হইত। তাহারা নিজেদের মানসিকতার হিসাবে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেছিল যে, সুযোগ পাইলেই মোহাম্মদ এই সকল অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত মোছলেম শক্তি মদীনায় প্রবল হইয়া উঠিলে, তাহাদিগের পক্ষের শামের বাণিজ্য-পথ যে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ইহার ফলে তাহাদিগকে যে প্রমাদ গণিতে হইবে, এ-কথাও তাহারা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। এই সকল কারণে মুছলমানদিগের সহিত যথাসম্ভব সত্বর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য কোরেশ দলপতিগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আবদুল্লাহ-এবন-জাহশ ও তাহার সঙ্গিগণ হযরতের আদেশ বিস্মৃত হইয়া, আম্‌র-হাজরমীকে নিহত করিয়া ফেলায় আবু-জেহেল ও আবু-সুফিয়ানের পক্ষে সমস্ত জনসাধারণকে উত্তেজিত করার সুযোগও ঘটিয়া গেল। এই সময় আবু-জেহেল ও আবু-সুফিয়ান প্রমুখ দলপতিগণ গোপনে পরামর্শ আঁটিয়া মদীনা আক্রমণের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইল এবং এই আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্যে আবু-সুফিয়ান আলোচ্য কাফেলা লইয়া শামদেশে গমন করিল। পাঠকগণ প্রথমে কাফেলার অস্বাভাবিকতাটা একবার আলোচনা করিয়া দেখুন। এবার আবু-সুফিয়ানের বাণিজ্যসম্ভার বহন করার জন্য এক সহস্র উট তাহার সঙ্গে চলিল। মক্কাবাসিগণ ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আবু-সুফিয়ানের সঙ্গে প্রেরণ করে। এমন কি—

لم يبق بمكة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعدا الا بعث به في تلك العير

মক্কার কোরেশ নর-নারীদিগের মধ্যে এক রতি-মাসা সোনা চাঁদিও যাহার নিকট ছিল, সেও তাহা এই কাফেলার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিল।* কোরেশ ও মুছলমানদিগের তখনকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাফেলার এই অসাধারণ আয়োজন—এই সকলের মূলে কি কোন রহস্য নাই? কোরেশগণ যে কোন একটা গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—এই সকল ব্যাপারে কি তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে না?

## জেহাদের প্রথম আয়ৎ

সকল পক্ষ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, বদর যুদ্ধই এছলামের সর্বপ্রথম সমর। তাহার পূর্বে মুছলমানগণ কাহারো সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। ইহাও সকলে স্বীকার করিয়াছেন যে, হযরত মদীনায় আসিবার কিছুকাল পরে জেহাদের অনুমতিজ্ঞাপক প্রথম আয়তটি অবতীর্ণ হইয়াছিল। আয়তটি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ' و ان الله على نصرهم لقدير -
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله - ولولا
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات •
و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الآية • (حج ٦ ركوع)

অনুবাদ: যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা হইতেছে, তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করা হইল— কারণ তাহারা অত্যাচারিত। সেই সমস্ত লোক যাহারা স্বদেশ হইতে অন্যায়রূপে বহিষ্কৃত হইয়াছে—শুধু তাহারা এইমাত্র বলিয়াছিল যে, আল্লাহই আমাদিগের প্রভু। আল্লাহ যদি মানব সমাজের পতিপয় লোকের দ্বারা অন্য লোকদিগকে অপসৃত না করিতেন, তাহা হইলে মন্দির, গির্জা, উপাসনালয় এবং মছজিদসমূহ—যাহাতে বহুলরূপে আল্লাহর নাম করা হইয়া থাকে—বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা হইত। (হজ্জ—৪)। অর্থাৎ, যে মুছলমানগণকে অন্যায়পূর্বক নিজেদের মাতৃভূমি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পরও আবার তাহাদিগের

---

* জারকানী ১—৩৯৫। হলবিয়া—শাহ আব্দুল হকের মন্তব্যসহ।

সহিত যুদ্ধ করার আয়োজন করা হইতেছে—আল্লাহ এই আয়ৎ দ্বারা তাহাদিগকে আত্মরক্ষার্থ* যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করিতেছেন, কারণ ইহারা যথেষ্ট অত্যাচারিত হইয়াছে এবং অতঃপর অস্ত্রধারণ না করিলে অত্যাচারী কোরেশদিগের হস্তে তাহাদিগকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে। ইহাই জেহাদের প্রথম আয়ৎ।** এই আয়ৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়টি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

আয়তে يقاتلون শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। উহার অর্থ যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা হইতেছে কিংবা করা হইবে। কোরেশগণ যে অবস্থায় মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আয়োজন করিতেছিল, এই আয়তটি যে সেই সময় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য 'ইউকাতেলুনা' শব্দ হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যাইতেছে যে, বদর সমর সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই কোরেশগণ মুছলমানদিগকে আক্রমণ করার আয়োজন করিতেছিল এবং সেইজন্যই আল্লাহ উৎপীড়িত মুছলমানদিগকে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণের অনুমতি বা অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। কাফেলা লুট করিতে গিয়া হিতে-বিপরীত ঘটিয়া হঠাৎ একটা যুদ্ধ বাধিয়া যায় নাই।

## কোর্‌আনের প্রমাণ—দ্বিতীয় আয়ৎ

বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত বহু বৃত্তান্ত কোরআন শরীফের 'আনফাল' সূরায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মক্কাবাসিগণ যে কি উদ্দেশ্যে তাহাদিগের শেষ রৌপ্যখণ্ড পর্যন্ত সংগ্রহ করিয়া শামদেশে প্রেরণ করিয়াছিল এবং পরিণামে তাহা যে কি কাজে ব্যয়িত হইয়াছিল, সূরা আনফালের একটি আয়তে তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله -

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون -

অর্থাৎ, কাফেরগণ মুছলমানদিগকে আল্লাহর পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদসমূহ ব্যয় করিতে যাইতেছে, অপিচ শীঘ্রই তাহারা উহা (এছলাম ধর্মে বিঘ্নদানের উদ্দেশ্যে) ব্যয় করিয়া ফেলিবে—তখন ইহা তাহাদিগের পক্ষে অনুতাপেরই কারণ হইবে, তদন্তর তাহারা পরাজিত হইয়া যাইবে।

তফছিরকারগণ এই আয়তের 'শানে নজুল' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারিলেও তাহাদিগের মতবাগুলি একত্রে আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আবু-সুফিয়ানের কাফেলার সমস্ত ধন-সম্পদই ওহোদ যুদ্ধের আয়োজনে ব্যয় করা হইয়াছিল। এই যুদ্ধে দুই সহস্র "হাবশী" সৈন্যকে মক্কাবাসিগণ নিয়মিত বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত মক্কার ও অন্যান্য স্থানের বহুসংখ্যক আরব সৈন্যও তাহাদিগের সঙ্গে ছিল। এ সকল কথা তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। একটু মনোযোগ সহকারে আয়তটির প্রতি লক্ষ্য করিলেও কাফেলার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যাইবে। এই আয়ৎ দুইটির ক্রিয়াপদ দ্বারা বদর যুদ্ধের পূর্ব এবং পরবর্তী অবস্থা বিবৃত করা হইয়াছে। প্রথম পদে বলা হইতেছে যে, তাহারা মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করার আয়োজন করিতেছে, আল্লাহর পথ অর্থাৎ এছলাম ধর্মকে প্রতিহত করাই তাহাদিগের লক্ষ্য। দ্বিতীয় পদে বলা হইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে তাহারা ঐরূপ কার্যে কথিতরূপে ধন-সম্পদ ব্যয় করিবে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শেষোক্ত পদের বর্ণিত ভাবী ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আলোচ্য আয়তটি অবতীর্ণ হইয়াছিল। অতএব এতদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে,

---

* উদ্ধৃত আয়তের অব্যবহিত পূর্ববর্তী আয়তটি একসঙ্গে আয়ত।

** ফৎহুলবারী ৭—১৯১। নাছাই আয়েশা হইতে এবং নাছাই, তিরমিজী ও হাকেম আব্বাছ হইতে, কবীর ৬—২২৬ প্রভৃতি।

বদর সমর সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই মক্কাবাসিগণ নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করিয়া মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল এইরূপে নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া কোরেশগণ মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার আয়োজন করিতেছিল বলিয়াই পূর্বোক্ত আয়াতে মুছলমানদিগকে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল এই দুই আয়ৎ দ্বারা যথাক্রমে প্রমাণিত হইতেছে যে, বদর সমর সংঘটিত হওয়ার পূর্বেও কোরেশগণ মুছলমানদিগকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল এবং আবু-সুফিয়ান এই উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি রণসম্ভার খরিদ করার ও বেতনভোগী সৈন্যদল সংগ্রহের জন্যই মক্কার সমস্ত ধন-সম্পদ লইয়া সিরিয়ায় গমন করিয়াছিল। তাহার এই যাত্রা প্রকৃতপক্ষে সমর অভিযান, বাণিজ্যের কথা একটা বাহ্যিক আবরণ মাত্র।

## কোর্‌আনের প্রমাণ—তৃতীয় আয়ৎ

কোর্‌আন শরীফের আনফাল সূরায় বদর সমর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আয়তটি বর্ণিত হইয়াছে :

كما اخرجك ربك من بيتك بالحق ° و ان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت و هم ينظرون - و اذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم و تودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم و يريد الله ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين -

**মর্মানুবাদ** : হে মোহাম্মদ ! তোমার প্রভু তোমাকে ন্যায়্যরূপে স্বগৃহ হইতে বহির্গত করিলেন, অথচ এই বহির্গমনের সময় একদল মুছলমান (যাইতে) বিশেষ কুণ্ঠিত হইতেছিল। সত্য স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হওয়ার পরও তাহারা তোমার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিল। যেন তাহাদিগকে মৃত্যুর পানে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, আর সেই মৃত্যুকে যেন তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। এবং (হে মুছলমানগণ ! তোমরাও বদর সমরের সেই প্রারম্ভিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া দেখ) যখন দুই দলের মধ্যে একটির সম্বন্ধে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই ওয়াদা দিতেছিলেন যে, তোমরা সেইটির উপর জয়যুক্ত হইতে পারিবে ; কিন্তু তোমাদিগের বাসনা ছিল যে (উল্লিখিত দল দুইটির মধ্যে) যেটি নিষ্কণ্টক, সেইটির উপর তোমরা অধিকার লাভ কর— অথচ আল্লাহ্ স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ধর্মদ্রোহীদিগের মূলোচ্ছেদ করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

এই আয়ৎ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে—

(১) হযরত আল্লাহ্‌র আদেশক্রমেই বদর অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন।

(২) হযরতের নিজ বাটীতে অর্থাৎ মদীনায় অবস্থান করার সময়কার বৃত্তান্ত এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) এই আয়ৎ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মদীনা হইতে বহির্গমনের কথা হইলে, এক দল মুছলমান নীরবে হযরতের আদেশ মানিয়া লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু আর এক দল ইহাতে বিশেষরূপে ভীত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(৪) এ-জন্য তাঁহারা হযরতের সহিত যথেষ্ট বাদ-বিতণ্ডাও করিয়াছিলেন।

(৫) তাঁহারা যে এতদূর ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং "সত্য স্পষ্টরূপে" বিবৃত হওয়ার পরও হযরতের সঙ্গে বাদ বিতণ্ডা করিতেও যে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই, ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেছিলেন যে, যে কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ এবং অসাধ্য ব্যাপার। সে কার্যের

দিকে অগ্রসর হইলে মুছলমানদিগকে যে দলবলসহ একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতে হইবে—ইহাতে তাঁহাদের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

(৬। মুছলমানগণ যখন মদীনা হইতে বহির্গত হন, তাহার পূর্বে উভয়—আবু সুফিয়ানের কাফেলা এবং কোরেশদিগের যুদ্ধযাত্রার সংবাদই তাঁহারা যুগপৎভাবে অবগত ছিলেন।

(৭। এই দুই দলের মধ্যে আবু-সুফিয়ানের কাফেলাটিই নিষ্কণ্টক ছিল, মুছলমানগণ এই "নিষ্কণ্টক দলকে" আক্রমণ করার জন্য উৎসুক ছিলেন; পক্ষান্তরে মক্কা হইতে সমাগত সমর অভিযানের সম্মুখীন হইতে তাঁহারা ভীতিবিহ্বলতা প্রকাশ করিতেছিলেন।

(৮। আবু-সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করা আল্লাহর তথা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার অভিপ্রেত ছিল না।

এই আয়তটি যে বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই।* সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, আবু-সুফিয়ানের কাফেলা লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যেই হযরত মদীনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু বদরে উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কাফেলা ত চলিয়া গিয়াছেই, পক্ষান্তরে কোরেশদিগের বিরাট সৈন্যবাহিনী মদীনার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কাজে কাজেই তাঁহারা বদর-প্রান্তরে পড়াও করিলেন এবং সেখানেই মক্কাবাসীদিগের সহিত তাঁহাদিগের হঠাৎ এই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু আলোচ্য আয়তের উপরি-বর্ণিত নির্দেশগুলির দ্বারা তাঁহাদিগের এই রেওয়ায়তের প্রত্যেক বিষয়েরই যথেষ্ট প্রতিবাদ হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা বলিতেছেন,—যেহেতু হযরত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিতেছিলেন না, কাজেই অনেকে মনে করিলেন—কাফেলা আক্রমণ করার জন্য যাওয়ার আবশ্যক নাই। তাই তাঁহারা যাত্রা করিতে এমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সাধারণ তফছিরে, এমন কি হাদীছের শরহ টীকাতেও এই প্রকার হাস্যজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কোরআন বলিতেছে—তাহারা সম্মুখে মৃত্যু বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল—পক্ষান্তরে কাফেলা লুট করার জন্য তাহারা বিশেষরূপে উৎসুক হইয়াছিল। আর আমাদিগের গ্রন্থকারগণ—কেবল ঐতিহাসিকগণের ভিত্তিহীন রেওয়ায়তপ্রসূত কতিপয় সংস্কারকে বহাল রাখার জন্য—অবলীলাক্রমে বলিয়া যাইতেছেন যে, কাফেলা লুট করা হইবে বলিয়াই লোকের এত কুণ্ঠা ও ভীতি হইয়াছিল, হযরত যুদ্ধযাত্রা করিলে সকলে তাহাতে বিশেষ আগ্রহ সহকারে যোগদান করিতেন। অর্থাৎ কোরেশদিগের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাদের মনে একটুও চাঞ্চল্য বা ভীতি উপস্থিত হইত না—কিন্তু তিন শতাধিক সশস্ত্র লোকে মিলিয়া ৩০/৪০ জনের বাণিজ্য অভিযান লুট করার কথা হইলে অমনি তাঁহাদিগের সম্মুখে মৃত্যু বিভীষিকার ভীষণ তাণ্ডব আরম্ভ হইয়া যাইত! এই কথাগুলি যে কতদূর স্বাভাবিক, পাঠকবর্গ তাহার বিচার করুন।

## ঐতিহাসিক প্রমাদ

### প্রথম প্রমাণ

আমাদিগের ঐতিহাসিক ও তফছিরকারগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, হযরত কাফেলা আক্রমণ করার জন্য মদীনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। বদরের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি মক্কাবাসীদিগের অভিযান সংবাদ অবগত হন এবং সেই সময় ও সেই স্থানে সহচরী আনছার ও মোহাজেরগণের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। কোরআনের আলোচ্য আয়তে এই সময়কার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কোরআন, হাদীছ ও যুক্তির হিসাবে এই সিদ্ধান্তটিকে অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি। আলোচ্য আয়তের প্রথম অংশে فريقا পদের পূর্ববর্তী 'ওয়াও'কে সকলেই 'হালিয়া' বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। বায়জাভী, রাজী, জমখশরী, মদারেক, খাজেন প্রভৃতি তফছিরকারগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, হযরতের মদীনা হইতে বহির্গমন এবং

---

* ফৎহুলবারী ৬—৪।

একদল মুছলমানের কুণ্ঠা ও অসন্তোষ, যুগপৎভাবে একই সময় সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপারে আলোচনা, ছাহাবাগণের মতামত গ্রহণ এবং একদলের ভীতিবিহ্বলতা ও মৃত্যু বিভীষিকা দর্শন প্রভৃতি যে, হযরতের 'স্বগৃহ' (মদীনা) হইতে বহির্গত হওয়ার সময়ই ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

## দ্বিতীয় প্রমাণ

এই আয়তের শেষার্ধে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়তে যখনকার ঘটনা বিবৃত হইতেছে, তখন আবু-সুফিয়ানের কাফেলা এবং মক্কার সমর-অভিযানের মধ্যে যে কোনওটিকে আক্রমণ করা মুছলমানদিগের পক্ষে সম্ভবপর ছিল। কিন্তু বদর প্রান্তরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াই তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, কাফেলা পূর্বেই চলিয়া গিয়াছে, এ-কথা তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন। সুতরাং তখন আর দুইটি দল তাঁহাদিগের সম্মুখে ছিল না। অথচ আয়তে দুই দলের কথা আছে। অতএব হযরত বদরের নিকটবর্তী হইয়া সহচরগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা কখনই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

## তৃতীয় প্রমাণ

বোখারী, মোছলেম ও আবু-দাউদ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে আনাছ-এবন-মালেক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উপস্থিত সমস্যা সম্বন্ধে ছাহাবিগণের মতামত জানিতে চাহিলে, আনছারগণের পক্ষ হইতে ছা'আদ এবন-ওবাদা বিশেষ উৎসাহ সহকারে বলিয়াছিলেন—হযরত ! আপনি আদেশ করিলে আমরা সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। এই হাদীছ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। এখানে প্রতিপাদ্য এই যে, আনছার সমাজপতি ছা'আদ-এবন-ওবাদা এই পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অথচ সমস্ত ঐতিহাসিক ও চরিতকার একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় উল্লিখিত ছা'আদ সে-বার মদীনা হইতে বাহির হইতে এবং বদর যুদ্ধে যোগদান করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং পরামর্শ ও মতামত গ্রহণাদি যে মদীনাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা এই হাদীছ দ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে।*

## চতুর্থ প্রমাণ

ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, 'হযরত বদর অভিমুখে যাত্রা করিলে, নওফলের কন্যা ওম্মে-ওয়ার্কা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শুশ্রূষাকারিণীরূপে সেনাদলের সঙ্গে যাইবার অনুমতি চাহিলেন।' হযরত তাঁহাকে বলিলেন—"নিজ নিজ বাটীতে অবস্থান কর।" আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে এই যাত্রায় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাওয়ার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। হাদীছের বিশ্বস্ততম পুস্তকসমূহে ওমর ফারুক প্রভৃতি ছাহাবিগণ কর্তৃক বদরী ছাহাবাগণের সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে সংখ্যার পর স্পষ্টতঃ "পুরুষ" শব্দের উল্লেখ আছে।** সুতরাং এই সকল হাদীছ হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, এই যাত্রায় কোন স্ত্রীলোকই মুছলমানদিগের সঙ্গে ছিলেন না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ওম্মে-ওয়ার্কা মদীনাতেই হযরতের সহিত বর্ণিতরূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণের নিজস্ব বর্ণনা হইতেও ইহার আরও প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে সেগুলি পরিত্যক্ত হইল। উপরের বর্ণিত প্রমাণ চতুষ্টয় হইতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ছাহাবিগণের মতামত গ্রহণ, তাঁহাদিগের কাফেলা লুণ্ঠনের অনুকূলে ইচ্ছা প্রকাশ, যুদ্ধের নামে ভীতি-বিহ্বলতা ও মৃত্যু-বিভীষিকা দর্শন এবং হযরতের সহিত আলোচনা ও

---

* বদর বিবরণ, কাসতল-এছাবা ৫—১৭৩ ** মোছলেম, তিরমিজী, আবু-দাউদ

বাদবিতণ্ডা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই যাত্রার পূর্বে মদীনাতেই সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত কাফেলা লুট করিতে অস্বীকৃত হইয়া মক্কাবাসীদিগের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়াতেই একদল ছাহাবী এত ভীত, কুণ্ঠিত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া ঐ প্রধান সংঘর্ষের জন্য নগর হইতে বহির্গত হওয়ার তাৎপর্য বুঝিয়া উঠিতে না পারায়, এমনভাবে হযরতের সহিত বাদবিতণ্ডা করিয়াছিলেন। আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ প্রথমে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, হযরত আবু-সুফিয়ানের কাফেলা লুট করার জন্যই মদীনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহার পর কোরআন ও হাদীছের সমস্ত প্রমাণ টানিয়া-হাঁকিয়া টানিয়া ছেঁড়াইয়া নিজেদের সেই সংস্কারের সহিত সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতেই যত গণ্ডগোল বাধিয়াছে।

## আর একটি ঐতিহাসিক ভ্রম

ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, হযরত কাফেলা লুণ্ঠনের সঙ্কল্প করিলে আবু-সুফিয়ান তাহা জানিতে পারিল। তখন সে জমজম নামক এক ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠাইয়া মক্কাবাসীদিগকে এই বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। ইহারই ফলে কোরেশগণ এই অভিযান লইয়া কাফেলাকে রক্ষা করার জন্যই মদীনা অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, আবু সুফিয়ান কোথায় কি প্রকারে ও কাহার মুখে সংবাদ পাইল, আর জমজম ছাবেত কি ভাবে মক্কায় সংবাদ লইয়া গেলেন, এ সকল কথার আলোচনা অনাবশ্যক। সে যাহা হউক, ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত এই রেওয়ায়তটিকে আমরা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কোরেশদিগের আলোচ্য সমর অভিযানের স্বরূপ কোরআন শরীফে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। কোরআন বলিতেছে :

الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن
سبيل الله - والله بما يعملون محيط - انفال -

অর্থাৎ "কোরেশগণ অহঙ্কারে গর্বিত হইয়া লোকদিগকে নিজেদের শক্তিমত্তা দেখাইতে দেখাইতে আল্লাহ্‌র পথে বিঘ্ন উৎপাদন করার জন্য নিজেদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল------।" এই আয়তের আলোচনা প্রসঙ্গে তফছিরকারগণ বলিতেছেন যে, হযরত বদর প্রাঙ্গণে মক্কার সৈন্যদলকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে আল্লাহ্‌ ! কোরেশ তাহার সমস্ত দর্প ও সমস্ত অহঙ্কার লইয়া তোমার ধর্মকে প্রতিহত করিতে এবং তোমার রছুলের সহিত যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে।" প্রায় সমস্ত তফছিরে হযরতের এই প্রার্থনার উল্লেখ আছে। আলোচ্য আয়াত ও বর্ণিত রেওয়ায়াত হইতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, কোরেশগণ কাফেলা রক্ষা করার জন্য নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া মক্কা হইতে বহির্গত হয় নাই। বরং শক্তিমদে উন্মত্ত ও অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া তাহারা মুছলমানদিগকে বিধ্বস্ত করতঃ এছলামকে ধ্বংস করার জন্য আগমন করিয়াছিল। ঐতিহাসিক ও তফছিরকারগণ বলিতেছেন যে, কোরেশগণ 'জোহফা' নামক স্থানে উপস্থিত হইলে আবু-সুফিয়ানের লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাফেলা নিরাপদে চলিয়া আসিয়াছে, অতএব তোমরা ফিরিয়া আইস। কিন্তু আবু-জেহেল ইহাতে অসম্মত হইয়া বলিল—আমরা এখন এখান হইতে বদরে যাইব, সেখানে উট জবাই করিব, পানভোজন ও আমোদ-আহ্লাদ করিব। ইহাতে সমস্ত আরব জাতি আমাদিগের শক্তিসামর্থ্যের কথা শুনিতে পাইবে, আয়াতে ভবিষ্যতে আমাদিগের অনেক উপকার হইবে। আবু-জেহেলের এই অহঙ্কারাদির কথাই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, কোরেশগণ এই সকল ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়াই মক্কা হইতে বহির্গত হইয়াছিল। কারণ আয়াতে তাহাদিগকে "গৃহ হইতে বহির্গমনকারীগণ" অবস্থাতেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত ঐ রেওয়ায়তটি কোরআনের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায়, যদি ও ইতিহাসে উহার উল্লেখ থাকে, তাহা অগ্রাহ্য ও অসঙ্গত বলিয়া নির্ধারিত হইবে।

আমরা কোরআন ও হাদীছ হইতে যে সকল দলীল-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হযরত কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে বহির্গত হন নাই। কিন্তু প্রতিপক্ষ এই প্রসঙ্গে হাদীছ হইতে কতকগুলি নজির উপস্থাপিত করিতে পারেন। সেইজন্য নিম্নে তাঁহাদিগের দলীল প্রমাণগুলির উল্লেখ করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

## প্রতিপক্ষের প্রথম দলিল ও তাহার খণ্ডন

কা'ব-এবন-মালেক নামক জনৈক ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছ বোখারীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাবী কা'ব বলিতেছেন :

انما خرج رسول الله صلعم يريد عير قريش حتى جمع الله
بينهم و بين عدوهم على غير ميعاد –

অর্থাৎ, হযরত কোরেশের কাফেলা লুণ্ঠন করার জন্যই বহির্গত হইয়াছিলেন—কিন্তু হঠাৎ তাঁহারা শত্রুদিগের সম্মুখবর্তী হইয়া পড়েন। ইমাম বোখারী তাবুক যুদ্ধের বিবরণেও এই হাদীছটি বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বিবরণ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, এটি প্রকৃতপক্ষে 'হাদীছ' নহে—বরং ইহা রাবী কা'ব-এবন-মালেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অভিমত মাত্র। সুতরাং ইহাতে বৃত্তান্ত ঘটিত ভুলভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নহে। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই কা'ব হযরতের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধ সত্ত্বেও বদর যাত্রায় যোগদান করেন নাই। সুতরাং তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নহেন। এখানে সত্যের অনুরোধে বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই বিবরণের রাবী কা'ব হযরতের বিশেষ তাকিদ সত্ত্বেও তাবুক যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। সেজন্য হযরত ও মুছলমানগণ দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার পরিজনবর্গও তাঁহার সহিত কথা বলা অন্যায় ও অধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। কা'ব এখানে তবুক যুদ্ধে নিজের অনুপস্থিতি এবং নিজের অপরাধ ও অবশেষে তাঁহার মার্জনার বিবরণ প্রদান করিতেছেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বদর যুদ্ধের কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—'আমি একমাত্র তাবুক ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধে অনুপস্থিত হই নাই।' এই কথাগুলি বলার পর তাঁহার যখন স্মরণ হইতেছে যে, এছলামের সর্বপ্রথম অগ্নি-পরীক্ষাতেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি শোধরাইয়া লইয়া বলিতেছেন :

غير اني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها

"তবে আমি বদর যুদ্ধেও যোগদান করি নাই। কিন্তু বদর যুদ্ধে যোগদান না করার জন্য কাহাকেও দণ্ডিত বা তিরস্কৃত হইতে হয় নাই।" এই প্রকার কৈফিয়ত দেওয়ার পর, বদর সমরের গুরুত্ব হ্রাস করার মানসে তিনি বলিতেছেন যে, সে-বার হযরত কোরেশদিগের কাফেলা লুট করার জন্যই বহির্গত হইয়াছিলেন, তবে হঠাৎ এই যুদ্ধ বাধিয়া যায়। কিন্তু কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়তে এবং বহুসংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীছে বদর যুদ্ধের যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঠ করার পর কা'বের এই উক্তিটিকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মদীনা হইতে বহির্গত হইবার পূর্বে হযরতের সেই আকুল আহ্বান, সমরক্ষেত্রে তাঁহার সমস্ত রজনীব্যাপী সেই ব্যাকুল প্রার্থনা, বদরী-ছাহাবিগণের অশেষ মহিমা কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা কা'বের কথার প্রতিবাদ হইয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, এখানে ঐতিহাসিক হিসাবে মোটের উপর কথা এই যে, এই বিবরণের রাবী কা'ব বদর সমরে উপস্থিত ছিলেন নাই, এবং এই সকল কথা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত ও অনুপস্থিতির কৈফিয়ত মাত্র। সুতরাং উহা হাদীছ বা শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। বিশেষতঃ কোরআন ও হাদীছের স্পষ্ট সিদ্ধান্তগুলির মোকাবেলায় তাহার কোনই মূল্য নাই।

ছহী মোছলেম নামক হাদীছ গ্রন্থে আনাছ হইতে একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। রাবী আনাছ ঐ বিবরণে বলিতেছেন যে,—

ان رسول الله صلعم شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان
فقام سعد بن عبادة - الحديث -

অর্থাৎ, আবু-সুফিয়ানের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হযরত সকলের মতামত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সময় আবু বাকর ও ওমর পরস্পর নিজেদের মত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, হযরত তাঁহাদিগের কথা শুনিতে চাহিলেন না। তখন (আনছারগণের দলপতি) ছা'আদ-এবন-ওবাদা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—হযরত! আপনি আমাদিগের (আনছারদিগের) মতামত জানিতে চাহিতেছেন? যাহার হস্তে আমার প্রাণ—তাঁহার দিব্য, আপনি আদেশ করিলে আমরা সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, জগতের দুর্গমতম স্থানকে পদদলিত করিতে পারি। অতঃপর হযরত সকলকে আহ্বান করিলেন এবং মুছলমানগণ যাত্রা করিয়া বদরে উপনীত হইলেন। কোরেশদিগের অগ্রগামী (Pioneer) সৈন্যদল তখন সেখানে উপস্থিত হইল। মুছলমানগণ তাহাদিগের মধ্যকার একটি দাসকে ধরিয়া আনিলেন এবং তাহাকে আবু-সুফিয়ানের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উত্তরে বলিতে লাগিল—আবু-সুফিয়ানের কোন সংবাদই আমি অবগত নহি, তবে আবু-জোহেল, ওৎবা, শায়বা প্রভৃতির সংবাদ জ্ঞাত আছি, তাহারা এই সঙ্গে আছে। (আবু-সুফিয়ান সংক্রান্ত সংবাদ গোপন করিতেছে মনে করিয়া) মুছলমানগণ তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলে সে বলিল—আচ্ছা, বলিতেছি, আবু-সুফিয়ান এই সঙ্গে আছে। হযরত তখন নামায পড়িতেছিলেন, গোলামটিকে অন্যায়রূপে প্রহার করা হইতেছে দেখিয়া তিনি শীঘ্র শীঘ্র নামায শেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন—লোকটি যখন সত্য কথা বলিতেছে, তখন তোমরা তাহাকে প্রহার করিতেছ, আর যখন মিথ্যা কথা বলিতেছে তখন তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছ, ইত্যাদি।*

একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে উত্তমরূপে জানিতে পারা যাইবে যে, আনাছের প্রদত্ত এই বিবরণটি প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের সিদ্ধান্তের সমর্থনই করিতেছে। এই বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বদর অভিমুখে যাত্রা করার পূর্বে এবং মদীনাতেই হযরত ছাহাবাগণের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ ছা'আদ-এবন-ওবাদা নামক আনছার দলপতিই যে সেই পরামর্শ সভায় আনছারদিগের মুখপাত্ররূপে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এই বিবরণে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। অথচ এই ছা'আদ যে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যে যাত্রায় মদীনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ইহা সর্ববাদীসম্মত সত্য। ইহা প্রতিপন্ন হইলেই কাফেলা লুটের সমস্ত কথাই একেবারে মাঠে মারা যায়। আমরা পূর্বে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

চিন্তাশীল পাঠকগণ এই বিবরণে আরও দেখিতে পাইবেন যে, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আবু-সুফিয়ানের নাম করা হইয়াছিল। আবু-সুফিয়ান মক্কার প্রধানতম জননায়ক এবং এছলামের ভীষণতম বৈরী! সুতরাং মদীনা আক্রমণের এই বিরাট অভিযানে সে-ই যে দলপতিরূপে আগমন করিবে, এই প্রকার অনুমান করাই স্বাভাবিক ছিল। আবু সুফিয়ান যে কাফেলা লইয়া শামদেশে গমন করিয়াছে, এ সংবাদ তখনও সাধারণ মুছলমানগণের জানা ছিল না, অন্যথায় অগ্রগামী কোরেশ সৈন্যদলের লোকদিগের নিকটে তাঁহারা আবু সুফিয়ানের সন্ধান করিবেন কেন? বিশেষতঃ আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ যখন স্বীকার করিতেছেন যে,

---

* মোছলেম ১—১০২ পৃষ্ঠা

মুছলমানগণের বদর সন্নিধানে উপনীত হইবার বহু পূর্বে আবু-সুফিয়ান তাহার কাফেলা সহ বদর ত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলিয়া গিয়াছিল, তখন আবার আবু-সুফিয়ানের সংবাদ লইবার জন্য ছাহাবাগণের এত ব্যগ্রতার কারণ কি ? সে যাহা হউক, এই বিবরণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, আবু-সুফিয়ানই যে কোরেশ সৈন্যবাহিনীর প্রধানতম নায়করূপে আগমন করিয়াছে, যুদ্ধের পূর্বদিবস পর্যন্ত সাধারণ ছাহাবাগণের তাহাই ধারণা ছিল। তাহার কাফেলা লইয়া যাওয়ার কথা তাঁহারা পরে জানিতে পারেন। আমাদিগের মনে হয়, উভয়পক্ষের গুপ্ত পরামর্শ ও মন্ত্রগুপ্তি এবং উভয়দলের জনসাধারণের সেই সকল বিষয়ের অজ্ঞতা একসঙ্গে জড়ীভূত হইয়া, আনাছ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ও নির্লিপ্ত এবং ঘটনাক্ষেত্রে অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের ভ্রমের কারণ হইয়াছে। তাঁহারা অনুমান করিয়া আবু-সুফিয়ানের নাম করিলেন, পরবর্তী রাবিগণ এই সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাফেলাটারও যোগ করিয়া দিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কাফেলা লুটের একটা বিরাট কল্পনা, অসতর্ক কিংবদন্তী সঙ্কলকগণের কল্যাণে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটা বাস্তব আকার ধারণ করিয়া বসিল। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, আনাছের এই বিবরণে কাফেলা বা তাহার লুণ্ঠন সম্বন্ধে একবিন্দু আভাসও পাওয়া যাইতেছে না। এখানে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, হিজরীর প্রথম সনে আনাছ দশ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র। অতএব ছাহাবিগণের সহিত হযরতের পরামর্শাদির বিবরণ অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত না হইলেও, হযরত যে কোন গুপ্ত সামরিক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ছাহাবাগণের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, একাদশ বৎসরের বালক আনাছের পক্ষে তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত থাকা যে অসম্ভব, এ-কথা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে।

## প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

বীরকেশরী মহাত্মা আলী এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, এবং মোশরেকগণ যখন 'যুদ্ধং দেহি' 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া আস্ফালন করিতেছিল, তখন এই বীর যুবকই সর্বপ্রথমে সমরক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। ইমাম আহমদ-এবন-হাম্বল তাঁহার মোছনাদে এই আলীর প্রমুখাৎ বদর সমরের বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাদীছ ও ইতিহাস সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকেও এই বিবরণটি উদ্ধৃত হইয়াছে * হযরত আলী বলিতেছেন ঃ

لما قدمنا المدينة.... وكان النبي صلعم يتخبر عن بدر، فلما
بلغنا ان المشركين قد اقبلوا سار رسول الله صلعم الى بدر....
فسبقنا المشركون اليها الحديث مسند۔ ا ص ١١٧۔

অর্থাৎ 'হিজরতের পর হযরত সর্বদাই বদর সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। অতঃপর যখন আমরা সংবাদ পাইলাম যে, মোশরেকগণ আগমন করিতেছে, তখন হযরত বদর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মোশরেকগণ আমাদিগের পূর্বেই সেখানে পৌঁছিয়া যায়।' ইহার পর বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।** পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হযরত আলীর প্রদত্ত বিবরণে, কাফেলা লুণ্ঠনের কথা দূরে থাকুক, আবু-সুফিয়ানের নামগন্ধও নাই। বরং এই বিবরণ দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মক্কার মোশরেকগণের আগমন সংবাদ পাইয়াই এবং তাহাদিগের সর্বনাশা আক্রমণে বাধা দিবার জন্যই হযরত বদর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

---

* মোছনাদ ১—১১৭, কানজুল-ওম্মাল ৫—২৬৬, তবরী ২—২৬৯, বায়হাকী, এবন-আবিশায়বা ও মোছনাদ আবুয়ালা প্রভৃতি।

** মোছনাদ ১—১১৭, কানজুল-ওম্মাল ৫—২৬৬, তাবরী ২—২৬৯, বায়হাকী, এবন-আবিশায়বা ও মোছনাদ আবুয়ালা প্রভৃতি।

এই আলোচনার উপসংহারে আমাদিগের নিবেদন এই যে, কেবল ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধারের জন্য আমরা এই দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। নচেৎ তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, হযরত বস্তুতঃ আবু-ছুফিয়ানের কাফেলা লুণ্ঠন করার জন্যই মদীনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহাতেও দোষের কোন কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। মক্কাবাসিগণ স্বতন্ত্র ও সমবেতভাবে এছলাম ধর্ম, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা এবং মোছলেম নরনারিগণের ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে সকল অনাচার ও অত্যাচার করিয়াছিল—হিজরতের পরও তাহারা মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে যে সকল ষড়যন্ত্র পাকাইতেছিল, যেরূপ ঘরে-বাহিরে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া মুছলমানদিগকে একদিনে সমূলে উৎপাটিত করার চেষ্টা করিতেছিল,—পাঠকগণ পূর্বে তাহা অবগত হইয়াছেন। আবু-সুফিয়ানের বাণিজ্য অভিযানের স্বরূপ, তাহার লক্ষ্য ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধেও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহারা পূর্বে অবগত হইয়াছেন। এ অবস্থায় হযরত যদি বাস্তবিকই কোরেশদিগের বাণিজ্যপথ বন্ধ করার অথবা আবু-সুফিয়ানের কাফেলা লুট করার সঙ্কল্প করিয়াই থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে কোন দিক দিয়া অন্যায় ও অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। এছলামের জেহাদ সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ইউরোপীয় লেখকগণ যে সকল ভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সম্ভব হইলে অন্য সময় বিস্তারিতরূপে সেগুলির আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

## চতুষ্পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

### বদর সমর—ভক্তগণের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা

### يوم الفرقان ' يوم التقى الجمعان

রমজান মাস—শুক্রবারের সুপ্রভাত, বদরের পর্বতপ্রান্তর মুখরিত করিয়া আজানধ্বনি উত্থিত হইল। ক্লান্ত-শ্রান্ত ছাহাবাগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রজনী যাপন করিতেছিলেন। পদব্রজে হেজাজের বন্ধুর পথ-পর্যটন, কয়েকদিন ব্যাপিয়া বিশ্রামের অভাব এবং রাত্রির বৃষ্টি জল-সিক্ত হওয়ার অবসাদ প্রভৃতি কারণে তাঁহারা যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু নামাযের আহ্বানধ্বনি উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহাদের সমস্ত অবসাদ এবং সমস্ত ক্লান্তি ক্ষণেকের মধ্যে কোথায় দূর হইয়া গেল, যেন কোন এক অদ্ভুতপূর্ব তড়িত প্রবাহের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ে জীবনের সাড়া জাগিয়া উঠিল। অযু সমাপন করিয়া সকলে জমাআতে সমবেত হইলেন। হযরত সমস্ত রজনী বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহন করিয়া প্রার্থনা ও উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন। ভক্তগণ সমবেত হইলে তিনি সকলকে সঙ্গে করিয়া ফজরের নামায পড়িলেন, এবং নামায শেষ হইলে মোছলেম বীরবৃন্দকে জেহাদ সম্বন্ধে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিলেন।

### কোরেশের ব্যূহ রচনা

প্রভাতরশ্মির প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উভয় সৈন্যদলে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। সহস্রাধিক কোরেশ সৈনা নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সমর প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। আপাদমস্তক লৌহবর্মে আচ্ছাদিত শতাধিক বিখ্যাত আরব বীর আরবীয় অশ্বপৃষ্ঠে সেনাপতির আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে তৎকালীন সমর পদ্ধতি অনুসারে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচিত হইয়াছে। মক্কার কবি ও প্রধান নায়কবৃন্দ মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া দুর্ধর্ষ আরবগণকে এছলামের, হযরতের ও মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। অন্যদিকে মাত্র ৩১৩ জন মুছলমান, কতকগুলি পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র

লইয়া ময়দানের অপর প্রান্তে দণ্ডায়মান। ইহার মধ্যে একজন মাত্র অশ্বারোহী, বর্ম ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রেরও এই অবস্থা। এই সাজ-সরঞ্জাম লইয়া তিনশত সেবক, মোস্তফা-চরণপ্রান্তে সমবেত হইলেন। হযরত সংক্ষেপে মানবজীবনের কর্তব্য বুঝাইয়া দিয়া সকলকে ছত্রবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলেন। মুছলমান ইহাতে অভ্যস্ত, সকলে পায়ে পায়ে ও কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, বদর প্রান্তরে كأنهم بنيان مرصوص এর পুণ্যদৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনশত মুছলমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যূহে ও ছত্রে বিভক্ত-বিন্যস্ত হইয়া স্থানটিকে লৌহ দুর্গে পরিণত করিলেন। মোস্তফা তখন সেনানায়করূপে সকল ছত্রের ও সকল ব্যূহের অবস্থাদি পরিদর্শন করিতেছেন, আবশ্যক মত সামরিক উপদেশ দিতেছেন। এইরূপে সৈন্য-বিন্যাস ও তাহার পরিদর্শনাদি কার্য সম্পন্ন করিয়া তিনি সকলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আদেশ করিলেন ঃ সকলে সাবধান ! তোমরা যেন আগে আক্রমণ করিও না। বিপক্ষগণ আক্রমণ করিলে তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বাধা দিও, কিন্তু তরবারি বাহির করিও না। সাবধান, আমি আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেহ আক্রমণ করিও না।

## হযরতের জন্য আরিশ নির্মাণ

ছাহাবাগণ পরামর্শ করিয়া হযরতের জন্য সামান্য প্রকারের একটা আরিশ বা বস্ত্রবাটিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দকে বর্ণিতরূপ উপদেশ দেওয়ার পর হযরত সেই আরিশে প্রবেশ করিলেন। ইয়ারে-গার আবু-বাকর ব্যতীত সেখানে আর কেহই ছিলেন না। হযরত এই পার্থিব উপকরণগুলিকে পরিত্যাগ করতঃ তখন একবার তাঁহার সেই চরম ও পরম আপনজনের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন সব ভুলিয়া গিয়াছেন—সেই আপনজনে একেবারে তন্ময়-তদগত হইয়া পড়িয়াছেন। সহস্র নর-শার্দূলের বিকট হুঙ্কার, সমূলে ধ্বংস পাইবার আশু আশঙ্কা, তিনশত আত্মোৎসর্গকারী ভক্তের অপূর্ব বিশ্বাসের তেজ—এ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তিনি নিজের সেই চরম ও পরম বন্ধুর শরণ লইলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের মনের কথা নিবেদন করিলেন। আরিশের সে প্রার্থনা আরশে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। এই প্রার্থনায় হযরত এতদূর তন্ময় ও বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোন কোন রাবী মনে করিয়াছিলেন, হযরত প্রার্থনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

## হযরতের প্রার্থনা

হযরত আরিশে আপন ভাবে বিভোর হইয়া আছেন, মুছলমানগণ প্রভুর আদেশক্রমে অচল পর্বতখণ্ডবৎ ধীরস্থিরভাবে দণ্ডায়মান। এমন সময় কোরেশপক্ষ হইতে বাণ বর্ষণ আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে একটি তীর 'মেহজা' নামক ছাহাবীর বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল। মেহজা কলেমায় শাহাদত পাঠ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইলেন। ইনিই বদর সমরের সর্বপ্রথম শহীদ।* তিনশত বীর ভক্তের সম্মুখে এ দৃশ্য দর্শন করিলেন, কিন্তু চাঞ্চল্য, ক্রোধ বা ব্যগ্রতার কোন লক্ষণই তাঁহাদিগের মধ্যে পরিদর্শিত হইল না। প্রভুর হুকুম—'আমি আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেহ বিপক্ষকে আক্রমণ করিও না।' কাজেই সকলে নীরব, নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। এই সময় হারেছা-এবন-ছোরাকা নামক ভক্ত হাওজের ধারে জলপান করিতেছিলেন। হারেছা পাত্র তুলিয়া মুখে দিতে যাইতেছেন, এমন সময় কোরেশদিগের একটা শাণিত শর তাঁহার কণ্ঠনালি ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। পিপাসিত হারেছা শরবতে শাহাদত পান করিয়া সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইয়া বসিলেন। ভক্তবৃন্দ নীরবে এ দৃশ্য দর্শন করিলেন এবং নীরবে তাহা সহ্য করিয়া থাকিলেন।

---

* এছাবা মুস্তা-এবন-ওকবা হইতে।

## ভক্তগণ প্রস্তুত

হযরতের প্রার্থনা শেষ হইয়াছে। তিনি মাথা তুলিয়া সুহৃদবর আবু-বাকরকে বলিলেন—আবু-বাকর, শুভসংবাদ, আনন্দিত হও, বিজয় নিশ্চিত। এই বলিতে বলিতে তিনি আরিশ হইতে বহির্গত হইয়া মোছলেম বীরবৃন্দের সম্মুখে উপনীত হইলেন। হযরতের বদনমণ্ডলের স্বাভাবিক মধুরগাম্ভীর ভাব, তখন যেন কি এক স্বর্গীয় তেজে দৃপ্ত হইয়া এক অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। এইরূপে হযরতকে সম্মুখে দর্শন করিয়া ভক্তগণ যেন পুলকে শিহরিয়া উঠিলেন। আমীর হামজা, ওমর ফারুক এবং শেরে খোদা হযরত আলী প্রমুখ মোছলেম বীরবৃন্দ রুদ্ধশ্বাসে প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করিতেছেন। হযরতকে সম্মুখে দেখিয়া আনন্দে ও উৎসাহে এক একবার যেন আপনি পা উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু আবার তখনই সতর্কতা অবলম্বিত হইতেছে। এই সময় হযরত ধর্মসমরে আত্মোৎসর্গ করার সফলতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া সকলকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। তিনশত কণ্ঠের তকবির ধ্বনি এছলামিক পরিভাষায় উত্তর করিল—"প্রস্তুত, প্রস্তুত, প্রভু হে, আমরা সকলেই প্রস্তুত !"

## যুদ্ধ নিবৃত্তির প্রস্তাব

ওদিকে কোরেশ সৈন্যদলে মহাকোলাহল আরম্ভ হইয়াছে। কেহ আত্মপ্রশংসার সঙ্গীত গান করিতেছে। কেহ অহঙ্কারভরে চীৎকার করিতেছে, কেহ রোষকষায়িতলোচনে দাঁত কড়মড় করিতেছে। কেহ ক্রোধভরে মাটিতে পদাঘাত করিতেছে ! আর সকলে সমস্বরে এছলাম ধর্মের, মুছলমান সমাজের ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার উদ্দেশ্যে অকথ্য গালিবর্ষণ করিয়া শাসাইতেছে। এই সময় কোরেশ দলপতিগণের আদেশক্রমে ওমের-এবন-অহব নামক এক ব্যক্তি মুছলমানদিগের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য অশ্বারোহণে তাঁহাদের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। স্বদলে প্রত্যাবর্তন করিয়া ওমের বলিতে লাগিল—মুছলমানদিগের সংখ্যা তিন শতের অধিক হইবে না। তাহাদিগের পশ্চাতে সাহায্য করিবারও কেহ নাই। তরবারি ব্যতীত আত্মরক্ষার জন্য কোন উপকরণ তাহাদিগের সঙ্গে নাই, ইহাও উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাহারা এমন দৃঢ় ও সুবিন্যস্তভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে যে, একটি প্রাণের বিনিময় না দিয়া আমরা তাহাদিগের একটি প্রাণনাশ করিতে পারিব না। ফলে এই যুদ্ধে আমাদিগের পক্ষের অন্ততঃ তিনশত প্রাণ উৎসর্গ না করিয়া আমরা কোন মতেই জয়যুক্ত হইতে পারিব না। ওমেরের কথা শুনিয়া হাকিম-এবন-হেজাম নামক জনৈক মহদন্তঃকরণ কোরেশের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি জনসাধারণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, এই অন্যায় সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার কোনই কারণ নাই, তিনশত প্রাণ বলি দিয়া এই যুদ্ধে জয়লাভ করার সার্থকতাও কিছুই নাই। হাকিম বক্তৃতা দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ওৎবা-এবন-রাবিআ নামক কোরেশ দলপতির নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের মনোভাব প্রকাশ করিলেন। ওৎবা হাকিমের কথার সমীচীনতা অস্বীকার করিতে পারিল না। হাকিম তখন আশান্বিত হইয়া বলিলেন ঃ দেখুন, আপনি ধনে-মানে কোরেশের একজন বরেণ্য ব্যক্তি। আজ আপনি একটু দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া এই অন্যায় সমর হইতে স্বজাতিকে বিরত করুন—আরবের ইতিবৃত্তে আপনার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ওৎবা উত্তর করিল—আমি ত প্রস্তুত আছি। এক ওমের হাজরমীর শোণিত পণ, তাহাও আমি নিজে পরিশোধ করিয়া দিতে পারি। কিন্তু হানজালিয়ার পুত্র (আবু-জেহেল)-কে কোন যুক্তির দ্বারাই বিরত রাখা সম্ভব নহে। যাহা হউক, তুমি তাহার নিকট গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখ, তোমার প্রস্তাবে আমার সম্মতি আছে।

হাকিম তখন আবু-জেহেলের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের ও ওৎবার মতামত ব্যক্ত করিলেন। কত ষড়যন্ত্র করিয়া আজ তাহারা সহস্রাধিক দুর্ধর্ষ আরব যোদ্ধা লইয়া এমন অতর্কিতে মুসলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করার সুযোগ পাইয়াছে। মুষ্টিমেয় মুসলমানকে বদর প্রান্তরে বিধ্বস্ত করিতে পারিলে মদীনা আক্রমণ সহজ হইবে। ইহুদী, কপট-মুসলমান ও পৌত্তলিকগণ মদীনায় তাহাদিগের অপেক্ষা করিতেছে। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করা কি কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? হাকিমের কথা শুনিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বলিতে লাগিল ঃ মোহাম্মদের যাদু ওৎবার উপর বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে। ভীরু, কাপুরুষ, কোরেশের কলঙ্ক, আজ সমরের নামে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার বাহানা খুঁজিতেছে! না, না, এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি—ওৎবার পুত্র মোহাম্মদের দলভুক্ত, সে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত! তাহার নিহত হওয়ার আশঙ্কায় নরাধম এমন বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ধিক্, শত ধিক তাহাকে। হাকিম তখন আবু-জেহেলকে সেইখানে রাখিয়া ওৎবার নিকট গমন করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। ক্রোধ, অভিমান ও অহঙ্কারে ওৎবা একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল। কি, আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ, পুত্রের মায়ায় আমি বীরধর্মে জলাঞ্জলি দিয়েছি! আচ্ছা, আরব দেখুক, জগৎ দেখুক, কে বীর আর কে কাপুরুষ। এই বলিয়া ওৎবা সদলবলে সমর প্রাঙ্গণে অগ্রসর হইল। ওদিকে আবু-জেহেল ছুটিয়া গিয়া আমর হাজরমীকে বলিল—দেখিতেছ কি, তোমার ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণ আর সম্ভবপর হইবে না। কাপুরুষ ওৎবা সদলবলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। শীঘ্র উঠিয়া আর্তনাদ করিতে আরম্ভ কর। আবু-জেহেলের কথা শেষ হইতে না হইতে, আমর সমস্ত অঙ্গে ধুলা মাখিতে মাখিতে এবং গায়ের কাপড় ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে তাহার ভ্রাতার নাম লইয়া আর্তনাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আর যায় কোথায়, হাকিমের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে সহস্র কণ্ঠনিসৃত বীভৎস চীৎকারে রণপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

## যুদ্ধের সূত্রপাত—ওৎবা নিহত

মুসলমানগণ ধীরস্থির ও নীরব-নিষ্পন্দভাবে অচল পর্বতবৎ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদিগের শিরায় শিরায় ঈমানের অজেয় অদম্য তড়িৎতরঙ্গ সহস্র আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে, তাঁহারা একবার সম্মুখস্থ শত্রুসৈন্যদলের প্রতি আর একবার কোটি-বিলম্বিত তরবারির প্রতি তাকাইতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর চরণযুগলের প্রতি চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পুনরায় গম্ভীরভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন। তখন নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধের পূর্বে প্রত্যেক পক্ষের বিখ্যাত বীরগণ রণপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া অন্যপক্ষকে সমরে আহ্বান করিতেন। সে পক্ষের নির্বাচিত কয়েকজন খ্যাতনামা বীর এই আহ্বানের উত্তর প্রদানের জন্য বীরদর্পে অগ্রসর হইতেন। প্রথমে বাচনিক আস্ফালন এবং তাহার পর অস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ হইত। এইরূপে কয়েকদল যোদ্ধা প্রেরণের পর সাধারণ আক্রমণ আরম্ভ হইয়া যাইত। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। অভিমান-ক্ষুব্ধ ওৎবা, তাহার সহোদর শায়বা ও পুত্র অলিদকে অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—কে আসিবি আয়, আমাদের তরবারির খেলা দেখিয়া যা! এই আহ্বান শুনিয়া কয়েকজন আনসার বীর উলঙ্গ তরবারি হস্তে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। হযরতের নিষেধ করার পূর্বেই ওৎবা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—মোহাম্মদ! মদীনার এই চাষাগুলির সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের পক্ষে অসম্মানজনক। আমাদিগের যোগ্য যোদ্ধা পাঠাও! ততক্ষণ আনসার বীরগণ হযরতের আদেশক্রমে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তখন হযরত নিজের পরমাত্মীয়গণের মধ্য হইতে আমীর হামযা, মহাত্মা ওবায়দা ও বীরকেশরী আলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তোমরা উহাদিগের মোকাবেলায় অগ্রসর* হও! ইঁহারা অগ্রসর হইলে কাফেরগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল—অলিদের সহিত আলীর, শায়বার সহিত হামযার এবং ওৎবার সহিত ওবায়দার যুদ্ধ বাধিয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে শায়বা ও অলিদের মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

ওলায়দা তখন সকলের অপেক্ষা বৃদ্ধ, তিনি ওৎবাকে নিহত করিলেন বটে, কিন্তু নিজেও গুরুতররূপে আহত হইয়া পড়িলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে তিনিও শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ওবায়দা আহত হইলে আলী ও হামজা গিয়া ওৎবাকে নিহত করেন। কিন্তু বিশ্বস্ত হাদীছ গ্রন্থসমূহে স্বয়ং হযরত আলীর প্রমুখাৎ যে রেওয়ায়ৎ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এ কথার উল্লেখ নাই।*

## সাধারণ আক্রমণ

ওৎবার বংশের নিধনপ্রাপ্তির পর সমস্ত কোরেশ সৈন্য একত্রে মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিল। এতক্ষণ ধৈর্যধারণ করার পর সুযোগ পাওয়া মাত্র মুছলমানগণও প্রচণ্ডবেগে তাহাদিগের উপর পতিত হইলেন। দুই দলে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

হযরতের জীবনী লেখকগণ এক্ষেত্রে কেবল সংখ্যার ও সাজ-সরঞ্জামের তারতম্য প্রদর্শন করতঃ এই পরীক্ষার গুরুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, এই অনল-পরীক্ষার গুরুত্বের আরও একটি দিক আছে, সেটি বীরত্ব, দৈহিক বল বা সমরপটুতার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে—সেটি হইতেছে বিশ্বাস ও ঈমানের শক্তি-পরীক্ষা। পাঠক, একবার কল্পনানেত্রে চাহিয়া দেখুন, স্বীয় প্রাণপ্রতিম পুত্র আবদুর রহমানকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আবু বাকর উলঙ্গ তরবারি হস্তে তাঁহার প্রাণবধ করার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। ওৎবার এক পুত্র হোজায়ফা পূর্বেই মুছলমান হইয়াছিলেন। পিতাকে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি মোকাবেলার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন। হযরত ওমরের তরবারির আঘাতে তাঁহার মাতুলের দেহ দ্বিখণ্ডিত হইতেছে। আল্লাহর নামে এবং সত্যের সেবায় এমন করিয়া সকল মায়ার বাঁধনকে কাটিয়া ফেলা, সহস্র রুস্তমের মুণ্ডপাত করা অপেক্ষা অধিকতর দুঃসাধ্য। এ পরীক্ষায় প্রাতঃস্মরণীয় ছাহাবাগণ যে সফলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

## হযরতের আকুল প্রার্থনা

যখন দুই দলে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, অস্ত্রের ঝনঝনা এবং রণ-কোলাহলে বদরের গগন-পবন যখন ভীষণভাবে আলোড়িত হইতেছে, হযরত তখন সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া পুনরায় সেই আরিশে প্রবেশ করিলেন। তিন শত ভক্ত নিজেদের তিন গুণেরও অধিক ধর্মদ্রোহীদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোরেশগণ আসিয়াছে সত্যসনাতন এছলাম ধর্মকে সমূলে উৎপাটিত করিতে। আল্লাহর নাম বিলুপ্ত হউক, ইহাই তাহাদিগের সঙ্কল্প। আর মুছলমানগণ নিরস্ত্র, একমাত্র আল্লাহর নাম ব্যতীত তাঁহাদিগের অন্য কোন সম্বল নাই—তাঁহারা আসিয়াছেন প্রাণের বিনিময়ে আল্লাহর নামকে জয়যুক্ত করিতে। মুছলমানগণ ধ্বংস হইয়া যায় যাউক, কিন্তু তাহা হইলে তাওহীদের ঝঙ্কার যে চিরকালের তরে থামিয়া যাইবে, মুছলমান যে তাওহীদের বাহন। এই প্রকার চিন্তায় হযরতের মন আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি আল্লাহকে পুনঃ পুনঃ আকুল আহ্বান করিতে ভূলুণ্ঠিত হইলেন এবং পূর্ববৎ প্রার্থনায় সম্পূর্ণরূপে তন্ময়-তদগত হইয়া গেলেন। আনছারে বড় ছা'আদ-এবন-মা'আজ এই অবস্থা দেখিয়া কয়েকজন আনছার বীরকে সঙ্গে লইয়া আরিশের দ্বারদেশে পাহারা দিতে লাগিলেন। আলী বলিতেছেন—আমি যুদ্ধ করিতে করিতে হযরতের তত্ত্ব লইবার জন্য তিনবার আরিশে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তিনবারই দেখিলাম, হযরত সিজদায় গিয়া একেবারে আপনহারা অবস্থায় প্রার্থনায় নিমগ্ন আছেন। তিনবারই শুনিলাম, হযরত বলিতেছেন ঃ

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث

---

* মোছনদ, কানজুল-ওম্মাল প্রভৃতি।

ওমর ফারুক বলিতেছেন—যুদ্ধের প্রারম্ভকালে হযরত কেবলা-মুখী হইয়া দুই বাহু উর্ধ্বে উত্থিত করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ঃ

اللهم انجز لي ما وعدتني ! اللهم آت ما وعدتني ! اللهم انك ان

تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض -

'হে আমার আল্লাহ্, আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছ, তাহা পূর্ণ কর ; হে আমার আল্লাহ্, আমাকে যাহা দিবার ওয়াদা করিয়াছ, তাহা দান কর ! আল্লাহ্ ! বিশ্বাসিগণের এই দলটিকে যদি তুমি ধ্বংস করিয়া ফেল, তাহা হইলে ধরাতলে আর তোমার পূজা হইবে না।'* স্বনামধন্য কবি 'একবাল' যেন হযরতের এই প্রার্থনার প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিতেছেন ঃ

ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں ترا نام رہے

کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے ؟

যাহা হউক, হযরতের স্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর গ্রামে উপনীত হইল, এবং এই আপনহারা অবস্থায় উত্তরীয়খানি স্কন্ধদেশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। তখনও তিনি পূর্ববৎ তন্ময়ভাবে প্রার্থনায় নিমগ্ন। ভক্তপ্রবর মহাত্মা আবু-বাকর এই দৃশ্য দর্শন করিয়া অধীরভাবে ছুটিয়া আসিলেন, উত্তরীয়খানা দ্বারা হযরতের শরীর আচ্ছাদিত করতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিতে লাগিলেন ঃ "সবুর, সবুর, প্রভু হে ! যথেষ্ট হইয়াছে। এ প্রার্থনা ব্যর্থ যাইবে না। আল্লাহ্ শীঘ্রই নিজের ওয়াদা পূর্ণ করিবেন।" এই সময় আল্লাহর নিকট হইতে অভয়বাণী আসিল, হযরতের বদনমণ্ডল স্বর্গীয় প্রভায় তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ছুরা আনফালের নিতিন্ন আয়ৎ এই সময় অবতীর্ণ হয় এবং হযরত মুছলমানদিগকে এই সকল আয়তের মর্ম জানাইয়া দেন।

## যুবকের সঙ্কল্প

এদিকে ময়দানে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। সত্যের সেবক মোছলেম বীরবৃন্দ এক-একবার আল্লাহর নামে জয়ধ্বনি করিতেছেন এবং এক-একজন যেন শত সৈনিকের শক্তি লইয়া শত্রুদলনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। কোরেশ দলপতি ওৎবা পূর্বেই নিহত হইয়াছে। হযরতের ও এছলামের আর একটি প্রধান বৈরী ছিল—নরাধম উমাইয়া-এবন-খাল্ফ। আনছার বীরগণের হস্তে তাহাকেও পঞ্চত্ব পাইতে হইয়াছে। আবু-লাহাব বদর যুদ্ধে যোগদান করে নাই—নিজের পরিবর্তে একজন খাতককে পাঠাইয়া দিয়াছিল, আবু-সুফিয়ানও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না। সুতরাং তখন এক আবু-জেহেলই কোরেশ সৈন্যদলের একমাত্র বলবুদ্ধি। আবদুর রহমান-এবন-আওফ বলিতেছেন—আমি অন্যান্য মোজাহেদগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত আছি। এমন সময় দেখি, দুইটি তরুণ বয়স্ক যুবক সমরক্ষেত্রের এদিক ওদিক যেন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। অল্পক্ষণ পরে তাহাদিগের একজন আমার নিকটে আসিয়া বলিল—তাত ! আবু-জেহেল লোকটা কে ? সে কোথায় আছে ? তাহাকে একবার দেখাইয়া দিতে পারেন ? কিছুক্ষণ পরে অন্য যুবকটি আসিয়াও ঐরূপে আবু-জেহেলের সন্ধান লইতে লাগিল। আমি তখন বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা আবু-জেহেলকে খুঁজিতেছ কেন ? যুবকদ্বয় উত্তর করিল—আমরা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আবু-জেহেলের সাক্ষাৎ পাইলেই তাহাকে হত্যা করিব। তাই আজ সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আবদুর রহমান বলিতেছেন, এই তরুণ যুবকদ্বয়ের মুখে তাহাদিগের সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ করিয়া আমি যাহারপর নাই আনন্দিত হইলাম এবং আবু-জেহেলকে দেখাইয়া দিলাম।

---

* এবারতটি মোছলেম হইতে গৃহীত।

## আবু-জেহেল নিহত হইল

আবু-জেহেল তখন কোরেশ সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে ব্যূহ বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। কোরেশ সৈন্যদলের কতিপয় প্রধান প্রধান বীর তাহার বিশেষ দেহরক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছে, সতর্কতার একটুও ত্রুটি নাই। এমন সময় মা'আজ ও মোআউজ নামক উপরে বর্ণিত ভ্রাতৃযুগল উলঙ্গ তরবারি হস্তে আবু-জেহেলের ব্যূহের দিকে ধাবিত হইয়া নিমেষের মধ্যে ব্যূহের উপর আপতিত হইল। অতর্কিত আক্রমণের ফলে কোরেশ সৈন্যগণ যেন একটু হতভম্ব হইয়া পড়িল এবং "ব্যাপার কি" তাহার সঠিক সংবাদ লইতে লইতে ভ্রাতৃযুগল একেবারে আবু-জেহেলের মাথার উপর উপস্থিত। এই সময় আবু-জেহেলের পুত্র একরামা মা'আজের বাম বাহুতে তরবারির আঘাত করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে যায়, কিন্তু মা'আজ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না অথবা একতামার আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার জন্যও ব্যগ্র হইলেন না। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য—সঙ্কল্প সিদ্ধি: সুতরাং আঘাত-জর্জরিত হইয়াও এছলামের এই তরুণ মোজাহেদযুগল একমাত্র আবু-জেহেলকে লক্ষ্য করিয়া তীরবেগে ধাবিত হইলেন। বলিতে ভুলিয়াছি—একরামার তরবারির আঘাতে মা'আজের বাম বাহুটির অধিকাংশ কাটিয়া গিয়া ঝুলিতে থাকে। মা'আজ দেখিলেন—তাঁহারই বাহু এখন তাঁহার সাধন পথের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন আর বিলম্ব সহিল না, মা'আজ দোদুল্যমান বাহুটি পদতলে চাপিয়া ধরিয়া এমন জোরে ঝটকা দিলেন যে, বাহুটি তাঁহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিনি বিশেষ স্ফূর্তিসহকারে সঙ্কল্প সাধন মানসে লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে যুগল-বাহুর সমবেত আঘাতে আবু-জেহেলের রক্তরঞ্জিত দেহ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, বাহ্যিক হিসাবে এই ভ্রাতৃযুগলই বদর বিজয়ের প্রধান উপকরণ।

## সত্যের জয়

মোছলেম বীরবৃন্দের সিংহবিক্রমে দেখিতে দেখিতে ন্যূনাধিক ৭০ জন কোরেশ সৈন্য নিহত হইল। যে ১৪ জন কোরেশ-প্রধান হযরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে নায়কত্ব করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ১১ জন এই যুদ্ধে নিহত হইল। নিহত লোকদিগের মধ্যে ওৎবা, শায়বা, আবু-জেহেল, তস্য ভ্রাতা আছি, আবু-ছুফিয়ানের পুত্র হানজালা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইরূপে বহু সৈন্য হতাহত এবং অধিকাংশ প্রধান ব্যক্তিবর্গকে নিহত হইতে দেখিয়া কোরেশ সৈন্যদলের মধ্যে ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইল এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মুছলমানগণ তখন অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করিয়া পলায়নপর শত্রুসেনাবর্গকে বন্দী করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিহাসে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুছলমানগণ যদি তখন অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ না করিতেন, তাহা হইলে বহু কোরেশ সৈন্য তাঁহাদিগের দ্বারা শমন সদনে প্রেরিত হইত। আরিশের দ্বাররক্ষক ছা'আদ এ সম্বন্ধে প্রকারান্তরে হযরতের নিকট অভিযোগও করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাচ তিনি এ সময় অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন নাই। যুদ্ধের পূর্বে হযরত সকলকে বিশেষ তাকিদ সহকারে বলিয়া দিয়াছিলেন—"কোরেশদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছে; সাবধান, তাহাদিগকে কেহ আঘাত করিও না।"

## কোরেশ বন্দীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার

এই যুদ্ধে কোরেশ পক্ষের ৭০ জন সৈন্য মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হয়। ইতিহাসে আহত ও নিহত কোরেশদিগের নাম ও বংশ পরিচয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার প্রচলিত সামরিক রীতিনীতি ও দেশাচার অনুসারে মুছলমানগণ এই বন্দীদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিতে অথবা বংশ-পরম্পরাক্রমে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। ইহাদিগের

পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত নৃশংস অত্যাচার এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা স্মরণ করিলে, সতত মনে হয় যে, এই মহাপাতকের কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলাই উচিত ছিল। কিন্তু দয়ার সাগর মোহাম্মদ মোস্তফা আদেশ করিলেন— استوصوا بالاسارى خيرا।

"বন্দীদিগের সহিত যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিবে।" আবু–আজিজ নামক জনৈক বন্দী নিজ মুখে বলিয়াছে : 'মোহাম্মদের আদেশক্রমে মুছলমানগণ দুই বেলা আমাদিগের জন্য রুটি তৈয়ার করিয়া দিত, আর নিজেরা খেজুর খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত। আহারের কোন উত্তম জিনিস হস্তগত হইলে, নিজেরা না খাইয়া তাহা আমাদিগকে খাওয়াইয়া যাইত।' স্যার উইলিয়ম মুরের ন্যায় খ্রীষ্টান লেখকও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—

In persuance of Mohammad's command...the citizens, and such of the Refugees as had houses of their own, received the prisoners with kindness and consideration. 'Blessings on the men of Medina !' said one of these in later days : 'they made us ride, while they themselves walked a foot : they gave us wheaten bread to eat when there was little of it, contenting themselves with dates.'*

অর্থাৎ, মোহাম্মদের আদেশক্রমে মদীনাবাসিগণ এবং সমর্থ মোহাজেরবর্গ বন্দীদিগের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। একজন বন্দী পরে নিজেই বলিয়াছে—'খোদা মদীনাবাসীদিগের মঙ্গল করুন, তাহারা আমাদিগকে উট ও ঘোড়ায় সওয়ার করিয়া দিত, আর নিজেরা হাঁটিয়া যাইত। তাহারা আমাদিগকে ময়দার রুটি তৈয়ার করিয়া খাওয়াইত, আর নিজেরা খেজুর খাইয়া কাটাইয়া দিত।'

বন্দীদিগের সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করার পর হযরত নিহত ব্যক্তিগণের সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন। মুছলমানদিগের পক্ষে ৬ জন মোহাজের এবং ৮ জন আনছার মোট ১৪ জন এই যুদ্ধে শাহাদৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুছলমানগণ তাঁহাদিগকে যথাবিধি সমাধিস্থ করিলেন। নিহত কোরেশ সৈন্যগণের লাশগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ময়দানে পড়িয়া ছিল। সেইগুলিকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া আসা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না। ইহাদিগের জন্য একটা বড় কবর খনন করা হইল এবং সেই অর্দ্ধগলিত দুর্গন্ধ লাশগুলিকে ছাহাবাগণ নিজেরা বহিয়া আনিয়া তাহাতে সমাধিস্থ করিলেন।**

## পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

### বদর সমর সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনা

মুছলমানগণ নিহত সৈনিকদিগকে সমাধিস্থ করিতে, বন্দীদিগের সুব্যবস্থা করিতে, আহতগণের চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করিতে এবং কোরেশদিগের পরিত্যক্ত রণসম্ভার ও অন্যান্য আসবাবপত্র গোছাইয়া লইতে ব্যাপৃত আছেন। তখন মদীনাবাসী ভক্তগণের উৎকণ্ঠার কথা তাঁহাদের স্মরণ হইল। মদীনার পৌত্তলিকগণ ও ইহুদী সমাজ তখন আশায় উৎফুল্ল হইয়া 'সুসংবাদের' অপেক্ষা করিতেছিল। কপট মুছলমানগণও গোপনে গোপনে তাহাদিগের সহায়তা করিতেছিল। তাহাদিগের দৃঢ় আশা ছিল যে, মুছলমানগণ

---

* ১৯২৩ সালের সংস্করণ, ২৩৩ পৃষ্ঠা।

** এই অধ্যায়ের বর্ণিত বিবরণগুলি—বোখারী, মোছলেম, আবু–দাউদ, মোছনাদ, তাবকাত, ফাতহুল-বারী প্রভৃতি হাদীছ পুস্তক বিভিন্ন স্থান হইতে এবং এবন-হেশাম, তাবরী, তাবকাত, অফাউল অফা, মাওয়াহেব ও হলবী প্রভৃতি ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত। এই বিবরণগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতভেদ না থাকায় স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক বিবরণের বরাত দেওয়া হইল না।

এই যুদ্ধে একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। মুছলমানদিগের পরাজয় সংবাদ মদীনায় পৌঁছামাত্র তাহারা সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে—এই প্রকার সঙ্কল্পও যে পূর্বে স্থির হইয়া গিয়াছিল, পূর্বাপর সংঘটিত ঘটনাগুলি একত্রে আলোচনা করিলে তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারা যায়। পাঠকগণ এই ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন, পরবর্তী ঘটনাসমূহের দ্বারা ইহার আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

## মদীনায় সংবাদ প্রেরণ

যাহা হউক, হযরত আর কালবিলম্ব না করিয়া আবদুল্লাহ ও জায়েদ নামক ছাহাবীদ্বয়কে বদরের বিজয় সংবাদ লইয়া মদীনা ও কোবায় পাঠাইয়া দিলেন। এই দূতদ্বয় মদীনা ও কোবার প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইয়া মুছলমানদিগকে আল্লাহর অনুগ্রহের সংবাদ প্রদান করিলেন। মদীনায় যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন মুছলমানগণ হযরতের নয়নমণি, মহাত্মা ওছমানের সহধর্মিণী বিবি রোকাইয়ার সৎকার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বদর যাত্রার পূর্বে ইনি পীড়িত হইয়া পড়েন, হযরত ওছমান এইজন্য যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এই বিজয় সংবাদ পৌঁছামাত্র মদীনার মুছলমানদিগের মধ্যে মহা উৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। তাঁহারা দলে দলে জায়েদ ও আবদুল্লাহর নিকট সমবেত হইতে আরম্ভ করিলেন এবং নিজ কর্ণে বিজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া আল্লাহর নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

## ইহুদীদিগের মনস্তাপ

ইহুদী, পৌত্তলিক ও কপটগণ মনে করিয়াছিল, কোরেশদিগের এ আক্রমণ সহ্য করা মোহাম্মদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর হইবে না। তাহার পর তাহারা যখন দেখিল যে, জায়েদ হযরতের বিশিষ্ট উটটি লইয়া একাকী মদীনায় ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ফেলিল—এইবার মোহাম্মদের দফারফা হইয়াছে, ঐ দেখ, তাহার উট ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু জায়েদ নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"মোছলেম সমাজ! আনন্দিত হও। সত্যের শত্রুগণকে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। কোরেশ দলপতিগণের মধ্যে অধিকাংশই নিহত হইয়াছে। তাহাদের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে। তাহাদিগের বহু ধনসম্ভার ও সাজসরঞ্জাম আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। বহুসংখ্যক কোরেশ বন্দী হইয়া মদীনায় প্রেরিত হইতেছে।" এই কল্পনাতীত, স্বপ্নাতীত সংবাদ শ্রবণে তাহারা ক্রোধে ও ক্লেশে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। কা'ব-এবন-আশরফ ইহুদীদিগের প্রধান জননায়ক, সে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ফেলিল :

ويلكم احق هذا؟ اوهؤلاء اشراف العرب وملوك الناس-

ان كان محمد اصاب هؤلاء فبطن الارض خير من ظهرها

"তোদের সর্বনাশ হউক, এ সংবাদ কি সত্য? হায় হায়, ইহারা আরবের নায়ক ও রাজা। মোহাম্মদ যদি ইহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন ত মরণই শ্রেয়স্কর!" মুছলমানগণ এই প্রকার প্রলাপোক্তি ও অন্যায় ব্যবহারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পরস্পরকে এই আনন্দ সংবাদ দিতে লাগিলেন।

## হযরতের প্রত্যাগমনে মদীনায় উৎসব

এদিকে মুছলমানগণ বন্দী ও বিজয়লব্ধ সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া মদীনা যাত্রা করিলেন। ইতিহাস পাঠে মনে হয় যে, হযরত কয়েক মনজেল পর্যন্ত তাঁহাদিগের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা পথে একটু বিশ্রাম করিয়া দুই-এক দিন পরে মদীনায় উপনীত হন। হযরতের শুভাগমন সংবাদে মদীনায় নূতন করিয়া উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ ও

প্রাচীনেরা তাঁহার সংবর্ধনার জন্য মদীনা হইতে বহির্গত হইয়া বদর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যুবকেরা আনন্দ-উৎসবে মত্ত হইয়া মুহুর্মুহু তকবির ধ্বনি দ্বারা মদীনার গগন-পবন কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিলেন। মদীনার বালিকাগণ "দফ" বাজাইয়া সমবেত কণ্ঠে সংবর্ধনাসূচক সঙ্গীত গান করিতে লাগিল। হযরত যথাসময় মদীনায় উপনীত হইলে, সে রাজীবচরণ দর্শন করিয়া ভক্তগণ আশ্বস্ত, তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইলেন। মদীনায় পৌঁছিয়াই হযরত বন্দীদিগের আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন, আহুত কুটুম্বগণের ন্যায় তাহাদের আদর-যত্ন হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে যে সকল মালে গনিমত মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল, পথিমধ্যেই হযরত তাহা মুছলমানদিগকে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এছলামের ইতিহাসে সুপরিচিত 'জুল-ফাকার' নামক তরবারিখানিও এই যুদ্ধে মুছলমানদিগের হস্তগত হয় এবং হযরত তাহা নিজের জন্য রাখিয়া লন।*

## বন্দীদিগের সম্বন্ধে পরামর্শ

ছিহা-ছেত্তার বিভিন্ন পুস্তকে বহু প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী কর্তৃক বদরের বন্দিগণ সম্বন্ধে কতিপয় হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ হাদীছগুলির সারমর্ম এই যে, বদর যুদ্ধে ধৃত বন্দীদিগের সম্বন্ধে মীমাংসা করার ভার ও অধিকার আল্লাহ্ কর্তৃক মুছলমানদিগের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছিল এবং হযরত প্রকাশ্যভাবে ইহার ঘোষণাও করিয়া দিয়াছিলেন। তিরমিজী নামক হাদীছ গ্রন্থে বহু ছাহাবা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, বন্দিগণকে হত্যা করা হইবে অথবা মুক্তিপণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত এ মীমাংসার ভার ছাহাবাগণের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ছাহাবাগণ মুক্তিপণ গ্রহণের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। (তিরমিজী ১ম খণ্ড ২০৩ ও ২১৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। যাহা হউক, বদর যুদ্ধের পর বন্দিগণকে আনয়ন করা হইলে মদীনায় পরামর্শ সভার অধিবেশন হইল এবং পূর্ববর্ণিত মন্তব্য প্রকাশ করতঃ হযরত তাহাদিগের সম্বন্ধে ছাহাবাগণের মতামত জানিতে চাহিলেন। এ সম্বন্ধে যে ছাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল, ছহী হাদীছের বর্ণনাতেও তাহা প্রমাণিত হইতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে চিরকালই চরমপন্থী ও ধীরপন্থী দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। (অবশ্য নীচ স্বার্থের দাস মোনাফেকদিগের কথা স্বতন্ত্র।)। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। হযরত আবু-বাকর নিবেদন করিলেন ঃ 'হযরত ! ইহারা সকলেই আমাদিগের স্বজন ও আত্মীয়। আমার মতে কিছু কিছু অর্থ লইয়া ইহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত। ইহাতে আমাদিগের সাধারণ তহবিলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইবে। পক্ষান্তরে অল্প দিনের মধ্যে ইহাদিগের সকলের পক্ষে এছলাম গ্রহণ করাও সম্ভব।' এখানে বলা আবশ্যক যে, হযরত ভক্তপ্রবর আবু-বাকরের নিকট ছাহাবাগণের অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। তখন ওমরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন—খাত্তাবের পুত্র, আপনার কি মত ? ওমর সসম্ভ্রমে নিবেদন করিলেন—"আমি আবু-বাকরের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। ইহারা এছলামের চিরশত্রু এবং মুছলমানগণের প্রাণের বৈরী। আমাদিগকে নির্যাতিত করিতে, আল্লাহর রছুলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিতে এবং আল্লাহর সত্যধর্মকে জগতের পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে ইহারা সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। এগুলি অন্যায়, অধর্ম ও অত্যাচারের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। এগুলিকে অবিলম্বে হত্যা করিয়া ফেলা হউক। প্রত্যেক মুছলমান উলঙ্গ তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হউক এবং নিজ হস্তে নিজের আত্মীয়বর্গের মুণ্ডপাত করুক—আমার ইহাই মত।" তিরমিজীর হাদীছ হইতে পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, আবু-বাকর ছাহাবাগণের সাধারণ মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন, অতএব হযরত, ওমারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া আবু-বাকরের অভিমত অনুসারে মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

---

* এবন-হেশাম, তাবকাত, তাবরী, হালবী বদর প্রসঙ্গ।

সাধারণ ইতিহাস লেখকের বর্ণনা পাঠ করিলে মোটের উপর পাঠককে এই ধারণায় উপনীত হইতে হইবে যে, বদর যুদ্ধের বন্দীদিগের মুক্তিপণ এক হাজার হইতে চারি হাজার দেরহাম পর্যন্ত নির্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু নাছাই, আবু-দাউদ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে এবন-আব্বাছ কর্তৃক যে দুইটী হাদীছটি বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ হইতেছে যে, বদর যুদ্ধের বন্দীদিগের জন্য চারিশত দেরহাম মাত্র মুক্তিপণ নির্ধারিত হইয়াছিল।* হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সকল বন্দী লেখাপড়া জানিত, হযরত তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন—'তোমরা প্রত্যেকে মদীনার দশটি বালককে লেখা শিখাইয়া দাও, ইহাই তোমাদিগের মুক্তিপণ।' কতিপয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে কোন প্রকার পণ না লইয়াই মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।** এখন পাঠকগণ বিগত পঞ্চদশ বৎসরের ইতিহাস এবং কোরেশদিগের কার্যকলাপ একবার স্মরণ করুন। তাহারা কি উদ্দেশ্যে মদীনা আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল এবং এই আক্রমণে সফলকাম হইলে তাহাদিগের হস্তে মুছলমানদিগের কি অবস্থা ঘটিত, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহার পর বন্দীদিগের প্রতি মুছলমানদিগের বর্তমান ব্যবহার বা তাহাদিগের মুক্তিসংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারাই বিচার করিয়া বলুন যে, বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে ইহা অতুল কি-না? প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ এখানে ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, জীবনের সর্বপ্রথম সুযোগেই, হযরত মদীনায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোরআনের বিখ্যাত লিপিকার যায়েদ এই সময় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।*** আমরা 'বাধ্যতামূলক' বিশেষণ প্রয়োগ করায় কোন কোন পাঠক একটু চমকিত হইবেন, ইহা আমরা বিদিত আছি। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মদীনার মুছলেম আনছার বালকগণকে পাঠশালায় যাইতে বাধ্য করা না হইয়া থাকিলে, এতগুলি বন্দীর প্রত্যেকের পক্ষে দশটি বালককে শিক্ষা দিবার সুযোগ লাভ কোনমতেই সম্ভবপর হইতে পারিত না।

## বন্দী হত্যার মিথ্যা অভিযোগ

এবন-এছহাক, এবন-জরির ও এবন-ছা'আদ প্রমুখ ইতিবৃত্ত সঙ্কলকগণ বলিতেছেন যে, মদীনা আসিবার সময় পথিমধ্যে নজর-এবন হারেছ ও ওকবা এবন-আবু-মুআয়েৎ নামক দুইজন বন্দীকে হত্যা করা হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে, হযরতের সম্মুখে, এমন কি তাঁহারই আদেশক্রমে, এই হত্যা সাধিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টান লেখকগণ এই ব্যাপারটাকে খুব ঘোরাল করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে ঐতিহাসিকগণের সঙ্কলিত এই কিংবদন্তীটি সত্য বলিয়া নির্ধারিত হইলেও তাহা দ্বারা হযরতের চরিত্রের উপর দোষারোপ করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যুদ্ধ-বিগ্রহে ও রাজনৈতিক ব্যাপারে এই প্রকার 'নরহত্যা' সর্বদাই সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা লইয়া খ্রীষ্টান লেখকগণের—বিশেষতঃ জেনারেল ময়ারের কুটিল ও মুরুব্বীয়ানার—এতটা হৈ চৈ করা আদৌ সঙ্গত ও শোভনীয় হয় নাই। তাঁহারা ঐতিহাসিক হিসাবে একটু তদন্ত করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, এই হত্যার বিবরণগুলি, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিবিশেষের স্বকপোলকল্পিত উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা নিম্নে ধারাক্রমে এই তথাকথিত হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

---

* আবু-দাউদ ১—২০, আওনল মাবুদ ৩—১৪ ও নাছাই প্রভৃতি দেখুন।
** যোরকানী ১—২৪৭ এবং এবন-হেশাম, তবরী প্রভৃতি।
*** তবকাত ২—বদর।

নাজ্‌র এবন হারেছের হত্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনায় যে সকল অসামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে, সংক্ষেপের খাতিরে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না।

যাহা হউক, কথিত ইতিহাসগুলির পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে প্রথমেই দেখা যাইবে যে, এই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনাকালে কোন ঐতিহাসিক তাহার 'ছনদ' বর্ণনা করেন নাই। এবন-এছহাক বলিতেছেন—"মক্কার কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এই গল্পটি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।" এবন-এছহাক অন্যান্য সকল স্থানে ছনদ বর্ণনা করিতেছেন, অথচ এখানে এমন করিয়া সারিয়া দিতেছেন, ইহার অর্থ কি ? আর এই শ্রেণীর ভিত্তিহীন গল্প-গুজবের মূল্যই বা কি ? একরূপ ক্ষেত্রে এবন-জরির ও এবন-এছহাকের প্রদত্ত বিবরণগুলি যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, এই পুস্তকের ভূমিকায় আমরা তাহা সম্যকরূপে প্রতিপাদন করিয়াছি।

যে কিংবদন্তীটির উপর নির্ভর করিয়া এই উপকথার সৃষ্টি করা হইয়াছে, একটু মনোযোগ সহকারে সেটি পাঠ করিয়া দেখিলে সহজে জানিতে পারা যায় যে, তাহা পুঞ্জীভূত ভ্রম-প্রমাদ অথবা স্তূপীকৃত মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বিবরণে বলা হইয়াছে যে, বদর যুদ্ধে মাত্র ৪৪ জন কোরেশ বন্দী হইয়াছিল এবং ঐ পরিমাণ শত্রু সৈন্য নিহত হইয়াছিল। অথচ ঐতিহাসিকগণ নিজেরাই ৭০ জন বন্দীর নামের উল্লেখ করিয়াছেন। জাজ্বল্যমান সত্যের বিপরীত এবন-এছহাক বলিতেছেন যে, ছায়েব-এবন-ছায়েব বদর যুদ্ধে মুছলমানদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। অথচ ইনি মুছলমান অবস্থায় বহুদিন পর্যন্ত হযরতের সঙ্গে ছিলেন এবং স্বয়ং হযরত ইঁহার গুণ-গরিমার প্রশংসা করিয়াছেন।* সুতরাং যে রেওয়ায়তের কোন ছনদ নাই এবং যাহার রাবিগণ এই প্রকার ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়া থাকেন, তাঁহার ও তাঁহাদিগের ভিত্তিহীন কথা মাত্রের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কখনই সমীচীন হইতে পারে না। মজার কথা এই যে, উপরিবর্ণিত ইতিহাসের রাবিগণই বলিতেছেন যে, ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হোনায়েন যুদ্ধের পর হযরত এই নাজর-এবন-হারেছকে গনিমতের মাল হইতে একশত উট উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। এই অসামঞ্জস্যের সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই শেষোক্ত নাজরকে "সম্ভবতঃ প্রথমোক্ত নাজরের ভ্রাতা" বলিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছেন। আবার কেহ কেহ হোনায়েন উপলক্ষে বর্ণিত নাজরকে 'নাছর' 'নোজের' 'নোছের' 'হারেছ' প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্যর উইলিয়ম মুর তাঁহার পুস্তকে বদর উপলক্ষে খুব ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া নাজরের হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই আবার ঐ পুস্তকের ৪র্থ খণ্ডের ১৫১ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে নিজ মুখে স্বীকার করিতেছেন যে, হোনায়েনের গনিমত হইতে নাজর-এবন হারেছকেও একশত উট প্রদান করা হইয়াছিল। এবন-মোন্দা ও আবু-নাইমের ন্যায় প্রাচীন চরিত লেখকগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, এই নাজর-এবন-হারেছ হোনায়েন যুদ্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং হযরত তাঁহাকে একশত উট প্রদান করিয়াছিলেন।** এবন-মোন্দা ছনদ সহকারে এবন-এছহাক হইতে এবং এবন-এছহাক আবু-ছইদ ছাহাবী হইতে ছনদ সহকারে বর্ণনা করিতেছেন যে, হোনায়েন যুদ্ধের পর হযরত এই নাজর-এবন-হারেছকে একশত উষ্ট্র প্রদান করিয়াছিলেন।*** কিন্তু যেহেতু কোন কোন ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে, বদর যুদ্ধের পর নাজরকে হত্যা করা হইয়াছিল, অতএব পরবর্তী লেখকেরা এই পরম্পরাগত ও প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী কর্তৃক প্রদত্ত রেওয়ায়তটিকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু এই ভিত্তিহীন কিংবদন্তীটিকে রক্ষা করার জন্য তাঁহারা এবন-মোন্দা ও আবু-নাইমের ন্যায় মোহাদ্দেছগণের সিদ্ধান্তকে বিনা বিচারে ডিসমিস করিয়া দিতে এক বিন্দু কুণ্ঠিত হন নাই।****

* মোসনদ, এছাবা প্রভৃতি।

** তাহ্‌কিক ২—১২০২ নং নাম।

*** এছাবা ৮৭০৫ নং নাম।

**** এবন-আছির কৃত তাহ্‌কিক দেখুন।

বিজ্ঞ পাঠকগণ এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, এবন-হেশামের মারফতে এবন এছহাকের যে সঙ্কলনটি এখন আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত হারেছ-এবন-হারেছকে উট দিয়াছিলেন। কিন্তু এই হারেছ-এবন-হারেছের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই সঙ্কলক এবন-হেশাম টীকা করিয়া বলিতেছেন—হারেছ-এবন-হারেছ নহে, নোজের-এবন হারেছ হইবে। তবে উহার নাম নোজের ও হারেছ উভয় হইতে পারে। অধিকন্তু কোন কোন সংস্করণে নোজের স্থলে নোছের নামের উল্লেখ হইয়াছে।* এই গবেষণার পরে আমরা দেখিয়াছি যে, এবন-হেশামের সঙ্কলিত এই বর্ণনার সঙ্গে রাবী এবন-এছহাক কোন প্রকার ছনদ এমন কি উপরিতন একটি রাবীর নামেরও উল্লেখ করেন নাই।** কিন্তু পক্ষান্তরে মোহাম্মদ এবন-আম্মা কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়তে এবন-এছহাক হইতে হজরত পর্যন্ত সমস্ত রাবীর নাম যথাবিহিত ধারাবাহিকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং এবন-এছহাকের এই রেওয়ায়ৎ দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত হইতেছে যে, নাজর-এবন-হারেছ বদর যুদ্ধের পর নিহত হন নাই, বরং ইহার ছয় বৎসর পরে হোনায়েন যুদ্ধের গনিমতের ভাগও তিনি পাইয়াছিলেন। ফলতঃ নাজরের হত্যাকাণ্ডের কাহিনীটি যে কিরূপ ভিত্তিহীন কল্পনা, আশা করি পাঠকগণ তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে ওকবার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা নিবেদন করিব।

## ওকবার হত্যাকাণ্ড

আমাদিগের ইতিহাস লেখকগণ বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহার মধ্যে একটি ছনদ-বিহীন বর্ণনায় কথিত হইয়াছে যে, নাজর-এবন হারেছের পর হজরতের আদেশে ওকবা-এবন-আবু মুইৎকেও হত্যা করা হয়। ওয়াকেদী-এবন এছহাক প্রভৃতি এই বিবরণ সম্বন্ধে কোন প্রকার ছনদ বা পরম্পরার উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ ইহাদিগের বর্ণনায় এত অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহার সমাধান করাও অসম্ভব। এই দুইটি কারণে ঐতিহাসিক হিসাবে এই বিবরণগুলির কোনই মূল্য নাই। তবে আবু-দাউদ নামক হাদীছ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে একটি হাদীছের উল্লেখ দেখা যায়। আমরা নিম্নে হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

عن ابراهيم قال اراد الضحاك بن قيس ان يستعمل مسروقا - فقال له عمارة بن عقبة اتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان ؟ فقال له مسروق ' حدثنا عبد الله بن مسعود ' و كان فى انفسنا موثوق الحديث ' ان النبى صلعم لما اراد قتل ابيك ' قال من للصبية ؟ قال النار - فقد رضيت لك ما رضى لك رسول الله صلعم (ابوداؤد ج ص ١٠)

"এবরাহিম বলেন: জোহাক-এবন-কায়েছ, মছরুককে কোন কার্যে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, ওকবার পুত্র ওমারা জোহাককে বলিলেন, আপনি কি ওছমানের হত্যাকারীদিগের অবশিষ্ট ব্যক্তি (অর্থাৎ এই মছরুক)-কে কার্যে নিযুক্ত করিবেন? তখন মছরুক ওমারাকে বলিলেন—আবদুল্লাহ-এবন-মাছউদ আমাদিগকে বলিয়াছেন—আর তিনি আমাদিগের মধ্যে মূল নির্ভর ব্যক্তি—হজরত যখন তোমার পিতাকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন সে বলিয়াছিল—আমার সন্তানবর্গের তত্ত্বাবধান কে করিবে? হজরত বলিলেন—"আগুন।"*** বলা আবশ্যক যে, ইহা বদর যুদ্ধের ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর পরের ঘটনা। কুফাতে বাসী মছরুক তাবেয়ী এবং ওমারা ওছমানের ভাই। এই হাদীছের সম্বন্ধে জানিতে পারা যাইতেছে

---

* এবন হেশাম ২—২১ পৃষ্ঠা। ** ফৎহল বারী ৮—১০ পৃষ্ঠা

যে, মাছরুক এছলামের ৩য় খলিফা হযরত ওছমানকে হত্যা করিয়াছিলেন। আমীর জোহাক এই মাছরুককে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিতে চাহিলে ওমারা তাঁহার পূর্ব কীর্তির উল্লেখ করিয়া এই নিয়োগের প্রতিবাদ করেন। মাছরুক ইহাতে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন এবং এই ন্যায্য অভিযোগের কোন সঙ্গত প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ হইয়া ওমারার প্রতিবাদের প্রতিশোধ লওয়ার জন্যই এবন-মাইতিদের নামকরণে একটা হাদীছ বলিয়া ফেলিলেন। রাবী-মাছরুক এই বিবরণের শেষাংশে ছাহাবী ওমারা ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাভগ্নিগণকে নারকী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। অথচ ইঁহারা সকলেই হযরতের ছাহাবী - বলা বাহুল্য যে, যে মহাপুরুষ হযরত ওছমানের ন্যায় খলিফাকে হত্যা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, যিনি একটি ছাহাবী পরিবারকে নারকী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির সাক্ষ্য কখনই বিশ্বাস্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অধিকন্তু যে অবস্থায় তিনি এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন, বিচারকালে তাহাও বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত।

এই হাদীছের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রাণদণ্ডের কথা শুনিয়া ওকবা যখন হযরতকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার সন্ততিবর্গের ভার কে গ্রহণ করিবে ? হযরত উত্তরে বলিলেন—আন্নার। 'নার' শব্দের সাধারণ অর্থ অগ্নি, নরকাগ্নি সম্বন্ধেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। মাছরুকের কথামতে ইহার অর্থ এই যে, তাহারা সব জাহান্নামে যাইবে। স্যার উইলিয়াম মূর প্রভৃতি সুযোগ পাইয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন—Hell fire ! খৃষ্টান লেখকগণ এই উক্তি দ্বারা হযরতের নৃশংসতা সপ্রমাণ করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনাটিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, এখানে 'নার' শব্দের অর্থ যে অগ্নি বা নরকাগ্নি হইতে পারে না, এ-কথা তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত ছিল। বিজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, মক্কার একটি বংশ 'নার গোত্র' বলিয়া খ্যাত হইত।* ওকবা তাহাদিগের বিশেষ আত্মীয়। সুতরাং তথাকথিত হাদীছের আলোচ্য অংশের অর্থ এই হইবে যে, বানু-নার বংশের স্বজনগণ তোমার সন্ততিবর্গের তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিবে।**

উপসংহারে পাঠকবর্গকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আলোচ্য নাজর ও ওকবা, এছলামের, হযরতের এবং মুছলমানদিগের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার জঘন্যতম ও জঘন্যতম অপরাধ করিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হয় নাই। এবন-হেশাম তাঁহার ইতিহাসের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধ্যায়ে ইঁহাদিগের অমানুষিক অত্যাচার-অনাচারের বিশদ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।*** অবশেষে হিজরতের পরও তাহাদিগের এই অন্যায় আক্রমণ। এই সমস্তও এই দুইজন শয়তানীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। এই বিবরণ সত্য হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ৭০ জন কোরেশ বন্দীর মধ্যে মাত্র এই দুই জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই দুই ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ অপরাধে লিপ্ত হইয়াছিল। অতএব এই দুই ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের ব্যাপার লইয়া হযরতের চরিত্রের উপর দোষারোপ করার ন্যায় ধৃষ্টতা আর কি হইতে পারে ! আমাদিগের খৃষ্টান বন্ধুগণ প্রত্যেক প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর উল্লেখকালে, সেগুলিকে হযরত কর্তৃক অনুষ্ঠিত murder ও assassination বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, দয়ার সাগর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা বদর যুদ্ধের সমস্ত বন্দীকেই নগদমাত্র অর্থের বিনিময়ে মুক্তি প্রদান করিলেন। যাহাদিগের অর্থ দিবার শক্তি ছিল না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না লইয়াই তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল। আবুল ওজ্জা নামক জনৈক বন্দী হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ মোহাম্মদ ! তুমি জানিতেছ, আমার অর্থ দিবার

---

* কামুছ—নুর

** মৌলবী চেরাগ আলী কৃত A Critical Exposition of the Popular Jihad ৭২ পৃষ্ঠা

*** ১—১২৪, ১২৬।

ক্ষমতা নাই। আমি গরীব এবং কয়েকটি কন্যার পিতা, আমার প্রতি দয়া কর। হযরত ইহাকেও বিনা ক্ষতিপূরণে মুক্তিদান করিলেন। এই প্রকার বহু লোক কোন প্রকার বিনিময় না দিয়াও মুক্তিলাভ করিল। ফলতঃ হযরতের দয়া এবং মুছলমানগণের অনুগ্রহের ফলে অল্প দিনের মধ্যে কোরেশের সমস্ত বন্দী স্বাধীনভাবে স্বদেশে চলিয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহারা এই দয়া অনুগ্রহের যে কি প্রকার প্রতিদান করিয়াছিল, পরবর্তী ঘটনা দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

## ষট্পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

### দ্বিতীয় হিজরীর অন্যান্য ঘটনা

### হযরতকে হত্যা করার নূতন ষড়যন্ত্র

মক্কার নরপশুগণ এই করুণ ব্যবহারের যথাযোগ্য প্রতিশোধ দিতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হইল না। হযরতকে হত্যা করিয়া বদর যুদ্ধের ক্ষোভ ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মক্কায় ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই ষড়যন্ত্রের ফলে ওমের-এবন-অহব নামক জনৈক দুর্দান্ত ব্যক্তি হযরতকে অতর্কিতভাবে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হইল। স্থির হইল—সে কোন একজন বন্দীকে মুক্ত করার বাহানা লইয়া মদীনায় গমন করিবে এবং সুযোগমত অতর্কিত অবস্থায় হযরতের উপর তরবারি চালাইবে। তাড়াতাড়িতে দুই-এক বারের অধিক আঘাত করা হয়ত সম্ভবপর নাও হইতে পারে, এবং সেজন্য হযরত আহত হইয়াও বাঁচিয়া যাইতে পারেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া ওমেরের খরধার তরবারিখানি আমূল তীব্র হলাহলে সিক্ত করা হইল, যেন কোন গতিকে তাহা একবার হযরতের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিলে, তাঁহার প্রাণরক্ষা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ওমের যদি নিহত হয়, তাহা হইলে ওমাইয়ার পুত্র ছফওয়ান তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে এবং তাহার পরিজনবর্গের প্রতিপালনভার গ্রহণ করিবে—ইহাও পাকাপাকিভাবে স্থির হইয়া গেল

হযরত মছজিদে বসিয়া আছেন, ওমর প্রভৃতি ছাহাবিগণ বাহিরে বসিয়া বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময় গলায় তরবারি ঝুলাইয়া ওমের মছজিদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। তখন মুছলমানগণ ওমেরকে الشيطان من شياطين القريش কোরেশদলের অন্যতম শয়তান বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তাহার কুটিল চাহনি ও সন্দেহজনক হাবভাব দেখিয়া হযরত ওমরের মনে খটকা লাগিল। তিনি সকলকে সতর্ক হইতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং কয়েকজন আনছারকে হযরতের চারিদিকে উপবেশন করার আদেশ দিয়া স্বয়ং হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া অবস্থা নিবেদন করিলেন। হযরত একটু মধুর হাসা করিয়া বলিলেন—'বেশ, তাহাকে লইয়া আইস।' ওমর তাহার কণ্ঠবিলম্বিত তরবারি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে লইয়া মছজিদের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ইহা দেখিয়া হযরত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং ওমেরকে তাঁহার নিকট সরিয়া আসিতে বলিলেন। অতঃপর হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওমের! কি মনে করিয়া?"

ওমের—"আজ্ঞে! এই বন্দীদের জন্য। আপনি দয়া করুন।"

হযরত—"সে ত খুব ভাল কথা। কিন্তু এই তরবারি কেন আনিয়াছ?"

ওমের—"তরবারির কপালে আগুন, উহা আপনাদের কি ক্ষতি করিতে পারিয়াছে?"

হযরত তাহাকে পুনঃ পুনঃ সত্য কথা বলিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু ওমের নানা প্রকার বাহানা করিয়া এক কথাই বলিতে লাগিল। তখন হযরত হাসিয়া মক্কার গুপ্ত ষড়যন্ত্র এবং ছফওয়ানের সহিত প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এমন গোপনীয় পরামর্শ, গুপ্ত ষড়যন্ত্র—হযরত এ সমস্ত ব্যাপার কিরূপে অবগত হইলেন! ওমের

তখন চমকিত চিত্তে হযরতের এই মো'জেজার কথা ভাবিতেছে। ওমরের বিবেক আর আত্মগোপন করিতে পারিল না, সে ভয়-ভক্তি-বিজড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল— "মোহাম্মদ ! পূর্বে তোমার কথায় বিশ্বাস করি নাই, এখন সেজন্য অনুতপ্ত হইতেছি। বস্তুতঃ তুমি সত্যই আল্লাহর রছুল। আল্লাহকে ধন্যবাদ, তিনি এই মহাপাতকের উপলক্ষে আমাকে সত্যের জ্যোতিঃ সন্দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন,......।"

এইরূপে প্রাণের বৈরী দুই দিনে হযরতের অধমাধম সেবকে পরিণত হইলেন। হযরত সকলকে বলিয়াছিলেন—তোমাদের এই ভ্রাতাকে উত্তমরূপে কোরআন শিক্ষা দাও। কিছুকাল পরে ওমের হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—মহাত্মন ! আমি আল্লাহর জ্যোতিকে নির্বাপিত এবং সত্যের সেবকগণকে নির্যাতিত করিতে সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। এইরূপে যে মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছি, এখন আমি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাই। আপনি অনুমতি দিন, আমি মক্কায় গিয়া যথাসাধ্য এছলাম প্রচার করিতে থাকি। হযরত ওমেরকে অনুমতি দিলেন, এবং স্পর্শমণির সংস্রবে নূতন জীবন লাভ করিয়া তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এদিকে ছফওয়ান মক্কার লোকদিগকে ইঙ্গিতে বলিয়া রাখিতেছিল—'দেখিও, আমি শীঘ্রই এমন শুভ সংবাদ দিতে পারিব, যাহাতে তোমরা বদরের সমস্ত শোক ভুলিয়া যাইবে।' কিন্তু ওমেরকে দেখিয়া সে অবাক হইয়া রহিল। এ-কি! এহেন দুর্ধর্ষ ওমের, তাহার উপরও মোহাম্মদের যাদু খাটিয়া গেল ?* বস্তুতঃ এ 'যাদুর', এ মো'জেজার এবং এ মহিমার কি তুলনা আছে ? মোস্তফা চরিত্রের এমনই মহিমা যে, কোরেশগণ যখনই যাহাকে তাঁহার হত্যা সাধনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছে ;— সেই-ই চক্ষের পলকে তাঁহার প্রধানতম সেবকরূপে পরিণত হইয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগের মনস্তাপের কারণ হইয়াছে। যাহা হউক, কোরেশগণ ওমেরের প্রাণের বৈরী হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তিনি এখন ভয়-ভাবনার অতীত। তিনি কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া আপনার কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার আদর্শে ও প্রচার মাহাত্ম্যে মক্কার বহুসংখ্যক নরনারী এছলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।**

## কোরেশের প্রতিহিংসা

বদর যুদ্ধের ভীষণ পরাজয়ে কোরেশের প্রতিহিংসাবৃত্তি শতগুণে বর্ধিত হইয়া গেল। হযরতকে হত্যা করার জন্য তাহারা যে ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছিল, তাহার বিপরীত ফল ফলিতে দেখিয়া তাহাদিগের ক্রোধ ও অভিমানের সীমা রহিল না। তখন তাহারা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নূতন উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা অনেক যুক্তি-পরামর্শের পর স্থির করিল, উপঢৌকন ও উৎকোচ দ্বারা আবিসিনিয়া দরবারের সমস্ত কর্মচারীকে এবং অবশেষে রাজা নাজ্জাশীকে বশীভূত করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর প্রবাসী মুছলমানদিগকে, যে-কোন উপায়ে হউক, হস্তগত করতঃ তাহাদিগকে হত্যা করিয়া বদরের শোক ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকার পরামর্শ আঁটিয়া তাহারা আমর-এবন-আছ ও আবদুল্লাহ-এবন-রাবিয়া নামক দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিজেদের প্রতিনিধি করিয়া আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করিল। এই প্রতিনিধিদ্বয়ের সহিত আরও কয়েকজন কোরেশ যে আবিসিনিয়া যাত্রা করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আমর-এবন-আছ, কূটরাজনীতির ব্যাপারে চিরকালই বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সহচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া যথাসময় আবিসিনিয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং উপঢৌকনের নামে নানা প্রকার উৎকোচ দিয়া

* কিছুদিন পরে স্বয়ং ছফওয়ানও এছলাম গ্রহণ করেন।

** তাবরী ২—২৯৩, হেশাম ২—৩৪, এছাবা ৫—৩৯ প্রভৃতি।

সেখানকার সকলকে বশীভূত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা নাজ্জাশীও এই সকল মূল্যবান উপহারাদি পাইয়া তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। রাজার এই প্রকার সদয় ব্যবহার দেখিয়া প্রতিনিধিদিগের আশা হইল যে, এইবার তাহাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে—প্রবাসী মুছলমানদিগকে মক্কায় লইয়া গিয়া তাহাদিগের রক্তে বদরের শোক, ক্ষোভ ও অপমান ধুইয়া ফেলার সুযোগ ঘটিবে। আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া একদিন সুযোগ বুঝিয়া তাহারা রাজসমীপে উপস্থিত হইল এবং নিজেদের দুরভিসন্ধির কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল। মহামান্য নাজ্জাশী, কোরেশ-প্রতিনিধিগণের মুখে এই নীচ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং আমর এবন-আছের মুখে এমন জোরে চপেটাঘাত করিলেন যে, তাঁহার নাক দিয়া রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। স্বয়ং আমর-এবন আছ ও জা'ফর-এবন আবি তালেবের প্রমুখাৎ এই ঘটনাটি বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে।*

## বিবি ফাতেমার বিবাহ

বদর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, হযরত তাঁহার প্রাণপ্রতিম কন্যা বিবি ফাতেমাকে হযরত আলীর সহিত বিবাহিত করিলেন। হযরত আলীর সম্বলের মধ্যে ছিল একটা বর্ম—বদর যুদ্ধের 'গনিমত' হইতে এই বর্মটি তাঁহার ভাগে পড়িয়াছিল। এইটি বিক্রয় করিয়া যে কয়টি টাকা পাওয়া গেল—তাহাই মোহররূপে প্রদত্ত হইল। স্বয়ং হযরত খোৎবা পড়িয়া আলী ও ফাতেমাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। এমন দম্পতিযুগলের বিশেষত্ব ও মহিমা বর্ণনা করিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করার আবশ্যক। এখানে ঐতিহাসিক হিসাবে কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইঁহারাই ছৈয়দ বংশের আদি জনক-জননী, এবং ইমাম হাছান ও ইমাম হোছেন ইঁহাদিগেরই দুলাল।**

## আবু-সুফিয়ানের নূতন ষড়যন্ত্র

মক্কার প্রধান সমাজপতি আবু-ছুফিয়ান, বদর সমরের পরিণাম দর্শন করিয়া যাহার পর নাই মর্মাহত হইয়াছিল। কোরেশ বন্দিগণ মক্কায় ফিরিয়া আসার পর সে আরবের তৎকালীন প্রথা অনুসারে প্রতিজ্ঞা করিল যে, বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ না লওয়া পর্যন্ত সে কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না—স্ত্রীলোকের নিকটেও যাইবে না। তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল—যে-কোন প্রকারে হউক, মুছলমানদিগকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত করিবে। এই প্রতিজ্ঞার পর, জিলহজ্জ মাসের প্রথম ভাগে দুইশত নির্বাচিত কোরেশ ছওয়ার সঙ্গে লইয়া সে মদীনার দিকে ধাবিত হইল। যথাসময়ে এই অভিযান মদীনার নিকটবর্তী হইলে, আবু-সুফিয়ান তাহাদিগের আর সকলকে একটি গুপ্তস্থানে লুকাইয়া এবং নিজে রজনীর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অতি সন্তর্পণে মদীনার ইহুদী পল্লীতে প্রবেশ করতঃ ছাল্লাম-এবন-মেশকামের বাটীতে উপস্থিত হইল। ছাল্লাম বনি-নাজির গোত্রের ইহুদিগণের প্রধান ধনকুবের, যুদ্ধ-বিগ্রহাদির জন্য সঞ্চিত সাধারণ তহবিলটিও তাহার জিম্মায় ছিল। যাহা হউক, ছাল্লাম বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে আবু-সুফিয়ানের অভ্যর্থনা করিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করা সম্বন্ধে মক্কার কোরেশ ও মদীনার ইহুদীদিগের মধ্যে পূর্ব হইতে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিতেছিল।*** যাহা হউক, পানভোজনের পর দুই দলপতি মিলিয়া মোছলেম বিনাশের উপায় সম্বন্ধে সমস্ত পরামর্শ স্থির করিল, মুছলমান সমাজসংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ও আবু-সুফিয়ান ছাল্লামের নিকট অবগত হইল। এইরূপে সমস্ত কথাবার্তা ও পরামর্শ শেষ হওয়ার পর, অল্প একটু রাত্রি থাকিতে সে নগর হইতে বহির্গত হইয়া কোরেশদিগের সহিত মিলিত হইল। বলা বাহুল্য যে,

---

* হলবী ১—২০০ হইতে ২০২ পৃষ্ঠা।

** মোছলেম, এছাবা, আবু-দাউদ প্রভৃতি

*** আবু-দাউদ—নজির প্রসঙ্গ।

তাহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া মক্কার দিকে ধাবিত হইল। মদীনার দুইজন অধিবাসী শহর হইতে দূরে নিজেদের কৃষিক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, কোরেশগণ তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া এবং তাঁহাদিগের ফল-শস্যাদি পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়। মদীনায় এই সংবাদ পৌঁছামাত্র হযরত কতিপয় ভক্তকে লইয়া আবু-সুফিয়ানের অনুসরণ করেন; কিন্তু তাঁহাদের যাত্রা করার অনেক পূর্বেই কোরেশগণ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। কাজেই বহু চেষ্টাতেও মুছলমানগণ তাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না। আবু-সুফিয়ান নিজ সৈন্যদলের রসদের জন্য বহু পরিমাণে ছাবিক বা ছাতু সঙ্গে আনিয়াছিল, এবং ফিরিবার সময় নিজেদের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে তাহা ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ছাতুর বস্তাগুলি অনুসরণকারী মুছলমানদিগের হস্তগত হয় বলিয়া এই অভিযানটি ছাবিক অভিযান বলিয়া খ্যাত হইয়া যায়।

### রোযা ও ঈদের জামাআত

হিজরীর দ্বিতীয় সনে রমজানের রোযা ফরয হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। এই রোযা এছলামের একটা মহত্তম ব্রত এবং শ্রেষ্ঠতম সাধনা। এই ব্রতকে কোরআনে 'ছিয়াম' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ইহার অর্থ—আত্মসংবরণ বা আত্মসংযম। শরীরের সকল প্রকার গ্লানি এবং মনের সকল প্রকার পাপবৃত্তিকে শাসিত ও সংযত করিয়া লওয়ার জন্য, দীর্ঘ ত্রিশ দিবারাত্রি ব্যাপিয়া মুছলমানকে এই ব্রত পালন করিতে হয়। ক্রোধ, হিংসা, মিথ্যা কাজ, মিথ্যা কথা এবং 'ব্রহ্ম-মুহূর্ত' বা ছোবহে ছাদেক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পান-ভোজনাদি দ্বারা এই ব্রত ভঙ্গ হইয়া যায়। এমন কি, এই ব্রতকালে কেহ গালাগালি দিলে বা প্রহার করিলেও সাধক তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবেন না—ইহা শাস্ত্রের অলঙ্ঘনীয় বিধান।

বলা বাহুল্য যে, রমজানের রোযার পর রোযার ফেৎরাদান এবং ঈদের নামাযের জন্য জামাআতের অনুষ্ঠানও প্রথমে এই সনে প্রচলিত হইয়াছিল। 'বানি-কাইনোকা' ইহুদী গোত্রের সহিতও এই সনের শেষভাগে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা পর সনের ঘটনাবলীর সহিত একত্রে উহার উল্লেখ করিব।*

## সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

### ইহুদীদিগের বিশ্বাসঘাতকতা

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা মদীনায় শুভাগমন করিয়া প্রথমেই সেখানকার সকল জাতিকে লইয়া একটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। মদীনার ইহুদী, পৌত্তলিক ও মুছলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সমবায়ে এই গণতন্ত্র গঠিত হয় এবং তাহার ফলে বিভিন্ন বংশ ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদিগকে "এক জাতি" বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভে সকল সম্প্রদায়ের সমবায়ে ও সমর্থনে যে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয় যে, ইহুদী, পৌত্তলিক ও মুছলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা আপন আপন বিশ্বাস ও সংস্কার অনুসারে ধর্মকার্য সমাধা করিবার অধিকারী হইবেন, কারবার-বাণিজ্যাদি সম্বন্ধেও সকলের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। এ-সকল বিষয়ে কেহ কাহারও অধিকারে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে কোন বিদেশী শত্রু মদীনা আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইলে, সকলে সমবেত শক্তি দ্বারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। কেহ বাহিরের কোন শত্রুকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিবেন না, কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য যে, মদীনার ইহুদী সমাজ এই প্রতিষ্ঠানের একটি অন্যতম অঙ্গ ছিল। পাঠকগণ যথাস্থানে এই সকল বিবরণ অবগত হইয়াছেন।

---

* ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে ঈদুল-আযহার জামাআত এবং কোরবানীর প্রথম অনুষ্ঠানও এই সনে সম্পন্ন হইয়াছিল।

কৌসিদ্য ও অন্যান্য নানাবিধ নীচবৃত্তি এবং ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইহুদীজাতি চির প্রসিদ্ধ। তাহারা একদিকে প্রকাশ্যে এই সকল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল, অন্যদিকে গোপনে মুছলমানদিগের সর্বনাশ সাধনের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা দেখিল—হযরত একেশ্বরবাদী হইলেও সকল যুগের সকল দেশের নবী-রছুল ও মহাজনগণের প্রতি ভক্তি ও সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে যীশুকে লইয়া বিগত ছয় শতাব্দী ধরিয়া খৃষ্টানদিগের সহিত তাহাদিগের এত কাটাকাটি-মারামারি, এবং যাঁহাকে 'অভিশপ্ত জারজ' বলিয়া বিশ্বাস করাকেই তাহারা প্রধান ধর্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে—হযরত শতমুখে তাঁহার ও তাঁহার গর্ভধারিণী বিবি মরিয়মের মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছেন। মদ্যপান ও ব্যভিচার তখন ইহুদী জাতির—বিশেষতঃ তাহাদিগের ধনী ও প্রধান পক্ষের—অঙ্গের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদিগের যাজক ও পুরোহিতগণ ধনীদিগের বৃত্তিভোগী হওয়ায় এই সকল মহাপাতক সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধানানুসারে উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইত না। কাজেই সাধারণ সমাজে উহা ভীষণভাবে সংক্রামক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা দেখিল যে, হযরত কঠোর ভাষায় এই সকল ব্যভিচারের প্রতিবাদ করিতেছেন—এই সকল পাপে লিপ্ত ব্যক্তিগণের জন্য কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছেন। লোভ ও পরস্ব অপহরণ বৃত্তির ফলে ইহুদিগণ এমনই অধঃপতিত হইয়া গিয়াছিল যে, সামান্য দুই-একখানা অলঙ্কারের জন্য তাহারা মাছুম বালিকাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিতে একবিন্দুও দ্বিধাবোধ করিত না।* কিন্তু তাহারা দেখিল যে, হযরত এই সকল শিশু হত্যার কঠোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন—প্রাণের বিনিময়ে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহুদী জাতি অর্থগৃধ্নুতার জন্য যুগে যুগে বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছে। কুসীদ গ্রহণই তাহাদিগের এই জঘন্য বৃত্তি চরিতার্থ করার প্রধান উপলক্ষ। এই উপলক্ষকে অবলম্বন করিয়া তাহারা মদীনাবাসী জনসাধারণের হৃদয়-শোণিত শোষণপূর্বক তাহাদিগকে দাসানুদাসে পরিণত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছে। এমন কি, দুঃস্থ ও ঋণী মদীনাবাসীদিগের পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীদিগকে বন্ধক রাখিয়া আপনাদিগের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন তাহারা দেখিল—হযরত সুদ গ্রহণকে ভীষণতম ও জঘন্যতম মহাপাতক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সুদ প্রদান করাও মহাপাপ বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ ও দুর্দশাগ্রস্ত স্বদেশবাসীর সাহায্যের জন্য তিনি সাধারণ তহবিল বা 'বায়তুল মাল' প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। কাজেই তাহাদিগের এই পাপ ব্যবসায়টি যে আর অধিক দিন চলিতে পারিবে না, ধূর্ত ইহুদিগণ তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল। পক্ষান্তরে আওছ ও খজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ বাধাইয়া অথবা তাহাদিগের গৃহ-বিবাদে উৎসাহ দিয়া এতদিন তাহারা সহজে উভয় গোত্রকেই পদানত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহারা দেখিল—হযরতের শিক্ষাগুণে তাহাদিগের সব কলহ, সব বিবাদ চিরকালের জন্য মিটিয়া যাইতে বসিয়াছে। এক মুছলমান অন্য মুছলমানকে সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষাও ভালবাসিতেছে। প্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে দুনিয়ায় তাহাদিগের তুলনা হইতে পারে না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া ইহুদী জাতি আপনাদিগের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চমকিয়া উঠিল। ধূর্ত কা'ব-এবন-আশরাফ তখন ইহুদীদিগের সর্বপ্রধান সমাজপতি। তখন সে-ই মদীনার সর্বেসর্বা এবং 'হর্তা-কর্তা বিধাতা'! কিন্তু সে দেখিল যে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সেও বিচলিত হইয়া পড়িল।

---

* বোখারী—মোছলেম।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি এবং নীচবৃত্তি ও বিশ্বাসঘাতকতায় মদীনার ইহুদিগণ পৃথিবীর অন্যান্য ইহুদীদিগকেও পরাস্ত করিয়াছিল। তাহারা এখন সমবেতভাবে এছলামের ও মুছলমানদিগের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইল। পাছে যাজক ও পুরোহিতগণ ধর্ম ও নীতির দোহাই দিয়া অথবা অন্য কোন কারণে এই বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহাচরণে বাধা প্রদান করে, এই আশঙ্কায় ধূর্ত কা'ব সর্বপ্রথমে মদীনার সমস্ত ইহুদী যাজক ও ব্যবস্থাপক পণ্ডিতকে ডাকিয়া সকলের জন্য যথাযোগ্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিল, এবং সকলে এছলামের বিরুদ্ধাচরণে সম্মতি দিলে পর তাহাদিগের মোশাহেরা বণ্টন করিয়া দিল।*

বদর যুদ্ধের বহু পূর্ব হইতে কোরেশ প্রধানদিগের সহিত মদীনার ইহুদ দলপতিগণের যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, পাঠকগণ পূর্বেই তাহা অবগত হইয়াছেন। বদর যুদ্ধের পর মদীনায় আবু-সুফিয়ানের আগমন এবং ইহুদ-দলপতি ছালামের সহিত তাহার গুপ্তষড়যন্ত্রের কথাও আমরা পূর্বে নিবেদন করিয়াছি। বদর যুদ্ধে মুছলমানদিগের বিজয়লাভের সংবাদ অবগত হইয়া নরাধম কা'ব যে প্রকার স্পষ্ট ভাষায় নিজের মনস্তাপ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, নরাধম কা'ব কেবল মৌখিক মনস্তাপ প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইল না। সে অবিলম্বে মক্কায় গমন করিল এবং মক্কার পল্লীতে পল্লীতে উপস্থিত হইয়া বদর সমরে নিহত কোরেশগণের শোকগাথা গান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কা'ব নিজে কবি, সে নিজের দুষ্টপ্রতিভার সাহায্য লইয়া প্রত্যেক নিহত কোরেশের নামে এক-একটা গাথা রচনা করিল, এবং তাহার আবৃত্তি করিয়া কোরেশদিগকে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। এ যাত্রায় মদীনার ৪০ জন ইহুদী কা'বের সহিত মক্কায় গমন করিয়াছিল।** কোরেশ ও ইহুদ এখন এছলামের সাধারণ শত্রু, সুতরাং সমস্ত প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিকে পুছিয়া ফেলিয়া বিশ্বাসঘাতক ইহুদ-দলপতিগণ মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল, এবং সমস্ত যুক্তি-পরামর্শ স্থির করার পর কা'ব ও তাহার সহচরবর্গ মদীনায় ফিরিয়া গেল।***

মদীনায় পৌঁছার পর নরাধম কা'ব নিমন্ত্রণের অছিলায় হযরতকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক তাঁহাকে হঠাৎ হত্যা করিয়া ফেলার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু হযরত তাহা পূর্বাহ্ণেই জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার সে ষড়যন্ত্র সফল হইতে পারে নাই।**** তখন নরাধম কা'ব অগ্নিশর্মা হইয়া হযরতের নামে নানা প্রকার গ্লানিজনক কবিতা রচনা করিয়া তাহা মদীনাময় প্রচার করিয়া দিতে লাগিল।$ তাহাদিগের তখনকার 'ভাবগতিক' দেখিয়া স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছিল যে, কোন গতিকে একটু ছুতানাতা বাহির করিয়া মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করার জন্য তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এমনভাবে উত্যক্ত ও বিপন্ন হইয়াও মুছলমানগণ কোরআনের আদেশ ও হযরতের উপদেশ অনুসারে ধৈর্যধারণ করিয়া রহিলেন।$$ তখন ইহুদিগণ প্রকাশ্যভাবে এবং মুছলমানদিগের সম্মুখে হযরতের অবমাননা করার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাক্ষাৎকালে মুছলমানগণ 'আচ্ছালামু আলায়কুম' বলিয়া পরস্পরকে শুভাশীষ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ—তোমাদিগের প্রতি শান্তি হউক, তোমাদিগের কল্যাণ হউক।' কিন্তু ইহুদিগণ হযরতের সাক্ষাৎ পাইলেই ইহার পরিবর্তে 'আচ্ছাম

---

* জরকানী—এবন-এছহাক প্রভৃতি হইতে।

** আবু-দাউদ—এখরাজুল ইহুদ, হাদিছ ৫১০ বিস্তৃত পরে দ্রষ্টব্য।

*** জরকানী—মুছা-এবন-ওকবা হইতে ২—৯৩ পৃষ্ঠা।

**** ইয়াকুব—বানি-নাজির, ফৎহুলবারী—কাবের প্রাণদণ্ড। $ আবু দাউদ—কা'ব প্রসঙ্গ।

$$ কোরআন ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب - اذى كثيرا الاية আয়াত ও আবু দাউদ প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। বিস্তারিত পরে দ্রষ্টব্য।

আনায়কা (অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হইয়া যাও) বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল।* মুছলমান সমাজ তখনকার অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কোরেশগণ প্রস্তুত হইয়া আছে, মদীনার ইহুদ সমাজ উত্থান করিলেই তাহারা মদীনার উপর আপতিত হইবে, এ সকল যুক্তি-পরামর্শের কথা তখন আর কাহারও অবিদিত ছিল না। এদিকে এই সকল ব্যাপার ইহুদীদিগের ব্যক্তিগত অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল, এবং সেইজন্য হযরত ইহুদী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করিলেন না। কিন্তু হযরতের এই ন্যায়নিষ্ঠা এবং মুছলমানদিগের এই ধৈর্য তখন দুর্বলতা ও কাপুরুষতা বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। ফলে ইহুদীদিগের স্পর্ধা ও তাহাদিগের ধৃষ্টতা শতগুণে বর্ধিত হইয়া গেল। এমন কি, তখন সন্ধ্যার পর হযরতের বাটীর বাহিরে গমন করাও তাহারা নিরাপদ বলিয়া মনে করিতেন না।**

মদীনার ইহুদগণ নানা প্রকার দুরভিসন্ধি লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। দেশবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন সমাজের মধ্যে গৃহবিবাদের সৃষ্টি করিয়া দিতে পারিলেই মুষ্টিমেয় বিদেশী ও বিজাতীয়দিগের পক্ষে তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। ইহুদিগণ এই শাসননীতি অনুসারে এযাবৎ মদীনার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, এছলামের শিক্ষাগুণে আনছারগণ পূর্বের সমস্ত কলহ-বিবাদ বিস্মৃত হইয়া ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইতেছে, তখন তাহাদিগের আতঙ্ক ও আশঙ্কার অবধি রহিল না। এই অধ্যায়ে যে সময়কার অবস্থা আলোচিত হইতেছে, তখন ইহুদ সমাজ ইহার প্রতিকারে মনোযোগী হইয়াছে। এই সময়, আওছ ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে বিবাদাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিবার জন্য তাহারা বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্বে কে কাহার পূর্বপুরুষকে হত্যা করিয়াছে, কোন্ সমাজকে অন্যের হস্তে কিরূপে অপদস্থ হইতে হইয়াছিল, কে বীর আর কে কাপুরুষ—ইত্যাদি বিষয় লইয়া ইহুদগণ সর্বত্র চর্চা আরম্ভ করিয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, উভয় সমাজের কপট মুছলমানগণ এই কার্যে "প্রতিপক্ষ"কে যথেষ্ট সাহায্যও করিয়াছিল। একদা উভয় গোত্রের লোকেরা এক মজলিসে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় বিশেষভাবে নিযুক্ত কয়েকজন ইহুদী "চর" সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং 'বোআছ' যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলিয়া উভয় গোত্রের লোকদিগের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া দিল। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা উভয় দলকে এমন করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিল যে, সেই মজলিসে দুইদলে মারামারি আরম্ভ হইয়া যায়, এবং দুইজন মুছলমান এই দাঙ্গায় আহত হইয়া পড়েন। আর যায় কোথায়—দেখিতে দেখিতে দুই দলই রণসাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এমন সময় এই বিপদের সংবাদ পাইয়া হযরত স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং এই আত্মকলহের পার্থিব ও পারলৌকিক পরিণামের কথা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তখন সকলের চৈতন্য হইল এবং অনুতপ্ত ও লজ্জিতভাবে তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। কোরআনের নিম্নলিখিত আয়তটি এই ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হয় ঃ

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب
يردوكم بعد إيمانكم كافرين -

হে বিশ্বাসিগণ। তোমরা যদি এক দল আহলে-কেতাবের বশীভূত হইয়া পড়, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে মুছলমান হওয়ার পর পুনরায় কাফের বানাইয়া দিবে।***

ইহা ব্যতীত এছলামের গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য তাহারা একটা নূতন পন্থা অবলম্বন করিল। এই অভিসন্ধি অনুসারে ইহুদিগণ হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া এছলাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অল্প সময় পরে এছলাম ত্যাগ করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে,

---

* বোখারী—বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছ।
** এছাবা—তাল্হা-এব্‌ন-বরা
*** এমরান ১—৯৮, আয়াত।

মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—উহা একেবারে অসার, তাই ঐ ধর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই প্রকারে এছলামের গুরুত্বনাশ ও তাহার মর্যাদা হানি করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, এই উপায়ে মুছলমানদিগের ধর্মবিশ্বাসও শিথিল হইয়া যাইবে এবং তাহারাও এছলাম পরিত্যাগ করিয়া বসিবে। কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে এই ঘটনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে :

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى

الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ -

"এবং গ্রন্থধারীদিগের মধ্যে একদল (পরস্পরকে) বলিল—মুছলমানদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, পূর্বাহ্ণে তাহার প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ কর এবং অপরাহ্ণে তাহাকে অমান্য কর। ইহাতে মুছলমানগণ (স্বধর্ম হইতে) ফিরিয়া যাইতে পারে* ফলতঃ বদর যুদ্ধের পূর্বে ও পরে ইহুদিগণ এই প্রকার হযরতকে ও মুছলমান সমাজকে নানা প্রকারে উত্যক্ত করিয়া যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল।

## বানি-কইনোকা বংশের প্রকাশ্য বিদ্রোহাচরণ

সে সময় 'বানি-কইনোকা' নামক একটি ইহুদ গোত্র মদীনায় বাস করিত, ইহুদীদিগের মধ্যে দুর্ধর্ষ যুদ্ধনিপুণ ও ধনী বলিয়া আরবে ইহাদিগের বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইহারা বদর যুদ্ধের পূর্ব হইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া বহু অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম আপনাদিগের দুর্গে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছিল। সমর ঘোষণা হওয়া মাত্র ইহাদিগের শত শত যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিত। এবন খাল্‌দুন বলিতেছেন যে, কৃষিকার্য বা ভূসম্পত্তির প্রতি ইহারা কখনই আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই, বাণিজ্য ও গৃহশিল্পই ইহাদিগের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপলক্ষ ছিল। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে বলিতেছেন যে, এই কইনোকা বংশের ইহুদিগণই সর্বপ্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল এবং তাহারাই সর্বাগ্রে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে উত্থান করিয়াছিল।**

মুছলমানগণ তখনও বদরের অনল-পরীক্ষায় বিপন্ন, এমন সময় সুযোগ বুঝিয়া—এবং পূর্ব নির্ধারণ অনুসারে—বানি কইনোকার ইহুদিগণ মদীনার মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত করার চেষ্টা করিল। এই সময় একদিন জনৈক মোছলেম মহিলা কোন আবশ্যকের জন্য বাজারে গিয়াছিলেন। ইহুদিগণ সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে উত্যক্ত ও অবমানিত করিতে লাগিল। কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁহার মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। মহিলাটি তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহার পরিচিত জনৈক স্বর্ণকারের দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বর্ণকারের দোকানে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন ইহুদী আসিয়া তাঁহার চাদরের কোণ দোকানের খুঁটিতে বাঁধিয়া দিল এবং নরাধমগণ 'মজা' দেখিবার জন্য একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে, দুর্বৃত্তগণ সরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া মহিলাটি যেমন গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি তাঁহার গায়ের চাদরখানি খসিয়া পড়িল। এই ভদ্র পুর মহিলাকে বিপন্ন অবস্থায় দর্শন করিয়া নরপিশাচগণ হো হো করিয়া হাসিতে এবং করতালি দিতে থাকিল। মহিলাটি লজ্জা ও ক্ষোভে মৃতপ্রায় হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন—মোছলেম কুল মহিলা ইহুদী নরপিশাচদিগের হস্তে বিপন্ন, তাহার সম্ভ্রম রক্ষা করার কেহ আছে কি? এই আর্তনাদ জনৈক মুছলমান পথিকের কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেদিকে ছুটিয়া আসিয়া মহিলার সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। এই সময় দুই-এক কথায়

---

* আল-এমরান, ৭ম রুকু। ** তবকাত, তাবরী, মাওয়াহেব, হালবী, এবন-হেশাম প্রভৃতি।

বচসা বাধাইয়া ইহুদিগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনিও যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আক্রমণকারী ইহুদীদিগের সংখ্যাধিক্য হেতু তাঁহাকে অচিরাৎ নিহত হইতে হইল। তাঁহার তরবারির আঘাতে একটি ইহুদীও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল না।* এই সংবাদে মদীনাস্থ আনছার ও মোহাজেরগণের মনে যে প্রকার ক্রোধ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাহারা পূর্বকার সেই আরব থাকিলে তখনই মদীনার গলিতে গলিতে রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইত, একটি স্ত্রীলোকের অপমানের প্রতিশোধে শত শত স্ত্রীলোককে নির্যাতিত এমন কি নিহত হইতে হইত। কিন্তু এখন তাঁহারা মুছলমান—আর এছলাম তাঁহাদের ধর্ম। এছলামের অর্থ শান্তি ও আনুগত্য, মহিমান্বিত মোস্তফার শিক্ষাগুণে তাঁহারা ইহা—কেবল স্বীকার নহে, বরং—প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন; সুতরাং এহেন উত্তেজনার সময়েও তাঁহারা এই শিক্ষাকে অর্থাৎ এছলামকে বিস্মৃত হইলেন না। তাঁহারা নীরবে ধৈর্যধারণপূর্বক হযরতের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মদীনায় প্রত্যাগমন করার পর ইহুদীদিগের এই বিদ্রোহাচরণের কথা শুনিয়া হযরত স্বয়ং কাইনোকায়দিগের বাজারে উপস্থিত হইলেন এবং ইহুদীদিগকে ডাকাইয়া নানা প্রকার হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। আবু-দাউদের একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইহুদীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ 'হে ইহুদ সমাজ! তোমরা আনুগত্য স্বীকার কর,** অন্যথায় কোরেশদিগের ন্যায় তোমাদিগকেও বিপন্ন হইতে হইবে।' কিন্তু ইহুদিগণ হযরতের উপদেশ গ্রহণ করিল না। তাহারা বিশেষ ধৃষ্টতাসহকারে বলিতে লাগিলঃ 'মোহাম্মদ! কতকগুলি কোরেশকে হত্যা করিয়াছ বলিয়া গর্বিত হইও না। তাহারা যুদ্ধ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে যে ব্যাপারটা কিরূপ কঠিন।'*** যাহা হউক, ইহুদিগণ আনুগত্য স্বীকার করিল না—হযরতের উপদেশ গ্রহণ করিল না। বরং প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের 'চ্যালেঞ্জ' দিয়া হযরতকে শাসাইতে লাগিল। এদিকে মোছলেম মহিলার নির্যাতন ও অবমাননা এবং তাঁহার রক্ষাকারী আনছার বীরের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুছলমানদিগের মধ্যে উত্তেজনার অবধি নাই। হযরত যে ইহুদীদিগকে ইহারই একটা বিচার মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যাহা হউক, হযরত বিফল মনোরথ হইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহুদী জাতি কূটবুদ্ধি ও নীচ ষড়যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত হইলেও সাহস বল ও ঈমানের তেজ তাহাদিগের আদৌ ছিল না। হযরত ফিরিয়া যাওয়ার পর তাহারা দেখিল যে, তাহাদিগকে অচিরে মুছলমানদিগের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সুতরাং এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের সমস্ত স্পর্ধা ও অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহারা অগত্যা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুর্গের দরজাগুলি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিল। তখন হযরত মুছলমানদিগকে লইয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। ইহুদিগণ মনে করিয়াছিল—কোরেশ শীঘ্রই মদীনা আক্রমণ করিবে; সুতরাং অল্প কিছুদিন এইভাবে কাটাইয়া দিতে পারিলেই তাহাদের সুদিন উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া মুছলমানদিগের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। কিন্তু দীর্ঘ ১৫ দিনের অবরোধের পর যখন দেখিল যে, মক্কা হইতে কোন সাহায্য আসিল না, পক্ষান্তরে এই দীর্ঘ অবরোধের ফলে তাহাদিগের রসদাদিও নিঃশেষপ্রায় হইয়া আসিয়াছে—তখন তাহারা হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ করতঃ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল। হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া

* তবকাত, তাবরী, মাওয়াহেব, হলবী, এবন-হেশাম প্রভৃতি।
** উপক্রম উপসংহারের খাতিরে এই অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।
*** বর্ণিত ইতিহাসগুলি দেখুন।

তাহারা প্রস্তাব করিল ঃ "আমরা আমাদিগের ধন-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ মদীনা হইতে বাহির হইয়া যাইতেছি। আমাদিগের প্রতি অন্য কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন না।" তখনকার দেশাচার ও সামরিক নিয়মানুসারে মুছলমানগণ এই বিদ্রোহী বন্দীদিগের প্রতি যদৃচ্ছা দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, প্রধান পক্ষকে হত্যা করিয়া তাহাদিগের স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণকে দাসদাসীতে পরিণত করিয়া রাখিতে পারিতেন। আর তখনকার কথাই বলিতেছি কেন, সভ্যতার এই চরম উৎকর্ষের দিনে, জগতের সভ্যতাভিমানী জাতিগুলি "বিদ্রোহী"-দিগের সম্বন্ধে যে কি প্রকার মোলায়েম ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। সেন্টহেলেনায় নেপোলিয়নের ন্যায় বীরকেও কি অবস্থায় জীবন যাপন' করিতে হইয়াছে, তাহাও সকলে অবগত আছেন। এই সেই দিনকার কথা—পরাজিত কাইসর ও আনওয়ার পাশা প্রভৃতির জন্য ইংলণ্ডে যেরূপ যূপকাষ্ঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, ভারতবর্ষে "শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসনের নামে" নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর গুলী চালাইয়া নিয়তই যে মহানুভবতা প্রকাশ করা হইতেছে—ভারতবাসী মাত্রই তাহা অবগত আছেন। আজ যদি স্যার উইলিয়ম মুর ও ডাক্তার মারগোলিয়থের স্বজাতীয় গভর্নমেন্টের শাসনাধীন কোন দেশে ঐ প্রকার ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারাই যে বিদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন, বোধ হয় জগদ্বাসীর তাহা অবিদিত নাই। কিন্তু হযরত এই বিদ্রোহী ইহুদীদিগের একটি প্রাণীকেও কোন প্রকারে দণ্ডিত করিলেন না। তিনি শান্তির প্রার্থী, তাই তিনি বিনাবাক্যে ইহুদীদিগের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন কেবল সম্মতিই নহে—বরং তাহাদিগের যাত্রার সুব্যবস্থা করার জন্য ওবাদা-এবন-ছামেত নামক বিখ্যাত ছাহাবীকে বিশেষরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পূর্বে এই ওবাদার সহিত কইনোকা বংশের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। অধিকন্তু হযরত তাহাদিগকে তিন দিনের অবকাশও প্রদান করিলেন।

এবন-এছহাক প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ইহুদিগণ হযরত সমীপে উপস্থিত হইলে, আবদুল্লাহ-এবন-ওবাই নামক কপট বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল—'মোহাম্মদ ! ইহাদিগের প্রতি করুণ ব্যবহার কর!' এই প্রকার বলিতে বলিতে সে হযরতের বর্মের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ দিক হইতে ধরিয়া ফেলিল। হযরত বিশেষ বিরক্তি ও ক্রোধ সহকারে পুনঃপুনঃ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু সে এতদসত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ উত্তর করিতে লাগিল—আমি কোন মতেই ছাড়িব না। যাবৎ তুমি ইহাদিগের সম্বন্ধে করুণ ব্যবস্থা না কর, তাবৎ আমি তোমাকে ছাড়িতে পারি না। তাহার পর হযরত রাগ করিয়া বলিলেন—"দূর হইয়া যাউক, তোমার খাতিরে উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম।" বিবরণটি যে প্রক্ষিপ্ত, এই অস্বাভাবিক গল্পটিই তাহার প্রমাণ। বর্ণিত আবদুল্লাহ যে একজন কপট এবং সে যে শত্রুদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করার প্রধান পাণ্ডা, তাহা হযরতের এবং মুছলমানদিগের জানিতে বাকী ছিল না। ইহার ন্যায় নরাধমের জোরে হযরত ইহুদীদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন—এরূপ কথা পাগলেও বিশ্বাস করিতে পারে না। অধিকন্তু এই গল্পে আবদুল্লাহর যে উৎকট ব্যবহারের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। বিশেষতঃ রেওয়ায়তের হিসাবেও এই বিষয়টি অবিশ্বাস্য। 'সুনামখ্যাত' ঐতিহাসিক ওয়াকেদী, এই বিবরণের সঙ্গে و هو يريد قتلهم পদাংশ যোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, হযরত বনি-কাইনোকার ইহুদীদিগকে হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ এবন-ওবাই নামক মোনাফেকের পীড়ার এবং তাহার অত্যাচারে তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ওয়াকেদীর ন্যায় 'মিথ্যা বিবরণের প্রবর্তক' ঐতিহাসিকের এবংবিধ অশাস্ত্রীয় ও অস্বাভাবিক বর্ণনাকে আমরা বিনা বিচারেই মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে পারি, ভূমিকায় ইহার বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। আমরা উপরে আবু-দাউদের যে হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও এই সকল কথার কোন আভাস নাই।

ইহুদিগণ মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করার জন্য বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদির দুর্গে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি মুছলমানদিগের হস্তগত হইল—এবং এই প্রকারে আল্লাহর অনুগ্রহে শত্রুগণই তাঁহাদিগের শক্তি বর্দ্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

عدو شود سبب خیر ، گر خدا خواهد

### কা'বের প্রাণদণ্ড

হিজরতের পর হইতে বিগত দুই বৎসর পর্য্যন্ত মদীনার ইহুদিগণ এছলাম ধর্ম, মুছলমান সমাজ ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার বিরুদ্ধে যে কি প্রকার নৃশংস ও জঘন্য আচরণে লিপ্ত হইয়াছিল, এই অধ্যায়ের প্রথমে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠকগণ এই উপলক্ষে কা'ব-এবন-আশরফ নামক ইহুদী দলপতির সম্যক পরিচয়ও জানিতে পারিয়াছেন। তৃতীয় হিজরীর রবিউল-আউওল মাসে এই কা'ব হযরতের আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। খৃষ্টান লেখকগণ এই প্রসঙ্গে হযরতের প্রতি নানা প্রকার দোষারোপ করিয়াছেন। সেইজন্য আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত আমরা কা'বের গত দুই বৎসরের দুষ্কৃতিগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

(১) বদর যুদ্ধের পূর্ব হইতেই মক্কার কোরেশ ও মদীনার ইহুদীদিগের মধ্যে যে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, কা'ব তাহার প্রধান নায়ক।

(২) বদর যুদ্ধে মুছলমানদিগের বিজয়লাভের সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র নরাধম কা'ব ক্রোধে ও অভিমানে আত্মহারা হইয়া যে ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিল, পাঠকগণ তাহা যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন।

(৩) কা'ব বদর যুদ্ধের পর প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করতঃ প্রধান প্রধান ইহুদী দলপতি ও পুরোহিতদিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় গমন করে এবং মদীনা আক্রমণপূর্বক বদরের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোরেশদিগকে উত্তেজিত করিতে থাকে।

(৪) সে মক্কায় গিয়া প্রত্যেক নিহত কোরেশের নামে এক-একটি উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা রচনা করে এবং কোরেশদিগের প্রতিহিংসাবৃত্তিকে ভীষণতর করিয়া তোলে।

(৫) সে মক্কায় গিয়া কোরেশদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতে থাকে যে, মোহাম্মদ একেশ্বরবাদী হইলেও কোরেশদিগের পৌত্তলিকতার ধর্ম, তাঁহার ধর্ম অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

(৬) কা'ব স্বজাতীয় প্রধান পুরোহিতদিগকে সঙ্গে করিয়া কা'বায় কোরেশ দলপতিগণের সহিত মিলিত হয়। সেখানে উভয় দল ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা সম্মিলিতভাবে মুছলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

(৭) ইহার পর আবু-সুফিয়ানও গুপ্তভাবে মদীনা আগমন করে এবং এ-সম্বন্ধে সমস্ত যুক্তি-পরামর্শ স্থির করিয়া যায়।

(৮) কা'ব প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্র পাকাইয়া এবং তাহাদিগকে মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করার জন্য বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছিল।

(৯) মদীনার সমস্ত ইহুদ গোত্রকে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করার জন্য সে প্রথম হইতে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছিল। এমন কি, এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সমস্ত পুরোহিত ও যাজককে নিজের অনুগত করিয়াছিল।

(১০) সে নানা প্রকার কবিতা রচনা করিয়া প্রকাশ্যভাবে হযরতের ও মুছলমানদিগের নামে নানারূপ গ্লানিকর কথার প্রচার করিত। মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর সে মোছলেম পুরমহিলাগণের নামেও ঐ প্রকার জঘন্য কবিতা রচনা করিতে এবং তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে নির্য্যাতিত করিতে আরম্ভ করিল

(১১) মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সে হযরতকে হত্যা করার জন্য অভিসন্ধি আঁটিয়া, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণের অছিলায় রাত্রিকালে স্ব-গৃহে আহ্বান করিল। এদিকে হত্যার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া রহিয়াছে। ইহুদী পল্লীতে উপস্থিত হইয়া হযরত এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারেন এবং অতি সঙ্গোপনে কা'বের বাটী হইতে সরিয়া পড়েন।

(১২) ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কা'ব জন্মভূমির স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিতে এবং তাহাকে চিরকালের জন্য বিদেশী কোরেশদিগের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল।

উপরে কা'বের যে সকল নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অপরাধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যে কিরূপ মারাত্মক, পাঠকগণ তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। এহেন নরাধমকে এই অবস্থায় আর কিছুদিন ছাড়িয়া দিলে সে যে হযরতকে ও মুছলমানদিগকে ভবিষ্যতে কি প্রকার বিপন্ন করিতে পারিত, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। সুতরাং এহেন কা'বের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া যে সর্বতোভাবে সঙ্গত ও সমীচীন হইয়াছিল, ন্যায়নিষ্ঠ পাঠক মাত্রকেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

কা'বের হত্যা ব্যাপার লইয়া ইতিহাস-পুস্তকসমূহে নানা প্রকার ভিত্তিহীন কিংবদন্তী ও গল্প-গুজব সঙ্কলিত হইয়াছে। রেওয়ায়তের হিসাবেও যে ঐ বিবরণগুলির কোনই মূল্য নাই, বিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থেও কা'বের প্রাণদণ্ডের বিবরণ বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, এই হাদীছ গ্রন্থগুলিতেও কোন প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত হয় নাই। একটা উদাহরণ দিতেছি। বোখারীর একটি রেওয়ায়ৎ একরামা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। একরমা বলিতেছেন যে, তিনি এবন-আব্বাছের মুখে কা'বের হত্যা সংক্রান্ত বর্ণনাটি অবগত হইয়াছেন। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, ঘটনার সময় এবন-আব্বাছ পাঁচ বৎসরের শিশু মাত্র, বিশেষতঃ তখন তিনি তাঁহার পিতার সহিত মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা ব্যতীত একরামা যে কিরূপ বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি, ভূমিকায় তাহা বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর রেওয়ায়তগুলির উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগের ঐতিহাসিক ও টীকাকারগণের মধ্যে অনেকেই বলিয়াছেন যে, আলোচ্য ঘটনা উপলক্ষে ছাহাবাগণকে হযরত প্রকারান্তরে মিথ্যা কথা কহিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। অথচ এই রেওয়ায়তগুলির মোল কড়াই কাণা।

স্যার উইলিয়ম প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণ এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের অভ্যাসমত নানা প্রকার প্রলাপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের খাতিরে নিম্নে একজন ইংরেজ লেখকের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। মিঃ স্ট্যানলি লেনপুল মিঃ E.W. Lane কৃত selections from the Koran নামক পুস্তকের ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

"The execution of the half-dozen marked Jews is generally called assassination, because a Muslem was sent secretly to kill each of the criminals. The reason is almost too obvious to need explanation. There were no police or law courts, at Madina ; some one of the followers of Mohammad must therefore be the executer of the sentence of death, and it was better it should be done quitely, as the executing of a man openly before his clan would have caused a brawl and more bloodshed and retaliation, till the whole city had become mixed up in the qurrael. If secret assassination is the word for such deeds, secret assassination was necessary part of the internal government of Madina. The men

must be killed, and best in the way. In saying this I assume that Mohammad was cognisant of the deed, and that it was not merely a case of private vengeance : but in several instances the evidence that traces these executions to Mohammad's order is either entirely wanting or is too doubtful to claim our credence"

## অষ্টপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

### ওহোদের অগ্নি-পরীক্ষা

### কোরেশের রণসজ্জা

মক্কার সমস্ত ধন-সম্পদ লইয়া আবু-সুফিয়ান কি উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাত্রা করিয়াছিল, বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমরা তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। বদর যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হওয়ার পর কোরেশের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা শতগুণে বর্ধিত হইয়া গেল এবং তাহারা মুছলমানদিগকে দুনিয়ার পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলার জন্য যথাসাধ্য উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিল। গতবার হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসায় তাহাদিগকে যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল এবং ঐ যুদ্ধে অল্পসংখ্যক মোছলেম বীর যে অসাধারণ বলবীর্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, কোরেশ দলপতিগণের তাহা বিশেষরূপে স্মরণ ছিল। কাজেই এবার তাহারা এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াই উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। বদর সমরের পূর্বে কোরেশগণ নিজেদের শেষ রৌপ্যখণ্ডটিও আবু-সুফিয়ানের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল এবং এই প্রকারে তাহার তহবিলে পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল, এ বিবরণ আমরা যথাস্থানে অবগত হইয়াছি। সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পূর্ণ এক বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আবু-সুফিয়ানের কাফেলার ধন-সম্পদগুলি এযাবৎ প্রাপকগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই, বরং তৎসমুদয় কোরেশদিগের মন্ত্রণা-গৃহে আমানত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল।* ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে চিন্তাশীল পাঠকগণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার একমাত্র উদ্দেশ্যে এই বিপুল ধনরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, মক্কায় শোকসন্তাপ কথঞ্চিতরূপে প্রশমিত হইয়া গেলে, একরামা ও ছফওয়ান প্রভৃতি আবু-সুফিয়ানের নিকট প্রস্তাব করে যে, মূলধনগুলি প্রাপকগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হউক, আর মুনাফার টাকাগুলি যুদ্ধের জন্য ব্যয় করা হউক। আবু-সুফিয়ান বিশেষ আগ্রহসহকারে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে। তাহার পর মুনাফার টাকাগুলি লইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যয় করা হয়। কিন্তু এক বৎসর পর্যন্ত এই টাকাগুলি এমনভাবে ফেলিয়া রাখা হইল কেন—তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কেহই আবশ্যক বলিয়া মনে করে নাই ! অধিকন্তু তাঁহারা একবাক্যে বলিতেছেন যে, "এইরূপে মুনাফার পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা কোরেশদিগের যুদ্ধের তহবিলে সঞ্চিত হইয়া গেল।" অর্থাৎ তাঁহাদিগের কথা অনুসারে এ যাত্রায় আবু-সুফিয়ানের শতকরা একশত টাকা হিসাবে লাভ হইয়াছিল। ইহার পর কোরেশগণ এক হাজার উটও এই মুনাফা খাতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই এক হাজার উটের মূল্যও বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার সহিত যোগ করিয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, এই রেওয়ায়তগুলির উপর আমরা আদৌ কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। সকল দিক ভাবিয়া সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া

---

* এবন-হেশাম, তাবরী, হালবী প্রভৃতি।

দেখিলে সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, ইতিহাসের রাবী বা জনশ্রুতি বর্ণনাকারিগণ এই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারেন নাই, এবং আমাদিগের মোহাদ্দেছ ও আলেমগণ ঐ সকল ইতিহাসকে চিরকালই উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসায় অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় তাহার সুক্ষ্ম আলোচনাও এযাবৎ হইতে পারে নাই। প্রকৃত কথা এই যে, বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্যেই আবু সুফিয়ানের নিকট সঞ্চিত হইয়াছিল, মুনাফাসহ এই মূলধন সঙ্কলিত যুদ্ধে ব্যয় করার জন্যই এতকাল আমানত রাখা হইয়াছিল, এবং পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধন করার প্রথম সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্রই মূলধনের ঐ পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও তাহার মুনাফা হইতে খরিদা রণসম্ভার ও যান বাহনাদি সমস্তই যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত ও নিয়োজিত হইয়াছিল। বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমরা কোরআনের প্রমাণ দ্বারা এই বিষয়টি প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি।

## কোরেশের ধনবল ও জনবল

এই প্রসঙ্গে আরও বলা আবশ্যক যে, বদর হইতে ওহোদ পর্যন্ত কোরেশগণ যে নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ও বাণিজ্যসম্ভার মন্ত্রণাগৃহে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল এবং এতদিন তাহারা যে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, এরূপ অনুমান করাও সমীচীন হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ নিজেরাই স্বীকার করিতেছেন যে, এই সময় কোরেশগণ পুরাতন বাণিজ্যপথ পরিত্যাগ করিয়া এরাকের মধ্য দিয়া সিরিয়া যাতায়াত করিতে থাকে। এইজন্য জায়েদ-এবন-হারেছার নেতৃত্বাধীন একটি অভিযান প্রেরণের কথাও তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন। ফলতঃ কোরেশ জাতি নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করিয়া এই সাধারণ তহবিল গঠন করিয়াছিল এবং বাণিজ্য দ্বারা ঐ তহবিল বাড়াইয়া লওয়ার চেষ্টাও তাহারা করিয়াছিল। অধিকন্তু এই বাণিজ্য উপলক্ষে আরব ও সিরিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে গমনপূর্বক অস্ত্রশস্ত্র ও রণসম্ভারাদি সংগ্রহ করার বিশেষ সুবিধাও তাহাদের হইয়াছিল। যাহা হউক, দীর্ঘকালের চেষ্টার ফলে কোরেশদিগের সাধারণ তহবিলে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হইয়া গেল, এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রেরও আর কোন অভাব থাকিল না।

এইরূপ ধনবলে যথেষ্ট বলীয়ান হওয়ার পর কোরেশ দলপতিগণ জনবল সংগ্রহের প্রতি মনোযোগী হইল। ইহুদী জাতির সহিত তাহাদিগের ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। মদীনা আক্রান্ত হইলে, ইহুদিগণ যে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিবে, পরস্পরের মধ্যে এইরূপ সন্ধি ও প্রতিজ্ঞা বহু পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কোরেশগণ এখন আরবের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন বংশ ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে প্রতিনিধি পাঠাইয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল। এজন্য তাহারা মক্কার দুইজন কবিকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করিল। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম ও প্রধান আবুল ওজ্জা। এই নরাধম বদর যুদ্ধে মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। তাহার পর হযরতের দয়ায় ক্ষতিপূরণে মুক্তি পাইয়াছিল। সে হযরতের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল যে, অতঃপর আর কখনও মুছলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। কিন্তু মক্কায় পৌঁছামাত্র সে খুব বড় গলা করিয়া বলিতে লাগিল—"মোহাম্মদকে কেমন ঠকাইয়া আসিয়াছি।" যাহা হউক, এই নরাধম কোরেশের অন্যতম কবি মোছাফে'র সহিত যোগদান করতঃ বিভিন্ন গোত্রের আরবদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং নিজেদের দুষ্ট প্রতিভা ও শয়তানী শক্তির প্রভাবে হেজাজের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আগুন লাগাইয়া দিল। "ধর্মের অপমান, ধর্মমন্দিরের অপমান, ঠাকুর-দেবতার অপমান, পুরোহিত-পণ্ডিতদিগের সর্বনাশ"—প্রভৃতি বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া তাহারা চারিদিকে এমন উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া দিল যে, অল্পকালের মধ্যে নানা স্থান হইতে বহু দুর্ধর্ষ আরব যোদ্ধা মক্কায় সমবেত হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে অন্যূন তিন সহস্র সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী মদীনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হইল।

## কোরেশবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা

যাত্রার সময় কোরেশগণ তাহাদিগের প্রধান দেবতা হোবল ঠাকুরকে সঙ্গে লইতে বিস্মৃত হইল না। সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে কোরেশের জয়পতাকা। পতাকার পশ্চাতে বিকট-দর্শন বিরাটকায় হোবল ঠাকুর উচ্চ চতুর্দোলার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুরের পশ্চাতে ১৫শ জন কোরেশ নারী 'রণচণ্ডী' বেশে উটের উপর বসিয়া আছে। তাহারা রণবাদ্য বাজাইয়া এবং যুদ্ধ-সঙ্গীত গান করিয়া এই বিপুল কোফরবাহিনীর প্রতিহিংসাবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল। আরবের বিখ্যাত বীর খালেদ-এবন-অলিদ দুইশত সুসজ্জিত অশ্বসাদী সৈন্য লইয়া তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তাহার পর সাতশত উষ্ট্রারোহী দুর্ধর্ষ আরব বীর লৌহবর্মে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপে তিন সহস্র সৈন্যের এই বিরাট বাহিনী, সত্যকে সমূলে উৎপাটিত করার উদ্দেশ্যে মদীনার পথে যাত্রা করিল। হযরতের পিতৃব্য আব্বাছ, কোরেশের এই উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া যাহার-পর-নাই বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং জনৈক অনুগত লোককে একখানা পত্রসহ মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। আব্বাছের প্রেরিত দূত বিশেষ চেষ্টা করিয়া কোরেশবাহিনীকে পশ্চাতে রাখিয়া মদীনায় উপস্থিত হইল। কোরেশের এই বিপুল সাজসজ্জার সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া হযরত ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন ঃ

حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

অসংখ্য সৈন্য ও বিরাট আয়োজন সহকারে কোরেশগণ আমাদিগকে ধ্বংস করিতে আসিতেছে আসুক। "আমাদিগের আল্লাহ্ আছেন, তিনি আমাদিগের অবলম্বন, তিনিই আমাদিগের সম্বল, তিনিই আমাদিগের সহায়। তিনি একাকীই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট।" অতঃপর আততায়ীদিগের সংবাদ আনিবার জন্য তখন দুইজন ছাহাবীকে মদীনার বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, কোরেশ সৈন্যবাহিনী একেবারে মদীনার নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছে।

## পরামর্শ সভা

শুক্রবারের প্রাতঃকালে হযরত ছাহাবাগণকে পরামর্শের জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। আবদুল্লাহ-এবন-ওবাইকেও ডাকা হইল। সকলে সমবেত হইলে কিংকর্তব্য নির্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ আরম্ভ হইল। আনছার ও মোহাজেরগণের মধ্যে যাঁহারা প্রবীণ, তাঁহাদিগের অধিকাংশই নিবেদন করিলেন—হযরত ! সকল দিককার সমস্ত অবস্থা সম্যকরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া আমাদিগের মনে হইতেছে যে, এবার নগরের বাহিরে গমন করা আমাদের পক্ষে কোনমতেই সঙ্গত হইবে না। পাঠকগণ মদীনার আভ্যন্তরীণ অশান্তির কথা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। এই আশঙ্কায় গত কয়েকদিন ধরিয়া সমগ্র মদীনার উপর কড়া পাহারা বসাইতে হইয়াছিল। মহাত্মা ছা'আদ-এবন-মা'আজ প্রভৃতি আনছার নায়কগণ বহু বিশ্বস্ত ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া গতরাত্রি মদীনার মছজিদের দ্বারদেশে রক্ষীর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এ অবস্থায় সম্ভবতঃ আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়াই প্রবীণেরা এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে মদীনা নগরী তখনকার হিসাবে ক্ষুদ্র দুর্গ এবং প্রাচীর ও পরিখাদির দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সুতরাং শত্রুসৈন্য নগরের নিকটবর্তী হইলে তাঁহারা সহজেই তাহাদিগের ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন, অথচ শত্রুগণ তাঁহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি করিয়া উঠিতে পারিবে না। হযরতও এই মতের সমর্থন করিয়া বলিলেন—আমার মতেও ইহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আমরা নগরের মধ্যেই অবস্থান করি।

## প্রতিবাদ ও ভোট গ্রহণ

কিন্তু এই মতটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল না। এবন-ছা'আদ বলিতেছেন যে, সর্বপ্রথমে فتيان احداث অর্থাৎ নবা যুবকগণ (young party) এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ

করিলেন। তাঁহারা সসম্ভ্রমে নিবেদন করিলেন—হযরত! আমরা এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারিতেছি না। আমাদের মতে এই প্রকারে নগরে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে শত্রুপক্ষের স্পর্ধা বাড়িয়া যাইবে। তাহারা মনে করিবে যে, আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা শত্রুপক্ষকে দেখাইতে চাই যে, আমরা দুর্বল নহি, কাপুরুষ নহি। অগ্রে যদি আমরা অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আবার আমাদিগকে আক্রমণ করিতে তাহারা এত সহজে সাহসী হইতে পারিবে না। হযরতের পিতৃব্য বীরকুলকেশরী আমীর হামজা এতক্ষণ চুপ করিয়া এই সকল আলোচনা শুনিয়া যাইতেছিলেন। এতক্ষণে তিনি হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—এই ত কথার মত কথা! আমরা সত্যের সেবক মুছলমান—সত্যের সেবায় আত্মোৎসর্গ করাই আমাদের পার্থিব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে এবং জীবন মরণ তাঁহার অধিকারে—সে ভাবনা ভাবিবার কোন দরকার আমাদের নাই। 'হে আল্লাহর সত্যনবী! যিনি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন—তাঁহার দিব্য, মদীনার বাহিরে গিয়া উহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া আমি অন্ন স্পর্শ করিব না।' একদল আনছারও শেষোক্ত দলে যোগদান করিলেন। ফলতঃ এই প্রকার বাদানুবাদের পর দেখা গেল যে, غلب على الاموال الذى-يريدون-ابن سعد শেষোক্ত প্রস্তাবের পক্ষেই অধিকাংশ লোকের মত—অর্থাৎ নবীন দলের প্রস্তাবই ভোটে জয়যুক্ত হইল। সুতরাং নিজের ও নিজের বিশিষ্ট সহচরগণের মতের বিরুদ্ধে হইলেও হযরত এই প্রস্তাব অনুসারে ঘোষণা করিলেন—"সকলে প্রস্তুত হও, অদ্যই যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইবে।" এই পরামর্শ সভা ভঙ্গ হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই জুমআর নামাযের সময় উপস্থিত হইল। নামায অন্তে হযরত সকলকে জেহাদ সম্বন্ধে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিলেন এবং সকলকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে—"ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেই তাহাদের জয় নিশ্চিত।" জুমআর পর এই প্রকার ওয়াজ-নছিহতে আছরের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল এবং আছরের নামায পড়াইয়া হযরত সকলকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তপ্রবর মহাত্মা আবু বাকর ও ওমরও হযরতের সঙ্গে গমন করিলেন। এদিকে আদেশ প্রাপ্তি মাত্র মুছলমানগণ নিজ নিজ বাটীতে গমন করিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মছজিদের সম্মুখে সমবেত হইতে লাগিলেন।

হযরত অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক রণসাজে সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। এবারকার রণসজ্জায় হযরতের বিশেষ আগ্রহ দর্শন করিয়া ভক্তযুগল যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া তাঁহারা প্রভুকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। হযরত পর পর দুইটি বর্ম দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদিত করিলেন। বর্মের উপর দৃঢ় কটিবন্ধ শোভিত হইল, 'জুলফাকার' বামে দুলিতে লাগিল। ভক্তযুগল প্রভুকে এই প্রকারে সুসজ্জিত করার পর তাঁহার শিরোদেশে আমামা বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে হযরত আজ সেনাপতি বেশে সুসজ্জিত হইয়া মুছলমান মোজাহেদগণের জন্য কর্মযুগের পূর্ণতম আদর্শ সংস্থাপনে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে এক সহস্র মুছলমান রণসাজে সজ্জিত হইয়া প্রভুর আগমন অপেক্ষায় ছফবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান—সকলের দৃষ্টি এক দিকে। এমন সময় ছা'আদ-এবন-মা'আজ প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ছাহাবী সমবেত জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—আপনারা সকলে আর একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। আমার বিবেচনায় এই প্রকারে হযরতের মতের বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদিগের পক্ষে কোনমতেই উচিত হইতেছে না। আপনারা সকলে হযরতের মতের উপর নির্ভর করুন। এখানে এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে—এমন সময় যুগল ভক্তকে সঙ্গে করিয়া হযরত তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এমন অভূতপূর্ব রণসজ্জা, এমন অপরূপ বেশ ভূষা—আজ কিসের জন্য? সেই চিরবরণীয়-চিরকমনীয়, চিরসুন্দর-চিরমনোহর, শান্তি সুষমামাখা চিরউদ্ভাসিত বদনমণ্ডলের প্রশান্ত-গম্ভীর ভাব দর্শনে ভক্তগণ যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তখন ছা'আদের পূর্ব কথিত উপদেশ মতে কয়েকজন ছাহাবা অগ্রসর হইয়া নিবেদন করিলেন—হযরত! আমরা

নিজেদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতেছি, আপনার প্রতি নির্ভর করিতেছি। আপনি এ বেশ ত্যাগ করুন। কিন্তু হযরত দৃঢ়কণ্ঠে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"অসম্ভব!" জনমতের আধিক্যে একটা সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে এবং জননায়ক সেই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণাও করিয়া দিয়াছেন। এখন জনসাধারণ সেই নেতার ব্যক্তিগত মতের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেদের স্বাধীন মতটিকে বিসর্জন দিতেছে, তাঁহার মতে আত্মসমর্পণ করিতেছে। সুতরাং হযরত এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে পারিলেন না। তাই ভক্তগণকে মধুর সম্ভাষণপূর্বক বলিলেন—ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে আল্লাহ্ যদি আমাকে ইহার বিপরীত আদেশ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে আমি সেই আদেশের অনুসরণ করিতাম। এখন সকলে প্রস্তুত হও, আল্লাহর নাম করিয়া যাত্রা কর। ধৈর্যধারণ করিতে পারিলে তোমাদিগের জয় নিশ্চিত।

পৃথিবীর সকল সভ্যতা-কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত আরব উপদ্বীপ, আজ হইতে সার্দ্ধত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্বে, একজন নিরক্ষর আরব দুনিয়াকে গণতন্ত্রের এবং মানবীয় অধিকারের মূলসূত্র সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিতেছেন, জনমতের মর্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে যে আদর্শ স্থাপন করিতেছেন—পাঠকগণ এখানে একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। আরবের দুর্দম 'বেদুইন'—যাহারা সমাজপতির আদেশ-নির্দেশ মাত্রের অন্ধ অনুকরণ করিয়া চলিতে চির অভ্যস্ত, হযরতের শিক্ষাগুণেই আজ তাহারা তাঁহারই মতের প্রতিবাদ করিতেছে। অথচ তাহারা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, হযরত আল্লাহর সত্য রছুল এবং তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেই নিজেদের ধনপ্রাণ লুটাইয়া দিতে তাহারা কখনও মুহূর্তের জন্যও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এ শিক্ষার এবং এ আদর্শের কি তুলনা আছে?

## মোছলেম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা

পাঠকগণ কোরেশদিগের উদ্যোগ-আয়োজন এবং তাহাদিগের ধনবল ও জনবলের কথা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। এখন মুছলমানদিগের আয়োজনের ব্যাপারটা দর্শন করুন। জুমআর পূর্বে সিদ্ধান্ত স্থির হইল এবং আছরের নামায অন্তে সকলকে প্রস্তুত হইয়া আসিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। আদেশমাত্র সকলে স্ব-স্ব গৃহে গমন করিলেন, আর যাহার যাহা সম্বল ছিল তাহাই লইয়া মুহূর্তেকের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। বীরত্বের হুঙ্কার নাই, অহঙ্কারের দুন্দুভি নিনাদ নাই, প্রতিহিংসার আস্ফালন নাই—সকলে ধীরস্থির পদনিক্ষেপে নিজের নিজের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মছজিদের সম্মুখে সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদিগের দলে মোট দুইজন অশ্বসাদী, মাত্র ৭০ জন বর্মাবৃত এবং ৫০ জন তীরন্দাজ সৈন্য সংগৃহীত হইল। আর সকলে নগ্নদেহ ও পদাতিক, কাহারও হাতে তরবারি, কাহারও হাতে বর্শা। এই সাজ-সরঞ্জাম লইয়া এক হাজার মুছলমান হযরতের আদেশে নগর প্রান্তরে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। নগর পরিত্যাগ করিয়া কিছুদূর গমন করিলে, মদীনার প্রধান মোনাফেক নরাধম আবদুল্লাহ্-এবন-ওবাই নিজের দলবলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল:

عصاني واطاع الولدان ومن لا راى له

"মোহাম্মদ আমার কথা শুনিলেন না, আমার পরামর্শের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, আর কতকগুলি অজ্ঞ বালকের কথা অনুসারে কাজ করিলেন। আমরা ইহার সঙ্গে যাইব কেন? চল আমরা সকলে ফিরিয়া যাই।" এই বলিয়া সে নিজের দলের তিন শত সৈন্যকে ভাগাইয়া লইয়া মদীনায় ফিরিয়া গেল। হযরত সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, তাহাকে 'কোনমতে' নিবৃত্ত করার চেষ্টাও করিলেন না। অবশিষ্ট সাত শত মোছলেম বীরকে লইয়া তিনি ওহোদ পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন।* কোরেশ বাহিনী ময়দানের অপর প্রান্তে পড়াও করিয়াছিল

---

* ওহোদ মদীনার উত্তর দিকে ন্যূনাধিক দুই মাইল দূরে অবস্থিত

## সেনাপতিরূপে আল্লাহ্‌র রছুল

শনিবারের প্রত্যুষে মুছলমানগণ ফজরের জামাআতে হযরতের সঙ্গে নামায সমাপন করতঃ কাতার বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। হযরত তখন মোছাল্লা ছাড়িয়া ময়দানে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং নামাযের ইমাম তখন দক্ষ নায়ক ও বীর সেনাপতির ন্যায় মোজাহেদবর্গকে দলে দলে বিভক্ত করতঃ যথাযথ স্থানে সংস্থাপিত করিতেছেন। তখন এই সাত শত বীর ওহোদ পর্বতকে পশ্চাতে রাখিয়া শত্রু-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। পশ্চাতে পর্বতমালার মধ্যে একটি গিরিপথ ছিল, যাহাতে শত্রু সেনা পশ্চাৎদিক দিয়া মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, এজন্য উপরের বর্ণিত পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে ঐ গিরিপথ রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল. আবদুল্লাহ্‌-এবন-জোবের এই দলের নায়ক পদে নিয়োজিত হইলেন। আবদুল্লাহ্‌ নিজের এই ক্ষুদ্র সেনাদলটিকে লইয়া পাহাড়ের একটি সুরক্ষিত স্থানে ঘাঁটি পাতিয়া বসিলেন। হযরত ইঁহাদিগকে বিশেষ তাকিদ করিয়া বলিয়া দিলেন—তোমরা কোন অবস্থায় স্থান ত্যাগ করিও না। যখনই দেখিবে যে, শত্রুসেনা গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তোমরা তখনই তাহাদিগের প্রতি তীর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিও। জয় হউক, পরাজয় হউক, আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থায় এই স্থান ত্যাগ করিও না। ইহার যেন অন্যথা না হয়—সাবধান !*

## বালকগণের ভক্তি ও অভিমান

মদীনার কতিপয় অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও মোছলেম বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হযরত তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া মদীনায় ফিরাইয়া দিলেন। ইমাম আবু-ইউছুফের পূর্বপুরুষ ছা'আদ-এবন-হবতাও ইঁহাদিগের মধ্যে একজন। এই কিশোর বয়স্ক মোছলেমগণ যখন দেখিলেন যে, 'ছোট' বলিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে, তখন তাঁহাদিগের মনস্তাপের অবধি রহিল না। রাফে নামক একজন বালক এই ছোটত্বের কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্য পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া জোর করিয়া বড় হইতে লাগিলেন। তখন সকলে বলিলেন যে, বালকটি তীরনিক্ষেপে খুবই সিদ্ধহস্ত, সুতরাং এই সকল কারণে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইল। ছামরা-এবন-জোন্দবও তখন বালক ছিলেন এবং এইজন্য তাঁহাকে যুদ্ধে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে, আর রাফেকে অনুমতি দেওয়া হইতেছে, তখন তিনি অভিমানভরে স্বীয় পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—রাফেকে আমি কুস্তি লড়িয়া হারাইয়া দিয়া থাকি, সে অনুমতি পাইল—আর আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে, এ কেমন বিচার ! বালকগণের আত্মোৎসর্গের এই স্বর্গীয় স্পৃহা দর্শনে হযরত যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। শিশু ও বালকগণকে লইয়া আনন্দ করিতে হযরত বড়ই ভালবাসিতেন। হুকুম হইল—"বেশ কথা। তুমি রাফের সঙ্গে কুস্তি লড়, দেখা যাক।" আর যায় কোথায়, দেখিতে দেখিতে দুই বালক তাল ঠুকিয়া মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সৌভাগ্যবান ছামরা ইহাতে জয়লাভ করিলেন। তখন হযরত হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তোমাকেও অনুমতি দেওয়া গেল।" পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, এই বালকগণই দু-দিন পরে অর্ধপৃথিবীর উপর এছলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহারা, ধন্য তাঁহাদিগের জনক-জননী, আর শত ধন্য সেই মহাগুরু—যাঁহার শিক্ষা প্রভাবে এমন অসাধ্য সাধনও সম্ভবপর হইয়াছিল।

---

* বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ, তিরমিজী এবং প্রায় সমস্ত ইতিহাসেই এই সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

মদীনার আওছ বংশে আবু-আমের নামক একজন যাজক বাস করিত, এছলামের পূর্বে সে 'রাহেব' আখ্যায় আখ্যাত ছিল। আওছ ও খাজরাজ বংশের লোকেরা দলে দলে মুছলমান হইতেছে দেখিয়া আবু-আমের কতকগুলি লোককে সঙ্গে লইয়া মক্কায় পলাইয়া যায় এবং সেখানে কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। মদীনার এই প্রবীণ পুরোহিত, কতিপয় দুর্ধর্ষ সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সর্বপ্রথমে ময়দানে উপস্থিত হইল এবং আনছারগণকে সম্বোধন করতঃ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল—'হে মদীনার অধিবাসিগণ ! আমাকে চিনিতে পারিতেছ কি? আমি তোমাদিগের পুরোহিত আবু-আমের ! তোমরা মোহাম্মদকে ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে যোগদান কর, তোমাদিগের কল্যাণ হইবে।' কিন্তু আনছারগণ এখন পীর-পুরোহিতগণের প্রবঞ্চনার অতীত, তাহারা সমবেত কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"দূর হ' প্রবঞ্চক, তোর পৌরোহিত্যের কোন ধার আমরা ধারি না, তোর অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না।' আবু-আমের কোরেশদিগকে আশা দিয়া বলিয়াছিল যে, 'আমি মদীনার পুরোহিত, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমি একবার আহ্বান করিলে মদীনাবাসীরা সকলেই মোহাম্মদকে ত্যাগ করিয়া আমার দলে যোগদান করিবে।" কিন্তু আনছারগণের উত্তর শুনিয়া সে বলিতে লাগিল—দেখিতেছি, আমার অবিদ্যমানে হতভাগাগুলা একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। তখন তাহার পৌরোহিত্যের ক্ষুব্ধ অভিমান পুরাতন প্রতিহিংসার সঙ্গে যোগ দিয়া প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, এবং এই হতভাগাই সর্বপ্রথমে সদলবলে প্রস্তর ও বাণ বর্ষণ করতঃ যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়া দিল। আবু-আমের তাহার আক্রমণের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলে, আবু-সুফিয়ান দেখিল যে, এতদিন অনর্থক এই হতভাগাটার ভারবহন করা হইয়াছে। আনছারদিগের একটি বালক বাঁচিয়া থাকিতেও যে, তাহারা হযরতের বা অন্যান্য মোহাজেরগণের কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না, ধূর্ত আবু-সুফিয়ান তাহা সম্যকরূপে অবগত ছিল—এবং ছিল বলিয়াই মদীনার প্রাচীন পুরোহিতকে দিয়া এই রাজনৈতিক চাল চালিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার পরিণাম দেখিয়া সে নিজেই ময়দানে উপস্থিত হইল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"হে আওছ, হে খাজরাজ—তোমরা আমাদিগের স্বগোত্রস্থ লোকগুলাকে পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াও, আমরা তোমাদিগকে কিছুই বলিব না, তোমাদিগের নগর আক্রমণ করিব না, এখান হইতে ফিরিয়া যাইব।" আবু-সুফিয়ানের এই জঘন্য প্রস্তাব শ্রবণ করা মাত্রই আনছারগণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

## খণ্ডযুদ্ধ

ইহার পর খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, মক্কার বিখ্যাত বীর তাল্‌হা ইহার সূত্রপাত করিল। তাল্‌হা ময়দানে আসিয়া ব্যঙ্গস্বরে মুছলমানদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। সে অবশেষে বলিতে লাগিল—মুছলমান ! তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহ আছে কি—যে নিজের তরবারি দ্বারা আমাকে নরকে প্রেরণ করিতে অথবা আমার তরবারি দ্বারা নিজে স্বর্গে গমন করিতে প্রস্তুত ? বলা বাহুল্য যে, মুছলমানদিগের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াই তাল্‌হা এই প্রকার প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যাহা হউক, তাল্‌হার এই আহ্বান শ্রবণ করিয়া হযরত আলী অগ্রসর হইয়া বলিলেন—আমি আছি। আমিই তোমার নরকযাত্রার সাধ মিটাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া হযরত আলী সিংহবিক্রমে তাল্‌হার উপর আপতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাহার মস্তক ধুলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পিতার এই পরিণাম দেখিয়া তাল্‌হার পুত্র ওছমান নানা প্রকার আস্ফালন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। আমীর হামজা লম্ফ দিয়া তাহার উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার তরবারির অব্যর্থ আঘাতে ওছমানের দেহ দ্বি-খণ্ডিত হইয়া ভূপতিত হইল। পরপর দুইজন নায়কের শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া কোরেশগণ ভীত হইয়া পড়িল,

এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ স্থগিত করিয়া তাহারা সকলে সমবেতভাবে মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিল। এই সময় কোরেশ রাক্ষসিগণ করতাল বাজাইয়া তালে তালে রণসঙ্গীত গাহিয়া সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। আবু-সুফিয়ানের সহধর্মিণী হেন্দ ও তাহার সহচরীবৃন্দ সমস্বরে কণ্ঠে গান ধরিল ঃ

نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، مشي القطا النوارق
والمسك في المفارق، والدر في المخانق، ان تقبلوا نعانق
ونفرش النمارق - او تدبروا نفارق، فراق غير وامق

অর্থাৎ—"শুকতারার কন্যা আমরা, খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় সুন্দর গতিতে বাসর শয্যাগুলিকে পদদলিত করিয়া থাকি। দেখ দেখ, আমাদিগের শিরোদেশে মৃগনাভী, কণ্ঠদেশে মুক্তামালা। যদি অগ্রসর হইতে পার, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগের জন্য শয্যা রচনা করিব, তোমাদিগকে আলিঙ্গন দান করিব। আর যদি তোমরা পশ্চাদপদ হও, তাহা হইলে আমাদিগের সহিত বিচ্ছেদ, অসন্তোষের চিরবিচ্ছেদ।" সাধারণ আক্রমণের প্রারম্ভে কোরেশদিগের পতাকা বেষ্টন করিয়া এই রণরাক্ষসিগণ চীৎকার করিয়া বলিতেছিল ঃ

ضربا بني عبد الدار، ضربا حماة الدار، ضربا بكل بتار

তখন তিন সহস্র দুর্ধর্ষ আরব, হোবল ঠাকুরের নামে জয়নিনাদ করিতে করিতে সাত শত মুছলমানকে আক্রমণ করিল। মুছলমানদিগের মুখে দর্প নাই, দম্ভ নাই, তাঁহারা ধীরস্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কোরেশের প্রথম আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিতে লাগিলেন। একদিকে বর্মাবৃত সহস্রাধিক উষ্ট্রারোহী সেনার প্রচণ্ড আক্রমণ, অন্যদিকে দুই শত বর্শাধারী অশ্বসাদীর ভীম বিক্রম, তাহার উপর অন্যদিক দিয়া শত শত পদাতিকের অস্ত্রবর্ষণ—কিন্তু মুছলমানগণ তিন দিক হইতে বেষ্টিত ও আক্রান্ত হইয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। উদ্বেলিত সাগরবক্ষের উত্তাল ঊর্মিমালা যেমন তীরস্থিত পর্বতমূলকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিতে থাকে, বিপুল কোরেশবাহিনী সেইরূপ মোছলেম ব্যূহগুলিকে আক্রমণ করিতে থাকিল। তাহার পর ঐ তরঙ্গমালা যেমন পর্বতগাত্রে মাথা ঠুকিয়া আপনাআপনিই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, আবু-সুফিয়ানের বিরাট বাহিনী সেইরূপে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। বিশেষতঃ আলী, হামজা, আবু-দোজানা এবং তালহা প্রভৃতি গাজিগণ এই সময় যে প্রকার অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মুছলমানের জাতীয় ইতিহাসে তাহা চিরকালই সোনার অক্ষরে লিখিত থাকিবে। কোরেশের প্রথম আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিয়াই মুছলমানগণ কোরেশ বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে এবং প্রায় সকল ইতিহাসে এই মহামতি মোজাহেদগণের বীরত্ব কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মুছলমানগণ প্রথমেই শত্রুবাহিনীর কেন্দ্র আক্রমণ করিলেন। এই কেন্দ্রেই তাহাদিগের পতাকা প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেখিতে দেখিতে কোরেশের জয়পতাকা ভূলুণ্ঠিত হইল। ইহা দেখিয়া আর একজন কোরেশ যোদ্ধা লম্ফ দিয়া সেই পতাকা তুলিয়া ধরিল, সেও সেই মুহূর্তে শমনসদনে প্রেরিত হইল। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশজন কোরেশ, পতাকা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল, এবং নিমেষের মধ্যে সকলের প্রাণহীন দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। একা হযরত আলীই ইহাদের আটজনকে নিহত করেন। কোরেশ সেনাপতিগণ সহস্র চেষ্টা করিয়া দেখিল, কিন্তু মুছলমানদিগকে কোন প্রকারেই পশ্চাদপদ করিতে পারিল না। আরবের বিখ্যাত বীর খালেদ-এবন-অলিদ অশ্বসাদী সেনাদল সঙ্গে লইয়া তিনবার গিরিপথ দিয়া মোছলেম বাহিনীর পশ্চাদভাগ আক্রমণ করার চেষ্টা করিল, কিন্তু আবদুল্লাহ-এবন-জোবেরের অধীনস্থ অব্যর্থ লক্ষ্য তীরন্দাজ সৈন্যগণের বাণ বর্ষণের ফলে, তাহাকে তিনবারই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল।

## আমীর হামজার বীরত্ব ও শাহাদত

শহীদ-কুলশিরোমণি আমীর হামজা দুই হাতে দুইখানা তরবারি লইয়া কোরেশ কোফেরদিগের ব্যূহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং 'দো-দাস্তি তলওয়ার' চালাইয়া নরাধমগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কোরেশগণ এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বহু সৈন্য তাঁহার দিকে পরিচালিত করিয়া দিল। কিন্তু আমীরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি দুই হাতে তলওয়ার চালাইয়া যাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে ৩১ জন কোরেশ বীরের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া হামজা একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নাভির তলদেশ অনাচ্ছাদিত হওয়ার উপক্রম হওয়ায় তিনি 'সামাল' হইবার জন্য যেমন দাঁড়াইলেন, অমনি অহশী নামক মক্কার এক হাবশী গোলাম তাঁহার 'তলপেট' লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিল। আমীর তখন শরীর আচ্ছাদনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় অহশীর বর্শা তাঁহার উপরে বিদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠভেদ করিয়া চলিয়া গেল—আমীর সেই অবস্থাতেও তরবারি উত্তোলনপূর্বক দণ্ডায়মান হইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তখন ফেরদৌসের ফাছেদগণ উপস্থিত হইয়াছেন, আমীর আল্লাহর নাম করিয়া ঢলিয়া পড়িলেন—এবং সেই মুহূর্তেই তিনি শাহাদত প্রাপ্ত হইলেন।*

## আবু-দোজানার সৌভাগ্য

শেরে-খোদা হযরত আলীও নির্বিক্রমে কোরেশবাহিনীর উপর অপতিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে সম্মুখবর্তী কোরেশ সৈন্যগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এই সময় হযরত একখানা তরবারি হাতে লইয়া বলিলেনঃ "কে ইহা গ্রহণ করিবে, কে ইহার মর্যাদা রক্ষা করিবে?" এই তরবারির একদিকে নিম্নলিখিত পদটি লিখিত ছিল ঃ

في الجبن عار وفي الإقبال مكرمة

والمرء بالجبن لا ينجو من القدر

অর্থাৎ "কাপুরুষতায় কলঙ্ক এবং অগ্রসর হওয়াতেই সম্ভ্রম। আর সত্য কথা এই যে, কাপুরুষতার কলঙ্ক বহন করিয়াও মানুষ নিয়তির হাত এড়াইতে পারে না।" যাহা হউক, এই তরবারি হস্তে গ্রহণ করিয়া হযরত ছাহাবিগণকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—কে ইহা গ্রহণ করিবে, কে ইহার সম্ভ্রম রক্ষা করিবে? বলা বাহুল্য যে, তরবারি গ্রহণের জন্য চারিদিক হইতে শত শত বাহু ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়াছিল। উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই ইহা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্য কাহাকেও না দিয়া হযরত এই তরবারিখানি আবু-দোজানা নামক আনছার বীরের হস্তে অর্পণ করিলেন। তখন আবু-দোজানার গর্ব দেখে কে—তিনি মাথায় লাল রুমালের সুশ্রী পাগড়ী বাঁধিয়া হেলিতে-দুলিতে ও নাচিতে-কুঁদিতে কোরেশ বাহিনীর উপর আপতিত হইলেন এবং হযরতের প্রদত্ত তরবারি ও তাহার উপর লিখিত কবিতাটির মর্যাদা রক্ষণে যত্নবান হইলেন। আবু-দোজানা একে প্রথিতনামা বীর, তাহার উপর আনছারী মুছলমান, এবং সর্বোপরি হযরতের প্রদত্ত তরবারি তাঁহার হস্তে—সুতরাং তাঁহার বল-বিক্রম এবং মানসিক তেজ তখন যে কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আবু-দোজানা এই তরবারি লইয়া কোরেশ সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন—এমন সময় আবু-সুফিয়ানের স্ত্রী পিশাচিনী হেন্দ তাঁহার তরবারির নিম্নে পড়িয়া গেল। এমন তুমুল যুদ্ধ, এমন ভীষণ সংগ্রাম, আর এতাদৃশ উত্তেজনার সময়ও আবু-দোজানার বাহু শিথিল হইয়া আসিল। কি সর্বনাশ, এ যে স্ত্রীলোক! আমার হাতে যে হযরতের তরবারি! আবু-দোজানা উত্তোলিত তরবারি সংবরণ করতঃ অন্যদিকে গমন করিলেন। এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন তরবারিখানি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গেল, তখন এই বীর সেবক তাহা লইয়া হযরতের পদপ্রান্তে উপহার প্রদান করিলেন।**

---

* বোখারী, এছাবা প্রভৃতি   ** হালবী, এছাবা প্রভৃতি।

# উনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

## যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য পরিবর্তন

## আদেশ অমান্য করার শোচনীয় প্রতিফল

মোছলেম বীরগণ আর অপেক্ষা না করিয়া সমবেতভাবে সাধারণ আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কোরেশগণ এ সময় মুছলমানদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অল্পকালের মধ্যেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে মোজাহেদগণ তাহাদের কেন্দ্রস্থলটি অধিকার করিয়া লইলেন এবং কোরেশগণ তাহাদিগের রসদভার পরিত্যক্ত করিয়া হটিয়া যাইতে লাগিল। 'হেন্দ' প্রভৃতি কোরেশ নারীবৃন্দ তখনকার অবস্থা দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতঃ পলায়নপর হইল। এই প্রকারে কোরেশ সৈন্য একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ার পর মুছলমানগণ তাহাদিগের পরিত্যক্ত রসদভার ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। আবদুল্লাহ্-এবন-জোবেরের তীরন্দাজ সৈন্যদল এতক্ষণ পর্বতমূলে অবস্থান করতঃ নিজেদের কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এই আশাতীত জয়ের উল্লাসে এখন তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। হযরত তাঁহাদিগকে যে কঠোর তাকিদ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা ভুলিয়া গিয়া গনিমত সংগ্রহের জন্য সমরক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নায়ক আবদুল্লাহ্ তাঁহাদিগকে নিবারিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন—হযরতের কঠোর নিষেধের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ সৈনিকগণ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিতে লাগিলেন—এখন আমাদের সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে, এখন আর এখানে বসিয়া থাকিব কিসের জন্য? এই বলিয়া তাঁহাদিগের অধিকাংশ সৈনিকই স্থান ত্যাগ করিয়া ময়দানের দিকে ছুটিয়া গেলেন। আবদুল্লাহ্ মাত্র কয়েকজন লোককে লইয়া সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন।

এইরূপে হযরতের কঠোর আদেশ এবং সেনাপতির নিষেধ অমান্য করার ফলও হাতে হাতে ফলিতে আরম্ভ হইল। আরবের বিখ্যাত এবং রণকুশল সেনাপতি খালেদ-এবন-অলিদ অশ্বসেনী সেনাদল লইয়া চারিদিকে চক্র কাটিয়া সুযোগের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। খালেদ যখন দেখিলেন যে, মুছলমানগণ গিরিপথ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সেই অরক্ষিত পথের দিকে নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎদিক দিয়া মুছলমানদিগের মাথার উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরবর আবদুল্লাহ্ তাঁহার সহচর কয়জনকে লইয়া জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত হযরতের আদেশ পালন করিলেন—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহারা সকলেই শাহাদতপ্রাপ্ত হইলেন। এদিকে মুছলমান সৈন্যগণ নির্ভাবনায় গণিমতের মাল সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত আছেন। এমন সময় প্রথমে খালেদের অশ্বসাদী সেনাদল এবং তাহার পর অন্যান্য ছওয়ার ও পদাতিক সৈন্যগণ অতর্কিত অবস্থায় তাঁহাদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল এবং সতর্ক হওয়ার পূর্বে বহু মুছলমানকে কোরেশদিগের হস্তে নিহত হইতে হইল। কোরেশের জাতীয় পতাকা এতক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছিল। খালেদের এই আক্রমণ এবং মুছলমানদিগের উপস্থিত সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া 'আমরা' নাম্নী জনৈক কোরেশ বীরাঙ্গনা আবার তাহা তুলিয়া ধরিল। সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর ভূলুণ্ঠিত জাতীয় পতাকাকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উড্ডীয়মান হইতে দেখিয়া বিক্ষিপ্ত ও পলায়নপর কোরেশ সৈন্য আবার সেই পতাকার দিকে ছুটিয়া আসিল এবং তাহারা আবার দলবদ্ধভাবে মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিল।*

---

* বোখারী, আবু-দাউদ ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ।

হযরতের ও তাঁহার ছাহাবাগণের জীবনে ইহা একটি ভীষণতম অগ্নি-পরীক্ষা। অতর্কিতে হঠাৎ মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ায় ন্যায় এই আকস্মিক বিপদে মুছলমানগণ একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের শৃঙ্খলা এবং ব্যূহ প্রভৃতি প্রথমেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সকলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন এবং যিনি যেখানে ছিলেন, তিনি সেইখান হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময় ছাহাবাগণ, বিশেষতঃ আনছার বীরবৃন্দ, এমন কি মোছলেম মহিলাগণ পর্যন্ত যে প্রকার ভক্তি-বিশ্বাস এবং ধৈর্য-শৌর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, বস্তুতঃ দুনিয়ায় তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

## মোছআবের আত্মত্যাগ

পাঠকগণ বোধ হয় মদীনার প্রথম অধ্যাপক মহাত্মা মোছআবকে বিস্মৃত হন নাই। ওহোদের অগ্নি-পরীক্ষায় মুছলমানের জাতীয় পতাকা এই মোছআবের হস্তেই সমর্পিত হয়। এই পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য মোছআবকে প্রথম হইতেই যুদ্ধ করিয়া আসিতে হইয়াছিল, এবং তীর ও তরবারির আঘাতে তাঁহার আপাদমস্তক একেবারে জর্জরিত হইয়া গিয়াছিল। আলোচ্য সময় 'এবন-কামিআ' নামক জনৈক দুর্ধর্ষ কোরেশ অগ্রসর হইয়া তাঁহার দক্ষিণ বাহুর উপর তরবারির আঘাত করিল। বাহুটি কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোছআব বাম হস্তে পতাকাধারণ করিলেন—কিন্তু অবিলম্বে এবন-কামিআর তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে তাঁহার বাম বাহুটিও দেহচ্যুত হইয়া পড়িল—এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের একটি তীর আসিয়া তাঁহার জ্ঞান, ভক্তি ও বীরত্বপূর্ণ বক্ষটি ভেদ করিয়া চলিয়া গেল, মোছআব চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শহীদের অমর জীবন লাভ করিলেন। মোছআব শহীদ হওয়ার পর হযরত আলী এই জাতীয় পতাকা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। বাহ্যিক সাদৃশ্য দর্শনে ভ্রান্ত হইয়া এবন-কামিআ মোছআবকে হযরত বলিয়া মনে করিয়াছিল। সে তখন উল্লসিত স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল : "মোহাম্মদ নিহত হইয়াছে।" একে যুদ্ধের এই শোচনীয় অবস্থা, তাহার উপর এই মর্মন্তুদ দুঃসংবাদ, অথচ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং শত্রুসৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত ছাহাবাগণের পক্ষে হযরতের বা অন্য কাহারও সংবাদ লইবারও সুযোগ নাই। কাজেই এই দুঃসংবাদ রটিবার পর অধিকাংশ মুছলমানই ক্ষণেকের জন্য একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। একদল মুছলমান ইতোমধ্যেই শাহাদতপ্রাপ্ত হইয়াছেন, জীবিতদিগের মধ্যে একদল গুরুতর রূপে আহত হইয়া পড়িয়াছেন। আর হযরত নিহত হইয়াছেন শুনিয়া একদল অস্ত্রত্যাগ করতঃ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ এমন কি কেহ কেহ মদীনায় পলায়ন পর্যন্ত করিলেন।*

এদিকে হযরতের সম্মুখবর্তী কোরেশ সৈন্যদল উৎসাহিত হইয়া সমবেতভাবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন একদল আনছার হযরতকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার দেহরক্ষা করিতেছেন। কাফেরগণ অজস্রধারে, তীর, তরবারি, বর্শা ও প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতেছে, আর ভক্তগণ নিজের দেহকে ঢাল বানাইয়া তাহা দ্বারা প্রভুকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করিতেছেন। এই সময় বহুসংখ্যক আনছার হযরতের পদপ্রান্তে জীবন উৎসর্গ করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। এমন কি, এক সময়ে হযরতের সন্নিধানে কেবল তালহা ও ছা'আদ মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যান।** হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এই সময়কার ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু ঘটনার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিকরূপে এমন বিশৃঙ্খল ও অসংলগ্নভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে যে, সেগুলির একত্র সঙ্কলন এবং পরস্পর সংলগ্ন ও সমঞ্জসরূপে তাহার সম্পাদন সহজসাধ্য নহে। আমরা নিম্নে তাহার মধ্য হইতে দুই-চারিটি আবশ্যকীয় ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

---

* বোখারী, এছাবা, রওজুল্আনফ, তাবরী প্রভৃতি   ** বোখারী।

## হযরতের উপর ভীষণ আক্রমণ

'মোহাম্মদ নিহত হইয়াছেন' শুনিয়া কোরেশ সৈন্যদল এতক্ষণ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের একদল যখন দেখিল যে, এ সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি তাহাদিগের সম্মুখে অক্ষত দেহে দণ্ডায়মান আছেন, তখন তাহারা আর সকলকে ত্যাগ করিয়া সমবেতভাবে হযরতের উপর আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিল। হযরতকে নিহত করাই এই সকল আক্রমণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তাহারা আক্রমণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল, কিন্তু মুছলমানগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিফলমনোরথ করিয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তকুল শিরোমণি 'ছা'আদ অব্যর্থ লক্ষ্য তীরন্দাজ, তিনি হযরতের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদিগের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দুইখানা ধনুক ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি অন্যের নিকট হইতে ধনুক সংগ্রহ করিয়া তীর চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে ছা'আদ একাই সেদিন ন্যূনাধিক এক সহস্র বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন। আবু-তালহাও মদীনার বিখ্যাত তীরন্দাজ। তিনি কাফেরদিগের অস্ত্রবর্ষণ দর্শনে বিচলিত হইয়া নিজের গাণ্ডীব হযরতের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন এবং ঢাল লইয়া হযরতের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। হযরত এক-একবার ঢালের আড়াল হইতে মুখ বাহির করিয়া যুদ্ধের অবস্থা দেখিতে যান, আর আবু-তালহা চমকিত হইয়া বলেন—প্রভু! বাহির হইবেন না।

نفسي لنفسك الفداء ، ووجهي لوجهك الوفاء

অর্থাৎ "আমার দেহ প্রভুর দেহের ঢাল হউক, আমার প্রাণ প্রভুর প্রাণের বিনিময়ে উৎসর্গিত হউক।" এই সময় আবু-তালহা হযরতের প্রতি নিক্ষিপ্ত বাণগুলি নিজের বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আবু-দোজানার বীরত্বের কথা পাঠকগণ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। এই বিপদের সময় তিনিও আসিয়া হযরতের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণপণে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। একজন শত্রু হযরতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া আবু-দোজানা কুব্জ হইয়া নিজের দেহ দ্বারা হযরতকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। চক্ষের পলকে বর্শাটি আবু-দোজানার পৃষ্ঠদেশে বিদ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপে শত্রুপক্ষের বাণ ও বর্শার আঘাতে আবু-দোজানার পৃষ্ঠদেশ একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল।*

## জিয়াদের অপূর্ব সৌভাগ্য

কোরেশ-সৈন্য হযরতকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া হত্যা করিতেছে, মুষ্টিমেয় ভক্তগণ প্রাণপণ চেষ্টায়ও যেন সে আক্রমণের বেগ প্রতিরোধিত করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় হযরত তেজদৃপ্ত গম্ভীর ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে পারে, এমন কেহ আছে কি ?" প্রভুর জন্য, ধর্মের জন্য, আল্লাহর নামে আত্মবলি—ইহাই ত মোছলেম জীবনের পরম সার্থকতা। জিয়াদ নামক জনৈক আনছার যুবক হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—"আমি।" এই একটি শব্দে কত ভাব—কত ভক্তি, কত তেজ—কত শক্তি, এবং কত সাধনা—কত সিদ্ধি লুকাইয়া আছে, পাঠক তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। যাহা হউক, জিয়াদ পাঁচ-সাতজন আনছার বীরকে সঙ্গে লইয়া অগ্রবর্তী শত্রু-সৈন্যদলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। জিয়াদ ও তাঁহার সহচরগণ মরণের হাতে অমর জগতের প্রত্যাশায় দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াই এমন অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শৌর্য, বীর্য ও আত্মোৎসর্গের ফলে যুগপৎভাবে তাঁহাদিগের উভয় উদ্দেশ্যই পূর্ণ হইয়াছিল। শত্রু-সৈন্যগণ একটু সরিয়া

---

* বোখারী, মোছলেম, তাবরী, জাদুল-মাআদ, কানজুল-ওম্মাল প্রভৃতি।

দাঁড়াইলে দেখা গেল যে, জিয়াদের সহচরগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বহু পূর্বেই ফেরদৌসে প্রস্থান করিয়াছেন। জিয়াদ তখনও মুমূর্ষু, হযরতের আদেশে তাঁহাকে তুলিয়া আনা হইল। হযরত তখন জিয়াদের মস্তক নিজের পদযুগলের উপর রক্ষা করিয়া সজল নয়নে তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এত সুখ, এত সম্পদেও বুঝি জিয়াদের সাধ মিটিল না; তাই মরণের পূর্বমুহূর্তে তিনি গড়াইয়া হযরতের চরণযুগলের উপর 'উপুড়' হইয়া পড়িলেন, জিয়াদের গণ্ডদেশ হযরতের সেই ভক্তভয় নিবারণ কদম শরীফকে স্পর্শ করিল—মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল।*

سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے
یہ نصیب، اللہ اکبر! لوٹنے کی جائے ہے۔

বস্তুতঃ এ কি মরণ, সহস্র জীবন উৎসর্গ করিয়াও কি এমন মরণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়?

منم و همین تمنا که بوقت جان سپردن
برخ تو دیده باشم، تو درون دیده باشی ॥

কবি যেন এই ঘটনার চিত্র আঁকিয়া বলিতেছেন ঃ

بچه ناز رفته باشد ز جهان نیازمندے
که بوقت جان سپردن بسرش رسیده باشی।

## ওম্মে-আমারার অপূর্ব বীরত্ব

আকাবার বায়আত উপলক্ষে পাঠকগণ বিবি ওম্মে-আমারার নাম অবগত হইয়াছেন। ইঁহার নাম মোছায়বা, কিন্তু ইনি সাধারণতঃ ওম্মে-আমারা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বিবি আয়েশা প্রভৃতি মোছলেম মহিলাগণের সহিত ইনি শুশ্রূষাকারিণীরূপে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, আহত সৈনিকগণকে পানি সরবরাহ এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য প্রকার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন যে, মুছলমানগণ পরাজিত হইয়াছেন এবং কোরেশ সৈন্য হযরতকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ওম্মে-আমারা কাঁধের মশক ও হাতের জলপাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং তীর-ধনুক ও তরবারি লইয়া হযরতের নিকট ছুটিয়া গেলেন। তখন মুষ্টিমেয় ভক্ত প্রাণপণ করিয়া হযরতের দেহরক্ষা করিতেছিলেন। ওম্মে-আমারা সিংহীর-ন্যায় বিক্রমসহকারে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতাসহকারে বাণবর্ষণ করিয়া কোরেশদিগকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। শেষে যখন তীরে আর কুলাইল না, তখন গাণ্ডীব ফেলিয়া দিয়া তিনি উলঙ্গ তরবারি হস্তে অগ্রগামী কোরেশদিগের উপর আপতিত হইলেন। শত্রুদিগের বর্শা ও তরবারির আঘাতে তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই মোছলেম বীরাঙ্গনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ওহোদ যুদ্ধের বর্ণনাকালে স্বয়ং হযরত বলিয়াছেন ঃ "সেই বিপদের সময় আমি দক্ষিণে বামে যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি, ওম্মে-আমারা আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন।" এই সময় কোরেশদিগের একটা ঘোড়ছওয়ার ঘোড়া ছুটাইয়া হযরতের উপর আক্রমণ করিতে আসিল। ওম্মে-আমারা নক্ষত্রগতিতে তাহার উপর আপতিত হইলেন এবং মুহূর্তেকের মধ্যে তাহাকে আজরাইলের হস্তে সমর্পণ করিলেন।**

## হযরত আহত হইলেন

হযরত এই ঘোর বিপদের সময়ও অচল পর্বতের ন্যায় স্বস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন; ভয় নাই ভীতি নাই, উদ্বেগ নাই উৎকণ্ঠা নাই, নিজের এই শোচনীয়

---

* মোছলেম, এছাবা ও বিভিন্ন ইতিহাস। ** এবন-হেশাম, হল্বী, এছাবা প্রভৃতি।

দুরবস্থা দর্শনে অবসাদ নাই, বিমর্ষতা নাই। তিনি আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, বীর-সেনাপতির ন্যায় মুষ্টিমেয় ভক্তদলকে লইয়া কাফেরদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতেছেন। এই সময় এবন-কামিআ প্রভৃতি কয়েকজন নরাধমের অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতের ফলে হযরতের চারিটি দাঁত স্থানচ্যুত হইয়া যায়। এবন-শেহাব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে তাঁহার মণিবন্ধ আহত হইয়া পড়ে। কাফের সৈন্যগণ হযরতের উপর পুনঃ পুনঃ তরবারি চালনা করিয়াছিল, কিন্তু হযরত ও তাঁহার ভক্ত অনুচরবৃন্দের দৃঢ়তা, সতর্কতা ও বীরত্বের ফলে এ-সমস্তই ব্যাহত হইয়া আসিতেছিল। অবশেষে একবার নরাধম এবন-কামিআ হযরতের মস্তকের উপর তরবারির আঘাত করে। এই আঘাতে হযরতের শিরস্ত্রাণটি কাটিয়া যায় এবং তাহার দুইটি 'কড়া' তাঁহার কপালে ঢুকিয়া পড়ে। ইহার ফলে হযরতের মস্তক ও বদনমণ্ডল হইতে দরবিগলিতধারে শোণিতপাত হইতেছিল। হযরত তখন বদনমণ্ডল হইতে রক্তধারা পুছিতে পুছিতে তাঁহার পূর্ববর্তী নবী বিশেষের পরীক্ষার কথা কহিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—নিজেদের মুক্তি ও মঙ্গলকারী রছুলকে রক্ত-রঞ্জিত করিয়া সমাজ কিরূপে সফলতা লাভ করিতে পারে ? ইহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সমস্ত হৃদয় দয়া ও করুণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং সেই অবস্থায় তিনি করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ঃ

رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون

"হে আমার প্রভু ! আমার—'জাতি'কে ক্ষমা কর, কারণ তাহারা অজ্ঞ !!" অর্থাৎ অজ্ঞান বলিয়াই তাহারা আমার প্রতি এই অত্যাচার করিয়াছে। অতএব প্রভু হে, তুমি তাহাদিগের এই অজ্ঞতাজনিত অপরাধ ক্ষমা কর, যেন পূর্ববর্তী উম্মতদিগের ন্যায় ইহারা তোমার অভিশাপ ভাজন না হয়।*

মুষ্টিমেয় মোছলেম বীরগণের অসাধারণ শৌর্যবীর্য এবং অনুপম আত্মত্যাগের ফলে কোরেশ সৈন্যগণের আক্রমণবেগ প্রশমিত ও প্রতিহত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত উপস্থিত সহচরবৃন্দকে লইয়া পর্বতের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন। শত্রুগণ এখানেও আক্রমণ করার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মুছলমানদিগের প্রস্তর বর্ষণের ফলে তাহারা সেখান হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। যাহা হউক, এই অবস্থায় জামাআত সহকারে নামায সম্পন্ন করা হইল। হযরত বসিয়া বসিয়াই এমামত করিলেন এবং ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট হইয়া নামাযে প্রবৃত্ত হইলেন—দাঁড়াইয়া নামায পড়ার শক্তি কাহারও ছিল না। তাহার পর আহতদিগের যথাসম্ভব সেবা-শুশ্রূষা হইতে লাগিল।

## মদীনার মহিলাগণ ময়দানে

'হযরত নিহত হইয়াছেন'—মদীনায় এই জনরব প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোছলেম পুরমহিলাগণ সমরক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। ওম্মে-আয়মন এই সময় জনৈক মুছলমানকে নগর অভিমুখে যাইতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—কাপুরুষ ! কোথায় যাইতেছ ? মদীনার পুরমহিলাগণ এছলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেছে, আর তোমরা পলায়ন করিতেছ ! "এই লও, আমার অস্ত্র তোমাকে দিতেছি, তোমার অস্ত্র আমাকে দাও।" বানি-দিনার বংশের আর একটি মহিলা উদাসিনী বেশে ছুটিয়া আসিতেছেন, এমন সময় কতিপয় মুছলমানের সাক্ষাৎ পাইয়া তিনি ব্যাকুল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংবাদ কি ?"

"সংবাদ আর কি বলিব—তোমার সহোদর নিহত হইয়াছেন।"

"ইন্না লিল্লাহে—আল্লাহ্ তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন ! আর কি সংবাদ— ?"

"তোমার স্বামী নিহত।"

"উহ—ইন্না লিল্লাহে, তাঁহার আত্মার কল্যাণ হউক ; আর কি সংবাদ— ?"

---

* বোখারী ও মোছলেম—ওহোদ, যৎ-মুন্নবারী ৭—২৬১, পেফা, হালবী প্রভৃতি।

"তোমার পিতা—"

"হায়, স্নেহময় পিতা নিহত। ইন্না লিল্লাহে, তাঁহার আত্মার কল্যাণ হউক। হযরতের সংবাদ কি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"ভদ্রে ! সংবাদ শুভ, হযরত জীবিত আছেন এবং ঐ তোমার সম্মুখ দিকে অবস্থান করিতেছেন।"

"আমাকে একবার দেখাও, সেই প্রাণপ্রতিম প্রিয়তম কোথায় ?" তখন মুছলমানগণ তাঁহাকে লইয়া হযরতের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। এতক্ষণে তাঁহার শান্তি হইল, এবং তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন ঃ كل مصيبة بعدك جلل তোমাকে পাইলে সব বিপদই নগণ্য।* পিতাগতপ্রাণ বিবি ফাতেমাও এই সকল সংবাদ পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখনও হযরতের ক্ষতস্থান হইতে শোণিতপাত হইতেছিল। হযরতের কপালে শিরস্ত্রাণের দুইখানি লৌহখণ্ড প্রবেশ করিয়াছিল, পাঠকগণ পূর্বেই এ সংবাদ অবগত হইয়াছেন। মহামতি আবু-ওবায়দা দাঁতে করিয়া তাহা তুলিয়া দেন, ইহাতে তাঁহার কয়েকটা দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার পর হযরত আলী ঢালে করিয়া পানি আনিতে লাগিলেন এবং বিবি ফাতেমা তাহা দ্বারা হযরতের ক্ষতস্থানগুলি ধৌত করিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছে না দেখিয়া, তিনি একটা চটাইয়ের টুকরা পোড়াইয়া সেই ভস্ম ক্ষতস্থানে প্রদান করিতে লাগিলেন, ইহাতে রক্ত বন্ধ হইয়া গেল।**

## নররাক্ষসীদিগের পশাচিক কাণ্ড

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ! একদিকে মোছলেম-কুল জননী বিবি আয়েশা প্রমুখ মহিলাগণ, স্নেহ ও করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিরূপে আহত ও আসন্নমৃত্যু সৈনিকগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সেবা করিতেছেন—তাহাদিগের শুষ্ক কণ্ঠে পানি প্রদান করিতেছিলেন,*** অন্যদিকে কোরেশ রাক্ষসিগণ নরপিশাচিনীরূপে সমরক্ষেত্রে তাণ্ডবনৃত্য করিয়া বেড়াইতেছিল। যেখানে তাহারা দেখিল—মুমূর্ষু মোছলেম সৈন্য এক গণ্ডূষ পানির জন্য ছটফট করিতেছে, তাহারা অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইল এবং অস্ত্রের দ্বারা খোঁচাইয়া তাহার জ্বালা-যন্ত্রণার নিরাকরণ করিল। এই সময় ও এই অবস্থাতে আবু-দোজানার তরবারি প্রধান রাক্ষসী হেন্দের মস্তকোপরি উত্তোলিত এবং সঙ্গে সঙ্গে সংবরিত হইয়াছিল। যুদ্ধাবসানের পরও রাক্ষসিগণ নিজেদের পাশব প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। এই সময় তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে বিচরণ করিয়া আহত ও নিহত মুছলমানদিগের নাক-কান কাটিয়া মালা গাঁথিতে এবং তাহা গলায় পরিয়া বীভৎস চীৎকার ও তাণ্ডবনৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হামজার মৃতদেহ সম্মুখে দেখিয়া হেন্দ প্রথমে তাহাকে পূর্বোক্তরূপে বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলিল—তাহার পর সেই লাশের বুকে বসিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ হৃৎপিণ্ডটা টানিয়া বাহির করিল, এবং বুভুক্ষু কুক্কুরীর ন্যায় তাহা চর্বণ করিতে লাগিল।****

## তাওহীদের প্রকৃত স্বরূপ

এই শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও কতিপয় মুছলমান বীর বিশ্বাস ও বীরত্বের পরকাষ্ঠা প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হন নাই। "হযরত নিহত হইয়াছেন" শুনিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন ঃ "হযরত একজন প্রেরণাপ্রাপ্ত রছুল ব্যতীত আর কিছুই নহেন। যদি তিনি মরিয়া যান অথবা নিহত হন, তাহা হইলে কি তোমরা তাহার প্রচারিত সত্যকে

---

* তাবরী ৩—২৭, হালবী প্রভৃতি।

** বোখারী, মোছলেম—ওহোদ।

*** বোখারী—মাগাজী।

**** বোখারী, আবু-দাউদ, এছাবা, ফৎহুলবারী ও সমস্ত ইতিহাস।

পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎপদে প্রত্যাবর্তন করিবে ?" আনাছ-এবন-নাজ্রর নামক জনৈক ভক্ত এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কতিপয় মোহাজের ও আনছার অবসন্ন অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রের একপ্রান্তে অধঃবদনে বসিয়া আছেন। আনাছ তাঁহাদিগকে এমনভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভর্ৎসনার স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—এ সময় তোমরা এখানে বসিয়া কি করিতেছ ? তাঁহারা একান্ত বিমর্ষ ও সন্তপ্ত স্বরে উত্তর করিলেন—"আর কি করিব, হযরত নিহত হইয়াছেন।" ছাহাবিগণের মুখে এই কথা শুনিয়া আনাছ সিংহগর্জনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন :

فماذا تصنعون بعده ؟ فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلعم

"তাহা হইলে এ জীবন রাখিয়া আর কি ফল ? যাও, যে কর্তব্য পালনের জন্য হযরত আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তোমরাও তাহার জন্য আপনাদিগকে বলিদান কর ;" এই কথা বলিতে বলিতে আনাছ ক্ষিপ্রগতিতে শত্রু-সৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুদ্ধের পর একটি লাশকে কেহ চিনিতে পারিলেন না—অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে তাঁহার সমস্ত শরীর এমনভাবে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে একজন মোছলেম মহিলা আঙ্গুলের বিশেষ চিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে চিনিয়া বলিলেন—"আমার ভাই আনাছ !" আদর্শ কর্মবীর আদর্শ ধর্মবীর আনাছ, ঈমানের ও এছলামের মূল তত্ত্বটি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। "হযরত মরিয়াছেন কিন্তু কর্তব্য ত মরে নাই ? হযরত নিহত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত সত্য ত নিহত হয় নাই। অতএব সেই কর্তব্য পালনের জন্য এবং সেই সত্যের সেবার নিমিত্ত নিজের ধনপ্রাণ লুটাইয়া দেওয়াই মুছলমানের কাজ।" আনাছ ইহা বুঝিয়াছিলেন এবং নিজের পুণ্যতম আদর্শের দ্বারা মুছলমানদিগকে তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন।*

বিভিন্ন সমরক্ষেত্রের দিকে দিকে আত্মোৎসর্গের এই মহিমময় চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এমন সময় কা'ব-এবন মালেক সর্বপ্রথমে হযরতকে দেখিতে ও চিনিতে পারিয়া সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন : "মুছলমান শুভসংবাদ—এই যে হযরত !!" কা'বের এই চীৎকার শুনিবামাত্র ভক্তগণের আড়ষ্টদেহে অনল প্রবাহের সৃষ্টি হইল, তাঁহাদিগের শিরায় শিরায় নবজীবনের তাড়িততরঙ্গ বহিয়া গেল এবং সকলে সেদিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশাল সমরক্ষেত্রের সকল প্রান্তে এই সংবাদ পৌঁছিতে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনেকেই এ শুভসংবাদের কথা জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক, নিকটবর্তী মুছলমানগণ হযরতের চারিদিকে সমবেত হইতে লাগিলেন।

## আবু-সুফিয়ান হতভম্ব

বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বারা-এবন-আজেব নামক প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবীর প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, যুদ্ধাবসানের পর আবু-সুফিয়ান মুছলমানদিগের নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"মোহাম্মদ তোমাদিগের মধ্যে আছেন ?, আবু-বাকর তোমাদিগের সঙ্গে আছেন ? ওমর তোমাদিগের সঙ্গে আছেন ?" কেহই এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ায় নরাধম উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"সব কয়টাই নিহত হইয়াছে !" হযরত ওমরের আর সহ্য হইল না, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—রে আল্লাহর শত্রু, তুই মিথ্যা কথা কহিতেছিস ? তোর দর্প চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ ইঁহাদের সকলকেই জীবিত রাখিয়াছেন। তখন আবু-সুফিয়ান হোবল ঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি করিল মুছলমানগণ আল্লাহর নামের জয়নিনাদে পর্বতপ্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিলেন। এই প্রকারে বলাবলির কথা কাটাকাটি করার পর আবু-সুফিয়ান সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।**

---

* বোখারী, মোছলেম, তিরমিজি, এছাবা এবং তাবরী, হলবী প্রভৃতি ইতিহাস

** বোখারী, যাদ্-মায়াদ—ওহোদ।

যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—আগামী বৎসর বদর প্রান্তরে আবার তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। হজরতের আদেশে মুছলমানগণও বলিলেন—বেশ কথা, আমরা এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করিলাম।*

আবু-সুফিয়ান মুখে এইরূপ প্রলাপ বকিল বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত হৃদয় অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আবু-সুফিয়ান বহুদর্শী যোদ্ধা এবং ধূর্ত বণিক। সে দেখিল—একদিকে সাত শত নিঃসম্বল মুছলমান, আর অন্যদিকে সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত তিন সহস্র কোরেশ সৈন্যের বিরাট বাহিনী। এই সামান্য সংখ্যক সৈন্যদিগের নিকট তাহাদিগের ঘৃণিত পরাজয়, মুছলমান তীরন্দাজ সৈন্যদলের মারাত্মক ভ্রম, সেই ভ্রমের জন্য আকস্মিকভাবে ভীষণ বিপদে বিপন্ন হইয়াও মোছলেম বীরবৃন্দের অসাধারণ শৌর্যবীর্য এবং আল্লাহ্‌র নামে তাঁহাদের অকাতরে আত্মদান—তাহার পর উভয়পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ প্রভৃতি ব্যাপার একে একে তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। সে ভাবিয়া দেখিল যে, প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে তাহাদিগেরই পরাজয় ঘটিয়াছে। এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুছলমানগণ আবার একত্র কেন্দ্রীভূত হইতেছেন। এই আহত শার্দুল দল আবার যদি সমবেতভাবে আক্রমণ করিয়া বসে, তাহা হইলেই সর্বনাশ! এই প্রকার সাতপাঁচ ভাবিয়া আবু-সুফিয়ান নিজে দলবলসহ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

## যুদ্ধের জয়-পরাজয়

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই যুদ্ধে মুছলমানগণ ভীষণভাবে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মুছলমানগণ যে নিজেদের ভুলের দোষে এই যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কোরেশদল যে মুছলমানদিগের তুলনায় অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, ইহার কোনও প্রমাণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। পক্ষান্তরে এই যুদ্ধে মুছলমানদিগের পরাজয় হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহাও সমর্থন করিতে পারিতেছি না। জিজ্ঞাসা করি, বিজয়ী কোরেশ সৈন্য পরাজিত মুছলমানদিগকে ধ্বংস না করিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গেল—কেন? আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই 'ভীষণ পরাজয়' সত্ত্বেও কোরেশগণ একটি মুছলমানকেও বন্দী করিতে পারে নাই—এমন কি, একজন আহত মুছলমান সৈনিকও তাহাদিগের হাতে বন্দী হন নাই। যুদ্ধে কোরেশপক্ষের বিজয়লাভ ঘটিয়া থাকিলে এরূপ হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর হইত না। ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, কোরেশপক্ষের মাত্র ২৩ জন সৈন্য নিহত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের এই বর্ণনাটির উপর আমাদিগের একবিন্দুও আস্থা নাই। এই অনাস্থার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা নিজ মুখে বলিয়াছেন যে, একা আমীর হামজার হাতে ৩১ জন কোরেশ সেনা নিহত হইয়াছিল। মুছলমান পক্ষে ন্যূনাধিক ৭০ জন বীর প্রাণপণে যুদ্ধ করার পর শাহাদত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের হাতে যে কত লোক নিহত হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মোছলেম বীরদলের প্রচণ্ড আক্রমণে তিন সহস্র কোরেশ সেনা পলায়নপর হইতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং মুছলমান পক্ষ শত্রু বিনাশে একটুও ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং এই সময়ও যে বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য হতাহত হইয়াছিল, তাহাতে তর একবিন্দুও সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কোরআনের বিখ্যাত টীকাকার ইবনে এবনে আব্বাছ বলিয়াছেন যে, "ওহোদ যুদ্ধে হজরতের যে প্রকার জয়লাভ হইয়াছিল—সেরূপ বিজয় আর কখনও ঘটে নাই।" তিনি ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه আয়াত হইতে নিজের অভিমত সপ্রমাণ করেন।**

যাহা হউক, ওহোদ যুদ্ধে ন্যূনাধিক ৭০ জন মুছলমান শাহাদত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

---

* তাবরী, হালবিয়া, এবন-হেশাম প্রভৃতি। ** জাদল-মাআদ ১—২৫০

ইহাদিগের মধ্যে আমীর হামজা ও অধ্যাপক মোছআব প্রমুখ পাঁচ-ছয়জন মোহাজের, অবশিষ্ট সকলেই আনছার। যুদ্ধাবসানের পর হযরতের আদেশে শহীদগণের লাশ সংগৃহীত হইল এবং তাঁহাদের সেই রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের কাফনে তাঁহাদিগকে দুই-তিনজন করিয়া এক কবরে সমাধিস্থ করা হইল। ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ও মুছলমানগণ শহীদদিগের জন্য জানাযার নামায পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। বোখারী প্রভৃতি বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থসমূহে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, শহীদগণের জানাযা পড়া হয় নাই।* এমাম শাফেয়ী বলিতেছেন যে, যে সকল ঐতিহাসিক ছহীহ্ ও মোতাওয়াতের হাদীছের স্পষ্ট সিদ্ধান্তের বিপরীত রেওয়ায়তগুলি বর্ণনা করিয়া জানাযা পড়ার কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের লজ্জিত হওয়া উচিত। আল্লামা বোরহানুদ্দীন হালবী ইমাম ছাহেবের এই উক্তি উদ্ধৃত করার পর, রাবীদিগের সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজন রাবী মোনকার ও মাউজু' হাদীছ বর্ণনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন।** হালবীর এই মন্তব্য যে খুবই সমীচীন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে কথা এই যে, এখানে জানাযার নামায সংক্রান্ত শরিয়তের একটা মছলার তর্ক উঠিয়াছে বলিয়া হালবী ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ ঐতিহাসিক বর্ণনার সূক্ষ্ম সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নচেৎ এই শ্রেণীর বহু অবিশ্বাস্য রাবীর ভিত্তিহীন গল্প-গুজবগুলিকে চোখ বন্ধ করিয়া আপনাদের ইতিহাস পুস্তকগুলিতে স্থান দান করিতে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এ সম্বন্ধে ভূমিকায় বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে।

হযরত শহীদগণের 'কাফন দাফন' শেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই মদীনায় পৌঁছিলেন। মাগরেবের নামায মদীনাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। নামাযের সময় হযরত স্বনামধন্য ছাআদ-যুগলের স্কন্ধে ভর দিয়া বাটী হইতে মছজিদে আগমন করিয়াছিলেন।***

## হামরাউল-আছাদ অভিযান

কোরেশের বিরাট বাহিনী কয়েক মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া "রাওহা" নামক স্থানে পড়াও করিল। এখানে কিংকর্তব্য সম্বন্ধে তাহাদিগের পরামর্শ হইতে লাগিল। আবু-সুফিয়ান, একরামা প্রভৃতি দলপতিগণ বলিতে লাগিল ঃ মোহাম্মদ আহত, তাহার অধিকাংশ ভক্তই আঘাত-জর্জরিত, এ অবস্থায় মদীনা আক্রমণ না করিয়া ফিরিয়া যাওয়া আমাদিগের পক্ষে কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। মুছলমানদিগকে সমূলে উৎপাটিত ও সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করার জন্যই আমরা এত উদ্যোগ-আয়োজন করিলাম, নিজেদের যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলিলাম। এখন তাহার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অথচ আমরা ফিরিয়া যাইতেছি। দুই দিন পরে তাহারা আবার সামলাইয়া উঠিলে, তখন আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল করা সহজসাধ্য হইবে না। আবু-সুফিয়ান প্রভৃতি আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদিগকে নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া আপনাদিগের দলে আনয়ন করিয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল—কি করিতে আসিয়াছিলাম আর কি করিয়া যাইতেছি ! মদীনা আক্রমণ করিয়া ধর্মের শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিব, মদীনার সমস্ত ধন-সম্পদ লুটিয়া লইব, তাহাদিগের যুবতী ও কুমারীদিগের সতীত্ব হরণ করিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি এসব কিছুই হইল না। আমাদিগকে উল্টা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। অতএব তাহারা সিদ্ধান্ত করিল—"মদীনা আক্রমণ করিতেই হইবে।" উমাইয়ার পুত্র ছফওয়ান ইহার প্রতিবাদ করিল বটে, কিন্তু কেহ তাহার কথা গ্রাহ্য করিল না। এই সমস্ত কোরেশ দলপতিগণ আপনাদিগের লোক-লস্করসহ মদীনার পথে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

---

* বোখারী, মছনদদারী প্রভৃতি।

** হালবী ২—২৪৮।

*** ওহোদ যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ, তিরমিজী, কানজুল-ওম্মাল, মছনদদারমী, এছাবা এবং তবকাত, এবন-হেশাম, তাবরী, হালবী, মাওয়াহেব ও জাদুল-মাআদ প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত হইল

বনি-খোজাআ গোত্রের প্রধান সমাজপতি মা'বাদ মুছলমানদিগের বিপদ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য মদীনায় যাইতেছিলেন। তাঁহার গোত্রের অনেক লোক তখনও এছলাম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু হযরতের ও মুছলমানগণের প্রতি তাহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। পথে মা'বাদ কোরেশ সৈন্যদিগের এই অভিসন্ধির বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং দ্রুতপদে মদীনায় আগমনপূর্বক হযরতকে তাহাদিগের এই সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাত করিলেন। হযরত তখনই মহাত্মা আবু-বাক্‌র ও ওমরকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন এবং স্থির হইল যে, আগামীকল্য প্রাতেই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। পাঠকগণ মুছলমানদিগের তৎকালীন অবস্থাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। অধিকাংশ ছাহাবী তীক্ষ্ণভাবে আহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ক্ষতস্থানগুলি হইতে তখনও রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে, ৭০ জন শহীদের শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের অশ্রুধারা তখনও স্থগিত হয় নাই,—এমন সময় ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে বেলালের কণ্ঠস্বর উচ্চতর আরাবে ঘোষণা করিল—"মোছলেম বীরবৃন্দ, প্রস্তুত হও। এখনই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে।" কোরেশ-বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছে, তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, মুছলমান এখনও মরে নাই, কখনও মরিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, গতকল্যের যুদ্ধে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, অদ্য কেবল তাঁহারাই যাত্রা করিতে পারিবেন।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মদীনার মোছলেম পল্লীটি নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। আহত মুছলমান বীরবৃন্দ 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া শয্যার উপর লাফাইয়া উঠিলেন। সব শোক সব সন্তাপ, সমস্ত জ্বালা সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা গতকল্যের রক্তরঞ্জিত অস্ত্রশস্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া লইলেন এবং সোৎসাহে হযরতের খেদমতে সমবেত হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মোছলেম-বাহিনী মদীনা ত্যাগ করিয়া গেল। হযরত পূর্ববৎ রণসাজে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন—আর সকলে পদাতিক।

পূর্ব কথিত মা'বাদ প্রত্যুষে মদীনা ত্যাগ করিয়া গেলেন। পথে আবু-সুফিয়ানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মা'বাদ আবু-সুফিয়ানের সমধর্মী, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"এই যে মা'বাদ, সংবাদ কি ?"

"সংবাদ আর কি, এখনও সরিয়া পড়, নচেৎ—"

"নচেৎ কি? মোহাম্মদ সম্বন্ধে কোন সংবাদ আছে না-কি?"

"আছে বৈ কি ! মোহাম্মদ বিপুল আয়োজনে অগ্রসর হইতেছেন। এবার মদীনার প্রত্যেক মুছলমানই যোগদান করিয়াছে।"

"সারে সর্বনাশ ! তুমি কি বলিতেছ? তাহাদিগের অবশিষ্ট শক্তিটুকুকে বিনষ্ট করিতে, তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মদীনার দিকে অগ্রসর হইতেছি, মোহাম্মদ প্রত্যুষে আবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে—ইহাও সম্ভব ? তুমি বলিতেছ কি ?"

"বলিতেছি তাহাই, এখনও মানে মানে সরিয়া পড়। মুছলমান-বাহিনী আসিয়া পড়িতে বেশী বিলম্ব নাই—পলাও।"

আবু-সুফিয়ান তখন সকলকে মক্কার পথে যাত্রা করার আদেশ প্রদান করিল, কোরেশ-বাহিনী আর কালবিলম্ব না করিয়া স্বদেশাভিমুখে ধাবিত হইল। এদিকে হযরত মোছলেম-বাহিনী লইয়া, মদীনা হইতে আট মাইল দূরবর্তী 'হামরাউল আছাদ' নামক প্রান্তরে উপনীত হইলেন এবং কয়েকদিন সেখানে অপেক্ষা করার পর মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন।*

## দুইজন বন্দীর প্রাণদণ্ড

ওহোদ যুদ্ধের পর আবুল ওজ্জা ও মাআবিয়া নামক দুইজন মক্কাবাসী মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদিগের বন্দী হওয়ার কারণ

* বোখারী, এবন-হেশাম, তাবকাত, কামেল, জাদুল-মাআদ প্রভৃতি।

বড়ই কৌতূহলজনক। কোন কোন রাবী বলেন যে, 'কোরেশ-বাহিনী প্রাতঃকালে 'হামরাউল আছাদ' পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আবুল ওজ্জা তখন ঘুমাইতেছিল, সে সময় তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। তাহার পর একপ্রহর বেলার সময় মুছলমানগণ সেখানে উপস্থিত হন এবং সেই অবস্থায় তাহাকে গ্রেফতার করেন।' তিন হাজার কোরেশ-সৈন্যের বিপুল বাহিনী, তাহাদিগের শত শত অশ্ব, উষ্ট্র এবং সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম গোছাইয়া লইয়া যাত্রা করিতেছে, সে সময়কার কোলাহলে আবুল ওজ্জার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, কেহ তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটানও সঙ্গত বলিয়া মনে করিল না ! তাহার পর বেলা একপ্রহর পর্যন্ত তাহার সে নিদ্রার অবসান হইল না— হস্তশত মুছলমান সৈন্যের আগমনেও তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। এই কুম্ভকর্ণের নিদ্রার কথা বিশ্বাস করিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

সে যাহা হউক, ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, হযরতের আদেশে আবুল ওজ্জা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই আবুল ওজ্জা পাঠকগণের বিশেষ পরিচিত মক্কার বিখ্যাত কবি। বদর যুদ্ধে কবিবর মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হন এবং হযরতের দয়া ভিক্ষা করিয়া বিনাপণে মুক্তিলাভ করেন। তাহার পর মক্কায় গিয়া ইনি যেরূপে নিজের চাতুরীর বাহাদুরী করিয়াছিলেন, এবং ওহোদ যুদ্ধের পূর্বে সমস্ত আরব গোত্রগুলিকে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া যে প্রকারে হযরতের অনুগ্রহের প্রতিদান করিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন নরাধমটিই ওহোদ সমরের প্রধান উদ্যোক্তা। এহেন নরাধমের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা সঙ্গত হইয়াছিল কি-না, পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

এই যুদ্ধের দ্বিতীয় বন্দী মাআবিয়া, ইহার প্রতিও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। মাআবিয়া না-কি যুদ্ধের পর "পথ ভুলিয়া" সোজা মদীনায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে যখন দেখিল যে, মুছলমানগণ তাহার এই ভুলের কথা উত্তমরূপে জানিতে পারিয়াছেন, তখন সে হযরত ওছমানের নিকট গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল। ওছমান গণি অতি বড় শত্রুকেও "না" বলিতে পারিতেন না। তিনি মাআবিয়াকে সঙ্গে লইয়া হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন এবং তাহার জন্য সুপারিশ করেন। হযরত বলিলেন—ইহাকে তিন দিন সময় দেওয়া হইল, তিন দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করিয়া না গেলে ইহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। কিন্তু এহেন কঠোর আদেশ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মাআবিয়া মদীনায় থাকিয়া গেল। হামরাউল আছাদ হইতে ফিরিয়া আসার সময়, অর্থাৎ এই আদেশের চার-পাঁচ দিন পরে, ছাহাবাগণ মদীনার শহরতলীর একটি পল্লীতে ইহাকে ধৃত ও নিহত করেন।

মাআবিয়া কোরেশের বিরাট বাহিনীটাকে আরবের উন্মুক্ত প্রান্তরে এমন সহজে হারাইয়া ফেলিল কি করিয়া ? সে মদীনার পথকে মক্কার পথ মনে করিয়া মদীনার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইল, তবুও তাহার এ ভ্রম ঘুচিল না ? তাহার পর প্রাণদণ্ডের কঠোর আদেশ শ্রবণ করা সত্ত্বেও সে মদীনাতেই থাকিয়া গেল কেন ? স্যার উইলিয়াম মুর যথেষ্ট গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন—'কোরেশ যথাসময়ে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কি করিবে—কুগ্রহ, সে আবার পথ ভুলিয়া মদীনায় চলিয়া আসিল।' প্রকৃত কথা এই যে, কোরেশগণ যে পুনরায় মদীনা আক্রমণ করিবে, ইহা স্থির হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মাআবিয়া প্রভৃতিকে গুপ্তচররূপে প্রেরণ করিয়াছিল। ইহারা মদীনার সমস্ত আবশ্যকীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কোরেশদিগের নিকট সেই সকল সংবাদ প্রেরণ করিতেছিল। এবন-আছির এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"হযরতের সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত মাআবিয়া মদীনায় অবস্থান করিতেছিল।" অন্যান্য ইতিহাসেও স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইয়াও মাআবিয়া তিন দিবস পর্যন্ত মদীনায় লুক্কায়িত থাকিয়া কোরেশদিগকে জানাইবার জন্য হযরতের সংবাদাদি সংগ্রহ করিতেছিল।*

* কামেল, এবন-হেশাম, হালবী প্রভৃতি।

ওহোদ যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থানাভাব, বোধ হয় তাহার বিশেষ আবশ্যকও নাই। সংক্ষেপে আমরা ইহার কয়েকটি ফলের কথা নিবেদন করিয়া এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিব।

প্রথম ফল ঃ হযরতের উপদেশ বিস্মৃত হওয়ার এবং আমীর ও সেনাপতির আদেশ অমান্য করার ফল যে পার্থিব হিসাবেও কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, মুছলমানগণ সে সম্বন্ধে সম্যক শিক্ষালাভ করিলেন।

দ্বিতীয় ফল ঃ সমস্ত আরব বিশেষতঃ কোরেশ দলপতিগণ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে, মুছলমানকে ধ্বংস করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

তৃতীয় ফল ঃ জেহাদের অগ্নি-পরীক্ষায় আসল ও মেকী অর্থাৎ মুছলমান ও মোনাফেকের বাছাই হইয়া গেল।

চতুর্থ ফল ঃ ওহোদ প্রাঙ্গণে উম্মতের জন্য কর্মযোগ ও শোণিত-তর্পণের অভিনব আদর্শ ও পুণ্যময় 'ছুন্নত' প্রতিষ্ঠিত হইল।

# ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

## চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী

### রাজী' প্রান্তরের শোণিত-তর্পণ

চতুর্থ হিজরীর ছফর মাসে আছেম-এবন-ছাবেত নামক ছাহাবীর নেতৃত্বাধীনে দশজন মুছলমানকে মক্কার পথে প্রেরণ করা হয়—পথে চৌকিপাহারা দেওয়ার এবং নূতন কোন বিপদ উপস্থিত হইলে মদীনায় তাহার সংবাদ প্রেরণ করার জন্যই এই গুপ্তচর দলটিকে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। পথে রাজী' নামক স্থানে উপনীত হইলে হোজেল বংশের দুই শত লোক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ইহাদিগকে আক্রমণ করে। মুছলমানগণ তখন 'বেগতিক' দেখিয়া নিকটস্থ পর্বতে আরোহণ-পূর্বক আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। আততায়িগণ তখন তাঁহাদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু মুছলমানদিগের ভাবগতিক দেখিয়া তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, প্রাণ থাকিতে ইহারা কখনই আত্মসমর্পণ করিবে না। এদিকে জীবিত অবস্থায় বন্দী না করিতে পারিলে, তাহাদিগের মূল উদ্দেশ্য সফল হয় না। কারণ তাহারা পূর্বেই স্থির করিয়াছিল যে, কয়েকজন মুছলমানকে কোন গতিকে বন্দী করিয়া ফেলিতে পারিলে, তাহাদিগকে কোরেশদিগের হস্তে সমর্পণ করিবে, এবং তৎবিনিময়ে—কোরেশ দলপতিগণের ঘোষণা অনুসারে—বহু মূল্যবান পুরস্কার লাভ করিবে, কোরেশের নিকট হইতে নিজেদের বন্দীদিগকে ছাড়াইয়া আনিবে। কাজেই তখন তাহারা ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে লাগিল—আমরা তোমাদিগকে হত্যা করিব না, তোমরা নামিয়া আসিয়া আত্মসমর্পণ কর। দলপতি আছেম তাহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি তোমাদিগের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকগণের প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। নরাধমগণ তখন মুছলমানদিগের উপর তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। দলপতি আছেম তখন সহচরবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আর দেখিতেছ কি? সাবধান, আমাদের একটি জীবন্ত দেহও যেন উহাদিগের হস্তগত না হয়, আল্লাহু আকবর, চালাও তলওয়ার

দলপতির আদেশমাত্র মুছলমানগণ উলঙ্গ তরবারি হস্তে আততায়ীদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহাদিগের সাতজন বীর শাহাদত প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা তখন খোবায়েব জায়েদ ও আবদুল্লাহ নামক অবশিষ্ট তিনজন মুছলমানকে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে লাগিল যে, আমরা তোমাদিগের কোন অনিষ্ট করিব না, তোমরা নামিয়া আইস, আমাদিগের একটা বিশেষ আবশ্যক আছে। অবশিষ্ট

মুছলমানগণ দুষ্টদিগের এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিয়া যেমন অস্ত্রত্যাগ করিলেন, অমনি তাহারা তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল, এবং দড়িদড়া বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিতে লাগিল। আবদুল্লাহ্ এই অবস্থা দেখিয়া বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত একজনের নিকট হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন—ইহা বিশ্বাসঘাতকতার পূর্বাভাস। আল্লাহর দিব্য, আমি ইহাদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিব না। বলা বাহুল্য যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই আবদুল্লাহকে নিহত হইতে হইল। তখন অবশিষ্ট দুইজন অর্থাৎ জায়েদ ও খোবায়েবকে লইয়া নরাধমগণ মক্কার পথে রওয়ানা হইয়া গেল। কোন কোন ঐতিহাসিক বিবরণে লেখা যায় যে, শেষোক্ত তিনজন ছাহাবী প্রথম হইতেই দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন এবং 'জীবনের মায়ায়' কাফেরদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সকল ঐতিহাসিক বর্ণনায় হেকাহেতার ছহীহ্ হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত অনেক ভিত্তিহীন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণটিও বোখারী, আবু-দাউদ প্রভৃতির উল্লিখিত হাদীছের বিপরীত, সুতরাং অবিশ্বাস্য।*

প্রকৃত কথা এই যে, দুইজন বীর কাফেরদিগের অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আততায়িগণ তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় বন্দী করিয়া ফেলে।** পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, দুষ্টগণ দুই শত যোদ্ধা লইয়া এই দশজন মুছলমানকে ঘেরাও করিয়াছিল। বোখারীর রেওয়ায়তে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা একশত তীরন্দাজ সৈন্য লইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং এই দুই জনের আহত হওয়া যে কতদূর স্বাভাবিক, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত মহামতি খোবায়েব প্রমুখ অতঃপর যে অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি এই দুর্বলতার দোষারোপ করা আদৌ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, নরাধমগণ বন্দীদ্বয়কে লইয়া যথাসময়ে মক্কায় উপস্থিত হইল এবং নিজেদের বন্দীদ্বয়ের বিনিময়ে তাঁহাদিগকে কোরেশদিগের হস্তে বিক্রয় করিয়া ফেলিল।

## জায়েদের আত্মত্যাগ

বন্দীদ্বয়কে মক্কার নরপিশাচদিগের হস্তে যে কি প্রকার নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কয়েকদিন অমানুষিক নির্যাতন ভোগের পর তাঁহাদিগের মুক্তির সময় নিকটবর্তী হইল। তখন একদা ছফওয়ান-এবন-উমাইয়া ও তাহার নাস্তাস নামক দাস, জায়েদকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহ বধ্যভূমিতে নীত হইতেছে—এই তামাশা দেখিবার জন্য মক্কার পিশাচপ্রকৃতি নরনারী এবং বালক-বালিকাগণ হৈ-চৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল। এই সময় আবু-সুফিয়ান তত্ত্বপ্রবর জায়েদকে আল্লাহর দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করিল : জায়েদ, সত্য করিয়া বল, এখন মোহাম্মদকে যদি তোমার স্থলে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করা হয়, আর তাহার বদলে তোমাকে মুক্তি দেওয়া যায়, তুমি তাহা পছন্দ করিবে? জায়েদ ভক্তিগদগদ কণ্ঠে গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—আবু-সুফিয়ান, তুমি কি বলিতেছ! আমি শতবারও প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি, কিন্তু হযরতের চরণে একটা কণ্টক বিদ্ধ হইলে তাহা সহ্য করিতে পারি না। তখন আবু-সুফিয়ান বলিয়া উঠিল :

والله ما رايت من قوم قط اشد حبا لصاحبهم من اصحاب محمد (صلعم) له

"আল্লাহর দিব্য, মোহাম্মদের অনুচরগণ তাঁহার প্রতি যে প্রকার প্রেম ও ভক্তি পোষণ করিয়া থাকে, জগতে অন্য কোন জাতির মধ্যে তাহার তুলনা নাই।" যাহা হউক, জায়েদ স্থিরচিত্তভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আবু-সুফিয়ানের আদেশে নাস্তাস তাঁহার গ্রীবাদেশে অস্ত্রাঘাত করিল এবং কলেমা তাওহীদ উচ্চারণ করিতে করিতে জায়েদ মাটিতে লুটাইয়া

---

* বোখারী, আবু-দাউদ, আল্-তেরমেজী হইতে 'রাজী' অভিযান দেখুন।
** আমীর আলী।

পড়িলেন। মক্কার পিশাচ-পিশাচিনিগণ চকিত-চমকিত চিত্তে এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এ দৃশ্য দর্শন করিল।*

## খোবায়েবের লোমহর্ষণ পরীক্ষা

মহামতি খোবায়েবও এতদিন বন্দী অবস্থায় অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার মুক্তির সময়ও নিকটবর্তী হইয়াছে। খোবায়েবের এখন তারী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। এ যে বড় সুখের বড় সাধের মরণ, অথচ এতদিন বন্দীখানায় পড়িয়া থাকায় তাঁহার নখ-চুল প্রভৃতি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তিনি জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে একখানা 'ক্ষুর' চাহিয়া লইয়া এই অস্বস্তি দূর করিলেন এবং যথাসম্ভব সাজিয়া-গুজিয়া মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

মক্কার বাহিরে তান্‌ইম নামক স্থানে 'ক্রুশ' স্থাপিত হইয়াছে। নগরে আজ মহাকোলাহল—খোবায়েবকে আজ নিহত করা হইবে। ক্রুশে আবদ্ধ বন্দী, অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে ছটফট করিতে করিতে তিলে তিলে প্রাণত্যাগ করে, সুতরাং আজিকার তামাশাটা খুব মজাদারই হইবে! তাই মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তানইমে সমবেত হইয়া বন্দীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সময় কোরেশ দলপতিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তখন ঈমানের নূর এবং বীরত্বের প্রভাবে খোবায়েবের বদনমণ্ডল তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। খোবায়েব চলিতেছেন—সে চরণে একটুও জড়তা নাই, খোবায়েব চাহিতেছেন—সে চাহনীতে একটুও আবিলতা নাই। এইরূপে ক্রুশের তলদেশে উপনীত হইয়া খোবায়েব থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং কোরেশদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার প্রাণ ভরিয়া সেই প্রাণপ্রতিমকে ডাকিয়া লই।' এই বলিয়া তিনি নামাজে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যথারীতি সুসৌষ্ঠবের সহিত দুই রাকআত নামাজ সমাপন করিয়া বলিলেন—আহা, কত তৃপ্তি, কত শক্তি, কত শান্তি এই প্রার্থনায়। আমার আরও দুই রাকআত নামাজ পড়ার সাধ হইতেছিল, কিন্তু তাহা হইলে তোমরা হয়ত মনে করিতে যে, খোবায়েব মরণের ভয়ে সময় লইতেছে, তাই আমি বিরত হইলাম। এখন আমি প্রস্তুত! তখন নরাধমগণ খোবায়েবকে ধরিয়া যথারীতি ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ ও আবদ্ধ করিয়া দিল, এবং ঘাতকগণ তাঁহার সর্বাঙ্গে বর্শা-বল্লম প্রভৃতির দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। পরীক্ষার এই কঠোরতম সময় তাহারা খোবায়েবকে বলিয়াছিল—এখনও এই নাস্তিকতার ধর্ম ত্যাগ করিয়া পৈতৃক ধর্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে এখনই মুক্তিদান করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে খোবায়েব বলিয়াছিলেন :

وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزع

এই সময় মহামতি খোবায়েব যে কবিতার দ্বারা নিজের অবস্থা ও মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বোখারী, ফৎহুলবারী, এবন-হেশাম প্রভৃতি হইতে নিম্নে তাহার কয়েকটি পদের ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি :

"তাহারা আমার চতুর্দিকে দলে দলে সমবেত হইয়াছে। সকল গোত্রের লোককে ডাকিয়া আনিয়া খুব সমারোহ করিতেছে।"

"তাহারা সকলেই বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছে, সকলেই আমার বিরুদ্ধে হস্তগহস্ত, আর আমি এই বধ্যভূমিতে বন্দী হইয়া আছি।"

"তাহারা নিজেদের স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকেও ডাকিয়া আনিয়াছে, আর আমি দৃঢ় ও উচ্চ ক্রুশ-কাষ্ঠের সন্নিধানে নীত হইয়াছি।"

"তাহারা আমাকে বলিতেছে—'ধর্ম ত্যাগ করিলে মুক্তি পাইবে', কিন্তু মরণ যে ইহা অপেক্ষা খুব সহজ। আমার নয়নযুগল অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কাপুরুষতার কলঙ্ক নাই।"

---

* বোখারী, এছাবা, এবন-হেশাম, তবরী, তবকাত প্রভৃতি।

"আল্লাহ্ আমাকে এই বিপদে ধৈর্যদান করিয়াছেন, দেখ, তাহারা টুকরা টুকরা করিয়া আমার শরীরের মাংস কাটিয়া লইয়াছে, আমার জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত প্রায়।"

খোবায়েব অবশেষে বলিতেছেন ঃ

فلست ابالى حين اقتل مسلما　　على اى شق كان فى الله مصرعى

وذلك فى ذات الاله وان يشأ　　يبارك على اوصال شلو ممزع !

"যখন মুছলমান-স্বরূপে মরিতে পারিতেছি, তখন যেরূপ অবস্থায় মৃত্যু হউক, তাহার ভাবনা আমার নাই।"

"আর প্রকৃত কল্যাণ প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলে আমার দেহের প্রত্যেক কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিতে পারে !"*

পাঠক ! একবার স্থির হইয়া সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করিয়া দেখুন ! ধৈর্যের, ঈমানের এবং আল্লাহ্‌র উপর আত্মনির্ভরের এমন মহিমাপূর্ণ দৃশ্য—এমন কল্যাণময় আদর্শ জগতের ইতিহাসে অতি বিরল, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাইবেলের কথিত মতে, এই ঘটনার দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর পূর্বে যীশুখ্রিষ্টকেও না-কি এইরূপে ক্রুশে আবদ্ধ করিয়া নিহত করা হইয়াছিল**, কিন্তু ইতিহাস হিসাবে এই সকল লেখার কোন মূল্য নাই, সুতরাং তাহার উপর মোটেই আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐগুলিকে ক্ষণিকের জন্য বিশ্বস্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও, বাইবেল যীশুর এই সময়কার চাঞ্চল্য ও দুর্বলতার যে চিত্রখানা দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে, খোবায়েবের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। বাইবেলের যীশু মৃত্যু বিভীষিকা দর্শনে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

ايلى ! ايلى الما سبقتنى ؟

"হে আমার প্রভু, হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করিলে ?" আর ক্রুশে আবদ্ধ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দেহ হইতে কর্তিত হওয়ার পরও খোবায়েব কি বলিতেছেন, আমরা তাহা পূর্বেই অবগত হইয়াছি। বাইবেলের এই কথিত আদর্শকে সম্বোধন করিয়া খোবায়েবের প্রত্যেক দেহচ্যুত মাংসখণ্ড যেন উচ্চ নিনাদে বলিতেছিল ঃ

عمرے ست کہ آوازۂ منصور کہن شد　من از سر نو جلوہ دہم دار و رسن را!

খোবায়েব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার চরণের একজন দাস মাত্র। যাঁহার শিক্ষা ও সাহচর্যের ফলে জায়েদ ও খোবায়েবের ন্যায় শত-সহস্র মহামানবের উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি কত মহান কত মহিমাময়—আশা করি, আলোচনার সময় আমাদের নিরপেক্ষ পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হইবেন না।

## শত্রুপক্ষের ভীষণ ষড়যন্ত্র

এই মাসে আমের নামক এক ব্যক্তি হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—কতকগুলি উপযুক্ত লোক আমাদিগের দেশে পাঠাইয়া দিন, তাঁহারা সকলকে এছলামের মহিমা বুঝাইয়া দিলে বিস্তর লোক মুছলমান হইতে পারে। আমেরের কথা শুনিয়া হযরত বলিলেন—নাজ্‌দবাসিগণ ইহাদিগের অনিষ্ট করিতে পারে, তাহার উপায় কি? তখন আমের প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল, আমরাই সে দেশের প্রধান ; সকলে আমাদিগের কথা অনুসারে কাজ করে। আমি ইহাদিগের ভার গ্রহণ করিতেছি, অতএব আশঙ্কার কোন কারন নাই। আমেরের কথার উপর

---

* বোখারী, আবু-দাউদ, ফৎহুলবারী,—হাদী।

** মুছলমানেরা বলেন—ঈছা ক্রুশে নিহত হন নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে অনেকেই এখন এই মতের সমর্থন করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে লিখিত Rational Press Association কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।

বিশ্বাস করিয়া হযরত সত্তরজন বিশিষ্ট আনছার দ্বারা একটি মিশন গঠন করিয়া আমেরের সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিলেন। এই মহাজনগণ দিনের বেলায় কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন এবং সেই আয় দ্বারা 'আছ্‌হাবে ছোফ্‌ফা'র উদাসীন সাধকগণের জন্য অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেন। রাত্রিকালে তাঁহারা কোরআন অধ্যয়ন-অধ্যাপন এবং উপাসনা ও নামাযে ব্যাপৃত থাকিতেন। এহেন সেবক ও সাধক মহাজনগণের দ্বারা গঠিত এছলামের এই প্রথম 'মিশন' বীরমাউনা নামক স্থানে উপস্থিত হইলে এই আমের এবং তাহার স্বগোত্রস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। মুছলমানগণ প্রথমে আমেরের নিকট হারামকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। আমের কোন কথা না বলিয়া ঘাতককে ইঙ্গিত করা মাত্র, সে পশ্চাৎদিক হইতে এমন জোরে বর্শার আঘাত করে যে, হারাম সেই আঘাতের ফলে ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠেন। এই সময় তিনি চীৎকারপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন— فزت ورب الكعبة 'আমি সিদ্ধকাম হইলাম— আল্লাহ্‌র দিব্য।' হারামকে শহীদ করার পর আমেরের ইঙ্গিতে চারিদিক হইতে বহু লোকজন আসিয়া এই নিরীহ সেবকগণকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। একমাত্র কা'ব-এবন-জায়েদ মুমূর্ষু অবস্থায় কিছুকাল সেখানে পড়িয়া থাকার পর দৈবক্রমে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। রাজী' ও বীরমাউনার বিপদ সংবাদ একই সময় মদীনায় পৌঁছিয়াছিল।*

## ইহুদীদিগের ষড়যন্ত্র

মক্কার কোরেশগণ—মদীনার পৌত্তলিক ও ইহুদীদিগের সহিত যে ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। বদর যুদ্ধের পর কোরেশগণ বুঝিতে পারিল যে, আবদুল্লাহ্‌-এবন-ওবাই প্রভৃতি কপটগণ মুখে যতই আস্ফালন করুক না কেন, একটা বড় কাজ গড়িয়া তোলার অর্থাৎ মদীনার অন্তর্বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করার শক্তি তাহাদিগের নাই। তাই তাহারা এখন ইহুদীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল।' 'তখন নাজির গোত্রের সমস্ত ইহুদী পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, তাহারা মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিবে।' বিদ্রোহের পরামর্শ স্থির হইয়া যাওয়ার পর তাহারা মতলব আঁটিয়া হযরতকে বলিয়া পাঠাইল যে—আপনার সহিত আমাদিগের ধর্ম্ম লইয়াই যত মতভেদ, ইহার একটা মীমাংসা আমরা করিয়া লইতে চাই। অতএব আপনি ত্রিশজন মুছলমানকে লইয়া আসুন, আমরাও ত্রিশজন ইহুদী পণ্ডিত লইয়া যাইতেছি। উভয় দল কোন মধ্যস্থলে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হউক ! যদি আমাদিগের পণ্ডিতরা আপনার ধর্ম্মের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা সকলে এছলাম গ্রহণ করিব। ইহুদীদিগের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া হযরত তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন—তোমরা একটা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া না দিলে তোমাদিগের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। এই সময় বানি-কোরেজা নামক ইহুদী গোত্র মুছলমানদিগের সহিত সন্ধি করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তাহারা আর কখনও শত্রুপক্ষের সহিত কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না, তাহাদিগকে কোন প্রকারে সাহায্য করিবে না এবং কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। হযরত বানি-নাজির বংশের ইহুদীদিগকেও এই প্রকার সন্ধিশর্তে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহারা এ-কথাটা চাপা দিয়া বলিয়া পাঠাইল—যত গণ্ডগোল এক ধর্ম্ম লইয়া। আপনি আমাদিগকে স্বধর্ম্মের সত্যতা বুঝাইয়া দিন, আমরা সকলেই মুছলমান হইয়া যাইতেছি। তাহা হইলে আর সন্ধিপত্রের কোন আবশ্যকই থাকিবে না। আপনার বিশ্বাস না হয়, আমরা মাত্র তিনজন পণ্ডিত পাঠাইতেছি, আপনি আর দুইজন মুছলমানকে সঙ্গে লইয়া আগমন করুন। আপনি এই তিনজনকে এছলামের সত্যতা বুঝাইয়া দিতে পারিলে আমরা সকলেই এছলাম গ্রহণ করিব।

---

* বোখারী, মোছলেম, ফৎহুলবারী, এবন-হেশাম প্রভৃতি।

## হযরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

তখন হযরতও এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং দুইজন ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া নির্দিষ্ট স্থানের দিকে যাত্রা করিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইবে, সুতরাং কেহ অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইলেন না। পক্ষান্তরে ইহুদিগণ বস্ত্রের মধ্যে খঞ্জর, খড়্গ প্রভৃতি শরধার অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া লইয়া বহির্গত হইল। সমস্ত ইহুদীই যে এই সময় প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এছলামের পূর্বে আওছ ও খাজরাজ বংশের সহিত মদীনার ইহুদীদিগের বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রথা প্রচলিত ছিল। জনৈক আনছারের ভগ্নী মদীনার একজন বিশিষ্ট ইহুদীর সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। তিনি এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া, গোপনে তাঁহার ভ্রাতাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিলেন। আবু-দাউদ باب خبر النضير অধ্যায়ে জনৈক ছাহাবী কর্তৃক একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, এবং হাফেজ ও এবন-হাজর, ফৎহুলবারী গ্রন্থে মোহাদ্দেছ এবন-মর্দওয়াহ্ কর্তৃক বর্ণিত আর একটি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই হাদীছটি যে ছহীহ্ ছনদ সহকারে বর্ণিত, এবন-হাজর তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই দুইটি হাদীছ হইতে উপরের বর্ণনাগুলি সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ প্রভৃতি বিশ্বস্ত হাদীছ গ্রন্থসমূহে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, নাজির ও কোরেজা গোত্রের ইহুদিগণ حارب رسول الله صلعم হযরতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।* মুছা এবন-ওকাবা বর্তমান মাগাজী লেখকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিতেছেন ঃ

كانت النضير قد دنوا الى قريش وحضوهم على قتال رسول
الله صلعم ودلوهم على العورة -

অর্থাৎ নাজির বংশ কোরেশের সহিত দুরভিসন্ধি ও গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, কোরেশকে হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল এবং তাহাদিগের সমস্ত গোপনীয় বিষয় জানাইয়া দিয়াছিল।** কোরআন শরীফের ছুরা হাশরে ইহুদী ও কপটদিগের এই সকল দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের কথা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই ছুরার প্রাথমিক আয়াতগুলিতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহুদিগণ নিজেদের সুদৃঢ় দুর্গমালার ভরসায় হযরতের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল।

## ঐতিহাসিকগণের বিপরীত বর্ণনা

কোরআন, হাদীছ ও বিশ্বস্ত ইতিহাস হইতে উপরে যে বিবরণ উদ্ধৃত হইল, এবন-এছহাক প্রমুখ কয়েকজন ঐতিহাসিক ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত রেওয়ায়ৎ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ছনদহীন রেওয়ায়তের সারমর্ম এই যে, আমর-এবন-উমাইয়া বীরমাউনার ঘটনার পর কেলাব বংশের দুইজন লোককে ভ্রমক্রমে হত্যা করিয়া ফেলেন। নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে (এখানেও অনেক মতভেদ—হালবী দেখুন) বানি-নাজিরদিগের পল্লীতে গমনপূর্বক হযরত একটি বাটীর প্রাচীরমূলে উপবেশন করেন। এই সময়—এদিকে পরস্পরে কথাবার্তা হইতেছে, ওদিকে ইহুদিগণ হযরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। স্থির হইল যে, একজন লোক বড় একখানা পাথর লইয়া তাহা ছাদ হইতে হযরতের মাথার উপর ফেলিয়া দিলে, তাহা হইলেই তাহাদিগের মনস্কাম সিদ্ধ হইবে। ইহুদিগণ ইহার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় হযরতের নিকট আছমান হইতে সংবাদ আসায় তিনি চুপ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। তাহার পর সকলকে এই 'আছমানের খবরের' বিষয় অবগত করাইয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগের দুর্গাদি অবরোধ

---

* মোহাদ্দেছ আবদুর রাজ্জাক (তাঁহার তাফছীরে) এবং আব্দ-এবন-হামিদও এই হাদীছটি রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন। দেখুন দুররুল মনছুর প্রভৃতি।     ** ফৎহুলবারী হইতে।

করার আদেশ প্রদান করিলেন। খৃষ্টান লেখকগণ এই সকল ভিত্তিহীন বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন যে, মোহাম্মদ এই প্রকারে আছমানের দোহাই দিয়া নাজিরীয় ইহুদীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার একটা বাহানা বাহির করিয়া লইলেন। প্রকৃতপক্ষে এই দোষারোপের অন্য কোন প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্যার উইলিয়ম মুর (IV. 308) এই প্রসঙ্গে মনের সাধ মিটাইয়া ঝাল ঝাড়িয়া লইয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা মাগাজী লেখকগণের ভিত্তিহীন কিংবদন্তীগুলির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছি না। উপরি বর্ণিত ছহীহ্ হাদীছগুলি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে, এবন-এছহাক প্রভৃতির সঙ্কলিত রেওয়ায়তগুলির কোনই মূল্য নাই। ইহুদিগণ হযরতকে হত্যা করার জন্য যে ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহা যে হযরত 'জমিনের' সংবাদেই অবগত হইয়াছিলেন, উপরের বর্ণিত হাদীছ দ্বারা তাহাও সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

## হযরতের উদারতা এবং ইহুদিগণের ধৃষ্টতা

এহেন নীচ ষড়যন্ত্র এবং ভীষণ শত্রুতাচরণের সময়ও হযরত—বর্তমান যুগের সভ্যতম গভর্নমেন্টগুলির ন্যায়—তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন না, অথবা বিনাবিচারে তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করার কিংবা তাহাদিগের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ার আদেশও প্রদান করিলেন না। তিনি তাহাদিগকে নূতন করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহুদিগণ তখন প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণার উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত—তাহারা একদিকে নানা প্রকার বাহানা করিয়া কালক্ষেপণ করিতে চাহিল, অন্যদিকে মদীনার পৌত্তলিক ও কপটগণের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করিয়া লইতে লাগিল। হযরত এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া আর কালবিলম্ব করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি জনৈক দূতের মুখে ইহুদীদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমাদিগের সমস্ত দুরভিসন্ধি আমরা অবগত হইয়াছি। স্বদেশের শান্তি এবং স্বজাতির ধনপ্রাণ ও মান-সম্ভ্রম বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত করার জন্য তোমরা চেষ্টার ত্রুটি করিতেছ না। আমরা পুনঃ পুনঃ সন্ধির প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তোমরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলে না। এ অবস্থায় তোমাদিগকে মদীনায় থাকিতে দেওয়া আমাদিগের পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। অতএব তোমাদিগকে আদেশ করা যাইতেছে যে, তোমরা অনতিবিলম্বে মদীনার বাহিরে চলিয়া যাও।

মদীনার মোনাফেকগণ তখন ইহুদীদিগকে বলিয়া পাঠাইল ঃ "খবরদার, নগর ত্যাগ করিও না। আমাদিগের দুই সহস্র যোদ্ধা প্রস্তুত হইয়া আছে। আমরা জীবনে-মরণে কোন অবস্থায় তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। নগর ত্যাগ করিতে হয়, আমরা তোমাদিগের সঙ্গে গমন করিব। তোমরা তিষ্ঠিয়া থাক, আমরা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি, বানি-কোরেজার সমস্ত ইহুদী আমাদিগের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।"* এই প্রকার উৎসাহ পাইয়া নাজিরীয় ইহুদিগণের স্পর্ধার অবধি রহিল না। তাহারা হযরতকে বলিয়া পাঠাইল ঃ 'আমরা তোমার কোন কথাই শুনিতে চাহি না, তোমার যাহা সাধ্য হয়, করিতে পার।' ইহুদী দূতের মুখে এই 'আলটিমেটম' প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই হযরত গাত্রোত্থান করিলেন, এবং মুছলমানগণকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে ইহুদীদিগের পল্লী ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। ইহুদিগণ তখন পল্লীর প্রবেশদ্বারাদি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিয়া সুরক্ষিত দুর্গগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা মনে করিতে লাগিল, মদীনার দুই হাজার সৈন্য আর বানি-কোরেজার বহুসংখ্যক যোদ্ধা এখনই আসিয়া পড়িবে। তখন মুছলমানগণ বুকে-পিঠে আক্রান্ত হইয়া নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে। কিন্তু কাপুরুষগণের এই প্রকার নীচ ষড়যন্ত্র যে কখনই সফলতালাভ করিতে পারে না, তাহা তাহারা জানিত না।

---

* সূরা হাশরের ২য় রুকুতে এই উৎসাহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, দূত-মুখে ইহুদীদিগের চরম কথা শ্রবণ মাত্রই হযরত তাহাদিগের পল্লী বেষ্টনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। কপটিগণ একে স্বভাবতঃ কাপুরুষ, তাহার উপর হযরতের এই ক্ষিপ্রকারিতার ফলে তাহারা দলবদ্ধ হওয়ারও সুযোগ পাইল না। পক্ষান্তরে অনতিকাল পূর্বে হযরত কোরেজা বংশের ইহুদীদিগকে নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। কাজেই বহুদিনের অপেক্ষা ও অবরোধের পর তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িল এবং একজন দূত পাঠাইয়া হযরতের নিকট প্রস্তাব করিল যে, আমরা তোমার পূর্বেকার আদেশ মানিয়া লইয়া মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, আমাদিগকে মুক্তি দাও। বলা বাহুল্য যে, বহুদিনের অবরোধের ফলে দুর্গে অবস্থান করা এখন আর তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় হয় ক্ষুৎপিপাসায় না হয় মুছলমানদের অস্ত্রে সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত তাহাদিগের গত্যন্তর ছিল না। হযরত তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার দণ্ড বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অধিকন্তু অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত আর সমস্ত ধন-সম্পদ এবং তৈজসপত্র সঙ্গে লইয়া যাওয়ার অনুমতিও তাহাদিগকে প্রদান করিলেন—এজন্য তাহাদিগকে দশ দিনের সময় দেওয়া হইল। ইহুদিগণ ছয় শত উট বোঝাই দিয়া নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ লইয়া বহির্গত হইল। ইহা ব্যতীত মাথা মোটে যাহা গেল, তাহা স্বতন্ত্র। ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহুদিগণ ঘরের জানালা-দরওয়াজা ও ছোট ছোট কাঠের টুকরাগুলি পর্যন্ত কুড়াইয়া লইয়া যাইতেও বিস্মৃত হয় নাই। যাহা হউক, ইহুদিগণ দশ দিন পরে যথেষ্ট সমারোহ সহকারে মদীনা হইতে বহির্গত হইল।*

## এছলামের উদার ব্যবস্থা

এছলামের পূর্বে মদীনার মৃতবৎসা স্ত্রীলোকেরা 'মানস' করিত যে, তাহাদের সন্তান বাঁচিলে তাহারা তাহাকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করিবে। বানি-নাজির বংশের ইহুদিগণ যখন মদীনা হইতে দেশান্তরিত হয়, তখনও আনছারদিগের এরূপ কতিপয় পুত্র ইহুদী সমাজভুক্ত হইয়াছিল। তখন একদিকে আনছারগণ বলিতে লাগিলেন—আমরা আমাদিগের পুত্রগুলিকে ইহুদীদের সঙ্গে যাইতে দিব না। অন্যদিকে ইহুদীরা বলিতে লাগিল—ইহারা আমাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে, অতএব আমরা উহাদিগকে ছাড়িয়া যাইব না। কোরআনের নিম্নলিখিত আয়তটি সেই সময় অবতীর্ণ হইল ঃ

لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي

"ধর্ম সম্বন্ধে জোর-জবরদস্তি (সঙ্গত) নহে, বিপথের মধ্য হইতে সৎপথ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।" এই আয়ৎ অনুসারে হযরত বলিলেন—ঐ যুবকগুলি নিজেদের স্বাধীন মতানুসারে কাজ করুক—তাহারা ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সমাজে প্রবেশ করিতে পারে। আর যদি তাহারা ইহুদী ধর্মকে পছন্দ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখার অধিকার তোমাদের নাই।**

ইহা ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউওল মাসের ঘটনা। একদল পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, পূর্বে এই আয়ৎ অনুসারে কাজ হইত বটে, কিন্তু জেহাদের আয়ৎ অবতীর্ণ হওয়ার পর এই আয়ৎ মনছুখ অর্থাৎ ইহার আদেশ রহিত হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখানে অসম্ভব। তবে পাঠকগণকে সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, তাঁহাদের বর্ণিত জেহাদের আয়তটি বদর যুদ্ধের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল, আর আলোচ্য আয়তটি—আবু-দাউদের বর্ণিত এই হাদীছ অনুসারে—৪র্থ হিজরীর প্রথম ভাগে অবতীর্ণ হয়। অতএব উল্লিখিত পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যে অসঙ্গত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

---

* তাবরী, হালবী, এবন-এছহাক প্রভৃতি। ** আবু-দাউদ ২—৯, আওনুল-মাবুদ ৩—১১। লাবাব দুররে মনছুর ১—৩২৯। এবন-হাব্বান, বায়হাকী প্রভৃতি।

## মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা

মাদকদ্রব্য ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা এই সময় প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা হঠাৎ একদিনে প্রচারিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে পর পর কোরআনের তিনটি আয়াৎ অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম আয়াতে এইমাত্র বলিয়া দেওয়া হয় যে, সুরা শয়তানের একটা জঘন্য প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই আয়াৎ অবতীর্ণ হইলে আরবের চিরাচরিত সংস্কারে আঘাত লাগিল এবং বিবেকের সহিত তাহার সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া গেল। ইহার কিছুকাল পরে আদেশ হইল যে, মদমত্ত অবস্থায় কেহ নামায পড়িতে পারিবে না। নামায না পড়িলে নয়—তাহা ব্যতীত মুছলমান মুছলমানই থাকিতে পারে না, অথবা মদের মোহ পরিত্যাগ করাও সহজ নহে। কাজেই তখন নামাযের সময় বাদ দিয়া মদ্যপানের চেষ্টা হইতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইতে এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত পাঁচবার নামায পড়া একেবারে অপরিহার্য। কাজেই দিবাভাগে মদ্যপানের সুযোগ ঘটা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। এই প্রকারে আরও কিছুকাল জনসাধারণকে সংযমে অভ্যস্ত করার পর একদিন আদেশ প্রদত্ত হইল—সকল প্রকার মদ ও মাদকদ্রব্য অবশ্য পরিহার্য—হারাম। মদ্যের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ, মদ্যপায়ীকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। মদের সঙ্গে সঙ্গে জুয়া-ব্যভিচারাদিরও মূলোৎপাটন করা হইয়াছিল। এছলাম কি প্রকারে 'শয়তানের জঘন্য প্রতিষ্ঠানের' সংস্কার করিয়াছিল, কিরূপে সুনীতি, সুরুচি ও মনুষ্যত্বকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কোরআনের তফছীরে তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করার ইচ্ছা রহিল।

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই সনে হযরত আলীর প্রথম পুত্র ইমাম হাসানের জন্ম হইয়াছিল।

# একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

## সমস্ত আরব গোত্রের সমবেত শত্রুতা

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে—ওহোদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবু-সুফিয়ান মুছলমানদিগকে ধমকাইয়া গিয়াছিল—আগামী বৎসর বদর-প্রাঙ্গণে আবার যুদ্ধ হইবে। ওহোদ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহারা এ সম্বন্ধে যুক্তি-পরামর্শ করিয়া স্থির করিল—সমস্ত আরবের সমবেত শক্তি লইয়া মদীনা আক্রমণ করিতে হইবে। সেজন্য এত দম্ভ সত্ত্বেও তাহারা চ্যালেঞ্জ মত বদরে আগমন করে নাই। একে স্বাভাবিক ধর্ম বিদ্বেষ, তাহার উপর কোরেশ ও ইহুদীদিগের উত্তেজনা, কাজেই অল্পকালের মধ্যে সমগ্র হেজাজ প্রদেশ মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং পঞ্চম হিজরীর প্রথম হইতে তাহার কেন্দ্রে কেন্দ্রে সৈন্য সঞ্চয় ও রণসজ্জা আরম্ভ হইয়া গেল। হযরতও চারিদিকে দূত ও গুপ্তচর পাঠাইয়া সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে লাগিলেন। সুখের বিষয় এই যে, এই সকল আপদ-বিপদের মধ্যেও মদীনার নিকটবর্তী পল্লীসমূহে ধীরে ধীরে এছলামের প্রসার বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

## দুমা অভিযান

মুছলমানগণ তখন সদাসতর্কভাবে অবস্থান করিতেছেন—প্রতি মুহূর্তেই আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, দুমাতলজন্দল প্রদেশের অধিবাসীরা বাণিজ্যপথে লুটতরাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহারা মদীনা আক্রমণ করার জন্যও প্রস্তুত হইতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর কয়েক শত মুছলমানকে সঙ্গে লইয়া হযরত সেদিকে অগ্রসর হন এবং দুই-এক দিন বাহিরে অবস্থান করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসেন। মুছলমানগণ

যে প্রস্তুত হইয়া আছেন, ইহা প্রদর্শন করাই এই শ্রেণীর অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।*

## বানি-মোস্তালেক বংশের উত্থান

পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে মদীনায় সংবাদ পৌঁছিল যে, বানি-মোস্তালেক বংশের সমস্ত লোক রণসজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। অন্যান্য গোত্রের বহু লোকও তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দিতেছে। বলা বাহুল্য যে, হেজাজের সমস্ত পৌত্তলিক, সমস্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টান এবং সমস্ত কপট সমবেতভাবে মদীনা আক্রমণের যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, এগুলি তাহার পূর্বাভাস মাত্র। যাহা হউক, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হযরত বোরায়দা-এবন-হোছায়েব নামক জনৈক বিশিষ্ট ছাহাবীকে ইহার তদন্তের জন্য নিযুক্ত করিলেন এবং ইঁহার মুখে যখন জানিতে পারিলেন যে, সংবাদটি সত্য, তখন হযরত কয়েক শত মুছলমানকে লইয়া মদীনা হইতে বহির্গত হইলেন।

এই অভিযান ২রা শা'বান তারিখে মদীনা ত্যাগ করে। এবার কতকগুলি কপট মুছলমানও এই অভিযানের সঙ্গে গমন করিয়াছিল। বানি-মোস্তালেক গোত্রের দলপতিগণ মদীনার সংবাদাদি সংগ্রহের জন্য যে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিল, ঘটনাক্রমে মুছলমানগণ তাহাকে পথিমধ্যে বন্দী করিয়া ফেলেন। কাজেই বিদ্রোহীরা হযরতের যাত্রার সংবাদ আগে জানিতে পারে নাই। তাহারা হঠাৎ দেখিল যে, মোছলেম-বাহিনী একেবারে মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তখন সে অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া অন্যান্য গোত্রের আরবগণ অবিলম্বে সরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মোস্তালেক গোত্রের বহু যোদ্ধা মোরায়ছি' নামক জলাশয়ের নিকট সমবেত হইয়া মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিল এবং বহু শত লোক তীর নিক্ষেপ করিয়া মোছলেম-বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন হযরতও মোছলেম-বাহিনীকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করিয়া লইলেন এবং অল্পক্ষণ পরে সাধারণ আক্রমণের আদেশ প্রদান করিলেন। শত্রুপক্ষ এই আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় তাহাদিগের শতাধিক পরিবারের বহু নরনারী মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হইল। তাহাদিগের দুই সহস্র উট ও পাঁচ সহস্র ছাগ-মেষাদি পশুও মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল।** মোস্তালেক বংশের খোজাআ গোত্রের প্রধান দলপতি হারেছ। এই হারেছের কন্যাও এই সঙ্গে বন্দী হইয়াছিলেন।

## হযরতের অনুপম করুণা

বন্দিগণ যথাসময় মদীনায় আনীত হইলে হযরত তাহাদিগের দুরবস্থা দর্শনে যারপর-নাই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদিগের মুক্তির উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। দলপতি হারেছের কন্যা জোওয়ায়রিয়ার জন্যও একটা মুক্তিপণ নির্ধারিত হইয়াছিল। তিনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আমি মুছলমান—এই পণ দিবার সাধ্য আমার নাই। আপনি ইহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিন। জোওয়ায়রিয়া প্রকাশ্যভাবে বলিতেছেন যে, তিনি মুছলমান, অধিকন্তু তিনি সাহায্য ভিক্ষা করার জন্য হযরতের নিকট আগমন করিয়াছেন। এদিকে অন্যান্য বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার জন্যও হযরত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। এই সময় হারেছও হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যার মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। হযরত হারেছকে বলিলেন—আপনি আপনার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তিনি যাহা বলেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। কিন্তু জোওয়ায়রিয়া তাঁহার পিতাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন—"আমি মুছলমান, হযরতের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আমি আর কোথাও যাইব না।" তখন হযরত নিজেই তাঁহার পক্ষ হইতে মুক্তিপণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিলেন। হারেছের মদীনায় অবস্থানকালেই হযরতের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইয়া যায় এবং সেই মতে দাসী ও বন্দিনী জোওয়ায়রিয়া অচিরাৎ হযরতের সহধর্মিণী পদে বরিত হইলেন।

---

* তাবরী, এবন-হেশাম প্রভৃতি। ইহা রবিউল আউওল মাসের ঘটনা।

** বোখারী, মোছলেম, ফৎহুলবারী, জাদুল মাআদ প্রভৃতি।

মোস্তালেক গোত্রের শতাধিক পরিবারের সমস্ত নর-নারী ও বালক-বালিকা এবং তাহাদিগের সমস্ত ধন-সম্পদ মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল, এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই সমস্ত বন্দী পরিবারের পক্ষ হইতে মুক্তিপণ দিবার কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় তাহাদিগকে মুছলমানদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মদীনায় যখন প্রচারিত হইল যে, হযরত হারেছের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন মুছলমানগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—ইহারা এখন হযরতের শ্বশুরকুল, সুতরাং ইহাদিগকে আর বন্দী করিয়া রাখা সঙ্গত হইতেছে না। হযরতের সহধর্মিণী মাত্রই মুছলমানদিগের মাতা, সুতরাং জননী জোওয়ায়রিয়ার পিতৃকুলের সমস্ত লোকই এখন তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়া দাঁড়াইলেন। মুছলমানগণ তখন কালবিলম্ব না করিয়া সমস্ত বন্দীকে বিনাপণে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং সমস্ত ধন-সম্পদসহ তাহাদিগকে বিশেষ সম্মানের সহিত স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে মোস্তালেক বংশের শতাধিক পরিবারের বহুশত লোক একদিনেই মুক্তিপ্রাপ্ত হইল।*

মুছলমানদিগের এই প্রকার করুণ ব্যবহার দর্শনে মোস্তালেক বংশ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। যাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য তাহারা সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, তাহাদিগের নিকট এই প্রকার আশাতীত সদ্ব্যবহার পাইয়া তাহারা এছলামের মহিমায় অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনধিককালের মধ্যে এই গোত্রটি এছলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়া গেল।

## কপটদিগের শয়তানী

পূর্বে বলিয়াছি যে, কপট মুছলমান বা মোনাফেকগণও এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। ইহারা এবার দলত্যাগ না করিয়া দল ভঙ্গ করার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাদিগের ষড়যন্ত্রের ফলে কয়েকজন আনছার ও মোহাজেরের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধিবার উপক্রম হয়। বিবি আয়েশা এই অভিযানে হযরতের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় নরাধমগণ তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া একটা নূতন বিপ্লব বাধাইয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদিগের কোন চেষ্টাই সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। মোনাফেকদিগের দলপতি আবদুল্লাহ্-এবন-ওবাই মুছলমানদিগকে প্রকাশ্যভাবে বলিয়া দিয়াছিল :

لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل

অর্থাৎ "আমাদিগকে মদীনায় ফিরিয়া যাইতে দাও, তখন দেখিতে পাইবে যে, ছোটলোকগুলি ভদ্রলোকদিগের দ্বারা কিরূপে বিতাড়িত হয়।"** বলা বাহুল্য যে, এছলামের শত্রুগণ সমবেতভাবে অবিলম্বে মদীনা আক্রমণ করার জন্য যে উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিল, নরাধম তাহারই ভরসায় স্পর্ধান্বিত হইয়া এই প্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশে সাহসী হইয়াছিল।

## মাওলানা শিবলীর ভ্রান্ত অভিমত

হযরত অতর্কিত অবস্থায় বানি-মোস্তালেক গোত্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, বোখারী ও মোছলেমের হাদীছ হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু এবন-ছা'আদের একটি বর্ণনায় এই 'অতর্কিত আক্রমণের' কথা নাই। মাওলানা শিবলী মরহুম বলিতেছেন যে, বোখারী মোছলেমের এই হাদীছটি প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য নহে। কারণ, ইহার প্রথম রাবী নাফে, যুদ্ধে যোগদান করা ত দূরের কথা, তিনি হযরতকে কখনও দর্শন করেন নাই। সুতরাং হাদীছটি 'মোনকাতা' বলিয়া পরিগণিত হইবে।*** দুঃখের বিষয় এই যে, বোখারী ও মোছলেমের ন্যায় শ্রেষ্ঠতম পুস্তকের হাদীছ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশের সময়ও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা

---

* কামেল, হালবী, ফৎহুলবারী, এবন-হেশাম প্রভৃতি।

** কোরআন—মোনাফেকুন। জাদুল-মাআদ ১—৩৬৭।  *** ছিরত ১—৩০৪।

হয় নাই। আলোচ্য হাদীছের শেষভাগে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, নাফে উহার প্রথম রাবী নহেন। তিনি বলিতেছেন ঃ

حدثنی به عبد الله بن عمرو کان فی ذلک الجیش

অর্থাৎ আবদুল্লাহ্-এবন-ওমর আমার নিকট এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি এই অভিযানে (সহযাত্রী) ছিলেন। সুতরাং মাওলানা মরহুমের এই সিদ্ধান্তটি যে খুবই অসমীচীন হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

## মদীনা আক্রমণের বিরাট আয়োজন

ওহোদ যুদ্ধের অবসান ও বানি-নাজির বংশের নির্বাসনের পর হইতে হেজাজের ইহুদী ও পৌত্তলিক জাতিগণ মুছলমানদিগের ধ্বংস সাধন এবং এছলামের মূল উৎপাটনের জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাঠকগণ ইহা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। আবু-সুফিয়ান ওহোদক্ষেত্রে নিজে ঘোষণা করিয়াও যে কেন নির্ধারিত সময়ে বদরে আগমন করে নাই, তাহাও ইতিপূর্বে নিবেদিত হইয়াছে। আলোচ্য সময় বিভিন্ন আরব গোত্র স্বতন্ত্রভাবে যে কিরূপ বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করিয়াছিল, পাঠকগণ তাহাও বিদিত হইয়াছেন।

এই সময় নাজির গোত্রের ইহুদী দলপতিগণ দেখিল যে, এই প্রকারে বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল বিদ্রোহের দ্বারা তাহাদিগের পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। অবিলম্বে ইহার একটা সুব্যবস্থা না হইলে সমবেতভাবে মদীনা আক্রমণের 'স্কিমটা' একেবারে মাঠে মারা যাইবে। দীর্ঘস্থায়ী পরাধীনতার ফলে ইহুদী জাতি স্বাভাবিকরূপে মনুষ্যত্বের সর্বপ্রকার উচ্চবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে যুগপৎভাবে কাপুরুষতার সমস্ত উপকরণ তাহাদিগের মধ্যে যথেষ্টরূপে সঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিতে—বুক ঠুকিয়া শত্রুর মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হইতে ইহুদী জাতি কখনই সাহসী হয় নাই। কিন্তু গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাইতে এবং বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারীদলকে Organize করিতে তাহারা চিরকালই সিদ্ধহস্ত। সুতরাং আলোচ্য সময় মদীনা আক্রমণের জন্য বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি ও গোত্রসমূহকে Organize করার এবং এতৎসম্বন্ধে অন্যান্য সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিবার ভার ইহুদিগণ স্বহস্তে গ্রহণ করিল।

## ইহুদীদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্র

এই সকল ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করার জন্য নাজির দলপতিগণ চতুর্দিকে বাহির হইয়া পড়িল। হোয়াই-এবন-আখতব মক্কায় গিয়া কোরেশদিগের সহিত পরামর্শ স্থির করিতে লাগিল। কানানা-এবন-রবী গৎফান গোত্রের নিকট গমনপূর্বক তাহাদিগকে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল, খায়বরের উৎপন্ন ফল-শস্যের অর্ধেক তাহাদিগকে দেওয়া হইবে—ইহাও স্থিরীকৃত হইল। গৎফান গোত্রের সহিত বানি-আছাদ বংশের সন্ধি ও মিত্রতা ছিল, তাহারাও প্রস্তুত হইল। বানি-ছালিম ও বানি-ছাআদ প্রভৃতি গোত্রও এই সঙ্গে যোগদান করিল। ওহোদ যুদ্ধের পর বানি-কোরেজা গোত্রের ইহুদিগণ মুছলমানদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল, পাঠকগণ ইহা যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন। নাজির গোত্রের প্রধান দলপতি হোয়াই-এবন-আখতব এই সময় তাহাদিগের দুর্গে গমন করিল এবং তাহাদিগকে উত্থান করার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। কোরেজা বংশের প্রধান সমাজপতি প্রথমে ইহাতে অসম্মতি প্রকাশকরতঃ বলিয়াছিল—'মোহাম্মদ অদ্যাবধি কখনই আমাদিগের সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করেন নাই। তুমি আমাদিগের সর্বনাশ করার জন্যই আসিয়াছ।' কিন্তু হোয়াই তাহাকে বুঝাইয়া বলিলঃ তুমি বুঝিতেছ না, মোহাম্মদকে ও মুছলমানদিগকে সমূলে বিনষ্ট করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কোরেশ প্রভৃতি জাতি তাহাদিগের সমবেত শক্তি লইয়া মদীনার পথে অগ্রসর হইয়াছে। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। অবশেষে উত্থান করাই স্থিরীকৃত হইল, এবং কা'ব কোরেজার সকল লোককে একত্র করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে সন্ধিপত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত

হইয়াছিল মক্কায়। সেখানে এছলামের শত্রুগণ প্রতিজ্ঞা করিল—আমাদিগের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, মুছলমান আমাদিগের সাধারণ শত্রু। যাহাতে এই শত্রুদল এবং তাহার দলপতি মোহাম্মদের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট না থাকে, সেজন্য আমরা সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। এইরূপে মোহাম্মদকে, মুছলমানদিগকে এবং এছলাম ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত করিবার কঠোর সঙ্কল্প লইয়া দশ সহস্র দুর্ধর্ষ আরব মদীনার পথে ধাবিত হইল।

## মদীনায় সংবাদ পৌঁছিল

কোরেশ ও ইহুদীদিগের এই সকল ষড়যন্ত্রের কথা হযরতের ও বিশিষ্ট সহচরগণের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল না। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এতবড় একটা অভিযান, অস্ত্রশস্ত্রে এমন সুসজ্জিত হইয়া মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে, সম্ভবতঃ মুছলমানগণ ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। শত্রুপক্ষের এই সমবেত অভিযানের সংবাদ পাইয়া হযরত পরামর্শের জন্য ছাহাবাগণকে আহ্বান করিলেন। এবার মদীনার বাহিরে যাওয়া হইবে কি-না, এই বিষয়ে পরামর্শ আরম্ভ হইল। তখন সভাস্থলে নানা প্রকার প্রস্তাবের আলোচনা হইতে লাগিল—কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্ত হইল না। বাহিরের এই প্রচণ্ড আক্রমণ আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিপ্লবের বিভীষিকা। বর্তমান অবস্থায় নগরের বাহিরে যাওয়া কোনমতেই সঙ্গত নহে, অথচ মদীনা চারিদিক হইতে সুরক্ষিতও নহে। কাজেই আক্রমণকারী সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করিতে দ্বিধা করিবে না। এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, এমন সময় ছালমান ফার্সী (পারস্যবাসী) অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ পারস্যে আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে এই প্রকার বিপুল শত্রুবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়। আমরা এরূপ অবস্থায় নগরের চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া থাকি। ইহাতে শত্রুর পক্ষে নগরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। বর্তমান অবস্থায় ছালমানের প্রস্তাব অনুসারে কাজ করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল এবং সকলে পরিখা খননের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

## পরিখা খনন

পরামর্শ স্থির হওয়ার পর, মুছলমানগণ কালবিলম্ব না করিয়া পরিখা খননে প্রবৃত্ত হইলেন। কপট মুছলমানগণ ব্যতীত আর সকলেই ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া সমস্ত ক্লেশ ও যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া দিবারাত্রি সমানভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। মদীনার পশ্চাৎদিকে 'ছালআ' سلع পর্বত, সুতরাং সে দিকটা বিশেষ সুরক্ষিত ছিল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য দিকের স্থানে স্থানেও পরিখা খননের আবশ্যক হয় নাই। এই সময় কাজের শৃঙ্খলার জন্য হযরত মুছলমানদিগকে দশ-দশ জনের এক-একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া দিলেন। প্রত্যেক দল দশ গজ পরিমিত গড় খনন করিয়া দিবেন এবং পরিখা পাঁচ গজ গভীর হইবে—হযরত এইরূপ স্থির করিয়া দিলেন, প্রত্যেক দলের জমিও মাপিয়া দেওয়া হইল। ঐতিহাসিকগণ এই পরিখার দীর্ঘতা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও, তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিবরণ হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পরিখাটি ন্যূনাধিক ছয় হাজার হাত দীর্ঘ হইয়াছিল।

## অপরূপ দৃশ্য

মুছলমানগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া মৃত্তিকা খননে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহাদিগের আনন্দ ও উৎসাহের ইয়ত্তা নাই। ছহীহ্ হাদীছে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুছলমানদিগের নিকট দাস না থাকাতে তাঁহারা নিজেরাই মজুরের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে সময় মদীনায় খুব শীত পড়িতেছিল, তাহার উপর অল্প অল্প বৃষ্টিপাতও হইতেছিল।* এহেন দুর্দিনে ভক্তগণ পরম উৎসাহসহকারে পরিখা খনন করিতেছেন, কাঁধে করিয়া মাটির ঝুড়ি বহিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে সমবেত কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া বলিতেছেন ঃ

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا

* বোখারী, মোছলেম ও ফৎহুলবারী। কানজুল-ওম্মাল ৫—২৭৯ পৃষ্ঠা।

"আমরা তাহারাই—যাহারা মোহাম্মদের হস্তে জেহাদের বায়আত করিয়াছে, আমাদিগের এই প্রতিজ্ঞা চরম ও চিরস্থায়ী।" এই সময় হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাও ছাহাবিগণের সহিত যোগদান করিয়া সমবেতভাবে পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ ধূলিধূসরিত হইয়া গিয়াছে, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। দীন-দুনিয়ার রাজাধিরাজ আমার, আজ মজুররূপে কর্মযোগের আদর্শ স্থাপন করিতেছেন এবং নিজেও ধর্মমূলক ও উৎসাহব্যঞ্জক গাথার আবৃত্তি করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে মোহাজের ও আনছারগণকে উচ্চকণ্ঠে আশীর্বাদ দিতেছেন। এইরূপে বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কাজ চলিতেছে—এমন সময় পরিখার একস্থানে একখণ্ড কঠিন প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িল, ছাহাবাগণ চেষ্টা করিয়াও তাহা ভাঙ্গিতে পারিলেন না। ছালমান হযরতের দলে পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা কয়েকজন মাটি খুঁড়িতেছিলেন, আর হযরত অন্য কয়জনকে লইয়া সেই মাটি বহিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় ছালমান আসিয়া প্রস্তরের কথা নিবেদন করিলে হযরত বলিলেন—আচ্ছা বেশ, চল আমি যাইতেছি। এই বলিয়া হযরত জনৈক ছাহাবীর নিকট হইতে ঝাপড়া চাহিয়া লইলেন এবং 'বিছমিল্লাহ্' বলিয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত করিলেন। প্রথম আঘাতেই পাথরখানার কতটা অংশ ভাঙ্গিয়া গেল এবং পর পর তিন আঘাতে তাহা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। আঘাতের ফলে প্রস্তর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। এই সময় হযরত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলেন যে, পারস্য, এমন প্রভৃতি দেশ মুছলমানদিগের করতলগত হইবে—ঐ সকল দেশের সমস্ত লোকই এছলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করিয়া আল্লাহ্‌র নামের জয়জয়কার করিবে। বলা বাহুল্য যে, এই বাণী দ্বারা হযরত ছাহাবাগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সত্য অচিরাৎই জয়যুক্ত হইবে অতএব বর্তমান সঙ্কট দর্শনে কেহ যেন বিমর্ষ বা অবসন্ন হইয়া না পড়েন। এবন-এছহাক একটি ছনদহীন রেওয়ায়তে এই সহজ ও সরল ঘটনার মধ্যে কতকগুলি ভিত্তিহীন গল্প-গুজব ঢুকাইয়া দিয়াছেন। একে এবন-এছহাকের রেওয়ায়ৎ, তাহাতে আবার ছনদশূন্য ; সুতরাং এই রেওয়ায়তের মূল্য যে কত, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

এইরূপে তিন হাজার মুছলমান দীন দিন-মুজরের ন্যায় 'দিনের মজুরী' সংগ্রহ করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। এই সময়কার শীত-বৃষ্টির কথা পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার উপর বিপদ হইল খাদ্যের অভাব। বোখারীর কয়েকটা হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুছলমানদিগকে অনেক দিনের পুরাতন ও দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য—তাহাও আবার খুব সামান্য পরিমাণে—ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল। এমন কি, শেষভাগে হযরতকে এবং মুছলমানগণকে পর পর কয়েক সন্ধ্যা সম্পূর্ণ উপবাস করিয়া কাটাইয়া দিতে হইয়াছিল। ক্ষুধায় পেটের চামড়া পিঠের সঙ্গে লাগিয়াছে, কোমর উঁচু করিয়া কাজ করা কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই আরবের প্রথা অনুসারে পেটে পাথর বাঁধিয়া কাজ করিতে লাগিল। কোরেশদিগের এই অবরোধ যে কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা ছিল না। কাজেই এ সময় মদীনার স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগের প্রাণরক্ষার জন্যই যে অধিকাংশ শস্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারা যায়।

## কোর্‌আনের বর্ণনা

এই যুদ্ধ আহজাব ও খন্দক উভয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আহজাব অর্থে বহু দল এবং খন্দক অর্থে পরিখা। আরবের বিভিন্ন জাতি বহু সৈন্যদল লইয়া মদীনার উপর আপতিত হইয়াছিল এবং মুছলমানগণ খন্দক খনন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া উহার এই দুইটি নাম পড়িয়া যায়। বহু ছহীহ হাদীছে ছাহাবাগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, মুছলমানগণ আর কখনও এমন বিপদে পতিত হন নাই। নগরের বাহিরে দশ হাজার সৈন্যের ভীষণ রণনিনাদ, মধ্যে দুই সহস্র মোনাফেক কর্তৃক অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা, তাহার উপর বানি-কোরেজার আক্রমণ বিভীষিকা—পক্ষান্তরে খাদ্য-রসদাদির দারুণ অভাব। কোরআন শরীফের একটি ছুরা এই আহজাব নামে খ্যাত হইয়া থাকে। এই ছুরায় আলোচ্য সময়ের শোচনীয় অবস্থা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার কতকগুলি আয়াতের অনুবাদ প্রদান করিতেছি :

"হে মোমেনগণ ! তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর—যখন বহু

সেনাসঙ্ঘ তোমাদের উপর আপতিত হইয়াছিল, আমি তখন তাহাদিগের উপর ঝঞ্ঝা ও তোমাদিগের অলক্ষিত সেনাদল প্রেরণ করিয়াছিলাম ; আর আল্লাহ্ তোমাদিগের কার্যকলাপ দর্শন করিতেছিলেন। যখন তাহারা উচ্চ ও নিম্ন সকল দিক দিয়া তোমাদিগের পানে আগমন করিয়াছিল এবং যখন সকলে চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিল এবং যখন হৃৎপিণ্ডগুলি (উল্টাইয়া) মুখের দিকে আসিতেছিল এবং যখন তোমরা আল্লাহ্‌র (ওয়াদা) সম্বন্ধে নানাবিধ অনুমান করিতেছিলে, তখনই বিশ্বাসিগণের পরীক্ষা হইতেছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল। কপট ও দুর্বলচেতা ব্যক্তিগণ যখন বলিতেছিল যে, "আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলের ওয়াদাগুলি প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।" কিন্তু প্রকৃত মোমেনগণ এহেন বিপদ দর্শনেও একবিন্দু বিচলিত হইলেন না। কোরআনে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে ঃ "মোমেনগণ (আক্রমণকারী) সৈন্যসঙ্ঘকে দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল, আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুল আমাদিগকে যে (পরীক্ষার) কথা বলিয়াছেন—তাহা এইবার আসিয়াছে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুল সত্যই ব্যক্ত করিয়াছেন (অর্থাৎ ঈমানের পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিলে আমরা নিশ্চয়ই উভয় জীবনে সফলকাম হইতে পারিব। আর এই পরীক্ষায় পতিত হইয়া তাহাদিগের বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ আরও বাড়িয়া গেল।"*

## শত্রুপক্ষের মদীনা অবরোধ

মুছলমানগণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সপ্তাহেক কালের মধ্যে পরিখার কাজ শেষ করতঃ নগর রক্ষার অন্যান্য ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময় কোরেশের এই বিরাট বাহিনী মদীনার প্রান্তর ভূমিতে উপনীত হইল এবং একটু দূরে দূরে থাকিয়া নগর বেষ্টন করিয়া ফেলিল। সে সময় মুছলমান পুরুষের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে তিন হাজারের অধিক হইবে না। পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক বালকগণও এই হিসাবের মধ্যে গণিত হইয়াছিলেন। শত্রু সেনাগণের আগমনের পূর্বেই স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে নগরের একধারে একটি সুরক্ষিত দুর্গ বাটীকায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই দিক দিয়া ইহুদীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ও ছিল, মোনাফেকগণের উত্থানের আশঙ্কাও লাগিয়া ছিল। সেইজন্য হযরত সর্বপ্রথমে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব নিবারণের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। এজন্য ছালমা-এবন-আছলাম ও জায়েদ-এবন-হারেছা নামক দুইজন অভিজ্ঞ ছাহাবীকে নায়কের পদে নির্বাচিত করা হইল। ছালমার অধীনে দুই শত এবং জায়েদের অধীনে তিন শত পরীক্ষিত মোছলেম বীরকে নিয়োজিত করা হইল—ইহারা অন্তর্বিপ্লব রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। সেনাপতিদ্বয়ের উপদেশ মতে এই পাঁচ শত সৈন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র-বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া নগরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে এবং মধ্যে মধ্যে তকবির ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মোনাফেকগণ মনে করিল, তাহাদিগের পল্লীর চারিদিকে অসংখ্য মুছলমান সৈন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সুতরাং এখন মাথা তুলিলে আর রক্ষা নাই। পক্ষান্তরে বানি-কোরেজার ইহুদিগণও মুহুর্মুহু তকবির ধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া পড়িল। কথা ছিল যে, তাহারা নিজেদের পল্লীর দিক হইতে বাহির হইয়া মুছলমান স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগের আবাস স্থানটি আক্রমণ করিবে। কিন্তু চারিদিক হইতে আল্লাহু আকবরের বজ্রনিনাদ শ্রবণে কাপুরুষগণ মনে করিল যে, এদিকে বহু মোছলেম সৈন্য তাহাদিগের মুণ্ডপাত করার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। কাজেই উভয়দল ভীত-স্তম্ভিত হইয়া আপন আপন পল্লীতে বসিয়া রহিল। এদিকে হযরত অবশিষ্ট আড়াই হাজার মুছলমানকে লইয়া পরিখা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

বানি-কোরেজার ইহুদিগণ প্রথম হইতেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আসিতেছে। ওহোদ যুদ্ধের প্রাক্কালে ইহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কোরেশদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু এবারও হযরত তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই সময় তাহারা নূতন করিয়া সন্ধি স্থাপন করে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, ভবিষ্যতে কোন অবস্থায় তাহারা মুছলমানদিগের কোন প্রকার অনিষ্টজনক কার্যে যোগ দিবে না। তাহার পর হোয়াই-এবন-আখতব নামক ইহুদী দলপতির প্ররোচনার ফলে তাহারা পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং সন্ধিপত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলে। এ সকল কথা পাঠকগণ যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন।

---

* কোরআন, আহজাব ২ ও ৩ রুকু।

## বানি–কোরেজার বিদ্রোহ

পরিখা খনন কার্য শেষ করিয়া মুছলমানগণ অন্যান্য ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় মদীনায় সংবাদ পৌঁছিল যে, বানি–কোরেজার ইহুদিগণ পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মুছলমানগণ তখন চারিদিক হইতে 'বেড়া আগুনে' বেষ্টিত, পার্থিব হিসাবে তাঁহাদিগের রক্ষা পাওয়ার কোনই উপায় ছিল না। এমন সময় এহেন বিপদের সংবাদে মানুষমাত্রকেই বিচলিত হইতে হয়। ছাহাবাগণের মধ্যে একদল লোক এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রতিকারের জন্য চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হযরত এই অভিনব বিপদবার্তা শ্রবণে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেন—"ভয় কি, আমাদের আল্লাহ্ আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি একাই সকলের পক্ষে যথেষ্ট।" হযরত আল্লাহকে এমনইভাবে চিনিয়াছিলেন, সেই সর্বশক্তিমানের প্রকৃত স্বরূপকে নিজের মনেপ্রাণে এমনভাবে গ্রহণ ও ধারণ করিয়াছিলেন যে, জগতের সমস্ত দৈত্য–দানবের সমবেত তাণ্ডব দর্শনেও তাঁহার হৃদয়ে একবিন্দু বিভীষিকার সৃষ্টি হইত না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সেই সত্যময় সর্বশক্তিমানই সত্যের সেবার জন্য তাঁহাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিত্বের কোন সংস্পর্শই ইহাতে নাই। তাই ভীষণ হইতে ভীষণতর আপদ–বিপদের সময়— যখন পার্থিব জ্ঞান উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া আকুলি–ব্যাকুলি করিতে থাকে—তখনও তাঁহার আত্মা অভয় দিয়া ঘোষণা করে—যাঁহার আদেশে এবং যাঁহার পবিত্র নামকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে তোমার এই সাধনা, তিনি কখনও তোমাকে বিধ্বস্ত হইতে দিবেন না। তাঁহার শরীরে প্রত্যেক শোণিত কণায়, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের শিরায় শিরায় এই অক্ষয়, অব্যয়, চরম ও চিরস্থায়ী বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই বানি–কোরেজার এই উত্থান সংবাদ পাইয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন ঃ "ভয় কি ? আমাদের আল্লাহ আছেন।"

যাহা হউক, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ধর্মের নিকট হইতে সমস্ত দায়িত্ব এড়াইবার জন্য, হযরত আওছ ও খাজরাজ বংশের প্রধান সমাজপতি ছা'আদযুগলকে ইহুদীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ছা'আদযুগল আর কয়েক জন বিশিষ্ট ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া কোরেজাদিগের পল্লীতে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্বাপর সমস্ত কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু কোরেজাদিগের পাপের ভরা তখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদিগের কর্মফল ভোগের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে। কাজেই এই কৃতঘ্ন ইহুদিগণ মুছলমানদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদিগকে উল্টা গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। কা'ব তখন নানা প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল ঃ "মোহাম্মদ কে ? আমরা তাকে চিনি না, তোমাদের কোন সন্ধিপত্রের ধার আমরা ধারি না। তোমরা দূর হইয়া যাও।" মুছলমানগণ চলিয়া আসার পর তাহারা সদলবলে কোরেশদিগের সহিত যোগদান করিল।

## অবরোধ ও আক্রমণ

শত্রু সৈন্যবাহিনী মদীনার বাহিরে পড়াও করিয়া নগর আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। পদাতিক ও ছওয়ার সৈন্যগণ তিন দলে বিভক্ত হইল এবং আবু–সুফিয়ান প্রধান সেনাপতি পদে নির্বাচিত হইল। অন্যান্য ব্যবস্থার পর তাহারা সকলে একই সময়ে মদীনার উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিল, পাষণ্ডদিগের হুঙ্কারে মদীনার গগন পবন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। কিন্তু নগরের নিকটবর্তী হইয়া অদৃষ্টপূর্ব পরিখা দর্শনে তাহারা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। 'এ কি ব্যাপার, আরবে ত এরূপ যুদ্ধের রীতি নাই। এ ত যুদ্ধ নয়—প্রবঞ্চনা।' কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহারা এইরূপ বিকার বকিতে আরম্ভ করিল। সম্মুখে গভীর গড়খাই, তাহার পর উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ, ইহা অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। মুছলমানগণ নগর তোরণগুলিতে অব্যর্থ লক্ষ্য তীরন্দাজ সৈন্যদল বসাইয়া দিয়াছেন, পরিখা রক্ষার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। কাজেই শত্রুপক্ষ তখন নগর অবরোধ করিয়া, বাহির হইতে তীর ও প্রস্তর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু মুছলমানগণ এজন্য পূর্ব হইতেই সাবধান হইয়া ছিলেন,

সুতরাং শত্রুপক্ষের শত চেষ্টাতেও তাহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারিল না।

এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, অথচ নগর আক্রমণ করিয়া মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার কোন সুবিধাই ঘটিয়া উঠিল না। পক্ষান্তরে রসদ-পত্রও ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। তাহার উপর মদীনার খোলা ময়দানে শীতের প্রবল প্রকোপ। এই সকল কারণে শত্রুপক্ষ যার-পর-নাই বিচলিত হইয়া পড়িল। তখন তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল—যে-কোন গতিকে হউক, পরিখা অতিক্রম করিতেই হইবে। একবার কিছু সৈন্য পরিখা পার হইতে পারিলে, অন্যান্য সমস্ত সৈন্য সেই পথ দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে। তখন তাহাদিগের এই বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া, মুছলমানগণের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। আমর-এবন-আব্দে ওদ্দ এবং একরামা-এবন-আবু-জেহেল প্রভৃতি আরবের বিখ্যাত বীরগণ এই আক্রমণে নায়কের পদে নির্বাচিত হইল। আমরের শক্তি, সমর-নিপুণতা ও তাহার বীরত্ব আরবময় বিখ্যাত ছিল। সাধারণতঃ লোকের ধারণা ছিল যে, আমর একা এক সহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। পর্বত সংলগ্ন একটি স্থানে পরিখার প্রসার অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। আমর প্রভৃতি একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া এই স্থান হইতে পরিখা পার হওয়ার চেষ্টা করিল। আমর সর্বাগ্রে পরিখা উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিল এবং এপারে আসিয়া নানা প্রকার তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। মুছলমানগণ তাহার এই সকল প্রলাপোক্তির কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া আমর হুঙ্কার দিয়া বলিতে লাগিল :

لقد بححت من الندا ء لجمعهم - هل من مبارز ؟

"তাহাদিগকে ডাকিতে ডাকিতে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছি—আছে কেহ যোদ্ধা ?" শত্রুগণ পরিখা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আমর ও একরামা প্রভৃতি তাহাদিগের নায়ক, এই আকস্মিক বিপদে মুছলমানগণ যেন ক্ষণেকের তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন বীরকুল শিরোমণি শেরে-খোদা হস্তস্থিত তরবারি ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করিয়া বলিলেন—"এই যে, আছি।" তখন এই বীর যুবককে সতর্ক করার জন্য হযরত বলিলেন—"জানিতেছ, ও আমর।" বীর যুবক সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন—"সে আমর, আমিও আলী।" পারস্যের বিখ্যাত কবি ফতেহ আলী খাঁ হাবা সংক্ষেপে অতি সুন্দর ভাষায় এই ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :

بجستر سر ولش که عمرو ست این ، که دست یلی اجل زاستین

علی گفت ای شاه ! اینک منم ، که پیدا پیش عمرست در جوشنم .

আলী অনুমতি গ্রহণ করিয়া উলঙ্গ তরবারি হস্তে আমরের পানে ধাবিত হইতেছেন—এই সময় হযরত করুণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আল্লাহ বদর সমরে ওবায়দাকে গ্রহণ করিয়াছ, ওহোদের অনল-পরীক্ষায় হামজাকে গ্রহণ করিয়াছ, আর এই আলী তোমার সন্নিধানে উপস্থিত—সে আমার পরমাত্মীয়। আমাকে একেবারে স্বজন বর্জিত করিও না * যাহা হউক, আলী নিকটবর্তী হইলে আমর তাহার উপর প্রচণ্ডবেগে অস্ত্র চালনা করিল। শেরে-খোদা বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তাহার আঘাত ব্যাহত করতঃ তাহাকে আক্রমণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। একদিকে আরবের প্রথিতযশা বহুদর্শী বীর আমর, অন্যদিকে আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান তরুণ যুবক হযরত আলী। দুই বীরের পদচালনায় ধূলি উড়িয়া তাহাদিগের চারিদিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, তখন কেবল শোনা যাইতেছিল অস্ত্রের ঝনঝনা, কেবল দেখা যাইতেছিল ধূমপুঞ্জের মধ্যে বহিয়া বহিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। মুছলমানগণ রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের অপেক্ষা করিতেছেন—এমন সময় সেই ধূলিপুঞ্জের মধ্য হইতে পুনঃ পুনঃ আল্লাহু আকবর ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। বাহিরের বর্ণিত সেই ধ্বনি পর্বতে রোমাঞ্চ তুলিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠ তাহার প্রতিধ্বনি করিল—'আল্লাহু আকবর।' আমর নিহত হইলে অবশিষ্ট হওয়ারগণ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। প্রথম সংঘর্ষে হযরত আলীর এই আশাতীত বিজয়লাভে মুছলমানদিগের আনন্দ ও

---

* কান্জুল-ওম্মাল ৫—২৮২।

উৎসাহের সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেইদিকে ধাবিত হইলেন। এদিকে বীরবর খালেদ-এবন-অলীদ নির্বাচিত সৈন্যগণের একটা বাহিনী গঠন করিয়া হযরতের অবস্থান স্থলটি আক্রমণ করিয়া দিলেন। সমস্ত দিন অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এমন কি, হযরত ও ছাহাবাগণ নামাযের জন্যও এক মুহূর্তের অবকাশ পান নাই—ইহা হইতেই যুদ্ধের ভীষণতা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কয়েক দিন প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ চালাইয়া খালেদের এই "নির্বাচিত ও দুর্দ্ধর্ষ" সেনাদল অবসন্ন হইয়া পড়িল। সেনাপতি খালেদও বুঝিলেন যে, পরিখা রক্ষাকারী সৈন্য-প্রাচীর ভেদ বা ভগ্ন করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

## শত্রুপক্ষের অবসাদ

ফেব্রুয়ারী মাস, মদীনার অসহ্য শীত, ক্রমশঃ রসদাদির অভাব, সঙ্কল্প সিদ্ধি সম্বন্ধে নিরাশা ইত্যাদি কারণে শত্রুসৈন্য এমন কি তাহাদিগের পরিচালকগণ ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে কোরেজা বংশের ইহুদিগণ যখন দেখিল যে, গতিক বড় ভাল নয়, তখন তাহারা কোরেশদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কোরেজার কাপুরুষগণ প্রথমে স্থির করিয়াছিল যে, শহরতলীর প্রান্তদেশ দিয়া তাহারা মোছলেম মহিলা ও বালক-বালিকাগণকে অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করিয়া বাহাদুরী দেখাইবে। কিন্তু হযরত পূর্ব হইতে সে সম্বন্ধে যে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন। তখন অগত্যা লোক দেখাইবার জন্য তাহারা এদিক-ওদিক একটু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন বাহির হইতে প্রস্তরাদি বর্ষণ ব্যতীত অন্য কোনও কাজও ছিল না। ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই দেখিয়া ইহুদিগণ দুই-চারিদিন এই প্রকারে কোরেশদিগের সহিত ময়দানে অবস্থান করিল। কিন্তু যখন পরিখা অতিক্রম করার জন্য ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, তখন একদিন হঠাৎ তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল। কোরেশগণ ইহা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, এবং তাহাদিগের নিকট লোক পাঠাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ইহুদিগণ বলিয়া পাঠাইল ঃ কারণ আর কি ! আজ আমাদিগের 'ছাবত' বা শনিবার। আজ আমরা কিছুতেই ময়দানে যাইতে পারিব না। কোরেশ পক্ষ হইতে অনেক অনুরোধ-উপরোধ হইল, কারণ সেই সময়ই স্থানীয় লোকদিগের সাহায্যের বিশেষ দরকার ছিল। কিন্তু ইহুদিগণ বলিয়া পাঠাইল—"সে কোনমতেই হইতে পারে না। পূর্বে একবার ছাবত অমান্য করিয়া আমাদিগের একদল শূকর-বানর হইয়া গিয়াছে, আবার তাই ?" ইহুদীদিগের এই কথা শুনিয়া আবু-সুফিয়ান বিশেষ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল ঃ "এই শূকর-বানরের আত্মীয়রা আমাদিগের সর্বনাশ করিল।"

## অবসাদ আত্মকলহে পরিণত হইল

এহেন অকৃতকার্যতার প্রাক্কালে দুর্বলচেতা লোকদিগের মানসিক অবস্থা সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, কোফর-বাহিনীর সৈন্যদল ও দলপতিদিগের অবস্থাও তখন সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এত উদ্যোগ, এত আয়োজন, এত ক্ষতি, এত অর্থব্যয়, এত শয়তানী, এত ষড়যন্ত্র সমস্তই বিফল হইয়া গেল। তাহারা মনে করিয়াছিল, একদিনের যুদ্ধেই মুছলমানদিগের দফারফা হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে আজ তিন সপ্তাহ অতিবাহিতপ্রায়, দশ সহস্র সৈন্যের আহারাদির ব্যবস্থা সোজা ব্যাপার নহে। কাজেই এই কল্পনাতীত বিপদের ফলে তাহাদিগের রসদপত্র ফুরাইয়া আসিল প্রাকৃতিক অসুবিধারও ইয়ত্তা ছিল না। তাহারা আসিয়াছিল, একদিনেই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে এবং মুছলমান জাতিকে ধ্বংস করিতে, তাহাদিগের ধর্মকে সমূলে উৎপাটিত করিতে। কিন্তু মুছলমানগণ অক্ষত দেহে নগরে বসিয়া আছে, আর তাহারা এই প্রচণ্ড শীতের দিনে খোলা ময়দানে থাকিয়া আধমরা হইয়া পড়িতেছে। এই দুর্দশা ও দুরবস্থার সময় তাহারা স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ও অবিশ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল। এরূপ সময় সাধারণতঃ চারিদিকে নানা প্রকার মিথ্যা জনরবের সৃষ্টি হইয়া তাহা ক্রমশঃ অতিরঞ্জিত হইতে থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল বানি-কোরেজাদিগের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা নানাপ্রকারে অতিরঞ্জিত হইয়া সর্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল তখন কেহ

কেহ অনুমান করিয়া বলিল—সম্ভবতঃ কোরেজার ইহুদিগণ মোহাম্মদের সহিত সন্ধি করিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যে এই উক্তির 'সম্ভবতঃ' লোপ হইয়া গেল। কোরেজার ইহুদিগণ প্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত হয় নাই, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এখন তাহারা দেখিল যে, কোরেশদিগের সমস্ত আস্ফালনই মিথ্যা হইয়া গেল। মোহাম্মদ ও মুছলমানগণ মদীনায় অক্ষত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। এই অকৃতকার্যতার ফলে কোরেশ ও অন্যান্য আরব সৈন্যদিগের মধ্যে যে অবসাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও তাহারা অবগত ছিল। এদিকে শনিবারের বিশ্রাম গ্রহণ করায় কোরেশ প্রভৃতি গোত্রের প্রধানগণ তাহাদিগকে যে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছিল—তাহা বুঝিতেও তাহাদের বাকী ছিল না। তখন তাহাদিগের চৈতন্য হইল এবং তাহারা ভাবিতে লাগিল, কোরেশগণ চিরকাল এমনভাবে অবরোধ করিয়া থাকিতে পারিবে না। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, দীর্ঘকাল অবরোধ রক্ষা করাও আর তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এ অবস্থায় তাহারা দু-দিন পরে নিজ নিজ দেশে চলিয়া যাইবে, তখন আমাদিগের অবস্থা কি হইবে ? দেশদ্রোহী নরাধমগণ এই প্রকার চিন্তা করিয়া কোরেশদিগকে বলিয়া পাঠাইল—'তোমরা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবে না, ইহার জামিনের জন্য তোমাদিগের মধ্য হইতে সত্তরজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিভূস্বরূপ আমাদিগের দুর্গে পাঠাইয়া দাও, অন্যথায় আমরা তোমাদিগের সঙ্গে থাকিতে পারিব না।' ইহুদীদিগের এই প্রস্তাব শুনিয়া কোরেশগণ মনে করিল যে, যাহা শোনা গিয়াছিল, তাহা ঠিকই। কোরেজার বিশ্বাসঘাতকগণ নিশ্চয়ই মোহাম্মদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া লইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের সত্তরজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মুছলমানদিগের হাতে ধরাইয়া দিয়া, তাহারা নিজেদের পূর্বকৃত বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষতিপূরণ করিতে চাহিতেছে।

### ঐতিহাসিক বর্ণনা

ঐতিহাসিক এবন-এছহাক বলেন, নোআয়েম-এবন-মাছউদ নামক জনৈক গৎফানী প্রধান এই সময় হযরতের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন যে—হযরত আমি মুছলমান হইয়াছি কিন্তু আমার স্বজাতীয়েরা ইহা অবগত নহে। আপনি আমাকে যে কাজের আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি। তখন হযরত তাঁহাকে ছল-চাতুরী করিয়া শত্রু সৈন্যদিগের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করিয়া দিতে বলিলেন। কোরেশ ও কোরেজাদিগের বর্ণিত অবিশ্বাস ও আত্মকলহ এই নোআয়েমের শঠতার ফল। কিন্তু এবন-এছহাকের এই বিবরণটি যে একেবারে ভিত্তিহীন উপকথা, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এবন-এছহাক এই বিবরণের কোন ছনদ প্রদান করেন নাই। এমন কি তিনি যে কাহার মুখে উহা জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করেন নাই।* সুতরাং রেওয়ায়তের হিসাবে এই বর্ণনাটির কোনই মূল্য নাই। গৎফান জাতি হযরতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, নোআয়েমও কাফের অবস্থায় মদীনা আক্রমণের জন্য সদলবলে কোরেশদিগের সহিত যোগদান করে।** এই শত্রুদলের একজন প্রধান ব্যক্তি পরিখা পার হইয়া মদীনায় আসিল, কেহ তাহাতে কোন বাধা দিল না। পক্ষান্তরে 'আমি মুছলমান হইয়াছি' বলামাত্র, হযরত বিশ্বাস করিয়া সমস্ত গুপ্ত কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন। এ-সকল কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

### দৈব সাহায্য

যাহা হউক, প্রায় তিন সপ্তাহকাল এই অবস্থায় অতিবাহিত হওয়ার পর, একদিন মদীনায় প্রবল ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। কুয়াশা ও ক্ষুদ্রঝটিকায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল এবং সন্ধ্যার পর হইতে ঝটিকাবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। মক্কা ও তন্নিকটবর্তী স্থানের সৈন্যগণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসী, সুতরাং একে প্রথম হইতে তাহারা সকলেই হিমাড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর এই প্রচণ্ড ঝটিকার ফলে তাহারা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহাদিগের তাম্বুকানাৎগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল, রসদশালার সমস্ত জিনিসপত্র একেবারে লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িল। সে প্রবল তুষার

---

* এবন-হেশাম ২—২৪৪। ** হালবী ২—৩২৪।

ঝটিকার প্রচণ্ডবেগে আবু-সুফিয়ানের সমস্ত দম্ভ, সমস্ত স্পর্ধা, সমস্ত শয়তানী ও সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় উড়িয়া গেল—তাহারা তখন পরস্পরকে ধরাধরি করিয়া কোন গতিকে জীবনরক্ষা করিতে লাগিল। প্রভাত হইতে না হইতে আবু-সুফিয়ানের আদেশে কোরেশ শিবিরে যাত্রার বাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং তাহারা বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় দ্রুতপদে মক্কার পথে ধাবিত হইল।*

### ছা'আদের আত্মবলি

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ও তাঁহার ভক্ত-সেবকমণ্ডলীকে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত এবং সমূলে উৎপাটিত করার চরম চেষ্টা এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু বদর ও ওহোদের ন্যায় এবারও মুছলমানদিগকে একটা বড়দরের কোরবানী দিতে হইয়াছিল। পাঠকগণ ভক্তকুল শিরোমণি আনছার সমাজপতি ছা'আদ-এবন-মা'আজের নাম অনেকবার পাঠ করিয়াছেন। ছা'আদ অন্য কোন কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কাফেরগণ 'সাধারণ আক্রমণ' করিয়া নগর প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে,—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি বর্শা হস্তে সেদিকে ছুটিয়া যাইতেছেন, আর ব্যগ্রতাপূর্ণ ভাষায় বলিতেছেন ঃ

لبث قليلا تدرك الهيجا حمل ـ لا باس الموت اذا الموت نزل

"একটু অপেক্ষা কর, মানুষ আসিতেছে। সময় পূর্ণ হইলে মরণ ত আসিবেই—সুতরাং মরণের আর ভয় কি ?" ছা'আদের মাতা পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বৎস ! পিছাইয়া পড়িয়াছ, শীঘ্র অগ্রসর হও !" মাতৃ-আশীর্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া ছা'আদ অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় শত্রুপক্ষের একটি তীক্ষ্ণধার শর বিদ্ধ হইয়া তিনি আহত হইয়া পড়েন। জনৈক অভিজ্ঞ মহিলা ছা'আদের শুশ্রূষাকারিণীরূপে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার চিকিৎসার কোন ত্রুটি করা হইল না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, কয়েকদিন আহত থাকার পর ছা'আদ অমর হইলেন।

# দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

## কোরেজা গোত্রের প্রতি সামরিক দণ্ড

কোরেজা গোত্রের ইহুদীদিগের শঠতা ও ষড়যন্ত্র এবং তাহাদিগের বিশ্বাসঘাতকতার কথা পাঠকগণ বিভিন্ন প্রসঙ্গে অবগত হইয়াছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এখানে তাহাদিগের অপরাধগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

(১) মদীনায় শুভাগমনের পরই হযরত সেখানকার সকল জাতি ও সকল ধর্মাবলম্বী অধিবাসীদিগকে লইয়া একটি গণতন্ত্র গঠন করিয়াছিলেন। তাহাতে ধর্ম, বাণিজ্য ও অন্যান্য সমস্ত আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইহুদীদিগের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত ও ঘোষিত হইয়াছিল এবং বিগত চারি বৎসর পর্যন্ত তাহারা সেই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল।

(২) এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় তাহারা ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা মুছলমানদিগের কোন শত্রুকে কোন প্রকারে সাহায্য করিবে না। কোন বহিঃশত্রু মদীনা আক্রমণ করিলে তাহারাও মুছলমানদিগের ন্যায় স্বদেশ রক্ষার্থে নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে।

(৩) কিন্তু এই সন্ধির শর্ত এবং স্বদেশের স্বাধীনতা ও সম্মানকে নির্মমভাবে পদদলিত করিয়া তাহারা প্রথম হইতেই শত্রুপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং মুছলমানদিগকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে তাহাদের শত্রুপক্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করে। এই সকল সাধারণ অবস্থা পূর্বে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

---

* বোখারী, মোছলেম, ফৎহুলবারী প্রভৃতির বিভিন্ন হাদীছ এবং এবন-হেশাম, তাবরী, হাল্বী প্রভৃতি ইতিহাস হইতে পরিখা সমরের সমস্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল। বিশেষ আবশ্যকীয় স্থানগুলির হাওয়ালা যথাস্থানে প্রদত্ত হইল।

(৪) বানি-কোরেজার ইহুদীদিগের এই সকল অপরাধ পুনঃ পুনঃ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়. ওহোদ যুদ্ধের পর তাহারা পুনরায় নূতন সন্ধি স্থাপন করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, অতঃপর আর কখনই তাহারা মুছলমানদিগের শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিবে না—তাহাদিগকে কোন প্রকারে সাহায্য করিবে না। এবারও তাহাদিগকে বিনাদণ্ডে ও বিনা ক্ষতিপূরণে মা'ফ করিয়া দেওয়া হয়।

(৫) কিন্তু পরিখা সমরের পূর্বে অর্থাৎ নূতন সন্ধি স্থাপনের পর, প্রথম সুযোগপ্রাপ্তি মাত্রই তাহারা এই সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শত্রুদলে যোগদান করে। এই বিপদের সময় হযরত মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে তাহাদিগের নিকট পাঠাইয়া এই বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতার পরিণাম তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। কিন্তু, সে সকল উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাহারা চরম ধৃষ্টতা সহকারে উত্তর দিয়াছিল যে, 'মোহাম্মদকে আমরা চিনি না—তাহার কোন সন্ধিপত্রের ধারও আমরা ধারি না।'

(৬) অতঃপর তাহারা আপনাদিগের সমস্ত শক্তি লইয়া প্রকাশ্যভাবে পরিখা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। মোছলেম মহিলা ও বালক-বালিকাগণকে আক্রমণ এবং তাহাদিগের হত্যাসাধনের ভার এই নরাধমগণই গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলে একদল মুছলমানকে পরিখা পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের শক্তি সেই দিকে প্রয়োগ করিতে হইত। পক্ষান্তরে দশ সহস্র দুর্ধর্ষ আরব সহজে অরক্ষিত পরিখা অতিক্রম করিয়া নগর প্রবেশপূর্বক মুছলমানদিগকে নির্মূল করিতে পারিত। তাহাদিগের সঙ্কল্প সফল হইলে মুছলমানের নামগন্ধ দুনিয়া হইতে চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

## কোরেজার বর্তমান সঙ্কল্প

কোরেজা গোত্রের অতীত অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। নরাধমগণ এই পর্যন্ত আসিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা যখন দেখিল যে, আরবগণ সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করার উপক্রম করিতেছে, তখন তাহারা অনুতপ্ত বা চিন্তিত না হইয়া নিজেরাই মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বানি নাজির গোত্রের হোয়াই-এবন-আখতবের কথা পাঠকগণের স্মরণ আছে। হোয়াই সদলবলে খায়বারে গমন করিয়া সেখানকার ইহুদীদিগের সমাজপতি হইয়া বসিয়াছিল। এই হোয়াই যে পরিখা সমরের একজন অন্যতম উদ্যোক্তা, তাহাও পাঠকগণ যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন। খায়বারের এবং নাজির বংশের প্রবাসী সমস্ত ইহুদীই এখন হোয়াই-এর অনুগত ও আজ্ঞাধীন। সুতরাং তাহারা মনে করিল যে, একটু সামলাইয়া লইয়া হেজাজের সমস্ত ইহুদীকে একত্র করিয়া তাহারা মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিবে। নরাধম হোয়াই এই জন্য খায়বারে না গিয়া কোরেজাদিগের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময় সে যে খায়বারের ইহুদীদিগকে সুসজ্জিত হইয়া শীঘ্র মদীনা আক্রমণ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এহেন বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচদিগকে এমন অবস্থায় পুনরায় প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেওয়া—আর মুছলমানদিগকে স্বহস্তে হত্যা করা একই কথা। কাজেই পরিখা সমর হইতে অব্যাহতি লাভ করার পরমুহূর্তে হযরত আদেশ দিলেন—'কালবিলম্ব না করিয়া সকলে যাত্রা কর, কোরেজাদিগের দুর্গ অবরোধ করিতে হইবে।' হযরতের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র মুছলমানগণ যাত্রা আরম্ভ করিলেন—হযরত আলী পতাকাধারীরূপে সর্বাগ্রে গমন করিলেন। তিনি ও তাঁহার সহযাত্রিগণ দুর্গের নিকটবর্তী হইলে, নরাধমগণ দুর্গতোরণ হইতে হযরতের ও তাঁহার সহধর্মিণীগণের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার অশ্লীল ও অকথ্য গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের ধারণা ছিল—খায়বরের বিরাট ইহুদী বাহিনী শীঘ্রই মদীনার উপর আপতিত হইবে, তখন তাহারা একযোগে মুছলমানদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। কোরেশ প্রভৃতি আরব জাতি দূর হইয়া গিয়াছে, ভাল হইয়াছে। এখন মদীনা প্রদেশের বিশাল রাজত্বটা এক ইহুদীদিগেরই হইয়া যাইবে। এই সকল খেয়ালের বশবর্তী হওয়াতেই তাহাদিগের স্পর্ধা এমন চরমে উঠিয়াছিল। অন্যথায় এহেন বিপদের সময় এমন ধৃষ্টতা প্রকাশ করা তাহাদিগের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

## দুর্গ অবরোধ

যাহা হউক, তিন সহস্র মুছলমান যথাসাধ্য সত্বর বানি-কোরেজার দুর্গ অবরোধ করিলেন। হযরত সেখানে উপস্থিত হইলে এবং আলী তাঁহাকে ইহুদীদিগের কঠোর ও অশ্লীল গালাগালির কথা জ্ঞাপন করিলে, হযরত সদয়ভাবে উত্তর করিলেন—আমার অনুপস্থিতিতে যাহা বলিয়াছে, সে সম্বন্ধে কেহ কিছু মনে করিও না। উহারা আর ঐরূপ কথা বলিবে না। অতঃপর হযরত তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন, কিন্তু নরাধমগণ বিশেষ ধৃষ্টতাসহকারে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। কিন্তু কোরেজা গোত্রের সমাজপতি কা'ব সকলকে বুঝাইয়া বলিল—"এই নরাধম (হোয়াই) আমাদিগের সর্বনাশ করিয়াছে। তোমরা আর ইহার কুহকে ভুলিও না। এখন আমা'র কথা শোন—যে উপায়ে হউক মোহাম্মদের সহিত একটা মিটমাট করিয়া লও, নচেৎ আর রক্ষা নাই।" কা'ব নিজের অপরাধের গুরুত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিল, তাই সে প্রস্তাব করিল ঃ আমরা মুছলমানদিগকে কিছু কর দিতে স্বীকার করিয়া তাহাদিগের সহিত একটা ছোলেহ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলি, ইহাই আমার শেষ প্রস্তাব। কিন্তু দুষ্ট ইহুদিগণ তখনও আশা করিতেছিল যে, খায়বার হইতে বিরাট ইহুদী বাহিনী আসিয়া শীঘ্রই মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিবে। কাজেই কা'বের এ প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইয়া গেল। এইরূপে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন তাহারা দেখিল যে, খায়বার বাহিনীর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়ার আর কোনই আশা নাই, তখন তাহারা হযরতের নিকট সন্ধির প্রস্তাব ও তাহার শর্ত পাঠাইতে আরম্ভ করিল। হযরত তখন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন—"তোমরা সকলে আমার নিকট বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ কর, আমার বিচার-মীমাংসা মান্য করিয়া চলিয়া আইস। ইহা ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন প্রস্তাব আমি শুনিতে প্রস্তুত নহি।" কিন্তু তখন কোরেজাদিগের কর্মফল ভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাই নরাধমগণ দয়ার সাগর মোস্তফা চরণে আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মতিজ্ঞাপন করিল। হযরতের দয়া ও ক্ষমাগুণের পরিচয় তাহারা বহুবার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কাইনোকা ও নাজির গোত্রের বিদ্রোহীদিগের প্রতি হযরত যে সদয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাও অবগত ছিল। কিন্তু তাহারা হযরতকে প্রত্যাখান করিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, আমরা ছা'আদ-এবন-মাআজের বিচার মান্য করিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। হযরত এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে ইহুদিগণ দুর্গ পরিত্যাগপূর্বক আত্মসমর্পণ করিল।

ছা'আদ পরিখা যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের আশা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। এই অবস্থায় তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া মছজিদে আনয়ন করা হইল। ছা'আদ সমস্ত কথা শুনিয়া হযরতকে বলিলেন—আপনিই ইহাদের সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করুন। কিন্তু হযরত তাঁহাকে উভয়পক্ষের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা বুঝাইয়া দিলে তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন। ছা'আদ তখন সেই মজলিসে সকল পক্ষকে ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, তাঁহার আদেশ সকলে মান্য করিবেন। তাহার পর ছা'আদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—উহাদিগের যোদ্ধ পুরুষগণকে কতল করা হউক, অন্যান্য সকলকে বন্দী করা হউক এবং উহাদিগের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হউক, ইহাই আমার সিদ্ধান্ত। বলা বাহুল্য যে, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কোরেজার একদলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং একদলকে বন্দী করা হইল।

## খ্রীষ্টান লেখকগণের গাত্রদাহ

পরিখা সমরের অকৃতকার্যতার ফলে কোরেশের পক্ষে সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণের আশা চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টানজগৎ এরূপ ক্ষেত্রে চিরকালই ইহুদীদিগের দ্বারা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এখানেও মুছলমানদিগের ধ্বংসসাধনের একমাত্র উপলক্ষ ছিল কোরেজার ইহুদী সমাজ। তাহাদিগের শয়তানী শক্তিও আজ চিরকালের মত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। এ দুঃখ কি রাখিবার ঠাঁই আছে। তাই যীশুখৃষ্টের আদর্শ শিষ্যগণের প্রেমবৃত্তি এস্থলে অতিমাত্রায় স্ফুরণপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের আবেগে তাহারা এরূপ শোচনীয়ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, এ ক্ষেত্রে নিজেদের ভাষার সংযমও তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু বানি-

কোরেজার ইহুদী নরপিশাচগণ পূর্ণ চারি বৎসর ব্যাপিয়া বিদ্রোহ, কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতার যে নারকীয় অভিনয় করিয়া আসিতেছিল, মুছলমানদিগকে সবংশে বিনষ্ট করার জন্য তাহারা যে সকল ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, এবং হযরতের পুনঃপুনঃ ক্ষমা সত্ত্বেও, প্রত্যেক সুযোগেই মুছলমানদিগের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারা নিজেদের নীচতার যে প্রকার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে এই বিদ্রোহীদিগের একদলের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা যে খুবই সঙ্গত এবং খুবই সমীচীন হইয়াছে, কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ করিতে পারিবেন না। এখানে পাঠকগণ ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, ইহুদিগণই ছা'আদকে বিচারকরূপে নির্বাচিত করিয়াছিল এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করিবেন বলিয়া হযরতও ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

## ঐতিহাসিকগণের প্রলাপোক্তি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আমরা উপরে খ্রীষ্টান লেখকগণের প্রতি দোষারোপ করিয়াছি। কিন্তু এখানে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহাদিগের সমস্ত আক্রমণ এবং সকল প্রকার অপবাদের প্রধান অবলম্বন আমাদিগের তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ। বিজয়ের গুরুত্ব বর্ধনের জন্য, অথবা স্বাভাবিক অবহেলার নিমিত্ত কিংবা ব্যক্তিগত নীচ স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ইহারা নিজেদের পুঁথিগুলিতে ইতিহাসের নামে যে প্রকার সত্যের অপচয় বা অক্ষমার্হ অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা যথাস্থানে বিশদরূপে অবগত হইয়াছেন। ইঁহারা হযরতের জীবনী সম্বন্ধে বিনা তদন্তে ও বিনা পরীক্ষায় যে সকল অমূলক কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, স্থানে স্থানে তাহা পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এক কথায়, ইঁহারা বহু যত্নে যে কালিমারাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, ইউরোপীয় লেখকগণ হযরতের চরিত্র অঙ্কনে সুনিপুণ হস্তে তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ এবং তাঁহাদিগের পুঁথিগুলিকে মোহাদ্দেছ ও ইমামগণ যে কি চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন, ভূমিকায় তাহা বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

## বিশ্বস্ত হাদীছের প্রমাণ

এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, কোরেজা গোত্রের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকে হত্যা করা হইয়াছিল। নিহত ব্যক্তিগণের সংখ্যা দিতেও তাঁহারা কৃপণতা করেন নাই। তবে ইহাতেও যথারীতি অনেক মতবিরোধ দেখা যায়। যাহা হউক, তাঁহারা এই সংখ্যা ছয় শত হইতে নয় শত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিরমিজী, নাছাই প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে "বিশ্বস্ত সূত্রে" কোরেজা অভিযানে উপস্থিত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে—

كانوا اربع مائة، فلما فرغت من قتلهم - الحديث

এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'ছা'আদ কোরেজার পুরুষদিগকে নিহত করার আদেশ প্রদান করেন—তাহাদিগের সংখ্যা ছিল চারি শত। অতঃপর তাহারা নিহত হওয়ার অব্যবহিত পরে ছা'আদের মৃত্যু হয়।' এই হাদীছের রাবী কোরেজার পুরুষদিগের সংখ্যা দিতেছেন—চারি শত। পক্ষান্তরে তিনি নিহতদিগের সংখ্যা প্রদানের সময় স্পষ্টতঃ কোন কথা না বলিয়া, ছা'আদের আদেশ ও কোরেজার পুরুষ সংখ্যা মিলাইয়া যুক্তির হিসাবে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সমস্ত পুরুষকে যখন নিহত করার আদেশ দেওয়া হয় এবং যখন তাহাদিগের সংখ্যা চারি শত হওয়াও নিশ্চিত, তখন ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ঐ চারি শত পুরুষকে নিহত করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, রাবীর যুক্তির উপক্রমভাগের অনুমানটিকে অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও তদ্দ্বারা, ঐতিহাসিকগণের অসাবধানতা ও অতিরঞ্জন-প্রিয়তার যথেষ্ট প্রমাণ হইয়া যাইতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আলোচ্য কিংবদন্তীগুলি সঙ্কলনের সময় তাঁহারা ছেহাহ্ছেত্তার হাদীছ এমন কি কোরআনের আয়াতসমূহের সন্ধান লওয়াও আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। এ সম্বন্ধে আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বস্তুত রাবীর প্রথম অনুমানটি অভ্রান্ত নহে। এই দাবীর প্রমাণগুলি নিম্নে বিশদরূপে আলোচিত হইতেছে।

আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, উপরি বর্ণিত হাদীছের রাবী জাবের বলিতেছেন যে,

ছা'আদ "সমস্ত পুরুষকে" নিহত করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বোখারী ও মোছলেমের ন্যায় বিশ্বস্ততম হাদীছ গ্রন্থে ছা'আদের উক্তি স্পষ্টাক্ষরে উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

اني احكم فيهم ان تقتل المقاتلة

"আমি আদেশ করিতেছি যে, যুদ্ধে লিপ্ত* পুরুষদিগকে নিহত করা হউক।" আলোচ্য হাদীছের কোন রাবী ভ্রমক্রমে এই অত্যাবশ্যকীয় বিশেষণটি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাই "যুদ্ধে লিপ্ত পুরুষদিগকে নিহত করা হউক" এই পদটি "পুরুষদিগকে নিহত করা হউক" পদে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখন তিরমিজী ও নাছাই প্রভৃতির হাদীছটিকে বোখারী ও মোছলেমের হাদীছের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে, সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, কোরেজার বন্দীদিগের সম্বন্ধে ছা'আদের আদেশ প্রচারিত হওয়ার পর, কে মোকাতেল আর কে মোকাতেল নহে, তৎসম্বন্ধে একটা বিচার হইয়াছিল। বিচারের পর ঐ চারি শত পুরুষের মধ্যে যাহাদিগের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তাহাদিগের মুক্তি দেওয়া বা বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

## তৃতীয় প্রমাণ—কোর্‌আন

কোর্‌আন শরীফে বানি-কোরেজার এই ঘটনা বর্ণনাকালে কথিত হইয়াছে ঃ

وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا - الاية

অর্থাৎ "যে সকল গ্রন্থধারী (ইহুদী) কোরেশগণের সহায়তা করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদিগের দুর্গমালা হইতে বহির্গত করিলেন, এবং তাহাদিগের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দিলেন, (তাহাতে) তাহারা একদলকে নিহত করিতে এবং একদলকে বন্দী করিতে লাগিলে....।"** এই আয়ৎ দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোরেজার যে সকল পুরুষ কোরেশদিগের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগের একদলকে বন্দী করা হইয়াছিল—সকল পুরুষকে নিহত করা হয় নাই। সুতরাং নাছাই ও তিরমিজী বর্ণিত চারি শত পুরুষের মধ্য হইতেও যে কতকগুলি লোককে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

## চতুর্থ প্রমাণ—হাদীছ

এবন-আছাকের একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ, ওয়াকেদী ও এবন-এছহাক অপেক্ষা তাঁহার মর্যাদা কত অধিক, অভিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। কোরেজার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত হাদীছটির বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

فقتل رسول الله صلعم منهم ثلاث مائة وقال لبقيتهم انطلقوا الى

ارض المحشر فانا في آثاركم يعني ارض الشام فسيرهم اليها -

অর্থাৎ—অতঃপর হযরত তাহাদিগের তিন শত পুরুষকে নিহত করিলেন এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে বলিলেন—তোমরা সিরিয়া প্রদেশে চলিয়া যাও, অবশ্য আমরা তোমাদিগের গতিবিধির সন্ধান রাখিতে থাকিব। অতঃপর হযরত তাহাদিগকে সিরিয়া প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন।*** আমাদিগের রেওয়ায়ৎ সঙ্কলকগণের বর্ণনাগুলি যে কিরূপ ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ এবং তাহা যে কতদূর অতিরঞ্জিত, উপরের আলোচনা হইতে পাঠকগণ তাহার আভাস পাইতেছেন।

## পঞ্চম প্রমাণ—সাধারণ যুক্তি

কোরেজার ইহুদিগণ আত্মসমর্পণ করিলে তাহাদিগকে কোথায় রাত্রিবাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ইতিহাস লেখকগণ রাবীদিগের প্রমুখাৎ তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক হলবী এই পরস্পর বিপরীত বর্ণনাগুলিকে কোন প্রকারে সমঞ্জস করিয়া বলিতেছেন যে, কোরেজার সমস্ত পুরুষকে ওছামা-এবন-জায়েদের গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। একে তখনকার

---

* অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সমর্থ। ** ছুরা আহজাব। *** কানজুল-ওম্মাল ৫—২৮২ পৃষ্ঠা।

সাধারণ দারিদ্র্য, তাহার পর জায়েদ ও তাঁহার পুত্রের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা, এবং সর্বোপরি তৎকালীন আরবদিগের গৃহনির্মাণের ধারা—একসঙ্গে বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাঠকমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, ওছামার গৃহ একখানা ক্ষুদ্র পর্ণকুটির ব্যতীত আর কিছুই নহে। না হয় তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলাম যে, উহা একখানা বড় ঘর। এখন পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন যে, ঐ শ্রেণীর একখানা ঘরে কত লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে? আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ একদিকে হিসাব দিতেছেন যে, নয় শত বন্দীকে নিহত করা হইয়াছিল ;—অন্যদিকে তাঁহারাই আবার বলিয়া দিতেছেন যে, নিহত বন্দীদিগকে পূর্বরাত্রে ওছামার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। অতএব তাঁহাদিগের বর্ণনা যে কতদূর বিভ্রান্ত, তাহা ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অবশিষ্ট নরনারীগণকে হযরত সিরিয়া প্রদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবন-আছাকেরের বর্ণিত হাদীছে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। সিরিয়া প্রদেশটি তখন ইহুদী জাতির প্রধান কেন্দ্র ছিল, এইজন্য কোরেজার ইহুদীদিগকে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কোরআনের فاما منا بعد واما فداء আয়ৎ হইতেও ইহার সমর্থন হইতেছে।

## রায়হানার মিথ্যা গল্প

ওয়াকেদী ও এবন-এছহাক বলিয়াছেন যে, রায়হানা নাম্নী কোরেজার একটি স্ত্রীলোককে হযরত বাঁদীস্বরূপে রাখিয়াছিলেন। এবন-ছা'আদ বলিয়াছেন যে, মুক্তিদান করার পর হযরত তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি গল্প-গুজবের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এই বিবরণটি এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য গল্পগুলি ভিত্তিহীন উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হাফেজ-এবন-মন্দার ন্যায় রেজাল শাস্ত্রের ইমাম স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে—

واستسرى ريحانة من بنى قريظة ثم اعتقها فلحقت باهلها

"অর্থাৎ হযরত বানি-কোরেজার রায়হানাকে বন্দী করার পর মুক্ত করিয়া দিলে, রায়হানা স্বীয় পরিজনগণের নিকট চলিয়া গেল।" হাফেজ-এবন-হাজরও ইহার সমর্থন করিয়াছেন।*

হিজরীর পঞ্চম সনের শেষভাগে হযরত বিবি জয়নাবকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

## পঞ্চম সনের অন্যান্য ঘটনা

আরবের স্ত্রীলোকগণ এতদিন অসংযতভাবে যত্রতত্র যাতায়াত করিত, পোশাক-পরিচ্ছদের সুরুচি ও ভব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইত না। এই সময় আদেশ প্রদত্ত হইল যে, ভদ্রমহিলাগণ বাটী হইতে বাহির হইবার সময় বড় চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া লইবেন। সুরুচি ও শ্লীলতার বিপরীত অন্যান্য প্রথাগুলিও সঙ্গে সঙ্গে রহিত করিয়া দেওয়া হইল।

আরবে ব্যভিচারের কোন দণ্ড ছিল না। এছলাম এই সনে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে এই ধারা যোগ করিয়া দিল যে, ব্যভিচারী নরনারীকে এখন হইতে কঠোর শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাশীলতার হানি করা এবং তাহাদিগের নামে কুৎসিত অপবাদ রটনা করা তখন আরবীয়দিগের নিকট খুবই মজার জিনিস বলিয়া পরিগণিত হইত। স্ত্রীলোকেরা অগত্যা ইহা সহ্য করিয়া থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের আত্মসম্ভ্রম জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া যাইত। হিজরীর পঞ্চম সনে কোরআনের ভাষায় ঘোষণা করা হইল : "যদি কেহ সতীসাধ্বী নারীদিগের প্রতি দুশ্চরিত্রতার দোষারোপ করে, তাহা হইলে তাহাকে নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য চারিজন (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইবে। অন্যথায় অপবাদ রটনাকারীর প্রতি ৮০ দোররার দণ্ড প্রদত্ত হইবে এবং তাহার সাক্ষ্য আর কখনই গ্রাহ্য করা হইবে না।" এই সঙ্গে স্ত্রীবর্জনের কতকগুলি প্রচলিত রীতির সংস্কারও এই সনে করিয়া দেওয়া হয়।

পরিখা সমর পঞ্চম হিজরীর জিলকা'দ মাসে সংঘটিত হইয়াছিল।

---

* এছাবা: ৮—৯০ পৃষ্ঠা।

# ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

## انا فتحنا لك فتحا مبينا

### মুছলমানদিগের তীর্থযাত্রা—হোদায়বিয়া সন্ধি !

দীর্ঘ ছয়টি বৎসর অতিবাহিতপ্রায়—মোহাজেরগণ ধর্মের নামে দেশত্যাগী হইয়াছেন। মদীনার আনছারগণের আন্তরিক যত্ন ও অনুপম ত্যাগ স্বীকারের ফলে, তাঁহাদিগের কোন বিষয়ে বিশেষ কোন অভাব হয় নাই সত্য, কিন্তু জননী-জন্মভূমির প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা ত যাইবার নহে। বিশেষতঃ তাঁহাদের বড় আদরের, বড় যত্নের এবং বড় সম্মানের কা'বা মসজিদ—অর্ধযুগ হইতে তাহার ছায়াদর্শনের সৌভাগ্যও তাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই। তাই আনছার ও মোহাজেরগণ একবার মক্কায় গমন করার এবং সেখানে গমন করিয়া কা'বায় উপাসনাদি সম্পন্ন করার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। করুণার ছবি রহমতের নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাও ব্যাকুলচিত্তে সেই সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ছাহাবাগণ যখন ব্যাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ "হযরত ! কা'বার তীর্থ করা কি আর আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না ?" হযরত তখন সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাহার সুযোগ করিয়া দিবেন।"

এছলামের বয়ঃক্রম এখন ১৯ বৎসর। এই দীর্ঘকালব্যাপিয়া শয়তান নিজের সমস্ত শক্তি লইয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। দৈত্য-দানবগণের তাণ্ডবনৃত্যে আরবদেশ কাঁপিয়া গিয়াছে। কিন্তু শয়তান ও তাহার অনুচরবর্গের সমস্ত চেষ্টা ও সকল উদ্যোগকে উপেক্ষা করিয়া সত্য আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে। তাই শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আজ আরবের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাওহীদের বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, শয়তান নতজানু হইয়া পরাজয় স্বীকার করিতেছে। কোরেশ এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, মুছলমানদিগকে 'পিষিয়া মারার' সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হইবে না, তাহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে,—"মোহাম্মদ অজেয়।" কিন্তু এখনও তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে, মোহাম্মদ অজেয়, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, "সত্য অজেয়।" এখন তাহারই সূত্রপাত হইতে চলিল।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকা'দ মাসে হযরত মক্কাধামে তীর্থযাত্রা করার বাসনা প্রকাশ করিলেন। ইহা যে কেবল তীর্থযাত্রা, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত ইহার যে কোনই সম্বন্ধ নাই—সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাগুলি সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। নির্দিষ্ট তারিখে ন্যূনাধিক ১৫ শত ভক্তকে লইয়া হযরত তীর্থযাত্রা করিলেন। কোরবানীর পশু ইত্যাদি যথানিয়মে সঙ্গে লওয়া হইল। হযরত তীর্থযাত্রা করিতেছেন শুনিয়া মদীনার পার্শ্ববর্তী নবদীক্ষিত বেদুঈন গোত্রসমূহ তাঁহার সহযাত্রী হইবার জন্য মাতিয়া উঠিল। কিন্তু উত্তেজনার সময় ইহাদিগকে সংযত করিয়া রাখা কষ্টকর হইবে। পক্ষান্তরে কোরেশগণও মনে করিতে পারে যে, মুছলমানগণ মক্কা আক্রমণের জন্য দলেবলে অগ্রসর হইয়াছে। তাই এই বেদুঈন জাতিগুলিকে এবারকার মত ক্ষান্ত করিয়া দেওয়া হইল। পাছে কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয়, তাই তীর্থযাত্রার নিয়মানুসারে কোরবানীর পশুগুলিকে সাজাইয়া-গোজাইয়া অগ্রে অগ্রে রওয়ানা করিয়া দেওয়া হইল। রজব, জিলকা'দ জিলহাজ্জ ও মহররম মাসকে আরবগণ বিশেষরূপে মান্য করিয়া চলিত। এই চারি মাস তাহাদিগের সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হইয়া যাইত এবং সকলে শান্তি ও স্বস্তির সহিত তীর্থযাত্রা ও বাণিজ্যাদি কার্যে লিপ্ত হইতে পারিত। এই সময় শত্রু-মিত্র সকলেই তীর্থার্থে মক্কায় আগমন করিত এবং তীর্থ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইত। কেহ তাহাতে কোন বাধা দিত না, বাধা দিবার অধিকারও কাহারো ছিল না—এই প্রকার বাধা দেওয়াকে আরবগণ মহাপাপ বলিয়াই মনে করিত। হযরত মুছলমানদিগকে লইয়া জিলকা'দ মাসে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, পাঠকগণ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু জেদ, ঈর্ষা ও অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া আজ কোরেশগণ নিজেদের চিরাচরিত সংস্কারকে পদদলিত করিতেও একবিন্দু কুণ্ঠিত হইল না।

"কী, এত বড় স্পর্ধা ! সেই বিতাড়িত, বিদূরিত নাস্তিকটা তাহার শত শত অনুচরকে সঙ্গে করিয়া আবার মক্কায় প্রবেশ করিবে, তাহারা স্পর্ধা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, আর আমরা তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিব ? ইহা অপেক্ষা মরণ ভাল।" এই প্রকারে কোরেশ দলপতিগণ মক্কায় উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া পার্শ্ববর্তী সমস্ত আরব জাতিকে সংবাদ দিল—এইবার শিকার মুখের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সকলে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া আইস ! মুছলমানদিগকে বাধা দিবার জন্য, খালেদ-এবন-অলীদ ও একরামা-এবন-আবু-জেহেল কয়েকশত অশ্বসাদী সৈন্য লইয়া সর্বাগ্রে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু হযরত তাহাদিগের চোখ বাঁচাইয়া অন্য পথে মক্কার নিকটবর্তী "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এইখানে একটা পুরাতন কূপ অবস্থিত ছিল। মুছলমানগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহা হইতে পানি তুলিতে আরম্ভ করিলে অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সমস্ত পানি নিঃশেষিত হইয়া যায়, নিকটে অন্য কোথাও পানি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই ভক্তগণ হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া পানির অভাবের কথা জ্ঞাপন করিলেন। তখন হযরতের প্রার্থনায় কূপটি পুনরায় পানিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

## বাধা প্রদান ও সন্ধির প্রস্তাব

খোজাআ গোত্রের আরবগণ পৌত্তলিক হইলেও হযরতের সহিত তাহাদিগের বিশেষ মিত্রতা ছিল। মুছলমানগণ ইহাদিগের নিকট বহুবার বিশেষ সাহায্যও পাইয়াছিলেন। পরিখা সমরের আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠকগণ ইহাদের সহানুভূতির পরিচয় পাইয়াছেন। হযরতের আগমন সংবাদ পাইয়া খোজাআ গোত্রের দলপতি বোদায়েল-এবন-অরকা স্বগোত্রের অন্য কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ঃ "আমি দেখিয়া আসিতেছি, কোরেশ দলপতিগণ প্রস্তুত হইতেছে। তাহারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং কোনমতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না।" বোদায়েলের কথা শুনিয়া হযরত বিশেষ মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেনঃ "তুমি গিয়া কোরেশকে বল, আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসি নাই। আমরা যাত্রী তীর্থ করিতে আসিয়াছি মাত্র। এই প্রতিহিংসা এবং যুদ্ধের বাতিকে কোরেশ একেবারে জেরবার হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগের মহাক্ষতি হইয়াছে। তাহারা এখনও ক্ষান্ত হউক। আমি বলিতেছি, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোরেশগণ আমার সহিত সন্ধি স্থাপন করুক এবং আমাকে ও আরব জাতিকে স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব কর্তব্য পালন করিতে ছাড়িয়া দিউক। তাহার পর আমি যদি জয়যুক্ত হই, তাহা হইলে আরবের অন্য সমস্ত গোত্র যে ধর্মে প্রবেশ করে, কোরেশগণ ইচ্ছা করিলে তাহা গ্রহণ করিবে, অন্যথায় তাহারা স্বস্তির সহিত বিশ্রাম করিবে। পক্ষান্তরে তাহারা যদি ইহাতেও সম্মত না হয়, অর্থাৎ যদি এখনও তাহারা মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে আমিও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইব না।" কোরেশ বিগত ১৯ বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্তভাবে যে কত অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, পাঠকগণ তাহার পরিচয় বহুস্থানে পাইয়াছেন। পরিখা সমরের অকৃতকার্যতার ফলে তাহাদিগের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মদীনা আক্রমণের আশা চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইয়াছে। পরিখা সমরের পর হযরত এ-কথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এখন কোরেশদিগকে তাহাদিগের কৃতকার্যের প্রতিফল দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। হযরত প্রতিশোধ দিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত না হইয়া বরং তাহাদিগকে রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। যুদ্ধে যুদ্ধে কোরেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে—তাহার সর্বনাশ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, না জানি কত বেদনার সহিত হযরত এই কথাগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অথচ এই অন্যায় যুদ্ধগুলি করা হইয়াছিল, তাঁহাকে, মুছলমান সমাজকে এবং এছলাম ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ও সমূলে উৎপাটিত করার জন্য। পক্ষান্তরে প্রথম দিবস হইতে আজ পর্যন্ত কোরেশগণ এছলাম প্রচারে নানা প্রকার বাধা দিয়া আসিতেছে। তাহাদিগকে বলা হইল যে, তোমরা এই বাধা প্রদান স্থগিত রাখ। প্রচারের ফলে এছলাম যদি জয়যুক্ত হয় এবং আরবের সমস্ত গোত্র যদি এছলাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তখন কোরেশগণ স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্তব্য স্থির করিয়া লইবে। যদি তাহাদের মত হয়, তবে তাহারাও সকলের সঙ্গে সত্য ধর্মকে স্বীকার করিয়া লইবে ; আর

ইহাতে যদি তাহাদিগের অমত হয়, তাহারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত বর্তমানবৎ নিজের ধর্মেই থাকিয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা উদার এবং ইহা অপেক্ষা মহান প্রস্তাব আর কি হইতে পারে ?

বোদায়েল কোরেশদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ঃ আমি এখনই মোহাম্মদের নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি কতকগুলি কথা বলিয়া দিয়াছেন। আপনারা শুনিতে চাহিলে বলিতে পারি। তখন গোঁয়ার-গোবিন্দ শ্রেণীর লোকগুলি ঘৃণা ও উপেক্ষার সহিত বলিয়া উঠিল—"রাখ তোমার কথা, কথার আর কাজ নাই !" কিন্তু প্রবীণেরা বোদেলকে সব কথা ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি উপরোক্ত প্রস্তাবটি বুঝাইয়া বলিলেন। বোদেলের বক্তব্য শেষ হইলে ওরওয়া-এবন-মাছউদ নামক জনৈক প্রধান ব্যক্তি (নিজের বিজ্ঞতা ও গুরুত্ব প্রতিপাদনের পর) বলিয়া উঠিল, মোহাম্মদ তোমাদিগকে খুব সরল ও মঙ্গলজনক পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তোমরা অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া আসি।

## সত্যের প্রভাব

ওরওয়া উপস্থিত হইলে হযরত তাহাকেও পূর্ববর্ণিত কথাগুলি বুঝাইয়া দিলেন। হযরতের প্রস্তাব যে খুব সঙ্গত ও সুবিধাজনক, কোরেশদিগের মজলিসে সে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু হযরতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার ক্ষুদ্র অভিমান উগ্র হইয়া উঠিল, এবং সে হযরতকে সম্বোধন করিয়া ভর্ৎসনার স্বরে বলিতে লাগিল ঃ মোহাম্মদ ! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি যদি কোরেশকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে সমর্থ হও, তাহাতেই বা তোমার কি পৌরুষ ! নিজের জাতিকে তোমার পূর্বে আর কেহ ধ্বংস করিয়াছে কি ? পক্ষান্তরে ইহাও ভাবিয়া দেখ যে, যদি পরিণামে আমাদিগের জয় হয়, তাহা হইলে তোমার সঙ্গেকার ছোটলোকগুলি তখনই তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। ওরওয়ার এই প্রকার প্রলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া ছাহাবাদিগের মধ্যে যে কি প্রকার উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্যের কথা দূরে থাকুক, হযরত আবু-বাকর পর্যন্ত অধীর হইয়া ওরওয়াকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন। এদিকে সাধারণ আরবের রীতি অনুসারে ওরওয়া পুনঃ পুনঃ হযরতের দাড়িতে হাত দিতেছিল। এই প্রকার ধৃষ্টতাও কাহারও কাহারও অসহ্য হইয়া উঠিল। যাহা হউক, উভয় পক্ষ হইতে কঠোর ভাষার আদান-প্রদান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত ঐ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা বন্ধ করিয়া দিলেন। ওরওয়া কিছুক্ষণ মুছলমানদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া এবং তাহাদিগের ভক্তির গাঢ়তা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। কিছুক্ষণ পরে ওরওয়া হযরতের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কোরেশদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল ঃ আমি ভক্তি, বিশ্বাস এবং আনুগত্য ও তন্ময়তার যে দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছি, দুনিয়ায় তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। আমি রাজন্যবর্গের নিকট গমন করিয়াছি, কায়সর, কেসরা ও নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছি ; কিন্তু মোহাম্মদের অনুচরবর্গ তাঁহাকে যে প্রকার আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এবং সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাহা কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই। মোহাম্মদ খুব সঙ্গত প্রস্তাব করিয়াছেন, সকলে তাহাতে সম্মত হও ! ওরওয়ার প্রস্থানের পর পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের কয়েকজন আরব সর্দার পর পর হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরভাবে তাঁহার বক্তব্যগুলি শ্রবণ করিল, তাহারা নিজেরাও বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া বুঝিতে পারিল যে, বস্তুতঃ হযরত যুদ্ধের জন্য আগমন করেন নাই, বিদেশী তীর্থযাত্রীর ন্যায় তিনি আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ ও কোরবানী করিয়া চলিয়া যাইবেন। এদিকে তিনি সন্ধি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাও তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত উদার ও সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। কোরেশের জেদের ফলে এহেন প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, অধিকন্তু আরবের চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারকে পদদলিত করিয়া কোরেশগণ তীর্থযাত্রী ও তাহাদিগের পশুগুলিকে মক্কার শহরতলী হইতে ফিরাইয়া দিতেছে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া কোরেশের মিত্র জাতিসমূহের মধ্যে একটা অসন্তোষ ও তজ্জনিত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল। পরস্পরের মধ্যে ইহা লইয়া স্থানে স্থানে দুই একবার বচসাও হইয়া গেল।

## কোরেশের ধৃষ্টতা

আরবগণ এতদিন যাবৎ কোরেশের মুখে শুনিয়া হযরত সম্বন্ধে যে সকল বিরূপ ও জঘন্য ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল, আজ হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করার ফলে সে ধারণা সম্বন্ধে তাহাদিগের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইল। ধূর্ত কোরেশ দলপতিগণ এই অবস্থা দর্শনে বিচলিত হইল এবং মুছলমানদিগের সহিত শীঘ্র শীঘ্র একটা সংঘর্ষ বাধাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এই সময় খেরাশ নামক হযরতের জনৈক দূত সন্ধির প্রস্তাব লইয়া মক্কায় গমন করিলেন। সন্ধির নিমিত্ত নিজের বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শনের জন্য, খেরাশকে হযরত নিজের বিশিষ্ট উটের উপর ছওয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। খেরাশ মক্কায় পৌঁছিলে তাঁহার প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাত করা ত দূরে থাকুক, কোরেশগণ হযরতের উটটাকে মারিয়া ফেলিল। খেরাশকে হত্যা করার জন্যও তাহারা অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব কথিত আরব গোত্রের লোকেরাই তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল—তাঁহাকে হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। এই সময় কোরেশদিগের একটি অগ্রবর্তী সেনাদল মুছলমানদিগকে আক্রমণ করার চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু তাহার অধিকাংশকেই গ্রেফতার করিয়া ফেলা হয়। হযরত তাহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ করিলেন। কোরেশের এই সকল অন্যায় আচরণ এবং হযরতের এই অনুপম উদারতা, নিকটবর্তী আরব গোত্রগুলির উপর যে কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আগামী দুই বৎসরের ঘটনাবলীর দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক, সন্ধিসংক্রান্ত আলোচনার এই দীর্ঘসূত্রতা দেখিয়া হযরত নিজের কোন বিশিষ্ট ছাহাবীকে কোরেশদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবার সংকল্প করিলেন। প্রথমে ওমরের নাম হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সকল দিক বিবেচনা করিয়া ওছমানকে প্রেরণ করাই স্থির করা হইল। ওছমান মক্কায় আসিয়া কোরেশদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, হযরত কেবল তীর্থ করার জন্য আগমন করিয়াছেন। হযরত শান্তির প্রার্থী, তাই তিনি নিজে তোমাদিগের সহিত সন্ধি করার প্রস্তাব করিতেছেন। কোরেশগণ ওছমানের কথায় কোন প্রকার উত্তর দিল না, পক্ষান্তরে তাঁহাকে সেইখানে আটক করিয়া ফেলিল। ওছমানের প্রত্যাগমনে যতই বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, হযরত ও মুছলমানদিগের চাঞ্চল্যও ততই বাড়িয়া চলিল। এই অধীরতার সময় সংবাদ আসিল যে, কোরেশগণ ওছমানকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। কোরেশের পূর্বাপর আচরণের ফলে সকলে এ সংবাদে বিশ্বাস করিলেন।

## ছাহাবাগণের মরণ-পণ

'ওছমান নিহত'—এই সংবাদে ভক্তবৎসল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা যার-পর-নাই বিচলিত হইয়া পড়িলেন, আনছার ও মোহাজেরগণের ক্রোধ ও উত্তেজনার অবধি রহিল না। তখন হযরত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "ওছমানের শোণিতের জন্য কোরেশকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়া ক্ষান্ত হইব না। মরণ-পণ করিয়া সকলে প্রস্তুত হও।" আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই প্রস্তুত হইলেন। স্বদেশ হইতে বহুদূরে, অসংখ্য শত্রুসেনা বেষ্টিত ১৫ শত তীর্থযাত্রী নরনারী, একটি বৃক্ষতলে বসিয়া হযরতের হাতে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—মরিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধ করিব, কোন অবস্থায় একপদ পশ্চাৎবর্তী হইব না—আল্লাহ্‌র নামে আমাদিগের এই প্রতিজ্ঞা। এছলামের ইতিহাসে ইহাই "বায়আতে রেজওয়ান" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোর্‌আন শরীফের "ফৎহ্" নামক ছুরায় এই বায়আতের কথাই উল্লেখিত হইয়াছে।

## কোরেশের চৈতন্য

মুছলমানদিগের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কোরেশ দলপতিগণের চেতনা হইল। মুছলমানের বাহুবল ও ঈমানের তেজ তাহাদিগের অবিদিত ছিল না। পক্ষান্তরে যে আরব গোত্রগুলিকে লইয়া তাহাদের এত স্পর্ধা, তাহাদিগের সহিত ইতিমধ্যে বেশ একটু মত-বিরোধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহারা এই সময় কোরেশকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছিল—"আল্লাহ্‌র ঘর তীর্থ বন্ধ করার জন্য আমরা তোমাদের সহিত সন্ধি করি নাই। হয় তোমরা মোহাম্মদকে তীর্থ করিয়া যাইতে দিবে, না হয়, আমরা সমস্ত লোকজনসহ তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব।" যাহা হউক, এই সকল অবস্থা

গতিকে কোরেশগণ দমিয়া গিয়া ওছমানকে ছাড়িয়া দিল। মুছলমানগণ তাঁহাকে পাইয়া শান্ত হইলেন। পক্ষান্তরে কোরেশগণ ছোহেল-এবন-আমর নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। ইহারা কোরেশের প্রতিনিধি হিসাবে সন্ধির শর্তগুলি আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই বলিয়া উঠিল ঃ "এবার তোমাদিগকে এখান হইতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। নচেৎ আরব বলিবে, মোহাম্মদ জোর করিয়া তীর্থ করিয়া গিয়াছে। এ অপমান, এ হেয়তা, আমরা সহ্য করিতে পারিব না।" কিন্তু এতবড় স্পর্ধার কথা সহিয়া যাওয়া মুছলমানদিগের পক্ষেও কষ্টকর হইয়া উঠিল। সত্যের সেবায় আত্মবলিদান করাই যাহাদিগের সাধক-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা, আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করার জন্য যাহারা নিজেদের প্রাণগুলিকে সর্বদাই করপুটে লইয়া বসিয়া আছে—কোরেশের এই স্পর্ধা সহ্য করা তাহাদিগের পক্ষে কতদূর যন্ত্রণাদায়ক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং চতুর্দিক হইতে ক্ষুব্ধ অভিমানের অস্ফুট অভিব্যক্তি শ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু হযরত সকলকে শান্ত করিয়া বলিলেন—ন্যায়ের নামে, শান্তির নামে এবং আত্মীয়তার নামে কোরেশ আমার নিকট যে দাবী করিবে, আমি তাহা পূরণ করিব। ছোহেল, আমি তোমার এই শর্ত স্বীকার করিয়া লইতেছি।

## সন্ধির শর্ত

তখন বহু বাদ-প্রতিবাদের পর নিম্নলিখিত শর্তে সন্ধি হওয়াই স্থিরীকৃত হইল ঃ

১। মুছলমানগণ এ বৎসর হোদায়বিয়া হইতে ফিরিয়া যাইবেন।

২। আগামী বৎসর তাঁহারা তীর্থ করিতে আসিতে পারিবেন—কিন্তু তিন দিনের অধিক মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন না।

৩। পথিকদিগের জন্য যতটা আবশ্যক, মুছলমানগণ মাত্র সেই পরিমাণ অস্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিবেন—তাহাও থলির মধ্যে বদ্ধ করিয়া আনিতে হইবে।

৪। মক্কায় যে সকল মুছলমান আছে, মোহাম্মদ তাহাদিগকে মদীনায় লইয়া যাইতে পারিবেন না। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্য হইতে কেহ যদি মক্কায় থাকিয়া যাইতে চায়, তিনি তাহাকে বারণ করিতে পারিবেন না।

৫। তাহাদিগের মধ্যকার কোন পুরুষ কোরেশদিগের নিকট পলাইয়া আসিলে কোরেশগণ তাঁহাকে মুছলমানদিগের নিকট ফিরাইয়া দিবে না। কিন্তু মক্কার কোন মুছলমান বা অমুছলমান (পুরুষ) মুছলমানদিগের নিকট গমন করিলে, মুছলমানগণ তাহাকে কোরেশের নিকট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৬। অতঃপর কোন পক্ষ অন্য পক্ষের সহিত কোন প্রকার শত্রুতাচরণ করিবে না।

৭। আরবের অন্য গোত্রগণ স্বেচ্ছামতে যে কোন পক্ষের সহিত স্বাধীনভাবে মিত্রতা স্থাপনের অধিকারী হইবে।*

## নূতন পরীক্ষা

সন্ধির শর্তগুলি স্থির হইয়া গিয়াছে, সন্ধিপত্র লিখিত হইবার আয়োজন হইতেছে। এক মহামতি আবু-বাকর ব্যতীত অন্য সমস্ত মুছলমানই এই "হেয়তাজনক" শর্তগুলির জন্য যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। মজলিসের চারিদিক হইতে অসন্তোষের কলরব উঠিতেছে, ওমর উত্তেজিত স্বরে প্রতিবাদ করিতেছেন, আর হযরত সকলকে বুঝাইয়া-সুজাইয়া শান্ত করিতেছেন। ঠিক এই সময় আবু-জন্দল নামক জনৈক মুছলমান লৌহ-শৃঙ্খল বিজড়িত অবস্থায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবু-জন্দল এছলাম গ্রহণ করায় তাঁহার স্বজনবর্গ নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে ধর্মচ্যুত করার চেষ্টা করিতেছিল। এখন সুযোগ পাইয়া তিনি হযরতের নিকট পলাইয়া আসিয়াছেন। আবু-জন্দলকে দেখিয়াই ছোহেল বলিতে লাগিল—সত্য রক্ষার এই প্রথম পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। মোহাম্মদ ! তুমি এখন আবু-জন্দলকে কোরেশের নিকট

* ছহী মোছলেমের বিভিন্ন হাদীছ হইতে সঙ্কলিত।

ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। হযরত ছোহেলকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন—আবু-জন্দলের দাবী ত্যাগ করার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না। তখন হযরত অগত্যা আবু-জন্দলকে মক্কায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। সে কি করুণ দৃশ্য ! আবু-জন্দল নিজের শরীরের ক্ষতগুলি দেখাইয়া হযরতকে ও মুছলমানদিগকে বলিতেছেন—আজ আমাকে কোরেশদিগের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে। সেখানে ধর্মচ্যুত করার জন্য আমার উপর আবার এই প্রকার অত্যাচার করা হইবে। হযরত তখন আবু-জন্দলকে সম্বোধন করিয়া গভীর বেদনাযুক্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'আবু জন্দল ! তোমার পরীক্ষা খুবই কঠিন, ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ্‌র নামে শক্তি সঞ্চয় করতঃ সমস্ত সহিয়া যাও। তোমার ও তোমার ন্যায় উৎপীড়িত মুছলমানদিগের জন্য আল্লাহ্ শীঘ্রই উপায় করিয়া দিবেন। আমরা এইমাত্র সন্ধি করিয়াছি, তাহার অমর্যাদা করা অসম্ভব।' অতঃপর আবু-জন্দলকে কোরেশদিগের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

সন্ধি-পত্র লেখার ভার আলীর উপর ন্যস্ত হইল। হযরতের উপদেশ মতে তিনি প্রথমে লিখিলেন ঃ بسم الله الرحمن الرحيم 'করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্‌র নামে।' ছোহেল প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, তোমাদের এই "রহমান"কে আমরা চিনি না। আমাদিগের চিরাচরিত রীতি অনুসারে উহার স্থলে باسمك اللهم লিখিয়া দাও। হযরত বলিলেন, আচ্ছা তাহাই লেখা হউক। তাহার পর লেখা হইল ঃ 'আল্লাহ্‌র রছুল মোহাম্মদ, কোরেশ প্রতিনিধি ছোহেলের সহিত এই মর্মে সন্ধি করিতেছেন যে……।' ছোহেল আপত্তি করিয়া বলিল—আমরা তোমাকে আল্লাহ্‌র রছুল (প্রেরিত) বলিয়া স্বীকার করিলে আর এত গণ্ডগোল হইবে কেন ? 'মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ্' পদের 'রছুলুল্লাহ্' শব্দ কাটিয়া 'মোহাম্মদ-এবন-আবদুল্লাহ্' লিখিতে হইবে। হযরত বলিলেন—আমি আবদুল্লাহ্‌র পুত্র, ইহাও মিথ্যা নহে। অতএব 'রছুলুল্লাহ্' কাটিয়া দেওয়া হউক। তখন মুছলমানদিগের মনস্তাপ ও উত্তেজনা ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল এবং তাঁহারা চারিদিক হইতে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আলী সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, 'প্রভু ! ক্ষমা করিবেন, আমি ঐ শব্দটা কাটিয়া দিতে পারিব না।' তখন হযরতের আদেশে আলী ঐ শব্দটা দেখাইয়া দিলে হযরত নিজ হস্তে কলম ধরিয়া তাহা কাটিয়া দিলেন। তাহার পর সন্ধিপত্র লিখিত হইয়া গেল এবং উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন।* সন্ধিপত্রের সপ্তম শর্ত অনুসারে বানি-বেকর নামক গোত্রটি কোরেশদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল এবং খোজাআ গোত্রের লোকেরা মুছলমানদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল।

## ওৎবার ঘটনা

মক্কার মুছলমানগণ এই সন্ধির সময় পর্যন্ত কোরেশদিগের হস্তে কিরূপ নির্মমভাবে অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছিলেন, পাঠকগণ আবু-জন্দলের ঘটনায় তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। হযরত মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর ওৎবা নামক জনৈক মুছলমান কোন গতিকে কোরেশদিগের বন্দীখানা হইতে পলায়ন করিয়া মদীনায় আগমন করেন এবং হযরতের শরণ গ্রহণ করিয়া সেখানে অবস্থান করার জন্য প্রার্থী হন। হযরত তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন ঃ "ওৎবা ! তোমাকে মক্কায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমাদিগের ধর্মে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার কোন স্থান নাই।" ওৎবা মদীনায় গিয়াছেন জানিতে পারিয়া কোরেশগণ হযরতের নিকট দুইজন দূত পাঠাইয়া দিল এবং সন্ধির শর্ত অনুসারে তাঁহাকে ফিরাইয়া পাওয়ার দাবী করিল। হযরত ওৎবাকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়া তাঁহাকে দূতদিগের সঙ্গে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। পথে একস্থানে সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময় ওৎবা বিশেষ চাতুরী সহকারে সঙ্গীদিগের তরবারি হস্তগত করিয়া তাহাদিগের একজনকে এক আঘাতেই নিহত করিয়া ফেলিলেন, অন্য ব্যক্তি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল এবং মদীনায় আসিয়া হযরতকে এই হত্যার সংবাদ জ্ঞাপন করিল। অল্পক্ষণ পরে ওৎবাও উলঙ্গ তরবারি হস্তে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং হযরতকে সম্বোধন

* বোখারী, মাগাজী ও শরুৎ, মোছলেম ২—১০৪ হইতে ১০৬, ফৎহুলবারী, তাবরী প্রভৃতি।

করিয়া বলিতে লাগিলেন : মহাত্মন ! আপনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে বন্দী করিয়া কোরেশদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি উঁহাদিগের অত্যাচার হইতে নিজের ধর্মকে রক্ষা করার উপায় নিজেই করিয়া লইয়াছি। হযরত ওৎবার কথা শুনিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার এই কার্যে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন

ওৎবা মনে করিয়াছিলেন, হযরত যখন সন্ধিশর্ত পালন করিয়া আমাকে একবার কোরেশদিগের হস্তে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন তাঁহার দায়িত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আমি স্বচ্ছন্দে মদীনায় অবস্থান করিতে পারিব। কিন্তু হযরতের কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহার সে ভ্রম দূর হইয়া গেল। তিনি তখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে গ্রেফ্তার করার জন্য কোরেশগণ আবার লোকজন পাঠাইলে আবার তাঁহাকে তাহাদের হস্তে বন্দী হইতে হইবে। তখন তাঁহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহাও তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। কাজেই আর কালবিলম্ব না করিয়া ওৎবা মদীনা হইতে পলায়ন করিলেন এবং সমুদ্রের উপকূলস্থ 'ঈছ' নামক স্থানে একটি সুরক্ষিত উপত্যকার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মক্কার উৎপীড়িত মুছলমানগণ এই সংবাদ অবগত হইলে তাহাদিগের মধ্যকার অনেক লোক অবিলম্বে পলাইয়া আসিয়া ওৎবার সঙ্গে যোগদান করিলেন। এইরূপে দলপুষ্টি হওয়ার পর পলাতক বন্দিগণ কোরেশদিগের বাণিজ্যপথে হানা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদিগের গুপ্ত আক্রমণের বিভীষিকায় কোরেশগণ বিব্রত হইয়া পড়িল। তখন তাহারা অনুরোধ-উপরোধ করিয়া সন্ধিপত্রের ৫ম শর্তটি রহিত করিয়া দিল। ফলে উৎপীড়িত মুছলমানগণ দলে দলে মদীনায় চলিয়া আসিতে লাগিলেন। পুরুষদিগের ন্যায় মোছলেম মহিলাগণকে কোরেশদিগের হস্তে অশেষ প্রকারে নির্যাতিত হইতে হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কয়েকজন মহিলা মদীনায় পলাইয়া আসিলে, কোরেশপক্ষ তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া পাওয়ার জন্যও হযরতের নিকট লোক পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সন্ধিপত্রে কেবল পুরুষদিগের কথা লিপিবদ্ধ থাকায় হযরত তাহাদিগের দাবী অগ্রাহ্য করেন।

## মহা-বিজয়

এক আবু-বাকর ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ছাহাবাই হোদায়বিয়ার সন্ধি শর্তগুলিকে মুছলমানদিগের পক্ষে বিশেষ হেয়তাজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া ছাহাবাদিগের মধ্যে যে উত্তেজনা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল, পাঠকগণ পূর্বেই তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু কোরআন শরীফে এই 'হেয়তা স্বীকার'কেই فتح مبين বা স্পষ্ট বিজয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে, হোদায়বিয়ার পুণ্যক্ষেত্রে আরব জাতিসমূহের হিংসা-বিদ্বেষ ও দুর্ধর্ষতা, হযরতের ক্ষমা, প্রেম ও শান্তিপ্রিয়তার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া যায়। যে শত্রুকে বিধ্বস্ত করার জন্য তাহারা এযাবৎ নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে, তিনি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মঙ্গলকামী। এখন তিনি যথেষ্ট শক্তি অর্জন করিয়াছেন, বলপূর্বক নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার বা প্রতিশোধ গ্রহণের যথেষ্ট সামর্থ্যও তাঁহার হইয়াছে— তবু শান্তির খাতিরে তিনি এমন হেয়তা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। কোরেশ ও অন্যান্য আরব জাতির অন্তরাত্মা মোস্তফা হৃদয়ের এই অনুপম মহিমার নিকট আত্মসমর্পণ করিল, তাহারা নিজেদের কার্যকলাপের অসমীচীনতা মনে মনে স্বীকার করিয়া লইল। অধিকন্তু কোরেশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের জনসাধারণ এই ব্যাপারে সম্যকরূপে বুঝিতে পারিল যে, কোরেশ প্রধানগণ এতদিন পর্যন্ত হযরত সম্বন্ধে যে সকল গ্লানিজনক কথা প্রচার করিয়া আসিতেছে, তাহার মূলে কোন সত্যই নাই। "বস্তুতঃ মোহাম্মদ শান্তির পক্ষপাতী, তিনি খুব সঙ্গত প্রস্তাবই করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোরেশগণই হঠকারিতার বশবর্তী হইয়া তাঁহার শত্রুতা করিতেছে, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অন্যায় জেদ চরিতার্থ করার জন্য আরবময় অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছে"— এতদিনে হেজাজের জনসাধারণ ইহা সম্যকরূপে জানিতে ও বুঝিতে পারিল। কোরেশ অন্যায় জেদের বশবর্তী হইয়া আজ এই যাত্রীদলকে "আল্লাহর ঘরে"র তীর্থ হইতে বারিত করিল, আরবের চিরাচরিত ধর্মসংস্কার ও বিধি-ব্যবস্থা পদদলিত করিয়া ফেলিল। এমন কি, এ সম্বন্ধে

তাহাদিগের সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ এবং চেষ্টা-চরিত্রও বিফল হইয়া গেল—ইহা দেখিয়া কোরেশের মিত্র-গোত্রসমূহ তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে এই সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর মুছলমানগণ আরবের সর্বত্র গমনাগমন করার সুযোগ পাইলেন। অমুছলমান আরব গোত্রসমূহের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান করিতে লাগিলেন। এছলাম কি, তাহার প্রকৃত শিক্ষা এবং সাধনা কি, পৌত্তলিক জাতিসমূহ এতদিনে তাহার সম্যক পরিচয় গ্রহণের সুযোগ পাইল। হযরতের ছাহাবাগণ নানাকার্য ব্যাপদেশে দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িলেন—স্থানীয় আরবগণ তাঁহাদিগের চরিত্রের মহিমা উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহাদিগের আদর্শের অনুবর্তী হইতে লাগিল। এইরূপে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর অনধিক দুই বৎসর সময়ের মধ্যে মুছলমানদিগের সংখ্যা দ্বিগুণ অপেক্ষাও বর্ধিত হইয়া গেল।* ত্যাগ ও প্রেমসমরের এই অতুলনীয় জয়লাভ এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী আশুফলকেই কোরআনে "মহা-বিজয়" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ধর্মক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে হযরতের এই পুণ্য আদর্শ এবং মহিমামণ্ডিত ছুন্নতের অনুসরণ করিতে পারিলে, মুছলমান সমাজ এখনও ঐরূপ সফলতা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা আজ এই শ্রেণীর অত্যাবশ্যকীয় ছুন্নতগুলি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছি।**

# চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

## খায়বার বিজয়

### পূর্বকথা

মদীনার নিকটবর্তী পল্লীসমূহের ইহুদী গোত্রগুলি পরিখা সমর পর্যন্ত কোরেশদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া এছলাম ধর্ম ও মোছলেম জাতির মূলোৎপাটন চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু পরিখা সমরে—তাহাদিগের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কোরেশ দলপতিগণ তাহাদিগের প্রকৃত স্বরূপ সম্যকরূপে জানিতে পারিয়াছিল বলিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে অনৈক্য ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইয়া যায়। ধূর্ত ইহুদী দলপতিগণ পৌত্তলিক ও মোছলেম আরবগণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত করিয়া নিজেরা ভবিষ্যতের জন্য সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষা করিতেছিল। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, পরিখা সমরের পর কোরেশের মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদিগের পক্ষে মদীনা আক্রমণ করা আর কখনই সম্ভবপর হইবে না, পক্ষান্তরে কোরেশ পক্ষের সহিত অর্ধ যুগব্যাপী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ফলে মুছলমানদিগের যথেষ্ট ভক্তি ও শক্তি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা নিজেদের বহু যুগের সেই গুপ্ত অভিসন্ধি সফল করিবার জন্য কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল—মুছলমানদিগকে বিধ্বস্ত করতঃ আরবময় ইহুদী সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনায় খায়বারের ইহুদী কেন্দ্রে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল।

## খায়বার ও তাহার বর্তমান অবস্থা

মদীনা হইতে নির্বাসিত ইহুদিগণও ক্রমে ক্রমে খায়বারে গিয়া সমবেত হইয়াছে। বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত এক বিশাল শস্য-শ্যামল ভূভাগের নাম খায়বার। সিরিয়ার প্রান্তদেশে অবস্থিত হওয়ায় নানা কারণে এই স্থানটি বহুদিন হইতে ইহুদী জাতির একটা প্রধানতম কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। নির্বাসিত ইহুদিগণ তথায় সমবেত হওয়াতে স্থানীয় ইহুদীদিগের শক্তি ও উদ্দাম শঠতাও বর্ধিত হইয়া গেল এবং তাহারা মুছলমানদিগকে ধ্বংস

---

* নবরী, জাদুল-মাআদ, মাওয়াহেব ও হলবী প্রভৃতি।

** এই অধ্যায়ের লিখিত বিবরণগুলি বোখারী, মোছলেম, নবরী, ফৎহুলবারী, জাদুল-মাআদ, হলবী, তাবরী প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত হইল। এবন-এছহাক মুছলমানদিগের যে সংখ্যা দিয়াছেন, তাহা বোখারী কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীছের বিপরীত, সুতরাং অগ্রাহ্য।

করার জন্য সমবেতভাবে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের এই সকল চেষ্টার ফল যথাসময়ে নানা দিক দিয়া এবং নানা আকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মুছলমানগণ একটু স্বস্তিবোধ করিয়া নিজেদের কাজ-কারবারে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছিলেন— ঠিক এই সময় ইহুদীদিগের অনুষ্ঠিত নূতন বিভীষিকাগুলি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বিপন্ন ও সশঙ্ক করিয়া তুলিল। অধিকন্তু ইহুদী জাতি যে অদূর ভবিষ্যতে মদীনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহাও মুছলমানদিগের অবিদিত রহিল না। ইহুদীদিগের এই সকল অতীত ও অবশ্যম্ভাবী অত্যাচারগুলির স্থায়ী প্রতিকার করার জন্যই হযরত খায়বারের দিকে অভিযান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

## কার্যকারণ পরম্পরা

আমাদিগের ইতিহাসকার বা কিংবদন্তী সঙ্কলক গ্রন্থকারগণ খায়বার অভিযানের কার্যকারণ-পরম্পরার অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করেন নাই। "হযরত অমুক সনের অমুক মাসে সৈন্য লইয়া খায়বার অবরোধ করিলেন"—বলিয়াই তাঁহারা এই অধ্যায়টি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে খায়বারের পূর্বে সংঘটিত কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় ঘটনার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইয়া, তাঁহারা ও তাঁহাদিগের অন্ধ মোকাল্লেদগণ, ঐ কার্যকারণের আবিষ্কার করাও দুঃসাধ্য করিয়া রাখিয়াছেন। এই গ্রন্থকারগণের উপেক্ষা ও ভ্রম-প্রমাদের ফলে ব্যাপারটি এমনই অবোধগম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে— হযরত বিনা কারণে ও বিনা অপরাধে খায়বারের নিরীহ ইহুদীদিগের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, খ্রীষ্টান লেখকগণও এই কথাটি খুব জোর গলায় বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর লেখক ও রেওয়ায়ৎ সঙ্কলকগণ যে কিরূপ মারাত্মক ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, নিম্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পাঠকগণ তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

## ইহুদীপক্ষের ষড়যন্ত্র ও সমরায়োজন

হিজরত হইতে পরিখা-সমর পর্যন্ত মদীনার ইহুদিগণ মুছলমানদিগকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য যে সকল চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছিল, পাঠকগণ তাহা যথাস্থানে বিশদরূপে অবগত হইয়াছেন। পরিখা-সমরের পর তাহারা এছলামের চিরশত্রু 'গৎফান' গোত্রের সহিত বিশেষরূপে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বলা বাহুল্য যে, এই ষড়যন্ত্র পূর্বাপর সমানভাবে চলিয়া আসিতেছিল। এজন্য আবু-রাফে নামক ইহুদী দলপতি গৎফান ও তাহার পার্শ্ববর্তী পৌত্তলিক জাতিগণকে সমবেত করিয়া হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিল।* হযরতের অর্থাৎ মদীনার উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য ইহুদী প্রধানগণ বহু অর্থব্যয়ে আরবের পৌত্তলিকদিগকে প্রস্তুত করিয়াছিল।** আবু-রাফের পর এছির নামক এক ব্যক্তি ইহুদী সমাজের প্রধান দলপতির পদে নির্বাচিত হয়। তাহার সম্বন্ধে ইতিহাসকারগণ বলিতেছেন ঃ

وكان من حديث اليسير بن رازم انه كان بخيبر يجمع
غطفان لغزو رسول الله صلعم

"এছির-এবনে রাজেম হযরতের সহিত যুদ্ধ করার জন্য গৎফান জাতিকে খায়বারে সমবেত করিতেছিল।*** তুমুল গৎফান ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী পৌত্তলিকগণের এবং খায়বারের ইহুদীদিগের সমবেত অত্যাচারে মুছলমানদিগকে বার-পর-নাই উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিতে হয়। তাহারা একদিকে মদীনা আক্রমণের আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিল, অন্যদিকে সুযোগ ও সুবিধা

---

* তবকাত ৬৬ পৃষ্ঠা।

** বোখারী, ফৎহুলবারী ৭—৩৪৭ পৃষ্ঠা। *** এবন-হেশাম ৩—৮২ পৃষ্ঠা।

পাইলেই মুছলমানদিগের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহাদিগের এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্য মদীনা হইতে পর পর কয়েকবার অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। একবার মোছলেম বণিকদের একটা কাফেলা আক্রমণ করিয়া নরাধমগণ বহু মুছলমানকে হতাহত করিয়া ফেলে এবং তাঁহাদিগের সমস্ত ধন-সম্পদ লুটিয়া লইয়া যায়। জায়েদ-এবন-হারেছার নেতৃত্বাধীনে ওয়াদিল কোরা অভিযান এই জন্যই প্রেরিত হইয়াছিল।* হযরত আলীর নেতৃত্বাধীনে যে 'ফদক অভিযান' প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহুদিগণ পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রসমূহের দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদিগকে খায়বারে সমবেত করিতে থাকে, তাহাদিগের পথরোধ করার জন্যই এই অভিযানটি প্রেরিত হইয়াছিল।** ইহুদী জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর এছির বা ওছায়ের সকলকে সম্বোধন করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিল ঃ "আমার সহচরগণ এতদিন পর্যন্ত মোহাম্মদ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন, আমি এখন হইতে তাহার পরিবর্তন করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ধারা অবলম্বন করিতে চাই। আমি এখন মোহাম্মদের রাজধানীর উপর আক্রমণ করার নিমিত্ত প্রস্তুত হইব। এজন্য আমাকে স্বয়ং গৎফান জাতির নিকট যাইতে হইবে—তাহাদিগকে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে।" ইহুদীদিগের সভায় এই সকল সঙ্কল্প স্থির হওয়ার পর, এছির গৎফান প্রভৃতি জাতির নিকট গমন করতঃ তাহাদিগকে হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এই সংবাদ পাইয়াই হযরত আবদুল্লাহ্-এবনে রওয়াহা ও তাঁহার সঙ্গীত্রয়কে গুপ্তচর-রূপে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, জনরব নিক—খায়বার অঞ্চলের ইহুদী ও পৌত্তলিকগণ মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। গৎফানীয় পৌত্তলিকগণ ইহুদীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া মদীনা আক্রমণ করিবে এবং ইহুদিগণ তৎবিনিময়ে খায়বারের অর্ধেক খেজুর তাহাদিগকে দান করিবে, ইহাও স্থির হইয়া গিয়াছিল।*** ইহুদিগণের এই সকল আচরণের পরও হযরত নীরব ছিলেন, এমন কি তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য তিনি ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু হযরতের ধৈর্য ও শান্তিপ্রিয়তার ফলে ইহুদীদিগের স্পর্ধা বহু পরিমাণে বর্ধিত হইয়া গেল।

## আক্রমণের সূত্রপাত

ধৈর্য ও শান্তিপ্রিয়তা অনেক সময় প্রতিপক্ষের নিকট ভীতি ও কাপুরুষতা বলিয়া প্রতীত হয় এবং সেজন্য তাহাদিগের দুঃসাহস শতগুণে বর্ধিত হইয়া যায়। ইহুদী ও তাহাদিগের বন্ধু গৎফান জাতি মনে করিল—এত অত্যাচার মোহাম্মদ নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছেন—শক্তির অভাবে। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া মদীনা আক্রমণ করা উচিত। এইরূপ ভাবিয়া তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একটি দস্যুদল গঠন করতঃ তাহাদিগকে মদীনার পথে পাঠাইয়া দিল। মদীনা হইতে অনধিক দূরে "জু-কারাদ" নামক একটি চারণক্ষেত্রে হযরতের এবং তাঁহার ছাহাবাগণের পশুপাল চরান হইতেছিল। এই দস্যুদল হঠাৎ তথায় আপতিত হইয়া একজন মুছলমানকে নিহত করতঃ তাঁহার স্ত্রীকে এবং চারণক্ষেত্রে অবস্থিত হযরতের পশুগুলিকে লুটিয়া লইয়া যায়। মুছলমানগণ পর দিবস বহু আয়াসে সেগুলির উদ্ধার সাধন করেন।

এই প্রকারে খায়বারের ইহুদীদিগের ও তাহার নিকটবর্তী বিরাট গৎফান গোত্রের অত্যাচার উপদ্রবে এবং তাহাদিগের লুণ্ঠন ও নরহত্যার ফলে, মুছলমান সমাজ যার-পর-নাই উত্যক্ত ও অস্থির হইয়া পড়েন। জু-কারাদের আক্রমণ পর্যন্ত হযরত ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আক্রমণের ফলে তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, ইহুদী ও গৎফানীয় শক্তিকে

---

* এবনে হেশাম ২—৮২, কস্তলানী ৭—৩০০

** জাদুল-মাআদ ২—৩৭২ প্রভৃতি।

*** এই ঘটনাগুলি হালবী, খামিছ ও তবকাত হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে না পারিলে, মোছলেম জাতির অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভবপর হইবে না, তখন তিনি খায়বার অঞ্চলে অভিযান প্রেরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে ও সমস্বরে বলিতেছেন যে, জু-কারাদের আক্রমণ খায়বার অভিযানের সম্পূর্ণ এক বৎসর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত যে অসঙ্গত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই জন্যই ইমাম বোখারী জু-কারাদ অভিযানের উল্লেখকালে স্পষ্টতঃ বলিয়া দিয়াছেন—"এবং এই অভিযান খায়বারের তিন দিন পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল।"* ইমাম মোছলেম 'জু-কারাদ' ও অন্যান্য অভিযান শীর্ষক অধ্যায়ে একটি দীর্ঘ হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ হাদীছের প্রত্যক্ষদর্শী রাবী বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে,—"জু-কারাদ অভিযানের পর তিন দিন মাত্র মদীনায় অবস্থান করিয়াই আমরা হযরতের সমভিব্যাহারে খায়বার অভিযানে যাত্রা করিলাম......।"** আমাদিগের রেওয়ায়ৎ সঙ্কলক ঐতিহাসিকগণ যে কতদূর বেপরোয়াভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের সংগৃহীত বিবরণগুলি যে বহুস্থলে বিশ্বস্ততম হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে, পাঠকগণ পুনঃ পুনঃ ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। আলোচ্য প্রসঙ্গটিও ইহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। বোখারী মোছলেম প্রমুখ হাদীছ গ্রন্থে উভয় ঘটনার 'নায়ক' ও প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবাগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, জু-কারাদ আক্রমণের তিন দিন পরেই অভিযান মদীনা হইতে যাত্রা করিয়াছিল—আর তাঁহারা ঐ তিন দিনকে এক বৎসরে পরিণত করিয়া দিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। একে তাঁহারা ইহুদী ও বেদুইনদিগের ক্রমাগত অত্যাচার, উপদ্রব এবং পূর্বাপর সংঘটিত লুণ্ঠন ও নরহত্যাগুলিকে অন্যান্য ঘটনা প্রসঙ্গে অবান্তরভাবে ও অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া তাহার গুরুত্ব ও পরম্পরা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন ; তাহার উপর জু কারাদ অভিযানের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে এই প্রকার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া এই অত্যাবশ্যকীয় ঐতিহাসিক সত্যটিকে এক প্রকার অজ্ঞেয় করিয়া তুলিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা উপরে খায়বারের ইহুদী ও তাহাদিগের মিত্র জাতিসমূহের যে সকল অত্যাচার উপদ্রবের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা পাঠ করার পর খায়বার অভিযানের কার্যকারণ পরম্পরা অবগত হওয়া আর কাহারও পক্ষে কষ্টকর হইবে না। তাহার পর আমরা এই প্রসঙ্গে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, ইহুদী দলপতি এছির সমস্ত ইহুদীদের সমর্থন-মতে, মদীনা আক্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছিল ; সে এজন্য বহু অর্থব্যয়ে যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; স্বয়ং পার্শ্ববর্তী পৌত্তলিক গোত্রগুলির মধ্যে দাওরা করিয়া তাহাদিগকে মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল ;— এমন কি তাহারা মদীনার পল্লীপ্রান্তর ও চারণক্ষেত্রের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল ; এই অবস্থায় হযরত খায়বার অভিযানের আদেশ প্রদান করেন। এই প্রকার অবস্থায় এই আদেশ প্রদান করা সঙ্গত হইয়াছিল কি-না, ন্যায়নিষ্ঠ পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন

## খায়বার অভিযান

সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে ১৪ শত পদাতিক ও দুই শত অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া হযরত খায়বার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মদীনার অবশিষ্ট ইহুদিগণ, এই সংবাদ অবগত হইয়া যার পর-নাই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।*** কাজেই তাহারা যে খায়বারের ইহুদীদিগকে এই সংবাদ জ্ঞাত করাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পক্ষান্তরে মদীনার প্রধানতম কপট আবদুল্লাহ-এবন ওবাই খায়বারের ইহুদীদিগকে ইতিমধ্যেই পত্র দ্বারা অবগত করিয়া দেয় যে, 'মোহাম্মদ অচিরাৎ খায়বার আক্রমণ করিবেন। কিন্তু সেজন্য তোমাদিগের বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ নাই, ইত্যাদি।' মদীনার ইহুদী ও

---

* বোখারী ২—৫৯৩

** মোছলেম ২—১১৫। তাবরী, জালমার বর্ণনা। *** তবকাত ৭৭।

গুপ্তচরগণের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া খায়বারের ইহুদিগণ উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল—"আঃ মরণ ! মোহাম্মদ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে ?" কিন্তু তথাচ তাহারা সতর্কতা অবলম্বনে ত্রুটি করিল না। এই সতর্কতার খাতিরে কতিপয় ইহুদী দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার পর প্রত্যহ সম্মুখস্থ প্রান্তরে ছত্রভঙ্গ হইয়া মদীনা-বাহিনীর আগমন সম্বন্ধে চৌকি-পাহারার কাজ করিত। একদিন প্রাতঃকালে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খায়বারের কৃষকগণ মোছলেম বাহিনীর দর্শন পাইয়া ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মোহাম্মদ, পঞ্চব্যূহ সৈন্যসহ সমাগত।"

## দুর্গাবরোধ

ইহুদ গুপ্ত ষড়যন্ত্র পাকাইতে, অর্থ দ্বারা বিদ্রোহের সৃষ্টি করাইতে এবং প্রচ্ছন্নভাবে লুণ্ঠন ও গুপ্ত হত্যা করিতে সিদ্ধহস্ত হইলেও, বীরের ন্যায় সম্মুখ সমরে-প্রবৃত্ত হওয়ার সংসাহস তাহাদিগের কখনই ছিল না। সুতরাং এত ষড়যন্ত্র, এত অত্যাচার এবং এতাদৃশ স্পর্ধা প্রকাশের পর যেমন তাহারা মুছলমান-বাহিনীর সাক্ষাৎলাভ করিল, অমনি তাহাদের সমস্ত "বীরত্ব" শেষ হইয়া গেল এবং গৎফানী বন্ধুদিগের আগমন প্রতীক্ষায় তাহারা দুর্গমালার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া দুর্গদ্বারগুলি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা পূর্বাহ্নেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তিনি এমনভাবে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন, যাহাতে গৎফানীদিগের পক্ষে খায়বারে গমন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পক্ষান্তরে গৎফান গোত্রের লোকেরা যখন দেখিল যে, হযরতের সঙ্গে মাত্র ১৬ শত মুছলমান আগমন করিয়াছে, তখন তাহারা স্থির করিল যে, ইহাদের পশ্চাতে আর একটা বিরাট বাহিনী সুরক্ষিতভাবে আগমন করিতেছে। আমরা নিজেদের সুরক্ষিত পল্লীগুলি পরিত্যাগ করিয়া দূর প্রান্তরে উপনীত হইলেই, তাহারা পশ্চাৎদিক দিয়া আমাদিগের পল্লীগুলি আক্রমণ করিবে। বেড়াজালে বেষ্টিত হইয়া তখন আমরা ধনে-প্রাণে মারা যাইব।* এই ভাবিয়া তাহারা ইহুদীদিগের এতদিনের মিত্রতা, এমন বাধ্যবাধকতা, এত প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি সমস্তই বিস্মৃত হইয়া আপনাপন পল্লীতে চলিয়া গেল। কাজেই ইহুদীদিগের দুর্ভাগ্যের সীমা রহিল না।

## দুর্গ আক্রমণ

হযরত পূর্বাপর সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু "যখন তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, ইহুদিগণ যুদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, তখন তিনি স্বীয় সহচরবর্গকে ওয়াজ-নছিহত করিলেন এবং সকলকে জেহাদের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।"** মুছলমানগণ তখনও একেবারে নিঃসম্বল। ১৬ শত মুছলমান কেবল কতকটা ছাতু সঙ্গে লইয়া খায়বার যাত্রা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকালের অবরোধের ফলে ক্রমে ক্রমে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া আসিল এবং মুছলমানগণ ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় যার-পর-নাই কষ্ট পাইতে লাগিলেন। যাহা হউক, ইহুদিগণ যখন সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইল না এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত যখন দেখিতে পাইলেন যে, দুর্গের প্রাচীর তোরণ ও সুরক্ষিত বুরুজ হইতে ইট-পাথর এবং তীর-সড়কি প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া ইহুদিগণ ক্রমাগতে মুছলমানদিগের ধন-প্রাণের বিশেষ ক্ষতি করিয়াই চলিয়াছে ; তখন তিনি দুর্গ আক্রমণ করার আদেশ প্রদান করিলেন। প্রভুর আদেশবাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্রই ক্ষুৎ-পিপাসার অবসন্ন মুছলমানদিগের শিরায় শিরায় বিদ্যুতের লহরীলীলা আরম্ভ হইয়া গেল। তখন আল্লাহু আকবর নিনাদে খায়বারের পল্লী-প্রান্তর রোমাঞ্চ তুলিয়া ১৬ শত মোছলেম বীর নায়েম দুর্গের উপর আপতিত হইলেন। এই আক্রমণের নায়ক দুর্গতোরণ অধিকার করার সময় শত্রুপক্ষ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত গুরুভার প্রস্তরের আঘাতে শাহাদত প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহাতে অবসাদের পরিবর্তে নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হইল এবং দেখিতে দেখিতে নায়েমের সর্বোচ্চ তোরণচূড়ায় এছলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতে লাগিল। নায়েমের পর আরও কয়েকটা দুর্গ মোছলেম

---

* তাবরী।   ** বোখারী।

বীরবৃন্দের পদগুপ্রগত হইল। তাহার পর তাঁহারা ক'মুছ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এই দুর্গটি খায়বার দুর্গমালার মধ্যে সকল দিক দিয়াই সর্বপ্রধান বলিয়া খ্যাত ছিল। মার্হাব নামক বিখ্যাত যোদ্ধা এই দুর্গের প্রধান নায়ক পদে বরিত হইয়াছিল। আরবে তখন কিংবদন্তী ছিল যে, একা মার্হাব এক সহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ।

ক'মুছ দুর্গ আক্রমণ হইতে দেখিয়া দুর্গাধিপতি মার্হাব মত্তমাতঙ্গের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। আরবের সাধারণ প্রথানুসারে সে ময়দানে আসিয়া দর্পপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করতঃ প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন আমের নামক জনৈক ছাহাবী হযরতের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাহার মোকাবেলায় বহির্গত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে দুই বীরে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া গেল। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ আমের নিম্নে পড়িয়া যান এবং সেই অবস্থায় ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তরবারি চালনা করিতে গিয়া তিনি নিজের তরবারির আঘাতেই নিহত হন। আমের শাহাদত প্রাপ্ত হইলে, মোহাম্মদ-এবন-মোছলেমা উলঙ্গ তরবারি হস্তে মার্হাবের উপর আপতিত হইলেন এবং তাহাকে সাংঘাতিক-রূপে আহত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় বীরবর হযরত আলী অগ্রসর হইয়া এক আঘাতেই তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করেন।*

## আলীর বীরত্ব

ক'মুছ দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রথম দিন মহাত্মা আবু-বাকর ছিদ্দিক এবং দ্বিতীয় দিন মহামতি ওমর ফারুক সেনাপতির পদে নিয়োজিত হইয়া অশেষ ধৈর্য ও বীরত্বসহকারে যুদ্ধ পরিচালিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিন শেরে-খোদা আলী মোর্তজা নায়ক পদে নিযুক্ত হইয়া প্রচণ্ডবেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। প্রথম দুই দিনের আক্রমণের ফলে দুর্গ এবং দুর্গস্থ সৈনিকগণ বহু পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর বীরকুল-শিরোমণি আলী মোর্তজার এই প্রচণ্ড আক্রমণ—শত্রুপক্ষ সে আক্রমণবেগ প্রতিহত করিয়া উঠিতে পারিল না এবং অনতিবিলম্বে মোছলেম বীরবৃন্দ ক'মুছ দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।**

## বাজে কথা

কতিপয় শীয়া-রাবী এবং শীয়া-ভাবাপন্ন লেখক এই সরল সহজ ঘটনাটিকে নানাপ্রকারে অতিরঞ্জিত করিয়া মূল বিবরণকেই সাধারণ চক্ষে উপহাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—প্রথম দুই দিন আবু-বাকর ও ওমর কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া মুছলমানগণ হযরতের নিকট অভিযোগ করেন। পক্ষান্তরে যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত আলীর ঢালখানা পড়িয়া যাওয়ায় তিনি এক লম্ফ দিয়া দুর্গের একখানা গুরুভার লৌহকপাট ছিঁড়িয়া লইয়া তাহাকে ঢাল বানাইয়া লইলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আলী ঐ কপাটখানা পশ্চাৎদিকে চল্লিশ হাত দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পরে ৭০ জন বলিষ্ঠ লোকে কপাটখানা স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। কোন কোন রাবী বয়ান করেন যে, হযরত আলী ঐ কপাটখানা নিজ পিঠের উপর উঁচু করিয়া ধরিয়াছিলেন এবং মুছলমানগণ তাহার উপরে উঠিয়া দুর্গতোরণে প্রবেশ করিয়াছিলেন।*** এই গল্পটি রেওয়ায়াৎ এবং দেরায়াৎ উভয় হিসাবেই অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস্য।

---

* মার্হাব কাহার হস্তে নিহত হইয়াছিল, এতদসম্বন্ধে ঘোর মতভেদ দেখা যায়। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে বলেন যে, মোহাম্মদ-এবন-মোছলেমা'ই তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। মোছনদের একটি হাছন রেওয়ায়াতে জাবের কর্তৃক বর্ণিত একটি বিবরণেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু ছহী মোছলেম, মোছনাদ, নাছাই ও হাকেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ যে সকল হাদীছ রেওয়ায়াৎ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, মার্হাব হযরত আলীর হস্তেই নিহত হইয়াছিল। ওয়াকেদীর একটি রেওয়ায়াৎ অবলম্বন করিয়া কোন কোন পণ্ডিত হাদীছ ও ইতিহাসের রেওয়ায়াতের মধ্যে বর্ণিতরূপ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ফৎহুলবারী, এস্তিআব ও হালবী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

** বোখারী, মোছলেম, নাছাই, হাকেম প্রভৃতি। *** তাবরী, হালবী প্রভৃতি।

ইমাম ছাখাভী, ইমাম জাহবি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ এই গল্পটির সমস্ত ছনদ বা রাবী-পরম্পরাকে বাজে কথা ও অগ্রাহ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত আবু-বাকর ও ওমরের নিন্দাসূচক অংশটি তাবরী আওফ নামক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এবন-জরির তাবরী নিজে শীয়া-ভাবাপন্ন লেখক বলিয়া পরিচিত। তাহার উপর তাঁহার এই ঘটনার রাবী আওফকে কোন কোন মোহাদ্দেছ 'রাফেজী শয়তান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আলীর প্রশংসা কীর্তনের এবং আবু-বাকর ও ওমরের নিন্দা প্রচারের প্রলোভন সংবরণ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। সূক্ষ্মদর্শী ও ন্যায়নিষ্ঠ মোছলেম পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর রেওয়ায়তগুলিকে কখনই গণনার গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করেন নাই। বোখারী, মোছলেম, মোছনাদ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে এই সকল বাজে কথা ও বাজার-গুজব স্থানলাভ করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয়, আমাদিগের খৃষ্টান লেখকগণ কোরআন ও হাদীছের বিশুদ্ধতম বর্ণনাগুলিকে বাদ দিয়া এই সকল বাজে কথার উল্লেখ করতঃ মুছলমানদিগের উপর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন নাই। হযরত আলীর জীবনী সঙ্কলন করিতে গিয়া কোন লেখক যদি বটতলার "আলী-হনুমানের কেচ্ছা" হইতে "হযরত আলী আর বীর হনুমান, অযোধ্যাতে মহাযুদ্ধ দোনো পাহলওয়ান" পদের উল্লেখ করিয়া মুছলমান জাতির উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন, তাহা হইলে কেহ কি তাঁহাকে ন্যায়নিষ্ঠ লেখক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিবেন ? আমাদিগের খৃষ্টান লেখকগণেরও এই অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত জাতি ও সকল ধর্মের ছিদ্রান্বেষণ এবং ভ্রান্তানুসন্ধানপ্রিয়তার ফলে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তিটাই যেন ঐরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

## দুর্গ বিজয়

ন্যূনাধিক তিন সপ্তাহকাল অবরোধ রক্ষার পর, ক'মুছ দুর্গ মুছলমানদিগের হস্তে পতিত হইল। ইহার পর সপ্তাহকাল আরও তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছিল। কিন্তু একে একে সমস্ত দুর্গ মুছলমানদিগের হস্তে পতিত হইতে দেখিয়া অবশিষ্ট ইহুদিগণ অগত্যা অস্ত্রত্যাগপূর্বক হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। খায়বার বিজয়ের স্বরূপ নির্ণয় এবং ইহুদীদিগের ধন-সম্পদাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইমামগণের এবং হাদীছসমূহের মধ্যে ঘোর মতভেদ ও অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমি এ সম্বন্ধে যথাশক্তি আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, খায়বারের কতকগুলি দুর্গ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার পর মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। কতকগুলি দুর্গ যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় এবং আর কতকগুলি অবরোধের অল্প পরেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ইহাদিগের অস্থাবর ধন-সম্পদ ও পশুপাল সম্বন্ধে যথোপযুক্তরূপে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হাদীছ গ্রন্থসমূহে যে রেওয়ায়তগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দুর্গসংক্রান্ত ঘটনার স্বতন্ত্র বিবৃতি মাত্র। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উহার মধ্যে কোন প্রকার অনৈক্য নাই। ইতিহাসকারগণ বলেন যে, খায়বার যুদ্ধে ৯৩ জন ইহুদী নিহত হইয়াছিল। মুছলমান পক্ষের ১৫ জন বীর এই যুদ্ধে শাহাদত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

## বিজিতদিগের অধিকার

খায়বার বিজয়ের পর হযরত স্থানীয় ইহুদীদিগকে নিম্নলিখিতরূপ অধিকার প্রদান করিলেন ঃ

(১) তাহারা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বধর্ম পালন করিতে থাকিবে, কেহ তাহাতে কোন প্রকার বিঘ্নদান করিতে পারিবে না।

(২) মুছলমানদিগের ন্যায় কোন প্রকার আয়কর বা ভূমিস্ব তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে না।

(৩) মুছলমানদিগের ন্যায় তাহারা যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইবে না।

(৪) কতকগুলি দুর্গের স্বর্ণ ও রৌপ্য স্পর্শ করা হইল না। তাহাদিগের নিকট হইতে কতকগুলি পশু গ্রহণ করিয়াই তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইল।

(৫)। ইহুদীদিগের বাড়ীঘর ও জমিজমা পূর্ববৎ সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের স্বত্বাধিকারে থাকিবে।

(৬) দেশের সমস্ত ভূমির মূল মালেকী হকুক এখন মদীনার রাজসরকারের অধিকারভুক্ত হওয়ায়, জনসাধারণ তাহাদিগের দেয় ফসলী খাজনা বা উৎপন্ন শস্যের ভাগ (উপরিউক্ত জমিদারকে না দিয়া) এখন হইতে মদীনার রাজসরকারকে প্রদান করিবে।

(৭) ভাগ যেখাপূর্ব) অর্দ্ধাংশ নির্দ্ধারিত হইল।

খায়বারের ইহুদিগণ মদীনা আক্রমণ করতঃ মুছলমানদিগকে সমূলে বিধ্বস্ত করার জন্য যে প্রকার ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল এবং এজন্য তাহারা যেরূপ ভয়াবহ উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, দস্যুতা, লুণ্ঠন ও নরহত্যাদির দ্বারা কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহারা মুছলমানদিগকে যেরূপ উৎপীড়িত করিয়া আসিতেছিল, পাঠকগণ যথাস্থানে তাহার আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজ যদি ইহুদিগণ জয়যুক্ত হইত, তাহা হইলে মুছলমানের নামগন্ধ যে দুনিয়া হইতে চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এহেন আততায়ী প্রাণের বৈরীদিগকে, সম্পূর্ণরূপে পদানত করার পর যে সকল অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, হযরত তাহাদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

## পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

### ঐতিহাসিক প্রমাদ

খায়বার অভিযান প্রসঙ্গে কেনানা ও তাহার ভ্রাতার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে ইতিহাসকারগণ যে সকল অনৈতিহাসিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহারা বলিতেছেন যে, এই ভ্রাতৃযুগল সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করিয়া বানি-নাজির বংশের বহু স্বর্ণরৌপ্য এবং মণিমুক্তা ভূপ্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল। হযরতের বিশেষ তাকিদ সত্ত্বেও তাহারা এই গুপ্ত ধন-সম্পদের সন্ধান না দেওয়ায়, তিনি জোবের নামক ছাহাবীর উপর কেনানাকে 'পীড়ন' করার ভার প্রদান করেন। এই আদেশমতে জোবের তাহার বুকের উপর চকমকি পাথর ঠুকিয়া সেই স্ফুলিঙ্গগুলি দ্বারা কেনানাকে 'ছেঁকা' দিতে থাকেন। অবশেষে জনৈক ইহুদীর মুখে সন্ধান পাইয়া মুছলমানগণ উপরোক্ত ধন-সম্পদগুলি বাহির করিয়া ফেলেন এবং এই অপরাধের জন্য কেনানা ও তাহার ভ্রাতাকে নিহত করা হয়।* কিন্তু আমরা বোখারীর ন্যায় বিশ্বস্ততম হাদীছ গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি যে, কেনানার এই ভ্রাতা হযরত ওমরের খেলাফত অবধি বাঁচিয়া ছিল।** রেওয়ায়তের হিসাবেও গল্পটির কোনই মূল্য নাই। ইহার মূল রাবী এবন-এছহাক, কিন্তু তিনি যে কি সূত্রে এই বিবরণটি অবগত হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোন কথাই অবগত হইতে পারা যায় না। সুতরাং এই বিবরণটি যে ভিত্তিহীন উপকথা মাত্র, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতেছে না।

প্রকৃত কথা এই যে, কেনানা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মাহমুদ নামক জনৈক ছাহাবাকে হত্যা করিয়া ফেলে। যুদ্ধাবসানের পর এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যার অপরাধে কেনানার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। নিহত মাহমুদের ভ্রাতা মোহাম্মদ-এবন-মোছলেমা তাহাকে এই আদেশক্রমে নিহত করেন। তাবরী, হালবী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করার পর নিজেরাই স্বীকার করিতেছেন যে—

ثم دفعه صلعم الى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود

---

* তাবকাত, খায়বার, ৮১।

** বোখারী باب اذا اشترط في المزارعة الخ ও কংস্তুলানী দেখুন।

হালবী ইহার পূর্বে বলিয়াছেন ঃ

وانه صلعم دفع كنانة لمحمد بن مسلمة ليقتله باخيه

অর্থাৎ, অতঃপর হযরত কেনানাকে মোহাম্মদ-এবন-মোছলেমার হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি স্বীয় ভ্রাতা মাহ্‌মুদের হত্যার বিনিময়ে কেনানাকে নিহত করিলেন।* আবু-দাউদ গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে যে হাদীছের উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, কথিত ধন-সম্পদ হোয়াই-এবন-আখতবের অধিকারভুক্ত ছিল। হোয়াই পূর্বে নিহত হইয়াছিল। খায়বার যুদ্ধের পর হোয়াই-এবন আখতবের পিতৃব্য ছা'য়াকে হযরত ঐ ধন-সম্পদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, যুদ্ধ-বিগ্রহাদির ফলে সে সমস্তই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পরে এই ধন-সম্পদ পাওয়া যায়।** হোয়াই-এর ধন-সম্পদ তাহার পিতৃব্যের নিকট থাকাই স্বাভাবিক এবং এজন্য হযরত তাহাকেই সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, এবং এই ছা'য়াই উহার জন্য প্রকৃত দায়ী ও অপরাধী ছিল। কিন্তু এই হাদীছের দ্বারা জানিতে পারা যাইতেছে যে, এই অপরাধের জন্য তাহার প্রতি কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হয় নাই। সুতরাং স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধন-সম্পদ লুকাইয়া রাখার জন্য কাহারও প্রতি কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয় নাই। কেনানাকে নরহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল মাত্র।

## শুশ্রূষাকারিণী মহিলা সংঘ

হযরতের এবং তাঁহার মহিমান্বিত খলিফা চতুষ্টয়ের সময় মোছলেম মহিলাগণ শুশ্রূষাকারিণীরূপে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। যুদ্ধের সময় তাঁহারা আহত মুছলমানদিগকে পানি পান করাইতেন, শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষতস্থানগুলিতে ঔষধ লাগাইয়া ও পটি বাঁধিয়া তাঁহাদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। সময় সময় ইঁহারা রণক্ষেত্রে পুরুষদিগকে অস্ত্রশস্ত্র যোগাইয়া দিতেন এবং আবশ্যক হইলে এই মোছলেম বীরাঙ্গনাবর্গ স্বামী ও ভ্রাতার এবং পিতা ও পুত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ তরবারি হস্তে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। এছলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি এই শ্রেণীর মহিলাগণের অক্ষয় কীর্তি-কলাপে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। যথারীতি একদল মহিলা এই সকল কার্যের জন্য খায়বার যুদ্ধেও যোগদান করিয়াছিলেন। জনৈকা কিশোরী নিজের কণ্ঠমালা প্রদর্শন করতঃ আনন্দ গদগদ স্বরে বলিতেন—"আমার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া হযরত আমাকে এই পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।"***

## পার্শ্ববর্তী ইহুদীদিগের আত্মসমর্পণ

ফদক, ওয়াদিল-কোরা প্রভৃতি স্থানের ইহুদিগণ খায়বারের এই পরাজয় দর্শনে যার-পর-নাই ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িল, এবং এতদিনের শত্রুতার পর শেষে অগত্যা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার শরণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। দয়ার সাগর করুণানিধান মোহাম্মদ মোস্তফা এই প্রাণের বৈরীগুলির মলিন মুখ দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলেন। ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা হইল যে, এই সকল স্থানের ইহুদীদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার আমকর বা ভূমিকর গ্রহণ করা হইবে না। তাহারা সাধারণতন্ত্রকে যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে কোন প্রকার সাহায্য করিতে বাধ্য হইবে না। এই সকল স্বত্বাধিকারের বিনিময়ে তাহারা প্রতি বৎসর কিছু কিছু 'জিযয়া' কর প্রদান করিবে। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, ইউরোপীয় লেখকগণ জিযয়া শব্দটাকে যেরূপ

* হলবী ৩—৩৯, ৪৩ এবং তাবরী ৩—১৫।
** আবু-দাউদ ২য় খণ্ড "খায়বারের ভূমি।"
*** আবু-দাউদ, কানযুল-ওম্মাল ও সাধারণ ইতিহাস পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।

ভীষণ ও বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছেন, বস্তুতঃ ব্যাপারটা তদ্রূপ কিছুই নহে। মদীনার সাধারণতন্ত্রের অধীনে মুছলমানদিগকে সকল প্রকার আয়ের উপর বাৎসরিক শতকরা ২.৫০ টাকা হিসাবে 'আয়কর' দিতে হইত। ইহা ব্যতীত কৃষিক্ষেত্র ও বাগবাগিচার উৎপন্ন সমস্ত ফল শস্যের দশমাংশ কর স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। ছাগ, মেষ, উট, গাভী প্রভৃতি পশুর উপরও এইরূপ কর নির্ধারিত ছিল। এছলামের পরিভাষায় ইহা 'যাকাত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল অমুছলমানের নিকট হইতে 'জিযয়া' গ্রহণ করা হইত তাহারা বৎসরে একবার এই সামান্য কর বা ট্যাক্স দিয়াই অব্যাহতি লাভ করিত। অধিকন্তু মুছলমানগণ যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু জিযয়া দানকারী অমুছলমানগণ ইহা হইতেও মুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে সাধারণতন্ত্র তাহাদিগের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিতে দায়ী হইতেন। এই দায়িত্বের জন্যই তাহাদিগকে 'জিম্মী'' নামে অভিহিত করা হইত। হাদীছ ও ফেকাহ্ গ্রন্থসমূহে জিম্মীদিগের অধিকার সম্বন্ধে সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে।

## হযরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

এই সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর বিশ্রাম গ্রহণের জন্য হযরত কয়েক দিন খায়বার প্রান্তরে অবস্থান করেন। এই সময় কতিপয় ইহুদী হযরতের প্রাণনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ষড়যন্ত্র পাকাইতে থাকে। অবশেষে বিষ দিয়া হত্যা করাই স্থিরীকৃত হয়। তখন তাহারা একটা ছাগল জবাই করিয়া তাহার মোছাল্লাম তৈয়ার করিল এবং তাঁহার সহিত তীব্র হলাহল মিশাইয়া দিল। ইহুদিগণ সকলেই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিলেও, জয়নাব নাম্নী জনৈক ইহুদী স্ত্রীলোক স্বহস্তে এই সকল কাজের যোগাড় করিয়াছিল। হযরত রানের গোশত পছন্দ করিতেন বলিয়া তাহাতে অধিক পরিমাণে বিষ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। অবশেষে জয়নাব ঐ মাংসগুলি লইয়া হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয় এবং বিনয়সহকারে বলিতে থাকে ঃ ''মোহাম্মদ ! তোমার জন্যই এই সামান্য হাদয়া (উপঢৌকন) আনয়ন করিয়াছি, তুমি ইহা গ্রহণ করিবে কি ?'' হযরত কখনও কোন মুছলমান বা অমুছলমানের হাদয়া ফেরত দিতেন না। বিশেষতঃ একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহার জন্য এই প্রীতি উপহার প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। কাজেই তিনি ধন্যবাদের সহিত জয়নাবের উপহার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর যথারীতি ছাহাবগণকে সঙ্গে লইয়া হযরত এই মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাংসের এক টুকরা গলাধঃকরণ করিয়াই হযরত সহচরগণকে সম্বোধনপূর্বক বলিয়া উঠিলেন ঃ ''মাংসে বিষ মিশ্রিত, সাবধান !'' কিন্তু বেশর নামক জনৈক ছাহাবী ইহার পূর্বেই একগ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার শরীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেল এবং তিনি বিবর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

তখন হযরতের আদেশে জয়নাব ও অন্যান্য পাষণ্ডদিগকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, হযরত তাহাদিগকে এই আচরণের কারণ ও কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়নাব তখন স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল ঃ ''তোমাকে হত্যা করার জন্যই আমি এই পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছিলাম।'' জয়নাবের কথা শুনিয়া হযরত হাস্যসহকারে উত্তর করিলেন ঃ ''তাহা হইবার নয়। আল্লাহ্ কখনই তোমাকে এই কার্যে সফল মনোরথ হইতে দিবেন না।'' খায়বার বিজয়ী ছাহাবাগণ রুদ্ধশ্বাসে এই সকল বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া যাইতেছিলেন। জয়নাবের মুখে এই ভীষণ উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহারা চারিদিক হইতে বলিয়া উঠিলেন—''এখনও কি আমরা উহার প্রাণবধ করিবার অনুমতি পাইব না।'' হযরত গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—''না !'' তাহার পর তিনি ইহুদী পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—''তোমরা কি উদ্দেশ্যে এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে?'' তাহারা সমস্বরে উত্তর করিল ঃ ''আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, তুমি যদি ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী হও, তাহা হইলে এই বিষের বিন্দুমাত্র তোমার জিহ্বাকে স্পর্শ করা মাত্রই তুমি

গন্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে, আর আমরাও স্বস্তি লাভ করিব। পক্ষান্তরে যদি তুমি সত্য সত্যই আল্লাহর নবী হও, তাহা হইলে এই বিষ তোমার প্রাণনাশ করিতে পারিবে না।

## ভিত্তিহীন গল্প—গুজব

বোখারী ও মোছলেম প্রমুখ মোহাদ্দেছগণ এই ঘটনা সম্বন্ধে যে সকল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, উপরে তাহার সারসঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। ইহার মোকাবেলায় ওয়াকেদীর ন্যায় অবিশ্বস্ত লেখকের প্রমাণহীন কথাগুলির যে আদৌ কোন মূল্য নাই, বোধ হয় পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। আমাদিগের অতিরঞ্জন-প্রিয় লেখকগণ এক্ষেত্রে ওয়াকেদীর অন্ধানুকরণ করিয়া কতকগুলি অস্বাভাবিক উপকথার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, হযরত মাংস ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইলে ছাগলের সেই রানখানাহ অবান হইল এবং সে বলিতে লাগিল—'ইয়া রছুলুল্লাহ! আপনি আমাকে ভক্ষণ করিবেন না। আমাতে বিষ মিশান আছে।' এই গল্পটাকে উপক্রম উপসংহারের সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য তাঁহারা আরও কতকগুলি ভিত্তিহীন উপকথা রচনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ছহী হাদীছে এ সকল কথার কোনই উল্লেখ নাই, বরং তাহা দ্বারা এইগুলির প্রতিবাদই হইয়া যাইতেছে। ইমাম বোখারী বিভিন্ন অধ্যায়ে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, ইমাম মোছলেমও প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবা কর্তৃক এই ঘটনা সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।* বোখারী ও মোছলেমের এই সকল ছহী হাদীছ দ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হযরত উপরি বর্ণিত বিষাক্ত ছাগমাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। রানের জবান হইয়া থাকিলে এবং সে চীৎকারকরতঃ হযরতকে মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া থাকিলে হযরত কখনই সে মাংস ভক্ষণ করিতেন না এবং বিষ ভক্ষণের জন্য তাঁহার ওষ্ঠপ্রদেশ বিবর্ণও হইত না।

## হযরতের দৃঢ়তা ও করুণা

জয়নাবের বর্ণনার পর হযরত যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এখানে প্রথম আলোচ্য। 'জয়নাব ! আল্লাহ্ তোমাকে এই সঙ্কল্পে কখনই সফলকাম হইতে দিবেন না।' আত্মসত্যে হযরতের যে কিরূপ গভীর বিশ্বাস ছিল, এই উক্তি দ্বারা তাহা সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন—সত্যের সেবা এবং তাহার প্রচারের জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ আমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন, সুতরাং আমার এই সাধনা পূর্ণ, পরিণত ও সাফল্যমণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত জগতের সমস্ত হলাহল দিয়াও কেহ আমার প্রাণবধ করিতে পারিবে না। পার্শ্বে সহচর 'বেশর' বিষের জ্বালায় মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত, সেই বিষ যথেষ্ট পরিমাণ গলাধঃকরণ করিয়াও হযরত সম্পূর্ণ নির্ভীক ও নির্বিকার চিত্তে এই মহীয়সী বাণী প্রচার করিতেছেন। পক্ষান্তরে বিজয়ী ভক্তগণ যখন এই পরাজিত ও পদানত শত্রুদিগের মুণ্ডপাত করার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন, উলঙ্গ তরবারি হস্তে জয়নাবকে লক্ষ্য করিয়া অনুমতি চাহিতেছেন, তখন হযরত প্রশান্ত বদনে সকলকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দান করিতেছেন—দণ্ডদানের পূর্ণ শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জয়নাব এবং তাহার সহযোগী ইহুদীদিগকে অম্লান বদনে ক্ষমা করিতেছেন। এ মহিমার কি তুলনা আছে ? জয়নাব ও অন্যান্য ইহুদীদিগকে প্রতিফল দানের যথেষ্ট শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হযরত কেন ক্ষমা করিয়াছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরদান কালে সমস্ত হাদীছ গ্রন্থ একবাক্যে বলিতেছে যে, হযরত তাঁহার ব্যক্তিগত অত্যাচার ও অপরাধের জন্য কখনই কোন অত্যাচারী বা অপরাধীকে কোনও প্রকার দণ্ড প্রদান করেন নাই।** বলা বাহুল্য যে, মাসাধিক কালের অবরোধ এবং অশেষ কষ্ট

---

* বোখারী ৭—৩৪৮, ৮—১২, ১০—১৯৩ ; মোছলেম ২—২২২।

** বোখারী, মোছলেম, তিরমিজি, নাছাই, এবন-মাজা ও আবু-দাউদ—আয়েশা হইতে বর্ণিত হাদীছ ; ব্যক্তিগত অত্যাচারের জন্য হযরত কখনও কাহাকেও কোন প্রকার দণ্ড প্রদান করেন নাই।

স্বীকারের পর খায়বারের প্রস্তর নির্মিত দুর্গগুলি বিজিত হইয়াছিল, কতকগুলি ইহুদীর শরীর মুছলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু আজ এই ঘটনায় উপলক্ষে মোস্তফা চরিত্রের মহিমামণ্ডিত প্রকৃত স্বরূপটি যখন তাহাদিগের নয়ন সম্মুখে উজ্জ্বলে-মধুরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তখন ইহুদী জাতির হৃদয় (তাহাদিগের অনিচ্ছা সত্ত্বে এবং অজ্ঞাতসারে) মোস্তফা চরণে লুটাইয়া পড়িল এবং অচিরকালের মধ্যে এই পুণ্যপাদপে অমৃত ফল ফলিতে আরম্ভ হইল।

## জয়নাবের কর্মফল

জয়নাব এতক্ষণ নীরব নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়াছিল। নিজের দুর্বুদ্ধি এবং লোকের প্ররোচনাবশতঃ সে এতদিন পিশাচিনী সাজিয়াছিল। সে আনন্দ-উৎফুল্ল চিত্তে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল যে, কোন গতিকে এই মারাত্মক হলাহলের একবিন্দু মোহাম্মদের উদরস্থ করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহাকে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু সে যখন দেখিল যে, হযরত সেই হলাহল ভক্ষণ করিয়াও সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে অক্ষত দেহে যথাপূর্ব স্বস্থানে বিরাজ করিতেছেন, তখন তাহার আশ্চর্যের অবধি রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার এবং তাহার স্বজনবর্গের এই অপরাধ ধরা পড়িয়া গেল, তখন সে কম্পিত কলেবরে ঘাতকের তরবারির অপেক্ষা করিতেছিল। সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই অপরাধের জন্য তাহাকে এবং তাহার স্বজাতিকে অবিলম্বে শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্যে পরিণত হইতে হইবে। কিন্তু সে যখন দেখিল যে, তাহার ন্যায় প্রাণের বৈরীকেও মোহাম্মদ প্রশান্ত বদনে ক্ষমা করিতেছেন, সমস্ত ইহুদীকে বিনাদণ্ডে মুক্তি দিতেছেন ;—তখন জয়নাব আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ, তাহার যাবতীয় রাক্ষসী-বৃত্তি মুহূর্তেকের মধ্যে কোথায় উধাও হইয়া গেল। তখন সেই পিশাচিনী জয়নাব প্রেমপাগলিনীরূপে মোস্তফা চরণে লুটিয়া পড়িল এবং প্রকাশ্যভাবে কলেমা তাওহীদের জয়জয়কার করিয়া জীবন সার্থক করিয়া লইল। কিন্তু হতভাগিনী দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ সুখসম্ভোগের সুযোগ পাইল না। পূর্বকথিত বেশর তিন দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তখন ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যার অপরাধে জয়নাবের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল।*

## প্রবাসিগণের প্রত্যাবর্তন

মক্কাবাসীদিগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া যে সকল মুছলমান আবিসিনিয়ায় পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একদল পূর্বে চলিয়া আসিয়াছিলেন। অবশিষ্ট মোহাজেরগণকে আনয়ন করার জন্য হযরত কিছুদিন পূর্বে আবিসিনিয়ায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথাকার রাজা নাজ্জাশী Negus তাঁহাদিগের স্বদেশযাত্রার সমস্ত সুবিধা করিয়া দিলে, তাঁহারা সেখান হইতে যাত্রা করিয়া ঠিক খায়বার বিজয়ের শেষ দিন তথায় উপস্থিত হন। হযরত আলীর সহোদর জা'ফরও এই সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘকাল পরে পুনরায় এই স্বজনগণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া হযরত ও অন্যান্য মুছলমানগণ যার-পর-নাই আনন্দিত হন। খায়বার বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ লাভ ঘটায় এই আনন্দ শতগুণে বর্ধিত হইয়া যায়।**

## মক্কাবাসীদিগের মনোভাব

খায়বার বিজয়োৎ এবং জয়নাব কর্তৃক বিষ প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরে, হাজ্জাজ নামক জনৈক ইহুদী স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করেন। হাজ্জাজ ধনকুবের এবং হেজাজের বিখ্যাত 'মহাজন'। মক্কায় বণিকদিগের নিকট তাঁহার অনেক টাকার 'তেজারত' ছিল, তাঁহার অনেক পণ্যদ্রব্যও সেখানে রক্ষিত ছিল। হাজ্জাজ তাঁহার এছলাম গ্রহণের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই নিজের টাকাকড়িগুলি সংগ্রহ করিয়া

---

* নবনী ২—২২২ পেয়া ও ফৎহুলবারী দ্রষ্টব্য      ** বোখারী, এবন-হেশাম প্রভৃতি।

লওয়ার বাসনা করিয়া অবিলম্বে মক্কা যাত্রা করেন। তিনি নিজেই বলিতেছেন ঃ খায়বার যুদ্ধের ফলাফল জানিবার জন্য মক্কার অধিবাসিগণ অতিশয় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। আগন্তুক পথিকদিগের নিকট হইতেও এই সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার জন্য একদল কোরেশ নগরের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হইলে তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল ঃ সংবাদ কি? খায়বারের সংবাদ কি ? আমি বলিলাম—সংবাদ খুব ভাল। তাহারা তখন আমার উষ্ট্রের চারিদিকে সমবেত হইয়া কি, কি, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি বলিলাম—সংবাদের মত সংবাদ, এমন শুভ সংবাদ তোমরা আর কখনও শ্রবণ কর নাই। মোহাম্মদদের লোকজন সাংঘাতিকরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে,— একদম নাস্তানাবুদ। তাহাদের মেরুদণ্ড চিরকালের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ, আর মোহাম্মদ ইহুদীদিগের হস্তে বন্দী। খায়বার প্রধানগণের মত হইয়াছে যে, মোহাম্মদকে বাঁধিয়া মক্কায় চালান দেওয়া হইবে। এখানে তোমরা স্বহস্তে মুণ্ডপাত করিবে।

ইহুদী মহাজন হাজ্জাজ সবেমাত্র ইহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, এছলামের শিক্ষা ও প্রভাব এখনও তাঁহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সুতরাং তিনি খুব নুন-মরিচ দিয়া গল্পটাকে মক্কাবাসীদিগের মুখরোচক করিয়া দিলেন। লোকগুলি ছুটিতে ছুটিতে নগরে এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিলে মক্কা শহরটা একেবারে সরগরম হইয়া উঠিল। এদিকে হাজ্জাজ নগরে প্রবেশ করিয়া এই সকল গল্প দ্বারা আসর জমকাইয়া বসিলেন এবং এই প্রকার গল্প-গুজবের পর কাজের কথা পাড়িতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন—তোমাদিগের আনন্দ-উৎসবে যোগদান করার জন্য আমরাও মক্কায় আগমন করার সঙ্কল্প করিয়াছি, কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। মোহাম্মদের অবস্থা ত জানিতেছ, এখনও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। তাহার পর তাহার ভক্তগুলি বড় সামান্য বস্তু নহে। তাহাদিগের অসাধ্য কাজ নাই। তাহারা আবার কখন কি করিয়া বসে, তাহার ত ঠিকানা নাই। কাজেই আমরা স্থির করিয়াছি যে, সামলাইবার অবসর না দিয়া মদীনা আক্রমণ করিতে হইবে, মুছলমানের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু এজন্য অনেক টাকার আবশ্যক। এতদিনের যুদ্ধ-বিগ্রহে আমাদিগের সঞ্চিত তহবিলগুলি একেবারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য আমরা যত ইহুদী মহাজন আছি, সকলে একমত হইয়া স্থির করিয়াছি যে, এই কার্যের জন্য আমরা আমাদিগের যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলিব। এই কারণেই এ সময় আমার আসা। তোমরা মুহূর্তেক বিলম্ব না করিয়া আমার টাকাকড়িগুলি পরিশোধ করিয়া দাও, আমি স্বদেশে গিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেই। বিলম্বে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। এই প্রকার চাল দিয়া ধূর্ত মহাজন নিজের সমস্ত টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া লইয়া মক্কা ত্যাগ করিলেন। যাইবার পূর্বে তিনি হযরতের পিতৃব্য আব্বাছকে আসল কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়া যান। তাঁহার নিষেধ ছিল, তিন দিন পর্যন্ত এসব কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা হইবে না। এই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর একদা আব্বাছ কৃষ্ণবর্ণ জুব্বা পরিয়া বাহির হন। ইহা দেখিয়া কোরেশগণ বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল—আপনি দেখিতেছি, ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য পূর্ব হইতেই শোকবাস ধারণ করিয়াছেন। আব্বাছ তখন তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন—এ উৎসবের পরিচ্ছদ, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইয়াছেন। হতভাগাগণ ! এখনও সতর্ক হও ! আল্লাহর প্রদীপকে মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করিতে যাইও না। ইহাতে কেবল তোমাদেরই মুখ পুড়িয়া যাইবে—কিন্তু সে প্রদীপ নির্বাপিত হইবে না। তখন আব্বাছের মুখে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কোরেশদিগের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।*

---

* এবন-হেশাম ২—১৯২, কনজুল-ওম্মাল ৫—৩৮৫ প্রভৃতি। এই বিবরণটির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমার তদন্ত করার সুযোগ ঘটে নাই।

মক্কাবাসীদিগের বর্তমান মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য আমরা এই সদ্য দীক্ষিত ইহুদী মহাজনের ধূর্ততার কাহিনী পাঠকগণের গোচরীভূত করিলাম। হযরত মোহাম্মদের মুণ্ড কাটিবার এবং মুছলমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া ফেলার জন্য তাহাদিগের কত আনন্দ কত উৎসাহ! পাঠকগণ চিত্রের এই নারকীয় দিকটা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবেন। কিছুদিন পরে আমাদিগকে আবার এখানে আসিতে হইবে, তখন প্রেম-পুণ্যে উদ্ভাসিত উহার স্বর্গীয় দিকটাও দর্শন করিবেন।

## কয়েকটা সংস্কার

খায়বার সমরের পর হযরত আর কয়েকটা সংস্কারমূলক আদেশ প্রচার করিলেন। এতদিন খাদ্যাখাদ্য বলিয়া আরবদিগের মধ্যে কোন বিচার ছিল না। এখন হিংস্র পশু-পক্ষী অখাদ্য ও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইল। গর্দভ ও অশ্বতর মাংস এতদিন মুছলমানদিগের মধ্যেও অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। বোখারীর হাদীছে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, গর্দভ-মাংস ভক্ষণ করার প্রথা প্রচলিত থাকিলে গর্দভের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে এবং ইহাতে দেশের অনেক ক্ষতি হইবে—হযরত এই প্রকার আশঙ্কা করিয়াই গর্দভ-মাংস ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। উট কোরবানী করাতে দেশের এই অত্যাবশ্যকীয় পশুর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কায় হযরত একবার উটের কোরবানী বন্ধ করিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে গো-কোরবানী করার আদেশও প্রদান করিয়াছিলেন—ছহী হাদীছে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদিন পর্যন্ত আরবদেশে মোৎআ বা নির্দিষ্ট কালের জন্য অস্থায়ী বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন হযরতের আদেশে এই জঘন্য প্রথাটি রহিত হইয়া গেল।*

## পুনরায় তীর্থযাত্রা

হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, মুছলমানদিগকে সে বৎসর পথ হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আগামী বৎসর তাঁহারা তীর্থ করিতে পারিবেন। এই শর্ত অনুসারে হযরত কতিপয় ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় তীর্থযাত্রা করেন। সন্ধিশর্ত অনুসারে কোরেশগণ এবার মুছলমানদিগকে কোন প্রকার বাধা দিল না বটে, কিন্তু এ দৃশ্য দর্শন করার মত ধৈর্য তাহাদের ছিল না। তাই কোরেশ প্রধানগণ তখন নগর হইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধিশর্ত অনুসারে হযরত তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিয়া তীর্থসংক্রান্ত সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে থাকেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, কোরেশ প্রধানগণ এই সময় নগর হইতে বহির্গত হইয়া নিকটবর্তী আবুকোবায়েছ পর্বত উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ক্রোধ ও হিংসা-বিদ্বেষবশতঃ তাহারা নগর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কার জনসাধারণ হযরত এবং তাঁহার সহযাত্রীদিগকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া ও গালাগালি দিয়া উত্যক্ত করিতে একবিন্দুও দ্বিধাবোধ করে নাই। যে আবুবাক্রের কথা স্যার উইলিয়ম মুর উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি এই সকল ঘটনার উল্লেখ করার পর নিজেই বলিতেছেন........তখন আমি তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিলাম—দেখিতেছি তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করার সঙ্কল্প করিয়াছ। অদূরে ইয়াযাজ-প্রান্তরে আমাদিগের বহু অস্ত্রশস্ত্র সুরক্ষিত হইয়া আছে। তোমরা মনে করিয়াছ কি? এই প্রকার ধমক দেওয়ার পর তাহারা ভীত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। হযরত কাবাগৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে তাহারা কঠোর ভাষায় বাধা দিয়া বলিল—সন্ধিপত্রে কেবল তীর্থ করার কথা আছে, মসজিদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করার কথা

---

* বোখারী, মোছলেম ও অন্যান্য ইতিহাস। কোন কোন হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় মোৎআ হারাম হয়।

নাই। হযরত তাঁহার স্বাভাবিক মাহাত্ম্যগুণে এ সমস্তকেই ক্ষমা ও উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিতেছিলেন। আবদুল্লাহ-এবন-রওয়াহা রণসঙ্গীত আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলে, ইহা দ্বারা কোরেশদিগের মনে বেদনা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে মনে করিয়া হযরত তাঁহাকে ঐ সঙ্গীত গান করিতে নিষেধ করিয়া দেন। কোরেশদিগের কঠোর ভাষার ফলে এক সময় আনছার প্রধান ছা'আদ-এবন ওবাদা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, হযরত তাঁহাকে ধৈর্যধারণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই সকল ঘটনার মধ্য দিয়া কোরেশ জাতির তৎকালীন মানসিকতা খুব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। তাহারা যে সে সময় ছুতানাতা দ্বারা একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া নিরস্ত্র তীর্থযাত্রীদিগের উপর আক্রমণ করার চেষ্টায় ছিল, এই সকল ঘটনা পরম্পরার দ্বারা তদ্রূপ অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না।*

সন্ধিশর্ত অনুসারে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিয়া চতুর্থ দিবস সহচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া হযরত মদীনা যাত্রা করেন। মক্কার জনসাধারণ এবং মধ্যবিত্ত অধিবাসীবর্গ তাহাদিগের প্রধানগণের প্ররোচনায় হযরতের প্রতি যৎপরোনাস্তি দুর্ব্যবহার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র প্রভাবে তাহারা মুগ্ধ ও বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই ফলে অল্পদিনের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট কোরেশ মদীনায় গমনপূর্বক স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠকগণ ইহার বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে প্রাপ্ত হইবেন।

## ষট্‌ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

خلائق را ز دعوت جام در دادند    بهر کشور صلائے عام در دادند

نمود از عطا قطرے سرشتند    بنام تو یکے سطرے نوشتند

### ধর্মের আহ্বান

মানব সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত হইতেই জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে এবং এই মহামানবগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া মানুষকে আল্লাহর পানে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল উপস্থিত যুগের হিসাবে স্বদেশের, এমন কি কেবল স্বদেশস্থ জাতিবিশেষের, মঙ্গলচিন্তায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। হযরত মুছা কেবলই ভাবিতেছেন—ফেরাওনের দাসত্ব পাশ হইতে স্বজাতির মুক্তির কথা, তাহাদিগকে লইয়া নিজস্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা এবং কেবল সেই মুষ্টিমেয় মানবগণের পারলৌকিক কল্যাণের কথা। বাইবেলের যীশু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, পরজাতীয়দিগের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ বা সংস্রবই নাই। কেবল এস্রাইলের হারান মেষগুলিকে একত্র করার জন্যই তাঁহার আগমন। প্লাটো, জরথুষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাজনগণের শিক্ষা তাঁহাদিগের স্বদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। এই মহাপুরুষগণের প্রচারিত ধর্মের মূল সত্যকে বিস্মৃত হওয়ার ফলে ঐ সকল ধর্ম লইয়া দেশে দেশে ও সমাজে সমাজে ভয়ঙ্কর বিভ্রাট সৃষ্টি হইল এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রাণের বৈরী হইয়া দাঁড়াইল। পূর্বগণের সাময়িক অবস্থানুসারে ঐ প্রকার ব্যবস্থা আদৌ অসঙ্গতও ছিল না। কারণ তখনও মানবজাতির অবস্থা—একটা

* বোখারী, মাওয়াহেব, জরকানী, এছাবা ও হলবী প্রভৃতি। কোন কোন অসতর্ক ঐতিহাসিক, কোরেশদের আক্রোশ ও হযরতের প্রতি প্রস্তর প্রদর্শনের ঘটনাকে এই সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা মক্কা বিজয়ের পরবর্তী ঘটনা।

পরিবর্তনশীল, সর্বসম্প্রদায়, সার্বভৌম ও চিরন্তন ধর্মের উপযোগী হইয়া উঠে নাই; তাই এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি আসিয়াছিলেন—সকল দেশের সকল জাতির এবং সকল ধর্মের সকল লোকের নিকট আল্লাহর এই মহাসত্য বাণী পৌঁছাইয়া দিতে। তাঁহার প্রতি এই বিশেষ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল যে, তুমি বিশ্বমানবকে এইভাবে আহ্বান করিতে থাক—সেই সার্বজনীন ও সনাতন সত্যের দিকে, আল্লাহ এক, দুনিয়ার সমস্ত জাতিগত-কোলাহল এক সময় নিঃশেষ বিশ্বমানব চিরকালের মত বিলুপ্ত হইয়া যাক।

যেদিন হযরতের এই সাধনপন্থা যে প্রকার পরিণতিতে উপস্থিত হইয়া আসিয়াছিল, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর বিরুদ্ধবাদীদের জন্য তাহা কথঞ্চিৎভাবে অবরুদ্ধ হইয়া গেলে, তিনি নিজের শেষ জীবনের এই মহান কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়েই হযরত দেশ-বিদেশের প্রধান প্রধান নরপতি ও গোত্রপতিদিগের নিকট সেই সত্যের বাণী পৌঁছাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে সকল দেশের সকল জাতির সকল সমাজের মানুষদিগকে আহ্বানপূর্বক হযরত ঘোষণা করিলেন—সকলে আইস, আল্লাহর আহ্বান! সকলে শ্রবণ কর, মানবমাত্রই আল্লাহর বান্দা। সকলে শ্রবণ কর, জগতের সকল দেশের এবং সকল যুগের সমস্ত নবী-রসুল ও সকল মহাপুরুষ একই মূল সত্যের বাহক। সকলে সেই সনাতন ও সার্বজনীন সত্যকে অবলম্বন কর, মানবসমাজ এক অখণ্ড বিশ্ব-ভ্রাতৃসমাজে পরিণত হউক! মানবের জাতি এক, ধর্ম এক, কারণ তাহাদের আল্লাহ এক। আইস, আমরা সকলে একযোগে সেই অনন্ত-দয়াময়, প্রেমময়-করুণাময়, রহমানুর-রহিম 'সচ্চিদানন্দে'* আত্মসমর্পণ করিয়া দুনিয়ায় শান্তির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করি! হোদায়বিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরেই মদীনার দূতগণ হযরতের এই বাণী লইয়া দেশ-দেশান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

## রোমরাজের দরবারে মদীনার দূত

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পারস্য ও রোম সম্রাটের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ চলিতে থাকে। প্রথমে রোম সম্রাটের পরাজয় ঘটে এবং মিশর, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। পরে রোমের তৎকালীন কায়সার বা সম্রাট Heraclius-এর চেষ্টায় পারস্যের পরাজয় ঘটে এবং কায়সারের হস্তচ্যুত রাজ্যগুলি আবার তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। এই বিজয়ের পর কায়সার হেমস্ হইতে যাত্রা করিয়া তীর্থ করিবার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাস বা জেরুজালেমে উপস্থিত হন। দেহ্‌য়া কাল্‌বী নামক বিখ্যাত ছাহাবী হযরতের পত্র লইয়া প্রথমে বোস্রাস্থিত রোমান গভর্ণরের নিকট গমন করেন। তখন হারেছ নামক গচ্ছানবংশের প্রধান এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। হারেছ তখন আদি-বিন-হাতেমকে দেহ্‌য়ার সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে হিরাক্লিয়স বা কায়সারের দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা বায়তুল-মোকাদ্দাসে উপস্থিত হইলেন এবং হযরতের পত্র রোমরাজকে পৌঁছাইয়া দিলেন। দূতের মুখে আরবের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সম্রাটের কৌতূহল ও আগ্রহের সীমা রহিল না। তিনি বাইবেল, সুতরাং তৌরাত প্রতিশ্রুত 'শেষ ভবিষ্যদ্বক্তা'র আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কাজেই হযরতের পত্র পাইয়া তিনি তন্মধ্যস্থ সমস্ত প্রকৃত বাণী এবং সভাসদ্‌গণকে লইয়া মহাসমারোহে এক দরবার করার আদেশ প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট ইহাও আদেশ করিলেন যে, এদেশে আরবের কোনও লোককে পাওয়া গেলে, তাহাকে যেন এই দরবারে উপস্থিত করা হয়। ঐ সময়ে মক্কাবাসীর প্রধানতম শত্রু আবু সুফিয়ান কতিপয় কোরেশ

---

* সৎ, একমাত্র সৎস্বরূপ চৈতন্য ও আনন্দময় ঈশ্বরের একমাত্র সম্বোধন।

বণিকের সহিত সিরিয়া প্রদেশে অবস্থান করিতেছিল। আবু-সুফিয়ান নিজেই বলিতেছে : "মোহাম্মদের পত্র পাইয়া কায়সার আমাদিগকে তলব দিলেন এবং আমি ও আমার সঙ্গিগণ দরবারে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম, কায়সার রাজমুকুট পরিধান করিয়া সিংহাসনে সমাসীন এবং রোমের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবৃন্দ তাঁহার চারিপার্শ্বে উপবিষ্ট। এই সময় অনুবাদকের সাহায্যে কায়সার আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাদিগের যে লোকটি নিজেকে নবী বলিয়া মনে করিতেছেন, তোমাদিগের মধ্যে তাঁহার সর্বাপেক্ষা নিকটাত্মীয় কে? আমি উত্তর করিলাম—'আমি, সে আমার পিতৃব্য পুত্র।' তখন সম্রাট আমাকে সম্মুখে সরিয়া আসিতে এবং আমাদের আর সকলকে আমার পশ্চাতে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার সঙ্গীদিগকে বিশেষ তাকিদ করিয়া বলিয়া দিলেন : দেখ, আমি এই ব্যক্তিকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিব। সে মিথ্যা উত্তর দিলে তোমরা সকলে আমাকে তাহা বলিয়া দিবা। একে রোম সম্রাটের দরবার, তাহার উপর এতগুলি কোরেশ-প্রধান সঙ্গে, দেহয়া কালবী ও আদি-এবনে হাতেম তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট, তাহার উপর সম্রাটের এই তাকিদ। কাজেই আবু-সুফিয়ানের আর মিথ্যা কথা বলার সাহস হইল না। সে নিজ মুখে বলিতেছে : কি করিব, এই সকল কারণে সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।" এই সময় আবু-সুফিয়ানের সহিত সম্রাটের যে কথোপকথন হইয়াছিল, নিম্নে তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি

সম্রাট : যে লোকটি নবুয়তের দাবী করিতেছে—তাহার বংশ কিরূপ ?

আবু : খুব ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশে তাহার জন্ম।

সম্রাট : তাহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ রাজা ছিল কি ?

আবু : কই, তা ত দেখি না।

সম্রাট : তাহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কেহ নবী হওয়ার দাবী করিয়াছিল কি ?

আবু : না, আমাদের বংশে কেহ কখনও ঐরূপ কথা বলে নাই

সম্রাট : এই সকল কথা বলার পূর্বে এই লোকটি কি কখনও মিথ্যা কথা বলিয়াছে ? অথবা কেহ অন্যায়পূর্বকও তাহার প্রতি মিথ্যা কথা বলার দোষারোপ করিয়াছে কি?

আবু : না, মিথ্যা কথা সে জীবনে কখনও বলে নাই।

সম্রাট : তোমাদিগের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোক অধিকতর তাহার অনুসরণ করিতেছে ? বড় বড় প্রধান লোক, না গরীবগুলি?

আবু : না হুজুর, তাহাদের অধিকাংশই দীন-দুঃখী—আর এই নব্য যুবকদল।

সম্রাট : মোহাম্মদের ভক্তদিগের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে—না কমিতেছে ?

আবু : না হুজুর, দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সম্রাট : আচ্ছা বল দেখি, তাহার ধর্ম গ্রহণ করার পর, সেই ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কেহ তাহা ত্যাগ করিয়াছে কি?

আবু : না।

সম্রাট : তোমাদের সহিত তাহার যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে কি ?

আবু : জি হাঁ, কয়েকবার ঘটিয়াছে।

সম্রাট : তাহার ফলাফল কিরূপ হইয়াছে ?

আবু : কখনও আমরা জয়যুক্ত হইয়াছি, আর কখনও সে জিতিয়াছে।

সম্রাট : এই ব্যক্তি কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে কি ?

আবু : না, তা করে নাই। তবে আমাদের সঙ্গে হালে তাহার একটা সন্ধি হইয়াছে। দেখা যাক কি করে ! আমাদের ত খুবই আশঙ্কা আছে।

সম্রাট : এই ব্যক্তি কি শিক্ষা দিয়া থাকেন ?

আর ও বলে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর পূজা কর। তাঁহার পূজা-অর্চনায় আর কাহাকেও শরীক করিও না। আমরা পিতৃপিতামহাদিক্রমে যে সকল ঠাকুর দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি, আমাদিগকে তাহা ত্যাগ করিতে বলে। সে বলে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও করুণাময়—তিনি সর্বত্রই বিদ্যমান আছেন। অতএব তাঁহার পূজা-অর্চনায় অথবা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করার জন্য উকিল ও সুপারিশ দরকার হয় না। সে আল্লাহর উপাসনা করিতে আদেশ করে, আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেয়, আমাদিগের পরিশ্রম অর্জিত ধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দরিদ্রদিগকে বাটিয়া দিতে বলে। সত্যবাদী, সচ্চরিত্র এবং সুরুচিসম্পন্ন হইবার জন্য সকলকে তাকিদ করে। প্রতিজ্ঞা পালন করিতে এবং আমানতের খেয়ানত না করিতে হুকুম দেয়।

## সম্রাটের সিদ্ধান্ত

রোম-রাজ তখন মক্কাবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "দেখ, আমি প্রথমে এই লোকটির বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তোমাদিগের কথায় জানিলাম যে, আরবের সম্ভ্রান্ততম বংশে তাঁহার জন্ম। নবী, রসুল ও মহাপুরুষগণ চিরকালই এইরূপ উচ্চবংশ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তোমরা বলিলে যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ রাজা ছিল না। সুতরাং পিতৃরাজ্য উদ্ধার করার জন্য এরূপ করিতেছে, এই প্রকার সন্দেহও করা যায় না। তোমরা বলিলে যে, তাঁহার পূর্বে কেহ ঐ প্রকার কথা কহে নাই। সুতরাং সে যে কাহারও অনুকরণ করিতেছে, এরূপ সন্দেহ করাও অন্যায় হইলে। তোমাদিগের কথায় বুঝিলাম, দীন-দরিদ্র এবং নব্য যুবকগণই অধিকতর তাঁহার ভক্ত হইয়াছে। নবীদিগের সম্বন্ধে চিরকালই এরূপ হইয়া আসিতেছে। তোমরা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিতেছ যে, এই ব্যক্তি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই। ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি জীবনে মানুষ সম্বন্ধে কখনও কোন মিথ্যা বলে নাই, সে কি খোদার নামে মিথ্যা রচনা করিতে পারে ? তোমরা স্বীকার করিতেছ যে, কেহই তাঁহার ধর্মত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে না। স্মরণ রাখিও, ইহা সত্য ধর্মের মহিমা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিশ্বাসের পরমানন্দ একবার অন্তরের অন্তঃস্তলে প্রবেশলাভ করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। তোমরা বলিতেছ, যুদ্ধে তাঁহার জয়-পরাজয় উভয়ই ঘটিয়া থাকে, ইহা নবিগণের পরীক্ষা। তোমরা বলিতেছ, মোহাম্মদ জীবনে কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই, ইহাই ত সত্যসেবক নবীর লক্ষণ, নবী কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। তোমরা বলিতেছ যে, এই ব্যক্তি নামায, যাকাত, সচ্চরিত্রতা, আত্মীয়বৎসলতা প্রভৃতির শিক্ষা দিয়া থাকে। তোমাদিগের কথা সত্য হইলে, নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি আল্লাহর সেই নবী। আমিও তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি যে তোমাদিগের দেশে আবির্ভূত হইবেন ইহা কখনই মনে করিতে পারি নাই। আমার সাধ্য থাকিলে আমি সর্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে আমি তাঁহার পা দু'খানি ধোয়াইয়া দিয়া ধন্য হইতাম। সকলে শ্রবণ কর, আজ আমি যে সিংহাসনে বসিয়া কথা কহিতেছি, আমার এই সিংহাসন এবং এই সাম্রাজ্য, নিশ্চয়ই তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইবে।

## হযরতের পত্র

আবু-সুফিয়ান বলিতেছে—তখন সম্রাটের আদেশক্রমে হযরতের পত্র দরবারে পঠিত হইল। আমরা পত্রের মূল আরবী ও তাহার অবিকল অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে।

আল্লাহর দাস ও তাঁহার প্রেরিত মোহাম্মদের পক্ষ হইতে, রোমের প্রধান হেরাক্লের সমীপে। সত্যের অনুসরণকারিগণের প্রতি ছালাম। অতঃপর আমি তোমাকে এছলামের দিকে আহ্বান করিতেছি। এছলাম গ্রহণ কর, তোমার কল্যাণ হইবে। এছলাম গ্রহণ কর, আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করিবেন। কিন্তু যদি তুমি ইহাতে অস্বীকৃত হও, তাহা হইলে তোমার প্রজা সাধারণের পাপের জন্য তুমি দায়ী হইবে। (অতঃপর কোরআনের এই আয়তটি লিখিত ছিল) হে গ্রন্থধারিগণ! আইস, আমরা ও তোমরা সকলে একযোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি ঃ (তাহা এই) যে, আমরা কেহই আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও পূজা করিব না এবং আল্লাহকে ত্যাগ করতঃ অন্য কোন মানুষকে নিজেদের প্রভু বানাইয়া লইব না! (খৃষ্টান ও ইহুদী প্রভৃতি) গ্রন্থধারিগণ যদি (এই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করিতে) অসম্মত হয়, তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, (তোমরা স্বীকার কর আর না-ই কর, কিন্তু আমরা এই সত্যকে স্বীকার করিতে বাধ্য) আমরা মোছলেম, তোমরা এ-কথার সাক্ষী হইয়া থাক।

(মোহর) আল্লাহর
রছুল
মোহাম্মদ

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى . اما بعد فاني ادعوك بداعية الاسلام . إسلم تسلم . واسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم الاريسيين - ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم : الا نعبد الا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله . فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .

الله
رسول
محمد

আবু-সুফিয়ান বলিতেছে—মোহাম্মদের পত্র পঠিত হওয়ার পর দরবারে অত্যন্ত কোলাহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। কাজেই তখন তাহাদিগের মধ্যে যে কি কথোপকথন হইয়াছিল, আমি তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তখন সম্রাটের আদেশক্রমে আমরা দরবার হইতে বহির্গত হইলাম। সেদিন আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, মোহাম্মদকে জগতে আর কেহই বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না।*

রোম-রাজের নিকট হযরতের পত্র প্রেরণ এবং দরবারে আবু-সুফিয়ানের সহিত তাঁহার কথোপকথন প্রভৃতি ঘটনা, বোখারী ও মোছলেমের ন্যায় বিশ্বস্ততম হাদীছ গ্রন্থে এবং আবু-সুফিয়ানের প্রমুখাৎ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হযরতের দূত দেহয়া কালবী এবং তাঁহার সহযাত্রী আদি-এবন-হাতেম আলোচ্য সময় রাজ-দরবারে উপস্থিত ছিলেন। আবু-সুফিয়ানের সঙ্গেও বহু কোরেশ বণিক রোম-রাজের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আবু-সুফিয়ান ও তাহার সঙ্গিগণ তখন এছলামের পরম শত্রু, এ-কথাও পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন। আবু-সুফিয়ান এই বর্ণনার মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন বা যোগ-বিয়োগ করিয়া থাকিলে তাহার সঙ্গী কোরেশগণ এবং দেহয়া ও তাঁহার সহচর নিশ্চয় তাহা ব্যক্ত করিয়া দিতেন। ফলে এই

* বোখারী ৬—২৮, মোছলেম ২—৯৭ হইতে ৯৯ প্রভৃতি।

বিবরণের ঐতিহাসিক ভিত্তি যে সন্দেহ ও সংশয়ের সম্পূর্ণ অতীত, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, কোন কোন স্বনামখ্যাত আধুনিক মুছলমান লেখক বোখারী ও মোছলেমের এই রেওয়ায়তটির সন্ধান না পাইয়া ফৎহুলবারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পক্ষান্তরে স্যার উইলিয়ম মূরের ন্যায় আদর্শ খৃষ্টান লেখক এক্ষেত্রে কায়সার-দরবারের এই বিস্তৃত বিবরণটাকে কয়েক ছত্রের মধ্যে সারিয়া দিয়া নিজেদের জান বাঁচাইয়া লইয়াছেন। মোস্তফা চরিত্রের এই মনোমুগ্ধকর মহিমা, সত্যের এই অদম্য স্বর্গীয় প্রভাব, কায়সারের দরবারে এবং প্রাণের বৈরী আবু-সুফিয়ানের মুখে তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হযরতের এই গুণকীর্তন, খৃষ্টান লেখকগণের পক্ষে একেবারে অসহ্য। তাই তাঁহারা এই ঘটনাকে যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মূর সাহেব তাঁহার পুস্তকের কয়েকটা পাদটিপ্পনীতে অবশ্য খুব ধূর্ততা সহকারে এমন কয়েকটা কথা বলিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে বিশেষ ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যাইতে না হয়, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পাঠকগণের মনে এই বিবরণের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে একটা বড় রকমের সন্দেহের সৃষ্টি হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, বোখারী ও মোছলেম হইতে এই বিবরণটি উদ্ধার করার পর স্যার উইলিয়ম মূরের সমস্ত কারিকুরী সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। বোখারী ও মোছলেমে এই পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরতের পত্র পঠিত হওয়ার পর দরবারে এমন একটা কোলাহল ও হট্টগোল আরম্ভ হইয়া গেল যে, মক্কাবাসিগণ তখনকার কথাবার্তা কিছুই জানিতে ও বুঝিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে ইহার অব্যবহিত পরেই সম্রাট তাহাদিগকে দরবার হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। সুতরাং কোন কোন ঐতিহাসিক যে সকল পরবর্তী ঘটনার বিবরণ ইহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহা আদৌ বিশ্বস্ত নহে। স্যার উইলিয়ম দার্শনিক হিসাবে এই পত্রের অবিশ্বস্ততা সপ্রমাণ করার জন্যও যথেষ্ট পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"The letter of Heraclius contains a passage from the Koran which as shown by Weil, was not revealed till the ninth year of Hijra"—অর্থাৎ এই পত্রে কোরআনের যে আয়তটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা নবম হিজরীর পূর্বে অবতীর্ণ হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখক মহাশয় এখানে Weil কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তিগুলির একটুও আভাস প্রদান করেন নাই। যাহা হউক, স্যার উইলিয়ম প্রভৃতি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অর্থাৎ সত্য আবিষ্কারের প্রতি তাঁহাদের একটু আগ্রহ থাকিলে, তাঁহারা নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিতেন যে, আলোচ্য আয়তটি সপ্তম হিজরীর বহু পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। উইল ও তাঁহার মূল রাবী এখানে মারাত্মক ভুল করিয়াছেন।

## নাজ্জাশীর নিকট পত্র প্রেরণ

আবিসিনিয়া বা হাবশের রাজা নাজ্জাশী পাঠকগণের অপরিচিত নহেন। হযরত নাজ্জাশীর নিকটও জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন। ঐ দূতের মারফতে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, কোন বিশ্বস্ত হাদীছে তাহার অনুলিপি খুঁজিয়া পাই নাই। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে যে নকল দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকিলেও মোটের উপর নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারা যায় যে, আবিসিনিয়ার এই খৃষ্টান নরপতিকেও হযরত সেই সনাতন ও সাধারণ সত্যের পানে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই পত্রে হযরত ইছা বা যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল ঃ "এবং আমি ঘোষণা করিতেছি যে, যীশু আল্লাহর বাণী এবং তাঁহার প্রেরণা, সতীসাধ্বী মরিয়মের গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছে।" যাহা হউক, হযরতের পত্র পাইয়া আবিসিনিয়ার রাজা আছহামা, রাজ্য, রাজত্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রলোভনকে দূরে ফেলিয়া প্রকাশ্যভাবে এছলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহর সত্য ধর্ম এছলাম যে কি প্রকারে জগতে নিজের প্রভাব স্থাপন ও প্রসার বর্ধন করিয়াছিল, এই সকল ঘটনা দ্বারা তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

## মিশর দরবারে এছলাম

মিশরের অধিপতি মেকাওকাছের নিকট হযরতের যে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি সুরক্ষিত হইয়া আছে। মেকাওকাছ প্রকাশ্যভাবে এছলাম গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি হযরতের দূতের এবং তাঁহার পত্রের প্রতি যে প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যেরূপ আন্তরিক ও বিনয়সহকারে মূল্যবান উপঢৌকনাদিসহ পত্রের উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা লেখিলে মনে হয় যে, দুনিয়ার বাধাবিঘ্নের জন্য তিনি প্রকাশ্যভাবে এছলাম গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইলেও তাঁহার মন মোস্তফা-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

## পারস্য দরবারে মোছলেম দূত

পূর্বেই বলিয়াছি যে, হযরতের এই প্রেমের আহ্বান, এ সমন্বয় সাধনা, কোন দেশ বা জাতি-বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। কাজেই খ্রীষ্টান রাজন্যবর্গের ন্যায় পারস্যের অগ্নি-উপাসক নরপতির নিকটও এই মর্মে পরওয়ানা প্রেরিত হইল। খছরু-পরভেজ তখন পারস্যের "কেছরা" বা রাজাধিরাজ। হযরতের পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে ও অহঙ্কারে কেছরার আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। কি, এতবড় কথা ! আমার একটা গোলাম, আমারই একটা সামান্য প্রজা, আজ আমাকে স্বধর্ম ত্যাগ করিতে আহ্বান করিতেছে। আবার স্পর্ধা দেখ, আমার নামের পূর্বে নিজের নাম বসাইয়া দিয়াছে। কেছরা এইরূপে দম্ভ ও দর্প প্রকাশ করিতে করিতে হযরতের পত্রখানা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। পারস্যের অমর কবি নেজামী এই অবস্থা বর্ণনাকালে বলিতেছেন ঃ

چو عنوان گه عالمتاب را دید — تو گفتی سگ گزیده آب را دید

غرور پادشاهی بردش از راه — که گستاخی که یارد با چو من شاه؟

کرا زهره که با این احترامم — نویسد نام خود بالای نامم؟

رخ از گرمی چو آتشگاه خود کرد — بخود اندیشهٔ بد کرد و بد کرد

دریدان نامهٔ گردن سکن را

نه نامه بلکه نام خویشتن را

পারস্যের প্রবল প্রতাপান্বিত শাহে-কাজকোলাহ, দেশের প্রত্যেক প্রজাকে দাসানুদাস বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে। তাহার ধারণা ছিল যে, অন্য কোন মানুষ তাহার সমকক্ষতা করিবার অধিকারী নহে। কাজেই হযরতের পত্র পাইয়া সে ধৈর্যচ্যুত হইয়া পড়িল। তখন এমনের শাসনকর্তার নামে কড়া হুকুমসহ পরওয়ানা প্রেরিত হইল— মোহাম্মদকে গ্রেফতার করতঃ অবিলম্বে হুজুরে প্রেরণ করা আবশ্যক, ইহাতে কোন প্রকার অন্যথা না হয়।

এমনের শাসনকর্তা "বাজান" অবিলম্বে হযরতের নামের গ্রেফতারী পরওয়ানা দুইজন কর্মচারীর জেম্মা করিয়া তাহাদিগকে মদীনায় যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। এই লোক দুইটি মদীনায় পৌঁছিয়া হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং পরওয়ানা দেখাইয়া সমস্ত কেওয়ারা খুলিয়া বলিল। হযরত তাহাদিগের আদর অভ্যর্থনার কোন প্রকার ত্রুটি করিলেন না বটে, কিন্তু তাহাদিগের কথা ও পরওয়ানার কোন পরওয়া না করায় তাহারা যুগপৎভাবে স্তম্ভিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল—আদেশমত যদি হাজির হও,

তাহা হইলে গভর্নর সাহেব তোমার সম্বন্ধে সুপারিশ করিতে পারেন। অন্যথায় শাহানশার ক্রোধানলে পড়িয়া তোমাকে ও তোমার স্বজনবর্গকে একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যাইতে হইবে। হযরত এই সকল কথার প্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া দূতদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন : আচ্ছা বল দেখি, তোমরা এমন করিয়া দাড়ি ও গোঁফগুলা কামাইয়া ফেলিয়াছ কেন ? দূতদ্বয় বলিল—আমাদিগের প্রভুর (সম্রাটের) এইরূপ হুকুম। হযরত ইহার উত্তরে বলিলেন : 'কিন্তু আমাদিগের প্রভুর হুকুম দাড়ি বড় আর গোঁফ ছোট করিতে হইবে।' এই প্রকার কথোপকথনের পর হযরত দূতদ্বয়কে আগামীকাল আসিতে বলিয়া সেদিনের মত তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

বাজানের প্রেরিত কর্মচারীদ্বয় পরদিন হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলে, হযরত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : কাহার হুকুম, কাহার পরওয়ানা ?

দূতগণ : তাহা ত গতকল্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। পারস্যের শাহানশাহ খছরু-পরভেজের হুকুম।

হযরত : কিন্তু খছরু ত নিহত। তাহার পুত্র শিরওয়হ (বা Siroes) তাহাকে গত রাত্রি হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। যাও, বাজানকে এই সংবাদ জানাইয়া দাও। নিশ্চয় জানিও, এছলাম অনতিবিলম্বে কেছরার সিংহাসনের উপর অধিকার বিস্তার করিবে।

দূতগণ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় যখন হযরতের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে, সেই সময় বিশেষ যত্নসহকারে পাথেয়াদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ার পর, হযরত তাহাদিগকে সম্বোধনকরতঃ গম্ভীর স্বরে এরশাদ করিলেন : বাজানকে এছলাম গ্রহণ করিতে বলিবা। তাহা হইলে আমি তাহাকে পূর্ব পদে নিযুক্ত করিব। কর্মচারীদ্বয় ও তাহাদিগের সঙ্গী মিলিটারী ফৌজ এমনে পৌঁছিলে তথাকার শাসনকর্তা বাজানও তাহাদিগের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন।

শাহানশাহ খছরু পারভেজের হুকুম—মোহাম্মদকে গ্রেফতার করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিতে হইবে। এই হুকুম তামিল করিতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। রাজকর্মচারী, গ্রেফতারী পরওয়ানা, পুলিস-ফৌজ সমস্তই পাঠান হইয়াছিল—কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহার উপর এমন তেজস্বিতার ভাব, আত্মসত্যে এমন দৃঢ় বিশ্বাস আর কখনও ত দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। আমি পাঠাইলাম—সম্রাটের পরওয়ানা, আর মোহাম্মদ বলিয়া পাঠাইতেছেন—"তোমার সম্রাট গত রাত্রে তাহার পুত্র কর্তৃক নিহত হইয়াছে!" এমন স্পষ্ট অনাবিল ভবিষ্যদ্বাণী ত বাইবেলে কুত্রাপিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার পর আমাকে মুছলমান হইবার উপদেশ—তাহা হইলে মোহাম্মদ আমাকে আমার পূর্ব পদে বহাল রাখিবেন। ইহার অর্থ এই যে, আরব উপদ্বীপ স্বাধীন, কোন রাজা বা সম্রাটের ধার তাহারা ধারিবে না। সমস্ত আরব মিলিয়া এক মুক্ত, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে। মোহাম্মদের ইহাই সঙ্কল্প, এবং তাঁহার ভাবভঙ্গিতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই সঙ্কল্প সিদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই। এই সকল কথা চিন্তা ও আলোচনা করার পর বাজান দরবারের পাত্রমিত্র ও জনসাধারণকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া দিয়া বলিলেন : এই ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিব যে, মোহাম্মদ যথার্থই আল্লাহর সত্য নবী এ কয়টা দিন অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ।

## বাজান প্রভৃতির এছলাম গ্রহণ

অনতিবিলম্বে বাজানের নামে শেরওয়াহের ফরমান আসিয়া পৌঁছিল : "খছরুকে তাঁহার অন্যায় আচরণের জন্য নিহত করিয়া আমি সিংহাসনের অধিপতি হইয়াছি। এমনবাসীকে আমার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিবা। আর মক্কার সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করিবা না।" এই পত্র পাওয়ার পর বাজান এবং এমনের

বহু অগ্নি-উপাসক (পার্সিক) পরিবার এছলাম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। রাজনৈতিক অবস্থানুসারে বাজান কাগজ-পত্রে খছরুর অধীন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তখন তিনি এমনের আমীর বা রাজা হইয়া বসিয়া ছিলেন। এছলাম গ্রহণের পর তিনি কিছুকাল পূর্ববৎ রাজ্যপাট দেখাশুনা করিতেছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার মনে একটা অতৃপ্তি ও অস্বস্তির ভাব জাগিয়া উঠিল। আশেকে রছুল নিজের সেই পরম প্রেমাস্পদের চরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে রাজ্য ও রাজত্বের সমস্ত মোহ কাটাইয়া তিনি একদিন ফকীরবেশে মদীনার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তাহারা বাজানকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া ফেলিল।*

آن کس که ترا بخواست جان را چه کند
فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی و هر دو جهانش بخشی
دیوانهٔ تو هر دو جهان را چه کند

## সপ্তষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

### ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا

### খালেদ, ওছমান ও আমরের এছলাম গ্রহণ

হোদায়বিয়ার সন্ধিশর্তগুলি সংস্কারের হিসাবে মানুষের চক্ষে যতই হেয়তাজনক বলিয়া প্রতিপাদিত হউক না কেন, ক্ষমা ও তিতিক্ষার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাগুরু এবং প্রেম ও শান্তির মহত্তম সাধক এই হেয়তা স্বীকারকেই নিজের নবীজীবনের একটা প্রধানতম সাফল্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। হোদায়বিয়ার এই সন্ধি কোরআনেও "মহা-বিজয়" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। এছলাম শান্তির সাধনা—শান্তিতেই এই সাধনার প্রকৃত স্বরূপ লোকচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারে। তাই এই অবসরের জন্য হযরতের মন যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই জন্যই তিনি কোরেশের সমস্ত অন্যায় জেদ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, প্রথম সুযোগ হইতেই হযরত দেশ-বিদেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আল্লাহর সেই সত্য সনাতন বাণী পৌঁছাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, হিংসা-বিদ্বেষ ও হঠকারিতার বেগ কথঞ্চিতরূপে কমিয়া আসিলে আরব অনারব সকল জাতিই মহিমাময় মোহাম্মদ মোস্তফার প্রকৃত স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হইয়াছিল, এবং বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির শত শত লোক স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছিল। এই সময়কার দুই-একটা ঘটনা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে, আর কয়েকটা ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা হইলেই পাঠকগণ তখনকার অবস্থার কতকটা আভাস জানিতে পারিবেন।

---

* হালবী, এবন-হেশাম, তাবরী ও এছাবা প্রভৃতি। নামটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ বাজান হইবে বলিয়া মনে হয়।

খালেদ-এবন-অলীদ এবং আমর-এবন-আছের নাম পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। খালেদ আরবের অদ্বিতীয় বীর ও অজেয় সেনাপতি। ইঁহার ক্ষিপ্রকারিতা ও অসম সাহসিকতার ফলে ওহোদ যুদ্ধে, সম্পূর্ণরূপে বিজয়লাভের পরও, মুছলমানদিগকে যেরূপ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হন নাই। নাজ্জাশীর দরবারে আমরা কয়েকবার আমর-এবন-আছের পরিচয় পাইয়াছি। এমন দূরদর্শী ও রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত তখন আরবে খুব অল্পই ছিলেন। মোহাজের মুছলমানদিগকে ধরিয়া আনার জন্য আবিসিনিয়ার দরবারে এই আমর যে-সকল কূটিল রাজনৈতিক চাল চালিয়াছিলেন, পাঠকগণের তাহা স্মরণ আছে। ওছমান-এবন-তাল্‌হা কা'বার প্রধান মোহাফেজ, বায়তুল্লার সমস্ত তালাচাবি তাহারই জিম্মায় থাকিত। ইহা যে কত বড় সম্মানের পদ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমর অনেক পূর্বেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু নানাবিধ দুর্বলতার জন্য এতদিন আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাই আজ মক্কার সমস্ত সুখ-সম্পদ ও ধন-দৌলতের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, তিনি মদীনার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক মন্‌জিল অগ্রসর হইলে একদিন হঠাৎ খালেদ ও ওছমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিয়া যায়। এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের ফলে উভয় পক্ষই একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমর অনতিবিলম্বে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"খালেদ! কত দূর?" খালেদ বীরপুরুষ, তিনি বীর সৈনিকের ন্যায় ধীর ও অকপটভাবে বলিয়া ফেলিলেন—যাইতেছি মদীনায়। জেদের বশবর্তী হইয়া অসত্যের পূজা করিতে করিতে অন্তরাত্মা হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাই মদীনায় চলিয়াছি—প্রকাশ্যভাবে সত্যকে স্বীকার করিতে, পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে। আমর কত দিন? নিশ্চয় জানিও এই ব্যক্তি সত্যবাদী, তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর সত্য নবী। আমি ও আমার সঙ্গী ওছমান এই উদ্দেশ্যেই মদীনা যাত্রা করিয়াছি।

আনন্দে উৎসাহে আমরের বদনমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনিও তখন নিজের মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। তখন এই সর্বস্বত্যাগী যাত্রীত্রয় একসঙ্গে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে সেই প্রাণপ্রতিমের প্রেমামৃত পানে নিজেদের সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইয়া বসিলেন।

## বাহরায়েন প্রদেশ বিজিত হইল

বাহরায়েন প্রদেশ তখন পারস্য সম্রাটের অধীন একটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করদ রাজ্য। মোনজার-এবন-ছাভী নামক জনৈক সহৃদয় ব্যক্তি তখন বাহরায়েন প্রদেশের রাজা। তাঁহার নিকট হযরতের পত্র পৌঁছিলে, তিনি এবং তাঁহার সমস্ত আরবপ্রজা স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহুদী ও অগ্নিপূজকগণের অধিকাংশই তখনও এছলাম গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই। মোনজার ইহাদিগের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলে হযরত তাঁহার পত্রের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমরা অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। দেশের রাজা আজ পদানত দাসানুদাস হইয়া বিধর্মীদিগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন—আর হযরত কেবলই তাঁহাকে ধৈর্যের ও প্রেমের উপদেশ দিতেছেন, তাহাদিগের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে আদেশ করিতেছেন। হযরত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন, ধর্ম-সম্বন্ধে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করা অধর্ম। কারণ যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে, সে ত কেবল নিজেরই কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। এবং যাহারা ইহুদী বা পার্সিক ধর্মে থাকিতে চায়, তাহাদিগকে রাজকর (জিযয়া) দিতে হইবে মাত্র, ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ে তাহাদিগের উপর তোমার আর কোন অধিকার থাকিবে না।* বলা বাহুল্য যে, বাহরায়েনের অধিবাসীবৃন্দ এতদিন পারস্য সম্রাট ও তাঁহার কর্মচারিগণের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল।

---

* যাদুল, হালবী প্রভৃতি।

কোর ও জিযয়া শব্দ দুইটিও মূলতঃ পারস্য-রাজগণেরই আবিষ্কার। যাহা হউক, স্থানীয় ইহুদী ও পার্সিক প্রভৃতি অমুছলমানগণ হযরতের এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। এতদিনের করভার প্রপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জ—মুছলমান-অমুছলমান নির্বিশেষে রহমতুল-লিল-আলামীন মোহাম্মদ মোস্তফার নামে জয়-জয়কার করিতে লাগিল।

## ওম্মান প্রদেশ বিজিত হইল

এই সময় জাফর ও আব্দ নামক ভ্রাতৃযুগল ওম্মান প্রদেশের উপর আধিপত্য করিতেছিলেন। জাফর জ্যেষ্ঠ, সুতরাং সরকারীভাবেই তিনি রাজা নামে ঘোষিত হইলেও, কনিষ্ঠের সহিত পরামর্শ না করিয়া তিনি কোন গুরুতর কার্যের মীমাংসা করিতেন না। আমর-এবন-আছ নামক ছাহাবী হযরতের পত্র লইয়া ওম্মান রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং কনিষ্ঠ আব্দকে অপেক্ষাকৃত ধীরপ্রকৃতি ও নম্রস্বভাব বলিয়া জানিতে পারিয়া তিনি প্রথমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আরবের এই পয়গম্বরের কথা এতদিনে দেশদেশান্তরে সকলের প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরের কথা শুনিয়া আব্দ বিশেষ আগ্রহসহকারে বলিলেন : "দেখুন, আমি কনিষ্ঠ। আমার জ্যেষ্ঠই প্রকৃতপক্ষে রাজা। আমি যথাসময়ে আপনাকে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করিয়া দিব। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আপনাদিগের এই নবী আমাদিগকে কিসের পানে আহ্বান করিতেছেন ?"

"এক অদ্বিতীয় অক্ষয়-অব্যয় আল্লাহর উপাসনা করিতে, তিনি ব্যতীত আর সকলের পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করিতে, মোহাম্মদকে আল্লাহর প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতে ......।"

"আমর ! তুমি আরবের একজন গণ্যমান্য সরদারের পুত্র। তোমার পিতাকে আমরা আদর্শ বলিয়া মনে করিতাম। তিনি কি করিয়াছেন ?"

"দুঃখের বিষয়, তিনি হযরতের প্রতি ঈমান আনিবার পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছেন। আমিও বহুদিন পর্যন্ত পিতার মতেরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলাম।"

"তাহার পর তোমার এ মতি পরিবর্তন হইল কবে ?"

"সম্প্রতি, নাজ্জাশীর দরবারে। তিনিও মুছলমান হইয়াছেন কি-না !"

"বল কি ! আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান রাজা নাজ্জাশী নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন ? আর সেখানকার প্রজাসাধারণ কি করিতেছে ?"

"তাহারা নাজ্জাশীকে নিজেদের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহারাও সকলে মুছলমান হইয়াছে কি-না !"

"কি ! প্রজা-সাধারণ, পাদরী, পুরোহিত সকলেই ?"

"জ্বি-হাঁ, সকলেই।"

"আমর, সাবধান ! মানুষের পক্ষে মিথ্যা কথা বলার ন্যায় ঘৃণিত কাজ আর কিছুই নাই।"

"মিথ্যা নয়। জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। আমাদের ধর্মে মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ।"

"আচ্ছা বেশ ! সম্রাট হিরাকল কি করিতেছেন ? তিনি কি নাজ্জাশীর এছলাম গ্রহণের কথা জানিতে পারেন নাই ?"

"জানিতে-শুনিতে কিছু বাকী নাই। তবে এখন লাচার। আবিসিনিয়া আর তাঁহার অধীনে করদ রাজ্য নহে। রোম-রাজকে এক কপর্দক করও এখন তাহারা দেয় না।"

"আমর ! কি বলিতেছ ? এসব প্রলাপ বলিয়া মনে হইতেছে।"

"না রাজকুমার, ইহা প্রলাপ নহে। এসব একেবারে খাঁটি সত্য। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তদন্ত করিলে নিজেই সমস্ত জানিতে পারিবেন।"

"আচ্ছা আমর ! তোমাদিগের সেই নবী লোকদিগকে কি কি কাজ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, আর কোন কোন কাজে লিপ্ত হইতে লোকদিগকে বারণ করেন—তাহার বিবরণ আমাকে জানাইতে পার কি?"

"কুমার ! যতটুকু জানি, ততটুকু বলিতেছি :

(ক) তিনি লোকদিগকে আল্লাহর আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে আদেশ করেন এবং তাঁহার অবাধ্য হইতে নিষেধ করিয়া থাকেন।

(খ) তিনি মানুষ মাত্রের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে ও স্বজনগণের হিতসাধন করিতে আদেশ প্রদান করেন এবং অত্যাচার-অনাচার করিতে, ব্যভিচার ও মদ্যপান করিতে, পাথর পূজা ও মূর্তিপূজা এবং ক্রুশপূজা হইতে লোকদিগকে নিষেধ করেন।"

"আহা, কত সুন্দর এই শিক্ষাগুলি ! আমার ভ্রাতা সম্মত হইলে, আমরা উভয়ে মোহাম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিতাম এবং তাঁহার সত্যতা ঘোষণা করিতাম। তবে রাজত্বের মায়া, তিনি যে কি করেন, বলিতে পারি না।"

"তিনি এছলাম গ্রহণ করিলেও তাঁহার রাজত্ব তাঁহারই থাকিবে। তিনিই দেশের প্রধান পুরুষরূপে বিরাজমান থাকিবেন। তবে কথা এই যে, এখানকার বড়লোকদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু ছাদকা লইয়া আবার এখানকার দীন-দুঃখীদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে।"

"এ আদেশটা যে খুবই মহৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদের এই ছাদকার স্বরূপটা উত্তমরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

মদীনার দূত স্বনামখ্যাত আমর-এবন-আছ তখন রাজকুমারকে ছাদকা, ফেৎরা ও যাকাতের বিষয় যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। এছলামের শিক্ষা এই যে, প্রত্যেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে স্বর্ণ, রৌপ্য, ফল, শস্য এবং পশু প্রভৃতির একটা নির্দিষ্ট অংশ সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যবর্তিতায় দীন-দুঃখীদিগকে দান করিতে হইবে। এছলামের পরিভাষায় ঐ নির্দিষ্ট অংশে দরিদ্রসমাজের ন্যায়সঙ্গত 'হক' বা অধিকার আছে। আমর-এবন-আছ এইসব কথা বুঝাইতে বুঝাইতে যখন গৃহপালিত পশুপালের যাকাতের কথা পাড়িলেন, তখন আব্দ একটু বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, মাঠের ঘাস আর জঙ্গলের লতাপাতা খাইয়া যে পশুগুলি বাঁচিয়া থাকে, দেশের হতভাগাগুলাকে তাহারও ভাগ দিতে হইবে ! আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমাদের দেশবাসিগণ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কখনই সম্মত হইবে না !

যাহা হউক, কয়েকদিন অপেক্ষার পর আমর রাজদরবারে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইলেন এবং হযরতের মোহরাঙ্কিত পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা জাফর ধীরস্থিরভাবে হযরতের পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিলেন এবং পাঠ শেষ হইলে নীরবে তাহা কনিষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর রাজা মদীনার দূতকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমর তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন।

আরব ও তাহার পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে গত কয়েক বৎসর হইতে নানাকারণে এছলাম ধর্ম ও তাহার প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার অবস্থা-ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের আন্দোলন-আলোচনা চলিয়া আসিতেছিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর এছলাম ও তাহার প্রবর্তক সম্বন্ধে দেশবাসীর কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া যাইতে লাগিল এবং একটু একটু করিয়া তাহারা সত্যের সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করিল। এই সময় ওমান প্রদেশের রাজা-প্রজা সকলেই হযরতের শিক্ষা-দীক্ষাদি সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিয়া আসিতেছিল। আমরের আগমনের পরও দুই সহোদরের মধ্যে যে এই বিষয় লইয়া গভীর আলোচনা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। হযরতের পত্র পাঠ করার পরও কয়েকদিন পর্যন্ত এই বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা, আলোচনা ও অনুধাবনে শেষ হইয়া গেল। তাহার পর উভয় সহোদর একসঙ্গে এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

এই অল্প সময়ের মধ্যে হযরতের দূত ও সহচরগণ দেশদেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদিগের আহ্বান শুনিয়া এবং আদর্শ দেখিয়া দিকে দিকে কলেমায় তাওহীদের মঙ্গল আরাব উত্থিত হইতে লাগিল, দলে দলে লোক এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল। 'দুমাতুলজান্দল' প্রদেশের প্রধান—'আকিদার' এবং তাহার গোষ্ঠীর বহুলোক এইরূপে এছলাম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত হেময়র জাতির প্রধান 'জুলকেলা' এমন ও তায়েফের কতকগুলি জেলার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মোশরেক জাতিসমূহের সাধারণ কুসংস্কার মত পৌত্তলিকগণ তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিয়া আসিতেছিল। হযরতের শিক্ষাগুণে 'জুলকেলা'

নিজেকে ও নিজের প্রভুকে চিনিতে পারিলেন এবং ঈশ্বরের আসন হইতে দাসের আসনে নামিয়া আসিলেন। এছলাম গ্রহণের আনন্দোৎসব দিবসে রাজা তাঁহার ১৮ হাজার দাসদাসীকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। অবশেষে হযরত ওমরের খেলাফৎকালে ذو الكلاع 'জুলকেলা' নিজের রাজ্য-রাজত্ব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া মদীনায় চলিয়া আসেন। এইরূপে অন্যান্য বহু স্থানের নরপতি ও রাজন্যবর্গ হযরতের আহ্বানে জগতের সেই সাধারণ ও সনাতন সত্যকে অবলম্বন করিয়া মুছলমান হইলেন। ফলে দুই বৎসরের মধ্যে মুছলমানের সংখ্যা ও শক্তি দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক বাড়িয়া গেল।*

"মোহাম্মদ এক হাতে কোরআন ও অন্য হাতে তরবারি লইয়া নিজের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন"—এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাঁহারা একটুও লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেন না, তাঁহারা যে কোন শ্রেণীর মানুষ, পাঠকগণ এখানে একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আশা করি।

# অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

## খ্রীষ্টানশক্তির বিরুদ্ধাচরণ

## "মূতা" অভিযান ও তাহার কারণ

পারস্যকে পরাস্ত করার পর রোমসম্রাট কায়সারের এবং তাঁহার কর্মচারী ও স্বজনগণের দম্ভ-দর্প একেবারে চরমে উঠিয়াছিল। পৌত্তলিক আরবদিগের একটা নিরক্ষর লোক তাঁহাদিগকে ধর্মের দিকে আহ্বান করিতেছে—যীশুকে মানব সন্তান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে উপদেশ দিতেছে, এ 'ধৃষ্টতা' তাঁহাদের সহ্য হইয়া উঠিল না। তাই একটা ছুতানাতা বাহির করিয়া মুছলমানদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার এবং তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলার জন্য রোমরাজ্যের প্রধান ও পুরোহিতগণ সমবেতভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্রাটও যে শেষে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তিনি যখন দেখিলেন যে, এছলামের অভিনব শিক্ষার ফলে, আবিসিনিয়ার ন্যায় চিরপদানত করদ রাজ্যগুলি একে একে তাঁহার দাসত্বপাশ মুক্ত হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন এই মোছলেম শক্তিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া ফেলার জন্য তাঁহার আগ্রহের অবধি রহিল না।

### ফারওয়ার পরীক্ষা

ফারওয়া-এবন-আমের নামক জনৈক মহাপ্রাণ ব্যক্তি সে সময় সিরিয়ার 'মাআন' প্রদেশের গভর্নর পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি নিজে হযরতের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যখন দৃঢ়রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, বস্তুতঃ তিনি আল্লাহর সত্য নবী এবং যীশুখ্রীষ্টের প্রতিশ্রুত সেই মহামহিম ভাববাদী, তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এছলাম গ্রহণ করেন এবং পত্র দ্বারা হযরতকে এ সংবাদ জানাইয়া দেন। হযরত তখন মোছলেম জীবনের সাধনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ফারওয়ার পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য, ফারওয়ার এছলাম গ্রহণের কথা অবিলম্বে সর্বত্র প্রচারিত হইল। তখন রোমরাজ তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া লইয়া যান এবং এই নবধর্ম ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু সত্যকে যে সত্যভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করা তাহার সাধ্যাতীত। কাজেই ফারওয়া রাজ-আদেশ অমান্য করিতে বাধ্য হইলেন। তখন পদমর্যাদা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রলোভন দিয়া ফারওয়াকে বশ করার চেষ্টা চলিতে

* দীর্ঘসূত্রতা বর্জনের জন্য সমস্ত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর হইল না। এই ঘটনাগুলি তাবরী, এবন-এছহাক, কামেল ও হলবী প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত

লাগিল। কিন্তু এ চেষ্টাও বিফল হইয়া গেল, প্রবল-প্রতাপান্বিত রোমসম্রাট বজ্রকঠোর কণ্ঠে ফারওয়াকে নৃশংসভাবে হত্যা করার আদেশ প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সে আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিতও হইয়া গেল। কিন্তু নরবাঞ্ছিত ফারওয়া নিজের ধন, মান এমন কি জীবনের কোন পরওয়া না করিয়া ধীরস্থির চিত্তে ও ভক্তি গদ-গদ কণ্ঠে কালেমায় তাওহীদ পাঠ করিতে করিতে ক্রুশে আরোহণ করিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আনন্দসঙ্গীত গাহিয়া, সহস্র সহস্র দর্শকের প্রাণে তাওহীদের ঝঙ্কার জাগাইয়া দিয়া, অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। এই মহামতি শহীদ জীবনের শেষমুহূর্তে রোমকসম্রাটকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, মূর সাহেবের ভাষায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

"I will not quit the faith of Mohammad. Thou knowest well that Jesus prophesied before of Him. But as for thee, the fear of losing thy kingdonm deterreth thee, and so He was crucified."* ফারওয়া উত্তর করিলেন—"আমি মোহাম্মদের ধর্ম কখনই ত্যাগ করিব না। আপনি উত্তমরূপে জানিতেছেন যে, যীশু পূর্বে ইহারই আগমনের সুসংবাদ দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট! রাজ্য-রাজত্বের মায়ায় পড়িয়াই আপনি আজ এ সত্যকে অস্বীকার করিতেছেন।" অতঃপর তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হইল।"

ফারওয়াকে এরূপ অন্যায় ও নির্মমভাবে নিহত করার ব্যাপারে তৎকালীন খ্রীষ্টানদিগের মানসিকতা উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

## মূতা অভিযানের কারণ

হোদায়বিয়া-সন্ধির পর হযরত দেশবিদেশের নরপতি ও সমাজপতিদিগকে এছলাম ধর্মের পানে আহ্বান করিয়া কতকগুলি পত্র প্রেরণ করেন। হযরতের দূতগণ তাঁহার পত্র লইয়া যথাযথস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে থাকেন। পাঠকগণ পূর্বে ইহাদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই সময় হযরত, ওমের-এবন-হারেছ নামক জনৈক প্রিয় ভক্তকে এইরূপ একখানা পত্র দিয়া বোছরা বা হাওরানের রাজার নিকট প্রেরণ করেন। হযরতের এই দূত 'মূতা' নামক স্থানে উপনীত হইলে, 'শোরাহবিল' নামক জনৈক খ্রীষ্টানপ্রধান ওমেরকে ধরিয়া রাখে। অবশেষে হাত-পা বাঁধিয়া অশেষ যন্ত্রণা দিয়া অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। দূত অ-বধ্য—ইহা দুনিয়ায় চিরন্তন ও সর্ববাদীসম্মত বিধান। কিন্তু শোরাহবিল—অবশ্য গুপ্ত পরামর্শ ও উৎসাহের ফলে—এ বিধানকে পদদলিত করিয়া ফেলিল। এই নৃশংস নরহত্যা এবং অন্যায় দূত-হত্যার জন্য তাহারা কোন প্রকার অনুতপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং উল্টা মদীনা আক্রমণ করার জন্য সহস্র সহস্র সৈন্য সমবেত করিতে লাগিল। এই অবস্থায় 'শোরাহবিলের' দুষ্কর্মের দণ্ডপ্রদান করার জন্য ৮ম হিজরীর প্রথম জামাদি মাসে তিন সহস্র মোছলেম সৈন্যের এক বাহিনী সিরিয়ার মূতা প্রদেশ অভিমুখে প্রেরিত হয়।

এই অভিযান প্রেরণের সময় হযরত যে অসাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরবর্তী ঘটনাসমূহের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সাধারণ নিয়ম ছিল যে, হযরত একজন ছাহাবীকে সরদার বা নায়ক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিতেন। কিন্তু মূতা অভিযান প্রেরণের সময় তিনি যথাক্রমে জায়েদ-এবন-হারেছা, জা'ফর-এবন-আবিতালেব এবং আবদুল্লাহ-এবন-রওয়াহা নামক মহাজনত্রয়কে আমীর বা নেতা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। জায়েদ প্রথম আমীর, তিনি নিহত হইলে দ্বিতীয় আমীর জা'ফর তাঁহার স্থল অধিকার করিবেন এবং জা'ফর নিহত হইলে আবদুল্লাহ আমীর পদে বরিত হইবেন। ইহাও বলিয়া দেওয়া হয় যে, যদি আবদুল্লাহ নিহত হন, তাহা হইলে মুছলমানগণ নিজেদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা আমীর নির্বাচিত করিয়া লইবেন।**

---

* ৩৯৬ পৃষ্ঠা। মূল ঘটনার জন্য এছাবা ৩—২২৩, এবন-হেশাম ৩—৭০, তাবরী প্রভৃতি।

** বোখারী, জোরকানী, নাছায়ী।

পাঠকগণ বোধ হয় এই অভিযানের প্রধান নায়ক জায়েদকে বিস্মৃত হন নাই। বিবি খদিজার সহিত বিবাহিত হওয়ার পর এই জায়েদ সর্বপ্রথম ক্রীতদাসরূপে হযরতের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন. এছলামের কল্যাণে সেই "অতি ঘৃণিত ক্রীতদাস" আজ কেবল মুক্তই নহে, বরং বিরাট মোছলেম বাহিনীর প্রধান আমীর ও প্রথম নায়ক। আর শত শত কোরেশ ও আনছার এমন কি হযরত আলীর জ্যেষ্ঠ সহোদর বীরবর জাফর তাইয়ারও আজ তাঁহার অধীনে একজন সামান্য সৈনিক মাত্র। জাফর সবেমাত্র মোস্তফা-চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সুতরাং কুলশীল এবং বংশমর্যাদার অভিমান হইতে তখনও তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। জায়েদকে আমীর পদে বৃত হইতে দেখিয়া জাফর সসম্ভ্রমে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত তাঁহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন—জাফর ! ক্ষান্ত হও, ইহাতে যে কি অনন্ত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, তাহা তুমি অবগত নহ।* কিন্তু হায় ভারতের হতভাগ্য মুছলমান ! আজ এই অনর্থক কুলাভিমানে তাহাদের যে মহাসর্বনাশ হইতে বসিয়াছে, দুঃখের বিষয় তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবারও লোক নাই। বাংলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। এই অনৈছলামিক ঘৃণা ও অহঙ্কারের নিষ্পেষণে পড়িয়া কত "নিম্নশ্রেণীর" মুছলমান যে খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে, কত অজ্ঞ মুছলমান যে নেড়ানেড়ীর দলে মিশিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে, তাহার হিসাব কে রাখে ? "নীচ বংশে" জন্ম বলিয়া দীনদার পরহেজগার ও শিক্ষিত মুছলমানদিগকে মছজিদে প্রবেশ করিয়া নামায পড়িতে দেওয়া হয় না, আমাকে এ নির্মম আর্তনাদ অনেকবার শুনিতে হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত মুছলমানগণ এবং অন্যান্য কতিপয় পার্বত্য জাতির অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইবার সুযোগও আমার ঘটিয়াছে। বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, তাহাদিগের মুছলমান হওয়ার একমাত্র বাধা—মুছলমান। স্থানীয় মুছলমানগণ এই নব দীক্ষিত মুছলমান ভ্রাতাদিগকে 'জাতিভ্রষ্ট, সুতরাং অচ্ছুৎ' বলিয়া মনে করিয়া থাকে। হযরতের শিক্ষা ও এছলামের আদর্শ হইতে আমরা যে কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, এই সকল ব্যাপার হইতে তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

এই সেনাদলের যাত্রার সময় স্বয়ং হযরত এবং মদীনার মুছলমানগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে 'বিদায় উপত্যকা' পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। বিদায়দানের সময় হযরত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ আমি তোমাদিগকে সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয় করিয়া চলিবার উপদেশ দিতেছি। প্রত্যেক সহচর মুছলমানের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দান করিতেছি। আল্লাহ্‌র নামে রণযাত্রা কর এবং সিরিয়ায় তোমাদিগের এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদিগকে যুদ্ধদান কর। তোমরা যে দেশে যাইতেছ, সেখানকার মঠে সাধু-সন্ন্যাসিগণকে নিভৃত সাধনায় মগ্ন থাকিতে দেখিবা। সাবধান, তাহাদিগের কার্যে কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। সাবধান, একটি স্ত্রীলোক, একটি বালক বা বালিকা, একজন বৃদ্ধও যেন কোনক্রমে তোমাদিগের হস্তে নিহত না হয়। সাবধান, শত্রুপক্ষের একটি বৃক্ষও ছেদন করিও না, একটি গৃহও ভূমিসাৎ করিও না।** এই উপদেশের পর মুছলমানগণও আপন আপন রুচি অনুসারে এই সেনাবাহিনীকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন—তোমরা সততাসম্পন্ন অবস্থায় ফিরিয়া আসিও, কেহ বলিলেন—বিজয়ী হইয়া ফিরিও। "গনিমতের মালসহ যেন ফিরিয়া আসিতে পার" কোন লেখক এই সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছেন। শেষোক্ত লেখকগণের বর্ণনা সত্য হইলে, উহা কোন মুছলমানের উক্তি—হযরতের উক্তি নহে।***

---

* আহমদ, নাছাই।

** হালবী ৩—৮৬।

*** কোন কোন অসতর্ক লেখক এই অংশটুকুকে হযরতের উক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেখুন মূর ৩৯৩ পৃষ্ঠা।

শোরাহবিল যে দুষ্কর্ম করিয়াছিল, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল যে কি হইবে, তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। বরং এই প্রকার একটা সংঘর্ষ উপস্থিত করার জন্য, স্থানীয় খ্রীষ্টানগণের যুক্তি অনুসারে, সে ইচ্ছাপূর্বক এই দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কাজেই এই ঘটনার পর হইতেই তাহারা মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। শোরাহবিল 'বলকা' প্রদেশের একটা জেলার প্রধান কর্মচারী মাত্র। কিন্তু ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যাইতেছে যে, তাহার অধীনে একলক্ষ সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া আছে—মুছলমানগণ এই প্রকার সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত স্বয়ং কায়সার দুই লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত করিতেছেন বলিয়া জনরব শোনা গিয়াছিল। অর্থাৎ এক কথায় রোম-সম্রাট কায়সার হইতে সিরিয়ার সামান্য একজন আরব-খ্রীষ্টান পর্যন্ত সকলেই রণসাজে সজ্জিত হইয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মদীনাবাহিনী যাত্রা করিলে শোরাহবিলের গুপ্তচরগণ তাহাকে এই সংবাদ জানাইয়া দিল। তখন সে গ্রীক ও বিভিন্ন আরব গোত্র হইতে লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুছলমানদিগের আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু শোরাহবিল হইতে সম্রাট পর্যন্ত সকলেই কি এই তিন সহস্র অশিক্ষিত সৈন্যের আক্রমণ ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এইরূপে লক্ষাধিক সৈন্য সমবেত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ? এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রকার বিরাট আয়োজন শেষ করিয়া মোকাবেলার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকা কি সম্ভবপর? সকল দিককার সমস্ত অবস্থা সম্যকরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মদীনা আক্রমণ করার জন্য ঐ অঞ্চলের খ্রীষ্টানশক্তি সমবেতভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল এবং সেই জন্যই তাহারা এই বিপুল উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হযরত গুপ্তচরগণের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া যথাসম্ভব ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে এই (প্রথম) বাহিনী পাঠাইয়া দিয়া ভবিষ্যতের জন্য অন্য অন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হন।

## মুছলমানগণের পরামর্শ

মুছলমানগণ সিরিয়া প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের মোকাবেলার জন্য একলক্ষ সৈন্য মাআব অঞ্চলে অপেক্ষা করিতেছে, তখন বর্তমান অবস্থায় কিংকর্তব্য নির্ধারণের জন্য যাত্রা স্থগিত করিয়া সকলে পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। নানাবিধ আলোচনার পর একদল লোক বলিতে লাগিলেন যে, এই নূতন পরিস্থিতি সম্বন্ধে মদীনায় সংবাদ দেওয়া হউক, দেখা যাউক, এ সম্বন্ধে হযরত কি আদেশ প্রদান করেন। তিন হাজার সৈন্য লইয়া একলক্ষ শিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে যাওয়া, কোনমতেই সঙ্গত হইবে না। মহামতি আবদুল্লাহ্-এবন-রওয়াহা এই প্রকার আলোচনা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে এবং তেজদৃপ্ত ভাষায় বলিতে লাগিলেন : "মোছলেম সমাজ ! তোমরা যে সাফল্য অর্জনের জন্য বহির্গত হইয়াছিলে, আল্লাহর দিব্য, এখন তাহাই তোমাদিগের নিকট অনভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তোমরা ত বাহির হইয়াছিলে শাহাদত হাছেল করার—সত্যের নামে আত্মবলি দিবার উদ্দেশ্যে। সংখ্যার গণনা মুছলমান কখনই করে না, পার্থিব শক্তির তুলনায় সে কখনই প্রবৃত্ত হয় না—তাহার একমাত্র শক্তি আল্লাহ্। সেই আল্লাহর প্রেরিত মহাসত্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া, সত্যের তেজে দৃপ্ত হইয়া কর্তব্যের কোরবানগাহে আল্লাহর নামে হৃৎপিণ্ডের তপ্ত শোণিততর্পণ করাই আমাদিগের সাধনা। বিজয়ী হইতে পারি ভাল, আর শাহাদত হয় আরও ভাল। সুতরাং এত আলোচনা আর এই যুক্তি-পরামর্শ কিসের জন্য?" এই আগুন সকলের বুকে লুকাইয়া ছিল, কেবল দুই-চারিজন দূরদর্শিতার হিসাবে ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ্-এবন-রওয়াহার বাক্যগুলি দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে সব যুক্তিতর্ক, সব দূরদর্শিতা এবং সমস্ত 'মছলেহৎ' কোথায় ভাসিয়া গেল। সকলে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'আল্লাহর দিব্য, রওয়াহার পুত্র সত্য কথা কহিয়াছেন।'

তিন সহস্র মুছলমান আল্লাহর নামে জয়জয়কার করিতে করিতে একলাখ খ্রীষ্টানের মোকাবেলায় ধাবিত হইলেন। ইহাকেই বলে এছলাম, ইহাকেই বলে ঈমান ! আর আজকাল দূরদর্শিতা ও 'মছলেহৎ-পরস্তী'র চাপে পড়িয়া মুছলমানের ঈমান যে কিরূপ নির্মমভাবে নিষ্পেষিত ও নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, চিন্তাশীল পাঠকবর্গকে তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তাই উভয় যুগের কর্মের—কর্মফলের মধ্যে এত প্রভেদ।

## ভীষণ সংগ্রাম

মোছলেম-বাহিনী যথাসময় 'মুতা' নামক স্থানে উপস্থিত হইলে বিপুল খ্রীষ্টান-ফৌজের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তখন সেনাপতি জায়েদ বিশেষ কৌশল সহকারে নিজের ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে নানাভাগে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করিয়া অগ্রসর হইলেন,—মুহূর্তেকের মধ্যে দুই দলে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। একদিকে রোমসম্রাটের শত শত বিচিত্র জয়পতাকা, তাহার ছায়াতলে স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত সহস্র সহস্র ক্রুশ, এবং তাহার পশ্চাতে সুসজ্জিত লক্ষ সেনার বিরাট বাহিনী ;—অন্যদিকে একটি শ্বেত পতাকা পতপত করিয়া খ্রীষ্টান জগতকে প্রেমের আহ্বান জানাইতেছে, শান্তির আমন্ত্রণ দিতেছে। তাহার নিম্নে তিন সহস্র মাত্র মুছলমান। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেক বীরই আপন ভাবে বিভোর, শাহাদতের নেশায় মাতোয়ারা ও আল্লাহর নামে আপনহারা হইয়া ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময়—শত্রুপক্ষ আক্রমণ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে—সেনাপতি জায়েদ উচ্চকণ্ঠে আদেশ করিলেন ঃ "আর অপেক্ষা নয়, আক্রমণ কর, অগ্রসর হও, আল্লাহু আকবর।" তিন সহস্র কণ্ঠ সিরিয়ার গগন-পবন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনি করিল "আল্লাহু আকবর।" তাহার পর অস্ত্রের ঝনঝনা আর শস্ত্রের ঝনঝনা, তলওয়ারে তলওয়ারে চপলাচমক, বল্লমে বল্লমে দামিনীদমক। খালেদের হুঙ্কারে কায়সারের সিংহাসন পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল—সত্যের সহিত শয়তানের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

কিছুকাল তুমুল যুদ্ধ চলার পর সেনাপতি জায়েদ শাহাদতপ্রাপ্ত হইলেন। তখন বীরবর জা'ফর ক্ষিপ্রকারিতাসহকারে অগ্রসর হইয়া তাঁহার স্থান পূরণ করিলেন। মুছলমানগণ জাতীয় পতাকাকে আশ্রয় করিয়া যথাপূর্ব ভীমবেগে শত্রুসৈন্য-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিলেন। সেনাপতি জাফর অপূর্ব বলবীর্যত্বের পরিচয় দিয়া, অবশেষে শত্রুর অস্ত্র শস্ত্রের আঘাতে জর্জরিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। পরে দেখা গিয়াছিল—তাঁহার দেহের সম্মুখভাগের সামান্য একটু স্থানও অক্ষত রহিয়া যায় নাই।* দ্বিতীয় আমীর এইরূপে শাহাদতপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহামতি আবদুল্লাহ্-এবন-রওয়াহা আসিয়া পতাকা ধারণ করিলেন। তাঁহার উৎসাহ-বাক্যে মোছলেম বীরবৃন্দ নূতন উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু সময়ক্রমে আবদুল্লাহকেও শহীদ হইতে হইল। পাঠকগণের স্মরণ আছে যে, আবদুল্লাহ্ তৃতীয় বা শেষ সেনাপতি। তাঁহার নিহত হওয়ার পর মুছলমানদিগের জাতীয় পতাকা কিয়ৎকালের জন্য ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া শত্রুপক্ষও তখন প্রচণ্ডতর বেগে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিল। এই সময় নিজেদের কেন্দ্রচ্যুতি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মুছলমানগণ একেবারে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। এ অবস্থায় কি করিতে হইবে, কোন দিকে যাইতে হইবে, তাহা স্থির করাও তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। আবু আমের নামক ছাহাবী তখনকার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, সে সময় আমি দুইজন মুছলমানকেও একত্র দেখিতে পাই নাই।** এমন কি কতিপয় মুছলমান তখন দিশাহারা হইয়া মদীনা অভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় ওকবা-এবন-আমের নামক ছাহাবী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "পলাতক অবস্থায় নিহত হওয়া অপেক্ষা অগ্রবর্তী অবস্থায় নিহত হওয়া মানুষের পক্ষে শ্রেয়কর।" ওকবার চীৎকারে কতিপয় মুছলমানের চেতনা হইল। তখন ছাবেত-এবন-আরকম বিদ্যুদ্বেগে ধাবিত

---

* বোখারি,—মুতা। ফৎহুলবারী ৭—৩৫০ পৃষ্ঠা। ** তবকাত।

হইয়া সেই মরণব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতঃ জাতীয় পতাকাটি তুলিয়া ধরিলেন, এবং তাহা সবেগে আন্দোলন করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিতে-লাগিলেন ঃ 'কে কোথায় আছ মোছলেম বীর, এই দিকে ছুটিয়া আইস, একজন সেনাপতি নির্বাচন করিয়া লও।' ছাবেত এবং অন্যান্য সকলে খালেদের নাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু খালেদ বিনীত স্বরে বলিলেন ঃ ছাবেত! তুমি আমাদিগের সকলের ভক্তি-ভাজন, তুমিই ইহার উপযুক্ত পাত্র, তুমিই আমাদের সেনাপতি। কিন্তু দূরদর্শী ছাবেত বাধা দিয়া বলিলেন ঃ খালেদ, ভদ্রপ্রবণতা ছাড়, কথা কাটাকাটির সময় নাই। আমরা সকলে তোমাকে নিজেদের নায়ক মনোনীত করিয়াছি। তুমি জামাআতের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য। হযরতের পতাকা গ্রহণ কর, বল, আমাদিগকে কি করিতে হইবে।

## খালেদের রণকৌশল

খালেদের শরীরে যেমন অসাধারণ শক্তিসামর্থ্য এবং তাঁহার হৃদয়ে যেমন অনুপম বলবীর্য সেইরূপ তাঁহার মস্তকও অপ্রতিম রণনৈপুণ্যে পরিপূর্ণ। মনে হয় যেন আততায়ী খৃষ্টানশক্তির অভ্যুদয় ও উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা তাহার দমনেরও আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই মক্কায় খালেদের ন্যায় বিশ্ব-বিজয়ী বীরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাই এতদিন বিরুদ্ধাচরণ করিবার পর এই সময় তিনি যথাসর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া মোস্তফা-চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ক্ষেক্ষণ পরে আবার জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইতে দেখিয়া বিক্ষিপ্ত মুছলমানগণ পুনরায় সেইদিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। সকলে সমবেত হইলে খালেদ সেদিনকার মত কোনপতিকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়া চলিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিলে উভয় সেনাদল আপন আপন শিবির অভিমুখে ফিরিয়া গেল।

## ঐতিহাসিক প্রমাদ

হযরত, আবু আমের আশআরী নামক জনৈক বিশ্বস্ত ছাহাবীকে যুদ্ধের সংবাদ আনিবার জন্য 'মূতা' অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পর পর তিনজন সেনাপতি নিহত হওয়ার পর আবু-আমের যথাসম্ভব সত্বর মদীনায় উপস্থিত হইয়া হযরতকে এই বিপদ-বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। তখন শোকাতুর আত্মীয় ও ভক্ত পরিবারবর্গকে যথোচিতভাবে সান্ত্বনা দিয়া হযরত সমবেত মুছলমানদিগকে সেনাপতিত্রয়ের শাহাদত সংবাদ এবং খালেদের সেনাপতি পদে বৃত হওয়ার কথা জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর তিনি ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ 'সকলে যাত্রা কর, আপনাদের ভাইগুলিকে সাহায্য কর। সাবধান, একজন সমর্থ ব্যক্তিও যেন বাদ না পড়ে।' হযরতের আদেশপ্রাপ্তি মাত্র মুছলমানগণ কেহ ছওয়ারীতে, কেহ পদব্রজে মূতা অভিমুখে ধাবিত হইলেন * মোছনাদ, তবরানী, এবন-আছাকের, আবুয়্যালা, বায়হাকী, দারমী প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ কর্তৃক উল্লিখিত আবুয়্যছর ও আবু কাতাদা কর্তৃক বর্ণিত দুইটি হাদীছের সারমর্ম উপরে উদ্ধৃত হইল।

এই হাদীছে জানিতে পারা যাইতেছে যে, হযরতও এই সঙ্গে মূতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। আবু-কাতাদার হাদীছ হইতে ইহাও জানিতে পারা যাইতেছে যে, আবু-বাকর ও ওমর প্রমুখ বহু ছাহাবা হযরতের বা পশ্চাদ্বর্তী অন্য মুছলমানদিগের অপেক্ষা না করিয়া অগ্রেই চলিয়া গিয়াছিলেন। আরোহী মোজাহেদগণ যে পদাতিকগণের বহু অগ্রে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও আর কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না। সুতরাং খালেদ সেনাপতি হওয়ার পর অল্পকালের মধ্যে একদল মুছলমান অর্থাৎ অশ্বসাদী ও উষ্ট্রারোহী মোজাহেদগণ যে মূতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই সকল যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

---

* কান্জুল-উম্মাল ৫—২৬৪, ৩০৮, ৩০৯ এবং ফৎহুলবারী ৭—৩৬১।

বীরবর খালেদ এই আরোহী সৈন্যদিগকে পাইয়া তাহাদিগকে পুরাতন সৈন্যদিগের সহিত এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত করিয়া লইলেন যে, প্রাতঃকালে কায়সার সৈন্য ময়দানে উপস্থিত হইয়া তদর্শনে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল, মুছলমানদিগের সাহায্যের জন্য মদীনা হইতে অসংখ্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। যাহা হউক, মুছলমানগণ সেদিন নূতন উৎসাহের সহিত প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া দিলে রোমসৈন্য ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর 'অত্যন্ত শোচনীয়রূপে পরাস্ত' হইয়া খ্রীষ্টানগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেল। সাধারণ ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলি পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন একদিনে, এমন কি কয়েক ঘন্টার মধ্যে মুতার যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ এক সপ্তাহকাল ধরিয়া এই যুদ্ধ পরিচালিত থাকে।* এই সময় বীরবর খালেদের হস্তে আটখানা তরবারি ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। যুদ্ধের শেষ সময় তিনি নবম তরবারিখানা ব্যবহার করিতেছিলেন—খালেদ স্বয়ং এই রেওয়ায়তটি বর্ণনা করিয়াছেন।** এই হাদীছ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই যুদ্ধে বহু শত্রুসৈন্য মুছলমানদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিল।***

## জয়–পরাজয়

সাধারণ ঐতিহাসিকগণের আলোচনা পাঠে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে মুছলমানদিগেরই পরাজয় ঘটে এবং ছাহাবাগণ কর্তৃক গঠিত এই মোছলেম বাহিনীর মোজাহেদগণ নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় মদীনায় পলায়ন করিয়া আসেন। এমন কি, ইঁহাদিগের নগরে প্রবেশের সময় মদীনার আবালবৃদ্ধ নগর হইতে বাহির হইয়া ইঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে থাকে। অধিকন্তু ছাহাবাগণ এই পলাতক মুছলমানদিগের মুখের উপর ধুলামাটি ছুড়িয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন— "ধিক তোমাদিগকে, পলাতকের দল ! তোমরা জেহাদ হইতে পলাইয়া আসিলে।" দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রদ্ধেয় মাওলানা শিবলী মরহুমের ন্যায় সনামখ্যাত লেখকও এখানে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া এই সকল কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, বস্তুতঃ এই যুদ্ধে মুছলমানদিগের পরাজয় ঘটে নাই এবং তাঁহারা পলায়নও করেন নাই। বোখারীতে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, খালেদ সেনাপতি হওয়ার পর "আল্লাহ মুছলমানদিগকে বিজয়ী করিয়াছেন।" বলা আবশ্যক যে, ইহা স্বয়ং হযরতের উক্তি। অপেক্ষাকৃত সতর্ক ঐতিহাসিকগণও বলিতেছেন যে, فهزمهم الله أسوأ هزيمة "আল্লাহর ইচ্ছায় তখন খ্রীষ্টানগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল।**** পক্ষান্তরে, শেষ সেনানায়ক আবদুল্লাহ নিহত হওয়ার পর গণিত কয়েকজন মাত্র মুছলমান, অবস্থাগতিকে দিশাহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মদীনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। মদীনার কতিপয় লোক ইঁহাদিগের প্রতি বর্ণিতরূপ দুর্ব্যবহার করায় হযরত তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইঁহারা পলাতক নহেন, আবশ্যক হইলে ইঁহারা পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিবেন।" এই যুদ্ধে খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে বহু মাল গনিমৎও যে মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।§

## দ্বিতীয় প্রমাদ

এই প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যা উপস্থিত করিয়া খ্রীষ্টান লেখকগণ হযরতের জীবনী সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণগুলির প্রতি বেশ একটু বিদ্রূপের কটাক্ষ করিয়া লইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের আধুনিক লেখকগণও ইহার যথাযথ উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। কথা এই যে, যুদ্ধ হইতেছিল সিরিয়া প্রদেশের মুতা নামক স্থানে, আর হযরত তখন মদীনায় অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব যুদ্ধক্ষেত্রের বিবরণ

---

* হলবী ৩—৬৬ প্রভৃতি।

** বোখারী, মুতা সমর। *** ফৎহুলবারী ৭—৩৯৩

**** হলবী ৩—৬৭ § ফৎহুলবারী ৭—৩৯২ এবং হলবী ৩—৬৯।

অবস্থা হযরত কি প্রকারে অবগত হইলেন ? বিখ্যাত মাগাজী লেখক মুছা-এবন-ওকবা বলিতেছেন যে, সর্বপ্রথমে য়্যালা-এবন-উমাইয়া নামক জনৈক ব্যক্তি মূতার সংবাদ লইয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হইলে, হযরত তাঁহার মুখে কোন কথা শ্রবণ করার পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। বোখারীর একটি রেওয়ায়তে আনাছ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হযরত জনসাধারণকে, তাহাদিগের নিকট সংবাদ পৌঁছিবার পূর্বে, যুদ্ধের অবস্থা জ্ঞাত করিয়াছিলেন।'* এখন সমস্যা উপস্থিত হইতেছে যে, হযরত এ-সকল সংবাদ অবগত হইলেন কি প্রকারে ? কোন কোন লেখক এক কথায় ইহার উত্তর দিয়াছেন যে, 'আল্লাহ্ হযরতকে সব কথা জানাইয়া দিয়াছিলেন।' কিন্তু আর সকলের ইহাতে তৃপ্তি না হওয়ায় তাঁহারা বলিতেছেন :

رفعت الارض لرسول الله صلعم حتى نظر الى معترك القوم — طبقات

অর্থাৎ, হযরতের জন্য জমিনকে উঁচু করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।**

এ-সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, বোখারীর হাদীছে এইমাত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, মদীনার জনসাধারণ সর্বপ্রথমে হযরতের মুখেই যুদ্ধের অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন। এই হাদীছের قبل ان ياتيهم خبرهم কে قبل ان ياتيهم خبرهم মনে করিয়া অনেক মুছলমান ও অমুছলমান লেখক মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মুছা-এবন-ওকবার বর্ণিত বিবরণ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, উহা বহু হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত রেওয়ায়তের সম্পূর্ণ বিপরীত, সুতরাং একেবারে অগ্রাহ্য। এই হাদীছটি আমরা প্রথমে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। পক্ষান্তরে, চরিত অভিধান বা রেজাল শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা জানা যাইবে যে, আলোচ্য য়্যালা-এবন-উমাইয়া মূতা অভিযানের সময় এছলাম গ্রহণই করেন নাই। তিনি মুছলমান হইয়াছিলেন মক্কা বিজয়ের পর।*** এ সমস্ত যুক্তিতর্ক ছাড়িয়া দিলেও এবং মুছার বর্ণিত রেওয়ায়ৎ ছহী ও বিশ্বস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তাহা দ্বারা এইটুকু প্রমাণিত হইতেছে যে, তদ্বর্ণিত বিবরণের রাবী, আবু-আমেরের আগমন সংবাদ জানিতে পারেন নাই। এখন পৃথিবীর যে সংবাদটি তিনি অবগত নহেন, তাহা যে সংঘটিত হয় নাই, এমন কথা বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

## উনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

### جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

### মক্কা বিজয়

### সেই এক দিন আর এই এক দিন !

### অতীত স্মৃতি

সেই একদিন—ছাফা পর্বত শিখর হইতে সত্যের আকুল আহ্বান যেদিন সর্বপ্রথমে মক্কার গগন-পবনে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই একদিন—যেদিন আবু-জেহেলের প্রস্তরাঘাতে নিরপরাধ মোস্তফার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া দরবিগলিত শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই একদিন—যখন ভণ্ড, যাদুকর, পাগল, গণৎকার প্রভৃতি বলিয়া মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা 'আবু-তালেবের এতিমকে' পথে-ঘাটে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইতেছিল। সেই একদিন—এখন আরবের—কেবল আরবের কেন, বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক ভগবৎভক্ত নরনারীর—সাধারণ

---

* বোখারী, বাংছুলবারী। ** তবকাত—মূতা সমর। *** একমাল

অধিকারস্থল কা'বার পবিত্র প্রাঙ্গণে আল্লাহ্‌র নামে একটি প্রণিপাত বা একটা সেজদা করিবার অধিকারও তাঁহার ছিল না। সেই একদিন—মক্কাবাসীদিগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া যে দিন সত্যের সেবক মুক্ত বাতাসে মুক্তকণ্ঠে আল্লাহ্‌র নাম করিতে পারার আশায় পদব্রজে তায়েফে গমন করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদিগের অত্যাচারে তায়েফের প্রস্তর কঙ্কর-সমাকীর্ণ বন্ধুর মরুপ্রান্তরে অর্ধমৃত অবস্থায় তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছিলেন। সেই একদিন—যখন মক্কাবাসীদিগের অত্যাচারের ফলে, ভক্ত নরনারীদিগকে জননী জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া দূর আবিসিনিয়া দেশে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। সেই একদিন—কোরেশের কল্যাণে মোহাম্মদ মোস্তফাকে যখন স্বজনগণসহ দীর্ঘ তিন বৎসরকাল অন্তরীণের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই একদিন—যেদিন আল্লাহ্‌র আলোককে চিরতরে নির্বাপিত করার জন্য কোরেশের সকল গোত্র ও সকল গোষ্ঠী একত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। যেদিন শত ঘাতক বেষ্টিত মোস্তফা, রজনীর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া মদীনার পথে 'ছওর' গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভীতত্রস্ত ভক্তপ্রবরকে সম্বোধন করিয়া বুঝাইয়াছিলেন—'আমরা দুইজন নহি—তিনজন' আবু-বাকর ! আল্লাহ্ আমাদিগের সঙ্গে আছেন, সুতরাং চিন্তার কোনই কারণ নাই।*

'আমি সত্যের সেবক, সত্যের বাহক এবং সত্যের প্রচারক, অতএব আল্লাহ আমাকে ধ্বংস হইতে দিবেন না। সত্য একদিন নিশ্চয় জয়যুক্ত হইবে'—হযরতের এই সকল মহীয়সী বাণী এতদিনে,- দীর্ঘ ২১ বৎসরের কঠোর, কঠিন ও ভীষণ পরীক্ষার মধ্য দিয়া, সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল ; আজ তাহারই চরম চরিতার্থতার পুণ্যময় শুভমুহূর্ত সমাগত। এ মক্কাবিজয় নহে—মক্কারই অনন্ত বিজয়। কোরেশ এতদিন নরশার্দূল সাজিয়াও সর্বত্রই বিফলতার অভিশাপ ভোগ করিয়া আসিতেছিল—আজ মোস্তফা চলিয়াছেন, তাহাদিগকে মানুষ করিতে, গৌরবময় জীবন দান করিতে, তাহাদিগকে এক চিরবিজয়ী মহাজাতিতে পরিণত করিতে।

কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা, কত বিপদ কত বজ্র, কত আলোড়ন কত বিলোড়ন মুছলমানদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু সত্য একদিনের তরেও ক্ষুন্ন হয় নাই। আলোকে অনভ্যস্ত আরব, আল্লাহ্‌র প্রদীপকে মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করার জন্য এতদিন চরম চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু বালসূর্যকিরণবৎ তাহার প্রখর তেজরশ্মি, পলে পলে প্রখরতর হইয়া, নিবিড়, তিমির সমাকীর্ণ কীটক্রিমি পরিপূর্ণ আরবের প্রত্যেক পূতিগন্ধময় গুহকোণকে স্বর্গের পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত পুলকিত করার জন্য, আজ মধ্যগগনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে—সব জঞ্জাল, সব কুয়াশা-কুহেলিকা, সব ঝড়-ঝঞ্ঝাকে বিদূরিত, অতিবাহিত করিয়া আজ পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আজ পুরস্কার আসিয়াছে পরীক্ষাকে মোবারকবাদ করিতে, সিদ্ধি আসিয়াছে সাধনাকে আলিঙ্গন দিতে। রহমতুল-লিল্-আলামীন মোহাম্মদ মোস্তফার প্রেমে-পুণ্যে ও আলোকে-পুলকে উদ্ভাসিত স্নিগ্ধ-মধুর শান্তশীতল স্বরূপটাকে বিশ্বের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আজ আরশের আশীর্বাদ সহস্রধারে নামিয়া আসিয়াছে—তাই এই শান্তিময় বিজয় অভিযান !

## অভিযানের কারণ—কোরেশের সন্ধিভঙ্গ

হোদায়বিয়া-সন্ধির শর্তগুলি বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। ঐ সন্ধিপত্রে এইরূপ একটি শর্ত লিপিবদ্ধ হয় যে, আরবের অন্যান্য জাতিগণ তাহাদিগের ইচ্ছামত যে-কোন পক্ষের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিবে। পক্ষদ্বয় পরস্পরের প্রতি যে-সকল শর্ত পালনে বাধ্য

---

* হিজরতের পর এই দীর্ঘ ৮ বৎসর পর্যন্ত কোরেশগণ প্রকাশ্য ও গোপনে হযরতকে হত্যা করিবার এবং মদীনা আক্রমণ করতঃ এছলাম ধর্ম ও মোছলেম জাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া ফেলার জন্য যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, পাঠকগণ এখানে তাহাও এক্ষেত্রে স্মরণ করিয়া লইবেন।

হইলেন, পরস্পরের মিত্রগোত্রগুলির প্রতিও তাহাদিগকে সেইরূপ শর্তে বাধ্য থাকিতে হইবে। এই শর্ত অনুসারে মক্কা অঞ্চলের বানি-বেকর গোত্র কোরেশদিগের এবং বানি-খোজাআ গোত্র হযরতের সহিত মিত্রতা বন্ধনে বা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই গোত্রের মধ্যে বহু যুগ হইতে গোত্রগত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়া আসিতেছিল। সুযোগ পাইলেই ইহারা পরস্পরের ধনপ্রাণকে বিপন্ন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিত। হযরতের আবির্ভাব হওয়ার পর তিনি আরবীয় গোত্রসমূহের সাধারণ শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন, এবং সেই কারণে কিছুকালের নিমিত্ত খোজাআ ও বেকর পরস্পরের প্রতি বংশগত হিংসা-বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া সকলে সেই সাধারণ শত্রুর মুণ্ডপাত ও তাহার অভিনব ধর্মের মূলোৎপাটন করার জন্য একসঙ্গে কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর, তাহাদিগের সেই প্রকৃতিগত কলহ-কোন্দলবৃত্তি চরিতার্থ করার এ সুযোগটি নষ্ট হইয়া গেল। তখন তাহারা পরস্পরের কণ্ঠনালী ছেদন করার জন্য দন্ত নিষ্পেষণ করিতে লাগিল।* যাহা হউক, খোজাআ গোত্রের সহিত সন্ধি স্থাপনকালে, মুছলমানদিগের প্রধান ও সেই পক্ষের মুখপাত্ররূপে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকেই সকলের পক্ষ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। এই প্রতিজ্ঞার ফলে খোজাআ গোত্র মুছলমানদিগের রক্ষণাধীনে under protection বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহাদিগের চিরশত্রু বানি-বেকর বংশের লোকেরা কোরেশের সহায়তায় পূর্ববৎ তাহাদিগের উপর কোনও প্রকার অত্যাচার-অনাচার ঘটাইতে না পারে, পৌত্তলিক খোজাআ গোত্র কেবল এই আশায় হযরতের তথা মোছলেম জাতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই গোত্রের প্রধান পক্ষ পূর্ব হইতে হযরতের প্রতি যে প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণের তাহাও অবিদিত নাই। পক্ষান্তরে হোদায়বিয়া সন্ধি-পত্রের অন্যান্য শর্তগুলি মোছলেম জনসাধারণের নিকট কতদূর দুর্বহ এবং কি প্রকার কষ্টদায়ক হইয়াছিল যথাস্থানে তাহাও বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সন্ধির পরবর্তী তীর্থযাত্রার সময় মক্কাবাসীরা এই সন্ধিশর্তগুলির বলে হযরতের ও মুছলমানদিগের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, যেরূপ অন্যায় করিয়া তাহারা হযরতকে কা'বায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, পাঠকগণ তাহাও যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন।

## খোজায়ীদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার

হোদায়বিয়ার সন্ধিকে সকলেই মুছলমানদিগের পক্ষে নিতান্ত হেয়তাজনক বলিয়া মনে করিলেও, আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকেই فتح مبين বা 'স্পষ্ট বিজয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সন্ধি স্থাপনের পর অল্প দিনের মধ্যে এই মহাবিজয়ের মহিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং কোরেশ দেখিতে পাইল যে, মক্কা ও তাহার দক্ষিণ অঞ্চলের আরব গোত্রগুলিও অল্প দিনের মধ্যে এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কায় মক্কার কোরেশ, তায়েফের ছকিফ ও হোনায়েনের হাওয়াজেন জাতি যার-পর-নাই বিচলিত হইয়া পড়িল। এতদিনে তাহাদের কৃতকর্মগুলির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় কোরেশ জাতি এখন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই হাওয়াজেন গোত্রের দলপতিগণ এবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিল, এবং সমস্ত পৌত্তলিক আরব গোত্রকে লইয়া সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করার আয়োজন করিতে লাগিল। হাওয়াজেন দলপতিগণ এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আরবের বিভিন্ন প্রদেশে গমনপূর্বক ষড়যন্ত্র পাকাইতে থাকে অবশেষে পূর্ণ এক বৎসরের চেষ্টা-চরিত্র ও উদ্যোগ-আয়োজনের পর 'সাধারণ আক্রমণ' করার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ হইয়া যায়।** ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার দার্শনিক অনুশীলন করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃই জানিতে পারা যাইবে যে, ঐ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময় হইতে আবার কোরেশের মনোভাবের

---

* ফৎহুলবারী ৭—৩৬৫, মাওয়াহেব ১—১৪৮ প্রভৃতি।

** জরকানী (মওয়াহেব)—৩য় ২—৩৮৮।

পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়, এবং অবশেষে হোদায়বিয়ার সন্ধি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

এই সময় তাহারা দেখিতে পাইল যে, দক্ষিণ আরবের মধ্যে একমাত্র বানি-খোজাআ গোত্র মুছলমানদিগের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে। কাজেই এই খোজায়ীদিগকে অবিলম্বে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা তাহারা সর্বতোভাবে উচিত বলিয়া মনে করিল। 'তাহা হইলে দক্ষিণ প্রদেশটা এছলামের ও মোহাম্মদের প্রভাবমুক্ত হইয়া থাকিতে পারিবে। পক্ষান্তরে মোহাম্মদের মিত্র বানি-খোজাআর উপর আক্রমণ চালাইলে, হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র একখানা বাজে কাগজে পরিণত হইবে এবং আপনা আপনিই একটি সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়া যাইবে।' এই প্রকার যুক্তি-পরামর্শ আঁটিবার পর কোরেশগণ খোজাআদিগের চিরশত্রু এবং তাহাদিগের মিত্র বানি-বেকর গোত্রকে ক্ষেপাইয়া তুলিল, নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র ও রসদসম্ভারাদি দ্বারা তাহাদিগকে সজ্জিত ও সম্পন্ন করিয়া দিল এবং অবশেষে স্বনামখ্যাত কোরেশ নেতা ছফওয়ান, শায়বা, ছাহল,* হোওয়ায়তেব মেকরজ প্রভৃতি** বহু কোরেশ ব্যক্তিগতভাবে তাহাদিগের সহিত যোগদানপূর্বক খোজায়ীদিগকে অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করে। কোন কোন খ্রীষ্টান লেখক এক্ষেত্রে কোরেশদিগের অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত হ্রাস করার জন্য নিজেদের দুষ্ট প্রতিভার যথেষ্ট সদ্ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, গণিত কয়েকজন মাত্র কোরেশ বানি-বেকরের সহিত এই আক্রমণে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু হাদীছ ও ইতিহাসের সমস্ত প্রমাণের সার এই যে, কোরেশগণ বানি-বেকরকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া খোজায়ীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কোরেশগণই যোগাইয়াছিল এবং ইতিহাসে যে পাঁচজনের নাম পাওয়া যায়, তাহারা ব্যতীত আরও বহু কোরেশ এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে যোগদান করিয়াছিল। খোজায়ী কবি, এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া যে করুণ শোকগাথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে ঃ

"....ان قريشا اخلفوك موعدا  ونقضوا ميثاقك المؤكدا...."

"هم بيتـــونا بالوتير هجدا  وقتلونا ركعا وسجـــدا"

"মোহাম্মদ, দোহাই ! আল্লাহর দোহাই দিয়া আর্তনাদ করিতেছি। দেখ, কোরেশ তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহারা তোমার সেই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা পত্রখানা বাতিল করিয়া দিয়াছে। রজনীর অন্ধকারে অতর্কিতভাবে তাহারা আমাদিগের 'অতিরস্থ' আবাসগুলি আক্রমণ করিয়াছে এবং আমাদিগকে শায়িত ও উপবিষ্ট অবস্থায় হত্যা করিয়াছে।"*** পরে আবু-সুফিয়ান যখন মুছলমানদিগকে সন্ধি ও শান্তির নামে পুনরায় প্রবঞ্চিত করার জন্য মদীনায় গমন করে, তখন মহাত্মা আবু-বাকর তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছিলেন ঃ আবু-সুফিয়ান ! আমার দ্বারা কোন সাহায্য পাওয়ার আশা করিও না। তোমরাই ত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র দিয়া তাহাদিগকে এই নৃশংস অত্যাচারে প্রবৃত্ত করিয়াছ।****

## অত্যাচারের স্বরূপ

বানি-খোজাআ গোত্র 'অতির' নামক জলাশয়ের নিকট অবস্থান করিতেছিল। একদা রাত্রে তাহারা স্ত্রী-পুত্র পরিজনবর্গকে লইয়া স্ব স্ব আবাসে নিদ্রিত আছে, এমন সময় কোরেশ ও

---

* ফৎহুলবারী ৭—৩৬৮, জাদুল-মাআদ ১—৪৬০, এবন-হেশাম প্রভৃতি। ** তবকাত।

*** এবন-মান্দা, এবন-অছাকের, বাজ্জার, এবন আবিশায়বা, আবদুর-রাজ্জাক, তবরানী প্রমুখ বহু মোহাদ্দেছ এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এবন-হাজর বাজ্জারের বর্ণিত পরম্পরাকে মাউছুল ও ছহীহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেখুন ফৎহুলবারী ৭—৩৬৫, ৩৬৬।

**** কানজুল-ওম্মাল ৫—৩০০ পৃষ্ঠা।

বানি-বেকর গোত্রের লোকেরা অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া খোজায়ীদিগের সেই পল্লী আক্রমণ করে। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর খোজায়িগণ সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক ও নিরুদ্বেগ হইয়াছিল। সেই অবস্থায় এই অতর্কিত নৈশ আক্রমণ। সুতরাং পলায়ন অথবা প্রাণদান ব্যতীত তাহাদিগের আর উপায়ান্তরও ছিল না। খোজাআর বিখ্যাত কবি আমর-এবন-ছালেমের যে আর্তনাদপূর্ণ করুণ শোকগাথার কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কবি বলিতেছেন ঃ

"কোরেশ আপনার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়াছে—
আপনার সেই সুদৃঢ় সন্ধি শর্তগুলি তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।
তাহারা আমাদিগকে শুষ্ক তৃণের ন্যায় পদদলিত করিয়াছে,
কারণ তাহারা মনে করিতেছে যে, আমাদিগের কেহ নাই;
আর, আমাদিগের লোক সংখ্যা এখন তাহাদিগের নিকট নগণ্য।*
'অতিরে', ঘুমন্ত অবস্থায় তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল—
এবং শায়িত অবস্থায়, ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় ও উপবিষ্ট অবস্থায়
তাহারা আমাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে।......"

যাহা হউক, পাষণ্ডগণের এই নৃশংস অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের জন্য হতাবশিষ্ট নরনারিগণ 'আল্লাহুর দোহাই' দিতে দিতে কা'বার হরমে প্রবেশ করিল। দুর্ধর্ষতম আরবের মনেও এই সংস্কার বদ্ধমূল ছিল যে, হরমের মধ্যে একটি পিপীলিকার প্রাণবধ করাও অমার্জনীয় মহাপাতক। হরমের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে অতি পাষণ্ড নরহন্তাও অ-বধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কোরেশ ও তাহাদিগের বন্ধুগণের প্রত্যেকেই যেন শত শার্দুলের নৃশংসতা এবং সহস্র শয়তানের পিশাচতা লইয়া এই মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা হরমের মর্যাদার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করিল না। জনসাধারণ প্রথমে হরমের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে দ্বিধা করায়, তাহাদিগের অন্যতম নেতা নওফল চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আজ আর ভগবান বলিয়া কেহ নাই। আজ সাধ মিটাইয়া শত্রুবিনাশ কর।"** এইরূপে তাহারা নিরীহ নিরপরাধ এবং নিরস্ত্র ও নিদ্রিত খোজায়ীদিগকে 'মনের সাধ মিটাইয়া' বালক, বৃদ্ধ ও নরনারী-নির্বিশেষে হত্যা করিয়া চলিয়া যায়।

## কোরেশের অপরাধ

পাঠকগণ দেখিতেছেন যে—

(১) কোরেশপক্ষ হাওয়াজেন ও ছকিফ প্রভৃতি গোত্রগুলির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

(২) এই নিমিত্ত সন্ধিভেদ করার উদ্দেশ্যে তাহারা বানি-বেকরকে উপলক্ষ করিয়া খোজায়ীদিগের উপর আক্রমণ করিয়াছিল।

(৩) কোরেশগণের সহিত পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করিয়া এবং তাহাদিগের সাহায্যে ও সাহচর্যে তাহারা এই নির্মম অত্যাচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

(৪) সন্ধির শর্তানুসারে বানি-বেকরকে এই কার্যে কোন প্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দান করা কোরেশের পক্ষে আইন সঙ্গত হয় নাই। বরং বানি-বেকর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া খোজায়ীদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, তাহাদিগকে বারণ করা অথবা তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করতঃ মদীনায় সংবাদ প্রদান করা, কোরেশের পক্ষে একান্ত কর্তব্য ছিল।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কোরেশপক্ষ ইচ্ছাপূর্বক সন্ধিভঙ্গ করিয়াছিল। "বানি-বেকর খোজায়ীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল আর কোরেশ বানি-বেকরকে সাহায্য করিয়াছিল"—

---

* কানা, হাওয়াজেন, ছকিফ প্রভৃতি সমস্ত পৌত্তলিক আরব গোত্র এখন তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে।

** এবন-হেশাম ২—২০৯, জাদ ১—৪১০ তাবরী, তবকাত, কানজুল-ওম্মাল প্রভৃতি।

সাধারণ লেখকগণ ঘটনাটিকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনা পরম্পরার অন্তর্নিহিত সত্যগুলি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে ঃ "কোরেশগণ পূর্বনির্ধারিত পরামর্শ অনুসারে সন্ধিভঙ্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া খোজায়ীদিগের হত্যা সাধনে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহাদিগের মিত্র বানি-বেকর জাতি—অর্থ দ্বারা নিয়োজিত গুণ্ডার ন্যায়—এই কার্যে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল।"

## খোজাআর ডেপুটেশন

খোজায়ী কবির মদীনা আগমনের কয়েকদিন পরে, তাহাদের ৪০ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই অত্যাচারের ফরিয়াদ করার জন্য মোস্তফা দরবারে উপস্থিত হইলেন। কোরেশ ও বানি-বেকরের এই পৈশাচিক অত্যাচারের ও মিত্র খোজাআ বংশের এই মর্মন্তুদ বিপদের কথা শ্রবণে হযরত যার-পর-নাই মর্মাহত হইলেন। একদিকে সন্ধির শর্ত ও নিজ প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রক্ষা করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না, অন্যদিকে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীদিগের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক মমতা। মক্কা আক্রমণ করিলে তাঁহার জননী জন্মভূমি আর মক্কার অধিবাসীবৃন্দ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহারা বিধর্মী পৌত্তলিক ; তাহারা প্রাণের বৈরী—সব ঠিক। কিন্তু তবুও তাহারা যে স্বদেশবাসী, জননী জন্মভূমির সন্তান—আমার সহোদর ভ্রাতা। কাজেই হযরত 'একাএক' রণসজ্জার আদেশ না দিয়া প্রথমে কোরেশের নিকট দূত পাঠাইলেন। হযরতের দূত মক্কায় উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত পেশ করিয়া বলিলেন—আপনারা এই তিনটির মধ্যে কোনটি অবলম্বন করিবেন—জানিতে চাই। শর্ত তিনটি, যথা—

(১) অর্থ দ্বারা এই অন্যায় হত্যার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া হউক। অথবা—

(২) কোরেশ, বানি-বেকর জাতির মিত্রতা পরিত্যাগ করুক ; অথবা—

(৩) ঘোষণা করা হউক যে, হোদায়বিয়ার সন্ধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

তখন কোরেশপক্ষ হইতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হইল যে, আমরা তৃতীয় শর্ত মঞ্জুর করিতেছি।* কোরেশ যে কোন্ কারণে এমন অসমসাহসিকতার সহিত হোদায়বিয়ার সন্ধি ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। যাহা হউক, এই দূত মদীনায় ফিরিয়া আসার পর হযরত যখন দেখিলেন যে, মক্কা অভিযানে বহির্গত হওয়া ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই, তখন তিনি অতি সন্তর্পণে যাত্রার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

## এ যাত্রার বিশেষত্ব

দূতমুখে মক্কাবাসীদিগের সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়া হযরত যে কি প্রকার দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। হতভাগ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য তিনি নিজে দূত পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশ ও অনুরোধের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন করিতে একবিন্দুও দ্বিধাবোধ করিল না। তখন খোজাআ গোত্রের প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচারগুলির প্রতিবিধান করিবার জন্য তিনি মক্কাযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু স্বদেশ ও হতভাগ্য দেশবাসীর মমতা তখনও তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই। কাজেই তিনি এই যাত্রা সম্বন্ধে এরূপভাবে ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে কোরেশপক্ষ ঘুণাক্ষরেও তাহার কোন প্রকার সংবাদ জানিতে না পারে। পূর্ব হইতে সংবাদ জানিতে পারিলে কোরেশপক্ষ মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত হইবে, ইহা নিশ্চিত ; এবং বিরাট মোছলেম-বাহিনীর সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কোরেশকে একেবারে ধনেপ্রাণে মারা পড়িতে হইবে, ইহাও নিশ্চিত। সেইজন্য হযরত নিজের সঙ্কল্প গোপন করিয়া রাখিলেন, এমন কি প্রথম হযরত আবু-বাকরও কিছুই জানিতে পারেন নাই। এই অভিযানের সংবাদ যাহাতে বাহিরে পৌঁছিতে না পারে, সেজন্য মদীনার চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়া দেওয়া হইল, কয়েক দিনের জন্য বিদেশী লোকদিগের বহির্গমন নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল।

---

* কংজুলওমাল ও ফুরকানি দেখুন।

## হাতেবের অপরাধ

হাতেব-এবন-আবি বলতাআ নামক জনৈক ছাহাবী নিজের পরিজনবর্গকে ত্যাগ করিয়া মদীনায় আগমন করেন। এছলাম গ্রহণের পর একাদিক্রমে তিনি স্বধর্ম ও স্বজাতির যথেষ্ট সেবা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গ অদ্যাবধি মক্কায় অবস্থান করিতেছিল। অধিকন্তু, মক্কায় অবস্থান করিলেও তিনি কোরেশ নহেন। এই সকল কারণে তাঁহার মনে নানা আশঙ্কার সৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় কোরেশের সহানুভূতি গ্রহণ করিতে না পারিলে, মুছলমানদিগের মক্কা আক্রমণের সময় তাঁহার পরিজনবর্গের দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। এই সকল কথা ভাবিয়া তিনি কোরেশদিগকে হযরতের অভিযান-সংবাদ জ্ঞাত করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময় ওম্মে-ছারা নাম্নী কোরেশদিগের জনৈকা মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী মদীনায় আসিয়া হযরতের নিকট নিজের আর্থিক অভাবের কথা জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করে। হযরত তাহার অভাব পূরণ করিয়া দিলে সে যথাসময়ে মক্কায় চলিয়া যাইতে থাকে। হাতেব এই ওম্মে-ছারার নিকট একখানা গুপ্ত পত্র পাঠাইয়া দেন। কিন্তু হযরত হাতেবের এই অন্যায় আচরণের কথা জানিতে পারিয়া জোবের, মেকদাদ ও আলীকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ "রওজা-খাখ্ নামক স্থানে না পৌঁছিয়া দম লইবে না। সেখানে একটি বিদেশী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইবে, তাহার নিকট একখানা পত্র আছে, সেখানা লইয়া আসিতে হইবে।" হযরতের আদেশ শ্রবণমাত্র ইঁহারা অশ্বারোহণপূর্বক লক্ষ্যস্থানের দিকে ধাবিত হইলেন এবং যথাসময় ওম্মে-ছারার নিকট হইতে গুপ্ত পত্রখানা উদ্ধার করিয়া আনিলেন। হযরতের দরবারে ছাহাবাগণের সম্মুখে হাতেবের মোকদ্দমা পেশ হইলে তিনি নিজের দুশ্চিন্তা ও সঙ্কল্পের সমস্ত কথা অকপটে ব্যক্ত করিলেন। হাতেবের এই অকপট স্বীকারোক্তি শ্রবণ করিয়া হযরত বলিয়া উঠিলেনঃ "হাতেব সত্য কথা বলিয়াছে।" হযরত ওমর তখন হাতেবের 'গর্দান' মারার প্রস্তাব করিলে, হযরত তাঁহার অতীত খেদমতগুলি স্মরণপূর্বক তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলেন।*

## আবু-সুফিয়ানের নূতন ফন্দী

পাঠকগণ, আবু-সুফিয়ান ও কোরেশ জাতির চরিত্র-বৈচিত্রটি বোধ হয় বহু পরিমাণে অবগত হইতে পারিয়াছেন। হিজরতের পর আবু-সুফিয়ান যে আরও একবার মদীনায় আসিয়াছিল এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, তাহাও পাঠকগণের স্মরণ আছে। গত বারের ন্যায় সে এবারও একটা গূঢ় ও গুপ্ত রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি লইয়াই মদীনায় আসিয়াছিল এবং নিজেকে দূতরূপে পরিচিত করিয়া নিরাপদে সেই অভিসন্ধি সফল করার চেষ্টা করিয়াছিল। ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ না থাকিলেও, হাদীছ ও ইতিহাসের রেওয়ায়তগুলির দ্বারা এই প্রকার অনুমান করিয়া লওয়া খুবই সঙ্গত হইবে। যাহা হউক, আবু-সুফিয়ান, আবু-বাকর, ওমর, আলী প্রভৃতি ছাহাবাগণের সঙ্গে দুই-একবার সাক্ষাৎ করিয়া দুই-একটা বাজে কথা বলিয়া এমন ভাব দেখায় যে, সে যেন হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র দৃঢ়ীকরণের জন্যই আগমন করিয়াছে। দুই-একদিন পরে একদা মছজিদে হযরতের মজলিসে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ ঘোষণা করিল ঃ "আমি হোদায়বিয়ার সন্ধিকে 'রিনিউ' করিয়া চলিলাম"—এই বলিয়াই সে মদীনাত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যাহা হউক, আবু-সুফিয়ানের কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, হাওয়াজেন ও ছকিফ জাতির উত্থানের কথা শ্রবণ করিয়া হযরত হোনেন অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করার কল্পনা-জল্পনা করিতেছিলেন এবং

---

* হাতেবের ঘটনাটি বোখারী, আবু-দাউদ, তিরমিজী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে স্বয়ং হযরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বহু সন্ধানের পর আমরা কানজুল-ওম্মাল হইতে স্ত্রীলোকটির নাম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। (৫—২৯১) এই ওম্মে-ছারা যে কি উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করিয়াছিল, বোধ হয় পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

ছাহাবাগণও তাহা জ্ঞাত ছিলেন। এই সময়েই খোজাআদিগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহার অল্প কয়েকদিন পরেই হযরত মক্কায় অভিযান করেন। পূর্ব সন্ধানের কথা শত্রুপক্ষের বিদিত থাকায় এই অভিযানের সংবাদ পাইয়া প্রবল পরাক্রান্ত হাওয়াজেন জাতি নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া স্বদেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল। কোরেশ তখন অন্তঃশূন্য অবস্থায় উপনীত, মুখে দম্ভ-দর্প এবং অভিমান ও আড়ম্বরিতার প্রলাপ যথেষ্ট থাকিলেও নিজেদের বলে কিছু করিবার মত শক্তি তখন আর তাহাদের ছিল না। সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, মক্কার অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকে কোরেশের এমন কি নিজেদের অগোচরেই মোস্তফা-চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। শহরতলীর দুর্ধর্ষ আরবগণ হোদায়বিয়ার সন্ধি ও তাহার পরের বৎসরের 'ওমরা' উপলক্ষে হযরতের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহারা কোরেশের প্রবঞ্চনা ও স্বার্থপরতার বিষয় কতক পরিমাণে অবগত হইতে পারে। কাজেই কোরেশের অঙ্গুলি-সঙ্কেতমাত্র হাজার হাজার বদ্দু আরবের ফৌজ প্রস্তুত হইয়া যাওয়া এখন আর সম্ভবপর ছিল না। হাওয়াজেন ও ছকিফের লোকেরা নিজেদের দেশ ছাড়িয়া মক্কাবাসীদিগের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে পারিবে না, এই সংবাদ জানিবার পর আবু-সুফিয়ান মদীনায় আগমন করিয়াছিল এবং কোন প্রকার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে না গিয়া, সন্ধি ও শান্তির নামে পূর্বের ন্যায় মুছলমানদিগকে প্রবঞ্চিত করার প্রয়াস পাইয়াছিল।

## হযরতের মক্কাযাত্রা

৮ম হিজরীর ১৮ই রমজান* তারিখে, দশ সহস্র** অনুরক্ত ভক্তকে সঙ্গে লইয়া হযরত মক্কাযাত্রা করিলেন। দশ সহস্র মোছলেম বীরের এই বিরাট বাহিনী আজ ঠিক সেই পথ ধরিয়া মক্কাযাত্রা করিয়াছিল—আট বৎসর পূর্বে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে যে পথ দিয়া মদীনা প্রয়াণ করিতে হইয়াছিল। অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে, শ্বেত পতাকার ছায়াতলে শ্বেত অশ্বতর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া, হযরত সাফল্যের এই মহিমারঞ্জিত দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উপত্যকা অধিত্যকার প্রত্যেক আরোহণ-অবরোহণে এই বিশাল নরমুণ্ড-সাগরে যখন তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছিল, এবং অযুত কণ্ঠের তক্‌বির ঘোষণায় যখন হেজাজের পল্লী-প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল ; হযরতের মস্তক তখন বিনয় ও কৃতজ্ঞতার ভারে নত হইয়া আসিতেছিল। তিনি এ সাফল্যের মধ্যে নিজের সত্তা আদৌ অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি সব কাজে এবং সব স্থানে একমাত্র সেই সর্বশক্তিমান করুণানিধানের মঙ্গল হস্তের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন।

এইরূপে মদীনা-বাহিনী যথাসময়ে মক্কার নিকটবর্তী 'মররজ-জহরান' উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া পড়াও করিয়া বসিল। সন্ধ্যার পর সৈনিকগণ নিজ নিজ খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে পর্বতটি অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করিল। প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী ওরওয়া বলিতেছেন—সে দৃশ্য দর্শন করিয়া আরফার ময়দানের কথা মনে হইতেছিল। কোরেশগণ পূর্বাহ্নেই এই অভিযানের কথা জানিতে পারে, সেইজন্য তাহার খবর লইবার নিমিত্ত কোরেশ পক্ষের লোকেরা সর্বদাই মক্কার বাহিরে চৌকিপাহারা দিত। আবু-সুফিয়ান, হাকিম-এবনে-হেজাম ও বোদাএল-এবনে-অরকা নামক কোরেশ প্রধানগণ এক রাত্রিতে ঐরূপ চৌকি দিতে বাহির হইয়া, মরর-

---

* সাধারণতঃ ১০ই রমজান বলা হইয়া থাকে, কিন্তু ইমাম আহমদ তাঁহার মোছনাদে ছহী ছনদ সহকারে যে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ১৮ই তারিখের উল্লেখ আছে। হাফেজ এবনে-কাইয়েমও এই রেওয়ায়তের সমর্থন করিয়াছেন। দেখুন জাদনী ৩—৭৬, ফাৎহ প্রভৃতি।

** কোন কোন বর্ণনায় ৮ সহস্র বলা হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন—মদীনা হইতে ৮ হাজার একসঙ্গে যাত্রা করে, নগরের বাহিরে আর দুই হাজার তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। যাহা হউক, সংখ্যা যে দশ হাজারই ছিল, তাহা বোখারীর হাদীছ দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

উপত্যকায় ঐ দৃশ্য দর্শন করে এবং এ-সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। এইভাবে তাহারা নানাপ্রকার আলোচনা ও নানাবিধ দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়া উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, কারণ ইহা ব্যতীত প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের উপায়ান্তর ছিল না। যাহা হউক, আবু-সুফিয়ান ও তাহার বন্ধুদ্বয় অথৈর ভাবনা ভাবিতেছে, এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের কতকগুলি ছায়া তাহাদিগের দিকে ছুটিয়া আসিয়া বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিল—'তোমরা বন্দী'। বলা আবশ্যক যে, এই সময় মহামতি ওমর ফারুক একদল রক্ষী সৈন্য Patrol সহ উপত্যকার চারিদিকে 'রোন্দ' দিয়া বেড়াইতেছিলেন, আবু-সুফিয়ান প্রভৃতি তাঁহাদিগেরই হস্তে বন্দী হইয়াছিল।*

ওমর-ফারুক আবু-সুফিয়ানকে লইয়া হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ সত্যের শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটিত করার শুভমুহূর্ত সমাগত। আবু-সুফিয়ান আজ বন্দী। বস্তুতঃ প্রতিশোধ গ্রহণ ও প্রতিফল দানের সময় উপস্থিত। কিন্তু মহামহিম মোস্তফা যে সে-সব কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ ২১ বৎসর কালের অবিশ্রান্ত ও অমানুষিক অত্যাচারের একটা সামান্য স্মৃতিও তাঁহার হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। বরং আবু-সুফিয়ানকে দেখিয়াই তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ ও করুণা দ্বিগুণিত হইয়া গেল। হায়, কত অবোধ ইহারা, এখনও সত্যের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিতেছে ! ইহাতে যে হতভাগ্যগুলির ইহ-পরকালের সকল সুখ এবং সকল শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। হায়, এই হতভাগ্যদিগকে কবে আমি অনন্ত সুখ-সরোবরের তীরে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিব ! ফলতঃ তখন হযরতের দুঃখ হইতেছে যে, এই অবোধ হতভাগাগুলিকে তখনও তিনি সুখী করিতে পারেন নাই। এই সময় আবু-সুফিয়ানকে বন্দী অবস্থায় উপস্থিত করা হইলে, হযরত তাহার প্রতি কোন প্রকার রূঢ় বা কর্কশ ব্যবহার করিলেন না। বরং করুণ স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আবু-সুফিয়ান, এখনও তুমি সেই করুণানিধান 'অহদহু, লা-শরিকা লাহু' (একমেবাদ্বিতীয়ম)-কে চিনিতে পার নাই ?' আবু-সুফিয়ান বিমর্ষভাবে একটু আমতা আমতা করিয়া উত্তর করিল—তা, এখন পারিতেছি বই কি ! আমাদের ঠাকুর-দেবতা কেউ থাকিলে এখন আমাদের পানে তাকাইত। পাথরের ন্যায় জমাটবাঁধা মস্তিষ্কের উপর আজ এতটুকুও জ্ঞানের প্রভাব হইতে পারিয়াছে, আবু-সুফিয়ানের মনে যুক্তি ও জিজ্ঞাসার আভাস জাগিয়াছে দেখিয়া হযরত মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং উৎসাহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আচ্ছা, আবু-সুফিয়ান, আমি যে আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবী, এ সম্বন্ধে কি এখনও তোমার সন্দেহ আছে ? মোস্তফার প্রশস্ত ও প্রশান্ত ললাটদেশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আবু-সুফিয়ান নির্ভীক চিত্তে উত্তর করিল ঃ "এখনও কিছু কিছু সন্দেহ আছে।"** ইহার কিছু সময় পরে*** আবু-সুফিয়ান প্রকাশ্যভাবে এছলাম গ্রহণ করে।

যাহা হউক, আবু-সুফিয়ান এই অবস্থায় চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে হযরত তাহাকে সকাল পর্যন্ত থাকিয়া যাইতে আদেশ করেন।

ছোব্‌হে-ছাদেকের শুভপ্রভা পূর্ব গগনে প্রতিভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মরর-উপত্যকার শিখরদেশ হইতে আজানধ্বনি উত্থিত হইল। বেলালের সমুচ্চ ও সুগম্ভীর স্বরতরঙ্গে পর্বত-প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল। ভক্তগণও 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং সকলে জামাআতে সমবেত হইয়া ফজরের নামায সমাপন করিলেন। নামায অন্তেই যাত্রার আয়োজন হইল এবং মোছলেম সেনানিবেশের দিকে দিকে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। আবু-সুফিয়ান, পিতৃব্য আব্বাছের সহিত উপত্যকার একটা উচ্চ চূড়ায় বসিয়া এই তামাশা দেখিতে লাগিল। তখন বিভিন্ন

* বোখারী ৮—৫। ** ফৎহুলবারি, তবরী, হালবি প্রভৃতি।

*** কত পরে এবং ঠিক কোন সময়ে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

গোত্রের বীরগণ স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হইয়া মক্কার দিকে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে পতাকার পর পতাকা ও ফওজের পর ফওজ আবু-সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং সে চকিত ও স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে আনছার রেজিমেন্ট অভূতপূর্ব শান-শওকতের সহিত তাহার দৃষ্টিপথে সমাগত হইল। আবু-সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিল—'এ কাহারা ?' আব্বাছ উত্তর করিলেন—এটা আনছারীদিগের রেজিমেন্ট, ছাআদ-এবন-ওবাদা ইঁহার নায়ক। এই সময় ছাআদ আবু-সুফিয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ 'আজ ভীষণ সংঘর্ষের দিন, আজ কা'বার সম্ভ্রম নষ্ট হইবে।' আবু-সুফিয়ান ইহা শুনিয়া বিলাপবাক্যের ভাষায় আব্বাছের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে মোহাজেরগণ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, হযরত এই দলে অবস্থান করিতেছিলেন। হযরতকে দেখিয়াই আবু-সুফিয়ান আর্তনাদ করিয়া উঠিল ঃ মোহাম্মদ, তুমি কি তোমার স্বজনগণকে হত্যা করার আদেশ দিয়াছ ?

হযরত উত্তর করিলেন—না, কখনই নহে। তখন আবু-সুফিয়ান ছাআদের দর্পোক্তির কথা নিবেদন করিয়া ফ্যালফ্যাল নেত্রে হযরতের মুখপানে তাকাইয়া রহিল। হযরত বজ্রগম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—'ছাআদের কথা সত্য নহে, আজ প্রেম ও করুণার দিন, আজ কা'বার সম্ভ্রম চির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন।' সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসাদী হরকরা ছুটিয়া গিয়া সেনাপতি ছাআদকে হুকুম শুনাইল যে, এই প্রকার উক্তি করার জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।* ছাআদ নীরবে নবনিয়োজিত সেনাপতির হস্তে পতাকা দিয়া নিজে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন। তাহার পর হযরত, আবু-সুফিয়ানকে বলিতে লাগিলেন ঃ আবু-সুফিয়ান ! তুমি গিয়া মক্কাবাসীদিগকে অভয় দাও, আজ তাহাদিগের প্রতি কোনই কঠোরতা হইবে না। তুমি আমার পক্ষ হইতে নগরময় ঘোষণা করিয়া দাও ঃ

(১) যে ব্যক্তি অস্ত্রত্যাগ করিবে—তাহাকে অভয় দেওয়া হইল।

(২) যে ব্যক্তি কা'বায় প্রবেশ করিবে—সে অভয়প্রাপ্ত।

(৩) যাহারা নিজেদের গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিবে, তাহাদিগের কোনই ভয় নাই।

(৪) যাহারা আবু-সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করিবে, তাহারা অভয়প্রাপ্ত।** হযরত যে মক্কাবাসীদিগকে অভয়বাণী প্রেরণ করিলেন, সে সংবাদ মোছলেম বাহিনীর সমস্ত সৈন্যকেও জানাইয়া দেওয়া হইল। এই ঘোষণা ব্যতীত হযরত মুছলমানদিগকে কঠোরভাবে আদেশ দিলেন—নগর প্রবেশের সময় বা তাহার পরে কেহই অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। যাহাতে নগর প্রবেশের সময় কাহারও প্রতি কোন প্রকার অসংযত ব্যবহার করা না হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ তাকিদ করার পর হযরত একটা উচ্চস্থানে আরোহণ করতঃ স্বয়ং এ বিষয়ের পরিদর্শন করিতেছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, মুছলমানদিগকে বিভিন্ন দলে ও বিভিন্ন পথ দিয়া নগরে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সেনাপতি খালেদ-এবন-অলিদ যে পথ দিয়া নগর প্রবেশ করিতেছিলেন, সেদিকে সূর্যকিরণে অস্ত্রের চমক দর্শন করিয়া হযরত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং সেই মুহূর্তে কৈফিয়ত দিবার জন্য খালেদকে হাজির করা হইল। খালেদ উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—মহাত্মন ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহারা কোনমতেই নিরস্ত হইল না। তাহারা প্রথমে আমাদিগকে আক্রমণ করে এবং দুইজন মুছলমানকে নিহত করিয়া ফেলে। তখন অগত্যা আমাকেও অস্ত্র বাহির করিতে হইয়াছিল। কিন্তু, হে রহমতুল-লিল-আলামীন ! আপনি তদন্ত করিয়া দেখুন, যাহাতে এই সংঘর্ষে অধিক প্রাণহানি না হয়, সেজন্য আমি সর্বদাই যৎপরোনাস্তি সংযত ও সঙ্কুচিত হইয়াই সৈন্য চালনা করিয়াছি।*** হযরতের এই সকল সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও কোরেশ

---

* কানজ ৫—২৯৭ প্রভৃতি।

** বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ।  *** যৎহুলবারী, এবন-হেশাম প্রভৃতি।

পক্ষের নীচ ষড়যন্ত্রের ইয়ত্তা ছিল না। আবু-সুফিয়ানের মুখে হযরতের দয়া ও অভয়ের কথা জ্ঞাত হওয়ার পরও তাহারা নিজ ও অন্যান্য অনুগত গোত্রের দুর্দান্ত ও গুণ্ডাশ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক সংগ্রহ করিয়া মুছলমানদিগকে আক্রমণ করার জন্য সমবেত করিয়া ফেলিল। তাহাদিগের মধ্যে পরামর্শ স্থির হইল যে, আমাদিগের এই লোকগুলিকে যদি কৃতকার্য হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে আমরাও তখন তাহাদিগের সহিত যোগদান করিব। অন্যথায় মোহাম্মদ আমাদিগকে যে অভয়দান করিয়াছেন, তখন আমরা তাহা দ্বারা আত্মরক্ষা করিব। কোরেশের এই অকারণ সৈন্য সমাগম দেখিয়া, হযরত আনছারদিগকে ডাকিয়া প্রস্তুত থাকিতে এবং আগামীকল্য প্রাতঃকালে ছাফা পর্বতের পাদমূলে সমবেত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। আনছারগণের বিরাট সৈন্যসঙ্ঘ যথাসময় সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, "মুছলমানগণ তাহাদিগের যাহাকে ইচ্ছা নিহত করিতে পারিতেন, অথচ তাহারা একজন মুছলমানের কেশ স্পর্শও করিতে পারিত না।" কোরেশপক্ষ যখন বুঝিতে পারিল যে, মুছলমানগণ তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, তখন তাহারা নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যার-পর-নাই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এই সময় আবু-সুফিয়ান আর্তনাদ করিতে করিতে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল ঃ 'মোহাম্মদ ! কোরেশের এই দলটিকে যদি তুমি ধ্বংস করিয়া ফেল, তাহা হইলে আজ হইতে কোরেশের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।' তখন হযরত, আবু-সুফিয়ানকে পুনরায় নিজের অভয়বাণীর কথা স্মরণ করাইয়া বলিয়া দিলেন*— যাও, সেই অনুসারে কাজ কর, তোমাদিগকে পুনরায় ক্ষমা করিলাম, পুনরায় অভয় দিলাম।

# সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

## হযরতের নগর প্রবেশ

মোছলেম সেনাসঙ্ঘগুলি পূর্বকথিত মতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া এবং বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার পর, মোহাজেরগণকে সঙ্গে লইয়া হযরতও মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় কোরেশগণের প্রতি হযরতের অনুপম করুণা প্রকাশ সত্ত্বেও, তাহারা পুনঃ পুনঃ যে সকল নীচ অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল এবং প্রত্যেকবারই হযরত তাহাদিগের ঐ শ্রেণীর গুরুতর অপরাধগুলিকে যেরূপ প্রশান্ত বদনে ক্ষমা করিয়াছিলেন, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। যাহা হউক, এইরূপ পূর্ণ শান্তির সহিত হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ও তাঁহার সহচরগণ নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

### যাত্রার বিশেষত্ব

সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে বিজেতা নরপতিগণ নিজের প্রধান প্রধান অমাত্য ও সেনাপতিদিগকে সঙ্গে লইয়া নগর প্রবেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু মক্কাবাসিগণ বিস্মিত নেত্রে দেখিল, হযরতের ছওয়ারীর উপর স্থান পাইয়াছেন, একমাত্র ওছামা—ক্রীতদাস জায়েদের পুত্র ওছামা।** লক্ষ লক্ষ মানবের পরম ভক্তিভাজন ধর্মগুরু, আরবের মহাপ্রতাপশালী মহারাজাধিরাজ, অপরাজেয়-কোরেশবিজেতা, দশ সহস্র আত্মোৎসর্গকারী বীরসেনার অধিনায়ক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা—আর 'ঘৃণিত ও পশাধমরূপে ব্যবহৃত দাসপুত্র' একই উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আছেন। বস্তুতঃ আজ মক্কা বিজয় নহে, কোরেশ বিজয়ও নহে। বরং আজ

---

* মোছলেম ২—১০২, মোছনাদ ও আহাতি আবু-হোরায়রা হইতে।

** বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ ও সমস্ত ইতিহাস পুস্তক।

প্রেমের হস্তে পশুত্বের পরাজয় এবং সত্যের দ্বারা শয়তান-বিজয়ের স্বর্গীয় অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। মোস্তফা 'বিশ্বপ্রেম বিশ্বপ্রেম' করিয়া কেবল কতকগুলি অনর্থক সমাস সমষ্টি রচনা করিয়া যান নাই, তিনি শত্রুকে ক্ষমা করার জন্য কেবল কতকটা বাচনিক ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। বরং হাতে-কলমে তিনি ঐগুলিকে বাস্তবে পরিণত করিয়া দিয়াছেন, বাস্তব জগতে বাস্তব স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মক্কাবিজয়ের ব্যাপারগুলি তাহার আংশিক নমুনা মাত্র।

হযরতের প্রধানতম শিক্ষা ইহাই। মানুষ মানুষের প্রভু হইতে পারে না, মানুষ মানুষের দাস হইতে পারে না। তাহাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহ্ এবং তাহারা সকলে একমাত্র তাঁহারই দাস এবং তাঁহারই সন্তান—সুতরাং তাহারা সকলেই সমান। এই সত্য প্রচারের জন্য—না, তাহাকে পূর্ণ পরিণতরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য—হযরত আজ দাস পুত্রকে 'সহসাদী'রূপে গ্রহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন। আরব দেখিল এবং বুঝিল—পাশবিক অধিকারের বলে আল্লাহর আইনকে নির্মমভাবে পদদলিত করিয়া এতদিন তাহারা যে সহস্র সহস্র নরনারীকে ঘৃণিত পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর স্থান দিয়াছে, বিজয়ী এছলাম আজ তাহাকে তুলিয়া মোহাম্মদ মোস্তফার সহিত এক আসনে বসাইয়া দিতেছে।

## অপরূপ দৃশ্য

বিজয়ী রাজা ২১ বৎসরের পর আজ বৈরীবিজয়ে সমর্থ হইয়াছেন। এমন সময় কত দর্প, কত দম্ভ মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে অধিকার করিয়া থাকে ; শ্লাঘায় গৌরবে আনন্দে মানুষ একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে। কিন্তু ইতিহাস ও হাদীছ গ্রন্থসমূহে বিশ্বস্ত ছনদ পরম্পরা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে যে, নগর প্রবেশের সময় হযরতের মস্তক ক্রমেই অবনমিত হইয়া আসিতেছিল, এমন কি, ক্রমে ক্রমে তাহা পালানের "কাঠি" স্পর্শ করে।* মক্কার সহস্র সহস্র নরনারী আজ যেন কি এক অস্ফুট আর্তনাদ ও ব্যাকুল মনোভাব লইয়া মোস্তফার মুখপানে তাকাইয়া আছে। নিজেদের অপরাধগুলি স্মরণ করিয়া আজ তাহারা কতই না আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছে ! কোরেশ-দলপতি ও মক্কা প্রদেশের সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তিগণ দূরে দূরে দাঁড়াইয়া আছে। হযরতের সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইলে তাহারা লজ্জা, ঘৃণা ও অনুশোচনায় অধঃবদন হইয়া পড়িতেছে। হায়, হায়, বেচারারা কতই না কষ্ট পাইতেছে, কতই না মনস্তাপ ভোগ করিতেছে। সুতরাং যাহাতে কাহারও সহিত চাক্ষুষ না হয়, হযরত তাহার ব্যবস্থা করিলেন। হযরত সকল সময় এবং সকল দিকে তাঁহার সেই 'করুণানিধান পরমাত্মীয়ের' মঙ্গল করাঙ্গুলির স্পষ্ট সঙ্কেত দেখিতে পাইতেছিলেন। কিন্তু মানুষ আজ মানুষকে 'বিজয়ী' বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, যন্ত্রীকে ভুলিয়া যন্ত্রের দিকে তাকাইয়া আছে। অথচ সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাফল্য, সুতরাং সমস্ত মহিমা ও সমস্ত কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁহার। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হযরতের মস্তক একেবারে নত হইয়া সেজদার আকারে পালানের কাঠির সহিত মিলিয়া যাইতেছিল।**

নগর প্রবেশের পর হযরত সর্বপ্রথম কা'বা মছজিদের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ভক্তিভরে তাহার চারিপার্শ্বে প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন তাওহীদের প্রধানতম শিক্ষক এবরাহিম খলিলের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল্লার চারিপার্শ্বে পুতুল, প্রতিমূর্তি ; চিত্র এবং 'প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত' ৩৬০টি ঠাকুর-দেবতা ও বিগ্রহাদি স্থানলাভ করিয়া বসিয়াছিল। হযরতের আদেশে সেগুলি বাহির করিয়া ফেলা হইতে লাগিল। মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে হযরত এবরাহিম ও এসমাইলের চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাও ধুইয়া-মুছিয়া ফেলা হইতে লাগিল। যে চিত্রগুলি

* হাকেম—একলিল, এবনে-হেশাম, যাওয়াহেব ১—১৫৪।

** ভক্তগণ এই 'মাকাম'কেই 'মোসল্লায়ে নবী মস্তক', বলিয়া থাকেন।

ধুইয়া ফেলা অসম্ভব, জাফরানের পানি দিয়া সেগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইল।* যীশুক্রোড়ে মেরীর চিত্রও কা'বার একটা স্তম্ভে বিদ্যমান ছিল, এ চিত্রখানিও মুছিয়া ফেলা হইল।** হযরত, ওমর ফারুককে এই কার্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই প্রকারে সমস্ত চিত্র মোচিত হওয়ার পর হযরত কা'বায় প্রবেশ করিলেন।*** কা'বা প্রবেশের সময়ও যে সকল ধাতু বা প্রস্তর নির্মিত বিগ্রহ দণ্ডায়মান ছিল, হযরত হাতের ছড়ি দ্বারা তাহাদিগের কপালে খোঁচা দিয়া—অথবা তাহাদের মাথার দিকে ইঙ্গিত করিয়া**** বলিতেছেন ;

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

جاء الحق و ما يبدئ الباطل و ما يعيد

"সত্য স্বাগত হইল, মিথ্যা বিনষ্ট হইল, মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।" "সত্য সমাগত হইয়াছে এবং অসত্য কস্মিনকালেও আর ফিরিয়া আসিবে না।"$ কা'বায় প্রবেশ করার পর, হযরত প্রথমে তাহার দিকে দিকে ও কোণে কোণে ছুটিয়া গেলেন এবং প্রত্যেক কোণে উপস্থিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া তকবির ধ্বনি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বলপূর্বক মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত বিয়োগবিধুর শিশু, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার মাতৃ-আঙ্গিনায় উপস্থিত হইতে পারিলে যেমন সব ভুলিয়া সব ছাড়িয়া কেবল মা মা বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে—হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাও সেইরূপ কা'বা প্রবেশের প্রথম সুযোগে আকুল কণ্ঠে আল্লাহর নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। হযরতের অনুচর ও সহযাত্রিগণও প্রথম দিবারজনী এইরূপে তকবির, প্রার্থনা ও প্রদক্ষিণ কার্যে ব্যাপৃত রহিলেন। দ্বিতীয় দিবস নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে, বেলালের প্রতি আজান দিবার আদেশ হইল। আদেশ পাওয়ামাত্র বেলাল কা'বার একটি সমুচ্চস্থানে আরোহণপূর্বক আজান দিতে আরম্ভ করিলেন।$$ একে স্থান ও কালের বিশেষত্ব, তাহার উপর ভক্তকুলরাজ বেলালের কণ্ঠনিঃসৃত আজানধ্বনি—সে ধ্বনি শতাব্দীর কোফর-কলুষিত মক্কা নগরের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া কা'বার প্রান্তরে প্রস্তরে স্বর্গের শিহরণ জাগাইয়া তুলিল। তাহার উপর, বেলালের প্রথম তকবিরের সঙ্গে সঙ্গে অযুত ভক্তের মিলিত কণ্ঠে যখন তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল ; মক্কার অধিবাসিগণ তখন ভয়ে-বিস্ময়ে, ক্ষোভে-অভিমানে এবং অপমানে-অনুতাপে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।

## হযরতের অভিভাষণ

এ সময় কোরেশদিগের ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্যের অবধি নাই। তাহারা দলে দলে কা'বা প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছে, হযরত কি করেন বা কি বলেন, তাহা দেখিবার ও শুনিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়, নামায শেষ করার পর সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া হযরত একটি নাতিদীর্ঘ খোৎবা প্রদান করিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন ;

الحمد لله الذي انجز وعده ، و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده

"আল্লাহর শোকর যিনি নিজের ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন, যিনি নিজের দাসকে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাকী যিনি সঙ্ঘসমূহকে পরাভূত করিয়াছেন।" এইরূপে নিজের সমস্ত কৃতকার্যতার একমাত্র কারণ যে আল্লাহ্ এবং নিজের বা অন্য কোন মানুষের কোন হাত যে তাহাতে নাই, অভিভাষণের প্রারম্ভে তাওহীদের এই মূলমন্ত্রটি উত্তমরূপে স্মরণ করাইয়া দিয়া হযরত কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে নিজের সিদ্ধান্ত সকলকে জানাইয়া দিলেন। আমরা নিম্নে ঐ অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;

---

* বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি। ** ফৎহুলবারী

*** আবু-দাউদ, বোখারী প্রভৃতি। **** দেখুন—এবন-খাল্দুন।

$ বোখারী, মোছলেম, তিরমিজী। $$ বোখারী, এবন-হেশাম ২—২২১ ; কানজ ৫—২১৭, ৩০৩ প্রভৃতি।

(১) 'সকলে শ্রবণ কর : অন্ধকার-যুগের সমস্ত অহঙ্কার—তাহা অর্থগত হউক আর শোণিতগত হউক—সমস্তই আমার এই যুগল পদতলে দলিত, মর্দিত ও চিরকালের তরে রহিত হইয়া গেল।" এখানে বলা আবশ্যক যে, আরব জাতির অন্য শত যোগ্যতা বিদ্যমান থাকিলেও একমাত্র এই 'অন্ধকার যুগের অহঙ্কারের' জন্যই এতদিন তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইতে পারে নাই। একটা প্রাণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং একটা শোণিত পাতের অর্থের নিমিত্ত, তাহারা প্রতিবেশী গোত্রসমূহের সহিত যুগযুগান্তর ধরিয়া এবং পুরুষানুক্রমে যুদ্ধ-বিগ্রহ, নরহত্যা ও লুণ্ঠনকার্যে ব্যাপৃত থাকিত। ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য একটা গোত্রের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হইত। পক্ষান্তরে সেই গোত্রের কবি ও লেখকগণ সেই সকল অত্যাচারের কথা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতেন এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে সুদে-আসলে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইত। বলা আবশ্যক যে, অত্যাচারের এই আদান-প্রদানই আরবের প্রধান শ্লাঘার বিষয় ছিল। এইরূপে গৃহযুদ্ধ, কলহ-কোন্দল এবং অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা আরবীয় সমাজসমূহে চিরস্থায়ী ও ক্রমবর্ধনশীল হইয়া দাঁড়ায়। মহামতি মোস্তফা, আরব জাতিকে জীবন দিতে আসিয়াছিলেন। তাই ধর্ম সম্বন্ধে* কোন কথা না বলিয়া তিনি প্রথমে আরবের জাতীয় জীবনের সর্বনাশকর এই মারাত্মক ব্যাধিটির প্রতিকার করার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, এই ঘোষণার দ্বারা পূর্ব যুগের দাবী-দাওয়াগুলি বারিত ও রহিত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবীয় সমাজের প্রধানতম আপদটি নিমেষের মধ্যে চিরতরে তিরোহিত হইয়া গেল।

(২) অতঃপর যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তাহা হইলে ইহা তাহার ব্যক্তিগত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেজন্য তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। ভ্রমজনিত নরহত্যার জন্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণকে একশত উষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ইহাও তাহার ব্যক্তিগত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) 'হে কোরেশ জাতি ! মূর্খতা যুগের অহমিকা এবং কৌলিন্যের গর্ব আল্লাহ্ তোমাদিগের হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। মানুষ সমস্তই আদম হইতে আর আদম মাটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।' সকলে শ্রবণ কর, আল্লাহ্ বলিতেছেন : 'হে মানব ! আমি তোমাদিগের সকলকেই (একই উপকরণে) স্ত্রী-পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন করিয়াছি—এবং তোমাদিগকে একমাত্র এই জন্য বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন গোত্রে (বিভক্ত) করিয়াছি যে, উহা দ্বারা তোমরা পরস্পরের নিকট পরিচিত হইতে পারিবে (অহঙ্কার ও অত্যাচার করার জন্য নহে)। নিশ্চয়ই জানিও যে, তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক সংযমশীল (পরহেজগার), আল্লাহর নিকট সে-ই অধিক মহৎ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী।'

সকল মানুষই আদম হইতে পয়দা হইয়াছে—সুতরাং আদমের সন্তানগণ পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা এবং তাহারা সকলেই সমান। তাহার পর ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আদম মাটি হইতে উৎপন্ন। সুতরাং মানুষকেও মাটির মত সর্বসহ, সর্বপালক ও অহঙ্কারশূন্য হওয়া চাই। বলা বাহুল্য যে, সাম্য কোরআনের একটি প্রধানতম শিক্ষা এবং জগতে ইহার প্রতিষ্ঠাই মোস্তফা জীবনের প্রধানতম সিদ্ধি। এই শিক্ষা এবং এই সিদ্ধির প্রকৃত স্বরূপ আজও সাধারণভাবে মানব সমাজের বিদিত হয় নাই, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে !

(৪) 'সকল প্রকার মদ ও মাদক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, মুছলমান-অমুছলমান সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ।' মাদক দ্রব্যের ব্যবহার পূর্বেই হারাম হইয়াছিল, উহার ক্রয়-বিক্রয়ও বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই নিষেধটি এতদিন পর্যন্ত মুছলমানদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া ছিল এবং আরবের অমুছলমানগণ এযাবৎ এই পাপাচারে পূর্ণবৎ লিপ্ত হইয়া ছিল। আজ এছলামের পূর্ণ

---

* সাধারণতঃ একথা ধর্ম বলিতে যাহা বুঝান হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ এছলামের শিক্ষা অনুসারে মানবের প্রত্যেক কর্তব্যই ধর্ম।

সাফল্যের দিনে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, অতঃপর মাদক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির অন্তর্গত একটি গুরুতর অপরাধ বলিয়া নির্ধারিত হইবে।*

## অপরূপ দৃশ্য ও মহিমাময় আদর্শ

খোৎবা শেষ করার পর হযরত সমবেত কোরেশগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। একুশ বৎসরের অগণিত ও অকথ্য অত্যাচারের নায়ক এবং তাহাদিগের সকল পাপাচারের সহায় মক্কাবাসিগণ, আজ তাঁহার চরণতলে অধঃবদনে উপবিষ্ট। দীর্ঘ একুশ বৎসরের সমস্ত অপরাধ আজ তাহাদিগের চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভাবিতেছে—সেই অগণিত অপরাধপুঞ্জের প্রত্যেকটির জন্য তাহারা ন্যায়তঃ কঠোরতর দণ্ডাদেশের উপযুক্ত। তাই নিজেদের কর্মফলের ভাবী বিভীষিকা কল্পনা করিয়া তাহারা এক-একবার শিহরিয়া উঠিতেছে। আবার মোস্তফার মহিমান্বিত বদনমণ্ডলের মধুর, প্রশান্ত রূপ দর্শনে তাহাদিগের প্রাণে যেন একটা আশ্বাসের ভাব জাগিয়া উঠিতেছে। হযরত তখন সমবেত কোরেশগণকে বিশেষতঃ মক্কাবাসীদিগকে সাধারণভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ "হে কোরেশ জাতি ! হে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ ! তোমাদিগের প্রতি আজ আমি কিরূপ ব্যবহার করিব বলিয়া তোমরা মনে করিতেছ ?" মজলিসের চারিদিক হইতে শতকণ্ঠে উত্তর হইল ঃ

خـــيـــــوا ـــــ اخ كريم و ابن اخ كريم ....

فطن خيرا ـــــ اخ كريم و ابن اخ كريم و قدرت

ـــــ .... و ان كنا لخاطئين ـ

"কল্যাণের আশা করিতেছি।" "মঙ্গলের আশা করিতেছি।" "হে আমাদিগের মহিমাময় ভ্রাতা ! হে আমাদিগের মহান ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি বিজয়ী, তুমি আজ দণ্ডদানে সমর্থ। তবুও তোমার নিকট আমরা সদ্ব্যবহারই আশা করিতেছি। যদিও আমরা অপরাধী, তবু তোমার নিকট করুণ ব্যবহার পাইবার প্রত্যাশী।" তখন প্রেম ও করুণা-বিজড়িত কণ্ঠে এরশাদ হইল ঃ

لا تثريب عليكم اليوم ـ يغفر الله لكم و هو ارحم الرحمين ـ

اذهبوا ' فانتم الطلقاء

"আজ তোমাদিগের প্রতি কোনই অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন, তিনি শ্রেষ্ঠতম দয়াময়। যাও, তোমরা সকলে মুক্ত, সকলে স্বাধীন।"**

## হত্যার ষড়যন্ত্র ও হযরতের করুণা

হযরতের পূর্বোক্ত অভয় ঘোষণার পরও যাহারা খালেদের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া দুইজন ছাহাবীকে নিহত করিয়াছিল, সেই বিদ্রোহিগণও হযরতের করুণালাভে বঞ্চিত হইল না। একদল লোক হযরতকে অতর্কিতভাবে নিহত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাহাদিগের নিয়োজিত একজন লোক এই পরামর্শ অনুসারে হযরতকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ছাহাবাগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া এই ব্যক্তিকে 'নজরবন্দ' করিয়া রাখা হয়। রহমতুল-লিল-আলামীনের অপার করুণার ফলে এই আততায়ীকেও মুক্তি দেওয়া হইল।

## প্রাণের বদলে জীবনলাভ

মক্কা-বিজয়ের দ্বিতীয় দিবস হযরত নিবিষ্ট মনে কা'বার তাওয়াফ করিতেছেন—এমন সময় ফোজালা-এবন-ওমের নামক মক্কাবাসী অতি সন্তর্পণে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফোজালা নিজে বলিতেছেন—হযরতকে অতর্কিতভাবে হত্যা করার মানসে আমি খুব সতর্কে

---

* কানজ—৫—২৯৭ বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ, এবন-হেশাম প্রভৃতি।

** তাবরী ৩—১২০, জাদ ১—৪১৫ ; এবন-হেশাম ২—১১৯ ; হালবী ৩—৯৮

তাঁহার পানে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় তাঁহার দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ? ফোজালা না-কি?"

আমি ঃ জি, হাঁ, আমি।

হযরত ঃ কি মতলব আঁটিতেছ ?

আমি ঃ আজ্ঞে, কিছু না, এই আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিতেছি।

আমার এই দুর্দশা দেখিয়া হযরত আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মধুর হাস্যসহকারে বলিলেন ঃ 'বেশ কথা ফোজালা ! সেই আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।' এই সময় ফোজালার মানসিক অবস্থা যে কিরূপ হওয়া স্বাভাবিক, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি যুগপৎভাবে ভয়ে লজ্জায় ও অনুতাপে অভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। হযরত তখন নিজের দক্ষিণ হস্ত তাঁহার বক্ষের উপর স্থাপন করিলেন। ফোজালা বলিতেছেন—তখন আমার মনের সমস্ত চাঞ্চল্য ও সকল অশান্তি দূর হইয়া গেল। আমি এক স্বর্গীয় শান্তি ও অনির্বচনীয় তৃপ্তিলাভ করিয়া ধন্য হইলাম।

মদ ও বেশ্যা এই শ্রেণীর লোকদিগের অবসর রঞ্জনের প্রধান উপকরণ। ফোজালাও পূর্বে ইহাতে মজিয়া ছিলেন। তিনি যখন জীবনসাগারে স্নাত হইয়া পবিত্র দেহে ও শুদ্ধ-বুদ্ধ হৃদয়ে বাটীর দিকে ফিরিয়া যাইতেছেন, সেই সময় তাঁহার বড় আদরের ও বড় গৌরবের রক্ষিতা—সম্ভবতঃ তাঁহার ভাবান্তর দর্শনে বিচলিত হইয়া—বলিতে লাগিল ঃ "প্রাণেশ্বর ! একবার এদিকে আইস, একটা কথা শুনিয়া যাও।" ফোজালা লজ্জায় ও ঘৃণায় অধঃবদন হইয়া দ্রুত পদনিক্ষেপে সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন এবং যাইতে যাইতে মাথা নীচু করিয়া বলিতে লাগিলেন—একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদিগের সকলের প্রাণেশ্বর, তাঁহাকেই প্রেম কর, শান্তিলাভ করিতে পারিবে। "আর নয়—

قالت هلم الى الحديث فقلت يابى عليك الله والاسلام

আল্লাহ্ ও এছলাম আমাকে তোমা হইতে বঞ্চিত করিতেছে।"*

## একসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

### অপরাধিগণের প্রাণদণ্ড

### ঐতিহাসিকগণের অলীক বিবরণ

মক্কা প্রবেশের পূর্বে নগরবাসী জনসাধারণকে হযরত যে অভয়দান করিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছেন। এই অভয়দানের পরও একরামা ও ছফওয়ান প্রমুখ কোরেশ প্রধানগণ, বহু লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহপূর্বক, যেভাবে হযরতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল—এমন কি হযরতকে অতর্কিতভাবে নিহত করার জন্য তাহারা যে সকল গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, বিশ্বস্ত হাদীছ গ্রন্থ হইতে তাহাও পূর্বে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রেণীর অপরাধিগণ অল্পক্ষণের মধ্যে পরাভূত হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। তাহারা তখন মনে করিতে লাগিল—'মোহাম্মদ সকলকে অভয়দান করিয়াছেন—সত্য, কিন্তু আমরা তাঁহার সেই করুণ ব্যবহারের যে প্রতিদান করিয়াছি, তাহা ক্ষমার অযোগ্য। এ অবস্থায় মক্কা হইতে পলায়ন করা ব্যতীত প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর নাই।' এইরূপ ভাবনায় বিচলিত হইয়া ছফওয়ান ও একরামা প্রভৃতি গোপনে মক্কাত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। কয়েকটা "খুনী আসামী" প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ইতিপূর্বে মদীনা হইতে মক্কায় পলাইয়া আসে। তাহারাও হযরতের এই অপ্রত্যাশিত বিজয়লাভে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিল এবং আত্মগোপন

* জাদুল-মাআদ ১—৪১৭, এবন-হেশাম ৩—২২১, হালবী ও এছাবা প্রভৃতি।

বা দূরদেশে পলায়নপূর্বক প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমাদিগের অসতর্ক ঐতিহাসিকগণ এই শ্রেণীর নরনারীদিগের নামের তালিকা দিয়া বলিতেছেন যে, হযরত ইহাদিগকে অভয়দান করেন নাই। কেহ কেহ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বলিতেছেন যে, হযরত ইহাদিগকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ নিহত নরনারীদিগের নামের তালিকা দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা তাঁহাদিগের প্রমাণহীন—বরং প্রমাণের বিপরীত—অলীক অনুমান মাত্র। এই অনুমানের মূলে কোন সত্য নিহিত না থাকায় এই বিবরণের প্রত্যেক অংশে তাঁহারা এরূপ মারাত্মকরূপে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন যে, তাহার আলোচনাকালে ধৈর্যধারণ করা কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। বোখারী, মোছলেম, নাছাই ও আবু-দাউদ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থেও এতদসংক্রান্ত কোন কোন ঘটনার উল্লেখ আছে। আমরা নিম্নে এই সকল বিবরণ সম্বন্ধে কয়েকটা আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

নাছাই, আবু-দাউদ প্রভৃতি হাদীছ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় হযরত চারিজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আর সকলকেই অভয়দান করিয়াছিলেন।* আমরা প্রথমে হাদীছ হইতে এই ছয়জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া দিব এবং তাহার পর প্রত্যেক আসামী সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আসামিগণের নাম ঃ (১) আবু-জেহেলের পুত্র একরামা, (২) আবদুল্লাহ্-এবন-খাতল, (৩) মিকয়াছ-এবন-ছোবাবা, (৪) আবদুল্লাহ্-এবন-ছা'আদ-এবন-আবিছারহ, (৫—৬) মেকয়াছ-এবন-ছোবাবার গায়িকাদ্বয়। ইহার মধ্যে একরামা, আবদুল্লাহ্-এবন-ছাআদ এবং একটি গায়িকা যে নিহত হয় নাই, ঐ সকল হাদীছেই তাহার বর্ণনা আছে। একরামা ও আবদুল্লাহ্-এবন-ছা'আদ যে হযরতের পরেও বহুকাল বাঁচিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করারও উপায় নাই। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ্-এবন-খাতল ও মেকয়াছ-এবন-ছোবাবা এবং একটি গায়িকা যে নিহত হইয়াছিল, ঐ সকল হাদীছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ, নাছাই ও এবন-মাজা প্রভৃতি গ্রন্থে একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা প্রবেশের পর হযরতকে বলা হইল যে, এবন-খাতল কা'বার গেলাফের অন্তরালে পলাইয়া আছে—তখন হযরত তাহার প্রাণবধ করার আদেশ দান করেন। ছেহাছেত্তা ব্যতীত অন্যান্য কেতাবে ছহী ছনদসহকারে** এই হাদীছের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে যে, "অতঃপর লোক তাহাকে নিহত করিয়া ফেলিল।" সুতরাং এবন-খাতল যে হযরতের আদেশক্রমে নিহত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে।

## এবন-খাতলের অপরাধ

এবন-খাতলকে কেন 'অভয়দান করা' হয় নাই এবং কোন অপরাধে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল—আমাদিগের কতিপয় লেখক এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলিয়া যাইতেছেন যে, كان ابن خطل يهجوا رسول الله صلعم এবন-খাতল হযরতের কুৎসাকীর্তন করিয়া বেড়াইত, এই কারণে তাহার প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের প্রমাণহীন বরং প্রমাণ বিরুদ্ধ অনুমান মাত্র। বোখারী-মোছলেম প্রভৃতি বিশ্বস্ততম হাদীছ-গ্রন্থসমূহে, মোছলেমকুল-জননী বিবি আয়েশার রেওয়ায়তে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিজের প্রতি অনুষ্ঠিত কোন অত্যাচার বা অপরাধের কোন প্রকার প্রতিশোধ হযরত কখনই গ্রহণ করেন নাই। আর হযরতের নিন্দাবাদ এবং তাঁহার প্রতি অত্যাচার করার জন্য দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকিলে, মক্কায় বিশেষতঃ কোরেশ জাতির কয়জন লোক সে দণ্ডের হাত এড়াইতে পারিত? ফলতঃ উপরোক্ত লেখকগণের এই উক্তিটির কোনই মূল্য নাই। প্রকৃত কথা এই

---

* আবু-দাউদ ২১২, নাছাই ৬২১, ফাৎহ ৫—২১৪ ও ২১৫। ** ফৎহুলবারী।

যে, এবন-খাতল বিশ্বাসঘাতকতা, স্বেচ্ছাপূর্বক নরহত্যা ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে অপরাধী ছিল এবং সেজন্য মক্কা-বিজয়ের বহু পূর্বে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। আমাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় মোহাদ্দেছগণ এবন-খাতলের এই সব অপরাধের কথা বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। খাত্তাবী বলিতেছেন :*

كان ابن خطل بعثه رسول الله صلعم و بعث معه رجلا من الانصار
و امر الانصاري عليه - فلما كان ببعض الطريق وثب على الانصاري
فقتله و ذهب بماله - فلم يعقد له رسول الله صلعم الامان و قتله
يعني ما جناه في الاسلام -

হাফেজ এবন-হাজর বলিতেছেন :**

و انما امر بقتل ابن خطل لانه كان مسلما - فبعثه رسول الله
صلعم مصدقا و بعث معه رجلا من الانصاري و كان معه مولى يخدمه
و كان مسلما - فنزل منزلا ان يذبح تيسا... فعدى عليه و قتله ثم
ارتد مشركا -

ফাকেহী ছনদসহকারে বর্ণনা করিতেছেন যে :

بعث رسول الله صلعم رجلا من الانصار و رجلا من المزينة
و ابن خطل و قال اطيعا الانصاري حتى ترجعا - فقتل ابن خطل
الانصاري و هرب المزني --

এবন এছহাক প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।*** এই সকল বর্ণনার সরামর্ম এই যে, এবন-খাতল মুছলমান হইয়া মদীনায় অবস্থান করিতেছিল। এই সময় হযরত আর দুইজন মুছলমানের সঙ্গে তাহাকে যাকাত আদায় করার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করেন এই দুইজনের মধ্যে একজন মোজায়না বংশের আর একজন আনছারী, এই আনছারীকেই হযরত এই ক্ষুদ্র দলের আমীর করিয়া দেন। আনছারীর নিকট সরকারী তহবিলের টাকাকড়ি মওজুদ ছিল। পথিমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া এবন-খাতল হযরতের নিয়োজিত আমীরকে হত্যা করিয়া তাঁহার তহবিলের সমস্ত টাকাকড়ি অপহরণ করে এবং আত্মরক্ষার্থে মক্কায় পলাইয়া যায়। অপর লোকটি পলাইয়া মদীনায় উপস্থিত হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতা, ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যা, রাজদ্রোহ ও সরকারী তহবিল তছরুফের অপরাধে—সেই সময় তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল বলা আবশ্যক যে, মুছলমান আসামীরূপে তাহার প্রতি এই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল এবং মক্কা-বিজয়ের পর এই অপরাধের জন্যই হযরত এই ফেরারী খুনী আসামীকে নিহত করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।****

---

* আওনুল মাবুদ ৩—১২। ** ফৎহুলবারী ৪—৪৩।

*** এবন-হেশাম ২—২১৮ ; হালবী ৩—৯১ ; তাবরী ৩—১১৯ প্রভৃতি।

**** এবন-খাতলের নাম ও তাহার হত্যাকারি সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। অনেকে বলেন—গায়িকা দুইটি এই এবন-খাতলের রক্ষিতা ছিল ; কিন্তু আবু-দাউদ বলিতেছেন—উহারা মেকয়াছের রক্ষিতা। এই রেওয়ায়তগুলি যে সন্দেহিক জনশ্রুতি হইতে সঙ্কলিত, এই অসাধারণ মতভেদ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। গায়িকাদ্বয়ের পরিচয়াদির সম্বন্ধেও এই প্রকার অসমাধ্য জটিলতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

## মেক্‌য়াছের প্রাণদণ্ড

নাছাই, আবু-দাউদ, দারকুৎনী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থের একটি বিবরণে এই মাত্র জানা যাইতেছে যে, হযরত মেকয়াছ-এবন-ছোবাবা নামক এক ব্যক্তিকে অভয়দান করেন নাই, বরং তাহাকে নিহত করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই আদেশ অনুসারে লোকে তাহাকে বাজারে নিহত করিয়া ফেলে। এই হাদীছের দুইটি রাবী—এছমাইল ছুদ্দী ও আছবাত—সম্বন্ধে কতিপয় মোহাদ্দেছ তীব্র অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ছুদ্দী অত্যন্ত গোঁড়া শীয়া ছিলেন এবং তিনি হযরত আবু-বক্কর ও ওমরকে সর্বদা গালাগালি দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ছুদ্দীর শিষ্য আছবাতও যে শীয়া মতের অনুরাগী ছিলেন, তাহা তৎবর্ণিত একটা হাদীছ হইতে অনুমান করা যায়।* আহমদ-এবন-মোফজ্জেলকেও অনেকে জঈফ বলিয়াছেন। আবার মজার কথা এই যে, 'ছুদ্দী (তাহার উপরিতন রাবী) মোছআবের মুখে শুনিয়াছেন—পরবর্তী রাবী আছবাত সোজাসুজিভাবে এইরূপ বর্ণনা না করিয়া বলিতেছেন যে, زعم السدي عن مصعب بن سعد ছুদ্দী মনে করেন যে, তিনি মোছআব-এবন-ছা'আদের নিকট অবগত হইয়াছেন। ফলে রেওয়ায়তের হিসাবেও হাদীছটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য নহে। শ্রদ্ধেয় মাওলানা শিবলী মরহুমের ছিরৎ গ্রন্থের সঙ্কলক জনাব মাওলানা ছোলায়মান নাদভী ছাহেব এই হাদীছটাকে 'অসংলগ্নসূত্র' বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আবু-দাউদের প্রচলিত সংস্করণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছের শেষ রাবী মোছআব, এবং তিনি ছাহাবী নহেন—তাবেয়ী। আওনল মাবুদের সঙ্গে যে আবু-দাউদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে عن مصعب بن سعد عن سعد অর্থাৎ মোছআব-এবন-ছা'আদ হইতে, "তিনি ছা'আদ হইতে" স্পষ্টতঃ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইমাম নাছাই এই হাদীছটাকে অবিকল এই ছনদসহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ ছনদের শেষে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছেঃ عن مصعب بن سعد عن ابيه মোছআব-এবন-ছা'আদ হইতে, "তিনি স্বীয় পিতা (ছা'আদ) হইতে বর্ণনা করিতেছেন।" ফলতঃ মাওলানা ছাহেবের উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি যে সমীচীন হয় নাই, ন্যায়ের অনুরোধে আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি।

## মেক্‌য়াছের অপরাধ

যাহা হউক, ছনদের হিসাবে এই হাদীছটির গুরুত্ব কম হইয়া গেলেও এবন-আছাকের, এবন-আবিশায়বা প্রমুখ মোহাদ্দেছগণের বর্ণিত হাদীছগুলির সহযোগে, ওয়াকেদী ও এবন-এছহাকের 'ঐতিহাসিক বিবরণ' অপেক্ষা ইহার মর্যাদা যে অনেক অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং দার্শনিক যুক্তিতর্কের দ্বারা এই সকল হাদীছের কোন অংশ ভিত্তিহীন বলিয়া সপ্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত, উহার বর্ণিত ঘটনাগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই হিসাবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মক্কা বিজয়ের পর, মেক্‌য়াছকে হযরতের আদেশক্রমে নিহত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রাণদণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা সহজেই জানিতে পারিব যে, এই মেক্‌য়াছও একজন 'খুনী আসামী'—এবং হযরত মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ইতিহাস ও চরিত-পুস্তকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, মেক্‌য়াছ ও তাহার সহোদর হেশাম, এছলাম গ্রহণপূর্বক মদীনায় অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময় একটা যুদ্ধে জনৈক আনছারী ভ্রমক্রমে (শত্রু মনে করিয়া) হেশামকে নিহত করেন। যথাসময় হযরতের দরবারে এই মোকদ্দমার বিচার হইয়া যায় এবং হযরত ভ্রমজনিত নরহত্যার জন্য মেকয়াছকে যথারীতি প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। নরাধম এই ক্ষতিপূরণের টাকা লইবার পর উপরোক্ত আনছারীকে হত্যা করিয়া মক্কায় পলায়ন করে। সেই সময় ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যার অপরাধে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর সেই আদেশ কার্যে পরিণত করা হয়।**

---

* মীজান ১—৭০, ৯৩।

** এবন-হেশাম, হালবী, এছাবা প্রভৃতি

## গায়িকার প্রাণদণ্ড

এবন-খাতলের দুইজন রক্ষিতা গায়িকা হযরতের কুৎসামূলক গাথা গান করিয়া বেড়াইত। এই গায়িকাদ্বয়ের প্রতিও প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে একটি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করে, পরে হযরতের কৃপা ভিক্ষা করিয়া বাঁচিয়া যায়। কিন্তু অন্যটিকে নিহত করা হইয়াছিল—আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে এই কথা বলিয়াছেন। আবু-দাউদের একটি রেওয়ায়তে দুইজন গায়িকার মধ্যে একজনের নিহত হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই হাদীছটির ছনদ যে সন্তোষজনক নহে, আবু-দাউদ স্বয়ং সে কথা বলিয়া দিয়াছেন। তাহার পর ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, এবন-খাতলের গায়িকাদ্বয়ের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু আবু-দাউদের এই রেওয়ায়তে এবন-খাতলের স্থানে মেকয়াছ-এবন-ছোবাবার নাম করা হইয়াছে। নিহত গায়িকার নাম সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলিয়াছেন, তাহার নাম কারিবা। কেহ কেহ বলিয়াছেন কারিবা নহে, ফর্তনী। আবার কেহ কেহ আর্ণাব ও ওম্মে-ছা'আদ নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন। হাফেজ এবন-হাজর বলিতেছেন—এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, কারিবা, ফর্তনী, আর্ণাব ও ওম্মে-ছা'আদ একই ব্যক্তির নাম !* এই সকল গুরুতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই রেওয়ায়তগুলি কতিপয় রাবীর অনুমান বা ভিত্তিহীন জনশ্রুতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জন্য এবন-ছা'আদ, তাঁহার গুরু ওয়াকেদীর সমস্ত রেওয়ায়তকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিতেছেন যে, "প্রাণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে মাত্র এবন-খাতল, হোওয়ায়রেছ এবং মেকয়াছকে নিহত করা হইয়াছিল।"** ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, এই তিনজন পুরুষ ব্যতীত কোন নরনারীকে নিহত করা হয় নাই। এখানে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নারী হত্যা এছলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বোখারী ও মোছলেম এই মর্মের যে হাদীছটি আব্দুল্লাহ্-এবন-ওমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইমাম নাবাবী তাহার টীকায় লিখিতেছেন ঃ

اجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء الخ

"আলেমগণ একমত হইয়া বলিতেছেন যে, এই হাদীছের উপর আমল করা অবশ্য কর্তব্য—এবং স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা করা হারাম।"*** সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, রছুলের হাদীছ এবং আলেমগণের সমবেত সিদ্ধান্ত অনুসারে, এই গল্পটির প্রতি কোন প্রকার আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিজের প্রতি অনুষ্ঠিত কোন অত্যাচার-উপদ্রবের প্রতিশোধ হযরত জীবনে কখনই গ্রহণ করেন নাই।**** এইজন্য তিনি নিজের প্রাণের বৈরীদিগকেও কখনও কোন প্রকার দণ্ড প্রদান করেন নাই। পাঠকগণ মোস্তফা-চরিতের বহু স্থানে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাইয়াছেন। হযরত এই সকল অপরাধীকে ক্ষমা করিতেছেন, তীব্র হলাহল ভক্ষণ করিয়াও খায়বারের ইহুদী নারীকে সহাস্য-বদনে মুক্তিদান করিতেছেন—আর মক্কায় করে কোন ক্রীতদাসী স্বীয় প্রভুর সন্তোষলাভের জন্য তাঁহার কি গ্লানি করিয়াছিল, এইজন্য তিনি একজন স্ত্রীলোকের প্রতি নারী হত্যার বিরুদ্ধে নিজে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচারের পরও—প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেছেন, এ-কথা পাগলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

## মূরের উক্তি

স্যার উইলিয়ম মূর বলিতেছেন যে,—হযরতের কন্যা জয়নাবের প্রতি, তাঁহার মদীনা যাত্রাকালে অমানুষিক আক্রমণ করার জন্য হোওয়ায়রেছ ও হাব্বার নামক দুই ব্যক্তির প্রতি

---

* আবু-দাউদ ও ফৎহুল্বারী প্রভৃতির উপরোক্ত হাওয়ালাগুলি দ্রষ্টব্য।

** ১—২—৯৬।

*** ২—৮৭৪। এই হাদীছে অমুছলমান নারীদিগের কথাই বলা হইয়াছে।

**** বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি, বিবি আয়েশা হইতে

প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। হাব্বার পলাইয়া প্রাণরক্ষা করে এবং পরে মুছলমান হইয়া মদীনায় আগমন করায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। আমরা হাদীছ ইইতে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, চারিজন পুরুষ অর্থাৎ এবন-খাতল, আবদুল্লাহ্-এবন-ছা'আদ, মেকয়াছ ও একরামা এবং দুইজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আর সকলকেই অভয়দান করা হইয়াছিল। সুতরাং হাব্বার ও হোওয়ায়রেছের প্রতি যে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত বিবি জয়নাবের প্রতি উল্লিখিত অত্যাচারের বর্ণনাকালে ঐতিহাসিকগণ হাব্বার ব্যতীত আর কাহারও নামের উল্লেখ করেন নাই। স্যার উইলিয়মও কেবল হাব্বার নাম করিয়াছেন।* কোন কোন ঐতিহাসিক বিবি ফাতেমা ও বিবি ওম্মে-কুলছুমের মদীনা আগমন বৃত্তান্তে হোওয়ায়রেছের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মূর সাহেব ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া বলিতেছেন— "They met with no difficulty or opposition." অর্থাৎ হযরতের প্রেরিত জায়েদ প্রভৃতি নির্বিঘ্নে ও বিনা বাধায় বিবি-ফাতেমা ও ওম্মে-কুলছুমকে লইয়া মদীনা চলিয়া গেলেন।** মূর সাহেব প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করার আগ্রহাতিশয্যবশতঃ ঐতিহাসিকগণের ঐ গল্পটি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা*** সত্ত্বেও, তাহা হইতে হোওয়ায়রেছের প্রাণদণ্ডের কথাটা বাছিয়া লইয়াছেন এবং সেটাকে দীর্ঘকাল পরে সংঘটিত বিবি জয়নাবের মদীনা যাত্রাকালীন ঘটনার সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া ভদ্রতার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা এখানে স্যার উইলিয়মের সাধুতার আর একটু পরিচয় দিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। বিবি জয়নাবের প্রতি যে পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, মূর সাহেব তৎপ্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, হাব্বার আসিয়া জয়নাবের উটকে বর্শার আঘাত করে। ইহাতে তিনি এতদূর ভীত হইয়া পড়েন যে, তাহার ফলে তাঁহার গর্ভপাত হইয়া যায়। কিন্তু ইতিহাস ও চরিত অভিধানসমূহে স্পষ্টতঃ বর্ণিত এবং সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে,—"হাব্বার বিবি জয়নাবের স্ত্রীঅঙ্গে বর্শার আঘাত করায় তিনি উটের পিঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া যান। এই পতনের ফলে তখনই তাঁহার গর্ভপাত হইয়া যায় এবং রক্তস্রাব হইতে থাকে। বৎসরেককাল পরে এই কারণেই বিবি জয়নাব মৃত্যুমুখে পতিত হন।"**** এক শ্রেণীর খ্রীষ্টান লেখকগণ কিরূপ মনোভাব লইয়া হযরতের জীবনী সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

# দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

## বিভিন্ন ঘটনা

### বিজয়ের প্রভাব

মক্কা বিজিত হইল, চক্ষের নিমেষে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন হইয়া গেল এবং এই বিজয়ের ব্যাপার লইয়া দেশময় নানাসূত্রে বিভিন্ন প্রকারের আলোচনা আরম্ভ হইল। পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের আরবগণ হোদায়বিয়ার সন্ধির পর হইতে বহু-পরিমাণে কোরেশদিগের প্রভাবমুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময় তাহারা কোরেশ ও মুছলমানদিগের বর্তমান সংঘর্ষের পরিণাম দেখিবার জন্য ভবিষ্যতের অপেক্ষায় দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা মনে করিতেছিল—এই সংঘর্ষে সত্য বিজয়ী এবং মিথ্যা পরাভূত হইবে। একদিকে মোহাম্মদের প্রচারিত অদৃষ্ট ও অদৃশ্য আল্লাহ্ এক, অন্যদিকে কোরেশের পূজিত শত শত ঠাকুর-দেবতা। মোহাম্মদ বলিতেছেন—এই ঠাকুর-দেবতা এবং বোৎ-বিগ্রহগুলি অক্ষম জড়পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে,—পক্ষান্তরে একমাত্র

---

* ৩৪৪। ** ১৭২। *** কারণ সেখানে অবিশ্বাস করাই সুবিধাজনক হইয়াছিল।
**** এছাবা ২—৭৩২, হালবী প্রভৃতি।

তাঁহার সেই আল্লাহ্-ই সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা ও সর্বময়। আমাদিগের ঠাকুর-দেবতারা যদি মোহাম্মদের এই সকল নাস্তিকতা ও দেবদ্রোহের উপযুক্ত দণ্ডদান করিতে না পারেন, কাবা-মন্দিরের পূজারী পুরোহিতগণই যদি মোহাম্মদের হস্তে পরাজিত হইয়া যান, তাহা হইলে এই সকল বিরাটবপু ও বিশালকায় বিগ্রহাদির অপদার্থতা আমাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে। বোখারী প্রভৃতি বিশ্বস্ত হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

كانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فانه ان ظهر عليهم فانه نبى صادق - فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم-

আরবের বিভিন্ন গোত্র এইরূপে "মোহাম্মদ, তাঁহার আল্লাহ ও তাঁহার নবধর্ম" সম্বন্ধে নানা প্রকার আন্দোলন-আলোচনায় প্রবৃত্ত আছে, এমন সময় একদিন তাহারা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে অবলোকন করিল যে, মোহাম্মদ তাঁহার দশ সহস্র অনুচরসহ বিনা শোণিতপাতে মক্কা অধিকার করিয়া লইতেছেন। ভক্তগণের অযুতকণ্ঠ, মোহাম্মদের সেই অদৃষ্ট ও অদৃশ্য সর্ব-শক্তিমানের নামে জয়ধ্বনি তুলিয়া মক্কার গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। আবরাহার ৬০ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য যে কা'বা অধিকার করিতে আসিয়া দৈবসাহায্যে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহা অনায়াসে মোহাম্মদের অধিকারে আসিয়াছে। তাহারা দেখিল—তাহাদিগের সেই শক্তি-প্রতিমাগুলি অধঃমুখে ভূপতিত হইয়া মোহাম্মদের পদচুম্বন করিতেছে। তাহারা দেখিল—মোহাম্মদ কোরেশের সমস্ত স্পর্ধা ও আস্ফালন, সমস্ত শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র এবং তাহাদিগের সমস্ত ঠাকুর-দেবতাকে কটাক্ষে তিরোহিত, বিদূরিত ও পরাজিত করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সকল অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের বেদুঈন জাতিগুলি এছলামের প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িল, জ্ঞান ও সত্যের প্রবল আলোড়নে তাহাদিগের অন্ধ বিশ্বাস-কুসংস্কারের দুর্গদ্বার চূর্ণপ্রায় হইয়া আসিল। এই সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যখন দেখিল যে, হযরতের প্রেম ও করুণার ফলে কোরেশের ন্যায় অপরাধী জাতিও সম্পূর্ণরূপে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাহারা একেবারে স্তম্ভিত ও বিমোহিত হইয়া পড়িল।

## মক্কাবাসীর এছলাম গ্রহণ

বিশ বৎসর পূর্বে ছাফা পর্বতের উপত্যকায় আরোহণপূর্বক হযরত মক্কাবাসীদিগকে সত্যের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কঠিন প্রস্তরখণ্ড এবং কঠোর বাক্যবাণ দ্বারা কোরেশ দলপতিগণ সে আহ্বানের যে উত্তর দিয়াছিল, পাঠকগণের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। তখন হযরত দুনিয়ার হিসাবে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও নিঃসম্বল ছিলেন। আর আজ অযুত প্রাণ তাঁহার শ্রীচরণে আত্মোৎসর্গ করার জন্য লালায়িত হইয়া সেই পবর্তমূলে আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু তবু প্রচারের সেই পূর্ব ধারার কোনই পরিবর্তন হয় নাই। আজও সেই করুণ-মধুর আকুল আহ্বান, জনসাধারণকে মুক্তি ও মঙ্গলের অধিকারী করিয়া দিবার জন্য সেই ব্যগ্রব্যাকুল স্বর্গীয় সম্ভাষণ। বিশ বৎসরের সাধনার মধ্য দিয়া মহিমাময় মোস্তফার প্রকৃত স্বরূপকে কোরেশ বহু পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। তাই আজ যখন হযরত ছাফা পর্বতে আরোহণ করিয়া দেশবাসীকে পূর্ববৎ প্রেমের, সত্যের এবং আল্লাহ্‌র পানে আহ্বান করিলেন, তখন সহস্র সহস্র কণ্ঠ ভক্তিগদগদ স্বরে সে আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিল। মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের বহু নরনারী হযরতের হস্তে 'বায়আত' গ্রহণপূর্বক নিজেদের জীবন সার্থক করিয়া লইল। একরামা প্রভৃতি যে কয়জন মক্কাবাসী—নিজেদের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া—দূরদেশে পলায়ন করিতেছিলেন, তাঁহারাও হযরতের অভূতপূর্ব মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রায় সকলেই অবিলম্বে মোস্তফা চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রচার ও উপদেশ ব্যতীত হযরত এছলাম গ্রহণ করার জন্য কাহাকেও কস্মিনকালে কোন প্রকার

'পীড়াপীড়ি' করেন নাই। এক্ষেত্রেও তিনি কেবল উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন। যাহারা এছলাম গ্রহণ করিল না, তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার কঠোর ব্যবহার বা বিষম ব্যবস্থা করা হইল না। তাহারাও মুছলমানদিগের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন এবং তাহাদিগের সমান সকল অধিকারের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।*

## কয়েকটা ক্ষুদ্র ঘটনা ও মহৎ আদর্শ

একরামার পিতা আবু-জেহেল হযরতের প্রতি আজীবন যে কিরূপ পৈশাচিক দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হন নাই আশা করি। এছলাম গ্রহণের পর একদা একরামা হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিলেন যে, মুছলমানগণ তাঁহার পিতাকে গালাগালি দিয়া থাকেন। হযরত ইহাতে যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়া ভক্তবৃন্দকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন : "মৃতদিগকে গালাগালি দিয়া জীবিতদিগকে যন্ত্রণা দিও না। মৃতগণ তাহাদিগের কর্ম ও কর্মফল লইয়া চলিয়া গিয়াছে, অতএব তাহাদিগকে গালি দেওয়া অনুচিত।" "মৃত ব্যক্তিগণের জীবনের মন্দ দিকটা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাহার উত্তম দিকটার আলোচনা করা উচিত।"** আবু জেহেলের ন্যায় এছলামের প্রধানতম শত্রুর জন্যও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার এই আদেশ। কিন্তু আজ দেখিতেছি, মজহাবী কোন্দল-কোলাহলে লিপ্ত হাদী ও নায়েবে-নবী আখ্যাধারী মহাজনগণ, দলভুক্ত মূর্খ জনসাধারণের নিকট বাহাদুরী ফলাইবার অথবা বিপক্ষ-পক্ষের অন্তরে আঘাত দিবার উদ্দেশ্যে, ইমাম আবু-হানিফা, ইমাম বোখারী ও ইমাম তিরমিজীর ন্যায় মহিমান্বিত মহাজনগণকেও জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না ! একপক্ষের মওলানাগণ লিখিতেছেন যে,—"...... ইমাম তিরমিজি পদাঘাতে কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত হইলেন !" আর একপক্ষের হাদীবৃন্দ প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ঘোষণা করিতেছেন যে—"আবজাদের হিসাবে তারিখ বাহির করিলে 'ছগ্' বা কুকুর শব্দ হইতে যে সন বাহির হয়, তাহাই ইমাম আবু-হানিফার মৃত্যু তারিখ !" এহেন ভীষণ উক্তি প্রচারের পরও ইঁহাদিগের প্রত্যেকেই রছুলের ছুন্নত বা আদর্শের পাক্কাপাবন্দ পাক্কা ছোন্নৎ-জামাআত !! পাঠকগণকে এই তারতম্যের বিষয়টা একটু চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

## আমি রাজা নহি

হযরত ছাফা পর্বত উপত্যকায় উপবেশন করিয়া ভক্তগণকে দীক্ষাদান ও তাঁহাদিগের বায়আৎ গ্রহণ করিতেছেন, এমন সময় একটি লোক হযরতের দিকে অগ্রসর হইতে যাইয়া ত্রাসে কাঁপিতে লাগিল। হযরত তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন—ত্রস্ত হইও না, ভয়ের কোনই কারণ নাই। আমি রাজা নহি, সম্রাট নহি। আমি এরূপ একটি স্ত্রীলোকের সন্তান, যিনি শুষ্ক মাংস ভক্ষণ করিতেন।*** অর্থাৎ আমিও তোমাদিগের ন্যায় সাধারণ অবস্থায় লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি। এখনও আমি তোমাদিগেরই একজন। মানুষমাত্রেরই সমান অধিকার, সুতরাং একজন রাজা হইয়া নিজকে কতকগুলি অসাধারণ অধিকারের অধিকারী মনে করিয়া কর্তার আসনে বসিবে, আর আল্লাহর সন্তানগণ ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ভয়ের ন্যায় তাহাদিগের নামে ভীত, ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া থাকিবে—আমার সাধনায় এ ব্যবস্থার স্থান নাই।

## খালেদের অন্যায় আচরণ

মক্কা বিজয়ের পর হযরত ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে অর্থাৎ যে এছলাম গ্রহণ করিয়াছে, সে যেন নিজ গৃহের পুতুল-প্রতিমা-মাত্রই ভাঙ্গিয়া ফেলে।**** এছলাম গ্রহণের পূর্বেই মক্কাবাসিগণ তাহাদিগের ঠাকুর-

---

* বোখারী, ফৎহুলবারী, তবরী ৩—১২১, এবন-হেশাম ২—২২০, কামেল ২—৯৬, হালবী, জাদুল-মাআদ প্রভৃতি। ** হালবী ৩—৯২ প্রভৃতি।
*** হালবী ৩—৯১ ; কানজ, জাদ প্রভৃতি। **** জাদ ১—৪১৭।

বিগ্রহাদির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাওহীদমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিজেরাই সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দূর করিয়া দিতেছিলেন। হযরতের এই আদেশ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট লোকেরাও নিজ নিজ গৃহের বিগ্রহগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সাধারণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ বৃহৎ প্রতিমূর্তিগুলি ছাহাবাগণ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর, মক্কার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন পল্লীর আরব গোত্রগুলিতে এছলাম প্রচার করার জন্য হযরত ছাহাবাগণের কয়েকটা ক্ষুদ্র দলকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করেন, ইঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হয় নাই। এইরূপে খালেদ-এবন-অলিদ কতিপয় ছাহাবাকে সঙ্গে লইয়া বানি-যাজিমা গোত্রের নিকট গমন করেন, বলা বাহুল্য যে, ইঁহাকেও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয় নাই। কিন্তু খালেদ এখানে আসিয়া তাহাদিগের কতিপয় লোককে নিহত করিয়া ফেলেন। এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শ্রবণমাত্রই হযরত ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! তুমি জানিতেছ, খালেদের এই কার্যের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই। এই ঘটনার তদন্তকালে, অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে, ইহাও জানিতে পারা যায় যে, আবদুল্লাহ্-এবন-হোজাফার বলার দোষে হউক অথবা নিজেই শোনার ভুলেই হউক, খালেদ একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই এই অন্যায় কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তদন্তের পর হযরত মহামতি আলীকে অগাধ অর্থদানপূর্বক যাজিমীয়দিগের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রেরণ করেন। তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, খালেদের কার্যের সহিত হযরতের কোনরূপ সম্বন্ধ বা সহানুভূতি নাই—অধিকন্তু খালেদ ভ্রমক্রমেই যুদ্ধাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ; তখন তাহারা বহু পরিমাণে আশ্বস্ত হইল। হযরত যে ইহার জন্য কোন প্রকার দায়ী নহেন, এবং তিনি ক্ষতিপূরণ না করিয়া দিলেও তাহারা তাঁহার কিছুই করিতে পারিত না, যাজিমা গোত্রের লোকেরা ইহা সম্যকরূপে অবগত ছিল। ইহার পর যখন আলী হযরতের প্রতিনিধিরূপে তাহাদিগের পল্লীতে উপস্থিত হইলেন, যখন নিয়মিত শোণিত পণ অপেক্ষাও অধিক অর্থ দিয়া তাহাদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিলেন, তখন তাহারা মুক্তকণ্ঠে হযরতের মহিমার জয়জয়কার করিতে লাগিল। আলী হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া অতিরিক্ত অর্থ-বন্টনের কথা নিবেদন করিলে, হযরত উৎফুল্ল কণ্ঠে উত্তর করিয়াছিলেন—ভাল হইয়াছে, বেশ করিয়াছ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ 'আল্লাহ্ ! তুমি জানিতেছ, খালেদের কার্যের সহিত আমার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, আমি নিরপরাধ।'*

## বিচার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা

মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরে একটি স্ত্রীলোক চৌর্য অপরাধে ধরা পড়ে। স্ত্রীলোকটির অপরাধ খণ্ডনের কোন উপায় নাই দেখিয়া, তাহার গোত্রের সমস্ত লোক একযোগে ওছামার নিকট উপস্থিত হয় এবং বিস্তর অনুরোধ-উপরোধ করিয়া বলে—আপনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সুপারিশ করুন, যেন স্ত্রীলোকটিকে বিনাদণ্ডে মুক্তি দেওয়া হয়। পাঠকের স্মরণ আছে, এই "দাস পুত্র" ওছামা হযরতের সহসাদীরূপে মক্কা প্রবেশ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিল, এমন প্রিয়জনের অনুরোধের প্রতি হযরত কখনই উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, ওছামার প্রতি হযরতের এই অনুগ্রহ, ওছামার ভৌতিক দেহটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা দুনিয়ায় সাম্যনীতির প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠাতা, এই নীতির অনুসরণ করিয়াই তিনি ওছামাকে সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কোন অপরাধীর কুলশীলের কথা স্মরণ করিয়া, অবস্থাপন্ন স্বজনগণের মুখ চাহিয়া, তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিলে সেই সাম্যনীতিকেই যে পদদলিত করা হয়, এ-কথা তাহারা

---

* তাবরী ৩—১৪৪, তাবকাত ২—১০৬, কামেল ২—৬৮—৯৭, এবন-হেশাম ১—৩, হালবী, জাদুল-মাআদ, মাওয়াহেব প্রভৃতি।

ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। যাহা হউক, সরল হৃদয় ওছামা কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া হযরতের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্ত্রীলোকটির স্বগোত্রীয়দিগের অনুরোধ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। তাহারা কি বলিতেছেন—এই কথা শুনিবামাত্রই হযরতের বদনমণ্ডলে ভাবান্তরের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন ঃ "ওছামা ! তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডের ব্যতিক্রম করার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছ ?" ওছামার সরল হৃদয় সে গম্ভীর স্বরে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দিশাহারা হইয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন—"হে আল্লাহর রছুল ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

## হযরতের অভিভাষণ

এই সময় একদা অপরাহ্ণকালে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া হযরত একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে যথারীতি আল্লাহর মহিমা কীর্তন করার পর, তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ, তোমাদিগের পূর্ববর্তী বহু জাতি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, বিচার ক্ষেত্রে তাহাদিগের নিরপেক্ষতার অভাবই তাহার অন্যতম কারণ। তখন বিচার ক্ষেত্রে জাতি, কুল ও ধন-সম্পদাদির তারতম্য অনুসারে অপরাধীদিগের দণ্ড সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইত। কুলীন বংশজ ও ধনীদিগের গুরুতর অপরাধের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইত, কিন্তু কোন 'দুর্বল' বা নীচ বংশের লোক অপরাধ করিলে তাহার প্রতি কঠোরতর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। কোন 'শরীফ' বা ভদ্রলোক চুরি করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, আর কোন জঈফ বা দুর্বল লোক সেই অপরাধ করিলে তাহাকে দণ্ডিত করা হইত। কিন্তু সকলে জানিয়া রাখ, ইহা এছলামের আদর্শ নহে, এছলাম এই নির্মম পক্ষপাত সহ্য করিতে পারে না। মোহাম্মদ তাহার প্রাণেশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছে, তাহার কন্যা ফাতেমাও যদি আজ এই অপরাধে লিপ্ত হইত, তাহা হইলে তাহাকেও নির্ধারিত দণ্ডদানে মোহাম্মদ একবিন্দুও কুণ্ঠিত হইত না।"*

হযরত তাঁহার অভিভাষণে পুরাতন জাতিসমূহের অধঃপতনের যে কারণ নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। মানব সমাজ বা তাহার কোন অংশ যদি মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে নিজ নিজ সমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টিকে সমান অধিকারের অধিকারী এবং সমান দায়িত্বের দায়ী করিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় জাতীয় জীবনের উন্মেষ অসম্ভব। পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার, করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তারই মঙ্গল বিধান। বিভিন্ন গোত্র, বিভিন্ন অংশ অথবা বিভিন্ন অবস্থার লোকের পক্ষে তাহা কখনই অসমান হইতে পারে না। যে শাস্ত্রে এবং যে ব্যবস্থায় এই প্রকার তারতম্যের বিধান থাকে, তাহা কখনই স্বর্গীয় আশীর্বাদ লাভ করিতে পারে না—পারে না বলিয়াই, সেই সকল শাস্ত্র বা ব্যবস্থাধীন মানব সমাজ, জাতীয় জীবনের অভাব হেতু দিন দিনই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। জগতের প্রাচীন জাতিসমূহের অধঃপতনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে, সেই সত্যটি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে।

## শরীফ ও রজীল

পৃথিবীতে ইতর-ভদ্র বা শরীফ-রজীল বলিয়া মানুষের—না শয়তানের—তৈরী একটা নির্মম পরিভাষা সর্বত্রই প্রচলিত আছে। পাঠকগণ দেখিতেছেন—হযরত এই সাধারণ পরিভাষা পরিত্যাগপূর্বক, "রজীল" বা "নীচ" শব্দের স্থলে, জঈফ বা দুর্বল বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন। চিন্তাশীল পাঠকগণকে ইহার কারণ বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

---

* বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ, তিরমিজী, নাছাই এবং হাল্বী ৩—১২১ প্রভৃতি

# ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

## হোনেন, আওতাছ ও তায়েফ সমর

## ছকিফ ও হাওয়াজেন জাতির রণসজ্জা

হোদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে হেজাজের বিখ্যাত হাওয়াজেন জাতি নানা কারণে এছলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পূর্বে, পূর্ণ এক বৎসর পর্যন্ত হাওয়াজেন প্রধানগণ আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট গমনপূর্বক তাহাদিগকে হযরতের বিরুদ্ধে উত্থান করার জন্য উত্তেজিত করিতে থাকে। মক্কা বিজয় অভিযানের কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত, হযরত হাওয়াজেন প্রমুখ বিদ্রোহী জাতিসমূহের উত্থানের আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। পাঠকগণ এ-সকল কথার আভাস পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হাওয়াজেন বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত একটি বিরাট গোত্র। তায়েফের মহাশক্তিশালী 'ছকিফ' জাতি এই বিদ্রোহে তাহাদিগের সহিত যোগদান করায় হাওয়াজেনদিগের শক্তি বহুগুণে বর্ধিত হইয়া গিয়াছিল। মক্কার পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে এযাবৎ এছলামের আলোক প্রবেশ করিতে পারে নাই, সুতরাং 'মোহাম্মদ এবং তাঁহার নাস্তিকতা' সম্বন্ধে তাহারা কোরেশ প্রভৃতি জাতির ন্যায় পূর্ব হইতে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছিল। মক্কানগর ও কা'বা মছজিদ কোরেশদিগের অধিকারভুক্ত থাকায় এতদিন এই সকল অঞ্চলের অধিবাসিগণ আপনাদিগকে নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে থাকে, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তাহাদিগের চমক ভাঙ্গিল। বিশেষতঃ তাহারা যখন দেখিল যে, মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের অধিকাংশ গোত্রই স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করিতেছে, তখন তাহাদিগের আশঙ্কা বহুগুণে বর্ধিত হইয়া গেল। এই সকল কারণে হাওয়াজেন ও ছকিফ প্রভৃতি জাতি আর কালবিলম্ব না করিয়া মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। তায়েফের ছকিফ বংশ আর একটি বিশেষ কারণবশতঃ এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। মক্কার ধনী ও মহাজনদিগের বহু ভূসম্পত্তি এবং টাকাকড়ি ও মালপত্র তায়েফ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। পক্ষান্তরে কোরেশ ও ছকিফ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বহুদিন হইতে নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও চলিয়া আসিতেছিল।। মক্কা বিজয়ের পর তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, কোরেশ জাতির সামরিক শক্তি এখন সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন মুষ্টিমেয় ও দূরদেশবাসী মুছলমানদিগকে বিধ্বস্ত ও বিদূরিত করিয়া দিতে পারিলেই, অন্ততঃপক্ষে মক্কানগর এবং অর্ধ-আরবের উপর তাহাদিগের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হইবে, 'মক্কাবাসীদিগের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাহাদিগের করতলগত হইয়া যাইবে।' এই লোভের বশীভূত হইয়া তাহারা এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল।*

এই অভিযানের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, প্রকৃত ব্যাপার অবগত হওয়ার জন্য, আবদুল্লাহ্-এবন-আবিহাদরাদ নামক জনৈক ছাহাবী গুপ্তচররূপে প্রেরিত হন। আবদুল্লাহ্ দুই দিবস পর্যন্ত শত্রুশিবিরে অবস্থান করিয়া হযরতকে সংবাদ দিলেন যে, শত্রুপক্ষ বাস্তবিকই বিরাট আয়োজনসহ প্রস্তুত হইতেছে। দুই-একদিনের মধ্যেই তাহারা যাত্রা করিবে। ইহার পর জনৈক ছাহাবী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, "হাওয়াজেনের সমস্ত গোত্র অসংখ্য সেনার বিরাট বাহিনী লইয়া পর্বতমালার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা নিজেদের স্ত্রী-পুত্রাদি এবং সমস্ত ধন-সম্পদ ও পশুপাল সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইয়াছে।" হযরত হাসিয়া বলিলেন—বেশ কথা। এগুলি আগামীকল্য মুছলমানদিগের হস্তগত হইবে।

## পৌত্তলিকদিগের সাহায্য

শত্রুপক্ষের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহের পর, হযরতও তাহাদিগের গতিরোধ করার জন্য রণসজ্জা করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তাহাদের সঙ্গে অর্থ, রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র

---

* ফতহুলবোলদান ৫৩। মক্কার মোশরেকগণ হাওয়াজেন ও ছকিফ গোত্রের এই অভিযানের সংবাদ পাইয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিল : উহাদিগের অধীন হওয়া অপেক্ষা জনৈক কোরেশের অধীন হইয়া থাকা আমাদিগের পক্ষে সম্মানজনক। এই জন্যই তাহারা স্বধর্মাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল।

অল্পই ছিল। এদিকে সংখ্যায় এবং অস্ত্রশস্ত্রে শত্রুপক্ষ আরবদেশে অতুলনীয়। তাহাদিগের ন্যায় সুনিপুণ ও অব্যর্থ লক্ষ্য তীরন্দাজ হেজাজ প্রদেশে অল্পই ছিল। পক্ষান্তরে সেকালের হিসাবে নানাবিধ 'বৈজ্ঞানিক মারণযন্ত্রও' যে তাহারা সংগ্রহ করিয়াছিল, পাঠকগণ পরে তাহা জানিতে পারিবেন। এ অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র সংগ্রহ না করিয়া যাত্রা করাও সঙ্গত নহে। কাজেই হযরত মক্কার পৌত্তলিকদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে বহুসংখ্যক মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র এবং বহু সহস্র টাকা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। এক আবদুল্লাহ্-এবন-আবিরাবিআর নিকট হইতে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। ছফওয়ান এবন-ওমাইয়া একশত লৌহবর্ম ও তাহার আবশ্যকীয় সাজসরঞ্জাম মুছলমানদিগকে সাময়িকভাবে দান করে।* ছফওয়ান প্রভৃতি 'বহুসংখ্যক পৌত্তলিকও' এই যুদ্ধে হযরতের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল।** স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং স্বদেশবাসীর মঙ্গলবিধানের জন্য, দেশের অমুছলমান জাতিসমূহের সহিত সম্মিলিত হইয়া, একসঙ্গে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই হযরতের জীবনের মহীয়সী শিক্ষা। এইজন্য হিজরতের পরই তিনি মদীনার মুছলমান ও অমুছলমান অধিবাসীদিগকে লইয়া গণতন্ত্র গঠন করেন এবং তাহাতে মুছলমান ও অমুছলমান সকলকেই "এক জাতি" বলিয়া ঘোষণা করেন। এখানেও পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, মক্কার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হযরত পৌত্তলিকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। মুছলমান ও অমুছলমান একসঙ্গে দেশের সাধারণ শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন, একসঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন।

## প্রথম সংঘর্ষ ঃ মুছলমানদিগের ভীষণ পরাজয়

দশ সহস্র মুছলমানকে সঙ্গে লইয়া হযরত মক্কা হইতে যাত্রা করিলেন। মক্কার নবদীক্ষিত মুছলমান এবং অমুছলমান মিলাইয়া আরও দুই হাজার আরব তাঁহার এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। এই অভিযানের সময় মুছলমানগণ নিজেদের সংখ্যা দেখিয়া একটু গর্বিত হইয়াছিলেন,*** এবং সম্ভবতঃ এই গর্বের ফলেই তাঁহারা কতকটা অসতর্কও হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় এই অভিযান হোনেন নামক প্রান্তরের একপ্রান্তে উপস্থিত হইল। শত্রুপক্ষ পূর্ব হইতেই সেখানে প্রস্তুত হইয়া ছিল। পাহাড়ের আবশ্যকীয় ঘাটিগুলি অধিকার করিয়া এবং নিকটবর্তী উপত্যকায় বহুসংখ্যক অব্যর্থ লক্ষ্য তীরন্দাজ সৈন্য বসাইয়া দিয়া তাহারা নিজেদের 'অবস্থা' বেশ মজবুত করিয়া লইয়াছিল। প্রাতঃকালে মোছলেম-বাহিনী অগ্রসর হওয়ার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় হাওয়াজেনের বিরাট বাহিনী প্রচণ্ডবেগে তাহাদিগের উপর আপতিত হইল। নবদীক্ষিত মুছলমান এবং অমুছলমান সৈন্যগণ অত্যুৎসাহাতিশয্যবশতঃ বাহিনীর অগ্রে অগ্রে যাত্রা করিতেছিল। তাহাদিগের অনেকের নিকট আবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। ইহা ব্যতীত মক্কার পৌত্তলিক ও নবদীক্ষিত মুছলমানদিগের মধ্যে কয়েকজন লোক পূর্ব হইতে দুরভিসন্ধি পাকাইয়া এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। মোটের উপর এই সকল কারণে শত্রুপক্ষের প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, অগ্রবর্তী সেনাদল মুখ ফিরাইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মুছলমানগণ সামলাইয়া লইয়া শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অগ্রবর্তী সৈন্যদলের এই ঘৃণিত পলায়নের জন্য তখন এমনই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাদিগের সে চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হইল না। পলায়নপর সৈন্যদিগের উপর একদিকে সহস্র সহস্র অশ্বসাদী সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণ, তাহার উপর উপত্যকা ও পার্শ্ববর্তী গিরিসঙ্কট হইতে সুনিপুণ শত্রুসেনার সম্মিলিত বাণবৃষ্টি। ছহী হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাওয়াজেন বংশের লোকেরা বাণবর্ষণে অদ্বিতীয় বলিয়া কথিত হইত। তাহারা সেনাপতির ইঙ্গিতক্রমে সকলে একই সময় তীর নিক্ষেপ করিত। যুদ্ধক্ষেত্রে এক একবার

---

* মোছনাদ ৪—৩৬। মোয়াত্তা, আবু-দাউদ, নাছায়ী প্রভৃতি।

** বোখারী, ফৎহুলবারী—হোনেন। এছাবা ২—১০৮, তাবরী ৩—১২৭, হলবী ৩—১২৩ প্রভৃতি।

*** কোরআন, তওবা, ৪ রুকু।

মনে হইতেছিল, যেন পঙ্গপালে সমস্ত আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক, মোছলেম সেনাপতিগণের এ চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ সহস্র মোছলেম সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এমন কি, এ সময় একশত মুছলমানের অধিক রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন নাই। মুছলমানগণ সামলাইয়া লইয়া একবার শত্রুপক্ষকে বহুদূর হটাইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, তাহারা নিজেদের রসদপত্র ও রণসম্ভার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। মুছলমানগণ তাহাদের Tacticks বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ঐ সকল মালপত্র সংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। শত্রুসৈন্যের একটি 'কলম' পার্শ্ববর্তী গিরিসঙ্কটে লুক্কায়িত থাকিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। এখন তাহারা ঐ সকল গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মোছলেম-বাহিনীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিয়া দিল। এদিকে পলায়নের ভান করিয়া যে সকল শত্রুসেনা হটিয়া গিয়াছিল, তাহারাও ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং তীব্রতর বেগে মুছলমানদিগের উপর আপতিত হইল। এই আক্রমণের বেগ সহ্য করা মুছলমানদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহারা সকলে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন।

## মোস্তফার অসাধারণ দৃঢ়তা

এই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে পতিত হইয়াও হযরত এক মুহূর্তের জন্য বিচলিত হন নাই। এই সময় তিনি নিজের শ্বেত অশ্বতরের উপর আরোহণ করিয়া মুছলমানদিগকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিতে লাগিলেন কিন্তু সে বিশৃঙ্খলা এবং কোলাহলের মধ্যে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না, দুই-একজন ব্যতীত আর সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। এই সময়কার অবস্থা ইমাম বোখারী তাঁহার পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে এবং ইমাম মোছলেম হোনেন সমর প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবাগণের প্রমুখাৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থেও এ সম্বন্ধে বহু বিশুদ্ধ রেওয়ায়াৎ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল হাদীছ ও রেওয়ায়াতের সার এই যে, এইরূপে মুছলমানগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে হযরতের মুখে একটুও চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ পাইল না। এই সময় আব্বাছ হযরতের অশ্বতরের লাগাম এবং আবু-সুফিয়ান তাঁহার পালানের রেকাব ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। মাত্র আর দুই-তিন জন মুছলমান তাঁহার পার্শ্বে তিষ্ঠিয়া ছিলেন। এমন সময় বহু শত্রু-সৈনা চারিদিক হইতে হযরতকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। এহেন ঘোরতর বিপদের সময় হযরতের মুখে একটুও ত্রাসের ভাব দেখা গেল না।

দ্বাদশ সহস্র আত্মোৎসর্গী সৈন্য চক্ষের পলকে উধাও হইয়া গিয়াছে, অগণিত শত্রুসৈন্য উলঙ্গ তরবারি হস্তে আক্রমণ করিতে ওৎ পাতিতেছে, সেদিকে তাঁহার একটুও লক্ষ্য নাই এই সময় হযরত অশ্বতর হইতে অবতরণ করিলেন এবং নতজানু হইয়া নিজের সেই পরমজনের নিকট সাহায্য ও শক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর পুনরায় অশ্বতরে আরোহণ করিয়া অগণিত শত্রুসেনার উপর আক্রমণ করার জন্য তিনি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। এই সময় মহামতি আব্বাছ ও আবু-সুফিয়ান পূর্বকথিত রূপে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে হযরত দৃঢ়কণ্ঠে ও গুরুগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন ঃ

انا النبي لا كذب    انا ابن عبد المطلب

"আমি সত্যের বাহক, আমাতে মিথ্যার লেশমাত্র নাই, আমি আবদুল মোত্তালেবের সন্তান।" অর্থাৎ তোমরা সকলে আমাকে জানিতেছ—মানুষের ভরসায় আমি আসি নাই এবং মানুষের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি বিচলিতও হই নাই। যে সত্যময় সর্বশক্তিমান আমাকে তাঁহার মহাসত্যের সেবকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাকে ধ্বংস হইতে দিবেন না। এই বলিয়া হযরত অগ্রসর হইলেন। বীরত্ব ও বিশ্বাসের প্রভাবে হযরতের বদনমণ্ডল তখন স্বর্গের নূরে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া এবং এই তেজদৃপ্ত ঘোষণাবাণী শ্রবণ করিয়া শত্রুসৈন্যগণ যেন বিহ্বল ও বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কতিপয় আক্রমণকারী একেবারে হযরতের নিকটবর্তী হইয়াছিল। করুণানিধান মোস্তফা এখনও তাহাদিগের উপর অস্ত্র চালাইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি একমুষ্টি ধূলামাটি তুলিয়া লইয়া আল্লাহর নাম করতঃ তাহাদিগের চোখে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহারা চোখ মুছিতে মুছিতে পিছু হটিয়া গেল।

## অবস্থার পরিবর্তন

বিক্ষিপ্ত মোছলেম বীরগণের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিকটে ছিলেন, হযরতের গতিবিধি লক্ষ করিয়া তাঁহারা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অন্যান্যেও সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ছত্রভঙ্গ ও কেন্দ্রচ্যুত হইয়া যাওয়ায় সকলে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোনদিকে গেলে যে তাঁহারা আবার একেকেন্দ্রে সমবেত হইতে পারেন তাহা স্থির করিবারও উপায় ছিল না। এই সময় মহামতি আব্বাছ একটি উচ্চস্থানে আরোহণপূর্বক তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে মুছলমানদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন—"হে আনছার বীরগণ! হে শাজরার নীচে বায়আৎ গ্রহণকারিগণ! হে মোহাজের বীরবৃন্দ! হে মোহাজেরগণ! কোথায় তোমরা? এই দিকে ছুটিয়া আইস।" কেন্দ্রের সন্ধানলাভের জন্য মুছলমানগণ পূর্ব হইতে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন; আব্বাছের আকুল আহ্বানধ্বনি সমুত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমরক্ষেত্রের দিকে দিকে তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল—"ইয়া লাব্বায়েক! ইয়া লাব্বায়েক!"—এই যে, হাজির, হাজির! আব্বাছ বলিতেছেন—সদ্যপ্রসূত গাভী যেমন স্বীয় বৎসের বিপদ দর্শনে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসে, আমার আহ্বান শ্রবণ করিয়া মুছলমানগণ সেইরূপ ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। তখন ভূলুণ্ঠিত জাতীয় পতাকাগুলি আবার তুলিয়া ধরা হইল এবং বিচ্ছিন্ন মোছলেম-বাহিনী অল্প সময়ের মধ্যে আবার হযরতের পদপ্রান্তে সমবেত হইয়া অবিলম্বে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিয়া দিল। এই সময় হযরত আর একমুষ্টি কঙ্কর তুলিয়া তাহা শত্রুদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"শত্রু পরাস্ত, অগ্রসর হও!" তখন মুছলমানগণ প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। হাওয়াজেন ও ছকিফের সুনিপুণ, সুসজ্জিত এবং সুশিক্ষিত সৈন্যগণ মুছলমানদিগের গতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু মুছলমানদিগের তরবারির সম্মুখে তাহারা অধিকক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারিল না। স্ত্রী-পুত্র, রমণীহার ও সমস্ত ধন-দৌলত যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়াই তাহারা ইতস্ততঃ পলাইয়া গেল।*

## আওতাছ অভিযান

পলায়নের পর শত্রুপক্ষের কতক সৈন্য আওতাছ নামক স্থানে সমবেত হইল, অবশিষ্ট সৈন্যগণ তায়েফে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। দোরেদ নামক জনৈক বিখ্যাত, বহুদর্শী ও প্রাচীন সেনাপতি আওতাছে সমবেত সৈন্যদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল এবং মুছলমানদিগের অগ্রগতিতে বাধা দিবার জন্য এই সৈন্যদল লইয়া সে সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। হযরত, আবু-আমের আশআরী নামক ছাহাবীকে একটি নাতিবৃহৎ সেনাদলসহ আওতাছ অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। উভয় সৈন্যদলে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোরেদের পুত্র আসিয়া আবু-আমেরকে আক্রমণ করে। ফলে আবু-আমের নিহত হন এবং দোরেদের পুত্র তাঁহার হাত হইতে পতাকা ছিনাইয়া লয়। স্বনামখ্যাত আবু-মুছা আশআরী এই সময় অশেষ বীরত্ব সহকারে তাহাকে নিহত করেন এবং পতাকাটি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। সেনাপতি দোরেদও এই যুদ্ধে নিহত হয় এবং শত্রুপক্ষ ইহার পর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। মোছলেম সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি আবু-আমের মৃত্যুর সময় ভ্রাতুষ্পুত্র আবু-মুছাকে সেনাপতি পদে মনোনীত করেন এবং তাঁহাকে অছিয়ৎ করিয়া বলেন, "বৎস! হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আমার ছালাম নিবেদন করিবা, আর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুরোধ জানাইবা।" বলা বাহুল্য যে, এই সংবাদ শ্রবণমাত্রই হযরত দুই বাহু তুলিয়া আবু-আমেরের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।**

## তায়েফ অবরোধ

তায়েফ ছকিফ জাতির আবাসভূমি, পাঠকগণ ইহা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। হাওয়াজেন ও ছকিফের পলাতক সৈন্যদলের অধিকাংশই এখন তায়েফে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

---

* বোখারী—হোনায়েন ও তায়েফ, মোছলেম ১—১০১, এবনে-হেশাম ৩—১০, তাবরী ৩—১৩৫, জোরকানী ৩—১০১, উয়ুনুল আছার ২—২১১, ফৎহুলবারী এবং অন্যান্য হাদিছ ও ইতিহাস গ্রন্থ

** বোখারী ২—৩১, মোছলেম ২—২৯৯ প্রভৃতি।

তায়েফ দৃঢ় দুর্গমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সকল হিসাবে বিশেষ সুরক্ষিত স্থান। তাহার উপর তায়েফের প্রধানগণ এক বৎসর হইতে এই দুর্গগুলির সংস্কার করিয়া দীর্ঘকালের আহার ও পানোপযোগী রসদাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুর্গমালার তোরণে তোরণে, গুরুভার প্রস্তর এবং উত্তপ্ত লৌহখণ্ডাদি নিক্ষেপ করার জন্য নানা প্রকার মারণযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। ফলে তাহাদিগের উদ্যোগ-আয়োজনের কোনই ত্রুটি ছিল না।

হযরত কালবিলম্ব না করিয়া মোছলেম-বাহিনী সমভিব্যাহারে তায়েফে উপনীত হইলেন এবং তাহার দীর্ঘ দুর্গমালা অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। প্রায় তিন সপ্তাহকাল অবরোধ রক্ষা করা হইল, কিন্তু দুর্গ প্রবেশের বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই। এই অবরোধের পূর্বাপর অবস্থা সম্যকরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইবে যে, ভয় দেখাইয়া তায়েফবাসীদিগকে ভাবী বিদ্রোহাচরণ হইতে নিবারিত করাই হযরতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। নচেৎ খায়বার বিজয়ী মোছলেম বীরগণের পক্ষে এই দুর্গটি অধিকার করিয়া লওয়া কখনই অসাধ্য হইত না। যাহা হউক, একদিন হযরত ছাহাবাগণকে শুনাইয়া বলিলেন যে, আগামীকল্য আমরা এখান হইতে যাত্রা করিব বলিয়া মনে করিতেছি। এই যাত্রা করার কথা শুনিয়া একদল ছাহাবা ঘোর অমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের এই অন্যায় স্পর্ধা ও নীচ দুরভিসন্ধির সমুচিত দণ্ড প্রদান না করিলে এবং ছকিফ ও হাওয়াজেন জাতিকে উত্তমরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া না দিলে, দুই দিন পরে ইহারা আবার মদীনার ইহুদীদিগের ন্যায় ভীষণতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে,—মক্কার মুছলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। এই সকল ভাবিয়া তাঁহারা অবরোধ ত্যাগের প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে অনেকে আবার দুর্গ আক্রমণের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল আলোচনা শুনিয়া হযরত নিজের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। পরদিন মুছলমানগণ একটু উত্তেজিতভাবেই দুর্গমালার পাদদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং দুর্গের নিকটবর্তী হইয়া পড়ায় সেদিন দুর্গ হইতে নিক্ষিপ্ত তীর, প্রস্তর ও গুলী-গোলার আঘাতে তাঁহাদিগের বহু সৈন্য আহত হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার সময়, সকলে বিশ্রামলাভ করার পর, হযরত আবার বলিলেন—আগামীকল্য আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইব বলিয়া মনে করিতেছি। এদিন কিন্তু যাত্রার কথা শুনিয়া কেহ কোন প্রকার অমত প্রকাশ করিলেন না, বরং অনেকেই এই প্রস্তাবের সমর্থনই করিলেন। একদিনের অভিজ্ঞতার ফলে ভক্তগণের এই মত পরিবর্তন হইয়াছিল। হযরত তাহাদিগের এই হঠাৎ পরিবর্তন দর্শনে হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না।* হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, অবরোধ ত্যাগের সময় একদল লোক হযরতকে শত্রুদিগের প্রতি 'বদদোওয়া' করিতে অনুরোধ করায় তিনি দুই হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন ঃ "হে আল্লাহ, ছকিফকে সুমতি দান কর, তাহাদিগকে আমার সহিত সম্মিলিত করিয়া দাও !!"

## বন্দী ও ধন-সম্পদ

শত্রুপক্ষের সমস্ত বন্দী এবং তাহাদিগের যাবতীয় ধন-সম্পদ এতদিন মক্কার নিকটবর্তী জা'রানা নামক স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পরেও হযরত দুই সপ্তাহকাল হাওয়াজেনদিগের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু এত অপেক্ষার পরও তাহারা যখন উপস্থিত হইল না, তখন অগত্যা তাহাদিগের পশুপাল প্রভৃতি মুছলমানদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। বন্টনের পূর্বে মোস্তফা সমীপে উপস্থিত হইলে, ইহাদিগের সমস্ত বন্দী ত বিনা ক্ষতিপূরণে মুক্তি পাইতই, অধিকন্তু ইহারা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পত্তিও ফিরাইয়া পাইতে পারিত।

দুই সপ্তাহ পরে হাওয়াজেন জাতির কতিপয় গণ্যমান্য নেতা হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ঃ মোহাম্মদ ! আজ আমরা তোমার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আমাদিগের অপরাধ ও অত্যাচারের দিকে তাকাইও না। হে আমাদের বংশ, হে

* বোখারী, মোছলেম এবং তাবরী প্রভৃতি।

আরবের সাধু ! নিজ গুণে আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। আমরা বড় বিপদে পড়িয়াই উদ্ধারের জন্য তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি !

শত্রুদিগের এই দুর্দশা এবং তাহাদিগের এই অসাধারণ ক্ষতি দেখিয়া হযরত প্রথম হইতেই অপরিসীম বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। হাওয়াজেন প্রতিনিধিগণের কাতর প্রার্থনা শ্রবণে সে করুণা-সাগরে উদ্বেল উপস্থিত হইল। তাহাদিগের অবহেলার ফলে* ধন-সম্পত্তিগুলি সমস্তই বণ্টিত হইয়া গিয়াছে। এখন বাকী আছে বন্দী দল। হাওয়াজেনদিগের স্ত্রী-পুত্র ও সন্তানাদি ছয় হাজার নরনারী এখন বন্দী বা দাসরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহাদিগকে বিনা ক্ষতিপূরণে মুক্তি দিতে কেহ সহজে স্বীকার করিবে না, অথচ বুদ্ধির দোষে ও কর্মফলে তাহারা আজ সর্বস্বহারা হইয়া বসিয়াছে। এইভাবে সকল দিক ভাবিয়া হযরত প্রতিনিধিদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তোমাদিগের জন্য আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছি, ধন-সম্পদ ফেরত পাওয়ার এখন আর কোন উপায় নাই। বন্দীদিগের মুক্তির উপায় নির্ধারণ সম্বন্ধে আমিও চিন্তিত আছি। আমার ও আমার স্বগোত্রীয়দিগের অধিকারভুক্ত বন্দীদিগকে বিনা পণে মুক্তি দিবার ভার আমি গ্রহণ করিতে পারি। তবে অন্যান্য মুছলমান ও অমুছলমানদিগের অংশ সম্বন্ধে আমি এখন জোর করিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছি না। তোমরা নামাযের সময় মছজিদে উপস্থিত হইবা এবং নামায অন্তে সকলকে নিজেদের প্রার্থনা জানাইবা। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা তখনই বলিব।

হযরতের উপদেশ মতে হাওয়াজেন প্রতিনিধিগণ মছজিদে উপস্থিত হইলেন এবং নামায অন্তে সকলের নিকট কাতর কণ্ঠে বন্দীদিগের মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রতিনিধিগণের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর হযরত সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন : 'তোমাদিগের এই ভাইগুলি অনুতপ্ত হৃদয়ে তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দীদিগের মুক্তির প্রার্থনা করিতেছে। আমি এ সম্বন্ধে সকলের মতামত জানিতে চাই। তবে তাহার পূর্বে আমি বলিয়া দিতেছি যে, আব্দুল-মোত্তালেব গোত্রের প্রাপ্য সমস্ত বন্দীকেই আমি বিনা পণে মুক্তি দিয়াছি।' হযরতের এই উক্তি শুনিয়া মোহাজের ও আনছার দলপতিগণ পরমানন্দ সহকারে তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিলেন—সকলেই নিজ নিজ প্রাপ্যাংশ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কেবল দুই-একজন অমুছলমান গোত্রপতি বিনা পণে আপনাদের দাবী পরিত্যাগ করিতে অমত প্রকাশ করিলেন। হযরত ইহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "তোমাদিগের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের জন্য আমিই দায়ী রহিলাম। প্রথম সুযোগেই ঐ ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব।" এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই ছয় হাজার নরনারী ও বালক-বালিকা এক কপর্দক ক্ষতিপূরণ না দিয়াও মুক্তিলাভ করিল। যাইবার সময় হযরত বন্দীদিগের প্রত্যেককে নূতন বস্ত্র পরাইয়া বিদায় করিলেন।**

## আনছারগণের পরীক্ষা

এই যুদ্ধে হাওয়াজেন জাতির প্রায় সমস্ত ধন-সম্পদ মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। হযরত এগুলি কোরেশদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন, আনছারদিগকে ইহার কোন অংশই দেওয়া হইল না। মদীনার মোনাফেক দল মুছলমানদিগের, বিশেষতঃ আনছার ও মোহাজেরগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিবার জন্য সর্বদা যেরূপ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, পাঠকগণ পূর্বে তাহা অবগত হইয়াছেন। এক্ষেত্রেও তাহারা কয়েকজন অদূরদর্শী আনছার যুবককে কুমন্ত্রণা দিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তাহারা এই বণ্টনের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। আবার একদল আনছারের মনে হইতে লাগিল যে, এখন হয়ত হযরত স্বদেশে অবস্থান করিবেন, আমরা হয়ত অতঃপর আর তাঁহার সেবা করার সুযোগ পাইব না। এই সকল আলোচনার কথা যথাসময়ে হযরতের কর্ণগোচর হইল। তিনি তখন সমস্ত আনছার যুবককে

* ঠিক অবহেলা নহে, একদিন হোনায়েন যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তাহাদিগের অবকাশ হয় নাই।

** বোখারী ও ফৎহুলবারী ৮—২৫, এবনে-হেশাম ২—২৭, তবকাত ২—১১১, কামেল ২—১০৩, হলবী, যারকানী প্রভৃতি।

একত্র সমবেত করিয়া এই আলোচনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। হযরতের কথা শুনিয়া আনছার প্রধানগণ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, আমাদিগের দুই-এক জন যুবক এইরূপ কথা বলিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্য কেহই কোন কথা বলে নাই। হযরত তখন ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, কোরেশগণ নবদীক্ষিত, বিশেষতঃ তাহারা এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমি এই ব্যবস্থা করিয়াছি। যাহা হউক, আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা কি ইহাতেই সন্তুষ্ট নহ যে—লোক ছাগল-ভেড়া লইয়া বাড়ী যাইতেছে, আর তোমরা আল্লাহর রছুলকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছ ? আনছারগণ তখন সানুনয়ে ও ভক্তি গদগদ কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—প্রভু হে ! এই অজ্ঞান যুবকগুলির কথায় কর্ণপাত করিবেন না। আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে পাইয়া, আপনার সেবা করিয়াই আমরা পরিতৃপ্ত এবং কৃতার্থ হইয়াছি। আমরা যেন এই পরম সম্পদ হইতে বঞ্চিত না হই ! হযরত তখন আনছারদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, জীবনে মরণে আনছারদিগের সহিত কখনই তাঁহার বিচ্ছেদ হইবে না।

## ঐতিহাসিক গল্প-গুজব

কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরতের "দুধভগ্নী" শায়মাও এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। বন্দী হওয়ার পর তিনি নিজের পরিচয় দিলে ছাহাবাগণ তাঁহাকে হযরতের নিকট উপস্থিত করিলেন। হযরতের প্রশ্নের উত্তরে শায়মা নিজের পরিচয় দিবার সময় বলিলেন যে, শৈশবে আপনি আমার পিঠ কামড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি হযরতকে সেই কামড়ের দাগ দেখাইলেন। খ্রীষ্টান লেখকগণ এই দাগটাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, রেওয়ায়তের হিসাবে এই বর্ণনাটির কোনই মূল্য নাই। পক্ষান্তরে দেরায়তের হিসাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেও এই গল্পটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। ঊর্ধ্বপক্ষে চার বা পাঁচ বৎসরের একটি শিশু, একটি যুবতী স্ত্রীলোকের পিঠ এমন জোরে কামড়াইয়া দিল যে, অর্ধ-শতাব্দী পরেও সে কামড়ের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই—পাগলেও এরূপ কথা বিশ্বাস করিতে পারে না।

গনিমতের মাল বিতরণ করার সময় বহু সহস্র লোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। অর্ধ-লক্ষের অধিক উট, ছাগল প্রভৃতি পশু সেখানে উপস্থিত করা হয়। এই প্রকার ভিড়ে অল্পবিস্তর বিশৃঙ্খলা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই বণ্টনের সময় কতকগুলি ব্যস্ত লোক নিজেদের প্রাপ্য উটগুলি গোছাইয়া লওয়ার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে থাকে। কাজের ব্যবস্থা করার জন্য হযরত এই ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া একটা বৃক্ষছায়ায় উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে সকলকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এই সময় হযরতের উত্তরীয়খানি তাঁহার স্কন্ধদেশ হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি নিকটস্থ লোকদিগকে তাহা তুলিয়া দিতে বলেন। এই সামান্য ঘটনাটিকে খ্রীষ্টান লেখকগণ ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া দেখাইতে যত্নবান হইয়াছেন। স্যার উইলিয়ম ইহাতে রং ফলাইয়া বলিতেছেন ঃ "Mohammad is mobed on account of booty"—So rudely did they jostle, that he was driven to seek refuge under a tree, with his mantle torn from his shoulders...... extricating himself with some difficulty from the crush." এবন-এছহাকের মূল বর্ণনার উপর লেখক মহাশয় কিরূপ জঘন্যভাবে রং চড়াইয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করিয়াছেন, অভিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। লেখক হযরতের মহিমাব্যঞ্জক বিশুদ্ধতম হাদিছগুলি পরিত্যাগ করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু এই বিবরণটি এবন-এছহাকের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইলেও এবং তিনি পূর্ববর্তী কোন রাবীর নামগন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ না করিলেও, লেখক এই রেওয়ায়তটি গ্রহণ করিতে একবিন্দুও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

তায়েফবাসিগণ তাহাদিগের সুরক্ষিত দুর্গতোরণ হইতে 'প্রজ্বলিত লৌহশলাকা' নিক্ষেপ করিয়া মুছলমানদিগকে ধ্বংস করিতেছিল। সম্মুখে দ্রাক্ষাকাননগুলি অবস্থিত থাকায় মুছলমানগণ এতদসম্বন্ধে সাবধান হওয়ার সুযোগ পাইতেছিল না। ফলে কতিপয় ছাহাবীকে এই 'যন্ত্রচালিত প্রজ্বলিত লৌহখণ্ড' বা তৎকালীন তোপের গোলার আঘাতে প্রাণ হারাইতে হয়। অতঃপর হযরত দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলি কাটিয়া ফেলার আদেশ দিলে কতকগুলি লোক তাহা কাটিতে আরম্ভ করেন। এমন সময় শত্রুপক্ষের দূত আসিয়া নিবেদন করিল : মোহাম্মদ ! তোমার শত্রুগণ আল্লাহর নামে, দয়ার নামে প্রার্থনা করিতেছে যে, দ্রাক্ষকুঞ্জগুলি যেন ধ্বংস করা না হয় । হযরত বলিলেন—তথাস্তু । আমিও আল্লাহর নামে ও দয়ার নামে এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম !! প্রেম, করুণা ও উদারতার এই স্বর্গীয় চিত্রকেও কতিপয় খ্রীষ্টান লেখক কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই !

### হযরতের পুত্রবিয়োগ ও তাওহীদ শিক্ষা

হযরতের শিশু পুত্র এবরাহিম পরলোক গমন করেন। হযরত ইহাতে যথেষ্ট শোক পাইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে এবরাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্য গ্রহণ লাগে। ইহাতে জনসাধারণ বলাবলি করিতে থাকে যে, মহাপুরুষের পুত্রবিয়োগ ঘটায় এই প্রাকৃতিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। লোকদিগের এই অন্ধ বিশ্বাসের কথা শ্রবণ করিয়া, হযরত জনসাধারণের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়া সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, "চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুইটি নিদর্শন মাত্র। কাহারও জন্মগ্রহণে বা পরলোকগমনে উহাতে গ্রহণ লাগিতে পারে না। এইরূপ গ্রহণ উপস্থিত হইলে এই কুদরতের কাদের এবং নিদর্শনের মালেককে স্মরণ করিবা—তাঁহার পূজা উপাসনায় লিপ্ত হইবা।"* অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ করার কোন সুযোগই হযরত পরিত্যাগ করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, দুনিয়ার পুঞ্জীভূত অন্ধ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করতঃ মানব সমাজকে জ্ঞানের পুণ্য আভায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলাই এছলামের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকালকার দিনে অনেকে নিজেদের মিথ্যা কেরামত প্রচার করার জন্য যথাবিধি 'এজেন্ট' নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আবার একশ্রেণীর পীর-ফকীর এরূপ আছেন—যাঁহারা নিজেরাই ইচ্ছাপূর্বক নিজেদের কোন প্রকার কেরামত ও বুজরুকির কথা প্রচার করেন না বটে, কিন্তু অজ্ঞ জনসাধারণ অথবা স্বার্থপর গ্রাম্য মোল্লাগণকে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নানাবিধ আজগুবী কেরামতের কথা প্রচার করিতে দেখিয়াও, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন না। আমরা হযরতের এই আদর্শের প্রতি এই শ্রেণীর আলেম ও পীর ছাহেবদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

## চতুঃসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

### নবম হিজরী—সত্যের জয়জয়কার

অষ্টম হিজরীর শেষ মাস পর্যন্ত তায়েফবাসীদিগের বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত থাকিয়া হযরত মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং নূতন ও পুরাতন ভক্তবৃন্দকে এছলামের শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমুছলমান আরব গোত্রগুলিকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করার জন্য দেশের চারিদিকে প্রচারক দল প্রেরণ করা হইতে লাগিল। ক্ষেত্র পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল,—মহিমাময় মোস্তফার স্বর্গীয় চরিত্র-প্রভাবে এবং তাঁহার প্রচারিত সত্যের মহিমায় জনসাধারণ আকৃষ্ট ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এতদিনে হযরতের পরীক্ষার পুরস্কার এবং তাঁহার সাধনার সিদ্ধি, স্বর্গের আশীর্বাদে অভিষিক্ত ও পূর্ণ পরিণতরূপে উজ্জ্বল হইয়া আসিল—আরবের দিকে দিকে মোস্তফার মহিমবাণী অদ্ভুত হইয়া উঠিল, তাওহীদের মঙ্গল-আরাবে সমগ্র আরব উপদ্বীপ মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

---

* বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি—খছুফের নামাজ অধ্যায়।

এই সময় তাবুক অভিযানের জন্য হযরতকে কিছুদিন মদীনার বাহিরে অবস্থান করিতে হয়। ঐতিহাসিক পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমরা প্রথমে তাবুক অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব এবং ৯ম হিজরীর সাফল্যের সমস্ত বিবরণ তাহার পর একসঙ্গে বর্ণনা করিব।

## তাবুক অভিযান—অভিযানের কারণ

রোম সম্রাটগণ যে, বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে আরবদেশকে নিজেদের পদানত করার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, রোমের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। খীস্টখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব হইতে, এই চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল। এই সময় সম্রাট আগস্টাসের উৎসাহে ও সাহায্যে এগাস্ গ্যালস নামক তাঁহার (পারস্য দেশের) জনৈক শাসনকর্তা একটা বিরাট বাহিনী সঙ্গে লইয়া আরব বিজয়ে বহির্গত হন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, গ্রীষ্ম, অন্নাভাব ও মারাত্মক পীড়ার প্রকোপে এবং দেশবাসিগণের বীরবিক্রমের ফলে এই বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ধ্বংসমুখে পতিত হয় এবং ছয় মাস চেষ্টার পর সেনাপতি গ্যালস বিধ্বস্ত ও বিফল মনোরথ হইয়া আলেকজেন্দ্রিয়ায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।* খীস্টখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব হইতেই হযরতের জন্ম সন অর্থাৎ আবরাহার আক্রমণ পর্যন্ত এই চেষ্টা সমানভাবে চলিয়া আসিতেছিল।

'মূতা' অভিযানের বিবরণে পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে, তৎকালীন কায়সারও মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এই যুদ্ধে মুছলমানদিগের সাহস, বীরত্ব এবং ঈমানের বল দেখিয়া শত্রুপক্ষ স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা নিজেদের সংকল্প এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করে নাই। বরং এই অপমান ও অকৃতকার্যতার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য তাহারা অতঃপর দ্বিগুণ উত্তেজনার সহিত মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এমন কি, এই আক্রমণ ভয়ে মদীনার মুছলমানগণ সর্বদাই সশঙ্ক অবস্থায় অবস্থান করিতেন।**

রজব মাসের প্রথম ভাগে মদীনায় সংবাদ পৌঁছিল যে, রোমরাজ কায়সার মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সিরিয়া হইতে সমাগত বণিকগণ এই সংবাদের সমর্থন করিলেন। তাঁহাদিগের মুখে আরো জানা গেল যে, লাখম, জোজাম, গচ্ছান প্রভৃতি খ্রীষ্টান আরবগণ, নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া রোমীয় বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়াছে। রোম সম্রাট এজন্য পূর্ণ এক বৎসরের রসদভাণ্ডার ও রসদাদি সঙ্গে লইয়াছেন, সৈন্যদিগকে এক বৎসরের বেতন অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। ইহার অল্পদিন পরেই মুছলমানগণ জানিতে পারিলেন যে, রোমের বিরাট বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য যাত্রা করিয়াছে, তাহাদিগের অগ্রবর্তী সৈন্যদল 'বালকা' পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।***

আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ এই পর্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু বহু হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে,—"আরবের খ্রীষ্টানগণ রোমরাজকে লিখিয়া পাঠায় যে, আরবের যে লোকটি নবী হওয়ার দাবী করিতেছিল, সে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—অজন্মা ও মন্বন্তরের ফলে তাহাদিগের সমস্ত ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, উদ্যোগ-আয়োজনে আর কালক্ষেপ না করিয়া অচিরে মদীনা আক্রমণ করা উচিত। "এই পত্র পাওয়ার পর, সম্রাট কোবাদ নামক সেনাপতির অধীনে চল্লিশ হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী মদীনা অভিমুখে প্রেরণ করেন।"**** ইহা ব্যতীত আরবের খ্রীষ্টান জাতিসমূহ যে এই বাহিনীর সহিত যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এই সকল সংবাদ মদীনায় পৌঁছিলে মুছলমানদিগের দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। বাইজেন্টীয় বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের এবং আরবের

---

* Historians History of the World, 8—11, Ency, Britannica 11 edn. 2—426.

** বোখারী—ইলা।     *** তাবরী, তবকাত, এবন-হেশাম প্রভৃতি—তাবুক প্রসঙ্গ।

**** তিরমিজী, হাকেম, তাবরানী—ফৎহুলবারী ৮—৭৬, মাওয়াহেব প্রভৃতি

সহস্র সহস্র খৃষ্টান তাহাতে যোগদান করিলে, পৌত্তলিক আরবগণও সেই সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে। ইহা ব্যতীত কপট-মুছলমানদিগের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি লাগিয়াই ছিল। সর্বপ্রধান বিপদ—হেজাজের অজন্মাজনিত দারুণ অভাব। একে এই অভাবের জন্য হেজাজের অবস্থা এমনিতে সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপর রৌদ্র ও গ্রীষ্মের ভীষণ প্রকোপ এবং পান করিবার পানির দারুণ অভাবে দেশবাসী পূর্ব হইতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় রোমরাজের প্রস্তুতির সংবাদ মদীনায় পৌঁছিল।

হজরত অন্যান্য সমর সম্বন্ধীয় গতিবিধি ও সঙ্কল্পাদির কথা প্রায়ই জনসাধারণকে জানিতে দিতেন না। কিন্তু অবস্থার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবার তিনি রোমীয় অভিযানের সংবাদ মুছলমানদিগকে পূর্বাহ্ণেই জানাইয়া দিয়াছেন। রোমের অগ্রবর্তী সেনাদল 'বালকা' অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া হজরত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মোছলেম-হেজাজের প্রান্তে প্রান্তে জেহাদ ঘোষণা করিয়া, সকলকে স্বধর্ম, স্বজাতি ও স্বদেশের স্বাধীনতা এবং স্বজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যথাসর্বস্বপণে প্রস্তুত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। সকলে শুনিল রছুলুল্লাহের আদেশ, মদীনা হইতে চারি শত মাইল দূরবর্তী শামদেশের সীমান্তে যাইয়া শত্রু-সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করিতে হইবে।

প্রভুর এই আদেশবাণী প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেজাজের মোছলেম কেন্দ্রগুলির মধ্যে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের ত কথাই নাই, মক্কার বহু নবদীক্ষিত মুছলমানও অস্ত্রশস্ত্রসহ মদীনার দিকে ছুটিলেন, আরবের বেদুঈন গোত্রের বহু দুর্ধর্ষ যোদ্ধাও এই ধর্ম-সমরে যোগদান করিল। ছোফ্‌ফার সেই অনাহারী সাধকগণ এখন কোমর বাঁধিয়া কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, অবস্থাপন্ন মুছলমানগণ এই আল্লাহওয়ালা ফকীরদিগের যানবাহন ও পাথেয়াদির ব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিলেন।* দেখিতে দেখিতে চল্লিশ সহস্র মোজাহেদিনের এক মহাশক্তিশালী জমাআত মদীনার প্রান্তরে সমবেত হইয়া গেল।

কপটগণ নানাপ্রকার ওজর-আপত্তি তুলিয়া নিজেরা ত মদীনায় থাকিয়াই গেল—পক্ষান্তরে মন্বন্তর, অনাবৃষ্টি, রৌদ্রতাপ, মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী মরুভূমির দুর্গমতা, রোমবাহিনীর অজেয়তা, গচ্ছান, জোজাম প্রভৃতি খৃষ্টান জাতিসমূহের ধনবল, জনবল এবং অস্ত্রশস্ত্রের গল্প ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া মুছলমানদিগের মধ্যে দুর্বলতা আনিয়া দিবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। একদল মুছলমান প্রথমাবস্থায় ইহাদিগের কুহকে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু অচিরাৎ তাঁহারা সামলাইয়া লন এবং পূর্ণ উৎসাহের সহিত মোজাহেদগণের কাফেলায় যোগদান করেন। কা'ব প্রভৃতি মাত্র তিনজন মুছলমান "গয়ংগচ্ছ" করিতে করিতে মদীনায় রহিয়া যান। ইহাদিগের ঘটনার বিবরণ কোরআন ও হাদীছে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।**

চল্লিশ হাজার ধর্মযোদ্ধা মদীনা হইতে সিরিয়া যাত্রা করিতেছেন, প্রবল প্রতাপান্বিত রোম সম্রাটের সহিত মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হইতেছেন—অথচ তাঁহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন ও রসদাদির সম্পূর্ণ অভাব। এইজন্য হজরত, ভক্তগণকে এই সমরায়োজনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। হজরতের আহ্বান শ্রবণমাত্রই কর্তব্যপরায়ণ ভক্তগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং আপনাদের সাধ্যমত সাহায্য লইয়া হজরতের খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন। ওমর বলিতেছেন: সৎ অনুষ্ঠানমাত্রেই আবু-বাকর প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। হজরতের এই আহ্বান শুনিয়া আমার মনে হইল—আজ আমি আবু-বাকরকে পরাজিত করিব। এই সংকল্প করিয়া আমি নিজের সমস্ত ধন সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত করতঃ তাহার অর্ধেক লইয়া হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হজরত আমাকে প্রশ্ন করিলে ঐরূপ উত্তর দিলাম। কিন্তু আবু-বাকর নিজের যথাসর্বস্ব লইয়া প্রেমাস্পদ চরণে উপহার দিয়াছিলেন। হজরত ইহা জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "আবু বাকর! নিজ পরিবারবর্গের জন্য গৃহে কি কিছু রাখিয়া আসিয়াছ?" উত্তর-

---

* এবন-[illegible], জাদ ৪—[illegible] ** কোরআন—তওবা, বোখারী—তাবুক

কুল শিরোমণি তিনিকে—আকবর ভক্তি গদগদকণ্ঠে উত্তর করিলেন ঃ শ্রেষ্ঠতম সম্বল, আল্লাহ ও তাঁহার রছুল।"* মহামতি ওছমান ছাহাবাগণের মধ্যে অন্যতম ধনী ও গনী। তাঁহার ন্যায় উদার হৃদয় ও দানবীর মহাজন দুনিয়ায় অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি [illegible] আহ্বানে এক সহস্র উষ্ট্র এবং সত্তরটি অশ্ব আবশ্যকীয় সাজসরঞ্জামসহ, হুযুরের খেদমতে উপস্থিত করিলেন এবং ইহা ব্যতীত এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা নগদ চাঁদা প্রদান করিলেন।** এইরূপে ছাহাবাগণের প্রত্যেকেই যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিলেন, তবু কতিপয় ভক্তকে সাজসরঞ্জামের অভাবে ভগ্নমনোরথ হইতে হইল। স্বধর্মের, স্বজাতির এবং স্বদেশের এমন গুরুতর বিপদে আজ কেবল অর্থাভাবে তাঁহাদিগকে আত্মোৎসর্গ করার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে, এই দুঃখে তাঁহারা বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইহাদিগের জন্যও যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া দেওয়া হইল।

যথাসময়ে যাত্রার আদেশ হইল। ত্রিশ হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অশ্বসাদী সৈন্য আল্লাহর নামে জয়ধ্বনি করিয়া সিরিয়ার পথে যাত্রা করিলেন।

চল্লিশ হাজার ভক্তের এই বিরাট বাহিনী যখন বীরপদবিক্ষেপে সিরিয়ার তাবুক নামক স্থানে উপস্থিত হইল তখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, আরবের খৃষ্টানগণ হযরতের ও মুছলমানদিগের 'শোচনীয় দুরবস্থার' যে সংবাদ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল তাহা সর্বৈব মিথ্যা। তাহাদিগের সমরায়োজনের কথা জানিতে পারিয়াই মুছলমানগণ শত শত মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তাবুকে উপস্থিত হইয়াছে। ৪০ হাজার সৈন্য যখন এই অভিযানে যোগদান করিয়াছে, তখন অন্ততঃ আর দশ হাজার সৈন্য তাহাদিগের স্থানীয় শত্রুগণের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। যে ব্যক্তির অঙ্গুলি সংকেতমাত্রেই অর্ধলক্ষ প্রাণ এমন উৎসাহের সহিত আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে, তাঁহার সহিত হঠাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া পড়া নিরাপদ হইবে না। এরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহারা সম্রাটকে নিজেদের মতামতসহ সকল অবস্থা জানাইয়া দিলেন এবং রোম সৈন্য পথ হইতে ফিরিয়া গেল।

আরবীয় খৃষ্টানদিগের দুরভিসন্ধির কথা সকলে বিদিত ছিলেন। রোম সৈন্য ফিরিয়া যাওয়ার পর তাহাদিগের মস্তক চূর্ণ করার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু হযরতের এই অনুপম চরিত্র ও মহিমা দর্শনে খৃষ্টানগণ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং কয়েকদিনের মধ্যে তাবুক অঞ্চলের বিভিন্ন খৃষ্টান গোত্র এছলাম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল। যাহারা এছলাম গ্রহণ করিল না, তাহাদিগের সহিত এই মর্মে সন্ধি হইল যে, তাহারা সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে। তবে বৎসর বৎসর তাহারা সামান্য পরিমাণ কর দিতে বাধ্য থাকিবে।

## আবদুল্লাহর সৌভাগ্য

আবদুল্লাহ নামক জনৈক ভক্ত তাবুকের পথে পরলোকগমন করেন। এছলাম গ্রহণের পূর্বে ইহার নাম ছিল আবদুল ওজ্জা। তাঁহার ধনী পিতৃব্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলে পিতৃব্য তাঁহাকে বহু ধন-সম্পত্তি দান করিয়া এবং তাহার জন্য স্বতন্ত্র কারু-কারবার খুলিয়া দিয়া জনৈক ধনী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। আবদুল ওজ্জার সুখ-সম্পদের সীমা ছিল না। এই সময় হযরতের প্রচারিত সত্যধর্মের আহ্বান তাঁহার কর্ণগোচর হয় এবং কিছুকাল দ্বিধা ও অপেক্ষা করার পর তাঁহার অন্তরাত্মা এই সত্যকে স্বীকার করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। একদা তিনি পিতৃব্যসদনে উপস্থিত হইয়া এছলামের সত্যতার কথা ব্যক্ত করতঃ তাঁহাকে ঐ সত্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, পিতৃব্য ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে শাসন করার জন্য বলেন যে, তোর মত নাস্তিক আমার সম্পত্তির এক কপর্দকও পাইতে পারিবে না। আবদুল ওজ্জা পিতৃব্যের কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে নিবেদন করিলেন ঃ "তাত !

* মাওয়াহেব, তিরমিজী প্রভৃতি।

** দারমী, আবু-দাউদ, তিরমিজী প্রভৃতি—কানয ৬—৩১৩

সম্পত্তি অপেক্ষা সত্য অনেক বড়।" এই বলিয়া তিনি নিজের বস্ত্রগুলিকে খুলিয়া দিলেন, এবং উন্মত্তের ন্যায় বিধবা জননীর নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ মা, আমার লজ্জা নিবারণ কর। জননী তখন তাঁহাকে স্বামীর আমলের একখানা জীর্ণ কম্বল ফেলিয়া দিলেন। আবদুল ওজ্জা তাহা ছিঁড়িয়া তাহার একখণ্ড পরিধান করিলেন এবং অপর খণ্ড দ্বারা গাত্রাচ্ছাদিত করিয়া মদীনার দিকে ছুটিলেন। তিনি মছজিদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, এই উদভ্রান্ত প্রেমিকের মুখ দেখিয়াই হযরত সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কে ?"

"আমি আবদুল ওজ্জা, সত্যের সেবক, আশীর্বাদ ভিখারী।"

"সাধু ! তুমি আর ওজ্জার দাস নহ, এখন তুমি আল্লাহর দাস—আবদুল্লাহ। যাও, আত্মোৎসর্গকারী আল্লাহর ভোক্তার জামাতে প্রবেশ কর। আমার নিকট এই মছজিদেই তুমি অবস্থান করিবে।"

একদা আবদুল্লাহ ভাবে বিভোর হইয়া অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে কোরআন পাঠ করিতে থাকায় ওমর বিরক্তি প্রকাশ করেন। তখন হযরত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "ওমর ! উহাকে কিছু বলিও না। এই আবেগের কল্যাণেই ত সে নিজের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিতে সমর্থ হইয়াছে।" যাহা হউক, আবদুল্লাহর গোছল ও কাফনের পর আবু-বাকর ও ওমরের ন্যায় মহাজনদ্বয় তাঁহাকে কবরে নামাইতেছেন, বেলাল প্রদীপ ধরিয়া দণ্ডায়মান। এমন সময় হযরত ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ঃ সসম্ভ্রমে, সসম্ভ্রমে, তোমাদের ভ্রাতাকে সসম্ভ্রমে নামাও। এই বলিতে বলিতে হযরত স্বয়ং কবরে নামিয়া পড়িলেন এবং নিজ হস্তে তাঁহার দেহ কবরে স্থাপন করিলেন। ইহা আবদুল্লাহর প্রথম—এবং বোধ হয়—প্রধান পুরস্কার।*

# পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

## বিভিন্ন ঘটনা

### মুছলমানদিগের হজ্জযাত্রা

তাবুক হইতে ফিরিয়া আসার পর হযরতের আদেশে মুছলমানগণ হজ্জযাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহাত্মা আবু-বাকর ছিদ্দীক এই যাত্রীদলের আমীরপদে নির্বাচিত হইয়া তিন শত মুছলমানসহ তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহাদিগের যাত্রার পর নকিব বা ঘোষণাকারীরূপে আলীও এই দলে যোগদান করেন। হজ্জ সমাধা করার পর মিনা প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবী নিম্নলিখিত বিষয় দুইটি সকলকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেন ঃ

(১) অতঃপর পৌত্তলিকগণ কাবায় হজ্জ করিতে পারিবে না।

(২) অতঃপর কোন ব্যক্তি উলঙ্গ অবস্থায় কাবায় তওয়াফ করিতে পারিবে না।

কথিত আছে যে, বর্তমান আকারে যাকাত দিবার বিস্তারিত বিবরণ ও ত্রিসয়ার আদেশও এই বৎসর অবতীর্ণ হয়। 'যাকাত' শব্দের অর্থ শুচিকরণ। নিজের উপার্জিত ধন-সম্পদের মধ্য হইতে দরিদ্র লোকদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া না দিলে তাহা অপবিত্র হইয়া যায়, ইহাই এছলামের শিক্ষা। সেই জন্য এই দানকে যাকাত বলা হইয়াছে। নিজের অবস্থানুসারে সংসার ব্যয় নির্বাহ করার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে, তাহা নির্ধারিত পরিমাণ বা নেছাবের কম না হইলে প্রত্যেক মুছলমানকে তাহা হইতে যাকাত দিতে হইবে। উদ্বৃত্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের ৪০ ভাগের একভাগ অর্থাৎ শতকরা ২·৫০ টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হয়। আকাশের পানিতে ফসল হইলে তাহার এক-দশমাংশ এবং সেচের পানিতে জন্মা হইলে তাহার বিশ ভাগের

---

* এই অধ্যায়ের লিখিত সমস্ত বিবরণ বোখারী, মোসলেম, ফৎহুলবারী, জাদুল-মাআদ, কাশফুল-গুম্মাহ এবং তাবরী, তবকাত, এবন-হেশাম প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত। বিশেষ আবশ্যকীয় স্থলগুলিতে স্বতন্ত্র হাওয়ালা দেওয়া হইল।

একভাগ যাকাত দিতে হয়। সকল প্রকার ফল ও মেওয়ার উপর এই ওশর যাকাত নির্ধারিত আছে। ইহা ব্যতীত ছাগল, ভেড়া, উট প্রভৃতি পশুরও যাকাত দিতে হয়। প্রত্যেক অবস্থাপন্ন মুছলমানই এই যাকাত দিতে বাধ্য। এই যাকাত আট শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিভাগ করার হুকুম হইয়াছে, ইহারা ব্যতীত অন্য কাহাকেও যাকাত দেওয়া নিষিদ্ধ। হজরত বা তাঁহার বংশধর (ছৈয়দ)-গণের পক্ষে যাকাতের মাল গ্রহণ করা হারাম।

অমুছলমানদিগকে যাকাত দিতে হইত না, যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাহারা তাহাতে যোগদান করিতে বাধ্যও ছিল না। পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষ ঐ অমুছলমান মিত্র গোত্রগুলিকে আক্রমণ করিলে মুছলমানগণ ধন ও প্রাণ বলি দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন। এই জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে বাৎসরিক হিসাবে একটা অপেক্ষাকৃত সামান্য কর গ্রহণ করা হইত, ইহাই জিজয়া নামে খ্যাত হইয়াছে।

## ছামুদ জাতির আবাসভূমি

তাবুক যাত্রার সময় মুছলমানদিগকে জলাভাবের জন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এজন্য তাঁহারা ছওয়ারীর উটগুলিকে উত্তমরূপে পানি পান করাইয়া লইতেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত সে উটগুলিকে 'জবাই' করিয়া তাহাদের পাকস্থলী হইতে পানি বাহির করতঃ তাহা পান করিতেন।* কোরআন শরীফে বর্ণিত ছামুদ জাতির বাসস্থান তাবুকের পথেই অবস্থিত ছিল, উহা হেজর প্রান্তর নামে খ্যাত হইয়া থাকে। হেজর প্রান্তরের অধিত্যকায় কতকগুলি পুরাতন জলাশয় ছিল। এই জলাশয়গুলির পানি—সম্ভবতঃ ঐগুলিকে অস্বাস্থ্যকর মনে করিয়া পান করিতে হযরত সকলকে নিষেধ করিয়া দিলেন, অবশ্য তাহা হইতে পশুদিগকে পানি পান করাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তবুক প্রভৃতি স্থানের কয়েকটা ঝর্ণা ও অন্য জলাশয়ের পানি সতর্কতাসহ রক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত করার আদেশ দেওয়া হয়। অন্যথায় এই লক্ষাধিক তৃষ্ণাতুর জীবের তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়িতে যে কত দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঝর্ণাগুলির সামান্য পানি যে প্রথম চোটেই পানের অযোগ্য হইয়া পড়িত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদিগের কোন কোন ঐতিহাসিক এই সরল-সহজ ঘটনাগুলিতে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া তাহার উপর দুই-এক পোঁচ রং ফলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মুর প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণ এই শ্রেণীর আজগুবী গল্পগুলিতে বিলাতী কালির ছাপ দিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে।

## এছলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার

নিঃসহায়, নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় সাধক যেদিন সর্বপ্রথম তাওহীদের মহীয়সী বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা একবার স্মরণ করুন। তাহার পর দীর্ঘ ২২টি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। হিজরতের পূর্বে নানা কারণে ও নানা সূত্রে এবং নানা দিক দিয়া আরবের বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্র কিরূপে এছলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করিয়াছিল,—এছলাম গ্রহণের ফলে তাহাদিগকে কিরূপ ভীষণ হইতে ভীষণতর এবং নির্মম হইতে নির্মমতর পরীক্ষায় পতিত হইতে হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। মদীনায় আগমন করার পর ন্যূনাধিক দশটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার বিস্তারিত ইতিবৃত্তও আমরা অবগত হইয়াছি। এছলামের শত্রুপক্ষ যুগের পর যুগ এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া হযরতের চরিত্র চিত্রণে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবন ইতিবৃত্তের মধ্যে কেহ এমন একটি ঘটনাও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই, যেখানে বলা যাইতে পারে যে, হযরত এই ব্যক্তিকে এছলাম গ্রহণে বলপূর্বক বাধ্য করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, সত্য নিজেই নিজকে জয়যুক্ত করিয়া লইয়াছিল। পাঠকগণ দেখিয়াছেন—সত্যের মহিমা এবং মোস্তফার চরিত্র-মাহাত্ম্য একত্র সম্মিলিত হইয়া শত্রুকে মিত্রে এবং মোশরেককে মোছলেমে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিল।

---

* মাওয়াহেব, কাছতলানী প্রভৃতি।

মক্কা ও তায়েফে হযরতের ধর্ম প্রচার, গুপ্ত ও প্রকাশ্যে প্রচার এবং মদীনায় নবজীবনের সূত্রপাত, মদীনায় প্রচারক ও অধ্যাপক দল প্রেরণ এবং আনছারগণের এছলাম গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার পরও, সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই আরবের বিভিন্ন স্থানে প্রচারক দল প্রেরিত হইয়াছিল। বহুস্থলে এক-একটি গোত্রের একজন মাত্র লোক এছলাম গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ গোত্রে গমনপূর্বক সত্য ধর্মের মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন। ফলে অধিকাংশ স্থলে ঐ গোত্রগুলি এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া যায়। মদীনার গেফার ও আছলম জাতিও এই প্রকারে এছলাম গ্রহণ করে। হোদায়বিয়া সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের পর এছলাম যে কি উপায়ে ও কি প্রকারে মহা প্রভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহাও পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। বহুস্থলে আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, শত্রুগণ হযরতকে হত্যা করার জন্য যে ঘাতকগণকে নিযুক্ত করিয়াছিল, হযরতের মহত্বের ফলে তাহারাই অচিরে মোস্তফা চরণের অনুরক্ততম সেবক এবং সত্য ধর্মের প্রধানতম প্রচারকরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে প্রতিনিধি সংঘসমূহের বিবরণেও পাঠকগণ এছলামের প্রচার ও প্রসার সংক্রান্ত কতকগুলি ঘটনা অবগত হইতে পারিবেন

# ষট্‌সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

## প্রতিনিধি সংঘসমূহের সমাগম

এছলাম শান্তির ধর্ম—যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে তাহার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভবপর নহে। তাই মহিমময় মোস্তফা স্বদেশের মমতা ত্যাগ করিয়া মদীনায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাই নানাবিধ হেয়তা স্বীকার করিয়াও তিনি হোদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাই জীবনের প্রত্যেক সুযোগে তিনি অমুছলমান জাতিসমূহের সহিত সন্ধি স্থাপন করার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন।

মক্কা বিজয়ের পরে হযরতের শক্তি ও মাহাত্ম্যের কথা যুগপৎভাবে দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল এবং আরবের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী গোত্রসমূহ হযরতের খেদমতে দূত ও প্রতিনিধিদিগকে প্রেরণ করিয়া, তাঁহার ও তাঁহার প্রচারিত নবধর্ম সম্বন্ধে আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। নবম হিজরীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এইরূপে শতাধিক দূত ও প্রতিনিধিদল Embassies and Deputations মদীনায় উপস্থিত হয়। পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি যে, এই সকল ডেপুটেশনের সহিত এছলাম প্রচারের ইতিবৃত্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ হইয়া আছে। আমরা উহার মধ্য হইতে কতকটি ডেপুটেশনের কথা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি উহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, এছলাম নিজ গুণেই কল্পনাতীত সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল—তরবারির সহিত তাহার কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই।

### মাজিনা ডেপুটেশন

বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ডেপুটেশনের মধ্যে মাজিনা গোত্রের প্রতিনিধিগণের নাম সর্বপ্রথমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিজরীর ৫ম সনে এই মাজিনা জাতির চারিশত প্রতিনিধি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন এবং ধর্ম সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ ও আলোচনার পর সকলেই একসঙ্গে এছলাম গ্রহণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান *

### তায়েফের প্রতিনিধিদল

তায়েফের অবরোধ উঠাইয়া লইয়া হযরত যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় ওরওয়া এবনে মাসউদ নামক তায়েফের জনৈক প্রধানতম ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিয়া মদীনায় উপস্থিত হন এবং হযরতের নিকট এছলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর

---

* তবকাত ১—২—৩৩ ; এছাবা ৩—৫৩৮ ; মোছনাদ, তবরী প্রভৃতি।

তৎকালীন প্রথানুসারে ওরওয়াও বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এছলাম তখন ধীরে ধীরে এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করিতেছে। কাজেই হুকুম হইল—চারিজন স্ত্রীর অধিক এছলামে নিষিদ্ধ। এই আদেশ শ্রবণ মাত্রই ওরওয়া চারিজন মাত্র স্ত্রী রাখিয়া আর সকলকে পরিত্যাগ করিলেন। কয়েকদিন হযরতের খেদমতে অবস্থান করার পর ওরওয়ার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন ঃ প্রভু হে ! আমার স্বজাতীয়গণ অজ্ঞতা ও অন্ধ বিশ্বাসের তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া এছলাম প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে পারি। ওরওয়ার এই প্রার্থনার উত্তরে হযরত গম্ভীর স্বরে বলিলেন ঃ "ওরওয়া ! সে ত ভাল কথা, কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তোমার স্বজাতীয়েরা তোমায় হত্যা করিয়া ফেলিবে।" ওরওয়ার প্রাণ তখন স্বর্গের আলোকে উদ্ভাসিত, সত্যের সেবায় এবং স্বজাতির হিতসাধনের জন্য তাঁহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন—আমার স্বজনগণ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে।*

## ওরওয়ার শোণিত-তর্পণ

যাহা হউক, হযরতের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া ওরওয়া সর্বাগ্রে তায়েফে উপস্থিত হইলেন এবং সকলকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান করিতে লাগিলেন। এই প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ছকিফ গোত্র তাঁহার প্রাণের দুশমন হইয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে নানা প্রকারে নির্যাতিত করিতে লাগিল। একদিন স্বগৃহের সম্মুখদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ওরওয়া আল্লাহর নামের জয়কীর্তন করিতেছেন, এমন সময় সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তীর ও প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল—এবং অবশেষে তাহাদিগের দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটি শাণিত শর মহামতি ওরওয়ার বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল, ওরওয়া উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এই পরম পুরস্কার ও চরম সিদ্ধিলাভের জন্যই ওরওয়ার অন্তরাত্মা এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল। পাঠক, এছলামের প্রচার-ইতিহাস আদ্যন্তই এইরূপ শোণিতাক্ষরে লিখিত হইয়া আছে।

بنا کردند خوش رسمے بخون و خاک غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাঁহার স্বজনগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"এখন, কেমন ?" ওরওয়া উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলেন ঃ "সত্যের সেবায় ও দেশবাসীর কল্যাণে যে শোণিতধারা উৎসর্গীকৃত হয়, তাহা তত,—তাহা পুণ্য। আল্লাহ আমাকে এই সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়াছেন, সত্যের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া আজ আমি অমর শহিদগণের সহিত সম্মিলিত হইতে চলিলাম।" দেখিতে দেখিতে ওরওয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন।

ওরওয়ার এ শোণিত-তর্পণ ব্যর্থ যায় নাই। তিনি অন্তর্হিত হইলেন—কিন্তু তাঁহার সাধনা অন্তর্হিত হয় নাই।

ওরওয়ার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অভিনব সাধনা, অটল বিশ্বাস এবং অনুপম ধৈর্য লইয়া তাঁহার স্বজাতীয়দিগের মধ্যে আন্দোলন-আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল। একদল লোক বলিয়া উঠিল—ওরওয়ার ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তিকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা অন্যায় হইয়াছে। এই বাদ-প্রতিবাদ প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, ওরওয়া ত সত্য কথা বলিয়াছেন। এই কাঠ-পাথরের ঠাকুর দেবতাগুলির যে ক্ষমতা, তাহা ত মক্কা বিজয়ের সময় দেখা হইয়াছে। এইরূপ নানাদিক দিয়া নানাপ্রকার আন্দোলনের পর ছকিফ জাতি হযরতের নিকট প্রতিনিধি

---

* সমস্ত ছকিফ জাতি এমন কি কোরেশ প্রধানগণও ওরওয়াকে বিশেষ সম্ভ্রম ও ভক্তির চক্ষে দেখিত। তাহারা বলিত—ওরওয়ার মত মাতব্বর ব্যক্তি নবী হইল না, আর মোহাম্মদ নবী হইল। বিস্তৃত বিবরণ দেখুন—এছাবা

পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তায়েফের পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক ডেপুটেশন গঠিত হইল এবং ছকিফ জাতির প্রধান নায়ক আব্দে-য়্যালিল এই দলের নেতৃপদ বরিত হইলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তায়েফে হযরতের উপর যে নির্মম অত্যাচার করা হইয়াছিল, এই আব্দে-য়্যালিলই ছিলেন তাহার প্রধান নায়ক, অথচ আজ তিনি নির্ভীক চিত্তে হযরতের নিকট গমন করিতেছেন।

মোছলেম বাহিনী তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর, অর্থাৎ নবম হিজরীর রমজান মাসে, আব্দে-য়্যালিল এই ডেপুটেশন লইয়া মদীনায় উপস্থিত হইলেন। তায়েফের অবরোধ তুলিয়া লওয়ার সময় হযরত প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে আল্লাহ্, ছকিফ জাতিকে সুমতিদান কর, তাহাকে আমার সহিত সম্মিলিত কর। হযরতের এই প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া মদীনাবাসীর আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা ছুটাছুটি করিয়া হযরতকে ছকিফ প্রতিনিধিগণের আগমন সংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

হযরত এই অভ্যাগত পৌত্তলিকগণকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিলেন এবং মছজিদ প্রাঙ্গণে তাহাদিগের বাসস্থান নির্ধারণ করিয়া দিলেন প্রতিনিধিগণ কয়েকদিন ধরিয়া হযরতের নিকট নানাবিধ ধর্মতত্ত্ব অবগত হইলেন, নামাযের সময় কোরআন শ্রবণ করিলেন, ছাহাবাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান করিতে লাগিলেন এবং হযরতের স্বর্গীয় মহিমার পরিচয় পাইয়া তন্ময়-তদগত হইয়া এছলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মূর্খ ও অজ্ঞ জনসাধারণের জন্য তাঁহারা কতকটা ভাবিত হইয়া পড়িলেন। এছলামের সমস্ত সংস্কার ও বিধি-বিধান তাহারা একদিনে গ্রহণ করিতে পারিবে না মনে করিয়া, তাঁহারা হযরতকে তিনটি অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহাদিগের প্রথম অনুরোধ এই যে, তিন বৎসর পর্যন্ত তাঁহাদিগের ঠাকুর-প্রতিমাগুলিকে যেন ভগ্ন করা না হয়, হযরত ইহাতে সম্মতি দিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে আরও সময় কমান হইতে লাগিল, কিন্তু হযরত তাহাতেও সম্মত হইলেন না, কারণ শেরক ও তাওহীদ একত্র সম্মিলিত হইতে পারে না। শেষে তাঁহারা বলিলেন যে, আমরা স্বহস্তে আমাদিগের প্রতিমাগুলি ভগ্ন করিতে পারিব না, হযরত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। প্রতিনিধিগণের দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, ছকিফ জাতিকে নামায হইতে মুক্তি দেওয়া হউক। কারণ তাহাদিগের উচ্ছৃঙ্খল ও অজ্ঞ জনসাধারণ নামাযের বাঁধাবাঁধি নিয়মের অধীন থাকা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া মনে করিবে। হযরত এ প্রস্তাবেও অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—আল্লাহ্‌র ধ্যান ও তাঁহার উপাসনাই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। যে ধর্মে উপাসনা নাই, তাহা ধর্মই নহে। তখন তাঁহারা বলিলেন, আমাদিগকে যেন জেহাদের জন্য তলব করা না হয়, আমাদিগকে যাকাত দিতে বাধ্য না করা হয়। হযরত এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি ছাহাবাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—একবার এছলামের স্বর্গীয় প্রভাবে প্রবেশ করিলে, ইহারা নিজেরাই জেহাদে যোগ দিবার এবং যাকাত দান করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িবে।*

অতঃপর আব্দে-য়্যালিল মদ্যপান, ব্যভিচার, কুসীদ গ্রহণ ইত্যাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং তৎসম্বন্ধে এছলামের শিক্ষা ও আদেশ উত্তমরূপে জানিয়া লইতে লাগিলেন। হযরত সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মদ্যপান, মদ্যবিক্রয় এবং মদ্যপ্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য সকল মাদক দ্রব্যের ব্যবহার এছলামে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্যভিচার মহাপাতক, এই ঘৃণিত মহাপাতক এছলামের ত্রিসীমায় তিষ্ঠিতে পারিবে না। কুসীদজীবী আল্লাহ্‌র শত্রু, সে আল্লাহ্‌র বান্দাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া আল্লাহ্‌র সহিত সমর ঘোষণা করিয়া থাকে। আব্দে-য়্যালিল ও তাঁহার সহচরগণ এই প্রকার আলোচনার পর সেদিনকার মত নিজেদের বাসস্থলে চলিয়া গেলেন।

দূরদর্শী আব্দে য়্যালিল সহচরগণকে বুঝাইবার জন্য পরদিন হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ আমরা আপনার সমস্ত আদেশ মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু একমাত্র জিজ্ঞাসা এই যে, আমাদিগের "রাব্বাহ" সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে ? হযরত হাসিয়া বলিলেন—কিসের রাব্বাহ ! উহাকে তোমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিও। ডেপুটেশনের লোকগুলি ইহা

* আবু-দাউদ—খেরাজ, তারেফ ও আমানত ; জাদুল-মাআদ প্রভৃতি।

শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। রাব্বাহ্ এই কথা জানিতে পারিলে এখনই আপনাদের সর্বনাশ ঘটিবে, এরূপ কথা আর মুখে আনিবেন না। আমরা তাহাকে ভাঙ্গিতে গেলে সে আমাদের জনবাচ্চা পর্যন্ত সব গারত করিয়া ফেলিবে। হযরত বলিলেন, সে সম্বন্ধে তোমাদিগের বিচলিত হওয়ার আবশ্যক নাই, আমি লোক পাঠাইয়া তাহার ব্যবস্থা করিব। তোমাদিগের ঐ রাব্বাহ্ যে অচল প্রস্তরখণ্ড বৈ আর কিছুই নহে, তাহা তোমরা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

ছকিফ প্রতিনিধিগণ ফিরিয়া যাওয়ার সময় মুগীরা ও আবু-সুফিয়ান তাঁহাদিগের সঙ্গে গমন করিলেন। ইঁহারা রাব্বাহ্ বা মানাত দেবীর প্রতিমূর্তি ভগ্ন করিতে আসিতেছেন শুনিয়া তায়েফময় হাহাকার পড়িয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—না জানি এখনই কি বিপদ উপস্থিত হইবে! এই হট্টগোল ও হাহাকারের মধ্যে মুগীরার লৌহমুদগর রাব্বার মস্তকে পতিত হইল এবং অন্ধ বিশ্বাসী ভক্তগণের কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতে সে খন খন করিয়া খান খান হইয়া পড়িল।

প্রতিনিধিগণের প্রত্যাবর্তনের পর এক বৎসরের মধ্যে তায়েফ প্রদেশের সমস্ত অধিবাসী এছলামের ছায়াতলে প্রবেশ করিয়া ধন্য হইয়া গেল।*

## তামিম ডেপুটেশন

বশর-এবন-ছুফিয়ান নামক জনৈক ছাহাবী বানি কা'ব গোত্রের যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরিত হইলে, তামিম গোত্রের লোকেরা তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। বানিকা'ব বংশের প্রধানগণ অনেক করিয়া বলিলেন যে, আমরা মুসলমান, যাকাত প্রদান করা আমাদিগের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তোমরা আমাদিগের ধর্মকার্যে বাধা প্রদান করিও না। কিন্তু তামিম প্রধানগণ জেদ ধরিয়া বসিল যে,—একটা উটও তাহারা মদীনায় যাইতে দিবে না। বশর অকৃতকার্য হইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলে ওয়ায়না নামক ছাহাবীকে হযরত ৫০ জন সৈন্য সঙ্গে দিয়া প্রেরণ করেন এবং তিনি তামিম বংশের কতকগুলি লোককে গেরেফতার করিয়া আনেন।

তামিম গোত্রের লোকেরা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহাদিগের কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে হযরতের নিকট প্রেরণ করে। ইহারা স্বগোত্রের প্রধান প্রধান বক্তা ও কবিদিগকে সঙ্গে লইয়া মদীনায় উপস্থিত হয় এবং হযরতের বহির্গমনের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার কুটিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া জটলা করিতে থাকে। সে সময় তাহারা হযরতকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"মোহাম্মদ! বাহির হইয়া আইস। আমরা নিজেদের কবি ও বক্তাদিগকে সঙ্গে আনিয়াছি। আমরা আজ তোমার সহিত 'মোফাখেরা' ও 'মোশায়েরা' করিব।** হযরত বাহির হইয়া আসিলেন এবং ইহাদিগের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, অহঙ্কারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কবির তর্জা গাহিবার জন্য আমরা প্রেরিত হই নাই। কিন্তু সাহিত্য এবং সাহিত্যের মধ্যবর্তিতায় আত্মস্তুতিই তখন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রধান উপকরণ। কাজেই তাহারা নিরস্ত না হইয়া নিজেদের বক্তা ও কবিদিগকে সভাক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়া দিল। শব্দ-সাহিত্যের সাহায্যে তাহারা স্বগোত্রের গর্ব-গৌরব-ব্যঞ্জক বক্তৃতাদান ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া উপবিষ্ট হইল। তখন ছাবেত-এবন-কায়েছ নামক ছাহাবী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন, মদীনার প্রধান কবি হাচ্ছান প্রেমরস ও আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ কয়েকটা গাথা আবৃত্তি করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন। তখন প্রতিনিধিগণ অবনত মস্তকে নিজেদের পরাজয় স্বীকার করিলেন। এইরূপে যখন তাহাদের মাথা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন তাহারা একটু একটু করিয়া হযরতের নিকটবর্তী হইতে লাগিল এবং অবশেষে সকলেই এছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যে

---

* আবু-দাউদের বিভিন্ন অধ্যায়, এছাবা ১—৩৩৭, জাদুল-মাআদ এবং এবন-হেশাম ২—৪২ হইতে ৪৯; কামেল ২—১০৮ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

** বক্তাগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে স্ববংশের গুণ-গরিমা ও অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করিতেন, অন্য দলের বক্তারা ইহার পাল্টা জওয়াব দিতেন। ইহারই নাম মোফাখেরা। আর কবিদিগের এই শ্রেণীর লোকদিগকে 'মোশায়েরা' বলা হয়, উর্দু কবিদিগের মধ্যে এই প্রকার মোশায়েরা এখনও প্রচলিত আছে।

অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িল—কয়েকদিনের মধ্যে তাহারা সকলেই এছলাম গ্রহণ করিল। বলা বাহুল্য যে, মুছলমান অমুছলমান নির্বিশেষে অতিথি সৎকার এবং অতিথি বিদায় করা হযরতের জীবনের একটা অন্যতম আদর্শ। তামিম প্রতিনিধিগণের আতিথেয়তা ও বিদায় সম্বন্ধেও কোন প্রকার ত্রুটি হইতে পারে নাই।

এই প্রতিনিধিগণের সকলেই এছলাম গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের আদর্শে ও প্রচারের ফলে বিরাট তামিম গোত্র অল্পদিনের মধ্যেই এছলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া গেল।*

## আবদুল কায়েছ বংশের প্রতিনিধিগণ

পঞ্চম হিজরীর প্রথম ভাগেই বাহরায়েন প্রদেশে এছলাম প্রসার আরম্ভ হয়। এই সময় ঐ প্রদেশের ১৩ জন প্রতিনিধি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া এছলামের শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতঃ স্বদেশে ফিরিয়া যান। ইহাদিগের গোত্রে অর্থাৎ আবদুল কায়েছ বংশে খ্রীষ্টান ও পার্সিক ধর্মও অল্পবিস্তর প্রসার লাভ করিয়াছিল। নবম হিজরীর মধ্যভাগে বাহরায়েন প্রদেশের ৪০ জন সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন। ইঁহারা উট হইতে অবতরণ করিয়া হযরতের হস্ত চুম্বন করিতে থাকেন।** এই গোত্রের মধ্যে মদ্যপানের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান থাকায় হযরত ইহাদিগকে এই সকল মহাপাপের পরিণাম উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। ফলে স্বাধীন বাহরায়েন প্রদেশের অধিবাসীবর্গ সত্যানুসন্ধিৎসার বশবর্তী হইয়া স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করেন। মদীনার পর সর্বপ্রথমে বাহরায়েনের জোওয়াছি নামক স্থানে জুমআর নামায অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।***

## হানিফা গোত্রের ডেপুটেশন

মক্কা ও এমানের মধ্যপথে ইয়ামামা নামক স্থানে বিরাট হানিফা গোত্রের বাস। ছোমামা-এবন-ওছাল নামক ইহাদের জনৈক প্রধান ব্যক্তি একটি অভিযানে মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়া মদীনায় আনীত হন। ছোমামাকে মছজিদের একটি স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়। এমন সময় হযরত তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ছোমামা। তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইবে বলিয়া মনে করিতেছ ? ছোমামা সপ্রতিভভাবে উত্তর করিলেন—ভালই মনে করিতেছি। আমি খুনের অপরাধে অপরাধী, আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে নিহত করিতে পারেন। তবে আপনার নিকট হইতে প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা ও করুণ ব্যবহার লাভ করিবার আশা করি। তাহা হইলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমি কত কৃতজ্ঞ, কত ভদ্র। আর অর্থ গ্রহণের ইচ্ছা থাকিলে তাহাও বলুন। যাহা চাহিবেন, দিতে প্রস্তুত আছি। বন্দী ছোমামা হযরতের গৃহেই অতিথিরূপে বাস করেন এবং রাত্রে মোস্তফা পরিবারের সমস্ত খাদ্য ও দুগ্ধ একাই শেষ করিয়া ফেলেন। পরদিবস হযরত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—ছোমামা ! আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, তুমি এখন মুক্ত। ছোমামা মছজিদের নিকটস্থ ক্ষুদ্র জলাশয়ে অবগাহনপূর্বক স্নান করিয়া আবার হযরতের খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কলেমায় শাহাদত পাঠ করিয়া সত্য ধর্মে প্রবেশ করিলেন। ছোমামা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন, একমাত্র তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে কোরেশের যে দুর্দশা হইয়াছিল, পাঠকগণ পূর্বে তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করার পর ছোমামা নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান এবং এছলাম ধর্ম ও তাহার প্রচারক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন।

---

* বোখারী, হালবী, এবন-হেশাম ও এছাবা প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

** ইতিহাসে হস্তপদ চুম্বনের কথা আছে, বোখারীর হাদীছে পদ চুম্বনের উল্লেখ নাই। দেখুন—হালবী ও বোখারী। কিন্তু ইমাম বোখারীর আদবুল মুফরদ গ্রন্থে পদ চুম্বনের একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে (১৯৭ পৃষ্ঠা)।

*** বোখারী, মোছলেম—ঈমান অধ্যায় এবং বোখারী ও ফৎহুলবারী ৮—৬২ প্রভৃতি।

ইহার ফলে সেখানকার অধিকাংশ লোকই মুছলমান হইয়া যায়। হিজরীর নবম বৎসরে এই হানিফা বংশের বহুলোক হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন। অল্পকালের মধ্যে এই বংশের সমস্ত লোকই তাওহীদ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।*

## "তাই" বংশে এছলামের প্রচার

বিশ্ববিখ্যাত হাতেম তাই'-এর পুত্র আদি-এবন-হাতেম খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। হযরতের প্রতি নানাবিধ অন্যায় আচরণ করার পর আদি স্বদেশ হইতে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার পর স্বীয় ভগ্নীর মুখে হযরতের দয়া-দাক্ষিণ্যাদির কথা শুনিয়া নির্ভয়ে মদীনায় আসিয়া এছলাম গ্রহণ করেন। আদির প্রচার ফলে "তাই" বংশে দিন দিন এছলামের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে। হিজরীর নবম সনে, জায়েদ নামক জনৈক সাধু ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে 'তাই' বংশের বহুলোক হযরতের নিকট উপস্থিত হন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করার পর সকলেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর কিছুদিনের মধ্যে 'তাই' বংশের সমস্ত লোকই মুছলমান হইয়া যায়।**

## তারেকের কথা

তিরমিজী, নাছাই ও বাইহাকি প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে স্বয়ং তারেকের প্রমুখাৎ নিম্নলিখিত ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে। তারেক-এবন-আবদুল্লাহ্ বলিতেছেন : আমি একদিন মক্কায় 'মাজ্রাজ' নামক বাজারে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় দেখি, একজন সুকান্তি প্রিয়-দর্শন লোক, একটা বড় জোব্বা পরিয়া বাজারের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর উচ্চ শব্দে বলিতেছেন—'হে মানবগণ ! সকলে বল, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়—তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে।' সঙ্গে সঙ্গে দেখি আর একটা লোক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বলিয়া বেড়াইতেছে—খবরদার, কেহ ইহার কথা শুনিও না। এ লোকটা ভয়ঙ্কর যাদুকর, মস্ত একটা মিথ্যাবাদী। আর সঙ্গে এই লোকটি তাঁহাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতেছে। আমার প্রশ্নে বয়স্ক সঙ্গীরা বলিলেন—ইনি হাশেম বংশের লোক, নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রছুল বলিয়া মনে করেন। আর দ্বিতীয় লোকটি তাঁহার পিতৃব্য আবদুল ওজ্জা—আবু-লহব। এই ঘটনার পর কত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, একদা খেজুর কিনিবার জন্য একটা কাফেলা লইয়া আমরা মদীনা যাত্রা করি। আমরা নগরের বাহিরে একটি খোরমা বাগানে বিশ্রাম করিতেছি—এমন সময় তহবন্দ-পরা চাদর-গায় একজন লোক আমাদিগের নিকট আসিয়া ছালাম করিলেন এবং মধুর সম্ভাষণে আমাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমাদিগের সঙ্গে একটি লাল রঙের উট ছিল। আগন্তুক তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিলাম, এত মন খেজুর পাইলে উটটা বিক্রয় করা যাইতে পারে। লোকটি কোন প্রকার দামদস্তুর না করিয়া ঐ মূল্য দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং উটের নাসারজ্জু ধরিয়া নগরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমাদিগের তখন চেতনা হইল, মূল্য না লইয়া একজন অপরিচিত লোককে উটটা দিয়া ফেলিলাম, কেমন হইল ! আমাদিগের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন : "চিন্তার কারণ নাই। লোকটার মুখ দেখিলাম, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। এমন লোক কখনই প্রবঞ্চক হইতে পারে না। তোমরা নিশ্চিন্ত হও, টাকার দায়ী আমি রহিলাম।" কিছুক্ষণ পরে নগরের দিক হইতে একটি লোক আসিয়া বলিল : আমি রছুলুল্লাহর নিকট হইতে আসিতেছি। উটের মূল্য বাবত এই খেজুর আপনারা ওজন করিয়া লউন ; আর তিনি এগুলি আপনাদিগের খাওয়ার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনারা ইহা গ্রহণ করিলে তিনি বিশেষ সুখী হইবেন।

---

* বোখারী ও কংজুলওম্মাল ৮—৬৩, আবু-দাউদ ২—৮ ; জাদুল-মাআদ ও এবন-হেশাম প্রভৃতি।

** এবন-হেশাম ৩—৬৪, মোছনাদ, জাদুল-মাআদ ও এছাবা প্রভৃতি।

যথাসময় আমরা নগরে গমন করিলাম। মছজিদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, সেই লোকটি মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন। আমরা শেষের এই কথা কয়টি শুনিতে পাইয়াছিলাম :—"হে লোক সকল ! অভাবগ্রস্ত ও কাঙ্গালদিগকে দান কর, ইহা তোমাদিগের পক্ষে বিশেষ কল্যাণজনক। স্মরণ রাখিও, উপরের (অর্থাৎ দাতার) হাত, নিম্নের (গ্রহীতার) হাত অপেক্ষা উত্তম। পিতামাতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গকে প্রতিপালন কর।"

তারেক ও তাঁহার সঙ্গিগণ কয়েকদিন মোস্তফা সান্নিধ্যে অবস্থান করার পর এছলামের দীক্ষা গ্রহণপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং তাঁহাদিগের প্রচারের ফলে সেই অঞ্চলের সমস্ত লোক এছলাম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়।*

## নাজরান ডেপুটেশন

নাজরান এমনের নিকট অবস্থিত একটি বিস্তৃত ভূভাগ। ইহাই আরবের খৃষ্টানদিগের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল। সপ্তম হিজরীতে অথবা তাহার অব্যবহিত পরবর্তীকালে, হযরত তাঁহার স্বনামখ্যাত ছাহাবী মুগিরা-এবন-শো'বাকে এছলাম প্রচারের জন্য নাজরান প্রদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু মুগিরা স্থানীয় খৃষ্টানদিগের একটা সংশয়ের উত্তর দিতে না পারিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসেন।** ইহার পর হযরতের প্রেরিত জনৈক দূত তাঁহার পত্র লইয়া নাজরানে উপস্থিত হন। এই পত্রে নাজরানের খৃষ্টানদিগকে এছলামের প্রতি আহ্বান করা হইয়াছিল।***

নাজরানের বিশপ এই পত্র পাইয়া বিচলিত হইয়া পড়েন এবং কিংকর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া 'শারাহবিল' নামক জনৈক বিচক্ষণ হামদানবাসী খৃষ্টানের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। শারাহবিল একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিলেন : "এ সময় যে কি করা কর্তব্য, তাহা আপনিই স্থির করিতে পারেন। তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, এ-কালে এছমাইল বংশ হইতে যে একজন ভাববাদীর অভ্যুত্থান হইবে একথা আমরা বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি, এই লোকটি সেই ভাববাদী হইতে পারেন। এখন হইতেছে ধর্ম-সম্পর্কিত জটিল সমস্যা, আপনাদিগের ন্যায় ধর্মগুরুরাই ইহার সমাধান করিবেন।" আর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সকলে ঐরূপ উত্তর দিলেন। তখন বিশপ মহাশয় বিষম ফাঁপরে পড়িয়া আদেশ দিলেন—গির্জার উপরে চটের পর্দা ঝুলাইয়া দেওয়া হউক, আর হরদম ঘণ্টা বাজান হইতে থাকুক। কোন গুরুতর সমস্যা বা ভয়ঙ্কর বিপদের সময় ঐরূপ করার রীতি ছিল।

তখন খৃষ্টান জগতের উপর চার্চের বা পাদরী সমাজের অখণ্ড প্রতাপ বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই রাজা, তাঁহারাই শাসক এবং তাঁহারাই জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ৭৩টি গ্রাম তখন নাজরান গির্জার অধীন ছিল। কথিত আছে যে, যুদ্ধের সময় তাহারা একলক্ষ যোদ্ধা ময়দানে বাহির করিতে পারিত। অসময়ে ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাইয়া গির্জার গুম্বজের উপর চটের আবরণ দেখিয়া স্থানীয় খৃষ্টানগণ বিচলিত চিত্তে গির্জার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণটি লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল।

সকলে সমবেত হইলে লাট-পাদরী**** দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে হযরতের পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। তদনন্তর নানাবিধ আলোচনার পর স্থির হইল যে, চার্চের প্রধান প্রধান বিশপ ও যাজক অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে মদীনায় যাত্রা করুন। তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইয়া 'মোহাম্মদ ও তৎপ্রচারিত নবধর্ম' সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব সঙ্কলনপূর্বক সকলের কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ৬০ জন ধর্মযাজক ও প্রধান ব্যক্তির এক ডেপুটেশন নবম হিজরীতে মদীনায় গমন করে।

---

* জাদুল-মাআদ ১—৫১৬, এছাবা ১—২৮২, নাছাই, তিরমিজী প্রভৃতি

** তিরমিজী, তফছীর, মরিয়াম, সূরা: মুগিরার বর্ণনা।

*** বাইহাকি—জরকানী।

**** আবু-হারেছা রোম সম্রাট কর্তৃক উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন।

বিশপ ও তাঁহার ৬০ জন সঙ্গী আছর নামাযের পরই মদীনার মসজিদে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা সেখানে উপাসনা করিবার অনুমতি চাহিলেন। ছাহাবিগণ ইহাতে আপত্তি করা সত্ত্বেও হযরত সকলকে মছজিদের মধ্যে উপাসনা করিবার অনুমতি দিলেন এবং তাঁহারা পূর্বমুখী হইয়া নিজেদের নিয়ম অনুসারে উপাসনা সম্পন্ন করিলেন।* লর্ড বিশপ আবাহাম এবং প্রধান পুরোহিত আবদুল মাছিহ, হযরতের সঙ্গে "মোবাহালা"** করার মতলব পূর্ব হইতে আঁটিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু হযরতের মুখ দেখিয়া তাঁহাদিগের বুক কাঁপিয়া গেল। তাঁহারা তখন বলাবলি করিতে লাগিল—আর মোবাহালা করিয়া কাজ নাই লোকটা যদি প্রকৃতপক্ষে নবী হয়, তাহা হইলে ত আমাদিগের সর্বনাশ হইবে।

অতঃপর হযরতের সহিত ইঁহাদিগের ধর্মসংক্রান্ত অনেক আলোচনা হইল। খ্রীষ্টান ধর্মের দোষ-গুণগুলি হযরত তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যীশু ঈশ্বর নহেন ঈশ্বরের পুত্রও নহেন :—তিনি মানুষ। আল্লাহ তাঁহাকে নবুওতসহ অশেষ মহিমামণ্ডিত করিয়া নিজের রছুলরূপে দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু খ্রীষ্টানেরা বলিতেছেন যে, যীশু 'বিনা বাপে পয়দা' হইয়াছিলেন—সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তিনি ঈশ্বরের ঔরসেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন পক্ষান্তরে মদীনার ইহুদীরা উচ্চৈঃ করিয়া বলিতে লাগিল—তোমাদের ঈশ্বর কি তবে পরস্ত্রী গমন করেন ? এসব কথা কিছুই নহে। ঈশ্বরের ঔরসে মানুষের জন্ম হওয়া যেমন অসম্ভব, বিনা পিতায় মানুষের জন্মগ্রহণ করাও তদ্রূপ অসম্ভব। ফলতঃ যীশু-জননী মেরী কুলটা ও ব্যভিচারিণী এবং যীশু তাঁহার জারজ সন্তান। (মা'আজাল্লাহ)। হযরত উভয় পক্ষের এই অন্যায় অতিরঞ্জনের উত্তরে উভয় পক্ষের স্বীকৃত একটি অকাট্য যুক্তি দিয়া বলিলেন : তোমরা সকলেই স্বীকার করিতেছ যে, মানবের আদি পিতা আদম, তাঁহার পিতামাতা কেহই ছিল না, আল্লাহর ইচ্ছামাত্রই আদমের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং যীশুর জন্ম সম্বন্ধে তোমাদিগের কোন প্রকার বিতণ্ডা করার বা তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করার কোনই কারণ নাই।

ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় কোন প্রকার সুবিধা হওয়ার আশা নাই, মোবাহালা করিতে সাহসও হইতেছে না। তখন বিষম সমস্যায় পড়িয়া প্রতিনিধিগণ ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা ত্যাগ করতঃ রাজনৈতিক হিসাবে হযরতের সহিত সন্ধি করার প্রস্তাব তুলিলেন। নাজরানীয় খ্রীষ্টানগণ আন্তর্জাতিক আরব গণতন্ত্রের (International Arab Federation) মেম্বর হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং সেই জন্য তাঁহাদিগকে কমনওয়েলথ ফাণ্ডে কি পরিমাণ কর দিতে হইবে, হযরতকেই তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে অনুরোধ করিল। বলা বাহুল্য যে, হযরতের স্বাভাবিক উদারতার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এই শর্তগুলি স্থির হইয়া গেল। তখন হযরত নাজরানের অধিবাসীদিগের নামে নিম্নলিখিত সনদখানা লিখিয়া দিলেন :***

**নাজরানের পাদরী-পুরোহিত ও সন্ন্যাসীবর্গ এবং সাধারণ অধিবাসিগণের প্রতি :**

"তাহাদিগের উপস্থিত অনুপস্থিত, স্বজাতীয় ও অনুগত সকলের জন্য আল্লাহর নামে তাঁহার রছুল মোহাম্মদের প্রতিজ্ঞা এই যে, সকল প্রকার সম্ভবপর চেষ্টার দ্বারা আমরা তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিব। তাহাদের দেশ, তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ এবং তাহাদিগের ধর্ম ও ধর্মসংক্রান্ত যাবতীয় আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন, অব্যাহত ও নিরাপদ থাকিবে। তাহাদিগের কোন সমাজগত আচার-ব্যবহারের, কোন বিষয়গত স্বত্বাধিকারের এবং কোন ধর্মগত সংস্কারের উপর কখনও কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। অল্প হউক, বিস্তর হউক, যাহা কিছু তাহাদিগের আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরই থাকিবে। মুছলমানগণ তাহাদিগের

---

* যাদুল্‌মাআদ—বোখারী ও তারিখ-খামিছ

** পরস্পর পরস্পরকে এই বলিয়া শাপ দেওয়া—"আমি মিথ্যাবাদী হইলে আমার উপর আল্লাহর লা'নত হউক।"

*** বোখারী ও মুছলেম, ফতহুল বারী, যাদুল-মাআদ প্রভৃতি

নিকট—অর্থ-বিনিময় ব্যতীত—কোন প্রকার উপকার লইতে পারিবেন না। তাহাদিগের নিকট হইতে 'ওশর' গ্রহণ করা হইবে না, তাহাদিগের দেশের মধ্য দিয়া সৈন্য চালনা করা হইবে না। আল্লাহ্‌র নামে তাহাদিগকে আরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে যে, কোন ধর্মযাজককে তাহার পদ হইতে অপসৃত করা হইবে না, কোন পুরোহিতকে পদচ্যুত করা হইবে না, কোন সন্ন্যাসীর সাধনায় কোনও প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করা হইবে না। যাবৎ তাহারা শান্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে—তাবৎ এই সনদের লিখিত সমস্ত শর্ত সমানভাবে বলবৎ থাকিবে।"

"তাহারা অত্যাচারী না হউক এবং তাহারা অত্যাচারিত না হউক।"

প্রতিনিধিগণ নাজরানে প্রত্যাবর্তন করার পর সেখানকার লর্ড বিশপের খুল্লতাত-ভ্রাতা বেশর সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন,—ইনিই সেই প্রত্যাশিত শেষ নবী, আমি তাঁহার নিকট চলিলাম। এই বলিয়া যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতঃ তিনি মদীনায় আসিয়া এছলাম গ্রহণ করেন। নাজরানের গির্জায় একজন সন্ন্যাসী বহুদিন হইতে তপস্যায় মগ্ন হইয়া ছিলেন। প্রত্যাগত পাদরীদিগের মুখে হযরতের বিষয় অবগত হইয়া তিনিও উদভ্রান্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হন এবং হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নবজীবন লাভ করেন। এই মহাজনগণের প্রচারের ফলে নাজরান অঞ্চলে এছলামের প্রসার দিন দিন বাড়িয়া যাইতে থাকে।

এইরূপে দাওছ, আছাদ, কেন্দা, আশআর, হেময়ার প্রভৃতি আরবের বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত গোত্রের পৌত্তলিক, খ্রীষ্টান ও পার্সিকগণ, হযরতের নিকট দূত ও প্রতিনিধিদল পাঠাইয়া তাহাদিগের অধিকাংশই বিশেষ আগ্রহের সহিত এছলাম গ্রহণ করিল। অবশিষ্ট গোত্রগুলি সামান্য কর দিতে স্বীকৃত হইয়া হযরতের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। বলা আবশ্যক যে, কালক্রমে ইহারাও এছলামের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া মুছলমান হইয়া যায়।

হিজরতের অষ্টম, নবম ও দশম সাল প্রধানতঃ দেশ-বিদেশে প্রচারক প্রেরণ এবং দূত ও প্রতিনিধি দল সমূহের সহিত এই প্রকারের বিচার-আলোচনায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা শান্তির এই সময়টুকুর মধ্যে, আরবের ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং সকল প্রকার আইন-কানুন ও বিধিব্যবস্থার সংস্কার করিয়া দুনিয়াকে যে পরম সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না।

# সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

## বিদায় হজ

### হজযাত্রার ঘোষণা

কা'বাতুল্লার নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পর, আল্লাহ্‌ স্বীয় খলিফাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন ঃ 'তুমি লোকদিগের মধ্যে হজ্র সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া দাও, যেন তাহারা দেশের প্রত্যেক দূরপ্রান্ত হইতে পদব্রজে বা উষ্ট্র আরোহণ-পূর্বক তোমার সন্নিধানে সমবেত হয় এবং নিজের কল্যাণপ্রাপ্ত হইতে পারে।' মোছলেম জাতির ইহ-পরকালের সকল কল্যাণ ও সকল মঙ্গলকে পূর্ণ-পরিণত করার জন্য কুলপতি হযরত এব্রাহিমকে দিয়া এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইয়াছিল। এতদিন পর এব্রাহিম বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন, তাঁহার প্রার্থনা—হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার কঠোর সাধনার ফলে, এব্রাহিম খলিলের প্রতিষ্ঠিত সেই কা'বা, শের্কের কলঙ্ক-কলুষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছে। মহামতি হযরত এছমাইলের জন্মভূমি আরব-উপদ্বীপ, আবার আল্লাহর নামের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই সময় বুঝিয়া, দশম হিজরীর শেষভাগে, সাধারণভাবে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, হযরত এবার হজযাত্রা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আরব উপদ্বীপের প্রান্তে প্রান্তে আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার তরঙ্গ বহিয়া গেল। বহু মুছলমানের পক্ষে আজও হযরতের চরণ দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহারা যুগপৎভাবে এই মহাপুণ্যার্জনের জন্যও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

## লক্ষ সেবক বেষ্টিত মোস্তফার হজযাত্রা

দশম হিজরীর জি-কা'দ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকিতে হযরত যথারীতি প্রস্তুত ও সজ্জিত হইয়া কছওয়া নামক বিখ্যাত উষ্ট্রীর উপর আরোহণপূর্বক হজযাত্রা করিলেন। অসংখ্য মুছলমান মদীনা হইতেই হযরতের সঙ্গী হইয়াছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী জাবের-এব্‌ন-আবদুল্লাহ্‌ বলিতেছেন ঃ আমি প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হযরতের অগ্র-পশ্চাতে, দক্ষিণ-বামে যতদূর আমার নজর চলিল—লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে।* পথে যাইতে যাইতে আরও বহু গোত্রের যাত্রিগণ হযরতের সঙ্গে যোগদান করিলেন। ধনী-নির্ধন, ইতর-ভদ্র, দাস-প্রভু নির্বিশেষে সকল মুছলমান আজ একই আল্লাহ্‌র সেবক এবং এক আদমের সন্তানরূপে একই সাধনক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে। এক একখণ্ড শুভ্র শ্বেতবর্ণের উত্তরীয় ও তহবন্দ, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা হইতে মদীনার একটি দরিদ্রতম ক্রীতদাস পর্যন্ত, সকলের আজ এই এক পরিচ্ছদ। সকলেই নগ্নপদ, নগ্নমস্তক, সকলের মুখে একই 'লাব্বায়েক' ধ্বনি। এইরূপে লক্ষ সেবক বেষ্টিত মোস্তফা, ঠিক হিজরতের পথ ধরিয়া মক্কার দিকে অগ্রসর হইয়া নবম দিবসে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।** ইতিহাস ও হাদীছ গ্রন্থসমূহে হযরতের এই যাত্রা সংক্রান্ত বিবরণগুলি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা হইতে এক্ষেত্রের আবশ্যকীয় কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

## মক্কার নূতন দৃশ্য

মক্কাধামে আজ এক অভিনব দৃশ্য দেখা গিয়াছে। সেই উপেক্ষিত উৎপীড়িত সত্যের সেবক, দুই লক্ষ অনুরক্ত ভক্তের অনুপম জামাত সঙ্গে লইয়া, আজ আবার কা'বার সন্নিধানে সমবেত হইয়াছেন। ছাফা-মারওয়া পরিক্রম এবং কা'বা প্রদক্ষিণকালে, একই প্রকার শ্বেতবস্ত্র পরিহিত এই বিপুল জনসমুদ্র, কখনও ধীরে কখনও বা দ্রুতপদবিক্ষেপে, উপত্যকা-অধিত্যকা অতিক্রম করিতেছে—বিশাল সাগরবক্ষের উর্মিমালার মত সেই অনন্ত জনসাগরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। প্রত্যেক অধিরোহন অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে হযরতের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া দুই লক্ষ কণ্ঠে রহিয়া রহিয়া 'লাব্বায়েক' নিনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। ফলে আজ আবার আল্লাহ্‌র নামের জয়জয়কারে মক্কার গগন-পবন পুলকিত, প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, কা'বার প্রস্তরে প্রস্তরে রোমাঞ্চ জাগিল, স্বর্গের পুণ্যাশীষ সহস্রধারে নামিয়া আসিল।

## অসাম্যের প্রতিবাদ

কোরেশ পুরোহিত ও যাজক জাতি, ধর্মানুষ্ঠানেও তাহারা নিজেদের পৌরোহিত্যগর্ব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করিয়াছিল। এই জন্য তাহারা নিয়ম করে যে, কোরেশ ব্যতীত আর সকলকেই নরনারী নির্বিশেষে—বিবস্ত্র হইয়া কা'বার তাওয়াফ করিতে হইবে। তবে তাহারা অনুগ্রহপূর্বক কাহাকেও বস্ত্রদান করিলে সে সেই বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবে। বিদায় হজ্জের সময় এই নির্মম ও ঘৃণিত ব্যবস্থার মূলোৎপাটিত করা হয়। এই সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিয়ম করিয়াছিল যে, কোরেশগণ হরমের অন্তর্গত মোজদালেফায় অবস্থান করিবে ; আর অ-কোরেশ অকুলীন জনসাধারণকে যথাপূর্ব

---

* মোছলেম—৩৯৫ ; আবু-দাউদ, জাদুল-মাআদ।

** বোখারী, এব্‌ন-আব্বাছের বর্ণনা। এই যাত্রীদলের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে ইতিহাসে কয়েক প্রকার মতের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে নিম্নতম সংখ্যা ৭০ হাজার আর উর্ধ্বতম ১ লক্ষ ৪৪ হাজার। এই মতভেদের কারণ এই যে, মদীনা হইতে যাত্রার সময় লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তাহার পর পথে ক্রমে ক্রমে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মক্কা প্রদেশের যাত্রিগণকে মিলাইলে ঐ সংখ্যা আরও বাড়িয়া যায়। বিভিন্ন রাবিগণ বিভিন্ন সময়ের অবস্থা বর্ণনা করায় এই প্রকার 'মতভেদের' সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকন্তু এরূপ ক্ষেত্রে ঠিক সংখ্যা নির্ণয় করাও সম্ভবপর নহে। কেহ কেহ কোরবানীর চামড়ার হিসাব করিয়া ১ লক্ষ ৪৪ হাজার সমর্থন করিয়াছেন। ইহা-গণনার প্রকৃষ্ট উপায়, কিন্তু বহু যাত্রীর সঙ্গে যে কোরবানীর পশু ছিল না এবং তাঁহারা যে কোরবানী করেন নাই, তাহা ত ছহী হাদীছ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। আমরা মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, সেবার সর্বসাকুল্যে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ মুসলমান হজ্জে উপস্থিত ছিলেন।

আরাফাতের ময়দানে সমবেত হইতে হইবে। পাণ্ডা-পুরোহিত ও প্রপীড়িত জনসাধারণ এই ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রথম দিনই হযরত এই নির্মম ব্যবস্থার কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তিনি কোরেশের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আরাফাতে জনসাধারণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। আজি এই ব্যবহারও মূলোৎপাটিত হইয়া গেল। আল্লাহর সন্নিধানে সমস্ত মানুষই সমান—তাঁহার এবাদত-বন্দেগীতে, তাঁহার শাস্ত্র-শরিয়াতে বিভিন্ন গোত্রের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা হইতে পারে না। যে ঘৃণিত অহঙ্কার ও নির্মম অসাম্যবাদের উপর এই তারতম্যের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে, এছলাম তাহার সমর্থন করিতে পারে না। বরং উহার মূলোৎপাটন করাই এছলাম ধর্মের একটি প্রধানতম সাধনা। কুলপতি হযরত এব্রাহিম এই সহানুভূতি শিক্ষা ও সাম্যের দীক্ষা দানের জন্যই "ইতর-ভদ্র" নির্বিশেষে আল্লাহর সকল সন্তানকে আরাফাত ময়দানে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়িয়া দিলে হজ্বের মূল উদ্দেশ্যই যে পণ্ড হইয়া যায়। সকলকে এই সকল কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া হযরত সহযাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া আরাফাতের দিকে অগ্রসর হইলেন। এছলাম গ্রহণের পর কোরেশেরাও তাবাতের উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই তাহারাও নিজেদের সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়া হযরতের অনুসরণ করিলেন।*

## হযরতের অভিভাষণ

এই হজ্জ উপলক্ষে হযরত যে কয়টি** খোৎবা দান করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ ও ধারাবাহিকরূপে এই খোৎবাগুলির উদ্ধার সাধন করা আজ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। হাদীছ, তফছীর ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে ঐ অভিভাষণগুলির বিভিন্ন অসম্পূর্ণ অংশ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিয়া এক্ষেত্রে আমাদের আবশ্যকমত ঐ বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে নিম্নে একত্র বিন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিলাম।

করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার মহিমা কীর্তন এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর হযরত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :

হে লোক সকল ! আমার কথাগুলি মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর। আমার মনে হইতেছে, অতঃপর হজ্জ তীর্থে যোগদান করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিবে না।***

শ্রবণ কর। মূর্খতা-যুগের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস এবং সকল প্রকারের অনাচার আজ আমার পদতলে দলিত-মথিত অর্থাৎ রহিত ও বাতিল হইয়া গেল।****

মূর্খতা-যুগের শোণিত-প্রতিশোধ আজ হইতে বারিত, মূর্খতা-যুগের সমস্ত কুসীদ আজ হইতে রহিত। আমি সর্বপ্রথমে ঘোষণা করিতেছি, আমার স্বগোত্রের প্রাপ্য সমস্ত সুদ ও সকল প্রকার শোণিতের দাবী আজ হইতে রহিত হইয়া গেল।$

একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দণ্ড দেওয়া যায় না, অতঃপর পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলিবে না।$$

যদ্যপি কোন কর্তিত-নাসা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদিগের আমীর করিয়া দেওয়া হয় এবং সে আল্লাহর কেতাব অনুসারে তোমাদিগকে পরিচালনা করিতে থাকে, তাহা হইলে তোমরা সর্বতোভাবে তাহার অনুগত হইয়া থাকিবা—তাহার আদেশ মান্য করিয়া চলিবা।$$$

সাবধান ! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। এই অতিরিক্ততার ফলে তোমাদিগের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।$$$$

---

* বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।

** [illegible]

*** কনজুল-ওম্মাল ১১৩৭ নং হাদীছ, তাবরী প্রভৃতি।

**** বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ প্রভৃতি।

$ বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ প্রভৃতি।

$$ এবন-মাজা ও তিরমিজী প্রভৃতি

$$$ মোছলেম।

$$$$ এবন-মাজা, নাছাই।

স্মরণ রাখিও, তোমাদিগের সকলকেই আল্লাহর সন্নিধানে উপস্থিত হইতে হইবে, তাঁহার নিকট এই সকল কথার 'জওয়াবদিহি' করিতে হইবে। সাবধান তোমরা যেন আমার পর ধর্মভ্রষ্ট হইয়া যাইও না, কাফের হইয়া পরস্পরের রক্তপাতে লিপ্ত হইও না।*

দেখ, আজিকার এই হজ্জ দিবস যেমন মহান, এই মাস যেমন মহিমাপূর্ণ, মক্কাধামের এই হরম যেমন পবিত্র ;—প্রত্যেক মুছলমানের ধন-সম্পদ, প্রত্যেক মুছলমানের মানসম্ভ্রম এবং প্রত্যেক মুছলমানের শোণিতবিন্দুও তোমাদিগের প্রতি সেইরূপ মহান—সেইরূপ পবিত্র। পূর্বোক্ত বিষয়গুলির পবিত্রতার হানি করা যেমন তোমরা প্রত্যেকেই অবশ্য পরিত্যাজ্য ও হারাম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক, কোন মুছলমানের সম্পত্তির, সম্মানের এবং তাহার প্রাণের ক্ষতি সাধন করাও তোমাদিগের প্রতি সেইরূপ হারাম—সেইরূপ মহাপাতক।**

এক দেশের লোকের জন্য অন্য দেশবাসীর উপর প্রাধান্যের কোনই কারণ নাই। মানুষ সমস্তই আদম হইতে এবং আদম মাটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।***

জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই এক মুছলমান অন্য মুছলমানের ভ্রাতা, আর সকল মুছলমানকে লইয়া এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ।****

হে লোক সকল, শ্রবণ কর ! আমার পর আর কোন নবী নাই, তোমাদের পর আর কোন জাতি (উম্মৎ) নাই। আমি যাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, এই বৎসরের পর তোমরা হয় ত আমার আর সাক্ষাৎ পাইবে না—'এলেম' উঠিয়া যাওয়ার পূর্বে আমার নিকট হইতে শিখিয়া লও।$

চারিটি কথা, হাঁ ! এই চারিটি কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিও—শেরেক করিও না, অন্যায়ভাবে নরহত্যা করিও না, পরস্ব অপহরণ করিও না, ব্যভিচারে লিপ্ত হইও না।$$

হে লোক সকল শ্রবণ কর, গ্রহণ কর এবং গ্রহণ করিয়া জীবন লাভ কর। সাবধান ! কোন মানুষের উপর অত্যাচার করিও না ! অত্যাচার করিও না ! অত্যাচার করিও না ! সাবধান, কাহারও অসম্মতিতে তাহার সামান্য ধনও গ্রহণ করিও না।$$$

আমি তোমাদিগের নিকট যাহা রাখিয়া যাইতেছি, দৃঢ়তার সহিত তাহা অবলম্বন করিয়া থাকিলে তোমরা কদাচিৎ পথভ্রষ্ট হইবে না। তাহা হইতেছে—আল্লাহর কেতাব ও তাঁহার রছুলের আদর্শ।$$$$

হে লোক সকল ; শয়তান নিরাশ হইয়াছে, সে আর কখনও তোমাদের দেশে পূজা পাইবে না। কিন্তু সাবধান, অনেক বিষয়কে তোমরা ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিয়া থাক, অথচ শয়তান তাহারাই মধ্যবর্তিতায় অনেক সময় তোমাদিগের সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে।

---

* বোখারী।

** বোখারী, মোছলেম, তাবরী প্রভৃতি।

*** একদুল-ফরিদ।

**** হাকেম মোস্তদরক, তাবরী প্রভৃতি।

$ কনজুল-ওম্মাল, মোছনাদ—আবিওমামা।

$$ মোছনাদ—ছলমা-এবন-কায়েছ। শেষের দুইটি নম্বর রহমতুল-লিল-আলামীন হইতে গৃহীত।

$$$ মোছনাদ—রক্কাশী—ঐ

$$$$ বোখারী, মোছলেম ও তেহার অন্যান্য পুস্তক।

ঐগুলি সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিবা।*

অতঃপর, হে লোক সকল ! নারীদিগের সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি—উহাদিগের প্রতি নির্মম ব্যবহার করার সময় আল্লাহর দণ্ড হইতে নির্ভয় হইও না। নিশ্চয় তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহর জামিনে গ্রহণ করিয়াছ এবং তাঁহারই বাক্যে তাহাদিগের সহিত তোমাদিগের দাম্পত্যস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিও, তোমাদিগের সহধর্মিণীগণের উপর তোমাদিগের যেমন দাবী-দাওয়া, ও স্বত্বাধিকার আছে—তোমাদিগের উপরও তাহাদিগের সেইরূপ দাবী-দাওয়া ও স্বত্বাধিকার আছে। পরস্পর পরস্পরকে নারীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উদ্বুদ্ধ করিবা। স্মরণ রাখিও, এই অবলাদিগের একমাত্র বল তোমরাই, এই নিঃসহায়াদিগের একমাত্র সহায় তোমরাই।**

আর তোমাদিগের দাস-দাসী—নিঃসহায়-নিরাশ্রয় দাসদাসী ! সাবধান ! ইহাদিগকে নির্যাতিত করিও না, ইহাদিগের মর্মে ব্যথা দিও না। শুনিয়া রাখ, এক্তদায়ের আদেশ ঃ "তোমরা যাহা খাইবে, দাস-দাসীদিগকেও তাহাই খাওয়াইতে হইবে। তোমরা যাহা পরিবে, তাহাদিগকে তাহাই পরাইতে হইবে। কোন প্রকার তারতম্য করিতে পারিবে না।"***

যে ব্যক্তি নিজের বংশের পরিবর্তে নিজকে অন্য বংশের বলিয়া প্রচার করে, তাহার উপর আল্লাহর, তাঁহার ফেরেশতাগণের ও সমগ্র মানব জাতির অনন্ত অভিসম্পাত !$

আমি তোমাদিগের নিকট আল্লাহর কেতাব রাখিয়া যাইতেছি। যাবৎ ঐ কেতাবকে অবলম্বন করিয়া থাকিবা—তাবৎ তোমরা পদভ্রষ্ট হইবে না।$$

☆ ☆ ☆

যাহারা উপস্থিত আছ, তাহারা অনুপস্থিতদিগকে আমার এই সকল 'পয়গাম' পৌঁছাইয়া দিবা। হয়ত উপস্থিতগণের কতক লোক অপেক্ষা অনুপস্থিতগণের কতক লোক ইহার দ্বারা অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হইবে।$$$

☆ ☆ ☆

হযরত এক-একটি পদ উচ্চারণ করিতেছিলেন, আর তাঁহার নকিবগণ বিভিন্ন কেন্দ্রে দণ্ডায়মান হইয়া অযুত কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া যাইতেছিলেন। এইরূপে বিশাল জনসঙ্ঘের প্রত্যেক প্রান্তে হযরতের 'পয়গাম'গুলি প্রচারিত হইয়া গেল।

হযরতের বদনমণ্ডল ক্রমশঃই স্বর্গের পুণ্য প্রভায় দীপ্ত এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর সত্যের তেজে ক্রমশঃই দৃপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় তিনি আকাশের পানে মুখ তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি—আমি কি নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছি ?" লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—"নিশ্চয়, নিশ্চয়!" তখন হযরত অধিকতর উদ্দীপনাপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন ঃ "আল্লাহ্ শ্রবণ কর, সাক্ষী থাক ; ইহারা স্বীকার করিতেছে। আমি আমার কর্তব্য পালন করিয়াছি। হে লোক সকল ! আমার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে। তোমরা সে প্রশ্নের কি উত্তর দিবে জানিতে চাই। আরাফাতের পর্বত-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া লক্ষ কণ্ঠে উত্তর হইল ঃ "আমরা সাক্ষ্য দিব, আপনি স্বর্গের বাণী আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, নিজের কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছেন।" হযরত তখন বিভোর অবস্থায় আকাশের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ঃ "প্রভু হে শ্রবণ কর, প্রভু হে সাক্ষী থাক, হে আমার আল্লাহ্ সাক্ষী থাক।"$$$$

পাঠক ! জাতীয় মহাসম্মেলনে—ধর্ম মহামণ্ডলের এই পুণ্যতম পূর্ণতম অধিবেশনে, শ্রেষ্ঠতম মানব, শ্রেষ্ঠতম সাধক এবং শ্রেষ্ঠতম রছুলের এই চরম ঘোষণাটি আর একবার পাঠ করুন। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আমরা বাংলা অনুবাদে হযরতের ভাবের গাম্ভীর্য ও ভাষার বিশেষত্ব

---

* এবন-মাজা ও তিরমিজী।

** বোখারী, মোছলেম ও তাবরী প্রভৃতি। ইমাম নববী এই হাদীছের টীকায় লিখিয়াছেন ঃ নারী জাতির প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাহাদিগের স্বত্বাধিকারের বর্ণনা এবং তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের ভর্ৎসনা কত ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমি 'রেয়াজুছ ছালেহীন' পুস্তকে তাহার অধিকাংশই সঙ্কলন করিয়াছি।

*** তবকাত ২—১৩৩ প্রভৃতি $ মোছনাদ, আবু-দাউদ তায়ালছী ৫—২৩৪।

$$ বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি। $$$ বোখারী। $$$$ মোছলেম ১—২৯৭।

অক্ষুণ্ন রাখিতে পারি নাই, বোধ হয় কেহই পারিবে না। এই সরল সহজ ও স্পষ্ট অনাবিল পয়গামটির উপর টীকা-টিপ্পনী করার আবশ্যক নাই। আশা করি মুছলমান পাঠকগণ হযরতের এই চরম উপদেশের প্রত্যেক দফার সহিত সমাজের বর্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিবেন।

## স্বর্গের নেয়ামত পূর্ণ পরিণত হইল

আরাফাতের ময়দানে হযরতের এই অভিভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের শেষ আয়তটি অবতীর্ণ হইল ঃ

اليوم اكملت لكم دينكم، واتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا

"তোমাদের মঙ্গলহেতু তোমাদিগের ধর্মকে আজ পূর্ণ পরিণত করিয়া দিলাম এবং তোমাদিগের প্রতি নিজের নেয়ামতকে সুসমাপ্ত করিয়া দিলাম এবং এছলামকে তোমাদিগের ধর্মরূপে নির্বাচিত করিয়া দিলাম।" (মায়েদা—৩)

এই অভিভাষণ শেষ করার পর হযরত জনতার দিকে মুখ ফিরাইয়া করুণ ও গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বিদায়।" এই জন্য ইহা সাধারণতঃ বিদায়ের হজ্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। হাদীছে এই হজ্ব হজ্জাতুল বালাগ ও হজ্জাতুল এছলাম প্রভৃতি নামেও উল্লিখিত হইয়াছে।*

## তিনটি ক্ষুদ্র ঘটনা

অন্যান্য প্রসঙ্গে হজের সময়কার অনেকগুলি ছোট ছোট ঘটনা হাদীছ ও ইতিহাসের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যকার তিনটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

## এলেম উঠিয়া যাওয়ার অর্থ কি

হযরতের খোৎবায় এলেম উঠিয়া যাওয়ার কথা আছে। কতিপয় ছাহাবী ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িলেন। ওমামা বলিতেছেন—ব্যাপারটা খোলাসা করিয়া লওয়ার জন্য আমরা একজন বেদুঈনকে একখানা চাদর দিয়া, তাহার দ্বারা হযরতকে জিজ্ঞাসা করাইলাম—এলেম উঠিয়া যাইবে কি করিয়া ? আল্লাহর বাণী লিখিত অবস্থায় আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এমন কি দাস-দাসীদিগকে আমরা তাহা শিখাইয়া দিয়াছি। এ অবস্থায় এলেম উঠিয়া যাওয়ার তাৎপর্য কি ? হযরত উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিয়া বলিলেন—তোমরা কি জান না, ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকটও এরূপ বহু 'ছহীফা' বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাহার প্রতি তাহারা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে নাই। এলেমের উপযুক্ত অধিকারী যাহারা, তাহারা উঠিয়া যাইবে এবং এই শ্রেণীর উপযুক্ত অধিকারীদের তিরোধানই হইতেছে এলেমের তিরোধান!—মোছনাদ আবু-ওমামা।

## জেহাদে আকবর

মিনায় অবস্থানকালে জনৈক ছাহাবী আসিয়া হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন শ্রেণীর জেহাদ আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় ? হযরত উত্তরে বলিলেন ঃ "অত্যাচারী রাজার মুখের উপর সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া।"

## অপাত্রে দান

দুইজন সুস্থকায় ব্যক্তি এই সময় হযরতের খেদমতে ছদকার মাল পাইবার প্রার্থনা জানাইলে, হযরত পুনঃ পুনঃ তাহাদের আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন ঃ অবস্থাপন্ন বা সুস্থ দেহ কর্মক্ষম ব্যক্তির এ মালে কোনও অধিকার নাই। এ অবস্থায় তোমরা উহা লইতে ইচ্ছুক হইলে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।— (আহমদ ৪—২২৪)

এই তিনটি ছোট ঘটনার মধ্যে যে রুকম বিরাট ও মহান উপদেশ নিহিত আছে, পাঠকগণ তাহার প্রতি মনোযোগ দান করিলে শ্রমসার্থক বলিয়া মনে করিব।

কোরবানী প্রভৃতি হজের অন্যান্য অনুষ্ঠান শেষ করার পর হযরত মোহাজের ও আনছারদিগকে সঙ্গে লইয়া মদীনার দিকে প্রস্থান করিলেন।

---

* বোখারী, মোছলেম, আবু-দাউদ প্রভৃতি।

# অষ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

## একাদশ হিজরী বা শেষ বৎসর

### মহাযাত্রার আয়োজন

হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর হযরত যেন পৃথিবীর সমস্ত কাজকাম সারিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বদেশে স্বজনগণের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার সময় উপস্থিত হইলে, প্রবাসী যেমন তাড়াতাড়ি করিয়া প্রবাসের সমস্ত ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া, সেখানকার সমস্ত কর্তব্য শেষ করিয়া, আনন্দ ও ঔৎসুক্যের সহিত নিজের যাত্রার আয়োজন করিতে থাকে—একাদশ হিজরীর প্রথম হইতে ঠিক সেইভাবে নিজের "পরম প্রিয়ের" সন্নিধানে উপনীত হইবার জন্য, হযরত অতিশয় ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হজ্জ সম্মেলনে হযরত যে সকল খোৎবা দিয়াছিলেন, তাহা হইতেও বেশ জানা যাইতেছে যে, তিনি নিজের মহাযাত্রার কথা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছিলেন। ঐ খোৎবায় তিনি ইহার ইঙ্গিতও করিয়াছিলেন। অন্যান্য বৎসর রমজান মাসে একবার করিয়া কোরআন খতম করা হইত, গত রমজানে কিন্তু হযরত দুইবার খতম করিলেন। পূর্বে তিনি দশদিন মাত্র এ'তেকাফে বসিতেন, এবার পূর্ণ বিশ দিন এই নিভৃত সাধনায় অতিবাহিত হইয়া গেল।*

হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত ওহোদ প্রান্তরে শহীদগণের সমাধি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। ওহোদের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় মোস্তফার চরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সত্যের সেবক ছাহাবিগণ যে কিরূপ উৎসাহের সহিত আত্মবলিদান করিয়াছিলেন, পাঠকের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। ভক্তবৎসল মোস্তফা, জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাহাদিগের সেই আত্মবলির কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই আজ আবার তিনি তাঁহাদিগের সমাধি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদিগের জন্য প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাদিগকে শেষ ছালাম ও শেষ আশীর্বাদ জানাইয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মদীনায় আগমন করিয়া তিনি 'জান্নাতুল-বাকি' নামক সমাধিস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রজনীর দ্বিতীয় যাম অতিবাহিত প্রায়, নীরব নিস্তব্ধ সমাধি প্রাঙ্গণে অমাবস্যার অন্ধকার ছাইয়া পড়িয়াছে। এহেন নির্জন নিস্তব্ধ নিশীথকালে হযরত সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের আত্মার কল্যাণের জন্য আল্লাহর রহমত ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। উভয় স্থানে হযরত সমাধি-শায়িত শহীদ ও ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন : "হে সমাধিবাসিগণ ! তোমাদিগের প্রতি শান্তি হউক, আমরাও শীঘ্র তোমাদিগের সহিত সম্মিলিত হইতেছি।"** বিভিন্ন হাদীছের আলোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মক্কা বিজয়ের পর হইতেই হযরতের প্রাণে এই মহাযাত্রার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে এবং সেই হইতেই তিনি অহরহ 'নামকীর্তনে' ব্যাপৃত থাকিতে লাগেন।***

'জান্নাতুল-বাকি' হইতে প্রত্যাবর্তনের পর, ছফর মাসের শেষার্ধের প্রথম ভাগে, হযরতের পীড়ার সূত্রপাত হয়। স্বনামখ্যাত ছাহাবী আবদুল্লাহ্-এবন-মাছউদ বলিতেছেন : পরলোক গমনের একমাস পূর্বেই হযরত সকলকে নিজের মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর বিদায়ের মুহূর্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিলে, তিনি আমাদিগের সকলকে বিবি আয়েশার গৃহে সমবেত করিয়া বলিলেন : হে লোক সকল, তোমাদের প্রতি শান্তি হউক। আল্লাহ্ তোমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, তাঁহার সাহায্য ও শক্তিবলে তোমরা জীবনের কর্মসমরে জয়যুক্ত ও কল্যাণমণ্ডিত হও ! তিনি তোমাদিগকে মহত্ত্ব প্রদান করুন, সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং সততা অর্জনের শক্তি প্রদান করুন ! তাঁহার শরণে তোমরা নিরাপদ হইয়া থাক !

আমি তোমাদিগকে আল্লাহর নামে ধর্মভীরু হইবার অছিয়ৎ করিতেছি। তোমাদিগকে তাঁহারই মঙ্গল হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর ন্যায়দণ্ড সম্বন্ধে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া বলিতেছি—সাবধান ! কোন দেশের এবং কোন জাতির

---

* বোখারী—এ'তেকাফ ও ফাজায়েলে কোরআন।

** বোখারী—জানাজা, মোছলেম—হজ্জ  *** বোখারী, তফছির—এজা জাআ।

উপর অন্যায়াচরণ করিও না, ইহাতে তোমরা তাঁহার বিদ্রোহী বলিয়া গণিত হইবা কারণ তিনি কোরআনে আমাকে ও তোমাদিগকে বলিতেছেন ঃ

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض
ولا فسادا والعاقبة للمتقين -

"এই যে, পরকালের পরম শান্তি নিবাস, তাহা আমি সেই সকল শান্তি-প্রিয় লোকদিগের জন্য (নির্ধারিত) করিব, যাহারা পৃথিবীতে আত্মম্ভরিতা করিতে ও বিপ্লব ঘটাইতে চাহে না—এবং সংযমশীল লোকেরাই পরিণামে কল্যাণলাভ করিয়া থাকে।"

"তোমরা ভবিষ্যতে যে সকল বিজয়লাভ করিবা, তাহা আমি দেখিতেছি। তোমরা যে আমার পর মোশরেক হইয়া যাইবা—সে আশঙ্কা আমার নাই। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে—আমার পর ধন-দৌলতের মায়ামোহে তোমরা মুগ্ধ হইয়া না পড়, এজন্য তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করিতে প্রবৃত্ত না হও এবং সেই অপকর্মের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলস্বরূপ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় তোমরাও বিধ্বস্ত হইয়া না যাও !"

উপসংহারে হযরত উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া করুণাবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন ঃ তোমরা আমার অনুপস্থিত ছাহাবীদিগকে আমার "ছালাম" পৌঁছাইয়া দিবা আর আজ হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যাহারা আমার প্রচারিত ধর্মের অনুসরণ করিবে, তোমাদিগের মধ্যবর্তিতায় তাহাদিগের প্রতিও আমার ছালাম—অনন্ত অফুরন্ত আশীর্বাদ !*

অদ্য লেখনী ধন্য হইল, যুগব্যাপী সাধনা সার্থক হইল—ভক্তি ও আনুগত্যপূর্ণ হৃদয়ে আজ আমরা প্রভুর এই আশীর্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া—এবং মোস্তফা-চরিতের মধ্যবর্তিতায় পাঠক-পাঠিকাগণকে এই অমূল্য ধন দিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। আইস ভ্রাতা, আইস ভগিনী, আইস সকল ওম্মতী ! আমরাও কোটি কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়া বলিতে থাকি ঃ

و عليكم السلام يا نبي الله و يا رحمته الكاملة للعالمين
و صلواته و بركاته كما يحب و يرضى

## কবর পূজার কঠোর নিষেধাজ্ঞা

যাত্রার পাঁচদিন পূর্বে, হযরতের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ঐদিন রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির অবস্থায় তিনি সমবেত নর-নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ তোমাদিগের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ, তাহাদিগের পরলোকগত নবী ও মহাত্মাদিগের কবরগুলিকে উপাসনা মন্দিরে পরিণত করিয়াছে। সাবধান, তোমরা যেন এই মহাপাতকে লিপ্ত হইও না খৃষ্টান ও ইহুদিগণ এই পাপে অভিশপ্ত হইয়াছে। দেখ, আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি, আমি আমার দায় এড়াইয়া যাইতেছি। আমি তোমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করিয়া যাইতেছি—সাবধান, আমার কবরকে যেন তোমরা 'ছেজদাগাহ' বানাইয়া লইও না আমার এই চরম অনুরোধ অমান্য করিলে তজ্জন্য তোমরাই আল্লাহর নিকট দায়ী হইবে ! হে আল্লাহ ! আমার কবরকে "পূজাস্থলে" পরিণত করিতে দিও না।**

পৃথিবীতে যত প্রকার নরপূজা, যত প্রকার পৌত্তলিকতা এবং যত প্রকার শেরক অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার মূল এই স্থানে মানুষ তাহাদিগের ভক্তিভাজন মহাজনদিগের কবর, চিত্র, প্রতিমূর্তি বা অন্যান্য স্মৃতি চিহ্নগুলির প্রতি প্রথম প্রথম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকে। ক্রমে এই শ্রদ্ধা অন্ধ ভক্তিতে পরিণত হয় এবং এই অন্ধতার নিনাদে সেই মহাজনদিগের আদেশ-নিষেধগুলিও আর তাহাদের চোখে পড়ে না। কালে মানুষ এই মহামানবগণকে অতি-মানবরূপে গ্রহণ করে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে আল্লাহর আসনে বসাইয়া দেয় সেইজন্য হযরত তাঁহার ওম্মতকে প্রথম হইতেই নিষেধ করিয়া আসিয়াছেন—কবর পাকা করিবে না,

---

* মাওয়াহেব ২—৩৭২, নাহজান ৩—৩৪২ এবং বোখারী ও মোছলেম প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত
** বোখারী, মোছলেম ও মোয়াত্তা ইমাম মালেক।

তাহাতে গুম্বজ বানাইবে না, এমন কি মাটির কবরও অধিক উঁচু করিবে না। কবরে প্রদীপ জ্বালান এবং তাহার উপর নামাজ পড়াও এই জন্য নিষিদ্ধ। অবশেষে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও তিনি এ সম্বন্ধে যে ব্যাকুল অনুরোধ করিতেছেন, পাঠকগণ তাহাও দেখিতেছেন। কিন্তু মুছলমান সমাজ হযরতের অন্তিমকালের এই চরম অছিয়তের প্রতি আজ যে কিরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন, অভিজ্ঞ পাঠককে বোধ হয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

## পীড়ার বিবরণ

বিখ্যাত ছাহাবী আবু-ছুইদ খুদরী বলিতেছেন ঃ পীড়ার সময় একদা হযরত মেম্বর আরোহণপূর্বক সকলকে বলিলেন—"আল্লাহ তাঁহার জনৈক দাসকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দান করিলেন, কিন্তু সে তাহা ত্যাগ করিয়া আল্লাহকে গ্রহণ করিল।" ভক্তকুল-শিরোমণি আবু-বাকর ইহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"আমাদিগের পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হউন।" আবু-বাকরের ক্রন্দন দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলাম—বৃদ্ধের আজ কি হইয়াছে ? হযরত একজন লোকের গল্প বলিতেছেন, আর ইনি কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। এ যে হযরতের বিদায় ইঙ্গিত, আমরা তখন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।*

আজ পীড়ার একাদশ দিবস—এতদিন পর্যন্ত হযরত নিজেই ছাহাবাগণের এমামত করিয়া আসিতেছিলেন, এইদিন এশার জামাতে উপস্থিত হওয়ার জন্যও হযরত পর পর তিনবার অজু করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনবারই তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কাজেই তিনি সকলকে বলিয়া দিলেন "আবু-বাকরকে জামাতের এমামত করিতে বলিয়া দাও।" হযরতের পীড়া দিন দিনই অধিকতর সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছিল। এই সময় খায়বারের সেই বিষের জ্বালাও তীব্রতর হইয়া উঠিল। ছাহাবাগণ হযরতের এই অবস্থা দর্শনে হৃৎপ্রেমাসক্তি চঞ্চল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শেষে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, আবু-বাকর হযরতের স্থলে এমামত করিতেছেন, তখন তাঁহারা আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় আবু-বাকর ছাহাবাগণকে লইয়া নামাযের জামাত আরম্ভ করিয়া দিলেন। এমন সময় একটু আরাম বোধ করিয়া দুইজন সাথীর স্কন্ধে ভর দিয়া হযরত মছজিদে তশরিফ আনিলেন। হযরত আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া আবু বাকর ইমামের স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলে, তিনি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং নিজে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া নামাজ পড়িলেন।

* * * *

নামাযের পর হযরত উপস্থিত ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ মোছলেমগণ ! আমি তোমাদিগকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। তাঁহার আশ্রয়, তাঁহার অবধান এবং তাঁহার সাহায্যে তোমাদিগকে সঁপিয়া দিতেছি। আমার পরে সেই আল্লাহই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তোমরা নিষ্ঠা, ভক্তি ও সততার সহিত তাঁহার আদেশ পালন করিতে থাকিও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই শেষ, ভ্রাতৃবর্গ এই শেষ !

### সোমবার শেষ দিন ঃ

ছাহাবিগণ প্রত্যুষে উঠিয়া ফজরের জামাতে সমবেত হইয়াছেন, নামায আরম্ভ হইয়াছে। এমন সময় হযরতের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আল্লাহর প্রিয়তম দাসগণ তাঁহার পরেও কিভাবে প্রভুর উপাসনায় লিপ্ত আছে, তাহা দেখিবার জন্য হযরত পর্দা তুলিয়া দিতে বলিলেন। পর্দা তোলার সঙ্গে সঙ্গে জামাতের সেই স্বর্গীয় দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল।

এই দৃশ্য দর্শনে সেই অন্তিমকালে হযরতের বদনমণ্ডল আনন্দ-উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিল—তাঁহার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। আবার পর্দা ফেলিয়া দেওয়া হইল। (তারকাত ও মোহাদ্দ—ইমাম শাফেয়ী।)

* * *

---

* বোখারী, মোছলেম, মেশকাত।

এই অবস্থায় পিতাকে রোগযন্ত্রণায় অস্থির দেখিয়া বিবি ফাতেমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হায় ! আমার পিতা না জানি কত ক্লেশ পাইতেছেন।" কন্যার এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া হযরত বলিলেন—ফাতেমা ! আর অল্প সময় তোমার পিতার ক্লেশ—আজিকার পর তাঁহার আর কোন ক্লেশ নাই। (বোখারী।)

### এন্তেকাল

বিবি আয়েশা বলিতেছেন ঃ আমারই কক্ষে এবং আমারই বক্ষে হযরতের এন্তেকাল হইয়াছিল। হযরতের ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া আমি একখানা দাতন চিবাইয়া দিলে হযরত তাহা লইয়া ধীরে ধীরে কয়েকবার দাঁতে বুলাইলেন। নিকটে একটি পানির পাত্র ছিল। হযরত এই পাত্রে হাত ডুবাইয়া মুখে পানি দিতে দিতে বলিতেছিলেন—মাওতের অনেক কষ্ট। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্! হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যু-যাতনা সহ্য করিবার শক্তি দান কর। (মেশকাত)

☆ ☆ ☆

দিবসের তৃতীয় যাম অতিবাহিতপ্রায়—অন্তিম অবস্থা উপস্থিত। হযরত বার বার অচেতন হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু প্রত্যেকবার চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিতেছেন ঃ হে আল্লাহ্ ! **হে আমার চরম বন্ধু ! হে আমার পরম সুহৃদ ! তোমার সঙ্গে, তোমার সন্নিধানে !!** (বোখারী, মোছলেম)

পরম স্নেহভাজন আলী হযরতের মস্তক নিজ অঙ্কে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় হযরত একবার চোখ মেলিয়া দেখিলেন এবং আলীর দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন—**"সাবধান ! দাস-দাসীদিগের প্রতি নির্মম হইও না !"**

বিবি আয়েশা হযরতের মস্তক বুকে লইয়া বসিয়া আছেন, মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়াছে। এমন সময় হযরত শেষবার চোখ মেলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ঃ নামায, নামায—সাবধান ! দাস-দাসীদিগের প্রতি—সাবধান !!—এবং শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বাণী উচ্চারিত হইল ঃ হে আল্লাহ্ ! হে আমার পরম সুহৃদ !!*

☆ ☆ ☆

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আত্মা সেই পরম সুহৃদের সন্নিধানে মহাপ্রস্থান করিল।

**انا لله و انا اليه راجعون**

## উনাশীতিতম পরিচ্ছেদ

### বিভিন্ন কথা

### আক্কাছের প্রতিশোধ গ্রহণের ভিত্তিহীন গল্প

তবরী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে একদা হযরত ছাহাবাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—যদি আমার নিকট কাহারও কোন প্রকার দাবী-দাওয়া বা প্রাপ্য থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহা ব্যক্ত করুন। আমি সকল দায় ও সকল ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহর নিকট যাইতে চাই। হযরত এই সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বিশেষ তাকিদ ও অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ছাহাবাগণ বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াও ঐরূপ কোন কথা স্মরণ করিতে পারিলেন না। মাত্র একজন বলিলেন—একবার জনৈক কাঙ্গালীকে দান করার জন্য হুজুর আমার নিকট হইতে তিনটি দেরহাম ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তখনই তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। ইহা তবরীর বর্ণনা।** কোন হাদীছ গ্রন্থে এই রেওয়ায়তটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, আক্কাছ নামক কোন ব্যক্তির পিঠে হযরতের আঘাত করা, ঐদিন আক্কাছের তাহা বলা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের অছিলায় হযরতের "মোহরে নবুওতে চুম্বা দেওয়া"র যে গল্পটি সাধারণ

---

* বোখারী, মোছলেম—মেশকাত এবন-মাজা—অছায়া। ** ৩—১৯১।

ওয়াজ ও মৌলুদের মজলিসে সচরাচর পঠিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বাজে গল্প ব্যতীত আর কিছুই নহে। রহমতুল-লিল-আলামীন তাঁহার জীবনে কখনও মানুষের পিঠে কোড়ার আঘাত করেন নাই, বিনা কারণে ঐরূপ আঘাত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপরও নহে।

## হযরতের এন্তেকালের তারিখ

হযরতের এন্তেকালের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এবন-এছহাক, ওয়াকেদী প্রভৃতি সাধারণ ঐতিহাসিকগণ ১২ই রবিউল আউওলকেই হযরতের মৃত্যু দিবস বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সকল দিক দিয়া আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই মত কোন প্রকারেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সোমবারে হযরতের মৃত্যু হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সকলেই একমত— ছহীহ্ হদীছে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।* হযরত যে শুক্রবার দিবসে আরাফাতে অবস্থান করিয়াছিলেন, বহু ছহীহ্ হাদীছ হইতে তাহাও অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে।** আরাফাতে অবস্থান মাসের নবম তারিখে হওয়া নিশ্চিত এবং নবম তারিখ শুক্রবার হইলে ১লা তারিখে বৃহস্পতিবার হওয়াও নিশ্চিত। এই প্রকারে ১লা জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার ধরিয়া যত রকমে হিসাব করা যাউক না কেন, সোমবারে ১২ই তারিখ কোন মতেই পড়িতে পারে না। সুতরাং ১২ই যে হযরতের এন্তেকাল হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। হাফেজ এবন-হাজর আস্কালানী বোখারীর টীকায় বলিতেছেন—রাবী ও লেখকগণের "ভ্রমের কারণ এই যে, প্রথমে কথাটা ছিল ثاني شهر ربيع الاول। ইহার شهر টা عشر শব্দে রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং সাধারণ গড্ডালিকা-প্রবাহের ফলে সকলে বিনা তদন্তে এই ভ্রমটা পুরাদস্তুর চালাইয়া দিয়াছেন।***

কিন্তু ২রা তারিখকে হযরতের এন্তেকালের দিন বলিয়া নির্ধারণ করিতে হইলে, পর পর তিন মাসকে ২৯ দিনের বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ সেদিন সোমবার কোন মতেই পড়িতে পারে না। পর পর তিন মাস ২৯ দিনের হইতে কখনও দেখা যায় নাই, এই জন্য দোসরার পরিবর্তে কতিপয় বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ১লা রবিউল আউওয়ালকেই হযরতের এন্তেকালের প্রকৃত তারিখ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। বিখ্যাত চরিতকার ইমাম মুছা এবন-ওকবা, ইমাম লায়েছ মিছরী ১লা তারিখের রেওয়ায়াৎ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম ছোহেলী এই রেওয়ায়তকে অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।****

আমি নিজের সামান্য শক্তি অনুসারে ১লা ও ২রা তারিখের রেওয়ায়তগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে—

(ক) ১লার রেওয়ায়তগুলির মোকাবেলায় ২রার অনুকূল রেওয়ায়তগুলি অত্যন্ত দুর্বল, সুতরাং অগ্রাহ্য।

(খ) সন্ধ্যার অল্প পূর্বে হযরতের এন্তেকাল হইয়াছিল। সংবাদটির সাধারণভাবে প্রচার হইতে হইতে সূর্যাস্ত হইয়া যায় এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ২রা তারিখ আরম্ভ হইয়া যায়। এই জন্য কোন কোন রাবী "২রা তারিখে হযরতের এন্তেকাল হইয়াছিল" বলিয়া রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন।

☆ ☆ ☆

পরলোক গমনের সময় হযরতের স্বর্ণ, রৌপ্য, ছাগ, উষ্ট্র প্রভৃতি কোন সম্পত্তি ছিল না। তাঁহার বর্মটি তখন সামান্য শস্যের পরিবর্তে জনৈক ইহুদী মহাজনের নিকট আবদ্ধ ছিল (বোখারী, মোছলেম—মেশকাত)।

মৃত্যুর পূর্ব রাত্রে হযরতের গৃহে প্রদীপ জ্বালাইবার মত তেলও ছিল না। বিবি আয়েশা জনৈক প্রতিবেশীর নিকট হইতে তেল ধার করিয়া আনিয়া সে রাত্রে প্রদীপ জ্বালাইয়াছিলেন।

## বিয়োগ-বিধুরা বিবি আয়েশার শোকগাথা

সদ্যবিয়োগ-বিধুরা বিবি আয়েশা, হযরতের পরলোক গমনের পর যে শোকগাথা আবৃত্তি

---

* বোখারী—ওফাত, মোছলেম—জনাঃ।

** বোখারী—তফছীর এবং ছেহার অন্যান্য পুস্তকে حجة الوداع দেখুন।

*** ফৎহুলবারী ৮—৯১। **** ছিরৎ ২—১৭৫৭; এবন-কাছীর ২—১৮৪।

করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার ভাবার্থ প্রদান করিতেছি ঃ

'হায়, সেই ধর্মের রক্ষক, যিনি মানবের কল্যাণ চিন্তায় পূর্ণ এক রাত্রিও বিছানায় শুইতে পারেন নাই—তিনি চলিয়া গিয়াছেন। মানবের জন্য যিনি সম্পদ ত্যাগ করিয়া দৈন্যকে অবলম্বন করিয়াছিলেন—তিনি চলিয়া গিয়াছেন ! হায়, সেই প্রিয় নবী, যিনি ধর্মক্ষেত্রে শত্রুর প্রত্যেক অসঙ্গত আঘাতকেই ধৈর্যের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন—তিনি চলিয়া গিয়াছেন !"

"কখনও যিনি কোন অন্যায় বা অধর্মের সংস্পর্শে গমন করেন নাই, সহস্র অত্যাচার-অনাচারেও যাঁহার পবিত্র হৃদয়ের কোন পার্শ্বে একটু মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে নাই, কোন অভাবগ্রস্ত দীন-দুঃখীকে যিনি জীবনে কখনও "না" বলিতে পারেন নাই—তিনি আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন !"

"হায় ! সেই রহমতের নবী, মানবের মঙ্গলার্থে সত্য প্রচারের অপরাধে প্রস্তরের আঘাতে যাঁহার দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; যাঁহার সুন্দর, উজ্জ্বল, ও প্রশস্ত ললাটকে রক্তরঞ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; এবং সেই অবস্থাতেও যিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই,—সেই দয়ার সাগর আজ দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন ! সেই ধর্মের ত্যাগের ও প্রেমের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি—যিনি পরস্পর দুই সন্ধ্যা যবের রুটিও পেট পুরিয়া খাইতে পারেন নাই—তিনি চলিয়া গিয়াছেন।*

## ভক্তকুলের শোকাবেগ

হযরতের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ভক্তদিগের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। আনাছ বলিতেছেন—সেদিন সমস্ত মদীনা যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।**

☆ ☆ ☆

ভক্তকুল শিরোমণি, আজন্মের সঙ্গী ও সেবক আবু-বাকর ছিদ্দীক বিবি আয়েশার গৃহে প্রবেশ করিয়া এবং হযরতের মুখের চাদর সরাইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "প্রভু হে ! আবু-বাকরের যথাসর্বস্ব তোমার নামে উৎসর্গীত হউক, এ মৃত্যুর পর আর মৃত্যু নাই। আবু-বাকরের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি হযরতের ললাটদেশ চুম্বন করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে কন্যার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

## আবু-বাকরের দৃঢ়তা

হযরতের পরলোক গমনে ভক্তগণ যে অসাধারণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এই শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। মদীনার নরনারিগণ করুণ কণ্ঠে নানাপ্রকার শোকগাথা আবৃত্তি করিয়া হযরতের অনন্ত ও অনুপম গুণ-গরিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহামতি আবু-বাকর আজ যে অসাধারণ ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হইতে পারে না। তিনি বিবি আয়েশার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন—ওমর উলঙ্গ তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান, বহু লোকজন তাহার চারিদিকে সমবেত। এই অবস্থায় ওমর বলিতেছেন ঃ "হযরত মরেন নাই। যে বলিবে হযরত মরিয়াছেন, আমি তাহার মুণ্ড উড়াইয়া দিব।" আবু-বাকর কাহাকে কোন কথা না বলিয়া ধীরভাবে সেই জনতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন—এবং হাম্দ-না'আতের পর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন ঃ

اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات - ومن كان
منكم يعبد الله فان الله حى لا يموت - قال الله : وما محمد الا رسول '
قد خلت من قبله الرسل' افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ؟
ومن ينقلب على عقبيه' فلن يضر الله شيئا - و سيجزى الله الشاكرين -

---

* মাদারেজ ২—৫১২। ** দারমী, তিরমিজী—মেশকাত।

"অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি মোহাম্মদের পূজা করিত—সে জ্ঞাত হউক যে, মোহাম্মদ নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছেন। আর তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর পূজা করিত, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ জীবিত—তিনি মরেন নাই। (আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ "মোহাম্মদ একজন প্রেরিত বই আর কিছুই নহেন, তাঁহার পূর্বেও বহু রছুল গুজরিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি মরিয়া যান অথবা নিহত হন, তাহা হইলে কি তোমরা (আল্লাহর পথ হইতে) ফিরিয়া দাঁড়াইবে ? হাঁ, যাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইবে, তাহারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না—এবং শীঘ্র আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দান করিবেন।")। আল্লাহ্ তাঁহার কেতাবে হযরতকে সম্বোধন করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, হে মোহাম্মদ ! তোমাকে ও তাহাদিগকে অর্থাৎ সকলকেই মরিতে হইবে।"

ছাহাবাগণ বলিতেছেন—আবু-বাকরের মুখে কোরআনের এই বাণীগুলি শ্রবণ করিয়া সকলের চৈতন্য হইল। ওমরের বাহু শিথিল হইয়া আসিল, তাঁহার হাতের তরবারি মাটিতে পড়িয়া গেল। আমাদিগের তখন বোধ হইতেছিল যেন এই আয়াতগুলি আজ নূতন শুনিতেছি। স্বয়ং ওমর ফারুক বলিতেছেন ঃ আবু-বাকরের মুখে আল্লাহর এই স্পষ্ট আয়াতগুলি শ্রবণ করিয়া আমার সর্বশরীর অবশ হইয়া আসিল, আমার আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম।*

## হযরতের জানাজা

মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়, জানাজা সম্পন্ন করিয়া, হযরতকে সমাহিত করা হইল।"**

## দরূদ

মোস্তফা-চরিতের প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ ! শ্রদ্ধাভাজন ছাহাবাগণ যে দরূদ পাঠ করিতে করিতে হযরতের দেহকে সমাহিত করিয়াছিলেন,*** আসুন, আমরা মোস্তফা চরণের অনুরক্ত ভক্ত ও সেবক-সেবিকাগণ—সেই পবিত্র দরূদ শরীফ পাঠ করিতে করিতে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করি ঃ

"ان الله وملئكته يصلون على النبى، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما" اللهم ربنا لبيك وسعديك! صلوة البر الرحيم، والملا-
ئكة المقربين، والنبيين والصديقين والصالحين، وما سبح لك
من شيئ يا رب العالمين! على محمد بن عبد الله خاتم النبيين،
وسيد المرسلين، وامام المتقين، ورسول رب العالمين،
الشاهد البشير، الداعى باذنك السراج
المنير، و بارك عليه و سلم

---

* বোখারী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থ ও তাবরী প্রভৃতি।

** এবন-মাজা—জাদোল-মাআদ, তবকাত প্রভৃতি। সাধারণ ঐতিহাসিক বর্ণনায় বুধবারের উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু ঐ বর্ণনাগুলি অলীক এবং এবন মাজার হাদীছের বিপরীত।

*** মাদারেজ।